সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র　　সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সমকালীন

একদশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৭০

জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য

আপনি সর্ব বিষয়ে ব্যয় সঙ্কোচ

ও সঞ্চয়ের ব্রত গ্রহণ করুন

খাদ্য বিষয়ে মিতব্যয়ী হোন

খেত ও খামারে যেমন বেশী শস্য উৎপাদন প্রয়োজন, তেমনি আপনার ঘরেও খাদ্যশস্যের খরচ কমানো দরকার। খাদ্যশস্য অহেতুক খরচ করে আপনার ও দেশের শক্তি দুর্বল করবেন না।

নতুন পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রয় সাধ্যমত বন্ধ রাখুন

অপ্রয়োজনে নতুন পোশাক পরিচ্ছদ কেনা সাধ্যমত বন্ধ রাখুন। এর ফলে পোশাক পরিচ্ছদের দাম কমবে এবং সাধ্যমত সকলের প্রয়োজনও মেটানো যাবে। অনাবশ্যক পোশাক পরিচ্ছদ কিনে নিজের ও দেশের শক্তি দুর্বল করবেন না।

বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যয় হ্রাস করুন

কলকারখানায় সমরোপকরণ তৈরীর জন্য বেশী বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন। তাই ঘরে, অফিসে, দোকানে বা প্রেক্ষাগৃহে অহেতুক বিদ্যুৎ খরচ বন্ধ করুন। অনাবশ্যক বিদ্যুৎ খরচ করে নিজের ও দেশের শক্তি দুর্বল করবেন না।

কয়লা, কেরোসিন প্রভৃতি জ্বালানির ব্যবহার কম করুন

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কলকারখানা ও পরিবহন ব্যবস্থার জন্য জ্বালানি মালের প্রয়োজন আছে। তাই অনাবশ্যক জ্বালানি খরচ করে আপনার ও দেশের শক্তি দুর্বল করবেন না।

উৎসব ও আনন্দে বাহুল্য বর্জন করুন

জাতির এই সংকটে উৎসব, আমোদ ও দেশভ্রমণ প্রভৃতিতে যথাসম্ভব খরচ কমান। উৎসব ও আমোদ প্রমোদে অনাবশ্যক খরচ করে দেশের শক্তি দুর্বল করবেন না।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য

সঞ্চয় একটি প্রধান শক্তি

প শ্চি ম ব ঙ্গ স র কা র ক র্তৃ ক প্র চা রি ত

গরমে ছিমছাম বাটার স্যাণ্ডাল
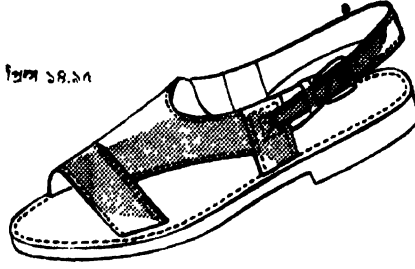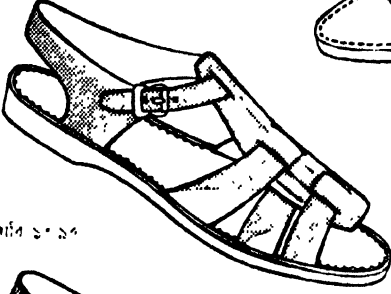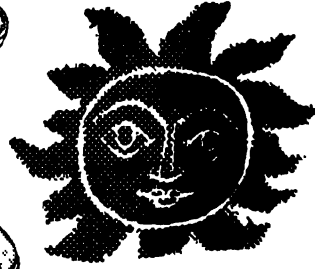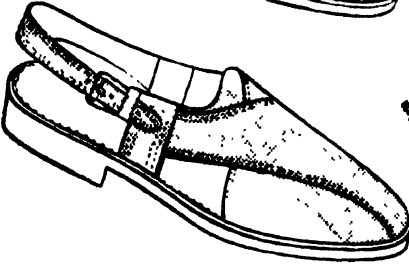
গরমের পথে ঘোরাফেরা সবচেয়ে ভালো স্যান্ডালে। স্যান্ডাল কেমন না-জুতো, না-চটি। পা-ঢাকা নয়, আবার পা-খোলাও নয়। গরমের তেজ থেকে বাঁচাবে, আবার হাওয়াও খেলাবে। পথিকের প্রিয় তাই বাটার স্যান্ডাল। হাজার রোদেও তাজা, ফিটফাট গঠন, উৎকৃষ্ট উপাদানে বাটার স্যান্ডাল।

ভারতীয় মুদ্রনশিল্পে

একটি পরিচিত নাম

৬/এ এস্. এন্. ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

ARUNA
ARUNA MILLS
MARINA
more DURABLE
more STYLISH
SPECIALITIES
Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH
Printed :
Voils
Lawns Etc.
ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD
ARUNA

অতীতের এক প্রদোষ সন্ধ্যা। পরম রূপবতী এক রাজকুমারীর সঙ্গে মারোয়াড় রাজকুমারের বিবাহোৎসব। বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করছেন বর ও বধূ, এমন সময় বিবাহ-সভায় দ্রুত প্রবেশ করল রক্তাপ্লুত রাজদূত, বলল, 'কুমার, সময় নেই, বাইরে শত্রু….।' বর্ম ও তরবারি নিয়ে অশ্বারূঢ় রাজকুমার যাত্রা করলেন রণক্ষেত্রে।

সেই সন্ধ্যাতেই বীরের মতো মৃত্যু বরণ করলেন রাজকুমার। নিশীথে রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হ'লেন রাজকুমারী। প্রিয়তমের নিষ্প্রাণ দেহের প্রতি ক্ষণেক চেয়ে রইলেন তিনি, তারপর আদেশ দিলেন, "বাঁশি বাজাও, মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণ কর, এবার আর লগ্ন পার হবে না।" চিতায় আরোহণ করে দয়িতের শিয়রে এসে বসলেন তিনি। পুরোহিতের গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণে, পুরনারীদের হুলুধ্বনিতে, সানাইয়ের সুমধুর সুরে কেঁপে উঠল বাতাস … লেলিহান হ'ল চিতার আগুন . .

এই ধরনের অসংখ্য কীর্তিগাথার মধ্যেই রয়েছে রাজস্থানের সত্যকার পরিচয়। মোটরযোগে ভ্রমণের আনন্দ অনেক— স্বদেশের অতীত কীর্তিগাথা ও কিংবদন্তী শোনার অপার সুযোগ এর অন্যতম আকর্ষণ। আপনি যদি মোটরে ভ্রমণ করেন, আরও অনেক নতুন গাথা ও জনশ্রুতির সন্ধান আপনি পাবেন।

ডানলপ ভ্রমণকারীদের সহায়

ভ্রমণ জাতীয় আয় বাড়ায়, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে

DC-583 A BEN
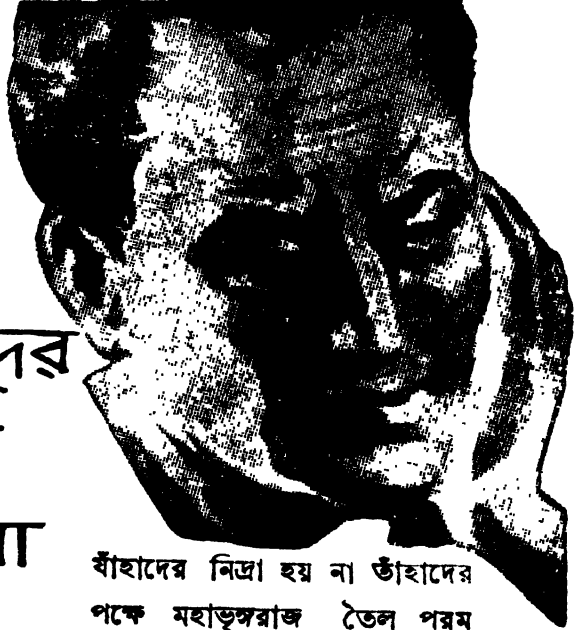
মহাভৃঙ্গরাজ

সাধনা ঔষধালয়

ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।
কলিকাতা কেন্দ্র— ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

SA 4/60

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে..
পরিমাসরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

একাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' সত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্র ॥

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

বৈশাখ
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
১ সংখ্যা

স ম কা লী ন

রবীন্দ্রকাব্যে বিজ্ঞানের প্রভাব

অমিয়কুমার মজুমদার

সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের সংগে একটা বিরোধ বর্তমান একথা অনেকে প্রকাশ ক'রে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে কোন সংঘাতের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়, কারণ ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞান হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান। তবে যদি কথাটাকে সংকুচিত বা সংকীর্ণ অর্থে অভিহিত করতে চাই, তাহলে বলা উচিত পর্যবেক্ষণ লব্ধ বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান। যে সব কবির দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতা আছে তাঁদের রচনায় পরিলক্ষিত হয় এক বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনার মধ্যে সাধারণ থেকে স্বতন্ত্র সুর অনুরণিত হয় তাতে লেশমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যে যে অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় তার মূলে তাঁর ঐ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী। রবীন্দ্রনাথ আনন্দরসের কবি। কাব্যরসের তরঙ্গোচ্ছ্বাস তাঁকে প্লাবিত করতে পারে নি তার কারণও তাঁর বৈজ্ঞানিক মেজাজ। কবি মনের উচ্ছ্বাসের প্রান্তে এসে বাধা সৃষ্টি করেছে তাঁর বৈজ্ঞানিক মন। সুস্থ, স্বাভাবিক পথে চালনা ক'রে এক রসোত্তীর্ণ জগতে তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে কবির বিজ্ঞান-রসিক সত্তা। একথা নিশ্চয় সবাই স্বীকার করবেন যে কবির বৈজ্ঞানিক চেতনা তাঁর কল্পনার জগতে কোন লোকসান ঘটায় নি। এ প্রসংগে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণ-বিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃংখলতার থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলাকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে, সে তো অনুভব করিনে।১"

এক শ্রেণীর সাহিত্যিক এবং কবি আছেন যাঁরা সাহিত্যের এলাকায় বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র প্রভাব উষ্মাসহকারে দেখেন। এমনকি অনেক সাহিত্যের ছাত্র আছেন যাঁরা বিজ্ঞান জানেন না একথা ব'লে উল্লসিত হন। কৌতুকের সংগে লক্ষ্য করা গেছে যে তাঁরা যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। অথচ বিরল প্রতিভার কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।২"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে বিজ্ঞানের যে প্রভাব অনুভব করেছিলেন তা আকস্মিকভাবে ঘটে নি, শৈশব থেকে জীবনের সায়াহ্ন পর্যন্ত বিজ্ঞানের নানা মহলে তাঁর মন আনাগোনা করেছে। তিনি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয় থেকে আহরণ করেছেন মন তৈরী করার নানা উপাদান। একথা সত্য যে উপনিষদের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছেন, কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা চলে না যে, মহর্ষি থেকে সুরু ক'রে গৃহশিক্ষক পর্যন্ত সকলেই কিছু না কিছু বৈজ্ঞানিক রসের সন্ধান কবিকে দিয়েছিলেন তাঁর বাল্যকালেই। মনে হয় শৈশবে তিনি বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে যে অনুশীলন করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিরূপে তিনি অধিকারী হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক মেজাজের।

প্রভাতসংগীত থেকে সুরু ক'রে নবজাতক পর্যন্ত নানা গ্রন্থে বিজ্ঞানের নানাবিধ তত্ত্বের সার্থক প্রতিফলন অনুভব করা গেছে। প্রভাত-সংগীতের অন্তর্গত 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়' কবিতাটির নাম তার বাণী বহন করছে। জগৎজোড়া নিয়মের রাজত্ব দেখে কবি বিস্ময়াবিষ্ট। তিনি লিখেছেন—

থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল গ্রহগণ নিজ অশ্রুজলে
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস নিভাইল নিজের হুতাশ

আবার একস্থানে আছে "সৃজনের আরম্ভ-সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার"

এ উদ্ধৃতি পাঠে সকলেই অনুভব করতে পারেন যে পৃথিবীর তথা গ্রহগণের সৃষ্টির তত্ত্ব এখানে বিধৃত হয়েছে।

যাঁরা সার জেমস্‌এর 'দি ডাইং সান্', প্রবন্ধটি পাঠ করেছেন তাঁরা এর মর্মার্থ সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

এই কবিতার এক অংশে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করতে গিয়েও কবি বৈজ্ঞানিক সত্যের আশ্রয় নিয়েছেন—

চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চক্র পথে রবি শশী ভ্রমে, চরাচর রাখিলা নিয়মে।

সৃষ্টির রহস্য তিনি অনুসন্ধান করেছেন বিজ্ঞানের পুঁথির মধ্যে, উপনিষদের কল্পলোকে নয়। বিজ্ঞানীরা বলেন সৃষ্টির ঊষাকালে অগ্নিপিণ্ড সূর্যের সামনে হঠাৎ এসে পড়েছিল ওরই সমতুল্য আর একটা নক্ষত্র। দুয়ের মধ্যে আকর্ষণের ফলে সৃষ্টি হ'লো বিরাট তরংগ। পরিশেষে সংঘর্ষের ফলে ছিটকে বেরোল কয়েক খণ্ড অগ্নিগোলক। তারা সূর্যকে 'জো-হুজুর' বলে মেনে নিয়ে ঘুরতে লাগলো তার চারপাশে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে। চলার আর বিরাম নেই। শেষ পর্যন্ত পিণ্ডগুলো তার প্রচণ্ড উত্তাপ ফেলল হারিয়ে। এমনি একটির নাম পৃথিবী। ধীরে ধীরে শীতল হয়ে সৃষ্টি করলো নতুন প্রাণের জন্য উপযুক্ত বাসভূমি, আবহাওয়া। আরো পরে জন্ম নিল প্রাণ। তার আগে সৃষ্টি হলো জল, বায়ু, শিলা। যে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে আজ তা দীর্ঘদিন পূর্বে এই পৃথিবীর মাটিতেই বিলীন হয়ে ছিল তা অস্বীকার করবার জো নেই। ক্রমবিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়ে এই পৃথিবী

এবং তার উপরকার প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগৎ আজকের এই অবস্থাতে পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগেকার সেই প্রাণী ও পৃথিবীর সাথে বর্তমানের এই পৃথিবীর আছে নাড়ীর সম্বন্ধ। তাকে স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। বিজ্ঞানের এই মহাসত্যটির আলোকে আমরা কবির নানা কাব্য নিয়ে আলোচনা করবো।

সোনার তরী (১৩০০) কাব্যগ্রন্থের বহু কবিতা নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বসুন্ধরা, ও 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতা দুটি তার মধ্যে অন্যতম। এখানে একটি প্রসংগ উল্লেখযোগ্য। 'প্রভাতসংগীতের' পর থেকে 'মানসী' পর্যন্ত কবির কাব্যে বিজ্ঞানের সূক্ষ্মচিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে নি। সোনারতরী থেকে কবি পুনরায় বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস মহাশয় তাঁর বিখ্যাত সমালোচনা গ্রন্থে ৩ বলেছেন, "বিজ্ঞান আশ্রয়ী যান্ত্রিক অভিব্যক্তিবাদের সংগে কবির এই একাত্মতা-তত্ত্বের বাইরের দিক থেকে ('অজিত-কুমার চক্রবর্তীর আলোচনাক্রমে) একটা মিল দেখা গেলেও অমিল গুরুতর। কারণ, সংগ্রাম, বিরোধ এবং আত্মকেন্দ্রিকতামূলক জীবধর্ম ঐ অভিব্যক্তির মূলে। কিন্তু কবির অভিপ্রেত মহাআত্মীয়তাবন্ধন অনুভব নিশ্চয়ই সর্ববিধ জৈব-সম্পর্কমুক্ত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলোপময় মিলনের বা পশ্চাতে প্রত্যাবর্তনের আগ্রহ, অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নয়। যাই হোক, কবির এ মনোভাব কোনো তত্ত্বের মাপকাঠিতে বিচার্য নয়। এ আশ্চর্য কবিকল্পনা মাত্র।"

অধ্যাপক দাসের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই সবিনয়ে মন্তব্য করতে চাই যে, অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তিনি যাচাই ক'রে দেখেন নি। তিনি মাত্র একটি দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন তা হচ্ছে 'স্ট্রাগল ফর্ এক্জিস্টেনস্ এ্যান্ড সারভাইবল অব দি ফিটেস্ট,' কিন্তু অভিব্যক্তি-বাদের এইটেই একমাত্র বক্তব্য নয়। বিভিন্ন সময়ে ডারউইন, মেণ্ডেল, পোষ্ট-ডারুইনিয়ানরা নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন ক্রমবিবর্তন প্রসংগে। রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সন্ধান নিতেন তা তাঁর বক্তব্যেই প্রমাণিত হয় "জ্যোতির্বিজ্ঞানের সহজ বই পড়তে লেগে গেলুম। এই বিষয়ের বই তখন কম বের হয় নি। স্যার রবার্ট বলের বড়ো বইটা আমাকে অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকোম্বস', ফ্লামারিয়' প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছি—গলাধঃকরণ করেছি শাঁস সুদ্ধ, বীজ সুদ্ধ। তার পরে এক সময়ে সাহস ক'রে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির এক সেট প্রবন্ধমালা।"৪

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের বক্তব্যও এই প্রসংগে উদ্ধৃতির যোগ্য : "জীবতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় বিষয় ছিল। বংশানুক্রম ও জন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল—দেখেছি তাতে প্যাভলভের গ্রন্থি ক্ষরণতত্ত্ব বা ওয়াটসনের আচরণ তত্ত্ব সম্পর্কীয় রচনাবলীর সংগেও কবির অপরিচয় নেই। জুলিয়ান হাক্সলি, হলডেন প্রমুখের রচনাবলী ত আমিই দেখেছি তাঁকে পড়তে।"৫

ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদে আছে এক আদিম জীবকোষ থেকে ক্রমে ক্রমে এই বিচিত্র জীবদেহ জন্মলাভ করছে। প্রাচীন অ্যামিবা থেকে আরম্ভ ক'রে মানবদেহ পর্যন্ত সর্বত্রই আছে "প্রোটোপ্লাজমিক সেল্।" অবশ্য মানবদেহে এর আকৃতি ভিন্নতর। কারণ মানবের মস্তিষ্কে এই কোষ অত্যন্ত জটিল ব্যূহ রচনা করেছে।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রত্যেক মানুষ একটি মাত্র ব্যক্তি নয়, বহু ব্যক্তিত্বের সমষ্টি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ গঠিত। এই প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তার পৃথক বুদ্ধি, ইচ্ছা, স্মৃতি ও সংস্কার আছে। ডারুউইনও একথা মেনে নিয়ে বলেছেন, "An organic being is a mi-

crocosm, a little universe, formed of a host of self-propagating organism, inconceivably minute and numerous as the stars in heaven".

ডারুইন বলেছেন লক্ষ লক্ষ জন্মের স্রোতের ভিতর দিয়ে জীবকোষকে চলে আসতে হয়েছে। কত অবস্থার বিপর্যয়ে কত পরিবর্তন তাকে আঘাত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তবু বহুবিধ পার্থক্য সত্ত্বেও জীবকোষের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে এবং সে তার জীবনী-ক্রিয়ার একটি অখণ্ড সংস্কারও বয়ে নিয়ে চলেছে। অভিব্যক্তিবাদ সম্পর্কে স্যামুয়েল বাটলারও সমশ্রেণীর মন্তব্য করেছেন, "I suppose, that the fish of fifty million years back and the man of to-day are one single living being in the same sense or very nearly so, as the octogenarian is one single living being with the infant from which he has grown". এই মতের পরিবর্তন বর্তমানকালে পরিদৃষ্ট হলেও সোনারতরী বা চিত্রার যুগে পরিবর্তিত তথ্য প্রাধান্য লাভ করেছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৮৯২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, "এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকালের নতুন; আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা খুব গভীর এবং সুদূরব্যাপী চেনাশোনা আছে। আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, বনশিশুর মতো একটা অন্ধজীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"৬

একে তো কল্পনাবিলাস বলা চলে না, এ যে প্রখর বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত। 'বসুন্ধরা' কবিতায় নিসর্গ বর্ণনাকালে ক্রমবিবর্তনবাদের কথা আছে। কবি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন যে আমাদের জীবনের যাত্রা কেবলমাত্র আজকের নয়। সুদূরে অতীতে জড় জগতের মধ্যেও এই প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গিয়েছিল, উদ্ভিত-জগতে এবং প্রাণী-জগতেও এই প্রাণই অভিব্যক্তির বা ক্রমবিবর্তনের স্তরে স্তরে পা ফেলে আসছে। একারণেই মানুষের কাছে তৃণের শিহরণ, কুসুম মুকুলের ফুটে ওঠার আনন্দ, সমুদ্রের কলরোল এত অর্থময়, এত পরিচিত।

জন্মের পূর্বে আমরা ভ্রূণাবস্থায় এই মাটির পৃথিবীতে ছিলাম, মৃত্যুতেও সেই পৃথিবীর ধুলোর সংগেই একাত্ম হয়ে থাকব। আমাদের জীবন-মরণের আশ্রয়স্থল এই পৃথিবী লক্ষ কোটি বছর ধরে তার বুকের উপরকার সমগ্র প্রাণ সমেত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

কবি বলছেন ঃ আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন

যুগযুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র ফুল ফল গন্ধ রেণু।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী মহাশয় এই কবিতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধান-যোগ্য। "বিজ্ঞানের কোনো একটি মতবাদের সহিত সুসংগত অথচ পরিপূর্ণভাবে কাব্য, এমন কবিতা প্রায়ই দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বকে জানিবার দুর্দম আকাঙ্ক্ষার সহিত অন্তঃপুর-বাসিনী ধরিত্রীকে জড়াইয়া থাকিবার ব্যাকুল আগ্রহ টানা-পোড়েনের মত বুনিয়া গিয়া বিচিত্র এক রসের সৃষ্টি করিয়াছে।"৭

'সমুদ্রের প্রতি' (সোনার তরী) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ অতীত জীবনের যে বিচিত্র স্মৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতির কোলে জন্মলাভের যে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তার মধ্যেও অভিব্যক্তিবাদের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। মনে হয়, যেন মনে পড়ে

যখন বিলীন ভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী' পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের, অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি।

সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সংগে একাত্মতাবোধের দ্বারা জীবনের অন্তহীন রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া সম্ভব। সেজন্য প্রকৃতির যেখান থেকে প্রাণরস উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, কবি সেখানে প্রবেশ ক'রে উৎসের সন্ধান করতে ব্যস্ত।

এই অভিব্যক্তিবাদ ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ডের কবিতাতেও ৮ ফুটে উঠেছে—

"With beat of systole and of diastole
One grand great life throbs through earth's giant heart

From lower cells of waking life we pass
To full perfection; thus the world grows old".

বারংবার কবির চিত্তে একই কথা ধ্বনিত হয় যে পৃথিবীর ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বস্তু তাঁর চিরসংগী; সৃষ্টির প্রায়ান্ধকার কাল থেকে ক্রমে ক্রমে তিনি বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। আজ যখন সেই সৃষ্টি-রহস্যের কথা তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে তখন পৃথিবীর পরিচিত প্রত্যেক কণিকার সংগে তিনি আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করেন।

চৈতালি (১৩০৩) গ্রন্থের 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় এই সুরের রেশ অনুভব করা যায়—

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে
বহুকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে
পশু, পাখি পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে—জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে, মাতৃস্তনে শিশুর মতন,
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

উৎসর্গ (১৩১০) কাব্যের 'প্রবাসী' কবিতায় এই মহাসত্যই উন্মোচিত হয়েছে। এই সংসারের বিচিত্র বন্ধনে আমরা আবদ্ধ। একারণেই নিজেকে পরবাসী মনে হয় না।

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে

এই কবিতাতেই অন্যত্র আছে—

'এ সাতমহলা ভবনে আমার চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

কবি বলেন যে, আমাদের এই বর্তমান জীবনের মধ্যে এক চিরন্তন জীবন আছে। আমার যে জীবন কত যুগ আগে থেকে কত বিচিত্র জীবন পর্যায়ের ভেতর দিয়ে আমার এই বর্তমানতায় আজ এসে পেঁাছেচে, আমার সেই জীবনই আমার অন্তর্নিহিত চিরন্তন জীবন এবং এই ক্ষণিক জীবনের স্বল্প পরিসর চেতনার মধ্যে সেজন্য কবি বিশ্বচেতনাকে এক এক সময় অনুভব করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে কবির একটি পত্র ৯ উদ্ধৃতির যোগ্য।

"I cannot account for this exactly, or explain definitely what kind of longing it is which is roused within me. It seems like the throb of some current flowing through the artery connecting me with the larger world. I feel as if dim, distant memories come to me of the time when I was one with the rest of the earth; when on me grew green grass, and on me fell the autumn light; when a warm scent of youth would rise from every pore of my vast, soft, green body at the touch of the rays of the mellow sun, and a fresh life, a sweet joy, would be half-consciously secreted and inarticulately poured forth from all the immensity of my being, as it lay dembly stretched, with its varied countries and seas and mountains, under the bright blue sky". My feelings seem to be those of our ancient earth in the daily ecstasy of its sun-kissed life; my own consciousness seems to stream through each blade of grass each sucking root, to rise with the Sapthro the trees, to breakout with joyous thrills in the waving fields of corn, in the rustling palm leaves.

I feel impelled to give expression to my blood-tie with the earth, my kinsman's love for her".

পত্রটি দীর্ঘ কিন্তু এর মধ্যে গভীর তথ্য সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। নৈবেদ্য এবং ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থেও বৈজ্ঞানিক তথ্যের সামান্য উল্লেখ আছে।

'বলাকা' গ্রন্থে পূর্বেকার মহাসত্যটি বিধৃত হয়েছে

"মনে আজি পড়ে সেই কথা চুপে চুপে
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া রূপ হতে রূপে
স্খলিয়া স্খলিয়া প্রাণ হ'তে প্রাণে।"

'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর একই। সমগ্র বিশ্ব-লোক ঘিরে যে প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে, সেই অসীম প্রাণ-স্পন্দনে কবির প্রাণ যখন পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যীভূত হয়েছে, তখনই ব্যক্তি চেতনার অচিন্তনীয় ব্যাপ্তিতে কবি মুক্তির উল্লাস বোধ করেছেন।

'পত্রপুট' গ্রন্থের অন্তর্গত 'পৃথিবী' কবিতা যিনি পাঠ করেছেন তিনিই আশ্চর্য হয়েছেন এর কাব্যমাধুর্য লক্ষ্য ক'রে। পুরাণের সংগে ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের সমন্বয় হওয়াতে এই কবিতা অনির্বচনীয় সুষমায় ভরে উঠেছে—

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী,
তুমি নিত্য নবীনা
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে (২৯শে আশ্বিন, ১৩৪২)

বনবাণী (১৩৩৩-১৩৩৪) গ্রন্থে কবির সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির—উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের আত্মীয়তা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জন্মদিনে (১৩৪৭) কাব্যগ্রন্থের ৫ নং কবিতায় ডারুইন কথিত ক্রমাভিব্যক্তিবাদের কথা প্রকাশিত হয়েছে। সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণ ক'রে কবি ক্রমাভিব্যক্তি লক্ষ্য করেছেন। সৃষ্টির প্রথমে যখন অগ্নিবন্যাধারা অসীম শূন্যে প্লাবিত করেছিল, তখন স্ফুলিঙ্গের মতো তিনি শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করেছিলেন। তারপর পৃথিবীতে জড়পিন্ড হয়ে কল্পরূপে এবং তারপর বৃক্ষরূপে রূপান্তরিত হলেন, পরে পশুরূপে। শেষে 'মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে' অবতরণ করলেন, পরিশেষে নতুন নতুন দ্বীপে নতুন নতুন ভাষাভাষী হয়ে বর্তমান জীবন গ্রহণ করেছেন। আবার এখান থেকে তাঁকে চলে যেতে হবে। কথাগুলি শুনলে মনে হয় যেন কোন বিজ্ঞানী ক্রমবিবর্তনের কথা বর্ণনা করছেন।

বনবাণী গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন "আমার ঘরের আশেপাশে যে সব বোবা বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হ'য়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পেঁছালো। তাদের ভাষা হচ্ছে জীব জগতের আদিভাষা। তার ইসারা গিয়ে পেঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে; হাজার হাজার বৎসরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়; মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ঐ গাছের ভাষায়--তার কোন স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।"

নৈবেদ্যের পরেকার রচনাসমূহ অর্থাৎ খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতিকে পরিধি নিয়ে গড়ে উঠেছে এক অধ্যাত্মযুগের বৃত্ত। সেখানে বিজ্ঞানের বিশেষ কোন প্রভাব নেই বললেই চলে। এরমধ্যে খেয়া'র 'প্রতীক্ষা' কবিতা উল্লেখযোগ্য। এই কবিতায় জোয়ারের বর্ণনায় কবির প্রাকৃতিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট পরিচয় বর্তমান। চাঁদের সংগে জোয়ার-ভাঁটার যে চিরন্তন সম্পর্ক আছে এই কবিতায় সেই বৈজ্ঞানিক সত্য-ই বিধৃত হয়েছে—

আজিকে চাঁদ উঠবে প্রথম রাতে　　পড়বে আলো গাছের ছায়া-সনে।
নদীর পারে নারিকেলের বনে,　　দখিন হাওয়া উঠবে হঠাৎ বেগে,
দেবালয়ের বিজন আঙিনাতে　　আসবে জোয়ার সংগে তারি ছুটে—

এবারে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা কবির কাব্যে কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক। পদার্থবিদ্যাও কবির প্রাণে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল এ প্রমাণ অনেক পাওয়া যায়। অণু-পরমাণু নিয়ে গঠিত এই জগৎ। এর প্রতিটি চলে তার নির্দিষ্ট পথে। ওর মধ্যে আবার বিশেষ চক্রপথ-আছে, বিজ্ঞানীরা তাকে বলেন অরবিট। এই অরবিট-এর মধ্যে ঘোরাফেরা করে ইলেকট্রন আর প্রোটনের দল। প্রতিটি পরমাণুর মধ্যে সুপ্তাবস্থায় আছে প্রচণ্ড তেজ বা শক্তি। অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে পরমাণুর অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা তেজ বাইরে মুক্ত অবস্থায় এনে ঘটানো যায় বিষম বিপ্লব। এছাড়া অনু-পরমাণু বিভিন্নভাবে সং-যোজিত হয়ে গড়ে তুলছে নতুন নতুন বস্তু। একই যৌগিক পদার্থের অনু ভেঙে নতুন কায়দায় জুড়ে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে। এ হচ্ছে নিছক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। এবারে কবির 'শেষ সপ্তক (১৩৪২)' কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে একটু আগেই বলা বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে মিলিয়ে নেই—

অনু পরমাণু অসীম দেশে কালে　　তার অন্তরে আছে বহ্নি
বানিয়েছে আপন আপন পথের চক্র　　তেজের দুর্দাম বোধ
নাচছে সেই সীমায় সীমায়,　　সেই বোধ খুঁজছে আপন ব্যঞ্জনা।
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ

'শ্যামলী' (১৩৪৩) গ্রন্থের 'আমি' কবিতা পাঠ করলে বোঝা যায় বিজ্ঞানকে কেমন ক'রে কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করা হয়েছে। কাব্য এখানে থাকলেও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সত্যের বিন্দুমাত্র অবমাননা হয় নি।

পণ্ডিত বলছেন—
বুড়ো চন্দ্রটা, নিষ্ঠুর চতুর হাসি তার,
মৃত্যুদূতের মতো গুঁড়ি মেরে আসছে সে
পৃথিবীর পাঁজরের কাছে।

এই সংগে কবির 'বিশ্বপরিচয়' (১৩৪৪) গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি প্রয়োজনীয়। "পৃথিবীর বিপদগণ্ডির অনেকটা বাইরে আছে ব'লে চাঁদের যা পরিবর্তন হয়েছে তা খুব বেশি না। পৃথিবীর টানের জোরে আস্তে আস্তে চাঁদ তার কাছে এগিয়ে আসছে। তারপরে যখন ঐ বেড়ার মধ্যে অপঘাতের এলাকায় প্রবেশ করবে তখন যাবে টুকরো টুকরো হয়ে। আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীর চারদিক ঘিরে শনিগ্রহের নকল করতে থাকবে, তখন হবে তার শনির দশা।"

জ্যোতির্বিজ্ঞানের এক বিশেষ দিক এমন সহজবোধ্য ভাবে আর কেউ প্রকাশ করতে পেরেছেন কি না জানি নে।

'পত্রপুট' গ্রন্থের 'উদাসীন' কবিতায় চাঁদের অতীত ও বর্তমান অবস্থার যে বর্ণনা আছে তা আশ্চর্যসুন্দর। বর্তমানকালে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের ফলে চাঁদের নানা কথা জানতে পেরেছি, অথচ কবি ১৯৩৬ সালে যে কবিতা রচনা করেছিলেন তাতে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও কাব্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে—

শুনেছি একদিন চাঁদের দেহ ঘিরে
ছিল হাওয়ার আবর্ত।
তখন ছিল তার রঙের শিল্প,
ছিল সুরের মন্ত্র,
ছিল সে নিত্যনবীন।
দিনে দিনে উদাসী কেন ঘুচিয়ে দিল
আপন লীলার প্রবাহ।
কেন ক্লান্ত হোলো সে আপনার মাধুর্যকে নিয়ে।
আজ শুধু তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব--
ফোটে না ফুল,
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী॥

সমসাময়িক কালে রচিত 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থে চাঁদ সম্বন্ধে অনুরূপ মন্তব্য আছে। ১০

চাঁদ যে নিয়মে অতিমাত্রায় রোদ পোহায় তাতে তার তেতে-ওঠা পিঠের উপরে হাওয়া এত গরম হয়ে উঠেছিল যে চাঁদ তার বাতাসের পরমাণুদের ধরে রাখতে পারে নি, তারা সবাই গেছে বেরিয়ে। যেখানে হাওয়ার চাপ নেই সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি বাষ্প হয়ে যায়। বাষ্প হওয়ার সংগে সংগেই জলের পরমাণু গরমে চঞ্চল হয়ে চাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। জল হাওয়া যেখানে নেই--সেখানে কোনো রকমের প্রাণ টিঁকতে পারে বলে আমরা জানি নে। চাঁদকে একটা তাল-পাকানো মরুভূমি বলা যেতে পারে।

'শেষসপ্তক' গ্রন্থের "তুমি প্রভাতের শুকতারা" কবিতাটিতে এক অপূর্ব ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে। সুদূরের রহস্যময় শুকতারার সাথে কবি এক নিগূঢ় প্রীতির বন্ধন অনুভব করেন।

জ্যোতিষী যাই বলুক না কেন শুক্রগ্রহ আমাদের কাছে শুকতারা। জ্যোতিষী বলে গোধূলিত দেহলিতে, সূর্যাস্তবেলায় মিলনের দিগন্তে রক্ত অবগুণ্ঠনের নীচে শুকতারা দেখা দেয়। কিন্তু কবির কাছে সে একান্ত আপনার। হেমন্তের শিশির বিন্দুর সাথে, শরতের শিউলির সংগে শুকতারার উপমা চলে। প্রভাতে মানব পথিককে নিঃশব্দে সে সংকেত করছে জীবনযাত্রার পথের মুখে আবার সন্ধ্যায় তাকে চরম বিশ্রামে ফিরে যেতে ডাকে। এই হচ্ছে কবিতাটির বক্তব্য। অথচ এই কবিতার মধ্যে হঠাৎ তিনি লিখলেন--

পণ্ডিত তোমাকে বলে শুক্রগ্রহ,
বলে, আপন সুদীর্ঘ কক্ষে
তুমি বৃহৎ, তুমি বেগবান,
তুমি মহিমান্বিত;
সূর্য বন্দনার প্রদক্ষিণ পথে
তুমি পৃথিবীর সহযাত্রী
রবিরশ্মিগ্রথিত দিনরত্নের মালা
দুলছে তোমার কণ্ঠে।

কবি বিবর্তনবাদকে স্বীকার করে নিয়েছেন তা আমরা দেখছি। তাঁর কথা-বার্তায়, কাব্যে ও প্রবন্ধে বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ আছে তা পরিস্ফুট হতে থাকে।

জীবন যত সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, বিজ্ঞান চর্চার স্পৃহাও তাঁর বেড়ে যেতে আরম্ভ করলো। এক একবার ইচ্ছে হয়েছে পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মত অনুসন্ধান করেন। বয়সের বাধা এবং উপযুক্ত প্রেরণার অভাবে বোধহয় ওপথে আর এগোন নি। মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন "দেখ সায়েন্স আমার খুব ভালো লাগে। এই যে সবুজ পাতা ঝির ঝির করছে হাওয়ায়, এর প্রত্যেক নড়ার সংগে সূর্যালোক নিচ্ছে ভিতরে, আর তা থেকে তৈরী হয়ে উঠছে নানারকমের জিনিস। কি আশ্চর্য অদৃশ্য ব্যাপার চলেছে সমস্ত প্রকৃতির শিরায় শিরায়, ভাবতে গেলে মন বিস্মিত স্তব্ধ হয়ে যায়।" ১১

আর একবার তিনি বলেছেন "....এই সব বই-ই আমার ভাল লাগে—সায়েন্সের বই। কী আশ্চর্য রহস্যময় এই জগৎ। আরো আশ্চর্য তার এতটুকু উদ্ঘাটন। কে মনে করতে পারে, এই যে হাতখানা এ খালি নৃত্যশীল অনুপরমাণুর সমষ্টি। এই সব বই আমার আরো ভালো লাগে এজন্য যে, মনকে একটা ইম্পার্সনাল অস্তিত্বে, একটা মুক্তির মধ্যে নিয়ে যেতে খুব সাহায্য করে। তুমি আমি কিছু নয়, শুধু আছে নিয়ম আর সংখ্যা।" ১২

প্রাণের সৃষ্টি রহস্য কবি নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। তারপরে বিজ্ঞানীদের তথ্যের সাথে তা মিলিয়ে বুঝতে পারলেন যে তাঁর ধারণা অভ্রান্ত। কবি বলছেন যে, পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি তিনি নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে যে তেজোময় লহরী তাঁর নাড়ীতে অনির্বচনীয়ের স্পন্দন এনেছে তা তিনি অনুভব করেছেন নিজের মধ্যে। 'পত্রপুট' কাব্যে আছে—

আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন অস্পষ্ট বার্তা
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।
হেমন্তের রিক্তশস্য প্রান্তরের দিকে চেয়ে
আলোর নিঃশব্দ চরণধ্বনি
শুনেছি আমার রক্তচাঞ্চল্যে।

সৃষ্টির পূর্বে এই পার্থিব জগতের অবস্থা কেমন ছিল তা বিজ্ঞানীরা বর্ণনা দিয়েছেন। সূর্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীর। আদিতে এই পৃথিবী ওই বিরাট তেজঃপুঞ্জে ভরা গোলাকার পিণ্ডটার মধ্যেই নিহিত ছিল। পরে এই সূর্যের আলোকেই উত্তপ্ত হয়েছে কঠিন শীতল পৃথিবী। আর সৃষ্টি হয়েছে প্রাণের। কবি বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে বলছেন—

বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত
হয়েছে অসীমকালে
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোকতীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
যে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।

'শ্যামলী' কাব্যের "বিদায় বরণ" কবিতাটির একটি চরণ উদ্ধৃতির যোগ্য। "চেতনার সংগে আলোর রইল না কোন ব্যবধান।" কবি-জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অতি

সত্যকথাই লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথ কবি ও দ্রষ্টা; তাই তাঁহার কাছে জড় ও জীব বিজ্ঞানের তথ্যরাজি অন্তরের রসের সঙ্গে মিশিয়া অনুভূতির মধ্যে নূতন ভাবে রূপ লইয়াছে।"১৩

সেঁজুতি (১৩৪৩-১৩৪৫) কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কয়েকটি কবিতায় আধুনিক বিজ্ঞানের কথা আছে। তখন যুদ্ধ চলছে স্পেনে। যুদ্ধের উত্তেজনা, উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে, অথচ লক্ষকোটি অখ্যাত মানুষের খবর কেউ রাখে না। এই কথা বোঝাতে গিয়ে কবি বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়েছেন। জ্যোতিষ্কলোকে নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ অবিরত তাপ ও আলো বিকিরণ করছে। এই তেজ বিকিরণের তীব্রতা এবং যে দূরত্ব পর্যন্ত আলো ও তাপ ছড়িয়ে পড়েছে তা কল্পনাতীত। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বেদনার হোমাগ্নি তার তাপ বিকিরণ করছে। বিশ্বের সকল মানুষ এর স্পর্শ পাচ্ছে অথচ বুঝতে পারছে না। কেন? কবি এক সুন্দর উপমার সাহায্য নিয়ে তা বুঝিয়েছেন। নক্ষত্রলোকে যে তেজ বিকীরিত হচ্ছে তা দৃশ্যমাণ নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখে বোঝার উপায় নেই। শুধু চোখে নক্ষত্রের আলো আমরা শান্ত ও সুন্দর রূপেই দেখি। তেমনি যে অদৃশ্য উৎস থেকে বেদনাগ্নি বিকীরিত হচ্ছে, যে পথচক্র ধরে সেই বিকীরণ পরিব্যাপ্ত হচ্ছে—তা আমাদের সাধারণ অনুভূতির অতীত। "চলতি ছবি" কবিতায় কবি বলেছেন—

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি
জেনেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বালিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নি সিন্ধু-প্লাবন নির্ঝরে
কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে।
কিন্তু, এই যে এই মুহূর্তে বেদনহোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দাহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্তজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে,
যেমন শান্ত যেমন স্তব্ধ দেখায় মুগ্ধ চোখে
বিরাম বিহীন জ্যোতির ঝঞ্ঝা নক্ষত্র-আলোকে।

বিশ্বপ্রাণের তত্ত্বকে আশ্রয় করে কবি ব্যক্তি-সত্তার আসক্তিকে ভুলতে চেষ্টা করেছেন। 'আমি' কবিতাটির মধ্যে এই তত্ত্বটির প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়। বিশ্বচেতনা লাভে ব্যক্তি-চেতনার বোধটি সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। কবি বুঝতে পারছেন, যে তিনি আজ পৃথিবীতে বিরাজ করছেন, তিনি আজকের নন। এই পৃথিবীতে কত নামে কত মূর্তিতে তিনি এসেছেন। 'পরিশেষ' (১৩৩৭-১৩৩৯) গ্রন্থের "আমি" কবিতায় আছে—

এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাবার
কত বারম্বার।

নবজাতকের অধ্যায়ে পালাবদল ঘটলো কাব্যের। তাহলেও প্রকৃতির অনন্ত রহস্যকে জানবার বাসনা তেমনি প্রবল।

বর্তমান সভ্যতার যান্ত্রিক উপকরণকে কাব্যের সৌন্দর্য দিয়ে শোভামণ্ডিত করে তুললেন। পক্ষীমানব, সাড়ে ন'টা, ইসটেশন কবিতায় এর পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বরহস্য জিজ্ঞাসা প্রকটিত হয়েছে 'কেন', প্রশ্ন, রাতের গাড়ি ইত্যাদি কবিতায়।

সৃষ্টির তত্ত্ব কবির মনে নানা কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছে সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সূর্য থেকে আলো আসে পৃথিবীতে। পৃথিবী প্রণয়ীর মত তাকিয়ে আছে সূর্যের দিকে। তার রশ্মিচ্ছটায় পৃথিবী আলোকিত, আরক্তিম। সূর্য থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে চলতে থাকে বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে। পৃথিবীর উপরিকার বায়ুমণ্ডল যেখানে শেষ হয়েছে তারও ঊর্ধে আছে ইথরের নিস্তরংগ সমুদ্র। অতদূর থেকে আসবার পথে বেশ খানিকটে আলো শুষে নেয় অনেক স্তর। শুধু তাই নয়, সূর্যের আজ্ঞাবাহী অন্যান্য গ্রহগুলিতে আংশিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তার আলো। সামান্য অংশ মাত্র পৃথিবীকে আলোয় উদ্ভাসিত করে। বেশীভাগই অপচয় হয়। কবির তাই জিজ্ঞাসা১৪—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান-যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দির মণ্ডপে
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে
অবশিষ্ট অমেয় আলোকধারা
পথহারা
আদিম দিগন্ত হতে
অক্লান্ত চলেছে ধেয়ে নিরুদ্দেশ স্রোতে।
সংগে সংগে ছুটিয়াছে অপার তিমির—তেপান্তরে
অসংখ্য নক্ষত্র হতে রশ্মিপ্লাবী নিরন্ত নির্ঝরে
সর্বত্যাগী অপব্যয়
আপন সৃষ্টির 'পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।

'প্রশ্ন' কবিতাটিও পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক রসে সিক্ত কবিতা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের কথা উপলব্ধি করতে গিয়ে কবি অভিভূত। পূর্বে বলা হয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে কবির কৌতূহলের অন্ত ছিল না। গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন, আয়তন ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয় জানতে কবির আগ্রহ অপরিসীম। তিনি লিখেছেন,

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে
কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
পণ্ডিতেরা, লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
দুর্লক্ষ্য আলোতে।

পৃথিবী ও প্রাণের আবির্ভাবের কথা জেনে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে চিন্তা করি, তাহলে তাবৎ প্রাণীকুল পৃথিবীর কেউ নয়? পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না? তবে এই সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? সার জেমস্ জীনস তাঁর গ্রন্থে বলেছেন পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে নেহাৎই আকস্মিকভাবে। বিজ্ঞানীরা এখনো জানতে পারেন নি সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে। জীবন ও জগতের মধ্যে যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে—সেই পরম সত্য উপলব্ধি করবার পূর্বেই হয়তো কবিকে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানা রঙা জলবিম্বপ্রায়,
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।

জীব জন্মগ্রহণ করছে এবং এক অধ্যায়ের শেষে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। এই যে চিরন্তন আসা-যাওয়া চলছে তার উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে কবি প্রশ্ন করছেন১৫

কেন এই আসা আর যাওয়া
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া
জানিনা, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পীকবি ॥

'সাড়ে ন'টা' কবিতাটিও অপূর্ব। বেতারের সুযোগ-সুবিধে আলোচনা করা হয়েছে এতে। বেতারের গান কবির কাছে মনে হয়েছে যেন কোন্ সুদূর আদর্শলোকের এক অভিসারিকা, গিরি-নদী-সমুদ্র, যুদ্ধ, মৃত্যু উপেক্ষা করে, রাগিনীর দীপশিখা হাতে নিয়ে একাকিনী অভিসারে চলেছে। যক্ষের বিরহগাথা মেঘদূত ও কালের সমস্ত বিপ্লব উপেক্ষা ক'রে চিরন্তন হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিতান্ত গদ্যময় একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়কে কবি কল্পনার হোমানলে দগ্ধ করে উৎকৃষ্ট কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন।

নিখিল বিশ্বের অনন্ত কোটি গ্রহনক্ষত্রের ওঠা-পড়া, ভাঙা-গড়ার মধ্যে সমস্তকে আশ্রয় করেও একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। একটি সুষমাও আছে। কবি বলেন, দিব্য চেতনার শক্তি স্পন্দনে সৃষ্ট এই জগৎ। দেশ-কালের মধ্যে অচিন্ত্যনীয় এই সৃষ্টি ওই দিব্যচেতনার দ্বারা বিধৃত। তাই এই বিশ্বজগতের মধ্যে এমন একটি পরিপূর্ণ ছন্দ রয়েছে, যে ছন্দের দ্বারা এই নিখিল বিশ্ব বিধৃত হয়। তেমনি প্রতি মুহূর্তের রূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের ধ্যান-রূপটিকে নিত্য নূতন করে গড়ে তুলেছেন। তাই যে কোন স্বরূপে সৃষ্টির একটা অখণ্ড রূপ কিছুতেই ব্যাহত হচ্ছে না। মনে হয় কবি কথিত দিব্য-চেতনা এবং সার জেমস্ জীনস্ বর্ণিত "ভাইটাল ফোর্স" একই।

সৃষ্টির রহস্য জানবার জন্যে যতবারই তিনি উন্মুখ হয়েছেন ততবারই তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন১৬

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতস বাজির খেলা আকাশে আকাশে
সূর্যতারা লয়ে
যুগ-যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হ'তে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে—কালে।

সূর্যের আলোর সংগে আমাদের প্রাণের যোগ কত গভীর ও ব্যাপক এবং তার যে একটি বৈজ্ঞানিক সত্যতা আছে তা কবি উপলব্ধি করেছেন নিজের অনুভূতি দিয়ে। 'যাত্রী' গ্রন্থে একস্থানে তিনি লিখেছেন, "সূর্যের আলোর ধারা তো আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে বইছে। আমাদের প্রাণ-মন, আমাদের রূপ-রস সবই তো উৎসরূপে রয়েছে ওই মহাজ্যোতিষ্কের মধ্যে। সৌর জগতের সমস্ত ভাবীকাল এতদিন তো পরিকীর্ণ হয়েছিল ওরই বহ্নিবাষ্পের মধ্যে। আমার দেহের কোষে কোষে ওই তেজই তো শরীরী। আমার ভাবনার তরঙ্গে তরঙ্গে ওই আলোই ত প্রবহমান। বাহিরে ওই আলোরই বর্ণচ্ছটায় মেঘে মেঘে পত্রে পুষ্পে পৃথিবীর রূপ বিচিত্র; অন্তরে ওই তেজই মানসভার ধারণ করে আমাদের চিন্তায় ভাবনায় বেদনার রাগে অনুরাগে রঞ্জিত। সেই এক জ্যোতিরই এত রঙ, এত রূপ, এত ভাব, এত রস।"

'পত্রপুট' কাব্যগ্রন্থের দশ নম্বরের কবিতাটির দুটি চরণ এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য।

'বলি—হে সবিতা,
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে আমার দেহের অণুপরমাণু।'

সোনার তরী পর্বে কবি যেমন সমসাময়িক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিকে কল্পনাশ্রিত করেছিলেন, বলাকা পর্বে তেমনি পদার্থবিদ্যার নতুন নতুন আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি যেমন পরমাণুবাদ ও গতি-বাদকে, ভাবগম্ভীর কাব্যের উৎস করলেন। 'বলাকার' 'চঞ্চলা' কবিতায় বিজ্ঞানের এই নূতন তত্ত্বের মর্মকথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে—

হে বিরাট নদী
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল

অবিচ্ছিন্ন অবিরল		চলে নিরবধি।

বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব হলো এই যে, বিরাম বলে কিছু নেই। আমাদের পৃথিবীর প্রতি কণা অবিশ্রান্ত গতিসমন্বিত। ১৯২২ সালে জে, এ, টমসন তাঁর বিখ্যাত 'দি আউট লাইন অব্ সায়েন্স' গ্রন্থে লিখেছেন— "....there is no such thing as rest. Every particle that goes to make up our solid earth is a state of perpetual unremitting vibration".

বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বগুলি ছাড়াও তার যেসব সৃষ্টবস্তু আমাদের কাছে অতি পরিচিত, তাদের অনেক কাহিনী রসমণ্ডিত হয়ে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ কবির নানা কাব্যে। 'নবজাতক' কাব্যের 'জবাবদিহি' কবিতায় আছে বর্ণতত্ত্ব। কালো রঙ সব রঙের শোষণে সৃষ্টি হয়—এই সত্যটি কবি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা অনির্বচনীয়।

সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি		শেষ প্রহরে রঙহরণের পালা।
কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,		ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর—
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি		কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।

বিজ্ঞানের যে মহলে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা সেখানে গভীর কৌতূহল নিয়ে কবি যাতায়াত করেছেন। সেই মহলের নতুন নতুন বাতায়ন উদ্ঘাটন তিনি সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন। এই বাতায়ন পথে দাঁড়াতে তিনি ভালোবাসতেন। তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ধান করতো গভীরে। কিন্তু বিজ্ঞানের আর একটা দিক আছে। যেখানে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রকাশ ঘটে। বিশুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে গড়ে উঠেছে শিল্প। সেখানে কলকারখানা, যন্ত্রপাতি। কবির মনে হতো বিপুল যন্ত্রশক্তি যেন দানবের রূপ নিয়ে এদিকটার সবজায়গা জুড়ে বসে আছে। কবির ভাল লাগে নি এদিকটা। এর প্রতি তাঁর মনের বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে মুক্ত ধারা, রক্ত করবী নাটকে।

নবজাতক কাব্যগ্রন্থের পক্ষীমানব কবিতাটি যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ। এ যেন বর্তমান যান্ত্রিক যুগের একটা প্রতিবাদ। আগে পাখীরা আকাশে উড়ত, গগন, পবন ও মেঘের তারা ছিল স্বাভাবিক সংগী। তাদের প্রাণ, তাদের গান আকাশের সুরে বাঁধা ছিল। মহাকাশের মহাশান্তির সংগে তারা এক ছন্দে, এক সুরে গাঁথা ছিল। কিন্তু মানুষের মদমত্ততা, স্পর্ধা দুই পাখা মেলে কর্কশ গর্জন করে আকাশের শান্তি নষ্ট করছে এবং হিংসাও মৃত্যুর অনল ঢালছে। তিনি বলেছেন—

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে		যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে		অশান্তি আজ উদাত বাজ
হানিছে অট্টহাসে।		কোথাও না বাধা মানে।

যন্ত্রের বিরুদ্ধে কবির বিক্ষোভ সর্বাংশে স্বীকার করা চলে না। বাস্তবে দেখা যায় কবি নিজেও তা মেনে চলেন নি।

সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্র-কাব্য আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে রোমান্টিকতা ও দার্শনিকতার পাশাপাশি কবি বিজ্ঞানকেও সম্ভ্রমের আসন দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের জগৎকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। তিন পর্বেই বিজ্ঞান তাঁর চিন্তার সমিধ সংগ্রহ করেছে। প্রথম পর্বে বিজ্ঞানের স্পর্শ ছিল বিক্ষিপ্ত। তৎকালীন প্রচলিত কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে পরিপোষণ করে তাঁর জীবন-চিন্তায় স্থান দিয়েছিলেন। অবশ্য সে রূপও নতন। মধ্যপর্বে চিন্তাধারার বৈজ্ঞানিক রূপান্তরণ আরো বিস্তৃত, আরো ব্যাপক। এর মধ্যে সংঘটিত হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কবি তখন আবির্ভূত হয়েছেন দার্শনিক রূপে। জীবনের তত্ত্ব ও সত্যকে তিনি এক বিশেষ

ভাষ্যে ব্যাখা করেছেন। এই ভাষ্য বিজ্ঞানের জারকে সিক্ত। শেষপর্বে বিজ্ঞানের প্রভাব আরো সুস্পষ্ট। কবি বিজ্ঞানের পড়াশুনায় নিমগ্ন হলেন গভীরভাবে। এই অধ্যয়নের ফল পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে তাঁর চিন্তায়, কবিতায়, প্রবন্ধে। কবির আইডিয়ালিজমের অলীক জগৎ থেকে তিনি সরে এসে উত্তরণ করলেন মেটিরিয়ালিজমের রাজ্যে। অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃতি জানালেন বিজ্ঞানাশ্রিত বুদ্ধিকে। বিজ্ঞানও শিল্পকে কাছাকাছি এনে তিনি বলেছেন, 'সায়েন্সেই বলো আর আর্টেই বলো, নিরপেক্ষ মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।'

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে উদ্ভিদ ও জীববিদ্যা, পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান কবির চিন্তাকে নাড়া দিয়েছে। প্রথম পর্বে জীবনের সম্পর্কে নতুন ভাষ্য রচনা করতে সাহায্য করেছে জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান। নিউটন, ডারুইনের আবিষ্কৃত তথ্য এবং বেকন ও কাণ্টের তত্ত্ব চিন্তা ঊনবিংশ শতকের বাংলাদেশকে প্লাবিত করে ফেলেছিল। রবীন্দ্রকাব্যের প্রথম অধ্যায় এই তত্ত্বচিন্তার প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় তা দেখানো হয়েছে।

এমনকি ডারুইনের জীবন সংগ্রাম তত্ত্বটিও প্রকাশ পেয়েছে বিসর্জন নাটকে রঘুপতির সংলাপে এবং গান্ধারীর আবেদন দুর্যোধন ও গান্ধারীর বিপরীত মুখী বক্তব্যর মধ্যে।

প্রথম পর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণ বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণ হয়তো এই যে এই বিশেষ দুই শাখার মধ্যে কবির বিশিষ্ট মানসপ্রকৃতি সমৃদ্ধতর ও পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল। কবির ভূমাবোধ, প্রকৃতিপ্রেম, বিশ্বৈক্যানুভূতি বিজ্ঞানের এই দুই বিভাগ প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলির মধ্যে অনুকূল আশ্রয় পেয়েছিল।

বলকা যুগের প্রারম্ভে যে গতিতত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে তা মুখ্যতঃ দর্শনের উপর ভিত্তি করেই। বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে এর এক সুষ্ঠুরূপ দেখা গেল। বের্গস-এর মতো রবীন্দ্রনাথও গতিবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বকে নিয়েছেন তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের অনুকূল করে। বিবর্তনের অভিব্যক্তি সর্বস্তরেই বর্তমান। মানুষের বিবর্তন যেমন বহিরঙ্গেও তেমনি সংস্কৃতিগতও। কেবলমাত্র দেহের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই হবে না, মানসিক সামাজিক দিকের প্রতিও মনোনিবেশ করতে হবে। জুলিয়ান-হাক্সলী এবং বর্তমান বিজ্ঞানীরা এই কথা স্বীকার করছেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মানুষের ধর্ম গ্রন্থে এ সত্যটিকে সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

*একস্থানে তিনি বলেছেন "অভিব্যক্তি চলছিল প্রধানত প্রাণীদের দেহকে নিয়ে, মানুষে এসে সেই প্রক্রিয়ার সমস্ত ঝোঁক পড়ল মনের দিকে। পূর্বের থেকে মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গেল। দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র; পৃথকভাবে আপন দেহরক্ষায় প্রবৃত্ত, তা নিয়ে প্রবল প্রতি-*যোগিতা। মনে মনে সে আপনার মিল পায় এবং মিল চায়, মিল না পেলে সে অকৃতার্থ। তার সফলতা সহযোগিতায়।....যোগের এই পূর্ণতা নিয়েই মানুষের সভ্যতা।"

কবি জীবনের শেষ পর্বে বিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আইনস্টাইন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের প্রভাবও তাঁর উপরে কম নয়। ইতিমধ্যে প্রাণ বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানের রাজ্যে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে পুরোনো তথ্য ও যুক্তি ভেঙে গিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি হলো। ইলেকট্রন-প্রোটন-কোয়াল্টা, তেজষ্ক্রিয়তা, আপেক্ষিকতত্ত্ব, কোয়াল্টামবাদ, ফিউসন ইত্যাদি নানা আবিষ্কারের ফলে পদার্থ বিজ্ঞানের ধারা গেল পালটে। এমনি অবস্থার সৃষ্টি হয়ে ছিল বিবর্তন—প্রজনন তত্ত্বের নব নব আবিষ্কারের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণ-বিজ্ঞানের এলাকায়। এই বিপুল অগ্রসৃতি সম্পর্কে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন।

এরই ফলশ্রুতি ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। বিশ্বপরিচয় বাদ দিলেও, খাপছাড়া প্রহাসিনী, নবজাতক প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে বিজ্ঞানের নব নব তথ্য গুলি ছড়িয়ে আছে রত্নকণিকার মতো।

একথা নিঃসংশয়ে সত্য যে কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞানের কয়েকটি আবিষ্কারের উল্লেখ থাকলেই বৈজ্ঞানিকতা হয় না। বিজ্ঞানের যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি হলে ব্যক্তিমানসের পটে গড়ে ওঠে একটি সামগ্রিক বক্তব্য বিশ্ব সম্পর্কে। মনে হয় এই বক্তব্যকে যথাযথ ভাবে অনুসরণ করাই হচ্ছে বিজ্ঞান বুদ্ধি। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে বিজ্ঞানের মধ্যে আছে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার রীতি। কাব্যজগতেও তা থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের দর্শনে ও কাব্যে এই বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া মূর্ত হয়ে উঠেছে। একারণেই তাঁর দৃষ্টি হয়েছে সহজ ও বাস্তবানুগ। কবির কাব্য থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার মধ্যেই রয়েছে এই বাস্তবচেতনার স্ফুলিঙ্গ। পরম আশ্চর্যের সংগে লক্ষ্য করতে হয় জীবনের শেষ ধাপে পেঁাছেও তিনি তাঁর যৌবনের অধ্যাত্মজগতে পশ্চাদপসরণ করেন নি। প্রগতির সংগে তাল রেখে তিনি বিস্ময়কর বিজ্ঞান-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

এ প্রসংগে ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্যের এক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তিনি লিখেছেন "বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মের রাজ্যে প্রাণ-জগতের নিত্য অভিব্যক্তির মধ্যে সুষম সামঞ্জস্য ধারাবাহিক সূত্র আবিষ্কারে বিজ্ঞান ব্রতী। তার পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ তথ্য ও তত্ত্ব দার্শনিককে প্রভাবিত করে, কবিচিত্তকে আলোড়িত করে। সেই আলোর প্রভায় দার্শনিক ও কবি জীবনের নতুন অর্থ আবিষ্কার করেন। সেই অর্থ তথ্যের যতোটা কাছাকাছি, ততোটাই সে বিজ্ঞানের সংগী। সেইসংগে রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী—অন্ততঃ দর্শন ও শিল্পের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিধৃত জীবন দর্শনেও বিজ্ঞানের সংযোগ ও দার্শনিকদের রূপান্তরণ আছে। বৈজ্ঞানিক দর্শনকে তিনি উপলব্ধি করেছেন স্বগত মনোভঙ্গিতে। প্রকৃতি, উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে যে বিবর্তন নিত্যবর্তমান, তাকে তিনি দেখেছেন মানুষের মধ্যে, তাকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মানবিক অভিব্যক্তির পথেও। জেনেছেন, প্রাণের লীলা জন্ম-মৃত্যু পুনরুজ্জীবনের অবিরত বিলাসে; জেনেছেন স্থান কাল পাত্রভেদে চলার পথ ও পদ্ধতি বিভিন্নরূপ নেয়, বাধা ও সংগ্রাম তদনুযায়ী ভিন্নতর হয়, ভূগোলের সংগে ইতিহাসকে, প্রবৃত্তির সংগে বৃত্তিকে সংস্কার ও সংস্কৃতিকে মিলিয়ে তুলনা করে বিচার করে দেখতে হয়। এইভাবে বিজ্ঞানের তথ্যসংগত তত্ত্বকে কবি প্রয়োগ করেছেন জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সমস্ত পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক নন, অপবিজ্ঞানীও নন, বিজ্ঞানবুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি সমন্বিত কবি দার্শনিক।"

একথা সর্বাংশে সত্য যে আর্টের সংগে বিজ্ঞানের যোগ সন্ধান করতে গেলে যান্ত্রিক পন্থায় তা সম্ভব হবে না। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান উভয়েই নিত্যপ্রবহমান, নিত্যপরিবর্তনশীল। বিজ্ঞানের গতি ক্রমশই দ্রুততর হচ্ছে, সেই সংগে সংগে সাহিত্যও দ্রুতবেগে সম্পন্ন হচ্ছে। কাজেই সংযোগ সূত্র গভীর না হলেই যে মিল থাকবে না একথা মেনে নেওয়া যায় না।

বিজ্ঞানের অগ্রসৃতি আমাদের পুরোনো সমাজের ভিত দিয়েছে পালটে। তাতে তার চেহারার পরিবর্তন হয়েছে আমূল। বিজ্ঞান সমাজকে পাল্টেই ক্ষান্ত হয় নি, তার প্রভাব বিস্তৃততর হয়েছে দর্শন ও শিল্পের এলাকায়। বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়ে প্রবেশ করেছে দর্শন ও সাহিত্যে। এই প্রভাব অপ্রতিরোধ্য। এবং এর প্রয়োজনও আছে এই পালাবদলের ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনার ধারা নিয়েছে নতুন রূপ। বলিষ্ঠতা এসেছে, এসেছে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ শক্তি মানুষের চিন্তার জগতে। এমনকি বিজ্ঞানের সংজ্ঞারও পরিবর্তন

ঘটেছে। বিজ্ঞান বললেই বোঝাতো 'তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান' অথবা 'সুসম্বন্ধ ও সুশৃঙ্খল সর্বজন-গ্রাহ্য যাবতীয় জ্ঞান।' কিন্তু বর্তমান কালে ঐ সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়ে রূপ নিয়েছে স্বতন্ত্র-ভাবে। এখন বিজ্ঞান মানে হচ্ছে 'প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং তাদের সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ বিশেষ জ্ঞান।'

আজ একথা বলবার দিন এসেছে যে বিজ্ঞান আর্টের শত্রুশিবির নয়, বরং তার মিত্র পক্ষীয়। কবিরা অভিযোগ করেন একদিন যেসব ভাবনাকে আশ্রয় করে মানুষের কল্পনা ডানা মেলে উড়ে যেত আজ বিজ্ঞানের গবেষণাগারে তার রহস্যভেদ হয়েছে। কল্পনার অবাস্তব জগতে রস-রূপ নিয়ে যারা বিবর্ধিত হতো কবি মানসাকাশে, আজ পৃথিবীর রুক্ষমাটির বুকে সে নেমে এসেছে। যে চাঁদ নিয়ে কবিদের কল্পনার অন্ত ছিল না আজ তার কল্পনাশ্রয়ী সৌন্দর্য টুটে গেছে। এসবই সত্যি। কিন্তু এ-ও কি সত্যি নয় যে আমাদের জানার পরিধি যত বাড়ছে সংগে সংগে অজানার গন্ডীও বিস্তৃত হচ্ছে। কাজেই যেখানেই অজানা রহস্য, সেখানেই কবি-কল্পনা রঙীন ফানুস হয়ে উড়ে যাবে। প্রসারিত হবে কল্পচেতনা, বিস্তৃত হবে তার এলাকা, জেগে উঠবে নতুন ছন্দ, নতুন রঙের প্রলেপে আঁকা ছবি। বিজ্ঞান-দৃষ্টি সম্পন্ন কবি-সাহিত্যিকের ক্যানভাসে ফুটে উঠবে বলিষ্ঠ কল্প-চিত্র। পর্যবেক্ষণার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হবে চিত্র-পট। বিজ্ঞানাশ্রয়ী বাস্তব এবং কল্পনা কাছাকাছি থেকে সৃষ্ট-করবে নব নব সৌন্দর্যের। রবীন্দ্রনাথ এরই পথপ্রদর্শক।

তথ্যপঞ্জী

১ বিশ্বপরিচয়, ২য় সং। ভূমিকা . ২। বিশ্বপরিচয়। ভূমিকা ৩। রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয় ৪। বিশ্বপরিচয়। ভূমিকা ৫। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ৬। ছিন্নপত্র ৭। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ, ১ম খণ্ড ৮ Panthae ৯। Glimpses of Bengal : Rabindranath Tagore ১০। বিশ্বপরিচয়, ২য় সং, পৃ ৯৬ ১১। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ঃ মৈত্রেয়ী দেবী, ১২। উপরি-উক্ত গ্রন্থ ১৩ রবীন্দ্র-জীবনী, ৪র্থ খণ্ড ১৪। নবজাতক ঃ কেন ১৫ ঐ ঃ শেষকথা ১৬ আরোগ্য

অন্যান্য গ্রন্থ

ক-রবি-রশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয়

খ রবীন্দ্র সাহিত্য পরিক্রমা—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গ রবীন্দ্রনাথ—প্রথম ও দ্বিতীয়—অধ্যাপক মনোরঞ্জন জানা

ঘ রবীন্দ্রনাথ—ডাঃ সুবোধ সেনগুপ্ত

ঙ রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (২য়)—অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী

চ রবীন্দ্র-জীবনী (১ম, ২য়, ৩য়)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ছ উত্তরসূরী পত্রিকা ঃ রবীন্দ্র শতবর্ষ সংখ্যা পৃঃ ২৯৯—৩১১

জ বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ অষ্টাদশ বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্র-চর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা, রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব—এই কটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা জানি, রবীন্দ্র-চর্চা বলতে আরও ব্যাপক কিছু বোঝায়। যেমন, তাঁর সংগীত (সুর-পদ্ধতি), চিত্রকলা, শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তা ইত্যাদি। এগুলিও নানাভাবে অন্য প্রদেশের চিন্তায় ও কর্মে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি কেরলীয় লেখক কৃষ্ণ ওয়ারিয়ার-এর সম্প্রতি-প্রকাশিত (১৯৬২ এপ্রিল) 'চিত্রাঙ্গদা' নামক গ্রন্থখানি। এটি ঠিক অনুবাদ নয়, একদিকে রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" অন্যদিকে কেরলের কথাকলি নৃত্য—এই দুয়ের মিশ্রণে এটি একটি আট্টকথা অর্থাৎ নৃত্যনাট্য। এ নিয়ে আলোচনা করার যোগ্যতা আমাদের নেই। নৃত্যগীতে আমরা অনধিকারী। এ-সব ক্ষেত্রে যোগ্যব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেই আমরা ক্ষান্ত হব।

আমাদের ত্রিবিধ উদ্দেশ্যের শেষেরটি অর্থাৎ 'অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব' একটি ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পণ্ডিত ব্যক্তিরাই এক্ষেত্রে কথা বলার অধিকারী। আমরা কেবল পল্লব-গ্রাহিতার পরিচয় দিতে পারি। যখন মূল-গ্রাহিতার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, তখন বাঙালী পাঠক পল্লবগ্রাহিতাকে প্রশ্রয় দেবেন আশা করি। এই প্রসঙ্গে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ভারতীয় ভাষাগুলিতে এখনও এ বিষয়ে বিস্তৃত ও গভীর অনুসন্ধানের তৎপরতা দেখা দেয়নি।

আমাদের প্রথম উদ্দেশ্যের (বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা) জীবনী-প্রসঙ্গ বিশেষ উৎসাহজনক নয়, তবে সাহিত্য-প্রসঙ্গের গুরুত্ব অবশ্যই আছে। আমরা তাই রবীন্দ্র-জীবনী প্রসঙ্গের উল্লেখমাত্র ক'রে সাহিত্যপ্রসংগ নিয়ে কিছুটা বিস্তৃত আলোচনা করব।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি (অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ) আপাতদৃষ্টিতে অনাকর্ষণীয় বোধ হলেও আমরা কিন্তু এই ব্যাপারেই একটু বেশি পরিমাণে মাথা ঘামাচ্ছি। কারণ এর মধ্য থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস-গ্রহণে পাঠক ও লেখকমণ্ডলীর আগ্রহ, পদ্ধতি, মেজাজ ও সামর্থ সম্পর্কে কতগুলি তথ্য আহরণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা এবং তার অনুবাদের কিছু তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে স্বভাবতই অন্য ভাষার উদ্ধৃতি-বাহুল্য ঘটবে।

এই প্রবন্ধের অপূর্ণতা সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। প্রথমত, আমাদের যাবতীয় আলোচনার মুখ্য অবলম্বন কলকাতাস্থিত 'জাতীয় গ্রন্থাগার'। কলকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং জাতীয় গ্রন্থাগার তার শীর্ষ-বিন্দু। কিন্তু 'ভারতবর্ষে রবীন্দ্রচর্চা'র অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, কলকাতার সাংস্কৃতিক ভাণ্ডার অনেকাংশে অপূর্ণ। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণার জন্য সারা ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে অনুসন্ধান আবশ্যক। বলা বাহুল্য, ব্যাপারটা আমাদের সাধ্যাতীত।

দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মন্ত্রণালয়ের পক্ষে ললিতকলা

রাজ্যের ব্যবধান বড় কম নয়। তাই বাংলা ও কেরলের পক্ষে পরস্পরকে জানা কঠিন বৈকি। তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চায় দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কেরল পিছিয়ে নেই। মলয়ালম্ গীতাঞ্জলিও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

মলয়ালম্-এ গীতাঞ্জলির অনুবাদ হয়েছে চারখানি। প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। এ গ্রন্থ দেখার সুযোগ ঘটেনি। দ্বিতীয় অনুবাদক এল্, এম্, তোম্মসস্-এর "গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। যদিও ইনি ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে অনুবাদ করেছেন এবং করেছেন গদ্যে, তবু তার জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায় চারটি সংস্করণ থেকে। এর থেকে বোঝা যায় কেরলবাসীরা গীতাঞ্জলিকে গ্রহণ করতে পেরেছেন।

এর সংগে তুলনা করুন তামিলের অবস্থাটা। ১৯৪৫ সালে ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে একটি মাত্র গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয় তামিলে। আজ পর্যন্ত দ্বিতীয় অনুবাদের চেষ্টা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়নি। এ বিষয়ে আমাদের একটা অনুমানের কথা বলছি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাচীন ঐতিহ্য বর্তমানের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। প্রাচীন তামিলের কাব্য-সমৃদ্ধি সুবিদিত। আধুনিক তামিলনাডে সেই কারণেই কি কাব্য-কলার অনাদর? সুব্রমাণ্য ভারতীকে বাদ দিলে গত আটশ' বছরে কোনো উল্লেখযোগ্য তামিল কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ কম্বন্, তিরুবল্লুবর, নম্মাড়বার, আন্ডাল, ইলংগো অডিগল প্রমুখ কবি জন্মেছিলেন প্রাচীন তামিলদেশে।

কেরলে এ জাতীয় ঐতিহ্য নেই। তাই বোধকরি নতুনকে গ্রহণ করার শক্তি ও প্রবণতাও তাদের বেশি। আর তারই ফলে গীতাঞ্জলির একটি স্মরণীয় অনুবাদ প্রকাশিত হল ১৯৫৯ সালে, মলয়ালম্ ভাষায়। প্রথমত, এই অনুবাদ হয়েছে সোজা বাংলা থেকে। দ্বিতীয়ত, এই অনুবাদ করা হয়েছে পদ্য-ছন্দে। তৃতীয়ত, এর অনুবাদক হলেন বর্তমান কেরলের শ্রেষ্ঠ কবি জি, শঙ্কর কুরুপ—সংক্ষেপে যিনি 'জি' নামে পরিচিত।

জি বাংলা জানতেন না। কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য, এবং বিশেষ করে মূল গীতাঞ্জলি থেকে অনুবাদের জন্য তিনি বাংলা শিখেছেন। এই কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন আর্, সি, শর্মা—যিনি বাংলা থেকে বেশ কিছু বই মলয়ালম্-এ অনুবাদ করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তিন পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় জি, শঙ্কর কুরুপ "গুরুদেব শ্রীরবীন্দ্রনাথ"-এর প্রতি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তার কিছুটা এইরূপ : "সাহিত্য জগতের পথিক আমি। জীবন-প্রভাতেই আমার কবি-হৃদয়কে আকৃষ্ট করে একটি পুণ্যতীর্থ, নাম তার গীতাঞ্জলি। কিন্তু তখন সেই তীর্থভূমি ছিল আমার পক্ষে দুরধিগম্য। ইংরেজী ভাষার পাত্রে ভরা সেই তীর্থ বারিবিন্দু দিয়ে হৃদয় ও আত্মাকে সিঞ্চিত করাই ছিল তখন আমার সাধ্যের মধ্যে।" তারপরে কবি বাংলা শিখে জীবন-সায়াহ্নে গীতাঞ্জলির অনুবাদ ক'রে তাঁর স্বপ্ন সফল করেছেন।

'গীতাঞ্জলি' অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যে পদ্যানুবাদকে প্রাধান্য দিচ্ছি তা কেবল ছন্দের গুরুত্বের জন্য। একেই মূল কাব্যের মনোহারিতা অনুবাদে অনেকাংশে খর্ব হয়, গদ্যানুবাদে হয় আরও বেশি। কারণ মূল কবি ছন্দকে বাহন ক'রে যে-ভাবে এগিয়ে চলেন, অনুবাদে গদ্যের অসমতা পদেপদেই সে গতিকে ব্যাহত করে। ছন্দ-অছন্দের বড়ো তফাৎ এই যে, কথা একটাতে চলে, আরেকটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। "মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে"—এই ছত্রটিকে যদি গদ্যে বলা হয় "ছিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়া অরুণ কিরণ মুখে আসিয়া পড়িতেছে"—তবে অনুরাগী পাঠকও আর এটিকে দ্বিতীয়বার পড়বেন না। মোট কথা, ছন্দ চাই। গদ্য-ছন্দ হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু গদ্যছন্দে বেগ সঞ্চার করা কঠিন। তাছাড়া এই

ছন্দের কৌশল অনেক বড়ো কবিরও অজানা। সুতরাং পদ্য-ছন্দই নিরাপদ।

কখনও কখনও অনুবাদের ক্ষেত্রে মূল ছন্দ বজায় রাখার দাবী ওঠে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কোথাও কোথাও সে দাবী মিটিয়েছেন। কিন্তু এ ধরণের চেষ্টা প্রশংসনীয় হলেও তার ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব নয়। আমাদের আশঙ্কা, তাতে কাব্যের রসাস্বাদনে বাধাই ঘটে। ভাষার মতো ছন্দেরও একটা দেশী-বিদেশী ভাব আছে। যে মলয়ালী পাঠক বাংলা ভাষা বুঝবেন না, জি, শঙ্কর কুরুপ তাঁর সামনে বাংলা ছন্দ রাখারও চেষ্টা করেন নি। করলে, ব্যাপারটা কেবল পাঠকের পক্ষেই নয়, অনুবাদকের পক্ষেও শোকাবহ হয়ে উঠতো। তবু দু-একটি পদে অনেকটা মূল গীতাঞ্জলির ছন্দ-দোলা অনুভব করা যায়। যেমন,

মেঘের পরে। মেঘ জমেছে। আঁধার করে। আসে

ইত্যাদি অংশের অনুবাদে বলা হয়েছে—

মেলিক্কুন্নু । মেঘমাল । মেলে মেলে । কূরি রুলুম্

গীতাঞ্জলির অনুবাদে শব্দাবলীর দিক থেকে মলয়ালী কবির একটি সুবিধা এই যে, রবীন্দ্র-ব্যবহৃত তৎসম শব্দ প্রায় যেমন-তেমন রেখেই তিনি কাজ চালাতে পারেন। উদাহরণ ঃ—

জননী, তোমার করুণ চরণখানি

হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণরূপে

এই ছত্র দু'টির অনুবাদে জননী　জননি (সম্বোধন), তোমার　তব—এই পরিবর্তনের সঙ্গে সন্ধির জট পাকিয়ে এবং 'করুণ' শব্দের পরিবর্তে 'আর্দ্রতা-পূরিত' এই সমাস-বন্ধ পদ ব্যবহার করে বাংলা কবিতায় সংস্কৃতের যেটুকু ত্রুটি ছিল, অনুবাদে তার ক্ষতিপূরণ করা হয়েছে। বাংলার ক্রম অনুযায়ী শব্দ সাজালে দাঁড়ায় এইরূপ : জননি, তব আর্দ্রতাপূরিতম্ চরণম্ ঞান্ (=আমি) কণ্ডোত্তিনেন্ (=হেরিনু) ইন্নু (=আজি) অরুণকিরণিঙ্ডল্। কুরুপের অনুবাদে হয়েছে :

অয়ি জননি,
　তব চরণমরুণকিরণত্তিল্ ঞা-
　নার্দ্রতাপূরিতমিন্নু কণ্ডোত্তিনেন্ ।

'মরণহরণ বাণী' মলয়ালম্-এ হয়েছে 'মরণহরণ বচনম্'। শিক্ষিত মলয়ালীর কাছে ব্যাপারটা কিছু দুরূহ নয়, কারণ এ জাতীয় শব্দ-সম্ভার পূর্ণ কাব্যের সঙ্গে তারা পুরুষানুক্রমে পরিচিত।

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, কুরুপের অনুবাদে স্থানে স্থানে হয়তো মলয়ালী পাঠককেও বেগ পেতে হয়। প্রসিদ্ধ কেরলীয় সমালোচক জোসফ মুণ্ডশ্শেরি বলেছেন কুরুপের রচনা কৃত্রিম কল্পনায় জটিল। এ মন্তব্য অবশ্য কুরুপের মৌলিক কবিতা সম্পর্কে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কল্পনা প্রয়োগের অবকাশ নেই। তবু মনে হয়, রবীন্দ্র-কল্পনা কুরুপের হাতে স্থানে স্থানে কৃত্রিম শব্দ প্রয়োগে জটিল হয়ে উঠেছে। "নিলাজ নীল আকাশ ঢাকি নিবিড় মেঘ কে দিল মেলে"—এই অংশ কুরুপের অনুবাদে দাঁড়িয়েছে এইরূপ : নির্লজ্জ নভোনগ্নতা দূর করিতে কে মেলিয়াছে নিবিড়ঘনশ্যামপট ?

নির্লজ্জ নভোনগ্নত নীক্কিটুবানারাবো
নীর্ত্তি বিরিচ্চীটুন্নু নিবিড়ঘনশ্যামপটম্ ?

এই অংশের রসাস্বাদনে শিক্ষিত মলয়ালী বন্ধুকে চিন্তামগ্ন হতে দেখেছি। ক্লিষ্টতা কোথায় ? রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়, অথবা অনুবাদকের প্রকাশভঙ্গিতে ?

সংস্কৃতপদের বাড়াবাড়ি দেখে কোনো স্পর্শকাতর বাঙালি ভাবতে পারেন অনুবাদের

মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-কাব্যের সমাধি রচনা করা হয়েছে। "জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া" এই অংশের অনুবাদে "জীবনং সুধাপূর্ণম্" শুনে বাঙালির ঠোঁটে একটু মুচকি হাসি ফুটে উঠবে। সে হাসি আরও প্রশস্ত হবে যখন শুনবে 'দেখি নাই কভু দেখি নাই" এই অংশের অনুবাদে বলা হয়েছে "অপূর্ব্বদর্শনমপূর্ব্বদর্শনম্।"

"সাহিত্যের অন্য সব মহলের তুলনায় কাব্যের মহলে বড্ড বেশী কড়াক্কড়ি। তার দরজা বড় বেশী আঁট। ভাষায় ভাষায় সে দরজার তালার কলকব্জা আবার এমন আলাদা যে একের চাবিতে অন্যের তালা খোলাই প্রায় দুঃসাধ্য। অনাত্মীয় বিদেশী ভাষার বেলা ত' বটেই, পরিচয়ের দিক দিয়ে যারা সহোদর তারাও অনেক সাধ্য-সাধনা নিষ্ঠা আন্তরিকতা ছাড়া পরস্পরকে প্রাণের রহস্যের সন্ধান দেয় না"—আধুনিক বাঙালি কবির এই অভিমতটি আলোচ্যপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। কুরুপের অনুবাদে রবীন্দ্র-প্রাণের রহস্য কতটা উদ্ঘাটিত হয়েছে সে-কথা বলার অধিকারী আমি নই, তবে তাঁর গীতাঞ্জলির পাতায় পাতায় নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর। মলয়ালী কবি বিশেষ ধৈর্য ও অনুরাগের সঙ্গে বাঙালি কবির অনুসরণ করেছেন। তৎসত্ত্বেও যেন প্রাণের রহস্য ধরা দেয়নি।

আমায় তুমি ফেলেছ কোন্ ফাঁদে

চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি। —এ অংশটি কেবল গীতাঞ্জলিতে নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যধারার একটি মনোরম প্রকাশ। কুরুপ এর অনুবাদে লিখেছেন—'আমি তোমার অন্তহীন গীতবলয়ে আবন্ধ' :

নিবন্ধনিহ ঞান্ নিন্ গানত্তিন্
নিরন্তমাকিয় বলয়িল্ ।

মনে হয় মলয়ালী কবি এখানে ইংরেজী গীতাঞ্জলির অনুসরণ করেছেন—

Thou hast made my heart captive in the endless meshes of thy music. স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যেখানে বাংলার অনুরূপ প্রকাশভঙ্গি ইংরেজীতে দিতে পারেন নি, সেখানে কুরুপের দোষ ধরা নিরর্থক। একখানি যথার্থ গীতকাব্যের পদ্যানুবাদে নানা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়। মলয়ালী কবি জি, শঙ্কর কুরুপ সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে গীতাঞ্জলির রূপ, রস, ভাব ও ছন্দকে নিয়ে কেরলবাসীদের জন্য যে-ভাবে কাব্যের অমৃত নির্ঝর প্রবাহিত করেছেন তা অবশ্যই স্মরণ করে রাখার মতো।

ডাক্তারি শিক্ষা ও দ্বারকানাথ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ বাল্যাবধি দেখেছেন কলিকাতার স্বাস্থ্যের অবস্থা—ম্যালেরিয়া বসন্ত কলেরা প্রভৃতি মহামারীর প্রকোপ—অথচ কোনরকম চিকিৎসার ভালো ব্যবস্থা নেই। কবিরাজ ডাকলে তিনি অধিকাংশ রোগে প্রধান ব্যবস্থা দিতেন দীর্ঘলঙ্ঘন—অনেক দুর্বল রোগী, তাতে আরও দুর্বল হয়ে পঞ্চত্ব পেতেন। আর ইংরাজী চিকিৎসা করাইলেও বিপদ কম ছিল না—কথায় কথায় তাঁদের ছিল রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা—ফলে রোগীর মোক্ষপ্রাপ্তির পথও সুগম হত।

কোম্পানীর সৈন্য ও জাহাজের শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের জন্য দমদমায় ও বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলাকায় হাসপাতাল নামে ছিল বটে কিন্তু সাধারণের বদ্ধ ধারণা ছিল যে কোনো রোগী ঐখানে ঢুকিলে আর জীবন্ত ফিরে না।

সহর কলিকাতাতেই যখন এই অবস্থা তখন গ্রামাঞ্চলের ব্যবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্ন কর্মস্থলে সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসার দরকার অনুভব করে গভর্নমেণ্ট হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত কলেজে ও মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসায় চিকিৎসা শিক্ষার ক্লাস খুলেন। পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "দেশীয় চিকিৎসক বিদ্যালয়" নামে এক বিদ্যালয় খোলা হয়। সেখানে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে প্রবেশাধিকার ছিল। ছাত্রসংখ্যা ছিল অনুর্ধ কুড়িজন, বয়স আঠারো থেকে কুড়ি এবং সচ্চরিত্র এবং দেবনাগরী বা পার্শী বা কমপক্ষে হিন্দুস্থানী ভাষা কহিতে ও লিখিতে সক্ষম হওয়া চাই। বৈদ্য ও হাকিমদের পুত্রদের দাবী সর্বাগ্রে গ্রাহ্য ছিল। পরীক্ষায় পাশ করিলে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরী ছিল এবং পেন্সনের ব্যবস্থাও ছিল। সার্জেন জেমস্ জেপসন্ মাসিক ৮০০্ টাকা বেতনে পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাছাড়া ৬০্ টাকা মাহিনার একটি মুন্সী, ত্রিশ টাকা মাহিনার একটি কেরাণী ও মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনার একটি চাপরাসী বরাদ্দ হয়। সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসাতেও চিকিৎসা বিদ্যার ক্লাশ বন্ধ হয় নাই। দেশীয় চিকিৎসক বিদ্যালয়ে ইংরাজী বই থেকে কতকগুলি ঔষধ ও তার গুণাগুণ বিষয়ে সপ্তাহে কয়েকদিন হিন্দীতে বক্তৃতা দেওয়া হত। ডাক্তার বার্টন ও তারপর ডাক্তার টাইট্‌লার এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। টাইট্‌লার প্রাচ্য ভাষাবিশারদ ও পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু খামখেয়ালিতে বড় কম ছিলেন না। শোনা যায় ছোটছেলেদের ছাগলজোতা গাড়ীতে চড়ে গড়ের মাঠে বেড়াতেন। তিনি সংস্কৃত কলেজে চরক শুশ্রুত ও মাদ্রাসায় আবিসেন্না পড়াবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৩৪ সালে ডাক্তার রস্ আসেন এই বিদ্যালয়ের রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা পড়াতে। তিনি সর্বদাই সোডার গুণ ব্যাখ্যা করতেন বলে ছাত্ররা তার নাম রেখেছিল "সোডা"। সেকালের নব্যবঙ্গের নেতৃগণ এই সোডকে নিয়ে নানা কৌতুক করতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ত' প্রকাশ্য সংবাদপত্রেই "সোডা ও তাঁর ছাত্রগণ" বলে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

ক্রমশ, কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষিত ডাক্তারের প্রয়োজন বাড়িল। এত সংখ্যক ডাক্তার বিলাত থেকে আনা সম্ভব ছিল না তাই কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দের চিকিৎসাবিদ্যা শেখানর ব্যবস্থা করা দরকার মনে করলেন। সে সময়ে সরকারী মহলে দুইদল ছিল—একদল চেয়েছিলেন দেশীয় প্রথায় চিকিৎসা শেখানো, অন্যদল ছিলেন পাশ্চাত্য প্রণালীতে চিকিৎসা শেখানোর অনুকূলে। ১৮৩৪ সালে লর্ড বেণ্টিংক দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যার অবস্থা

বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করলেন। তার সভাপতি ছিলেন জে, গ্রাণ্ট আর সদস্য ছিলেন সাদারলাণ্ড, ট্রেভালিয়ান, টমাস স্পেনসে, ডাক্তার ব্রমলি ও রামকমল সেন। এই কমিটি ইংরাজী ভাষায় পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গবর্মেণ্ট ১৮৩৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী কতকগুলি প্রস্তাব করলেন। তদনুসারে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। এর পরিচালনা ভার শিক্ষা কমিটিকে দেওয়া হয়—এই কমিটিতে থাকলেন প্রধান হাসপাতালের সার্জেন, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ডাক্তার, দেশীয় (নেটিভ) হাসপাতালের সার্জন, চক্ষু চিকিৎসালয়ের পরিদর্শক ও কোম্পানীর প্রধান ঔষধ প্রস্তুতকারক (এপথিকারী)। বর্তমান হেয়ার স্কুলের পিছনদিকে পুলিশ মর্গের নিকটে তৎকালীন "পেটি-কোর্টস্ জেল" ভবনে ইংরাজী ভাষায় পঞ্চাশটি ছাত্রকে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়।১ ছাত্রদের ভর্তি হবার সময় সচ্চরিত্র ও ভদ্রবংশীয় বলে প্রমাণ দিতে হয়েছিল। বাৎসরিক বিশ হাজার টাকা পারিশ্রমিকে ডাক্তার ব্রমলি অধ্যক্ষ ও আট হাজার টাকা পারিশ্রমিকে ডাক্তার গুডিভ সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্রমলির মৃত্যুর পর তিনচারজন অতিরিক্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

১৮৩৫ সালের জুন মাসে মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। তার অব্যবহিত পূর্বে (১৮৩৫ সালের ১৯শে এপ্রিল) দেশীয় হাসপাতালের সার্জেন ডাক্তার রোনাল্ড মার্টিন অধ্যক্ষগণের নিকট পত্র লিখে জানান যে ঐ হাসপাতালটি প্রধানতঃ অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় গরীব লোকেরা জ্বরজ্বালায় বিনা চিকিৎসায় মারা যাইতেছে। সুতরাং এই নগরের কোন মধ্যবর্তী স্থানে একটি জ্বরের হাসপাতাল খোলা কর্তব্য। বঙ্গের প্রতিনিধি শাসনকর্তা এই পত্র পাইয়া কলিকাতার স্বাস্থ্য ও জ্বরের হাসপাতালের উপযোগিতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটির একজন সভ্য ছিলেন দ্বারকানাথ। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য টাউন হলে ১৮৩৫ সালের ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটায় যে জনসভা হয় "ইংলিশম্যান" সংবাদপত্রে তার রিপোর্টে দেখি—

দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন যে, এই সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তিনি আসেন নাই। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুফল সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ আর কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের প্রকাশিত মতের পর এর প্রয়োজন সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। তবে এইটুকু তিনি বলতে পারেন যে বিলাতী ওষুধের প্রতি দেশীয়দের বিরূপতা দ্রুত লোপ পাচ্ছে এবং এ চিকিৎসাপদ্ধতির সুফল ক্রমশঃ তারা সকলেই মেনে নিচ্ছে। অবস্থাপন্ন দেশীয়দের মধ্যে খুব কমই আজ আছেন যিনি সাহেবি চিকিৎসায় আপত্তি করেন। তাঁর বন্ধু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত' বরাবরই দেশী পাঁচনে ঘোর আপত্তি। তবে এটা স্বীকার করতে হয় যে সাহেবী ওষুধ পছন্দ করলেও অবস্থাপন্নদের মধ্যে অনেকেই পারিবারিক ডাক্তারের তৈরী ছাড়া অন্য বাইরের কোন ডিস্পেন্সারীর ওষুধ খেতে রাজি নহেন।

সাহেব ডাক্তারের বিলাতী ওষুধ ছাড়াও ত' সেকালে এদেশের লোকেরা বেঁচে থাকত বলে কেহ কেহ তর্ক করেন। তা' সত্য, তবে এও সত্য যে, সে সমস্ত ওষুধ এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত। এখন অবস্থাপন্ন লোকেদেরও যা দেশী ঔষধ জোটে সেটা হল একমাত্র জ্বরের জন্য বিষ-গুলী, আর গরীবলোকের গঙ্গালাভ ছাড়া কোনকালেই কোন ওষুধ জোটে নাই। তাই তিনি স্বদেশীয়-দের এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। যাঁরা এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হয়েছেন সকলেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ এবং দ্বারকানাথ নিজে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য না করা লজ্জাকর মনে করেন। কেউ কেউ বলছেন যে, এবিষয়ে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা অনুচিৎ,

কিন্তু তিনি এটা মানতে রাজি নহেন। তাঁর মতে দেশবাসীর স্বাস্থ্য সরকারের অবশ্য প্রণিধান-যোগ্য বিষয় এবং সরকারের উচিৎ নিজে থেকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা। সম্প্রতি তাঁর বন্ধু রাজনারায়ণ রায় সরকারকে সৎকার্যে ব্যয়ের জন্য যে বিশ হাজার টাকা দিয়েছেন, তাঁর মনে হয় সেই টাকা এই হাসপাতালের তহবিলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তাঁর মনে হয় যে, তাঁর দেশীয় বন্ধুদের বিশেষ কর্তব্য হল এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়া।"

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই (২৪শে মার্চ ১৮৩৬) দ্বারকানাথ অধ্যক্ষ ব্রমলিকে লেখেন—

মেডিকেল কলেজের ব্যাপারে আপনার সাফল্যে কেবল মৌখিক অভিনন্দন জানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই না। যদি আপনার আশা পূর্ণ হয়—এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা হবেই—তা হলে এই কলেজ দেশ-বাসীর পক্ষে অতীব সুফলদায়ী বলে স্বীকৃত হবে।

এরকম একটা শিক্ষায়তন যে কতখানি উপকারী হতে পারে, বিশ্বাস করুন, আমার চেয়ে কোন লোক সে বিষয়ে বেশী অবহিত নয়। তবে আমি এও জানি যে আপনার কাজে বহু বাধা বিপত্তি আসবে— সবচেয়ে বেশী আসবে গোড়ার দিকে। অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কোন জিনিষ এদেশের লোককে তেমন খাটবার অনুপ্রেরণা দেয় না যেমন দেয় অর্থের লোভ। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে ছাত্রদের ঐভাবে উৎসাহিত করলে দেখবেন অসুবিধাসমূহ ঠিক সেই অনুপাতে দূর হয়ে যাবে।

দেশবাসীর একজন হিসাবে আমার মনে হয়, আমাদের যতটা সম্ভব আপনার সাধু প্রচেষ্টাকে সাহায্য করা কর্তব্য। বর্তমানে খুব বিরাট কিছু আশা করা যায় না, তবে উদাহরণ পেলে যদি আপনার সুবিধা হয় সেই হিসাবে আমি অন্তত এই কলেজকে সাহায্যের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করব না।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের দেশীয় ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য আমি আগামী তিন বৎসর বাৎসরিক দু'হাজার টাকা পুরস্কার দিতে ইচ্ছুক। এই পুরস্কারগুলি যাহাতে নামমাত্র না হয় সেই উদ্দেশ্যে ঐ টাকা আট বা দশ ভাগের বেশী ভাগ করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। কলেজের দেশীয় ও প্রতিষ্ঠাকালে ভর্তি হওয়া ছাত্রেরাই এই পুরস্কারের যোগ্য বলে আমি মনে করি। এ সংক্রান্ত সব বিষয়ে আপনার বিবেচনার উপর ছাড়িয়া দিলাম।

এর উত্তরে সরকারী শিক্ষা-কমিটি তাঁর বদান্যতার প্রশংসা করে লিখলেন—

মহাশয়,

আপনার দেশবাসীগণের মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার উৎসাহ সঞ্চারের জন্য আপনি উপযুক্ত দেশীয় ছাত্রদের বাৎসরিক দু'হাজার টাকা করে তিন বৎসর পুরস্কার দানের অভিপ্রায় জানিয়ে গত মাসের ২৪ তারিখে অধ্যক্ষের নিকট লিখিত পত্র মেডিকেল কলেজের নিয়ন্ত্রণকারী সাব-কমিটি লোক-শিক্ষার সাধারণ কমিটির নিকট পেশ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, আপনার এই মহানুভব দান গ্রহণ করিতে সাধারণ কমিটি আমায় আদেশ দিয়াছেন এবং তৎসহ মানবহিতৈষণা প্রণোদিত হয়ে আপনি এই দান ঘোষণা করেছেন তাহাতে উহারা কত শ্রদ্ধাবান, তাহাও আপনাকে জানাইতে নির্দেশ দিয়াছেন।

আপনার অনুগত ভৃত্য—
জে সি সাদারল্যাণ্ড
সেক্রেটারী জে. সি. পি. আই (২)

মেডিকেল কলেজের পুরস্কার বিতরণের দিনও দ্বারকানাথের উদ্দেশ্যে কলেজের উন্নতি-বিষয়ে যত্ন এবং ঐ দানের জন্য শিক্ষা-কমিটি প্রচুর ধন্যবাদ জানান। মেকলে সাহেব তখন

ভারতের শিক্ষাসচিব। তিনিও ২৯শে মার্চ ১৮৩৬ সালে শিক্ষাবিষয়ক বিবরণীতে লেখেন, "মেডিকেল কলেজে বাৎসরিক দু-হাজার টাকার পারিতোষিক দেবার জন্য দ্বারকানাথ অতীব প্রশংসার্হ। অযোধ্যার নবাব এবং তার সস্তা দাক্ষিণ্যকে এ একদম কাণা করে দিয়েছে।"৩

"কলেজ কর্তৃপক্ষ শরীর-সংস্থান এবং রসায়নশাস্ত্রে উৎকৃষ্ট ছাত্রদের মধ্যে পারিতোষিক বণ্টনের হার ঠিক করিয়া দিলেন। তিন বৎসর পরেও দ্বারকানাথের পারিতোষিক দান অব্যাহত ছিল; তবে পরিমাণে কতকটা কমিয়া যায়। ১৮৪৫ সন পর্যন্ত প্রতি বৎসরই "দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রাইজ ফণ্ড হইতে পুরস্কার দেওয়া হইতেছিল দেখিতে পাই।"৪

মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল, চিকিৎসাবিদ্যাও শিখানো হইতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার দুটি আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা প্রথমে সম্ভব হয় নাই। শব-ব্যবচ্ছেদ ও জ্বরজ্বালার হাসপাতাল। শব-ব্যবচ্ছেদের প্রতি সে সময়ে ভারতীদের বিশেষতঃ হিন্দুদের এক বিজাতীয় ঘৃণা ছিল। তাহাদের ধারণা ছিল শবস্পর্শে জাতি নষ্ট হয়। তখন অনেক কিছুতেই লোকে জাতি নষ্টের ভয় পাইত—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিলে, সতীদাহ নিবারণে সাহায্য করিলে—সব কিছুতেই গোঁড়া পণ্ডিতের দল জাতিচ্যুত করবার ভয় দেখাইতেন—তখন শব কাটিলে জাতি-ভ্রষ্ট যে নিশ্চিত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু রামমোহন দ্বারকানাথ প্রমুখ কয়েকজন তখন নিজেদের চিন্তা ও বুদ্ধির দ্বারা সমাজপতিদের অন্ধ ধর্মবিধানগুলিকে যাচাই করতে আরম্ভ করে বিদ্রোহ, স্বাধীনতা ও প্রগতির পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। সে যে কতটা মণীষা ও সাহসের পরিচয় তা' আজ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত।

সাহেব শিক্ষকবৃন্দ ও ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ প্রমুখ দেশহিতৈষীদের উৎসাহে মধুসূদন গুপ্ত জাতি নষ্টের সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রথম মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করেন। মধুসূদন গুপ্ত তখন সংস্কৃত কলেজের মেডিকেল ইনস্টিটিউশনের লেকচারার। পরে তিনি দেশীয় ভাষায় চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষাদান বিভাগের পরিদর্শক (সুপারিনটেণ্ডেণ্ট) হয়েছেন। এই শব-ব্যবচ্ছেদ করতে হয়েছিল চুপিচুপি কলেজের বহিঃপ্রাঙ্গণের একটি ঘরে। সে ঘরগুলির চিহ্ন সম্প্রতি লোপ পেয়েছে—সেখানে এখন সংস্কৃত কলেজের প্রান্তস্থ অতিকায় ইমারৎ। মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে প্রথম শব-ব্যবচ্ছেদ করেন রাজকৃষ্ণ দে। প্রথম বৎসর যাঁরা শব-ব্যবচ্ছেদ করেন তাঁদের নাম আজও স্বর্ণাক্ষরে মেডিকেল কলেজের এনাটমি হলে লেখা আছে—তার মধ্যে দ্বারকানাথের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখি। অবসর পাইলেই দ্বারকানাথ নিজেও ঐ ছাত্রগণের মধ্যে যাইয়া উপস্থিত থাকিতেন ও মানুষের শরীরাভ্যন্তরে প্রকৃতির সূক্ষ্ম কারুকার্য মনোযোগের সহিত দেখিতেন। শুনা যায় যে যখন প্রথমে কেহই শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন না, তখন দ্বারকানাথ বলিয়াছিলেন যে "কেহ রাজি না হইলে তিনি নিজে জাতি-নষ্টের ভয় ভাঙিবার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত আছেন।"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তদানিন্তন শিক্ষা বিভাগের (পূর্বের শিক্ষা কমিটির রূপান্তর) সম্পাদক ডাক্তার মাউয়াই মিউনিসিপ্যাল কমিটির চেয়ারম্যান স্যার জন পিটার গ্রাণ্টকে জ্বরবিকারের হাসপাতালের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে চাঁদাও তোলা হয়। দ্বারকানাথ ও কলিকাতার অন্যান্য ধনীগণ ইহাতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। মতিলাল শীল তখনকার কালে আনুমাণিক বারো হাজার টাকা মূল্যের জমি হাসপাতালের জন্য দান করেন। এই সকল দানের ফলে পটলডাঙায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠার পর ১৮৪৬ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েল কলেজ অফ্ সার্জেনস্ মেডিকেল কলেজকে পূর্ণ স্বীকৃতি দেন। বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন লর্ড ড্যালহাউসী

১৮৪৮ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। এই হাসপাতালের ভিতরে এখনও দ্বারকানাথ প্রমুখ কমিটির স্মারকলিপি আছে।৫

প্রথমবার বিলাত যাবার সময় নানা কারণে দ্বারকানাথ কোন দেশী ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার ১৮৪৪ সালে বিলাত যাবার আগে শিক্ষা কাউন্সিলকে দ্বারকানাথ লেখেন যে যদি মেডিকেল কলেজের কোন ছাত্র তাঁর সঙ্গে যেতে চান ত' তাঁর খরচ দ্বারকানাথ সম্পূর্ণ বহন করবেন। ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁর এ প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাঁকে জানানো হয় যে ভোলানাথ বসু ও সূর্যকুমার৬ চক্রবর্তী নামে ছাত্রদ্বয় তাঁর সঙ্গে যেতে চায়।৭ তখন সরকার থেকে আরো দুটি ছাত্রকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। দ্বারকানাথ ও ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে এই চারিজন ছাত্র৮ "বেণ্টিক" জাহাজে বিলাত যান। এই সম্বন্ধে ১৮৪৫ সালে ৬ই মার্চ 'ফ্রেন্ড অফ্ ইন্ডিয়া' লিখছেন দেখি—

"সমাজের শীর্ষস্থানীয় পরিবার থেকে চারিজন ছাত্রের বিলাত যাওয়া—যে জন্য যাওয়া সে বিষয় বাদ দিলেও—বিশেষ লক্ষ্যণীয়। হিন্দুদের স্বদেশের গন্ডীতে বন্ধ করে রাখা গভীর কুসংস্কারগুলি ক্রমশঃ যে শিথিল হচ্ছে এ তার প্রমাণ। নিষ্ঠাবান হিন্দুর কাছে সমুদ্রপার ভয় হয় ত কমে নাই, তবে স্পষ্টতই তাঁর কড়াশাসন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসছে। ম্লেচ্ছ দেশে গিয়েছেন বলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ যে অন্ধবিশ্বাসপ্রণোদিত হয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে একঘরে করেছিল—তাহাতে অন্যদের দ্বারকানাথের পদানুসরণ থেকে ক্ষান্ত করিতে পারা যায় নি; এবং আমরা বিশেষ আনন্দের সঙ্গে জানলাম যে গোঁড়া হিন্দু সমাজের শিরোমণি রাজা রাধাকান্ত দেব অর্থসাহায্য করিয়া বর্তমান যাত্রাকে অনুমোদন করেছেন। এইভাবে যখন বরফ একবার ভালোভাবেই ভেঙ্গেছে এবং বিলাত যাওয়ার ভয় ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে তখন শীঘ্রই অনেকেই এ পথ অনুসরণ করবেন বলে আশা করা যায়। অদূর ভবিষ্যতে জগন্নাথে তীর্থ করা, গয়ায় পিন্ড দেওয়া অথবা কাশীর মন্দির ও হনুমান দর্শনে যাওয়ার বদলে শিক্ষিত ও সংগতিপন্ন এদেশীয়রা ইষ্টিমারে চড়ে মিশর ও ইউরোপের নানা দেশ দর্শনে যাবেন আশা করা অন্যায় নয়। যে সব কুসংস্কার ভারতের সভ্যতাকে পিছিয়ে রেখেছে সেগুলিকে বিলোপ করার জন্য এদেশীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে চলাফেরা এই আগ্রহের চেয়ে বড় কিছু কল্পনাও করা শক্ত।"

বিলাতে গিয়ে চারজন ছাত্রই কৃতিত্বের সঙ্গে পরীক্ষায় পাশ করে সেদেশে ও এদেশে সুনাম অর্জন করেন। দ্বারকানাথের ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেখি ১৯মে ১৮৪৬ তারিখে গিরীন্দ্রনাথকে লিখছেন—আমাদের সঙ্গে আগত ডাক্তারির ছাত্রেরা লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শ' সাহেব ছাত্রকে হারিয়ে দিয়েছে। একজন 'কম্পারেটিভ এনাটমি'তে প্রথম পদক (স্বর্ণ) পেয়েছেন। তাঁর নাম সূর্যকুমার চক্রবর্তী এবং আরেকজন দুটি বিভিন্ন বিষয়ে, সম্ভবতঃ রসায়ন ও উদ্ভিদ্-বিদ্যায়, দুটি রৌপ্যপদক পেয়েছেন। ছয় হাজার মাইল দূরের লোক এখানে এসে এখানকার বাসিন্দাদের চেয়ে সফল হয়েছে দেখে এদেশের লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়েছে।

কলিকাতার লোকেরাও বেশ আগ্রহের সঙ্গে তাঁদের খবরা-খবর রাখতেন—কারণ দেখি তাঁদের লেখাপড়ায় সফলতা ও অন্যান্য বিষয় প্রায়ই সংবাদপত্রের মারফৎ প্রকাশিত হ'ত। বিলাতে গিয়ে সূর্যকুমার চক্রবর্তী যখন স্বর্ণপদক পান তখন খবর বের হয়—"গতবার স্থলপথে পাওয়া চিঠি থেকে জানা যায় যে বিখ্যাত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে যে চারজন চিকিৎসা শিক্ষার্থী বিলাতে গিয়াছেন, তাঁহাদের একজন—সূর্যকুমার চক্রবর্তী সম্প্রতি একটি স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। এ সংবাদ এদেশীয় সাধারণের এবং যাঁহারা এই যুবকের বিলাতে উচ্চশিক্ষার ব্যয় অংশত বহন করেছেন১০ তাঁদের পক্ষে পরম পরিতোষের বিষয় সন্দেহ নাই।"

দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে যখন অসুস্থ সেই সময়ে এই প্রথম ভারতীয় ডাক্তাররা স্নাতকোত্তর সম্মান পান। সে সভায় দ্বারকানাথ উপস্থিত থাকতে পারেন নাই। তাঁর কোন বন্ধু (সম্ভবতঃ ডাক্তার গুডিভ) তাঁর রোগশয্যায় খবরটি পৌঁছে দেন। এই ছাত্রদের সফলতার কথা যখন কলিকাতায় পৌঁছায় তখন দ্বারকানাথ জীবিত নাই।

নিজের পয়সায় ছাত্রদের বিলাতে পাঠিয়ে দ্বারকানাথ এমন অভূতপূর্ব কাজ করেছিলেন যে, তার আলোচনা দ্বারকানাথের স্মৃতিসভাতেও হয়েছিল।১১ সেখানে কলিকাতার আর্চ ডিকন বলেন—"তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর স্বদেশবাসী যে কঠোর দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ একমাত্র ঐহিক জ্ঞানই তা ভাঙ্গতে পারে। আকাঙ্খিতকে সম্ভাব্য করিতে ভগবানের আলো ও ন্যায় পথে চলার শক্তি আবশ্যক। স্বদেশবাসী ছাত্রদের ইংলণ্ডে পাঠাতে তাহাই তাঁহাকে প্রণোদিত করে।"

এডভোকেট জেনারেল কর্লভিলও এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেন—"দু-এক বছর আগে কেহ প্রশ্ন করতে পারতেন 'হিন্দু ছেলেদের আবার লণ্ডনে পাঠানো কেন? সেখানে বিদেশে প্রলোভনে পড়ে তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু সে আপত্তি আর টিঁকে না। পরীক্ষা করে এর সার্থকতা সম্পূর্ণ দেখা গেছে। মেডিকেল কলেজের যে চারজন যুবক তার মধ্যে দুজন দ্বারকানাথের অর্থে, লণ্ডনে গিয়াছে তাহাদের ব্যবহার ও পড়াশুনায় মনোযোগ চরম সন্তোষ-জনক। তাহারা ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিতোষিক পেয়েছে, লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক স্যার বেঞ্জামিন ব্রোডির অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছে। সেখানকার প্রলোভন তাহাদের অধ্যয়নে অমনোযোগী করে নাই। * * তাই আমার প্রস্তাব দ্বারকানাথের যা শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাকেই স্থায়িত্ব দেওয়া। ** কোন সংগতিহীন কলেজের ছাত্র জ্ঞান আহরণ করতে চায়, বিদেশ ভ্রমণেও উৎসুক। যদি এমন কোন স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সে উপকৃত হবে তবে সে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলবে—দ্বারকানাথ ঠাকুর উদারহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। স্বজাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। কুসংস্কার তাঁর পথে বাধা দিতে পারে নাই। কালাপানি পার হয়ে ধনী জ্ঞানীদের সঙ্গে তিনি মিশেছিলেন, হিন্দু সংস্কৃতি নিয়ে তিনি ইউরোপের সেরা অভিজাত মহলে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার সাহায্যে তাঁর দেশবাসী পাশ্চাত্য ভ্রমণে ও বিজ্ঞানের পথ অনুসরণে বহু সুযোগ পেয়েছে। অধিকতর শক্তি ও ব্যাপকতর উপলব্ধি নিয়ে সে দেশে ফেরবার সুযোগ পেয়েছে।"

একজন আগন্তুক বহু বৎসর পরে এই ঘরে দ্বারকানাথের চিত্র বা মূর্তি দেখে যা বলবে তার চেয়ে ঢের বেশী শ্রদ্ধার নিদর্শন হবে এই কথাগুলি।

(১) কর্নেল বয়েড সাহেবের বেতার বক্তৃতা ১৩৪১

(২) জেনারেল কমিটি ফর পাবলিক ইন্সট্রাকশন, (৩) তত্ত্ববোধিনী চৈত্র ১৮৫৫ শক

(৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

৫। জ্বরের হাসপাতাল ও মিউনিসিপাল কমিটি ১৮৩৫ সালে কলিকাতার দেশীয় হাসপাতালের সার্জেন শ্রীযুক্ত জে, আর, মার্টিনের উপদেশে সহরের এবং সহরতলীর স্বাস্থ্যের অবস্থা ও সাধারণভাবে পৌর ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে এক কমিটি গঠিত হয়।

ঐ কমিটি দীর্ঘ ১২ বৎসর ধরিয়া সোৎসাহে বিশেষ পরিশ্রমে দরকারী খুটিনাটি খবরের এক বিপুল-সম্ভার জড় করিয়া ছাপিয়া প্রকাশ করিয়া ১৮৪৭ সালে ঐ কাজ শেষ করেন।

কলিকাতায় এই বিরাট কেন্দ্রীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য এই কমিটি কোম্পানীর ৬১,২৪৮ টাকা ৭ আনা ১০ পাই চাঁদা তোলেন। ঐ হইতেই প্রধানতঃ এই হাসপাতালের অস্তিত্ব।

কমিটির রিপোর্টগুলি নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা স্বাক্ষর করেছিলেন—স্যার জে,পি গ্রাণ্ট কে, টি, সভাপতি।

রসময় দত্ত; জে, আর, মার্টিন; এ, এইচ, ই, বয়ল, প্রসন্নকুমার ঠাকুর; আর, স্কট টমসন; দ্বারকানাথ ঠাকুর; রুস্তমজী কাওয়াসজী; সি, ডব্লিউ, স্মিথ; জে, ইয়ং; এফ, পি, স্ট্রং; এইচ, গুডিভ; পি, রজার্স; জন, গ্রাণ্ট; জে, এইচ, প্যাটন্; ডব্লিউ, পি, গ্রাণ্ট।

৬। ১৮২৩ সালে বিক্রমপুরের কনকসার গ্রামে জন্ম। বাল্যে মাতৃবিয়োগ ও কৈশোরে পিতৃবিয়োগের পর কুমিল্লায় গোলক মুন্সির পরিবারে থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পূর্ণ করে কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িতে আসেন। বিলাত যাইবার পূর্বেই খৃষ্টান হয়েছিলেন এবং বিলাতে মেমসাহেব বিবাহ করেন। ১৮৪৮-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'সংবাদ প্রভাকর'-এর সম্বন্ধে বিরূপমন্তব্য করে লেখেন।

৭। কিশোরীচাঁদ মিত্র।

৮। ভোলানাথ বসু, দ্বারকানাথ বসু, গোপাললাল শীল ও সূর্যকুমার চক্রবর্তী। প্রত্যেক ছাত্রের লণ্ডনে যাতায়াত এবং অধ্যয়ন ব্যয় সাত হাজার টাকা পড়িবে বলিয়া স্থির হয়। দ্বারকানাথ চৌদ্দ হাজার টাকা দিয়েছিলেন, সরকার ৭০০০্ দেন ও বাকী সাত হাজার টাকা চাঁদা তুলিয়া যোগাড় করা হয়।

৯। বেঙ্গল হরকরা ২২ অগষ্ট ১৮৪৬।

১০। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম ৪০০০্, রামগোপাল ঘোষ ১০০০্, রুস্তমজী কাওয়াসজী ৫০০্, বর্ধমানের রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ১০০্, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ২০০্, রাধানাথ বাঁড়ুয্যে ২০০্, আশুতোষ দেব ১০০্, রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ১০০্, মতিলাল শীল ১০০্, হাজী মির্জা মেহদী ইস্পাহানি ৫০্, হরিমোহন সেন ৫০্, রমানাথ ঠাকুর ৫০্, রাজা নরসিংচন্দ্র রায় ৫০্, রসময় দত্ত ২০্।

১১। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরের হরকরার রিপোর্ট হইতে।

ভগবানলাল ইন্দ্রজী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বর্তমান গুজরাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড়ের এক বিশিষ্ট নাগর ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর ভগবানলাল ইন্দ্রজী জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবার সংস্কৃত, জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ চর্চা করিয়া পুরুষানুক্রমে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। বাল্যকালে ভগবানলাল গুজরাটি ভাষা শিক্ষার সঙ্গে এই সব বিষয় গুলিতে ও শিক্ষালাভ করেন। এই অঞ্চলে তৎকালে ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা না থাকায় ভগবানলাল ইংরাজী শিক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার পারিবারিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। ভগবানলাল যে স্থানে বাস করিতেন উহা গির্নার গিরিমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার গিরিগাত্রের নানা স্থানে সম্রাট অশোক, স্কন্দগুপ্ত, রুদ্রদমন প্রভৃতি নৃপতিদের অনুশাসন উৎকীর্ণ ছিল। এই সব প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি বারম্বার দেখিতে দেখিতে ভগবানলাল বাল্যকালেই ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ জেমস প্রিন্সেপ রচিত প্রাচীন বর্ণমালা সম্বন্ধীয় পুস্তকটির সাহায্যে (টেবলস্ অফ্ ইন্ডিয়ান এলফাবেটস্) তিনি প্রাচীন বর্ণমালাগুলির লিখন পদ্ধতি আয়ত্ব করেন ও তদ্দ্বারা তিনি শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন। এইভাবে নিজের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ভগবানলাল ভারতের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন। জুনাগড়ের পলিটিকাল এজেন্ট কর্নেল ল্যাঙ্গের গীর্নার শিলালিপি সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল, বালক ভগবানলালকে পুনঃ পুনঃ গীর্ণার গিরিমালায় পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া তিনিই তাঁহাকে জেমস প্রিন্সেপের "টেবল্স অফ্ ইন্ডিয়ান এলফাবেটস" পুস্তকটি পড়িতে দিয়াছিলেন। কর্নেল ল্যাঙ্গের পরবর্তী পলি-টিক্যাল এজেন্ট্ কিনলক ফরবেসের সহিতও ভগবানলালের পরিচয় স্থাপিত হয়, এই সময় ভগবানলাল যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিনলকের সহিত বোম্বাই-এর প্রত্ন-প্রেমিক ডাঃ ভাওদাজীর বন্ধুত্ব ছিল। প্রাচীন শাসনাবলী সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধারের কাজের জন্য ভাওদাজী এই সময় একজন উপযুক্ত সহকারী সন্ধান করিতেছিলেন। কিনলকের অনুমোদনক্রমে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভগবান-লাল ভাওদাজীর সহকারীর কর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর ভাওদাজীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল ভগবানলাল ভাওদাজীর সহকারী রূপে কাজ করেন। ভগবানলালের সমুদয় ব্যয়ভার ভাওদাজী সানন্দে বহন করিতেন। ভগবানলালকে ভাওদাজী অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। ভাওদাজীর সহকারী পদে বৃত হইয়া ভগবানলাল বিভিন্ন সময়ে গুজরাট অঞ্চল, উজ্জয়িনী, বিদিশা, এলাহাবাদ, ভিটরী, সারনাথ, রাজপুতানা, মালব, ভূপাল, আগ্রা, মথুরা, বারাণসী, উত্তর ও দক্ষিণ বিহার, বাঙ্গলা, উড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি স্থান এক বা একাধিক বার পরিদর্শন করেন। এই সব ভ্রমণ ব্যপদেশে তাঁহাকে অপরিসীম শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইত। এই সব স্থানে গমন করিয়া ভগবানলাল শিলালিপি প্রভৃতির যথাযথ প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতেন অথবা কাগজের উপর উহার ছাপ লইতেন, সম্ভব, হইলে ঐ স্থান হইতে প্রাচীন পুঁথি ও প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি প্রত্ন দ্রব্যও সংগ্রহ করিতেন। ডাঃ ভাওদাজী ঐ গুলির পাঠোদ্ধার করিতেন, কোন ছাপ অথবা প্রতিকৃতি যথাযথ না হইলে শুদ্ধ পাঠের জন্য ভগবানলালকে পুনরায় ঐ স্থানে গিয়া শুদ্ধ প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইত অথবা সম্ভব হইলে ছাপ লইতে হইত। এতদ্ব্যতীত বোম্বাই এ অবস্থিতি কালে ভগবানলালকে ভাওদাজী কর্তৃক ক্রীত অথবা অন্য উপায়ে সংগৃহীত

তাম্রপট্ট প্রভৃতি হইতে তত্রস্থ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে হইত। ডাঃ ভাওদাজীর ন্যায় সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তির পরিচালনাধীনে দীর্ঘকাল গবেষণা রত থাকায় ভগবানলাল ভারততত্ত্ব বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। উচ্চশিক্ষালাভ না করায় তাঁহার শিক্ষার যে অপূর্ণতা ছিল, তাহা এইরূপে পূরণ হইয়া যায়। ভাওদাজীর সহকারিত্ব কালে ইংরাজী ভাষা ও প্রাকৃতেও তিনি পারদর্শিতালাভ করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মে ভগবানলালের অন্নদাতা, পৃষ্ঠ-পোষক ও পিতৃতুল্য স্নেহ-পরায়ণ ডাঃ ভাওদাজী পরলোক গমন করেন। ভাওদাজীর আত্মীয়গণ অতঃপর ভগবানলালের ভরণপোষণভার বহন করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় তিনি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়েন। ভাওদাজীর উত্তরাধিকারিগণ ভাওদাজীর অর্থ সাহায্যে ভগবানলাল সংগৃহীত গবেষণার উপাদান সমূহ ঔদার্যবশতঃ ভগবানলালকেই ব্যবহার করার অনুমতি দান করেন। এই-গুলির সাহায্যে ভগবানলাল গবেষণা কার্য চালাইতে থাকেন কিন্তু ইংরাজীতে তাঁহার এতদূর দক্ষতা ছিল না যে উহা ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া বিদ্বৎমণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ গেঅর্গ ব্যুলারের বোম্বাই অবস্থিতিকালে ভগবান-লাল তাঁহার সংস্পর্শে আসেন। ব্যুলার ভগবানলালের পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত হন এবং তাঁহার ইংরাজী রচনাগুলি পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করিয়া প্রচার যোগ্য রূপদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ব্যুলারের সহযোগিতায় ভগবানলালের "গিরিগুহায় ক্ষোদিত লিপিসমূহের সংখ্যা লিখন রীতি" বিষয়ে একটি রচনা বোম্বাই এর সুপ্রসিদ্ধ "ইণ্ডিয়ান এণ্টি কোয়েরী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৮৭৭)। ব্যুলারের মধ্যস্থতায় ভগবানলাল বোম্বাই এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ ও. কড্রিংটনের সহিত পরিচিত হন। অতঃপর এই সোসাইটির মুখপত্রে ভগবানলালের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে চারিটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুদিন পর ভগবানলাল বোম্বাই রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। ক্রমে একজন প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরূপে দেশে বিদেশে তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইউরোপের ভারতবিদ্যাবিশারদগণ তাঁহার নিকট পত্রাদি প্রেরণ করিতে থাকেন। ভগবানলাল বন্ধুদের সাহায্যে এই সব পণ্ডিতদের সহিত পত্রালাপ অব্যাহত রাখিতেন।

ভাওদাজীর কর্মত্যাগ করার পর স্বাধীন গবেষক রূপে ভগবানলাল মোট ২৮টি নিবন্ধ রচনা করেন, এতদ্ব্যতীত বোম্বে গেজেটিয়ার ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় প্রতিবেদনে তাঁহার বহু রচনা সন্নিবিষ্ট হয়। ভগবানলালের এই সব রচনায় বহু অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হয়, ও এই সব তথ্য-গুলি পরবর্তী গবেষকদের নিকট অমূল্য বিবেচিত হয়। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কোঙ্কন উপকূলে সোপারা নামক স্থানে (প্রাচীন নাম সুর্পারক) ভগবান বুদ্ধের কতিপয় স্মৃতিচিহ্ন ও সম্রাট অশোকের অষ্টম গিরিলিপি আবিষ্কার ভগবানলালের জীবনের একটি বিশিষ্ট ঘটনা। উড়িষ্যার উদয়গিরি নামক গিরি গাত্রে খারবেল নরপতিগণ কর্তৃক ক্ষোদিত লিপিগুলির তিনিই প্রথম পাঠোদ্ধার করেন। মৌর্য রাজগণ যে একটি অব্দ (মৌর্যাব্দ) প্রচলন করেন তাহা ভগবানলালই প্রথম আবিষ্কার করেন। ভগবানলালের নানাঘাট লিপি ও অন্ধ্রের প্রাচীন মুদ্রাগুলির আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার দ্বারা অন্ধ্র রাজ্যের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হয়। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজ-বংশের কীর্তি কাহিনী ভগবানলাল কর্তৃকই প্রথম উদঘাটিত হয়।

ভগবানলাল নেপালে প্রাপ্ত ২১টি লিপির পাঠোদ্ধার করেন, ইহা হইতে নেপালের রাজ-বংশের ইতিহাস আবিষ্কৃত হয়। ডাঃ ব্যুলারের মতে নেপালের ইতিহাস রচনায় পথিকৃতের সম্মান ভগবানলালের প্রাপ্য। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ ভগবানলাল বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার অন্যতম

কেন্দ্র লিডেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভগবানলাল 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ডাঃ ভাওদাজীর আশ্রয় চ্যুত হওয়ার পর ভগবানলাল ডাঃ ব্যুল্যার, ডাঃ কর্ডিংটন, ডাঃ জে· এম· কেম্পবেল, ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডাঃ বার্জেস প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন এবং আপন বিদ্যাবত্তার প্রভাবে ইহাঁদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব লাভ করেন। এই সব সুহৃদদের চেষ্টায় ভগবানলাল শুধু দেশে বিদেশে প্রতিষ্ঠাই লাভ করেন নাই, গবেষণা কার্যের মাধ্যমে তাঁহার জীবিকা অর্জনেরও ব্যবস্থা হয়। ভগবানলালের অনুরাগিবৃন্দ বোম্বাই শহরের উপকণ্ঠে ওয়ালকেশ্বর নামক স্থানে তাঁহাকে একটি গৃহ নির্মাণ করাইয়া দেন। ভগবানলাল এই গৃহেই ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ মাত্র ঊনপঞ্চাশবর্ষ বয়সে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি গুজরাটের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন, এই ইতিহাসের তিন চতুর্থাংশ লিখিত হইবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় এই রচনা তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভগবানলাল অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীও ছিল না—এই জন্য তিনি তাঁহার বাসভবনটি উইল করিয়া স্বাস্থ্যান্বেষীদের ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যান। মৃত্যুর পর তাঁহার বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সম্বন্ধীয় অপ্রকাশিত পুঁথি সমূহ, প্রাচীন মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতির প্রতিলিপি, তাম্রশাসন প্রভৃতি তাঁহার উইল অনুসারে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় ও ব্রিটিশ মিউজিয়মে দান করা হয়। ভারতবিদ্যা সংক্রান্ত প্রকাশিত পুস্তকগুলি বোম্বাই এর ভারতীয়দের জন্য স্থাপিত সাধারণ পাঠাগারের প্রাপ্য হয়। মৃত্যুর পূর্বে ভগবানলাল নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হন কিন্তু কাহাকেও তিনি নিজের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। ডাঃ ব্যুল্যারের সহিত ভগবানলাল গুজরাটি ভাষায় পত্রালাপ করিতেন, একটি পত্রে ভগবানলালের আর্থিক দুরবস্থার আভাষ পাইয়া ডাঃ ব্যুল্যার জুনাগড় দরবার হইতে ভগবানলালের জন্য সাহায্য প্রাপ্তির চেষ্টা করেন। ডাঃ ব্যুল্যারের চেষ্টা ফলবতী হইবার পূর্বেই ভগবানলালের মৃত্যু হয়।

যে সব ভারতীয় ও অভারতীয় পণ্ডিতের চেষ্টায় ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব হইয়াছে, ভগবানলালের নাম তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। স্কুল কলেজের শিক্ষা বঞ্চিত ভগবানলাল একান্ত ভাবে আপনার চেষ্টায় জ্ঞানলাভ করিয়া পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতবিদ্যা বিশারদ রূপে তাঁহার নাম আজিও স্মরণীয় হইয়া আছে। ডাঃ ভগবানলালের সম্পূর্ণ রচনা সূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(a) Published in the Journal of the Bombay Branch of Royal Asiatic Society.

(1) Gadhia Coins of Gujarat and Malwa.
(2) Revised Facsimile, Transcripts and Translation or Inscriptions.
(3) On Ancient Nagari Numeration from an inscription at Naneghat.
(4) A new Andhrabhritya King, from a Kanheri Cave inscription.
(5) Copper Plate of the Sidahara dynasty.
(6) Coins of the Andhrabhritya Kings of Southern India.
(7) Antiquarian Remains at Sopara and Padan.
(8) A new copper plate grant of the Rastrakuta dynasty found at Naosari.
(9) New copper plate grant of the Rastrakuta Dynasty.
(10) A copper plate grant of the Traikutaka King.

(11) Transcript and Translation of the Bhitari Lat inscription.
(12) An inscription of King Asokavalla.

(b) The Indian Antiquary.

(13) Ancient Nagari Numerals, with a note by Dr. Buhles.
(14) The inscription of Rudradaman at Junagadh.
(15) The Shaiva Prakrama.
(16) Inscriptions from Nepal.
(17) Inscription from Kam or Kamvan.
(18) The Inscriptions of Asoka.
(19) The Kwhnan inscriptions of Skandagupta.
(20) An inscription at Gaya.
(21) A Bactro-Pali inscription of Siahas.
(22) A new Yadaba Dynasty.
(23) A new Gujrat copper plate grant.
(24) Some consideration on the history of Nepal edited by Dr. Buhler.

(c) To the Proceedings of the International Congress of orientalists held at Leyden in 1883.

(25) The Hathigumpha and three other inscriptions in the Udaigiri caves.

(d) To the Transactions of the seventh International Oriental Congress at Vienna.

(26) Two new Chalukya inscriptions.

(e) Bombay Gazetters.

(27) Portions relating to archeology in differents volumes.

(f) In separate and miscellaneous forms.

(28) Inscriptions from cave temples of Western India with descriptive notes edited by Dr. Burgess.
(29) Contributions to Dr. Burgess' Archeological Survey of India.

প্রাচীন ভারতে চৌর্যশাস্ত্র

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

চৌর্য সম্পর্কিত যে কোন আলোচনাই সমাজের একটি অন্ধকারময় জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। যথার্থ তত্ত্বান্বেষী মানুষ চৌর্যবৃত্তির মধ্যে এমন কোন তাৎপর্য খুঁজিয়া পায় না যাহাতে সে ঐ বিষয় সম্পর্কীয় কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও চৌর্য এবং ঐ শ্রেণীর অন্যান্য অপরাধমূলক সাহিত্য ও তাহার শ্রোতা জগতে দুর্লভ নহে। সুপ্রাচীন কাল হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে চৌর্য, দস্যুবৃত্তি, অপরাধপ্রবণতা প্রভৃতি সম্বন্ধে একাধিক উপভোগ্য উল্লেখ খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরে দুঃসাহসিক কর্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি সুপ্ত রহিয়াছে; এবং এজন্য অপরাধের অনুষ্ঠানের দুঃসাহসিকতার প্রতি মানবহৃদয় অজ্ঞাতে সূক্ষ্ম আবেদন জানায়। মানুষ আপনাকে বিজয়ীরূপে দেখিতে ভালবাসে বলিয়াই দুষ্করকর্মা দস্যু-তস্করের চরিত্রের আলোচনায় তাহার আসক্তি লক্ষ্য করা যায়। মানবচিত্তের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে কেহ কেহ চৌর্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত ও তথ্যমূলক আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিস্ময়কর অবদান এই চৌর্যশাস্ত্র। বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গ পর্যালোচনা করিলে তাহা হইতে চৌর্যবৃত্তি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। এই আলোচনায় ইহা লক্ষ্যণীয় যে এখানে যেমন বিশেষ বিশেষ খ্যাতিমান তস্করের কীর্তিকাহিনী বিবৃত হইয়াছে তেমন ভাবে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনের একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা দিবারও চেষ্টা করা হইয়াছে। চৌর্যকে এই সকল আলোচনার মধ্যে কোথাও নিন্দিত ও গর্হিত আচরণরূপে দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই, বরং সমাজের অধঃপতিত ও দারিদ্রমগ্ন যে বৃহৎ জনসমাজ সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থার অসাম্যে ও অভাবের তাড়নায় চৌর্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের ক্ষুব্ধ অভিযোগ নানাবিধ চাতুর্যময় যুক্তির সাহায্যে উপস্থিত করা হইয়াছে।১ উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক নীতির যতদিন জন্ম না হয় ততদিন পর্যন্ত অর্থগৃধ্নু ধনীর গ্রাস হইতে দরিদ্রের অন্ন সংগ্রহ করিবার একমাত্র উপায় বলিয়াই চৌর্যকে স্বীকার করা হইয়াছে। বর্তমান যুগের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সর্ববিধ অপরাধের মূল অন্বেষণ করিয়া দেখা হয় ও অপরাধের সংশোধনের নিমিত্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। সুপ্রাচীন যুগেও যে অপরাধীকে অপরাধের নিমিত্ত দোষী সাব্যস্ত না করিয়া অপরাধের মূল উৎস কোথায় এবং কিরূপ ঘটনা পরম্পরার প্রভাবে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ চৌর্যশাস্ত্র বিশদভাবে আলোচনা করিলে পাওয়া যায়। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে চৌর্যশাস্ত্র সুকুমার কলা ও কারুবিদ্যার অন্যতমরূপেই অঙ্গীকৃতি লাভ করিতে পারে। বস্তুবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যারূপেও যে চৌর্যবিদ্যার স্বীকৃতি সম্ভব ইহা সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কবি ও নাট্যকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

চৌর্য ও চুরিবিদ্যা সম্পর্কে সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে।২ বেদে দুই প্রকারের চৌর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। একশ্রেণীর তস্কর কেবলমাত্র গৃহস্থ বাটীতে সিঁদ কাটিয়া চুরি করিত, অপর শ্রেণীর তস্কর প্রকাশ্য রাজপথে ভয়দেখাইয়া পথিকগণের নিকট হইতে অর্থ ও দ্রব্য অপহরণ করিত। প্রথম শ্রেণীর চোরদের 'স্তেন' ও 'তস্কর' পদের দ্বারা উল্লেখ করা হইত

এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তস্করদের 'মলিম্লু' পদের দ্বারা অভিহিত করা হইত।৩ ঋগ্বেদে ও পরবর্তী গ্রন্থসমূহে চোর ও দস্যু অর্থে প্রথমে তস্কর পদটির প্রয়োগ দেখা যায়। বাজসনেয়ি সংহিতায় স্তেন ও তস্কর এই উভয়কেই 'মলিম্লু' পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে।৪ ঋগ্-বেদের একটি শ্লোকে একটি কুক্কুরকে তস্করের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে বলা হইয়াছে। অপর একস্থলে যাহারা অর্গলভগ্ন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিত ও রাজপথে অর্থাদি অপহরণ করিত তাহাদের মলিম্লু পদের দ্বারা উল্লেখ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে চৌরের কর্মপদ্ধতির অত্যন্ত নিপুণ ও সবিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।৫ তস্করেরা গভীর রাত্রে কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাহির হইত,—বাহির হইবার পূর্বে তাহারা পথঘাট চিহ্নিত করিয়া রাখিত। বিপদে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য অথবা গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য তাহারা সকল সময়ে নিকটে রজ্জু রাখিত। কখন কখন তাহারা গৃহ হইতে গবাদি পশু প্রভৃতি অপহরণ করিত। চৌরের অপর নাম ছিল তায়ু।৫ক ইহারা অনেকক্ষেত্রে বস্ত্র ও পরিধেয় দ্রব্যও অপহরণ করিত, অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ভদ্র গৃহস্থের নিকট হইতে দারিদ্র্যের অজুহাতে ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিত না। বাজসনেয়ি সংহিতায় শতরুদ্রীয় সূক্তে বিভিন্ন শ্রেণীর তস্করের শ্রেণীভেদ করা হইয়াছে। যেমন, যাহারা কেবলমাত্র দ্রব্য অপহরণ করিত তাহাদের বলা হইত স্তেন, যাহারা বলপূর্বক দ্রব্য অপহরণ করিত তাহাদের বলা হইত তস্কর, যাহারা কাহারও অজ্ঞাতে দেহাভ্যন্তরস্থ বস্ত্র হইতে স্বর্ণ প্রভৃতি তুলিয়া লইত (অর্থাৎ পিক্‌পকেট) তাহাদের বলা হইত স্তায়ু, কেবলমাত্র হাতসাফাইকারীদের 'মুষ্ণৎ' ও যাহার ঘরে সিঁদ কাটিত তাহাদের 'বিকৃন্ত' নামে অভিহিত করা হইত। ঋগ্বেদে রাত্রে নিরাপদে থাকিবার জন্য একাধিক বার প্রার্থনা করা হইয়াছে; সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে সেকালে চৌরের উপদ্রব কিরূপ ভয়াবহ ছিল। চৌরেরা দলবদ্ধ হইয়া ঘুরিত; অপরাধ প্রমাণিত হইলে তাহাদের কিপ্রকার শাস্তি দান করা হইত তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

চৌর্যশাস্ত্রের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মহাদেবের পুত্র কুমার স্কন্দ সর্বপ্রথম যোগাচার্য নামক একজন গুরুকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন।৬ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামাও এই শাস্ত্রের অপর একজন প্রণেতারূপে প্রসিদ্ধ, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময়ে গভীর রাতে সংগোপনে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে পরাভূত করিয়া পঞ্চপাণ্ডবতনয়ের শিরচ্ছেদ করেন। চৌর্যশাস্ত্রের অপর একজন প্রবক্তা ভাস্করনন্দিন্। 'বৃহৎ কথা' নামক আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে যে কর্ণীসুত নামক একজন ক্ষত্রিয় নৃপতি চৌর্য-শাস্ত্রের প্রচারক।৭ বিপুল ও অচল নামে তাঁহার দুই বন্ধু ছিলেন। তাঁহার এক কর্মদক্ষ মন্ত্রী ছিলেন শশ নামে। প্রসিদ্ধ প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদ ব্লুম্‌ফিল্ড্ মূলদেব নামে এক অসমসাহসী তস্করশ্রেষ্ঠের কীর্তিকলাপ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক নাটকে মহারাজ শূদ্রকই সর্বপ্রথম চৌর্যশাস্ত্র ও চুরিবিদ্যার বহুবিধ গুণাবলী কীর্তন করেন। নাটকের যে আখ্যান-ভাগে চৌর্যবৃত্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা নিম্নরূপ—মদনিকা নামে একটি তরুণী নাটকের নায়িকা বারাঙ্গণা বসন্তসেনার সখী। মদনিকার প্রতি প্রণয়মুগ্ধ ব্রাহ্মণপুত্র শর্বিলক মদনিকার মুক্তিপণ সংগ্রহের জন্য বণিক্ চারুদত্তের প্রাসাদে চৌর্যের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করে। অনভ্যস্ত অপরাধের অনুষ্ঠানের সময়ে অন্ধপ্রণয় ও বিবেকের দংশন এই দুয়ের সংঘাতে শর্বিলকের মনের যে জটিল চিত্র নাট্যকার অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সুন্দর। চতুর্বেদ পারদর্শী ব্রাহ্মণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও গণিকাপ্রণয়ের নিমিত্ত তাঁহাকে যে এই হীন তস্করবৃত্তিকে আশ্রয় করিতে হইয়াছে এজন্য তিনি স্বীয় অস্তিত্বকে একাধিকবার ধিক্কার দিয়াছেন। কিন্তু বিবেকের প্রবল

পীড়ন সত্ত্বেও চৌর্যশাস্ত্রের প্রণেতা ত্রিশূলীতনয় কার্তিককে প্রণাম করিয়া তিনি সন্ধিভেদের জন্য সিদ্‌কাটি লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। তস্করেরা ভিত্তি ছেদন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার সময়েও যে স্বীয় শিল্পচাতুর্যের পরিচয় রাখিয়া যাইত ইহার প্রমাণ ও মৃচ্ছকটিক নাটকেই পাওয়া যায়। চৌর্য কেবলমাত্র জঘন্য তস্করবৃত্তি নহে, একজন দক্ষ তস্কর একজন সুদক্ষ স্থপতিও বটে। চুরি করিবার সময়ে কোন শব্দ না হয়, এবং সন্ধিও এরূপে ছেদন করিতে হইবে যাহাতে তাহা দেখিতে ভয়ঙ্কর না হয়। প্রাসাদের কোন অংশ ক্ষার (অর্থাৎ নোনা) লাগিয়া ক্ষীণ ও দুর্বল হইয়াছে তাহাও ভিত্তিছেদনের পূর্বে লক্ষ্য করিতে হইবে। যে অংশে মূষিকেরা ছিদ্র করিয়াছে সেই অংশ ছেদনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। ভগবান্ কনকশক্তি চৌর্যশাস্ত্রে চারি প্রকারের সন্ধিভেদের নির্দেশ করিয়াছেন;—যেমন প্রথমে পক্ব অর্থাৎ শুষ্ক ইষ্টকের আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহার পরে অপেক্ষাকৃত কোমল ইষ্টকের ছেদন করিতে হইবে, তাহার পরে যেস্থলে ইষ্টক এবং অন্যান্য দ্রব্যের মিশ্রণ হইয়াছে তাহাতে জলসেচন করিতে হইবে এবং তাহার পরে যে অংশ কাষ্ঠনির্মিত তাহাকে আকর্ষণ করিয়া ভূমিতে পাতিত করিতে হইবে। সন্ধিরও সাত প্রকার ভেদ স্বীকৃত হইয়াছিল— যেমন, পূর্ণবিকশিত পদ্মের ন্যায়, সূর্যের ন্যায়, বালচন্দ্রের ন্যায়, পুষ্করিণীর ন্যায়, স্বস্তিকের ন্যায়, অথবা পূর্ণকুম্ভের ন্যায়। ইষ্টকের দৃঢ়তা ও গঠনভেদে এই সাতপ্রকার সন্ধিভেদের যে কোন প্রকারের সন্ধি প্রয়োগ করা যাইতে পারে॥

নিঃশঙ্কভাবে চুরি করিবার উদ্দেশ্যে তস্করেরা যে নানাপ্রকারের যোগচূর্ণ ব্যবহার করিত এবং তাহার প্রভাবে যে তাহারা অলক্ষিত থাকিয়া অথবা সকলকে নিদ্রাভিভূত করিয়া কর্ম সম্পাদন করিতে পারিত এরূপ উল্লেখও মৃচ্ছকটিক নাটকে পাওয়া যায়। ভিত্তিগাত্রে ছেদন করিয়া প্রবেশ করিবার সময়ে প্রথমে প্রথমে তস্কর সন্ধিবিবরের মধ্যে আপনার মস্তকের ন্যায় একটি কৃত্রিম মস্তক ঈষৎ প্রবেশ করাইয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কেহ জাগ্রত রহিয়াছে কিনা, অথবা প্রবেশপথে কোন প্রতিবন্ধক আছে কিনা। তাহার পর অত্যন্ত সন্তর্পণে ভিতরে প্রবেশ করিবে। চৌর্যবৃত্তিকে এইরূপে এক অসমসাহসী ভাগ্যান্বেষী সৈনিকের বৃত্তির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সৈনিকের দক্ষতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, চাতুর্য এই সমস্ত গুণেরই সমাবেশ তস্করের চরিত্রে দেখা যায়। চৌর্যবৃত্তির অন্যান্য সদ্‌গুণ বিষয়ে সরস ও মৌলিক আলোচনা রহিয়াছে "ধর্ম-চৌর্যরসায়ণ" গ্রন্থে। গোপালযোগীন্দ্রসূরী রচিত এই গ্রন্থে সমাজের অধঃপতিত ও দারিদ্র্যগ্রস্ত যে জনসমাজ অভাবের তাড়নায় চৌর্যবৃত্তিকে অবলম্বন করে তাহাদিগকে আশ্রয় দিবার ও সমর্থন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু চৌর্যবৃত্তিকে শাস্ত্রবিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিলেও আলোচনা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে রসগ্রাহী ও তাহাতে কোন দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করা হয় নাই। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই ইহা সমানভাবে উপভোগ করিতে পারে। মূল কাহিনীটি হইতেছে এইরূপ—প্রাচীনকালে ধর্মসেতু রাজ্যে ধর্মকেতু নামে রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এক ব্রাহ্মণের চারিটি পুত্র ছিল। পিতা বৃদ্ধকালে পুত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কে কিরূপে জীবন যাপন করিবে এ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতে লাগিলে চতুর্থ পুত্র ধর্মসংগ্রাহিন্ চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে এই অভিমত প্রকাশ করিল। পিতা ইহাতে শঙ্কিত হইলেও পুত্র চৌর্যকে হীনবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিল না, কারণ চৌর্য চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম, শাস্ত্ররূপে ইহার নির্দিষ্ট নীতি রহিয়াছে। চৌর্যকর্ম কখনই হীনবৃত্তি নহে। ইহাতে বালক, স্ত্রী অথবা ব্রাহ্মণের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত হয় না। তস্কর কখনই জীবহিংসা করে না। সম্মোহন চূর্ণ এবং সম্মোহন কজ্জল লইয়া সকলকে জ্ঞানহীন করিয়া সে আপন কর্ম সম্পাদন করে। সর্বতোভাবে সুসজ্জিত তস্কর

রাজার ন্যায় ক্ষমতাবান্। পিতা পুত্রের এই প্রকার যুক্তিতে শঙ্কিত হইলেও ধর্মসংগ্রাহিন্ ভবিষ্যতে চৌর্যানুষ্ঠানে কখনও 'মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করিবে না' এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে পিতা নিবৃত্ত হইল। জনকের দেহাবসানের পর ধর্মসংগ্রাহিন্ একদিন স্বীয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া গভীর রাত্রে বাহির হইল। দৈবক্রমে রাত্রিতে সেই দেশের রাজাও পুরপর্যবেক্ষণে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি বিসদৃশ বেশধারী এই ব্রাহ্মণকে দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিয়া চৌর্যশাস্ত্রের নানাবিধ স্তুতি করিল। পৃথিবীতে বহু প্রকারের চৌর্য রহিয়াছে। যেমন পৃথিবীর অন্ধকারকে চুরি করিয়া ভগবান অংশুমালী আকাশে দীপ্যমান, স্বয়ং বিষ্ণু বিশ্বের পাপহরণ করিয়া পুণ্যবান। যম প্রাণিগণের প্রাণ অপহরণ করিয়া চৌর্যের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। ধর্মমার্গের অবিরোধী এই চৌর্য সকল সময়েই শাস্ত্রসম্মত। চৌর্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন ধর্ম নাই, কারণ চোরেরা ধনীর অসংযত লিপ্সাকে সংযত করিয়া রাখে। ধনী ধনগর্বে গর্বিত হইয়া নানাবিধ অকরণীয় দুষ্কর্ম করিয়া থাকে। চৌর্য তাহার গর্বের বিনাশ করে। অহংকারকে সমূলে বিনষ্ট করিতে চৌর্য পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। কাব্যে ও নাটকে চৌর্যবৃত্তির গুণাগুণ সম্পর্কে নানা প্রকার উল্লেখ রহিয়াছে। ইন্দ্র গৌতমীকে অপহরণ করিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ গোপীগণকে অপহরণ করিয়া দোষভাজন হন নাই। রাবণ পরস্ত্রী অপহরণ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও চন্দ্র বৃহস্পতি ভার্যাকে হরণ করিয়া শিবের ললাটদেশে স্থান পাইয়াছেন। জগতে সর্বত্র তস্করের অপূর্ব লীলাবৈচিত্র্য। শিক্ষক ছাত্রের অজ্ঞানের অপহরণ করিয়া পূজ্যাস্পদ হইয়াছেন, অজ্ঞব্যক্তির অজ্ঞানকে অপহরণ করিয়া জ্ঞানী গুণবান্ হইয়াছেন, ভক্তিহীনের অশ্রদ্ধাকে চুরি করিয়া ভক্ত এবং আলস্যপরায়ণের আলস্য চুরি করিয়া কর্মী সমানভাবে শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। সুতরাং চৌর্যের ন্যায় নীতিসঙ্গত ধর্ম আর নাই। নৃপতি এই যুক্তিজালে অভিভূত হইয়া তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে, দশকুমার চরিতম্ নামক গদ্যকাহিনীতে, এবং হেমচন্দ্র রচিত পরিশিষ্ট পর্বে চৌর্য সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ আখ্যানের নিদর্শন রহিয়াছে। কথাসরিৎ সাগরের তৃতীয় তরঙ্গে রাজা পুত্রকের একটি হাস্যজনক চৌর্যের বর্ণনা করা হইয়াছে। একদা বিন্ধ্যাটবীতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাজাপুত্রক দুইটি দানবকে যষ্টিদণ্ড ও খেচরপাদুকার জন্য কলহ করিতে দেখিলেন, রাজা মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন যে তাহাদের মধ্যে যে দ্রুতধাবনে অপরকে পরাস্ত করিতে পারিবে সে বস্তুদ্বয়ের অধিকারী হইবে। মূঢ় দানব দুইটি দ্রুত দৌড়াইয়া চক্ষুর অগোচরে চলিয়া গেলে রাজা পাদুকা ও দণ্ড লইয়া পলায়ন করিলেন। কথাসরিৎসাগরের বহুবিধ আখ্যানের মধ্যে দ্রব্য চৌর্য, বাগদত্তা বধূর অপহরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদির অপহরণ, শক্তিহরণ, প্রভৃতি নানাবিধ অপহরণের কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। কেবলমাত্র তস্করদিগের দ্বারা অধ্যুষিত চৌরাটবী নামক একটি অরণ্য ও তাহার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামেরও উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল তস্কর সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিত, পরস্পর ভাবের আদানপ্রদানের নিমিত্ত নানাপ্রকার সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রয়োগ করিত। ইহারা প্রয়োজনবোধে প্রাণিহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। রজ্জুর সাহায্যে ইহারা দ্বিতল অথবা ত্রিতল গৃহের শীর্ষে আরোহণ করিত। ক্ষেত্রে পূর্ব হইতে গৃহের ভিত্তিতে চিহ্ন অঙ্কন করিয়া রাখিত। বৃদ্ধা দাসী অথবা নিন্দিতা নারীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গৃহের কোন স্থানে কোন দ্রব্য রক্ষিত আছে তাহা পূর্বাহ্নে জানিয়া রুদ্ধ অর্গল ভগ্ন করিতে হইলে তীক্ষ্ণাগ্র কীলক প্রবেশ করাইয়া ক্রমে চাপ বৃদ্ধি করিত। অনেক লইয়া গভীর রাত্রে চৌর্যের নিমিত্ত প্রবেশ করিত। গৃহপালিত কুক্কুর অথবা সর্পের দ্বারা দ্রষ্ট হইলে চিকিৎসার নিমিত্ত ঔষধ ও বস্ত্রখণ্ড নিকটে রাখিত। গৃহাভ্যন্তরের প্রদীপ নির্বাপিত

করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাহারা কপট বেশ ধারণ করিত, অথবা উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিত। স্ত্রীলোকেরাও যে কোন কোন স্থলে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিত তাহারও ইঙ্গিত এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর হইতে জানা যায় যে সুবর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু এবং হীরা মুক্তা প্রভৃতি মণি-মাণিক্য চৌরদের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল।

সম্পন্ন গৃহস্থের সন্তান অসৎ সংসর্গের জন্য পতিত হইয়া অনেক সময়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিত। দশকুমার চরিতে অর্থপালের আখ্যানভাগে অর্থপালের মিত্র পূর্ণভদ্রের চরিত ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্ণভদ্র অল্প বয়সে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। বারাণসীতে এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে চুরি করিতে যাইয়া সে রাজদরবারে অভিযুক্ত হয়। রাজার বিচারে মৃত্যুবিজয় নামক হস্তীর পদতলে তাহাকে পিষ্ট করিয়া মারিবার আদেশ হয়। অসমসাহসিকতার সহিত সে মৃত্যুবিজয়ের আক্রমণ প্রতিহত করিলে মন্ত্রী মুগ্ধ হইয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উপদেশে পূর্ণভদ্র চৌর্যবৃত্তি সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যাগ করিল।

ভারতীয় জনমানসের প্রকাশ যে কিরূপ বিভিন্ন দিকে ও বিচিত্রভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় চৌর্যবৃত্তিসম্পর্কীয় একাধিক আলোচনা হইতে। চৌর্যশাস্ত্রের প্রবক্তাগণ এই শাস্ত্রের নানাবিধ গুণের কীর্তন করিয়া বলিয়াছেন যে জগতে ধর্ম-অর্থ-কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ স্বীকৃত হইলেও অপর একটি অস্বীকৃত বর্গ রহিয়াছে যাহাকে চৌর্যবর্গ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জগতে সর্বত্রই তস্করের লীলাবৈচিত্র্য। কেহ অজ্ঞানকে চুরি করিয়া, কেহ দারিদ্র্যকে চুরি করিয়া, কেহ বা অভক্তিকে চুরি করিয়া—নানাভাবে চৌর্যেরই স্তুতি করিয়া গিয়াছেন। মানবজীবনের অগ্রগতির সহিত ধর্মানুমোদিত চৌর্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জগতে এমন কোন বণিক নাই যিনি চুরি করেন নাই, এমন কোন কবি নাই যিনি অপরের রচনা আত্মসাৎ করেন নাই, এমন কোন কলা পৃথিবীতে নাই যাহা চৌর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এজন্য চৌর্যের প্রকারান্তরে প্রশস্তি গাহিয়া রাজশেখর বলিয়াছেন—

নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্তচৌরো বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্॥ সুতরাং বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের সহিত প্রয়োগ করিলে চৌর্যবৃত্তি পরিণামে অনেক মঙ্গলের সৃষ্টি করে।

১। তুলনীয়—খাইতে পারিলে কে চোর হয়?......দারিদ্রের আহারসংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? (বিড়াল, বঙ্কিমরচনাবলী), ২। এত উ ত্যে প্রত্যদৃশ্রন্ প্রদোষং তস্করা ইব (১·১৯১·৫) ন তা নশন্তি ন দভাতি তস্করো...(৬·২৮·৩)। ৩। যে জনেষু মলিম্লবস্তেনাসস্তস্করা বলে। যে কক্ষেম্বাঘায়বস্তাংস্তে দধামি গম্ভয়োঃ। (বাজসনেয় সংহিতা · ১১·৭৯)। ৪। স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃসর। (৭·৫৫·৩)। ৫। পথ এক পীপায় তস্করো যথা এষ বেদ নিধীনাম্, (ঋগ্‌বেদ ৮·২৯·৬)।

৫ক। অব রামন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠম্ (ঋঃ, সং ৭·৮৬·৫)। ৬। নমো বরদায় কুমার কার্ত্তিকেয়ায়, নমঃ কনকশক্তয়ে ব্রাহ্মণ্যদেবায় দেবব্রতায়, নমো ভাস্করনন্দিনে, নমো যোগাচার্য্যায়...... (মৃচ্ছকটিক, তৃতীয় অঙ্ক)। ৭। কর্ণীসুতঃ করটকঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক। তস্য খাতৌ সখায়ৌ বিপুলাচল-সংজ্ঞিতৌ। শশো মন্ত্রিবরস্তস্য......।

সাহিত্য সংবাদ

ভিক্টোরীয় যুগের অতুলনীয় সাহিত্য সম্ভার বর্তমান যুগের সাহিত্য পাঠকের মনে কোনও ঔৎসুক্য জাগায় কিনা তা বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। সম্প্রতি এক অনুসন্ধানের ফলে যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। সমীক্ষার তথ্যে প্রকাশ যে, সে যুগের সাহিত্য সৃষ্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পাঠক মনে আর তেমন কোন সাড়া জাগায় না। ভিক্টোরীয় যুগের কবি এবং ঔপন্যাসিকদের প্রতি পাঠকদের কিছু আকর্ষণ এখনও আছে কিন্তু অন্যান্য সাহিত্য শাখা পাঠ্য বস্তু হিসাবে অবহেলিত। শিল্প, সংগীত, দর্শন এবং অন্যান্য গুরু গম্ভীর বিষয়ের উপর যে অপূর্ব সমালোচনা সাহিত্য সে যুগে রচিত হয়েছিল তা এক বিশেষ ধরণের অনুসন্ধানী পাঠককে অদ্যাবধি আকৃষ্ট করে কিন্তু আপামর পাঠক সমাজে তার কোনও আবেদন নেই। অথচ এককালে যা ছিল পাঠসৌন্দর্যের অফুরন্ত আকর। তথ্যানুসন্ধানী হ্যারল্ড হুইলার বলেছেন যে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী এক স্বর্ণযুগ। সাহিত্যিক এবং চিন্তানায়কদের আবির্ভাবে সে যুগ ছিল ভারাক্রান্ত, তাঁদের সৃষ্টি এবং চিন্তাধারা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তৎকালে যে দিক নির্দ্দেশকারী আলোড়ন তুলেছিল তার দশ-শতাংশও আজ বর্ত্তমান কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অবশ্য পাঠকের রুচিভেদ ঘটবেই। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে দুটি মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রভাবে পাঠ রুচির যে পরিবর্তন ঘটেছে তা ভয়াবহ।

ভিক্টোরীয় যুগের সমালোচনা সাহিত্য নিঃসন্দেহে উচ্চস্তরের গদ্যচর্চ্চার নিদর্শন। কার্লাইল যে বাকধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন তা তাঁর স্বদেশবাসী সুনজরে দেখেননি। রক্ষণশীল ইংরাজ কার্লাইলের রচনার মধ্যে বিদ্রোহের আভাষ লক্ষ্য করে রক্তচক্ষু হয়ে তাঁকে সাবধানবাণী প্রেরণ করতেও লজ্জাবোধ করেনি। কার্লাইলের প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর এই বিরূপতার কারণ বেশ স্পষ্ট। তিনি পাঠক সমাজকে যে সমাজচিন্তার ভাবনায় ভাবিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন তা সে যুগে অচিন্ত্যনীয় ছিল। সমাজ সংস্কারের যে নির্দ্দেশ তাঁর সৃষ্টিতে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চক্ষুশূল হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। "সার্তোর রিসার্তাস" কার্লাইলের অন্যতম অবদান, কিন্তু রক্ষণশীল ইংরাজ এই অপূর্ব রচনার প্রতি তেমন আকৃষ্ট হওয়া ত দূরের কথা লেখককে কি ভাবে অপদস্থ করা যায় সেকথাই প্রথমে চিন্তা করেছিল। কয়েকজন প্রভাবশালী ইংরাজের কৃপায় পাণ্ডুলিপিটি বহুদিন ধূলিমলিন অবস্থায় থাকার পর সার্তোর রিসার্তাস ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু কোনও প্রকাশক কার্লাইলের রচনাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। অবশেষে ১৮৩৫ সালে আমেরিকার বোস্টন সহরে সার্তের রিসার্তাস গ্রন্থরূপ ধারণ করে। মানব সমাজের পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার ব্যবহারের বিচিত্র রীতিনীতি সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান কার্লাইল করেছিলেন তারই দর্শনশাস্ত্র গ্রন্থটির মূল বক্তব্য। কার্লাইল এবং তাঁর মন্ত্রশিষ্য জন রাসকিন দুজনেই ছিলেন ভিক্টোরীয়া যুগের সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক। তাঁরা যা কিছু লিখতেন অথবা বলতেন তার ভিতরে কোনও ফাঁকি ছিল না।

সমাজের অনাচার তাঁদের মনে যে বেদনার ঝড় তুলতো তা দুজনেরই চিন্তা ধারাকে একই খাতে প্রবাহিত করেছিল। কিন্তু দুজনের বিক্ষোভ প্রকাশের ধারা ছিল বিভিন্ন। কার্লাইল সমাজের পর্বতপ্রমাণ গাফিলতীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বজ্রকণ্ঠে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করতেন এবং তাঁর মধ্যে বৃশ্চিক দর্শনের জ্বালা অনুভব করা যেত। কিন্তু রাসকিন বিক্ষোভ প্রকাশ করতেন কাব্যময় গদ্যের মাধ্যমে, যার মধ্যে কোনও জ্বালা ছিল না অথচ তাঁর অমোঘ যুক্তিবাদী মনের নির্দেশ পাঠক মনকে হতচকিত করে তুলত। রাসকিনের সৌন্দর্য্যবোধ সম্ভবতঃ তাঁকে কোনদিন রূঢ় হতে দেয়নি। বহু আঘাত তিনি পেয়েছেন কিন্তু সে আঘাত কাউকে তিনি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের লন্ডন সহর, বার্ণসউইক স্কোয়ারের হান্টার স্ট্রীটে কোনও এক জন রাসকিন বসবাস করতেন। স্কচ জাতীয় এই রাসকিন পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীতে এডিনবরা থেকে এসে লন্ডনে বসবাস সুরু করেন। বৃদ্ধ জন রাসকিন প্রচুর ঋণের দায় পুত্র জন জেমস রাসকিনের স্কন্ধে চাপিয়ে ১৭৮০ সালে পরলোক গমন করেন। দিশাহারা জন জেমস রাসকিন এবং বন্ধু টেলফোর্ড শেরী মদের ব্যবসায়ে যখন অবস্থা কিছুটা আয়ত্বে আনতে সক্ষম হয়েছেন সেই সময় দ্যোমেক নামক এ ফরাসী ভদ্রলোক স্বেচ্ছায় যোগদান করে ব্যবসাটির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। জন জেমস রাসকিন পিতৃঋণ শোধ করে যখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন তখন তাঁর জীবনে উদয় হলেন মার্গারেট কক্স। তাঁদের একমাত্র পুত্র জন রাসকিন ১৮১৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী হান্টার স্ট্রীটের বাসভবনে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহের নামানুসারে শিশুর নাম করণ করা হয়।

শিশু জনের দিনগুলি কঠোর শাসনের মধ্যে অতিবাহিত হতে থাকে মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে একটি মুহূর্ত্তও অবহেলায় নষ্ট করা জনের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না। কোনও ব্যতিক্রম ঘটলে অনায়াসেই জনের কপালে বেত্রাঘাত জুটত। শিশুকাল থেকেই তাঁকে চিত্রাঙ্কণ, সংগীত সাধনা এবং উচ্চৈঃস্বরে বিদ্যাভ্যাস করতে হত।

রেভারেণ্ড টি. ডেলের পেকহ্যামামস্থিত বিদ্যালয়ে রাসকিনকে ভর্ত্তি করা হয় কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁর বিদ্যাভ্যাস স্বচ্ছন্দগতিতে হয়নি অথচ তাঁর মেধা প্রশ্নাতীত ছিল।

রাসকিনের বয়স যখন সতের বৎসর তখন এক অভাবনীয় ঘটনা তাঁর জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে। মঁসিয়ে দ্যোমেকের সুন্দরী কিশোরী কন্যা আদেলির সংগে রাসকিনের পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয় গভীর প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু সেই প্রেম ছিল একপক্ষের, রাসকিন আদেলিকে ভালবাসতেন কিন্তু আদেলি ছিলেন বহুবল্লভা। তিন বৎসর পরে আদেলি যখন ব্যারণ দ্যুকমে নামক এক ফরাসী ভদ্রলোককে বিবাহ করেন তখন রাসকিন ভগ্নহৃদয়ে ইয়োরোপ যাত্রা করেন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই অসুস্থতা তাঁকে আজীবন যন্ত্রণা দিয়েছে আর মনে করিয়ে দিয়েছে এক হৃদয়হীনার কথা।

ইয়োরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসকিন অক্সফোর্ডের খ্রাইস্টচার্চ্চ কলেজে যোগদান করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এই সময়ে শেলডোনিয়ান থিয়েটারে স্বরচিত কাব্য "সালসেট এ্যাণ্ড এলিফান্টা" আবৃত্তি করে তিনি নিউডিগেট পুরস্কার লাভ করেন। বিদ্যাচর্চায় তাঁর কোনও অবহেলা ছিল না অথচ গ্রাজুয়েট হতে তাঁকে দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষা কন্টকিত শিক্ষা গ্রহণ করতে তাঁর কোনও আত্মিক আগ্রহ ছিল না উপরন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য ছিল অপর এক অন্তরায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অনুধাবনে কিম্বা শিল্প সাধনায় অথবা সাহিত্যচর্চ্চায় ছিল তাঁর প্রকৃত আসক্তি। অক্সফোর্ড

অধ্যয়নকালে স্থাপত্য এবং অন্যান্য বিষয়ের উপর তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

অক্সফোর্ড ত্যাগ করে রাসকিন হার্ণহিলের গ্রাম্য পরিবেশে ফিরে এক বৃহৎ রচনায় মনোনিবেশ করলেন। ১৮৪২ সাল, জে, এম, ডাবলিউ টার্নারের চিত্রকর্ম্মের সারবত্তা প্রসঙ্গে লণ্ডনে তখন তুমুল বাক বিতণ্ডা চলেছে; রাসকিন টার্নারের পক্ষ অবলম্বন করে এক পত্রিকায় পত্রাঘাত করেন। রাসকিন প্রথমে ভেবেছিলেন যে টার্নারকে অবলম্বন করে আধুনিক শিল্পী ও তাঁদের সৃষ্টির পক্ষে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে একটি পুস্তিকা রচনা করবেন। কিন্তু বাস্তবে সেই পুস্তিকা হয়ে দাঁড়াল পাঁচখণ্ডের এক বৃহৎ পুস্তক। "মডার্ণ পেণ্টার্স" গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ডটি ১৮৪৩ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডটিতে রাসকিন মাত্র একটি সমস্যার সমাধান করেছেন, প্রশ্নটি হল—হোয়াট ইস ট্রু গ্রেটনেস ইন আর্ট।

মডার্ণ পেণ্টার্সের প্রকাশকালে রাসকিনের বয়স ছিল চব্বিশ বৎসরেরও কম। গ্রন্থটি তুমুল বিতর্কের ঝড় বইয়ে দিল, ধুরন্ধর সমালোচকরা রাসকিনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন তাঁরা বললেন শিল্পের সংজ্ঞা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বাতুলের প্রলাপ মাত্র কিন্তু এক অপূর্ব গদ্যরীতির পরিচয় এই গ্রন্থটিতে আছে। রাসকিন এই অদ্ভুত সমালোচনায় বিব্রতবোধ করলেন এবং অদৃষ্টের পরিহাস এমনই যে যাঁদের পক্ষ অবলম্বন করে তিনি যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন তাঁরাই গ্রন্থটিকে তেমন সুনজরে দেখলেন না। এমন কি টার্নার, যাঁর শিল্পকলার বিশদ ব্যাখ্যায় রাসকিন তাঁর লেখনী মুখর করেছেন তিনিও তেমন উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। বিমর্ষ রাসকিন ১৮৪৫ সালে ইতালির পথে পাড়ি দিলেন। উদ্দেশ্য, সারা ইতালীর কলাশিল্প দর্শন এবং মডার্ণ পেণ্টার্সের দ্বিতীয় খণ্ডটির প্রস্তুতিকরণ। বেল্লিনী ও ভিনিশিয়ান ঘরোয়ানার চিত্রাবলী, ফ্রা এ্যাঞ্জেলিকো ও প্রাচীন টুস্কানদের শিল্পকর্ম্মের আলোচনায় দ্বিতীয় খণ্ডটি সম্পূর্ণ হল এবং ১৮৪৬ সালে প্রকাশিত হল। তখন রাসকিনের মতবাদ পাঠকসমাজ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরা স্বীকার করলেন যে এমন কাব্যময় গদ্যের পরিচয় বিশ্বসাহিত্যে বিরল। ইতিমধ্যে কোয়ার্টারলি রিভিউ এবং অন্যান্য পত্রিকার জন্য কয়েকটি প্রবন্ধ রাসকিন লিখেছিলেন, সেগুলি "দি সেভেন ল্যাম্পস অব আর্কিটেকচার গ্রন্থটিতে রাসকিনের নিজস্ব কয়েকটি এচিং সন্নিবেশিত করা হয়।

১৮৪৮ সালের দশই এপ্রিল রাসকিন, ইউফেমিয়া শালমার্স গ্রে নাম্নী এক সুন্দরী মহিলার সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কিন্তু ইউফেমিয়ার অন্তর সুন্দর ছিল না যার ফলে রাসকিনের বিবাহিত জীবন বিষাদময় হয়ে ওঠে। ছয়বৎসর পরে ইউফেমিয়া বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন। রাসকিনের জীবনে ইউফেমিয়া দ্বিতীয় অভিশাপ। মডার্ণ পেণ্টার্সের পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির রচনাকালে তিনি অপর একটি বৃহৎ রচনায় হস্তক্ষেপ করেন এবং ১৮৫১ সালে (লণ্ডনে তখন এক বিরাট প্রদর্শনী চলছিল) "দি স্টোনস অব ভেনিস" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। বত্রিশ বৎসর বয়স্ক রাসকিনকে বিদগ্ধ কার্লাইল অনুরোধ করেন যে বিষয়ের ছেদ যেন এখানেই না হয়। গ্রন্থটিতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অঙ্কিত কয়েকটি অপূর্ব এনগ্রেভিং সন্নিবেশিত হয়ে তার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করে। ১৮৫৩ সালে দি স্টোনস অব ভেনিস গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। এই সময়ে রাসকিন শ্রমিককুলের কর্ম্মসংস্থান ও তাদের জীবন যাপন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে থাকেন এবং একের পর এক প্রবন্ধে তাদের দুরবস্থার কথা প্রকাশ করেন।

সমাজ সংস্কারের কাজে রাসকিন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন ১৮৬০ সালের

পর যখন মডার্ণ পেন্টার্স পাঁচটি বৃহৎখণ্ডে সম্পূর্ণ হয়ে চিন্তাজগতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আস্বাদ বয়ে আনে তখনই রাসকিন অর্থনীতির গোলক ধাঁধার অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। কর্ণহিল ম্যাগাজিনে "আনটু দি লাস্ট" নামে একটি ধারাবাহিক রচনার কিয়দংশ ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হতে থাকে। সমাজ সংস্কারের ভিত্তিতে রচিত প্রবন্ধগুলি পুনরায় প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধগুলির মূল বক্তব্য হ'ল স্বার্থপরতা ত্যাগ এবং পরস্পরের প্রতি সৌহৃদ্যপূর্ণ সহযোগিতা সাহায্যে জীবনযাপন, কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ধারকগণ হট্টগোলের সাহায্যে প্রবন্ধগুলি কর্ণহিল ম্যাগাজিনে মুদ্রিত না করতে বাধ্য করায়। কিন্তু রাসকিন দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ১৮৬২ সালে ফ্রেজার্স ম্যাগাজিনে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। প্রায় দশ বৎসর পরে "মুনেরা পালভারিস" নামক সংকলন গ্রন্থে প্রবন্ধগুলি একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়।

অর্থনীতি এবং সমাজ সংস্কারের ভিত্তিতে রাসকিন বহু জায়গায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাগুলি কয়েকটি সংকলন গ্রন্থে প্রকাশিত হয়—"সিসেম এণ্ড লিলিজ" (১৮৬৫) দি এথিকস অব দি ডাস্ট এবং "দি ক্রাউন অব ওয়াইল্ড অলিভ" (১৮৬৬)। সাণ্ডারল্যাণ্ডের শ্রমিক টমাস ডিক্সন রাসকিনের কাছে এক চিঠিতে সমাজ সংস্কারের বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেন, সেই সূত্রে তাঁরা ক্রমাগত পত্রালাপ করেন। ডিক্সানের প্রশ্নের উত্তরে রাসকিন সমাজ সংস্কার, অর্থশাস্ত্র এবং শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতবাদ জ্ঞাপন করতেন। তাঁর এই চিঠিগুলি যথাক্রমে টাইম এণ্ড টাইড বাই উয়ের এণ্ড টাইন" ১৮৭২ ও "ফোর্স কালভিগেরা ১৮৭১-৮৪ নামক সংকলন গ্রন্থদুটিতে স্থান পায়। বিদগ্ধ জনের মতে গ্রন্থদুটি রাসকিনের গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কেবল তাই নয় তাঁর উপদেশের ভিত্তিতে গিল্ড অব সেন্ট জর্জ্জ সমিতি গঠিত হয়। সংস্থানটি গঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হল শিক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগিতা।

ইতিমধ্যে রাসকিন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কলাবিদ্যা বিষয়ে বক্তৃতাদানের জন্য ১৮৬৯ সালে আমন্ত্রিত হন। কলাবিদ্যার পশ্চাদপটে রিক্ত এবং দারিদ্র্য জর্জ্জরিত মূক মানবজীবনের যে স্বরূপ উদ্ঘাটন রাসকিন করেন তা মর্ম্মস্পর্শী কিন্তু অসুস্থতার জন্য তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তারপর তিনি সমাজ কলাণের কাজে ব্রতী হন এবং ১৮৮৭ সালের মধ্যে তাঁর সঞ্চিত অর্থ দুই লক্ষ পাউণ্ড নিঃশেষিত হয়। এই সময় রাসকিন তাঁর আত্মজীবনী "প্রেটার্শিয়া" রচনায় মনোনিবেশ করেন। শেষ জীবনে মানব কল্যাণে নিঃস্ব রাসকিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রকাশকদের দরজায় ধর্ণা দিতেন এবং অবসর সময়ে প্রেটার্শিয়োর জন্য বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থনে ব্যাপৃত থাকতেন।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম রোমাণ্টিক মানুষ রাসকিন মাত্র দুদিন শয্যালীন থেকে ১৯০০ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখ নিঃশব্দে মরজগৎ ত্যাগ করেন। ওয়েষ্টমিনিস্টার এ্যাবিতে রাসকিন পরিবারের জন্য নির্দ্দিষ্ট যে সমাধিক্ষেত্র আছে সেখানে রাসকিনের স্থান হয়নি কারণ তাঁর স্বজনরা তখনও সামন্ত তন্ত্রের ধারক সুতরাং রাসকিন তাঁদের কাছে সমাজদ্রোহী অতএব এ্যাবিতে তাঁর স্থান হতে পারে না। মৃত্যুপথ যাত্রী রাসকিন ব্যথিত হৃদয়ে এ সংবাদ শোনেন এবং অন্য এক সমাধিক্ষেত্রে নিজের শেষ শয্যার ব্যবস্থা করেন। তাই সৌন্দর্য্যের পূজারী ও মানবতাবাদী রাসকিনের মরদেহ তাঁর মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুযায়ী কাজিন্টন চার্চ্চের সমাধিক্ষেত্রে অদ্যাবধি সমাহিত।

অজিত দাস

প্রেমের চর্বিতচর্বণে বাংলা সাহিত্য

বর্তমানে বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে—কিন্তু বলতে বাধা নেই যে সে সব পরীক্ষা শুধু মাত্র আংগিক নিয়েই।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে কী বলবো এর চেয়ে কেমন করে বলবো এ প্রশ্নটাই সাহিত্যিকের প্রধান বিচার্য বিষয়। অন্ততঃ এই শতকের সাহিত্যিকদের কাছে। বিষয় যাই হোক না কেন বলার ভংগীর ওপরই নির্ভর করে কোন রচনা সাহিত্য পদববাচ্য হোল কী না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাহিত্য রচনায় বিষয়বস্তুর কোনই মূল্য নেই। একই বিষয় বস্তুকে নানা আংগিকে বার বার পরিবেশন করলে তার চমৎকারিত্ব অনেক খানি লোপ পায়।

বর্তমান শতকের বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে অধিকাংশ সাহিত্যিকের বক্তব্যই একটি মাত্র বিষয় বস্তুতে সীমাবদ্ধ। তা হচ্ছে প্রেম অথবা প্রেমঘটিত নানা সামাজিক ও মানসিক সমস্যা। অবশ্য একথা অস্বীকার করছি না যে প্রেম আমাদের হৃদয়বৃত্তি গুলির মধ্যে একটি মৌলিক স্থান অধিকার করে আছে। মানব হৃদয়ের সুকুমার দিকগুলি অধিকাংশই প্রেমাশ্রিত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে কাব্যে প্রেমের আধিপত্য দেখলে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু গদ্য সাহিত্যে কেন তা হবে?

বস্তুতঃ প্রেমের মহিমা একটুও ক্ষুন্ন না করেই বলা যায় যে এ ছাড়াও মানব জীবনের নানা দিক রয়েছে—রয়েছে হৃদয়বৃত্তির নানা শাখাপ্রশাখা, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান বাংলা সাহিত্যে (হাল ফিলের দু চারজন তরুণ লেখককে বাদ দিলে) মানব জীবনের অন্য সব দিক-গুলো প্রায় উপেক্ষিত।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথকে প্রেমের কবি বলা গেলেও গদ্য সাহিত্যে তিনি নিজেকে শুধু প্রেমের গন্ডীর ভেতরই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর 'গল্প গুচ্ছের' অনেক গল্পই মানব জীবনের অন্যান্য নানাদিক নিয়ে রচিত। বিসর্জন বউঠাকুরাণীর হাটে প্রেম হয়তো আছে—কিন্তু মুখ্য বিষয় বস্তু নয়। শেষের যুগের নাটকগুলিতো তত্ত্ব-প্রধান। উপন্যাস গুলির মধ্যেও, অন্তত, গোরাতে প্রেম মুখ্য বিষয় বস্তু নয়।

একটি বিষয় বস্তুর ওপর এতটা ঝোঁক দেওয়ার ফলে, বলাই বাহুল্য, আমাদের বর্তমান সাহিত্যে বৈচিত্র্যের অভাব দেখা দিয়েছে। সাহিত্যের গতিও হয়েছে একপেশে। এ অবস্থা যদি আরো কিছুকাল চলে তবে ভারতীয় সাহিত্যের দরবারে বাংলা সাহিত্যের গৌরবের আসন শীঘ্রই টলে উঠবে। অনুবাদের মাধ্যমে যতটুকু জানা যায়, মনে হয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাহিত্যে প্রেমের এমন একাধিপত্য নেই। আর বাংলা সাহিত্যে-ভ্রমণ কাহিনীতেও প্রেমের মিশাল না দিলে চলে না।

এই অবস্থার জন্য দায়ীকে? লেখক, না পাঠক,

পাঠকের দায়িত্ব যে এ বিষয়ে অনেকখানি সেকথা অস্বীকার করা যায় না। প্রেম কাহিনী বাংলা দেশে চলে ভালো—যে কোন গ্রন্থ প্রকাশকই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। বর্তমানে বাংলা দেশে যে কজন লেখককে জনপ্রিয় আখ্যা দেওয়া যায় তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রেমকেই প্রধান উপ-

জীব্য করেছেন। কিন্তু এটাও সত্যি যে লেখকেরা যদি জীবনের অন্যান্য দিক গুলি নিয়ে সার্থক রচনা আমাদের উপহার দেন তবে পাঠকেরা, অন্তত সৎ পাঠকেরা, নিশ্চয়ই সেগুলির যথাযথ মূল্য দেবেন। হয়তো সাধারণ পাঠকেরাও উদাসীন থাকবেন না। শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি বা বিন্দুর ছেলে কী গৃহদাহ বা চরিত্রহীনের চেয়ে কম জনপ্রিয় ছিল?

অবশ্য একথা আমি বলছি না যে গল্প উপন্যাস হতে প্রেম কে নির্বাসিত করা হোক। সাহিত্যের বিষয়বস্তু হিসেবে প্রেমের যে গৌরবের আসন তা চিরকাল অটুট থাকবে—অন্তত, মানব প্রকৃতি যতদিন না বদলায়। কিন্তু প্রেম কে গৌরবের আসন দেওয়া যেতে পারে, তাই বলে একাধিপত্য দেওয়া হবে কেন?

বস্তুত, আধুনিক কালে প্রতিটি মানুষের জীবন নানাদিকে এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের মন এমন জটিল ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছে যে সেক্ষেত্রে শুধু মাত্র প্রেমের ওপর জোর দেওয়াটা নেহাৎ অবাস্তব হবে। অথচ আজ কালকার বাংলা সাহিত্যে ঠিক তাই ঘটেছে। কোন বিদেশী পাঠক যদি আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য উল্টে পাল্টে দেখেন তবে তাঁর এই ধারণা হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয় যে এদেশের নর-নারীরা প্রেম করা ছাড়া অন্য কিছুই জানে না। কিন্তু বাংলা দেশের বর্তমান চেহারাটার দিকে চোখ ফেরালেই কী বোঝা যাবেনা যে এমন একটা ধারনা কতটা অমূলক? বোঝা যাবেনা কী যে আমাদের জীবনের হাজারো সমস্যার মধ্যে শুধু একটিই প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে?

কেন বাংলা দেশের লেখকেরা এই একপেশে মানসিকতা কাটিয়ে উঠতে পারছেন না? তারা কী মনে করেন প্রেম ছাড়া মহৎ সৃষ্টি সম্ভব নয়? তা যদি মনে করেন তবে ওঁদের দৃষ্টি, উদাহরণ স্বরূপ, পশ্চিমী লেখক, কাফ্‌কার রচনার প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই। এই লেখকের "মেটামরফাসিস" গল্পটি বিশ্বের গল্প সাহিত্যে অতুলনীয়। কিন্তু শুধু এই গল্পে নয়, কাফ্‌কার অন্যান্য রচনায়ও প্রেম অনুপস্থিত। হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনসম্বন্ধের বিবরণ রয়েছে কিন্তু তা তো প্রেমের সমগোত্রীয় নয়। অথচ এঁর প্রতিটি রচনা শুধু বিশেষ অর্থবহই নয়,—এদের রচনা ভংগীও অতুলনীয়। তারপর আরেকজন প্রসিদ্ধ পশ্চিমী লেখক আলবেয়র কামুর নাম ও এ প্রসংগে করা যেতে পারে। কামুর 'দি ফল' 'প্লেগ' প্রভৃতি বিশ্ব-বিখ্যাত রচনার নায়কদের আত্মিক সমস্যা, আর যাই হোক, প্রেম ঘটিত নয়। অথচ বিশ্বসাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁর অবদান কে অস্বীকার করতে পারবে?

"এন কাউন্টার" পত্রিকায় প্রায়ই আধুনিক পশ্চিমী কখনো কখনো বা এশীয় লেখকদের ছোট গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্প গুলি থেকেও বোঝা যায় যে ওদেশে সাহিত্যিকেরা বিষয়-বস্তুর সন্ধানে মানব জীবনের অলিতে গলিতে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমাদের অধিকাংশ লেখকই তো পশ্চিমী সাহিত্যের সংগে অল্প বিস্তর পরিচিত। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই দৈন্যের দিকে কেন ওঁদের চোখ পড়ে না?

বস্তুত, এই পৃথিবীতে আদি রসাশ্রিত সম্বন্ধ ছাড়া মানুষে মানুষে আরো কত প্রকার সম্বন্ধের অবকাশ রয়েছে—কত বিচিত্রই না হতে পারে পারিপার্শ্বিকের সংগে মানবাত্মার নিরন্তর সংগ্রামের কাহিনী। এমন কী প্রকৃতি বা জীব জগতেও ছড়িয়ে আছে কত সাহিত্যের উপাদান অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ লেখকই এখনো প্রেমের চর্বিত চর্বণে ব্যস্ত। এই একপেশে দৃষ্টি কী ওঁরা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, যদি না পারেন তবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতির আশা ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হবে সন্দেহ নেই।

মীরা বালসুব্রমণিয়ন

একটি প্রদর্শনী দেখে

অন্বেষণে জীবনের প্রকাশ। শিল্পীর আত্মজিজ্ঞাসার পিপাসা বিচিত্র ভাব বৈচিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তখনই যখন সে জীবনের চলমান অস্থিরতাকে জীবন জিজ্ঞাসার পথে চালিত করে। ভারত আর আর শিল্প মাধুর্য্য শিল্প জ্ঞান সঞ্চয় করেছে বিভিন্ন যুগে। আর্য্য থেকে মোগল সব কিছুতেই এই অন্বেষণ ছড়িয়ে আছে। সেই পুরাতনী সঞ্চয়ের তহবিল আর আধুনিক অন্বেষীমন দুইয়ের যোগফল সব কিছুতেই নতুন চিন্তাধারার কথা বলেছে। যদিও ধর্মের উৎসাহিত রথচক্র শিল্প জিজ্ঞাসার পথে জীবনের কোথায় মূল তাই আবিস্কারে মানবমনের বিচিত্র রস সম্ভারকে পরিবেশন করেছে। তবুও মানব মানবীর আদিম সংযোগ, তাদের দেহগত আবেদনের পথে বিরহ মিলনের সুখানুভূতি শিল্পের পুষ্পসঞ্চয়ে সমৃদ্ধ। নরনারীর দেহের আবেদনকে শুদ্ধতার, বিচিত্রতার আস্বাদন দিয়ে ভারত শিল্প তার মহান ঐতিহ্য সংযোগ এক বিচিত্র কর্মকান্ডের উপস্থাপনা করেছিল। বিশুদ্ধতায় সেই উপস্থাপনার তুলনা পাওয়া ভার। একথা সর্বদাই স্বীকার্য্য যে মনের আদিম গুহায়িত সর্পিল পথে আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি বিশেষতঃ দেহগত আবেদনে সম্ভূত বিচিত্র ভাব মন্ডলী সব সময়েই কার্যকরী এবং শিল্প সৃষ্টির পথে তা এক প্রচন্ড জিজ্ঞাসা। এই জীবন জিজ্ঞাসার পথে যৌবন মধুরতা, নরনারীর কামনার মিলন ভারতশিল্প এক অদ্ভুত শিল্প বৈচিত্র দিয়ে মন্ডিত করেছিল। আধুনিক যন্ত্র-বিশ্বাসীমনে এই শিল্প বৈচিত্র বৈজ্ঞানিকযুক্তিতে খন্ড বিখন্ড কেননা ওই শিল্প বৈচিত্র অনুভূতির পথে আপন সত্য আবিষ্কারে উৎসাহিত ছিল। কিন্তু এ যুগে সেই অনুভূতি নিঃসৃত জীবন জিজ্ঞাসার নতুন রূপ কল্পনা বর্ত্তমানে শিল্পীর তুলিতে প্রকাশ পাচ্ছে। যদিও এই প্রকাশ যুক্তি এবং বুদ্ধিগত ভাববিকাশেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তবুও যুক্তির পথকে অমান্যকরে আবেগের পথে উচ্ছ্বল প্রাণ চাঞ্চল্যের পথে এই বিচিত্র অনুভূতিকে প্রকাশ করার চেষ্টাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ভারতশিল্পের এক বিরাট অংশ কামসূত্র উদ্ভাবিত সুখানুভূতির বিচিত্র কল্পনাকে মূর্ত্তি শিল্পে উপস্থাপিত করেছিল—কিন্তু ক্লাসিক সৌন্দর্য্য বিলাসী মন তাদের কাম ও মিলন সম্ভূত রস-মাধুরীকে অন্যএক জগতের সৌন্দর্য্য মন্ডনের ভাষায় রূপায়িত করেছে। সেখানে নরনারীর মিলন সঞ্জাত রূপ মাধুরীতে তারা অভিষিক্ত হয়েছিল বটে তবে তাকে জগত সৃষ্টির এক বিচিত্র অনুভূতিতে প্রকাশ করেছে। সৃষ্টি আর জীবনের বীজ ভারত শিল্প জিজ্ঞাসায় যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেখানে কামনা বাসনার মিলন মুহূর্ত্তগুলি বিশ্বের আদিম সৃষ্টির রহস্যের কথাই বলেছে। এক হিসাবে এক কেন্দ্রিকতাকে সৃষ্টির আদিম উৎস মুখ অন্বেষণে বহুজন আনন্দ অভিষিক্ত এক বিচিত্র অনুভূতিকেই প্রধান করেছে। ভারত শিল্প জিজ্ঞাসায় যে ভাষা ব্যক্ত হয়েছে সে ভাষায় নর নারীর মিলন মুহূর্ত্তের কথা বলা হলেও বিশ্বের বিরাট সৃষ্টিতত্বের মূল অন্বেষণে সেই মিলন মুহূর্তগুলি বিশেষতঃ ভাবে বিজ্ঞাপিত নয়। প্রতীক শিল্প রচনার মধ্যে সেই রসবৈচিত্র নরনারীর মিলন সম্ভূত রূপমাধুরীতে এক বিরাট সৃষ্টি রহস্যের কথা প্রকটিত করেছে সেখানে সেই মিলনে সঞ্জাত রূপ বৈচিত্র বিরাট বিচিত্রতার কাছে

শুধুমাত্র এক খণ্ড অভিজ্ঞতা বিশেষ। মন শুধুমাত্র এখানেই সীমাবদ্ধ নয়—সে তার মর্ত্ত্য সীমার পথ পার হয়ে অসীম কোন কিছুর প্রতি নির্দেশ করেছে। দেহ মিলনের কথাটিই প্রধান নয়। দেহগত মিলন ছাড়াও বিশ্ব বিচিত্রতার মধ্যে যে সৃষ্টির বীজ উপ্ত—সেই জীবনের প্রকাশই কাম্য। কিন্তু—এই জগতের সীমার মধ্যে এই দেহগত মিলন কামনার যে প্রতীক ধর্মিতার কথা বেড়ে ওঠে—শুধুমাত্র, তাকেই প্রকাশ করলে সে শুধু ব্যক্তিগত এক বিশেষ চেতনার কথা বলবে কিন্তু সে চেতনা যদি ব্যক্তিকে পার হয়ে বিশুদ্ধতায় শুদ্ধ হয়ে বিশ্ব সৃষ্টির কথা না বলে তবে তা শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার কথাই লিপিবদ্ধ করবে। তাই আবেগ চাঞ্চল্য দিয়ে অনুভূতির পথ প্রশস্ত হলেও এই আবেগ অনুভূতিরও একবিশেষ যুক্তিও যে বর্তমান তা ভারতশিল্প প্রমাণ করছে। সেই অনুভূতির যুক্তিকে অস্বীকার করলে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। যদি একথা মেনে নিতে হয় যে অনুভূতি সম্ভূত যে রূপদর্শন তার থেকে আধুনিক যুক্তিমত নিঃসৃত শিল্প সচেতনতা অনেকাংশ অগ্রসর মনোবৃত্তির পরিচায়ক তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের ভুল হবে। নরনারীর দেহগত বিচিত্র লীলা মাধুর্য্য বিশ্বপ্রকৃতির লীলা মাধুর্যেরই এক খণ্ডিত অংশমাত্র। তাই জন্ম রহস্য আর সৃষ্টিতত্ত্বের মূলসূর অন্বেষণ করতে এই দেহ মিলনের বাস্তবতাকে রূপ মাধুরীতে অভিষিক্ত করেছে আর এই বাস্তবপন্থী মিলনের কথার মধ্যেই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি রহস্যের মূল সূর বিধৃত। তাই দেহগত মিলনের রূপ অপেক্ষা অন্যতর কোন রূপ দর্শনে শিল্পী মোহিত। কিন্তু যে চিত্রে শধুমাত্র—কামসূত্র বিন্যস্ত, সেখানে মন যখন এই দেহবাসনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ সুখানুভূতিতে আকৃষ্ট তখন অন্যতর কোন জগতের কথা আশা করা বৃথা। সেখানে অন্বেষী মন শুধুমাত্র এই দেহগত বাহ্যিক কামনা বাসনায় আবৃত। তাই স্থাবর। আকৃষ্ট সংলগ্ন দ্বৈত ত্রিভুজ সঙ্গম এবং তার অন্তর্গত বিন্দুর স্থাপনা ভারতশিল্পকলায় এক বিচিত্রভাব প্রদানকারী। সৃষ্টিকারী ঈশ্বর বিশ্বাসীমন ওই মধ্যস্থ বিন্দুতে বিশ্বচরাচরে অজ্ঞেয় আনন্দ অনুভূতির কথা প্রকাশ করেছে। দেহ থেকে যা সৃষ্ট তার অদ্ভুদ সৃষ্টি হবার পথ সবই ভারতশিল্পে অন্যতর জগতের প্রতি নির্দেশ জানায়। কেননা শিল্পী দার্শনিক সেখানে জগতের দেহবন্ধনের আকর্ষণের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা-মাধুর্য্য কল্পনা করেছে। তাই দেহগত হলেও সে শিল্প দেহের সীমাবদ্ধতাকে অসীম রূপ কল্পনার প্রতি ইঙ্গিত জানায়।

পৃথীশ গাঙ্গুলী ও রবীন মণ্ডলের চিত্রপ্রদর্শনী

নগ্নতাই শিল্প। ভদ্রতা, সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়াজালের নির্মোক শিল্প শক্তির ব্যাপকতা লাভের পথে অন্তরায়। ভদ্রতার বিনয় নম্রতায় অবনত শিল্প কাজ চাই না। ভদ্রশিল্প আমাদের আত্মমর্য্যাদার প্রতিষ্ঠার পথে হন্তারক। বক্তব্যবিষয়ে বলতে গেলেই অজস্র সংস্কারের কাঁটাতারে মন ক্ষত বিক্ষত হয় আর তা ঢাকতে যে দীন শিল্প সৃষ্টি করি তা আমার কথা অত্যন্ত ক্ষীণভাবে প্রকাশ করে। আমার মনটা তো অন্ত্যজ নয়। তার একটা সবল চাহিদা আছে। বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেও আর হৃদয়বৃত্তির দিক থেকেও। আপন মনের পথনির্দেশ মেনে এদের মধ্যে বলিষ্ঠ সংযোগ করাতে গেলেই হৈ হৈ উঠবে। বলবে, গেল গেল সব গেল। অপরিণত বয়স্ক অর্বাচীনতার জ্বালায় শিল্প মাথায় উঠলো। এ'দের একটা কথা কিছুতেই মনে থাকে না যে শিল্প সৃষ্টিতে মনের আদিমতম সর্পিল গুহায় নগ্ন সৌন্দর্য্য বিলাসী যে আত্মার কারুকার্য্য

আছে তাকে সর্বতোভাবে বর্জিত করলে সময়ের সঙ্গে বোঝা পড়ার দিকটা ভুলতে হবে। সময়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াতো দূরের কথা সাধারণ ভাবেও আমার আত্মার মুক্তির উপায়ও বিনষ্ট হবে। কঠিন, গর্বিত, রেখার তীক্ষ্ম আবেষ্ঠনীতে মাংস, মেদ এবং রক্ত ও তন্তুর সমবায়ে যে দেহের গতি সম্বন্ধ নির্দিষ্ট হচ্ছে তাকে আত্মার গঠনমধ্যে প্রকাশ করাই শিল্পের প্রধান কাজ। এই আত্মার প্রকাশের সঙ্গে শিল্পীর মনঃ সংযোগ যদি গঠিত হয় তবে আশাপ্রদ কিছু পাব। নচেৎ নয়।

প্রচলিত অর্থে ড্রইং বলতে যাকে বোঝায় তা নির্মোকের বাইরের রূপ। নির্মোকটা আমার আত্মার প্রকাশ হতে পারে না—। তাই নির্মোকের রেখাবন্ধনী সত্যকার রেখা বন্ধনী নয়। তাই মনের সঙ্গে যে পাঞ্জা কষাকষি আছে তাকে অসত্য করে তুলি। মিথ্যাভাষণে পটু শিল্প সৃষ্টি চাই না। তাই যে কথাটা আগে মনে পড়ে তা হলো যে নির্মোকটা আত্মার একটা উপহাস মাত্র। উপহাস নিয়ে শিল্প সৃষ্টি চলে না। সস্তা কার্টুন আঁকা চলে। ভদ্রতা, সামাজিক বিধি নিষেধের কত কি নির্মোকে আঁকা আছে। তাকেই আবার শিল্পে আমদানী করলে পাব কি। হায় ঈশ্বর, আমরা নির্মোকেই বিশ্বাসী। এই নির্মোকটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে নগ্ন মনটার বিশ্বগ্রাসী রূপচর্চাকে একবার রেখাতে রংএতে আনতে পারলে আর কি বাকি থাকে। যতই হাত সেখানে কাঁপুক, যতই রেখা অপরিণত হোক তবুও সিসমোগ্রাফের মতই কম্পিত রেখাঙ্কণে সেই নগ্ন মনটার ছিঁড়ে ঘুটে ফেলা বিরাট প্রকাশের কিছুতো পাব। মুখোশের বদলে অপরিণত হাতের এই অভিজ্ঞতাই ভালো। অন্ততঃ মনটার ছটফটানির কিছুতো হাতে হাতে পাওয়া যাবে। পৃথ্বীশবাবু চেষ্টা করেছেন। সেই চেষ্টার কিছু ছাপ নগ্ন মনটা ধরব ধরব করেছে। যদিও টোটাল ফর্ম বলতে যা বুঝি তা সেখানে ক্ষীণ। তবুও আত্মিরিকতার স্বাক্ষরে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। তবে আরও খুশী হতাম যদি না ভাবতাম এগুলো কবিতার ভাবানুবাদের পরিপূরক। কারণ ছবি এবং কবিতা দুইয়ের স্পিরিচুয়াল গত একটা বৈষম্য আছে তাকে অস্বীকার করলে ছবির বিশেষ ব্যাপারটাকেই অস্পষ্ট করে তোলা হয়। এই অস্পষ্টতাও পৃথ্বীশবাবুর ছবির এক দোষ। এখানে তাঁকে ভালো লাগে নি। তাঁকে দেখতে চাই শিল্পী হিসাবে—নগ্ন মনটার প্রতিকৃতি আঁকিয়ে হিসাবে। এই হিসাবে নগ্নতায় নিমগ্ন রবীনবাবু অনেকবেশী। আর সেই জন্যেও তাঁকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। লাল, মেটে লাল, খানিকটা নীলের আভায় ছবিগুলোকে অন্য এক জগতের প্রতিকৃতি বলে মনে হয়। প্রচলিত ড্রইং-এর মার প্যাঁচ রবীন-বাবুর চিত্রকথার মূল কথা নয়। সেখানে অনুভূতির জগতে যেমন ইশারা পেয়েছেন, তেমনি-ভাবেই সেই উড়ে যাওয়া রেখাকে তুলিতে আকৃষ্ট করেছেন। হয়তো এই তুলিতে ভাবানুবাদ করবার সময়ে সব সময়ে সক্ষম অনুবাদ আমরা পাইনি, তবুও মানসিকতার একটা স্পষ্ট ছাপ ছবির এক বিশেষ সম্পদ। যা ভালো লাগে তাকে আঁকতে আনন্দ এই কথাটা জোর করে, গায়ের জোরে যে শিল্পী প্রমাণ করেন নি তাতেই আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। পৃথ্বীশবাবুর রেখা এখনও তীক্ষ্ম, সুচতুর, বঙ্কিম ভঙ্গিমায় মগ্ন হতে পারেনি—সেখানে ইনোসেন্ট মনের একটা ছাপ বেশ স্পষ্ট অনুভূত হয়, কিন্তু দুর্বার তরঙ্গ খাতে রেখার বন্ধনী কম্পমান হতে পারে নি। ইমোশন সর্বদাই প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু রবীনবাবুর ঋজু রেখার বিভিন্ন তাল, মাত্রা এবং স্পেস পরিকল্পনা মনের আনন্দকে বেশ রসঘন করেছে। তবে এখানে একটা বক্তব্য আছে। ছবির রস আস্বাদনে রেখার বিভিন্ন গতি বিশেষ দায়ী। রং তার অসীম কল্পনার ডানা বিস্তারে মুগ্ধ করে—সীমাহীন কিছুর প্রতি ইশারা করে, কিন্তু রেখার বিচিত্র বন্ধনীতে সেই রং এর মেঘলা আমার মনে বিচিত্রতার স্বাদ এনে দেয়। এই ক্ষেত্রে কিছু ছবিতে রেখাগুলি

কঠিন, দানবীয় বলে মনে হয়। তারাই ছবিতে প্রধান আর সবই অপ্রধান। এতে করে শিল্পীর আসল বক্তব্যটিতে রে রে শব্দে রেখা গলাটিপে ধরেছে। সেখানে একটির সমতাল থেকে অন্য ভঙ্গ তালে চোখ ফেরাতে যথেষ্ট কষ্ট হয়। চোখের তারা খেলিয়ে তবে ছবির বিষয় উদ্ধার করতে হয়। সেখানে একটি রেখা এক একটি দেওয়াল হয়ে উঠেছে। রবীনবাবুর মনের কথা সহজেই বুঝতে পারি—কিন্তু চিত্রের যে স্পিরিচ্যুয়ালগত আবেদন আছে তাকে আস্বাদনের বাধা থাকছে প্রচুর এই কঠিন রেখা বন্ধনীর কিছু কিছু উদাহরণের জন্যে। এছাড়া বিচিত্র ভঙ্গিমায় নগ্ন মনটা সহজে নেওয়া যায়। বিষয় বস্তু নির্বাচনেও তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন জাপানী শিল্পীদের মতই। তবে তাঁকে ধন্যবাদ, কেননা তিনি নির্মোক দেখেই থমকে দাঁড়ান নি—নগ্নতার বিশাল, অসীম রূপ কল্পনায় নিমগ্ন হতে পেরেছেন। পৃথ্বীশবাবুকেও সেই একই কারণে ভালো লেগেছে।

ক্লাইন।

টাসিস্ট শিল্পী ক্লাইনের মৃত্যু হয়েছে। ফরাসী দেশে এই শিল্পী যথেষ্ট পরিমাণে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। আন্দ্রে মার্লো তাঁর ছবির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রদর্শনীর দিন ফরাসীদেশের সংস্কৃতি মন্ত্রী মার্লো অসংখ্য নীল কাগজের টুকরো নীল আকাশ থেকে উড়িয়ে ছিলেন। ওই দিন এক বিশেষ নীল রং দিয়ে ডাক টিকিটের প্রচলন করেছিলেন। যা-হোক ক্লাইন বিশেষ ভাবে একটি নীল রং-কে ক্লাইন ব্লু বলে চালিয়ে ছিলেন এবং বর্তমানে টাসিস্ট আন্দোলনে এক বিশেষ চরিত্র বলে পরিগণিত হতেন। তাঁর জীবন্ত তুলিতে যে সব ছবি আঁকতেন তা নাকি বিশেষ উচ্চমূল্যে বিক্রী হতো। কাউন্টেস ইলিনা ভেরোনভিচ তাঁর জীবন্ত তুলি ছিলেন। এই কাউন্টেসের নগ্ন দেহের বুক থেকে হাঁটু পর্যন্ত ক্লাউন ব্লুতে ঢেকে দেওয়া হতো। তারপর শিল্পীর নির্দেশ অনুসারে মেঝেতে ফেলা রাখা ক্যানভাসের ওপর দিয়ে বুকে চলে ফিরে ক্লাইনের জীবন্ত তুলি এক বিচিত্র রৈখিক চেতনাকে রূপ দিতেন। শিল্পী বিচারে তাদের স্থান কোথায়, তা বিচারের ভার রসিকদের উপরেই থাক। তবে তাঁর মৃত্যুর জন্যে কিছু স্বার্থপর, হুজুকে লোকই দায়ী। তাঁর ছবির যথেষ্ট কদর পাবে আর তার দামও পাবেন অনেক—এই ভরসা দিয়ে ক্লাইনকে পথে বসিয়েছিলেন তথাকথিত কিছু চিত্র ব্যবসায়ী। কার্যকালে দেখা গেল ক্লাইন ধার করেছেন অনেক, টাকা পান নি একটাও, আর সেই ছল চিত্র ব্যবসায়ীরা সটকে পড়েছেন। কেউ তাঁরা ক্লাইনকে চেনেন না। তখন নিরুপায় ক্লাইন, আত্মহত্যা করেই সেই বিপদ থেকে মুক্ত হলেন। শিল্প সৃষ্টির ব্যাপারে ক্লাইন কি করতে পেরেছেন কিংবা কি করতে পারতেন তার প্রসঙ্গ না তুলেই বলা যায় যে ক্লাইন এক বিশেষ ইমোশ্যানাল শিল্পী। নতুন কিছু করবার এক বিচিত্র পদ্ধতি তিনি আবিষ্কারে মগ্ন ছিলেন। হয়ত পরে--এই শিল্পীই বিশ্বশিল্প ক্ষেত্রে বিশিষ্ট কিছু করে যেতে পারতেন। কিন্তু স্বার্থপর কতিপয় অসাধু লোকের অপরিণাম দর্শিতায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে—এই দুঃখে আমরা সকলেই দুঃখিত।

নিখিল বিশ্বাস

সুতানুটি সমাচার ॥ বিনয় ঘোষ। বাক সাহিত্য ৩৩ কলেজ রো—কলিকাতা ৯। বারো টাকা।

কলকাতার সহরে আজ প্রায় সত্তর লক্ষ লোক। তার আয়তন সেই পুরোনো সুতানুটি গোবিন্দপুর আর কলকাতা গ্রামের সীমানার মধ্যেই আজ শেষ নয়। কত বিচিত্র কর্মের কেন্দ্র-ভূমি হয়েছে এই সহর গত দুশো বছর ধরে। পূর্ব জগতের প্রাণচঞ্চল এই সহরের ইতিহাস যে কোন একটি রাজত্বের ইতিহাসের মতই চমকপ্রদ। আজকের এই সুগঠিত কলকাতা, তার অভিজাত অঞ্চলের বিলাসকেন্দ্রগুলি, তার ধনী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আকাশছোঁওয়া সৌধাবলী এর সংগে আগেকার কলকাতার কি তফাৎ। কেমন করে সেদিনের শিশু কলকাতা আজকের এই পরিণত তারুণ্যে এসে পৌঁছল তার পূর্ণাংগ ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি।

আলোচ্য গ্রন্থটি তিনজন বিদেশীর কলকাতার জীবন সম্পর্কে লেখা ডায়েরী ও পত্রা-বলীর অনুবাদ। উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা ১৭৪৯ থেকে ১৮০৯ পর্যন্ত, এলিজাফের কলকাতা থেকে লেখা কয়েকটি চিঠি, ফ্যানি পার্কসের ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮২২-২৮, এবং জ্যাক-মোঁর কয়েকটি চিঠি থেকে কলকাতার একটি যুগের সামাজিক ইতিহাস গঠনের চেষ্টা হয়েছে।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে সামাজিক ইতিহাস রচনার চেষ্টায় তিনি যে সব স্মৃতি-কথা ভ্রমণবৃত্তান্ত জাতীয় বই দেখেন সেগুলি সরকারী নথিপত্রের চেয়ে নানাদিক থেকে বেশী মূল্যবান। কারণ সেগুলি শুধু ঘটনার তালিকা নয়—সেগুলির মধ্যেই 'কালের পটভূমিতে মানুষের জীবনের স্পন্দন পর্যন্ত অনুভব করা যায়।' সেই সামাজিক ইতিহাসের সন্ধান করতে গিয়েই লেখক অনুভব করেছেন এই জাতীয় গ্রন্থগুলির প্রয়োজনীয়তা। তাই উপরোক্ত লেখা-গুলির বাংলা অনুবাদ একত্র করে সুতানুটি সমাচার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন।

বলা বাহুল্য এই লেখাগুলির রস বিশ্লেষণ এই সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়। কারণ প্রত্যক্ষ পঠনের আনন্দ সমালোচনার মধ্যে প্রত্যাশিত নয়। আমরা দু-একটি তথ্য ও কাহিনী এখানে উল্লেখ করে পাঠক সাধারণকে এই বইয়ের স্বরূপ জানাতে চেষ্টা করবো এবং এই বই পড়তে উৎসাহিত করবো।

উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথা নানা কাহিনীতে পূর্ণ যে কাহিনীগুলির 'হিউম্যান ইন্টারেষ্ট লক্ষ্য করবার মতো। নানা ধরণের, নানা স্তরের মানুষের সংগে তাঁর কি গভীর যোগাযোগ ছিল এবং জীবনকে তিনি কি আশ্চর্য রসদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ভূমিকায় অনুবাদক জানাচ্ছেন, "হিকি জীবন উপভোগ করতে জানতেন, বুঝতেন যে জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা এবং জীবনের কোন অভিজ্ঞতাকে তিনি উপেক্ষণীয় মনে করতেন না।" লাটের বাড়ির ভোজসভা থেকে বিচিত্র ধরণের আরো বহুতর অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন। এই জীবনাসক্ত মানুষটির লেখার মধ্যেও সেই উত্তপ্ত হৃদয়ের স্পর্শটুকু আছে বলেই আজও সে লেখা জীবন্ত।

তখনকার কলকাতায় ভারতীয় সমাজে ইউরোপীয়দের প্রভাব, তাদের ঔৎসুক্য এবং

ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার নানা বিচিত্র কাহিনী হিকি সাহেব রেখে গেছেন। কোন কোন অংশ এমনি নাটকীয় রসে পূর্ণ যে পড়তে পড়তে ভুলে যাই যে ইতিহাস পড়ছি, কোন নাটক নভেল পড়ছিনে। ফে ও পার্কাসের বৃত্তান্তগুলি সংক্ষিপ্ততর এবং হিকির বুদ্ধিদীপ্ত ঔজ্জ্বল্যের অভাব সেখানে অনুভব করা কষ্টসাধ্য নয়। তবু ছোটখাটো খুঁটিনাটি ঘটনার জালের মধ্যে ইতিহাসের বড় বড় ইঙ্গিত লুকিয়ে থাকে। যাঁরা ইতিহাসের ছাত্র তাঁদের কাছে এ কাহিনী তুচ্ছ ঘটনার স্মৃতিকথা বলে অবজ্ঞাত হবে না।

এলিজা ফে এদেশের নানা সামাজিক প্রথার উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সতীদাহ প্রথার অমানুষিক বর্বরতা এবং তার নামে নারীত্বের গৌরব ও মহত্ব প্রচারের কাহিনীকে তিনি তীব্র ধিক্কারের ভাষায় ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁর লেখার দু এক লাইন অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—"স্ত্রী হল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গহনা ও টাকা-কড়ির প্রাণহীন পোঁটলা-পুঁটলির মতন। মরার পর সম্পত্তিটি তিনি রেখে যেতে চান না, সঙ্গে নিয়ে যেতে চান। তার জন্যই সহমরণের প্রয়োজন, এবং শাস্ত্রবচনের আধ্যাত্মিক আস্তরণ দিয়ে এই হীন উদ্দেশ্য চাপা দেওয়াও দরকার। এই হল পতিভক্তি প্রণোদিত সহমরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা।" এ ছাড়া জাতিভেদ, ভারতীয় সন্ন্যাসী-দের আত্মশোধনের নিষ্ঠুর পদ্ধতি, চড়কপূজা প্রভৃতির বর্ণনায় এলিজা ফের সহৃদয়তা ও পর্যবেক্ষণশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছি।

ফ্যানি পার্কসের লেখা এলিজা ফের মতো চিঠির সমন্বয় নয়। এ হলো রোজনামচা। তাঁর লেখার মধ্যে রামমোহন রায়ের বাড়ির ভোজসভার বর্ণনা সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সেখানে নিকী বাইজীর উল্লেখ পাওয়া গেল। এবং রামমোহন রায় যে সমাজের ভয়ে মেকী আধ্যাত্মিকতার আবরণ টেনে সাধু সেজে বসেননি তিনি যে পুরুষসিংহের মতো জীব-নের প্রতি নিজের আসক্তিকে চরিতার্থ করেছিলেন তার কাহিনী পড়ে আনন্দ হলো।

দুর্গাপূজার বর্ণনাও পার্কসের লেখার মধ্যে আছে। আর আছে একটি সতীদাহের বিবরণ।

বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক ইতিহাস অনেক লেখা হয়েছে। রাজবংশের কাহিনী পরম্পরা বড় বড় ঐতিহাসিকরা বিধৃত করেছেন। কিন্তু সমাজের ইতিহাস, জাতির অন্তরঙ্গ ইতিহাস (যতটুকু রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে স্বভাবতঃই এসে যায় তার বেশী) বিশেষ কেউ রচনা করেন নি। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা বিনয় বাবুর সুদীর্ঘকালের সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টার সংগে খাপ খেয়েছে। ইতিহাস চর্চার এই ধারায় তার কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুতানুটি সমাচার বাংলার সামাজিক ইতিহাস সাধনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

সৌমেন্দ্রনাথ বসু

ছাতাবাহার। গিরিজাপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। রেডিয়েন্ট প্রসেস। ১৫৫, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৪ থেকে প্রকাশিত। মূল্য ২·৬০ নঃ পঃ।

আবোল-তাবোল কিংবা খাই-খাই বা উড়কি ধানের মুড়কি জাতীয় ছড়ার বইকে বহুদিন অব-লীলায় বাজারের অন্য পুস্তক থেকে আলাদা করে নেওয়া গেছে। সুনির্মল বসুর কিছু ছড়া

ভিন্ন এতাবৎ অন্য কোনো বইকে সেই একই সারিতে রাখা সম্ভব হয় নি। অবশ্য শিশুদের জন্য ইদানীং লেখার ঝোঁকই কিছু কম—যাও বা দৃষ্ট, তাতে স্নেহ নেই বা বুদ্ধির রসের জোগান নেই। সম্প্রতি আমার এক বন্ধু কিছু ছড়া লিখেছিল কবি জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়-এর এই ছড়ার স্বাদ প্রতিভাকেই স্পর্শ করায়; কিন্তু সংখ্যায় খুব কম বলে তা এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। আবোল-তাবোল বা খাই-খাইতে ছড়ার উপরও কিছু আছে—তাহল ছবি; শিশুদের আজগুবি দেশে নিয়ে যাবার মতো অনন্য চিত্রাবলী এবং তাদের বিশ্বাসযোগ্য চোখকে বিস্ময় মুগ্ধ করবার মতো রঙ।

ছাতাবাহার সম্প্রতি প্রকাশিত এমনই একখানা ছড়ার বই। যাতে লেখকের স্নেহের সঙ্গে রঘুনাথ গোস্বামীর পরম আদরে আঁকা ছবি পূর্বোক্ত দলের উপযুক্ত করে তুলেছে। ছড়ার বিষয় পারিপাট্য শব্দ চয়ন মিলের ব্যবহারে কোথাও যত্নের বা বুদ্ধির অভাব নেই। হয়তো কোনো ছড়া একটু পরিণত শিশুর মনের খোরাক—তা হোক সে বয়সের কিশোর তো সর্বত্র রয়েছে। এই সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি কোনো উদ্ধৃতি করতে চাই না—কারণ একটি ছড়ার অংশ আর ছড়াটি এক নয়। ইচ্ছে করলে পাতা ভরানোর জন্য প্রচুর উদ্ধৃতিই দেওয়া যায়। ছড়ার ছন্দটি যার মূল কথা আকর্ষণ আর স্মরণযোগ্য তা সর্বত্র যথাযথ। এসব বইর মুদ্রণে কিন্তু যে সাবধানতা প্রয়োজন; যা আরো শোভন করে তোলে গ্রন্থকে, যেখানে কিছু অযত্ন আছে।

লেখাটি শেষ করবার পূর্বে প্রচ্ছদের জন্য রঘুনাথ গোস্বামীকে ধন্যবাদ জানাই। এমন প্রচ্ছদ বহুকাল চোখে পড়ে নি।

ছাতাবাহার ব্যাঙের ছাতার মতো সব শিশুদের মনে রামধনু রঙের বাহার ছড়াক।

অজয় দাশগুপ্ত

মোহিতলালের কাব্য পরিক্রমা ॥ অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা-১২। দাম ৪.০০ টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। তাঁর সাহিত্য-জীবন দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে তিনি কবি; দ্বিতীয় পর্বে তিনি সমালোচক। নানা কারণে মোহিতলালের সমালোচক সত্তা কবিসত্তার উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মোহিতলালের কাব্যপ্রতিভা কম ছিল। বরং এর বিপরীতটাই সত্য। রবীন্দ্রনাথের এত নিকটে থেকেও তিনি অনুকরণের সহজ পথ অবলম্বন করেন নি। মোহিতলালের নিজস্ব কাব্যরীতি ও কাব্যভাবনার দীপ্তি পাঠকদের চমকিত করেছিল। অনেক নবীন কবি সেদিন তাঁকে আধুনিকতম কবি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ কড়ি ও কোমলের যুগ পার হয়ে এসেছেন তখন। মোহিতলাল কড়ি ও কোমলের জীবনবিলাসকেই মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করলেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য ও আনন্দানুভূতির কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেন মোহিতলাল। এই বীর্যবান ভোগাকাঙ্ক্ষার কবি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ স্বপনপসারী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। বিস্মরণী-তে সেই প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ ছিল। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ স্মর-গরল থেকেই পুনরাবৃত্তি দেখা দেয় এবং এর পর থেকে তাঁর কাব্যপ্রতিভার ক্রমাবনতি শুরু হয়।

মোহিতলালের কাব্যপ্রতিভার অস্তগমন কয়েকটি কারণের সমন্বয়ে ঘটেছে। বীর্যবান ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রধান উৎস যৌবনের উদ্দীপনা। কবি যৌবন অতিক্রম করবার পর সেই উৎস স্বভাবতই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পর থেকে মোহিতলালের সমালোচক সত্তা প্রাধান্য লাভ করে। তিনি নিজেই বলেছেন, আমাদের সাহিত্যে সমালোচকের প্রয়োজন খুব বেশী; এবং তাঁর চোখে সমালোচক ও কবির মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু জীবিকার সঙ্গে সাহিত্য সমালোচনা ওত-প্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ায় কবি মোহিতলাল সমালোচক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। 'উনবিংশ শতকে বাঙ্গালীর জীবন কোন মন্ত্রগুণে এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার কারণ অনুসন্ধানের জন্যও মোহিতলালের কবি-মন উৎসুক হয়েছিল। বাংলার নব-জাগৃতিতে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ দান সম্বন্ধে মোহিতলাল সচেতন ছিলেন। সুতরাং উনবিংশ এবং বিংশ শতকের প্রথম দুই দশকের বাংলা সাহিত্য বিশ্লেষণ করে সমকালীন পাঠকদের জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন মোহিতলাল। এইটে ছিল তাঁর জীবনের দ্বিতীয় পর্বের প্রধান সাধনা। এর জন্য গদ্যের চর্চা ছিল অপরিহার্য।

মোহিতলাল এখন গদ্য-লেখক হিসাবেই অধিক পরিচিত। তাঁর কবি পরিচয় সমৃদ্ধ গদ্যরচনার অন্তরালে হারিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় তার কাব্যগ্রন্থ স্থান পাওয়ার নতুন করে মোহিতলালের কাব্য সাধনার আলোচনা শুরু হয়েছে।

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের আলোচনাগ্রন্থটি শুধু ছাত্রদেরই প্রয়োজন মেটাবে না, কাব্যরসপিপাসু পাঠকও এ বই পড়ে উপকৃত হবেন। মোহিতলালের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত পরিচয় থাকবার ফলে এ বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তকের প্রথমেই লেখক মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের বিবরণ দিয়ে শ্রদ্ধানিবেদন করেছেন। এর ফলে পাঠকের মনে এমন আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক যে বইটি বুঝি ভক্তের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। কিন্তু বই শেষ করবার পর দেখা যাবে সে আশঙ্কা অমূলক। দ্বিজেনবাবু মোহিতলালের কবিতার দোষ-গুণ নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেছেন। মোহিতলালের কবিপ্রতিভার ক্রমাবনতির কারণ লেখক যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণের ধারাটি পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে বলেই মনে করি।

দ্বিজেনবাবু তাঁর বই আরম্ভ করেছেন মোহিতলালের কাব্যসাধনার পরিবেশের পরিচয় দিয়ে। তারপর কয়েকটি অধ্যায়ে মোহিতলালের কাব্যগ্রন্থগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা করা হয়েছে। শেষ দুটি অধ্যায় হল মোহিতলালের জীবনদৃষ্টি ও কবিদৃষ্টি এবং মোহিতলালের শিল্পবোধ। মোহিতলালের কাব্যপ্রতিভা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক রসবোধ ও নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মোহিতলালের সমকালীন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্যধারা, মোহিতলালের রবীন্দ্র বিরোধিতা, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করবার ফলে আমরা কবি ও তাঁর পরিবেশের একটি সামগ্রিক পরিচয় পাই। লেখকের ভাষা প্রাঞ্জল। মোহিতলালের কবিতার ভূমিকা হিসাবে বইটি সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

গৃহসীমান্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের প্রতিটি নারীর পক্ষে বর্ত্তমানে অনেক কিছু করার রয়েছে। স্থানীয় নারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করুন। করার মতো বহু কাজ রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করুন, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন। শৃঙ্খলা রক্ষায়, ব্যবহার গঠনে, মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদিতে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে পারেন ঃ

* অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন; অযথা জিনিষপত্র কেনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন।
* সোনা কিনবেন না। দেশের জন্য সোনা দিন।
* যে কাজই হোক্ না কেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তা পালন করুন, কারণ, সুচারুভাবে সম্পন্ন প্রতিটি কাজ জাতীয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—ভারতকে শক্তিশালী করে।
* নিরুৎসাহিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের কর্ত্তব্যে অংশ গ্রহণ করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

DA-62/57 (Bengali)

সমকালীন

প্র ব ন্ধে র মা সি ক প ত্রি কা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দু'খানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

এ্যাসকো
সাবানে
কাচাই
সহজ

ASCO
SPECIAL
HOUSEHOLD SOAP
TABLET

d. No. C3597Phone : 23-5155 May '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKALIN

একাদশ বর্ষ ॥ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০

সমকালীন

দি সেক্রেটারী, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফাণ্ড, প্রাইম মিনিষ্টারস্ সেক্রেটারিয়েট, নিউ দিল্লী এই ঠিকানাতেও আপনি মনি অর্ডার এবং চেক পাঠাতে পারেন।
জওয়ানদের শক্তি বাড়ান

গৃহসীমান্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করার জন্য ভারতের প্রতিটি নারীর পক্ষে বর্তমানে অনেক কিছু করার রয়েছে। স্থানীয় নারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্রতিরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করুন। করার মতো বহু কাজ রয়েছে। জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করুন, অন্যকেও দান করতে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট কিনুন। শৃঙ্খলা রক্ষায়, ব্যবহার গঠনে, মনোভাব গড়ে তোলা ইত্যাদিতে আপনার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা কাজে লাগাতে পারেন :

* অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন; অযথা জিনিষপত্র কেনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুন এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করুন।
* সোনা কিনবেন না। দেশের জন্য সোনা দিন।
* যে কাজই হোক্ না কেন দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তা পালন করুন, কারণ, সুচারুভাবে সম্পন্ন প্রতিটি কাজ জাতীয় প্রস্তুতিতে সাহায্য করে—ভারতকে শক্তিশালী করে।
* নিরুৎসাহিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজের কর্তব্যে অংশ গ্রহণ করুন।

সদা সতর্ক থাকুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন।

DA-62/57 (Bengali)
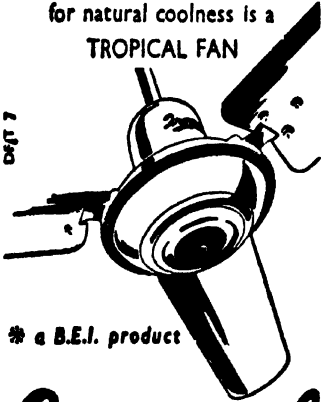
একাদশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

জ্যৈষ্ঠ
তেরশ সত্তর

একাদশ বর্ষ
২ সংখ্যা

স ম কা লী ন

যাত্রাভিনয়

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য

প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে যাত্রাগান প্রচলিত ছিল। 'নাটগীতে'ই এর পূর্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রার মূল অর্থ উৎসব উপলক্ষে 'শোভাযাত্রা এবং তদুপলক্ষে নাটগীত'। শেষ পর্যন্ত শোভাযাত্রা উঠে গিয়ে শুধু নাটগীত রইল। এই নাটগীত-ই ক্রমে যাত্রগানে পর্যবসিত হয়। কাজেই যাত্রার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে স্বভাবত নাটগীতের কিছু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। নাটগীতে কোন প্রকার পালা বাঁধা থাকত না, বাঁধা থাকত গান। তারই সংগে উপস্থিত মত কিছু সংলাপ মিশিয়ে কয়েকজন পাত্র-পাত্রী নৃত্য ও ভাবভংগী সহযোগে পৌরাণিক বা সুপ্রচলিত কোন কাহিনীর অভিনয় করত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চরিত্রের মাধ্যমে এতে হাস্যরস পরিবেশনের ব্যবস্থাও থাকত, নাটগীতে নর ও নারী উভয় প্রকার চরিত্রই পুরুষের দ্বারা অভিনীত হত—

> "হইলা বড়াই বুড়ী প্রভুনিত্যানন্দ।
> সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র॥" (শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

বাংলা সাহিত্যে নাটগীতের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক ১৫০০ খৃীষ্টাব্দের রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের 'শ্রীচৈতন্য ভাগবত'-এ। চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে 'ব্রজ-লীলা' ও 'রুক্মিণীহরণ' নামে দুটি অভিনয় হয়। শ্রীচৈতন্যদেব রুক্মিণীর ভূমিকাভিনয় করেন। এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, শ্রীবাস, মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য প্রমুখ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগণ। অভিনয়ে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হত।

'রুক্মিণী হরণে'র একটি অংক অভিনয়েরই প্রায় তিনঘণ্টা সময় লেগেছিল—

"প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেশ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধরের প্রবেশ॥"

মধ্যযুগে পালরাজাদের কাহিনী পালাও যাত্রায় প্রচলিত ছিল—

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত॥"

পরবর্তীকালে ক্রমে যাত্রার জন্য বাঁধা পালা রচনার প্রচেষ্টা চলে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত বাঁধা যাত্রার পরিচয় পাওয়া যায় নেপালে প্রাপ্ত বাংলা যাত্রা 'গোপীচন্দ্র নাটক'-এ। এর প্রায় একশত বছর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত ভারতচন্দ্রের অসম্পূর্ণ 'চন্ডী-নাটক'-এ প্রাচীন যাত্রার নিদর্শন পাওয়া যায়। তথাপি একথা বলাচলে যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষ্ণযাত্রা, পাল-যাত্রা চন্ডীযাত্রা, চৈতন্যযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাঁধা-যাত্রার তেমন প্রচলন হয়নি। এই সময়ে হাস্যরস সৃষ্টির জন্য কৃষ্ণযাত্রায় 'নারদ' ও 'ব্যাসদেব' চরিত্র দুটির অবতারণা করা হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কালীয়দমন রাস প্রভৃতি কৃষ্ণ-যাত্রায় বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন শ্রীদাম, সুবল ও পরমানন্দ অধিকারী। এই শ্রেণীর যাত্রার সংগীতাংশ ছিল কীর্তনের প্রভাব মণ্ডিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই যাত্রায় বাঁধাপালার বিশেষ প্রচলন হয়। গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামী সকলেই বাঁধা যাত্রানাট্য সংযোজনা করে দর্শকদের অজস্র প্রশংসা অর্জন করেন। এই শতাব্দীতেই গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা কলিকাতা অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) অনেক প্রেমগীতি রচনা করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত টপ্পাগানের সুরানুকরণে ঐসব গানে সুরারোপ করা হয়। টপ্পার বিশেষ তান ভংগী ও সুর-বৈশিষ্ট্যের জন্য এই গান ক্রমে বিশেষ সমাদর পেতে থাকে। রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ কুলুইচন্দ্র সেন আখড়াই ওস্তাদি-গানের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন নিধুবাবুর টপ্পা তাকেই আরো বিস্তৃত করে তোলে।

রাগ সংগীতের এই ঢেউ যাত্রাগায়কদেরও প্রভাবিত করে। ফলে গানে যে কীর্তনের প্রভাবছিল তা দ্রুত লুপ্ত হয়ে যায় এবং আনুমাণিক ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত জুড়ির গানে রাগসংগীতের প্রভাবে টপ্পা ভাংগা তান ও ধ্রুপদী-বাঁট ব্যবহৃত হতে সুরু করে। এ জাতীয় যাত্রা গায়কদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রজমোহন রায় ও মতিলাল রায় অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জোড়াশাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে বাঁশ ও সামিয়ানা সহযোগে মঞ্চ প্রস্তুত করে ন্যাশনাল থিয়েটার নামে সাধারণ রংগালয়ের উদ্বোধন হয় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। তারপর থেকেই কলিকাতায় মঞ্চাভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এর পর থেকেই শরৎচন্দ্র ঘোষের বেংগল থিয়েটার (১৮৭৩), ভুবনমোহন নিয়োগীর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার (১৮৭৩), বিডন ষ্ট্রীটে গুর্মুখ রায়ের ষ্টার থিয়েটার ১৮৮৩, পরে গিরিশচন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার ১৮৮৭, এমারেল্ড থিয়েটার ১৮৮৭, মিনার্ভা থিয়েটার ১৮৯৩ প্রভৃতি বহু নাট্যশালা গড়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মঞ্চাভিনয়ের প্রতি দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় মঞ্চাভিনয় দ্বারা যাত্রা প্রভাবিত হতে আরম্ভ করে।

তৎকালীন যাত্রাপালার কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। (ক) 'যাত্রায় সমস্ত রাত্রি গায়িতে'—হত বলে গানের সংখ্যা ছিল অত্যধিক। সকল চরিত্রই গান ও নাচে অংশ গ্রহণ করত। 'কৃষ্ণনৃত্য করেন,

রাধানৃত্য করেন, বারণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন,—সঞ্জীবচন্দ্র। (খ) স্বতন্ত্র প্রকৃতির স্বতন্ত্র গতি, স্বতন্ত্র কথা—একথা যাত্রাকারদের বড় জানা ছিল না; তাই চাল-চলন ও পাত্র-পাত্রীর সংলাপে স্থান-কাল ও চরিত্র সম্বন্ধে স্বভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব হত না। (গ) পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ও অধিকারীরা উদাসীন ছিলেন। রাম, লক্ষ্মণ যেমন চাপকান ও মোগলাই পাগড়ি ব্যবহার করতেন তেমনি নকিব, জমিদার ও রাজা সকলেই একই পরিচ্ছদধারী। (ঘ) অতিরিক্ত রং ঢং ইত্যাদি তামাসা দ্বারা নাটকের রসপরিণতিতে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি করা হত। (ঙ) কথকতার ধরণে বক্তৃতা, নাচ-গান, রং ঢং মিশিয়ে বিভিন্ন পালার সাহায্যে নীতি ও ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাত্রার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যেভাবে যাত্রার উপস্থাপনা হত তাতে সাধারণ শ্রোতার মনোরঞ্জন হলেও এতে নাট্যরস সৃষ্টি হত না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাট্যকার মনোমোহন বসু যাত্রার পুনর্গঠন করতে প্রয়াসী হলেন—"আমরা চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিল, তাহার ধ্বংস না করিয়া তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। আমরা চাই সেই যাত্রার গান সংখ্যায় কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে সংশোধিত করিয়া নাটকের স্বভাবানুযায়ী কথোপকথনাদি বিবৃত হউক।"

হিন্দুমেলার অন্যতম প্রবর্তনকারী মনোমোহন বসুর প্রচেষ্টায় কিছুটা দোষমুক্ত হয়ে যাত্রানাট্য অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়ে ওঠে। যাত্রা-নাটকের সংস্কার করার জন্যই গানের সংখ্যা কমিয়ে তিনি রামাভিষেক নাটক ১৮৬৭, সতীনাটক ১৮৭৩, হরিশ্চন্দ্র নাটক ১৮৭৫ প্রভৃতির মাধ্যমে --গীত ও ভক্তি-করুণ রসের মিশ্রণে এক শ্রেণীর নাটক প্রবর্তন করেন। এই শ্রেণীর নাট্যরচনা থিয়েটার ও যাত্রা উভয়প্রকার অভিনয়ের পক্ষেই উপযোগী। রত্নাবলী ১৮৬৫ শ্রীবৎসচিন্তা ১৮৬৬, এবং জানকী বিলাপ ১৮৬৭ প্রভৃতি রচয়িতা হরিমোহন কর্মকার ও গীতাভিনয় প্রবর্তক মনোমোহন বসুর প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মতিরায় ও ব্রজ রায়ের প্রচেষ্টায় কথকতার ধরণের বক্তৃতার সংগে ভক্তিরসম্পূর্ণ গান যুক্ত হয়ে "গীতাভিনয় নামে নূতন যাত্রা পদ্ধতির সৃষ্টি" (ডকটর সুকুমার সেন)।

পাইক পাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রামনারায়ণ তর্করত্ন কর্তৃক সংস্কৃত রত্নাবলী নাটক অবলম্বনে রচিত বাংলা রত্নাবলী নাটক অভিনীত হয় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে। এই নাট্যাভিনয় থেকেই মঞ্চে বিশেষভাবে ঐক্যতান বাদনের প্রচলন হয়। যাত্রায়ও পরবর্তী কালে মঞ্চপ্রভাবেই বিশেষ ঐকতান বাদনের রীতি প্রচলিত হল। গিরিশচন্দ্রের পরে শিশিরযুগে মঞ্চাভিনয়ে ঐকতান বাদন বন্ধ হয়ে গেলেও যাত্রায় কিন্তু প্রারম্ভে ও অংকের শেষে ঐকতান বাদন একটি বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল। সংগীতের অন্যতম শাখা নৃত্য-শিল্প একসময় ভারতে যে উন্নতি লাভ করেছিল তার প্রমাণ—একদিকে ভরতমুনির নাট্য-শাস্ত্র, অন্যদিকে অজন্তা, ইলোরার চিত্রাবলী এবং কণারক ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ মন্দির গাত্রে খোদিত নৃত্যরত মূর্তি। কিন্তু মুসলমান রাজত্বে ভারতীয় নৃত্যকলার বিশেষ অবনতি ঘটে। বৃটিশ রাজত্বেও সুদীর্ঘ কাল সভ্য সমাজে নৃত্য তেমন সমাদৃত হয় নি। সুতরাং সুনিয়ন্ত্রিত নাচের সংগে সাধারণের পরিচয় বন্ধ হয়ে গেল। যাত্রায়ও নৃত্য বলতে যা বুঝায় তার ব্যবহার থাকল না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে গিরিশযুগে মঞ্চে সুনিয়ন্ত্রিত নৃত্য প্রবর্তিত হয়। বিংশ শতাব্দীতে শিশিরযুগের প্রারম্ভে এই নাচ আরও উন্নত হয়। এরপরে উদয়শঙ্কর নৃত্যকলাকে বাংগালী সভ্য—সমাজে প্রচলিত করেন। যাত্রাভিনয়ের সাধারণ নৃত্যাংশ যেমন মঞ্চ প্রভাবিত তেমনি একক বা দ্বৈত নৃত্যে আছে উদয়শংকরের প্রভাব। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে যাত্রানাটকের গঠন রীতি ও সংগীতাংশ নানা ভাবে মঞ্চপ্রভাবিত হতে থাকে। কেবল যাত্রাই যে মঞ্চপ্রভাবিত

তা নয়, মঞ্চ ও যাত্রাম্বারা প্রভাবিত হয়েছে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলা নাটকে অত্যধিক গীতি-প্রীতি এর অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইংরাজি বা সংস্কৃত নাটকে এত গীতে ব্যবহার লক্ষিত হয় না।

পূর্বে যাত্রার আসরে চার কোনায় চারজন জুড়ি বসতেন। গানের এক একটি অংশ এক একজন জুড়ি গাইতেন। জুড়ি গায়করা সকলেই মোটামুটি ওস্তাদ গায়ক ছিলেন। জুড়িদে কেউ কেউ আবার বেহালাতেও পারদর্শী ছিলেন। সে রকম ক্ষেত্রে গীতাংশ গাইবার পরে বেহালাতেও খানিকটা সুরের কাজ দেখানো হত। আর তার সংগে চলত পাখোয়াজ বা তবলার কাজ কাজেই এক একটি জুড়িগান কম করেও অন্তত আধঘন্টা ধরে চলত। যাত্রাভিনয় চলত প্রায় দশঘন্টা ধরে। সকালে যাত্রা সুরু হলে সন্ধ্যায় শেষ হত, এবং প্রথমরাতে আরম্ভ হলে ভোর বেলায় সমাপ্ত হত। জুড়ি গানের সময় নাটকের গতি যেত রুদ্ধ হয়ে। যাত্রায় গানের উপরেই অধিক জোর দেওয়া হত বলে এক সময় শ্রোতারা আনন্দের সংগেই একে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে দর্শকদের নাট্যবোধ জাগ্রত হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই জুড়িগানের প্রতি তাঁরা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কথিত আছে—ভূকৈলাসের রাজষ্টেটে সাবিত্রী সত্যবান পালায় জুড়িগানে অতিষ্ঠ হয়ে জনৈক মোক্তার শ্রোতা সদ্য বিবাহিতা সত্যবানকে ছেড়ে দিয়ে জুড়িদের নিয়ে যাবার জন্য যমরাজের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন। কাজেই দর্শকরুচির জন্যই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকেই যাত্রায় আর একপ্রকার নূতনত্ব দেখা দিল। জুড়িরগানের পাশে বিবেকের গান প্রচলিত হল এবং এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই জুড়ি উঠে গিয়ে যাত্রায় বিবেকের গান পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হল।

ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়, অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার অপেক্ষা দৈবের প্রাধান্য, অহেতুকী ভক্তি, অবতারবাদ, অলৌকিকতা, দেবদেবীর লীলা, ভবিষ্যদ্বাণী, শাস্ত্রের শাসন, বিবেক ও মনুষ্যত্ববোধ, আদ্যোপান্ত কাহিনীর উপস্থাপনা, ঘটনার আকস্মিকতা, স্থান-কাল বিবেচনা না করে পাত্র-পাত্রীর উপস্থিতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমবায়ে রচিত যাত্রায় সাধারণত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও ভক্তিমূলক কাহিনী-ই অবলম্বনীয় ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বংগ ভংগ আন্দোলন সুরু হওয়ায় দেশবাসীর মনে স্বদেশীভাব বিশেষভাবে জাগ্রত হতে থাকে। এরই ফলে বাংলার চারণ কবি মুকুন্দ দাস ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে সংগীত সহযোগে দেশে স্বদেশী ভাব প্রচারে ব্রত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হিন্দুমেলার পর থেকেই হরলাল রায়ের বঙ্গের সুখাবসান ১৮৭৪, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম ১৮৭৪, চিতোর আক্রমণ ১৮৭৫, অশ্রুমতী ১৮৭৯, উপেন্দ্রনাথের সুরেন্দ্র বিনোদিনী ১৮৭৫, ক্ষীরোদপ্রসাদের বঙ্গের প্রতাপাদিত্য ১৯০৪, গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা ১৯০৫, মীরকাসিম ১৯০৬, দ্বিজেন্দ্রলালের মেবার পতন ১৯০৭ প্রভৃতি স্বদেশী ভাবাত্মক নাটক রচিত হলেও যাত্রায় ঐ শ্রেণীর নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন মুকুন্দ দাস ১২৮৫-১৩৪১। বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, নিশিকান্ত বসু রায় প্রমুখ নাট্যকারদের ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাবে যাত্রায়ও ঐতিহাসিক নাটক প্রবর্তিত হয়। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যাত্রানাট্যের পাশাপাশি চলতে থাকে মুকুন্দ দাসের স্বদেশী ভাবাত্মক সামাজিক পালা। এই সময়ের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যাত্রায় অভিনয় এবং বিবেকের গান দুয়েরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু মুকুন্দবাবুর যাত্রায় অভিনয় অপেক্ষা গান ও বক্তৃতা প্রাধান্য পেত। বিভিন্ন চরিত্রে মুকুন্দ দাসের গান ও দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করত। যাত্রায় সাধারণত রাগ-রাগিনীর সংগে টপ্পা ভাংগা তান ও মনোহর সাহী সুরের ঢং মিলিয়ে বিবেকের গানে সুরারোপ করা হত এবং এর লয়ও অধি-

কাংশ ক্ষেত্রে ছিল মধ্যগতির। কিন্তু মুকুন্দবাবুর যাত্রাগানে রাগসংগীতের কাঠামো বজায় রেখে যেমন সুর করা হত তেমনি আবার এর সংগে কিছুটা বাউলের ঢং মিশিয়ে নূতনত্ব আনার চেষ্টা করা হত। সাধারণত এই সবগান দ্রুত লয়ে গীত হত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের সুর হত উদ্দীপনাময়। কারণ যে গানে আবেগ ও দ্রুততা নেই জনজাগৃতির ক্ষেত্রে সে গান তেমন ফলপ্রসূ হয় না। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার প্রধান লক্ষ্য ছিল, জনজাগরণ। এই প্রসঙ্গে মাতৃপূজা, সমাজ, পল্লীসেবা, ব্রহ্মচারিণী, কর্মক্ষেত্র প্রভৃতি পালা স্মরণযোগ্য। এই শ্রেণীর পালায় অগ্নি-বীণার কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানও মাঝে মাঝে সংযোজিত হয়ে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করত। বর্তমান কালে যাত্রায় পৌরাণিক পালা কদাচিৎ দেখা যায়। ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ, ব্রজেন্দ্রনাথ দে, জিতেন্দ্রনাথ বসাক, বিনয় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পালাকারগণের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভক্তিমূলক নাটকই যাত্রায় অধিকতর প্রচলিত।

যাত্রার প্রয়োগ পদ্ধতির পাঁচটি অংগ—ক। আসর খ। আলো গ। বেশবিন্যাস ঘ। সংগীত ঙ। অভিনয়। চতুষ্কোণাকৃতি উন্মুক্ত আসরের চারদিকেই যাত্রাদর্শকদের বসার ব্যবস্থা হয়। এই আসরের দুদিকে বসেন বিভিন্ন যন্ত্রীও স্মারক। আসরের একদিকে থাকে দুখানি চেয়ার। রাজ-সিংহাসন থেকে সুরু করে সকল প্রকার আসন রূপে ঐ দুটি-ই ব্যবহৃত হতে পারে। চেয়ারের পাশ দিয়ে থাকে প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি মাত্র নির্দিষ্ট পথ। অনেক সময় দর্শকদের দেখার সুবিধার জন্য তক্তা দিয়ে আসরটি উঁচু করা হয়। সে রকমক্ষেত্রে যন্ত্রী ও স্মারকের জন্য কিন্তু আবার ঠিক আসরের গা-ঘেঁসে একটু নীচুতে বসার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তার দর্শকদের সামনে দেখার কোন রকম অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারেন। রঙ্গস্থল ও বসার জায়গা সামিয়ানা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। এরফলে অভিনেতার কণ্ঠস্বর হাওয়ায় উপরে ভেসে না গিয়ে বরং সামিয়ানায় বাধা পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মঞ্চাভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের সংগে অভিনেতার কিছুটা বাস্তব সান্নিধ্য স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু যাত্রার আসরে এই সান্নিধ্য অধিকতর। যাত্রার আসরে কিছু রাখা-ঢাকা নেই। কালীর আবির্ভাব দেখাতে হলে এখানে বড় আয়না, আলো, রঙিনছায়ার খেলা দেখানোর প্রয়োজন হয় না। খড়্গহস্তে রক্তমাংসের মুণ্ডমালিনী একেবারে হেঁটেই স্বয়ং রঙ্গস্থলে উপস্থিত হন।

পল্লী অঞ্চলে আলোর অসুবিধার জন্য সাধারণত দিবাভাগেই যাত্রার আসর বসত। সহরাঞ্চলে আলোর অপেক্ষাকৃত সুব্যবস্থার জন্য রাতে যাত্রাগান হত। সেসব ক্ষেত্রে আসরে বড় কেরোসিনবাতি বা সম্ভবস্থলে গ্যাসবাতির ব্যবহার করা হত। ক্রমে গ্যাসের পরিবর্তে এল ডে-লাইট্ ও পঞ্চলাইট। রঙ্গস্থলের চারকোনায় চারটি আলো ঝুলানো হত যাতে আসরে কোন দিক থেকেই পাত্র-পাত্রীর ছায়া না পড়ে। ডে-লাইট্ বা পঞ্চলাইট্ খুবই শক্তিশালী। কাজেই অভিনেতার ভাব ভংগী দেখার দিক থেকেও দর্শকদের অধিকতর সুবিধা হল। যাত্রা উজ্জ্বল আলোতেই অভিনীত হয়। বর্তমানে স্থান বিশেষে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার ও চলছে। সে সব ক্ষেত্রেও হাই লাইট্ এ্যাক্টিং-ই প্রচলিত। আলোর ব্যবহারে পরিবেশ, কাল ও ভাব (এ্যাটমোসফিয়ার, টাইম এ্যান্ড মুড) নির্দেশের রীতি অপ্রচলিত। পাত্র পাত্রীর সংলাপ ও অভিনয় ভংগীর সাহায্যেই যাত্রায় সমস্ত ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। যাত্রাগানে শ্রোতাকে অনেক বিষয়ে অনুমান কল্পনার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়। এইটি যাত্রার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই বিশেষ একটি মন নিয়ে শ্রোতাকে যাত্রা শুনতে যেতে হয়। অভিনয় ছাড়া যাত্রাপালায় দর্শনীয় একমাত্র যুদ্ধ। কিন্তু থিয়েটারে শোনার সংগে অনেক কিছু দর্শনীয় ও থাকে। তাই সাধারণত বলা হয়—যাত্রা শুনতে যাই, থিয়েটার দেখতে

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কখনো কখনো স্ত্রীভূমিকায় নারী আসরে অবতীর্ণ হলেও যাত্রায় পুরুষই নারীচরিত্রে অভিনয় করে থাকে। পুরুষকে নারী সাজতে হলে দাড়ির কালো দাগ ঘুচিয়ে দেবার জন্য স্বভাবতই মুখে চড়া রং মাখানো প্রয়োজন। পুরুষ চরিত্রে স্বাভাবিক মেক-আপ থাকলেও নারী চরিত্রাভিনেতার জন্য যাত্রায় হাই মেক-আপ ব্যবহৃত হয়। নারীচরিত্রাভিনেতা নির্বাচনে অধিকারীরা অবশ্যই কণ্ঠ ও দৈহিক গঠনের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। অনেক সময় যাত্রায় এমনও দেখা যায়, চেহারা ও অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য স্ত্রী চরিত্রাভিনেতা পুরুষ কি নারী বুঝা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পোষাক পরিচ্ছদের দিক থেকে যাত্রায় স্বাভাবিকতা অনেকস্থলেই বজায় রাখা হয় না—বিশেষত পৌরাণিক ও প্রাচীন ঐতিহাসিক পালায়। রামায়ণ মহাভারতের যুগের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পালায়ও চুমকি লাগানো ঝকঝকে জামা, ব্লাউজ, নাগরা জুতো, ম্যান্টেল প্রভৃতির ব্যবহার হামেসাই দেখা যায়। হিন্দুরাজাদের জামা এবং মুসলমান সম্রাট অশোক, রাজা বিক্রমাদিত্য ও মহীপালের পোষাকও একই রকম।

যাত্রার সংগীতে নৃত্যে, গীত ও বাদ্য তিনেরই ব্যবহার আছে। সখী সম্প্রদায়ের সমবেত নৃত্য, রিলিফ সৃষ্টির জন্য একক বা দ্বৈত নৃত্য যাত্রার একটি বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়েছে। সংগীতের দিক থেকে বিবেকের গান যাত্রার প্রধান আকর্ষণ। বিবেকের গানে এখন বাঁট—তানের কাজ এক রকম উঠেই গিয়েছে। উচ্চারণের স্পষ্টতা, ভাবভঙ্গী, চড়াসুর, রাগের ঢং ও কাঠামো এবং তাল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে গানের বিশেষত্ব এখনো মোটামুটি বজায় আছে। কিন্তু অন্য চরিত্রের গানে এবং রিলিফ সৃষ্টির জন্য প্রযুক্তগানে যাত্রা-ঢঙ-এর সংগে রেকর্ড-রেডিও-সিনেমার প্রভাবে আধুনিক সুরের মিশ্রণে একপ্রকার সুর-প্রয়োগ করা হয়। সে সুর অধিকাংশ সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং অত্যন্ত সহজেই বিবেকের গানের সুরের সংগে তার পার্থক্য ধরা পড়ে। যাত্রাভিনয়ে কখনো কখনো বেহালা ও বাঁশির সাহায্যে মুড্ মিউজিক সংযোজিত হয়। আবহসংগীতের প্রতি ও যে প্রয়োগকর্তার একেবারে লক্ষ্য নেই একথা বলা যায় না। কেটেল্ ড্রাম ও নানারকমের বাঁশির সাহায্যে যুদ্ধের বাজনায় সংগীতের এদিকটির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে যাত্রায় কিছু কিছু শব্দ প্রয়োগের পরিচয় ও পাওয়া যায়। উপবনে পাখীর ডাক, পিস্তলের গুলি ছোড়ার আওয়াজ, প্রান্তরে মিলিয়ে যাওয়া ডাকের প্রতিধ্বনির শব্দ প্রভৃতি অনুকরণের প্রচেষ্টায় এই রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংগীতের দিক থেকে ঐকতান বাদন যাত্রার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পর থেকেই দর্শকবৃন্দের চাহিদা অনুযায়ী স্বভাবতই সংগীত অপেক্ষা অভিনয়ের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেওয়া সুরু হয়। চিত্রশিল্পের সংগে তুলনা করে বলা যায়, ছায়াচিত্রের অভিনয় সরু তুলির কাজ, মঞ্চাভিনয় অপেক্ষাকৃত মোটা তুলির কাজ এবং যাত্রাভিনয় বড় তুলির কাজ অথবা স্পেটুলা ওয়ার্ক। এক একটি যাত্রানুষ্ঠানে দুই, তিন, চার এমনকি পাঁচ হাজার পর্যন্ত দর্শক সমাগম হয়। এই বিপুল দর্শকের গোচরীভূত করবার জন্য স্বভাবতই যাত্রার এক্সপ্রেসন্-এ উপাংগের সংগে বিশেষ বিশেষ স্থূল অংগ ভংগির প্রয়োজন অপরিহার্য। তাই মঞ্চাভিনয়ের মত যাত্রাভিনয়ে সূক্ষ্ম কাজের তেমন প্রয়োজন হয় না। যাত্রাভিনয়ে সবচেয়ে বড় সম্পদ জোরালো ভারী কণ্ঠ এবং উচ্চারণের স্পষ্টতা। দৈহিক গঠনের সংগে যার এদুটি সম্পদ আছে তিনিই যাত্রার অধিকতর জনপ্রিয় অভিনেতা বলে নিজেকে পরিচিত করার সুযোগ পান। পৌরাণিক যাত্রায়। হাই পিচ এ্যাক্টিং-এর জন্য ছন্দোময় সংলাপের প্রচলন হয় গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে। শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের জন্যই আবেগময় দীর্ঘ সংলাপ এবং আবৃত্তিমূলক অভিনয় যাত্রার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালায় যেখানে

ছন্দোময় সংলাপ থাকে না এবং রিসাইট্যাল কোয়ালিটি ও যেখানে প্রয়োগ করার অসুবিধা আছে যাত্রায় সেখানেও দীর্ঘস্বরান্ত অক্ষরগুলির উচ্চারণে বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণ রীতি বহির্ভূত আবৃত্তিমূলক ভংগীর ভগ্নাংশ স্বরূপ বিশেষ সুরের টান ব্যবহৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথিতযশা মঞ্চাভিনেতাদের অভিনয় রীতিদ্বারা সুপরিচিত যাত্রাভিনেতাদের অভিনয় পদ্ধতি প্রভাবিত হয়েছে। এদের কেউ অনুকরণ করেন আবেগমূলক কণ্ঠের কাজ, কেউ নিয়েছেন বিশেষ বিশেষ এক্সপ্রেসন্ বৈশিষ্ট্য, আবার কেউবা অনুসরণ করেন দ্রুত অথচ স্পষ্ট ডেলিভারী-র রীতি। প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতাদের অভিনয় ভংগী স্মরণ করলেই একথার যাথার্থ্য অনুমিত হবে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে কোন কোন সুপরিচিত অভিনেতা আপন বৈশিষ্ট্য নিয়েই খ্যাতি অর্জন করেছেন। যাত্রার অভিনয় রীতিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—ইমোশনাল্, ষ্টাণ্ট্ প্রধান ও ইনটেলকচুয়াল। প্রখ্যাত যাত্রা অভিনেতা কালীয়দমন গুহঠাকুরতা, প্রভাত বসু ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য প্রথম ধারার অভিনয়ে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ষ্টাণ্ট্ প্রধান এ্যাক্টিং-এর জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন চুনী গোস্বামী যেমন বর্তমান খ্যাতিমান নট ফনীভূষণ মতিলাল। ইন্টেলকচুয়াল এ্যাক্টিং-এর টাচ থাকত যাত্রার চিরপরিচিত অভিনেতা সুরেশবাবুর অভিনয়ে। এই রীতির অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায় ফণী বিদ্যাবিনোদের (বড় ফণী) মধ্যে। বলা বাহুল্য ইন্টেলেকচুয়াল্ এক্টিং যেমন বিশেষ চিন্তা ও সাধনা প্রসূত তেমনি এর স্থান ও খুব উঁচুতে। আবেগমূলক ও চমকপ্রধান অভিনয় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং যাত্রায় এই দুটি রীতি-ই অধিক প্রচলিত।

আলোকশিল্পের ব্যবহার, কণ্ঠ যন্ত্রসংগীত ও শব্দ প্রয়োগবিধি, এবং অভিনয় রীতির দিক থেকে মুক্তাংগন থিয়েটার-এর সংগে যাত্রার প্রভূত পার্থক্য। প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে অভিনয় ছাড়াও মুক্তাংগন থিয়েটারে আলোক নিয়ন্ত্রণ, সংগীত ও শব্দক্ষেপণের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু যাত্রায় জোর দেওয়া হয়ে থাকে অভিনয়, গান ও ঐকতান বাদনের উপরে। রঙিন আলোর খেলা, আলো-আঁধারি ভাব, ভাবদ্যোতক আলো প্রভৃতি যাত্রায় অপ্রচলিত। যেখানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে সেখানেও হাই লাইট-এ যাত্রাভিনয় করা হয়। যুগ ও ও রুচির প্রভাবে বহু পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করে যাত্রা বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ করেছে। সংগীত—প্রয়োগ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, পালা রচনার ধারাও বদল হয়েছে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হওয়ায় পৌরাণিক পালার পাশে ভক্তিমূলক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালা রচিত হয়েছে। ভাবের দিক থেকে এসেছে বিপ্লব। তাই অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ এবং অহেতুকী ভক্তি ভাব-ই যাত্রার প্রধান অবলম্বন হয়ে রইল না। স্বদেশীভাব এবং নানা ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সংগে মানবিক ভাব স্বাভাবিক কারণেই ক্রমে পালা রচনায় নিজ স্থান অধিকার করেছে। এত পরিবর্তনেও কিন্তু যাত্রা ঠিক যাত্রাই আছে। অভিনয় দেখে মোটেই বুঝতে কষ্ট হয় না—কোনটি যাত্রা কোনটি থিয়েটার। এমনকি একটি যাত্রাপালাকে যদি মঞ্চের সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করে প্রয়োগ করা হয় তাহলেও তা যাত্রাই হয়ে ওঠে, থিয়েটার হয় না। প্রসিদ্ধ অভিনেতার এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে মেক-আপ পরিবর্তন করে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করলেও রূপের অন্তরালে যে মানুষটি থাকে তাকে চিনতে একটুও কষ্ট হয় না। মঞ্চে প্রযুক্ত যাত্রাও তেমনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুণে দর্শকদের কাছ থেকে আত্ম-পরিচয় গোপন রাখতে পারে না। তাই যদি হয়, তাহলে যাত্রার আরো যুগোচিত আধুনিক পরিবর্তন সম্ভব কিনা—এটাই হল প্রশ্ন। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। নানবজীবনে প্রতিদিনই বিজ্ঞানের প্রভাব বেড়ে চলেছে। এমত অবস্থায় যাত্রায়ও যে এর প্রভাব আসবে এতে আর আশ্চর্যের কিছু

নেই। তাই সামগ্রিক ভাবে যাত্রার কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ফল। দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে কোন কিছুরই পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তন ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। তাই চট্ করে তা চোখে পড়ে না। শেষ পর্যন্ত যখন এটা একটা বিশেষ ধাপে এসে পৌঁছয় তখনই তা সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এমনি করেই যাত্রায় নানা পরিবর্তন ঘটেছে, আরো পরিবর্তন ঘটবে।

যাত্রাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—ক. অন্তর্বিভাগ ও খ. বহির্বিভাগ। পালারচনারীতি, অভিনয় পদ্ধতি ও সংগীত-প্রয়োগ নিয়ে অন্তর্বিভাগ। বহির্বিভাগে পড়ে আসর প্রস্তুতি, আলোর ব্যবহার, অভিনেতৃ-নির্বাচন, বেশবিন্যাস এবং শব্দ ক্ষেপণ-বিধি। অন্তর্বিভাগীয় বিভিন্ন অংগের মধ্যে সংগীত প্রয়োগের পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বহির্বিভাগে পরিবর্তন ঘটেছে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহারে, স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনেতার স্থলে অভিনেত্রী নির্বাচনে এবং কিছু কিছু শব্দক্ষেপনের রীতি অবলম্বনে। যেখানে উপায় নেই সেখানে অবশ্য যা পাওয়া যায় তাতেই বাধ্য হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। কিন্তু উপায় থাকলে অভিনেতার সংগে দর্শকমনের দ্রুততর সংযোগ ঘটিয়ে রসোপলব্ধির সহায়ক রূপে যাত্রায় যান্ত্রিকতার সাহায্য গ্রহণ করা অসমীচীন নয়। বরং যান্ত্রিকতা ক্ষেত্র বিশেষে অসার্থক প্রয়োগকে সাফল্য মণ্ডিত করে দর্শকদের তৃপ্তি বিধান করবে। যাত্রায় যান্ত্রিকতার ব্যবহার করা চলে শব্দক্ষেপণও আলোর ব্যবহারে, প্রতিপক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র ধরল আর বিনা আওয়াজে-ই লক্ষ্য ভেদ হয়ে গেল এতখানি কল্পনা হয়ত অস্বাভাবিক। তাই প্রায় বিশ বছর আগে থেকে পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সম্পৃক্ত পাখীর ডাক, প্রতিধ্বনি আগ্নেয়াস্ত্রের আওয়াজ প্রভৃতির শব্দক্ষেপণ বিধি যাত্রায় সুরু হয়েছে অভিনেতা ও শ্রোতার অনুমান কল্পনার সুবিধার্থে। তাতে যাত্রার আসল প্রকৃতির কোন বিপর্যয় ঘটেনি। কাঠ ও করতালি এবং বেহালাও বাঁশির সাহায্যে এই অসার্থক শব্দক্ষেপণ-বিধিকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রেরদ্বারা সুষ্ঠরূপে পরিচালনা করায় ও যাত্রার অন্তর্মহলের বিপ্লব ঘটার আশংকা অমূলক।

যাত্রার অভিনয় উচ্চ-গ্রামে বাঁধা, রঙ-চড়ানো। খোলা জায়গায় সহস্র সহস্র শ্রোতার শ্রুতি-রঞ্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয় বলেই যাত্রাভিনয়ে এই রীতি প্রচলিত। আর সেইজনাই এই-স্তরের অভিনয়ে জোরালো কন্ঠের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু শুধু কন্ঠের দ্বারা অভিনয় কখনো সম্ভব নয়। এমন কি রেডিও-প্লেতেও নয়। রেডিও শ্রোতার দৃষ্টি-গোচর না হলেও সংলাপ ব্যবহারের সময় সেখানেও অভিনেতার নানাভাবভংগী আপনাথেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। বস্তুত এক্সপ্রেশন ছাড়া কোন অভিনয়ই সম্ভব নয়। যাত্রায়ও অনেক সময় সংলাপহীন ভাব-অভিনয় প্রযুক্ত হয়। শুধু হাই লাইট্-এ অভিনয় করলে যারা কাছে বসেন তারা অভিনেতার ঐ সব এক্সপ্রেশন্ লক্ষ্য করে অভিনয়ের রসোপলব্ধির যতটা সুযোগ পেয়ে থাকেন দূরের দর্শকদের পক্ষে তা অসম্ভব। এই কারণেই অভিনেতার সংগে দূরের দর্শকদেরও যাতে কর্ণ ও নয়নের মাধ্যমে দ্রুত মানস সংযোগ ঘটানো যায় তারই জন্য সম্ভবও প্রয়োজনস্থলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে সাদা ফোকাস্ ব্যবহার করা খুবই সংগত। সখীনৃত্য, একক বা দ্বৈতনৃত্যের, দৃশ্যে রঙিন আলোর ব্যবহারও করা যেতে পারে। তাতে নৃত্যের সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হয়। আলো ব্যবহারের এ রীতি রস-সৃষ্টি ও রসোপভোগের সহায়ক বলেই বর্তমান যুগে এর সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন। যাত্রার আন্তর প্রকৃতি বজায় রেখে বহির্বিভাগের দিক থেকে আধুনিক যান্ত্রিকতার সাহায্যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোকনিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠ শব্দক্ষেপণ একেবারেই অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এই যান্ত্রিকতা ব্যবহারের সফলতা নির্ভর করে মাত্রাবোধের

উপর। মঞ্চাংগন থিয়েটার ও যাত্রার পার্থক্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নাট্যরচনা রীতি, অভিনয়, কণ্ঠসংগীত, আবহ সংগীত ভাবদ্যোতক সংগীত ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক থেকে সে পার্থক্য বজায় রাখাই কর্তব্য। মঞ্চাংগন থিয়েটারে যাত্রারমত নারীভূমিকায় পুরুষ অভিনয় করে না। এই দুই রীতির নাট্যপ্রয়োগে আলো এবং শব্দ ব্যবহারের রীতিও আলাদা। মঞ্চাংগন থিয়েটারে আলোক ও বিচিত্র শব্দক্ষেপণ দ্বারা নানা পরিবেশ, কাল ও ভাব নির্দেশ করা হয়। যাত্রায় কিন্তু সংলাপ সংস্থাপন ও অভিনয় কৌশল-ই এসব বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। যাত্রাপালায় দুষ্মন্ত যে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সখীদের সংগে শকুন্তলার কথাবার্তা শুনছে 'আস্তগাছের গুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি'—(রবীন্দ্রনাথ)। স্থান-কাল-পরিবেশ সম্পর্কে এই সৃজনী শক্তির সহায়ক যাত্রার বর্ণনাত্মক সংলাপ। যাত্রাপালার সংলাপ রচনায় এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। পালায় আসলরস সংগীত ও সংলাপ-বৈশিষ্ট্যযোগে 'অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিক দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।'

চরিত্রোপস্থাপনা ও সংলাপ সংযোজনা সম্পর্কে পালা রচয়িতারা সকলেই যে যথেষ্ট সতর্ক নন একথা প্রমাণিত হল বিশ্বরূপা নাট্যোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত যাত্রা-উৎসব-এর ত্রিশটির অধিক যাত্রাভিনয়ে। স্থান-কাল বিবেচনা না করে পাত্র-পাত্রীর রঙ্গস্থলে উপস্থিতি, অবান্তর ঘটনা ও পরিস্থিতির অবতারণা এবং সম্ভাব্যতা বিচার না করে সংলাপ—প্রয়োগ পালাকারদের পক্ষে প্রশংসনীয় নয়। বর্তমান যুগে দর্শকদের নাট্যচেতনা অনেকাংশে বর্ধিত। কাজেই লোকনাট্য রচনায়ও পালাকারদের দৃষ্টি ভংগীর কিছুটা পরিবর্তন আবশ্যক। তাতে যাত্রার নাট্যগুণ ও সাহিত্যিক মূল্য দুটোই যে বেড়ে যাবে এবিষয় কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া দর্শক তৈরি করার দায়িত্বের কথাও নাটক রচয়িতাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য।

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের মালোয়া নামক স্থানে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা সামান্য করনিকের কর্ম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। রত্নগিরি বিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ বোম্বাবই এর এলফিনষ্টোন কলেজে প্রবেশ করেন ও বিশেষ যত্নের সহিত ইংরাজী সাহিত্য ইতিহাস, বিজ্ঞান ও গণিত অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে কৃতিত্বের সহিত শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাঁহাকে পুণা ডেকান কলেজের "ফেলো" নিযুক্ত করা হয়। এই সময়ে বোম্বাই প্রদেশের তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা মিঃ হাউয়ার্ডের সহিত রামকৃষ্ণের পরিচয় স্থাপিত হয়। রামকৃষ্ণের বিদ্যা ও তীক্ষ্ণধী লক্ষ্য করিয়া মিঃ হাউয়ার্ড তাঁহাকে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে প্ররোচিত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই নিয়ম হয় যে সমুদর বৃত্তিভোগী ছাত্রগণকে (ফেলো) বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত পাঠ্য তালিকানুযায়ী পরীক্ষা দিতে হইবে। নূতন নিয়ম অনুযায়ী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রথম যে চারিজন ছাত্র বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকত্বের (বি.এ ডিগ্রী) গৌরব অর্জন করেন তাঁহাদের মধ্যে রামকৃষ্ণ গোপাল অন্যতম, দ্বিতীয় জন ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে। উত্তরকালে ইনি রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ লাভ করেন। বি. এ ডিগ্রীলাভের পর বৎসরেই রামকৃষ্ণ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে ও সংস্কৃত উভয় বিষয়েই পরীক্ষা দিয়া এম. এ ডিগ্রী পান। এই বৎসর তিনি হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু দেশ, বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি রত্নগিরি সরকারী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, প্রথম জীবনে তিনি এই বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যেই তিনি ছাত্র পাঠ্য দুইখানি সংস্কৃত পুস্তক (স্যানস্ক্রিট রীডার) রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ গোপাল বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সরকারী শিক্ষা বিভাগে কখনও বোম্বাই কখনও বা পুণায় সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে কর্ম করেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পুণার ডেকান কলেজের প্রধান অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই পদ হইতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলার) নিযুক্ত হন। ইহার বহু পূর্ব হইতেই তিনি সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার সহিত জড়িত থাকিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে সচেষ্ট হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ গভর্নর জেনারেলের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদলাভ করেন। পর বৎসর হইতে চারি বৎসর কাল তিনি বোম্বাই-এর প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি কে, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

কর্মজীবনে রামকৃষ্ণ বোম্বাই-এর সরকারী শিক্ষা বিভাগে উচ্চ বেতনে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, একজন শিক্ষাবিদ্ রূপে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যত্ব লাভ ও

তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল ইহা তাঁহার বাহ্য পরিচয়, একজন অদ্বিতীয় ভারত বিদ্যাসাধক রূপেই তাঁহার প্রকৃত খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডেকান কলেজের "ফেলো" থাকা কালেই তিনি সযত্নে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন ও অচিরকালের মধ্যেই উত্তম রূপে উহা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থিদের উপযোগী দুইটি উত্তম সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন, এই রীডার দুইটি শিক্ষার্থিদের নিকট বিশেষ সমাদর লাভ করে। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত ভাষার এম, এ. ডিগ্রী অর্জন করেন ও পরে বোম্বাই এর এলফিনষ্টোন কলেজে সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ বুল্যারের চেষ্টায় সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ব্যুল্যর নিজেই ঐ পদে আসীন ছিলেন তাঁহার অন্য কর্মে নিয়োগ হইলে ঐ পদ শূণ্য হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া রামকৃষ্ণ সুবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ঐ প্রবন্ধটি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বোম্বাই শাখায় পঠিত হইলে তিনি ভারততত্ত্ববিদ্‌রূপে খ্যাতি লাভ করেন, ইতিপূর্বেই সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃতের নিপুণ অধ্যাপকরূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপ হইতে আন্তর্জাতিক প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনে যোগদানের জন্য তাঁহার নিকট আমন্ত্রণ আসে কিন্তু তিনি উহাতে যোগদান করিতে না পারিয়া অধিবেশনে পাঠের জন্য নাসিকের শিলালিপি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়া দেন, পরবর্তীকালে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এই সম্মেলনের ভিয়েনা অধিবেশনে যোগদান করেন ও একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। রামকৃষ্ণ গোপালের সম্মেলনে উপস্থিতি ও প্রবন্ধ পাঠ সম্মেলনকে এতদূর সাফল্যমণ্ডিত করে যে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ এই ভারতীয় পণ্ডিতকে প্রেরণ করার জন্য বোম্বাই প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রীয় ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দানের এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যভার পরিত্যাগ করার পর—রামকৃষ্ণ গোপাল পুণা নগরীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। ভারত বিদ্যাচর্চাই তাঁহার অবসরকালের অবলম্বন ছিল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট পুণা নগরীতেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

রামকৃষ্ণ গোপালের ভারতবিদ্যাচর্চার তিনটি ধারাই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ রামকৃষ্ণ গোপাল সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগ সম্বন্ধেই প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেন। মালতী মাধব নাটকটি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সুসম্পাদিত করিয়া প্রকাশ করেন। ভেবর ও পেটারসনের মত খণ্ডন করিয়া তিনি পতঞ্জলির সঠিক আবির্ভাব কাল নির্ণয় করেন। ভারতীয় ধর্মতত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে তিনি ব্যুলার সম্পাদিত ভারতবিদ্যার বিশ্বকোষে একটি অতি সুদীর্ঘ নিবন্ধ (পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত) প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি প্রমাণিত করেন যে ভারতের বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গীতা এবং উপনিষদ্ হইতেই উদ্ভব হইয়াছে। এই নিবন্ধে তিনি বৈষ্ণব মতবাদ কিভাবে যুগে যুগে রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব, রামানন্দ, শ্রীচৈতন্য, বল্লভাচার্য, নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির সাধনায় বিবর্তিত হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার তাঁহাকে সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহের ভারার্পণ করেন, ইহার পূর্বে পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব ব্যুলারের উপর ন্যস্ত ছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ১৮৭৯ হইতে ১৮৯১ পর্যন্ত সংগৃহীত পুঁথির তালিকা ছয়খণ্ডে প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টগুলি সংস্কৃত ভাষার বহু অজ্ঞাত পুস্তক ও গ্রন্থাকার সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্যের আকর বলিয়া পরিগণিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় গবেষণা ব্যতীত রামকৃষ্ণ গোপাল ভারতীয় ভাষা তত্ত্বের গবেষণাতেও মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ভারতীয় ভাষা তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন (উইলসন্ ফিলোলজিক্যাল লেকচারস্)। রামকৃষ্ণ এই

ভাষণাবলীতে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের উপর সবিশেষ আলোকপাত করেন। একজন জার্মান (অধ্যাপক উইন্‌ডিশ্‌) এই ভাষণগুলি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ঋগ্বেদের ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বর্তমান রূপ প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে ভারতীয় ভাষার বিবর্তন আর কেহ ইতিপূর্বে এমনভাবে আলোচনা করেন নাই। উইলসন্‌ ফিলোলজিক্যাল লেকচারস্‌গুলি প্রদত্ত হইবার প্রায় অর্ধ শতাব্দীর পরে জার্মান ভাষাতত্ত্বজ্ঞ অধ্যাপক উইণ্ডিসের এই মন্তব্য সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব আলোচনাতেই রামকৃষ্ণের প্রতিভা আবদ্ধ থাকে নাই। প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার ও প্রাচীন ইতিহাসের চর্চাতেও রামকৃষ্ণ সবিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তাঁহার রচিত দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস (হিস্ট্রি অব্‌ ডেকান্‌ ১৮৮৪) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতিতে ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকের উপাদেয়তা কদাপিও হ্রাস পাইবে না।

দীর্ঘজীবী রামকৃষ্ণ বহু বৎসরের নিরলস সাধনায় বহু পুস্তক ও নিবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। বহু নূতন তথ্য ও চিন্তার জনকরূপে ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি সম্মানিত। তাঁহার প্রতিটি রচনা বিচার বিশ্লেষণ সমৃদ্ধ। ভারতীয় সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার প্রায় প্রতিটি রচনাই নূতন আলোকপাত করিয়াছে। রামকৃষ্ণের ভারতবিদ্যানিষ্ঠা বহু তরুণ গবেষককে ভারতবিদ্যাচর্চায় অনুপ্রাণিত করে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ গ্রেট্‌ব্রিটেন রামকৃষ্ণকে সোসাইটির সম্মানিত সভ্য শ্রেণীভুক্ত করেন। কলিকাতা ও জার্মানীর গোটিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৮৫) তাহাকে সম্মানসূচক পি, এইচ্‌, ডি, উপাধিতে ভূষিত করেন। তদানীন্তন ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনে রামকৃষ্ণ অতিশয় সৎ, উদারহৃদয় ও সত্য-প্রিয় ছিলেন। শেষ জীবনে পুণায় বাসকালে লোকে তাঁহাকে মহর্ষি বলিত। রামকৃষ্ণ অতিশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকার কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রথাকে ঘৃণা করিতেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি সামাজিক নির্যাতনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার বিধবা কন্যার পুনরায় বিবাহ দিয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলাদেশের ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে বোম্বাই প্রদেশে "প্রার্থনা সমাজ" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, বাল্যবিবাহ নিরোধ, একেশ্বরবাদ প্রচার প্রভৃতি এই সমাজের কর্মসূচী ছিল। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি বাঙালী ব্রাহ্ম নেতাগণ বোম্বাই প্রার্থনা সমাজের আমন্ত্রণে এই সব বিষয়ে বক্তৃতা দিতে প্রায়ই বোম্বাই গমন করিতেন। আত্মারাম পাণ্ডুরঙ্গ, মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর প্রভৃতির চেষ্টায় এই "প্রার্থনা সমাজ" গঠিত হয়। রামকৃষ্ণ পুণায় বাসকালে পুণায় প্রার্থনা সমাজের নেতৃত্ব করিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "আমার আত্মকথা ও বোম্বাই প্রবাস" গ্রন্থে পুণার প্রার্থনা সমাজ ও উহার নেতারূপে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার করের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে।

রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার করের জীবনব্যাপী ভারত-বিদ্যাচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপে রামকৃষ্ণের ৮০তম জন্মদিবস উপলক্ষে পুণায় ভাণ্ডার কর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট্‌ নামে একটি প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়। সার দোরাব টাটা, সার রতন টাটা প্রভৃতি ধনকুবের এবং বোম্বাই গভর্নমেন্টের অর্থানুকুল্যে এই প্রতিষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন বোম্বাই-এর তদানীন্তন গভর্নর লর্ড উইলিংডন কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই সম্পন্ন হয়। পঞ্চাশ বৎসরের চেষ্টায় বোম্বাই সরকার ব্যুলার, পিটরসন ও রামকৃষ্ণ ভাণ্ডার কর প্রভৃতির সহায়তায় যে সব সংস্কৃত ও

প্রাকৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন তাহা এখানে রক্ষিত হয়, এতদ্ব্যতীত রামকৃষ্ণের ব্যক্তিগত সংগ্রহের তিন হাজার সংখ্যক পুঁথি ও পুস্তক রামকৃষ্ণ এই প্রতিষ্ঠানে দান করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি ভারতবর্ষের প্রমুখ প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র, এই প্রতিষ্ঠান হইতেই মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণ মুদ্রণের পরিকল্পনা লওয়া হয়। এই মহাভারত ২৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ ২১টি সুবৃহৎ খণ্ড ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী খণ্ডগুলি অচিরেই প্রকাশিত হইবে আশা করা যায়।

রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ভাণ্ডার কর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে তাঁহার সমগ্র রচনাবলী চারি খণ্ডে (ডিমাই সাইজ ১৭৫০ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছে (*)। এই চারিখণ্ড পুস্তকে রামকৃষ্ণ-ভাণ্ডার-করের জীবনব্যাপী ভারত বিদ্যাচর্চার সম্যগ্‌ পরিচয় নিহিত আছে। রামকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র দেবদত্ত ভাণ্ডার করের নাম বঙ্গদেশে সুপরিচিত। ইনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন (কারমাইকেল প্রফেসার অফ্‌ এনসিয়াণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি য়্যাণ্ড কালচার)। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহারও মৃত্যু হইয়াছে।

* Collected Writings of R. G. Bhandarkar. Ed. by Udgikar & Paranjape—Bub. by Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona (1927-33).

ফারুখশিয়রের ফারমান ও ডাক্তার উইলিয়াম হ্যামিলটন

দীপক সেন

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে হুগলী নদীর তীরে ইংরেজরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিচ্ছিল ধীরে ধীরে। ডাচ, ফরাসী, পর্তুগীজ, জার্মানী বণিকেরা সে সময়ে বেশ কায়েম হয়ে নদীমাতৃকা বাংলার বুকে বেসাতি নিয়ে বসে গেছে। তাই আস্তানা খুঁজে পেতে ইংরেজদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

ষোলশো একান্ন খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা হুগলীতে আস্তানা পত্তন করে। সাত আট বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ব্যবসায় লাভের অংক বাড়তে থাকে। বাদশাহ সাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার সুবাদার সুজার কাছে দরবার করে ইংরেজ কোম্পানী এককালীন বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। আলমগীর বাদশাহ হবার পর ষোলশো আশী খৃষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ আর একটি বাদশাহী ফরমান জারী হল ইংরেজদের স্বপক্ষে। স্থির হল সর্বসাকুল্যে শতকরা ৩২% শুল্ক দিলেই অন্যান্য যাবতীয় শুল্ক থেকে রেহাই পেয়ে ব্যবসা করবেন তাঁরা। ফরমানের সমস্ত আদেশ কার্যতঃ বলবৎ হোতো না স্থানীয় মোগল রাজ কর্মচারীদের জবরদস্ত জুলুমে। নানা অন্যায় দাবী-দাওয়া করতেন তাঁরা। উপায়ান্তর না দেখে ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীরা 'বলং বলং বাহুবলং' নীতির অনুসরণ করলেন। আইন অমান্যের অভিযোগে তিনজন ইংরেজ ধৃত হন হুগলীতে, আর তাইতে রেগে জব চার্ণক—কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা—হুগলী সহরে আগুন লাগিয়ে, মোগলদের জাহাজ বিধ্বস্ত করে নদী বেয়ে পালিয়ে গেলেন মেদিনীপুরের হিজলীতে।

ওদিকে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের ইংরেজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে মোগল রাজকর্মচারী-দের বিরোধ প্রকটতর হতে থাকে, বিশেষতঃ বোম্বাই আর সুরাটে। আচমকা আক্রমণে মোগল-বাহিনীর কাছে ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বোম্বাই, সুরাটের কুঠিয়াল ইংরেজ অনেকেই বন্দী হলেন মোগলদের শিবিরে। আলমগীর আদেশ করলেন ইংরেজরা ব্যবসা করতে পারবেন না মোগলদের অধিকৃত ভারতবর্ষে আর তাঁর কোনও প্রজা ব্যবসা করতে পারবে না ইংরেজদের সঙ্গে।

ইংরেজ তথা ইউরোপীয় প্রতিটি জাতির নৌশক্তিই মোগল রণতরীর চেয়ে বেশী শক্তিমান ও পরাক্রমশালী। অথচ সুরাট অর্থাৎ 'মক্কার দ্বার' থেকে আরব সাগর দিয়ে পুণ্য মক্কাশরীফে হজ যাত্রীদের জাহাজের নিরাপত্তারও প্রয়োজন। বিশেষতঃ, তখন পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে পর পর কয়েকটি হজ যাত্রীবাহী জাহাজ আক্রান্ত হয়েছিল। 'জিন্দা পীর' বাদশাহ আলমগীর হজ যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন। জলপথে ইংরেজরা সহায় হবে এই কথা ভেবে সুরাটের ইংরেজরা নগদ ১৫০,০০০্ টাকা অর্থদণ্ড দিয়ে ষোলশো নব্বই সালের ৪ঠা জানুয়ারী থেকে আবার মোগল বাদশাহর সুনজরে আসে। শায়েস্তা খাঁর বদলে তখন বাংলায় মোগলশাসক হয়ে এসেছেন ইব্রাহিম খাঁ। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ তিনিও ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিলেন।

এরই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সুতানটী, গোবিন্দপুর আর কালীঘাট এই তিনখানি গ্রামের উপর ইংরেজের নজর পড়ল। কোম্পানীর কর্মপরিচালক জব চার্ণককে পেয়ে বসল

একটি ভাবনা। কেমন করে এই গ্রাম কখানির উপর নিজের অধিকার স্থাপন করা যায়। সৌভাগ্য-ক্রমে জব চার্ণকের হঠকারিতার পরোক্ষ ফলস্বরূপ সেই সুযোগও এসে গেল।

ষোলশো আটানব্বুই সাল। কলিকাতার মূলকেন্দ্র এই তিনখানি গ্রামের মালিক সাবর্ণ চৌধুরীরা। বর্তমানের লালদিঘী সেকালে আয়তনে আরও অনেক ছোট ছিল। এরই উপর চৌধুরীদের দোলমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত ছিল। দোলপূর্ণিমার রাতে খেলা হত হোলি আবীরের রঙে দীঘির জল হত রাঙা। তাই এখন আজও এটা লালদীঘি। তাই এখন যেখানে টেলিফোন ভবন সেই জায়গা বরাবর আগে ছিল ড্যালহৌসী ইনস্টিট্যুট, তারও আগে ট্রেডার্স এসেম্ব্লি আর সে আমলে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছারী বাড়ী। এই কাছারী বাড়ীর এক অংশে ঘর ভাড়া করে তৎকালীন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসা করত, কাগজপত্র রাখত।

সাবর্ণ চৌধুরীদের আমমোক্তার ছিলেন এন্টনী। দোল পূর্ণিমার উৎসব রজনীতে জব চার্ণক ও তাঁর সহকারীদের উৎসবে প্রবেশানুমতি দিলেন না বরং দু'চার কথা শুনিয়ে দিলেন। প্রতিশোধ নিতে জব চার্ণক সদলবলে ফিরে এলেন ঘোড়া চালানোর চাবুক নিয়ে। চড়াও হলেন উৎসব প্রাংগণে। অপমানে পালিয়ে গেলেন এন্টনী। সাবর্ণ চৌধুরীরা ওই জায়গার জমিদারী বেচে দেবার সিদ্ধান্ত করলেন। খরিদ করতে সদা উৎসুক ইংরেজ কোম্পানী সুযোগের অপব্যয় করলেন না। সে আমলের বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ মালিক অর্থাৎ বাদশাহের অনুমতি ছাড়া জমিজমার হস্তান্তরকরণ ছিল সম্পূর্ণ বে-আইনী।

বাদশাহী আমীর-ওমরাহ, কর্মচারীদের থেকে তদ্বির তদারক শুরু করে নজরানা মোট কুড়ি হাজার টাকা খরচ করলেন কোম্পানীসাহেব। সে আমলে এদেশীয় লোকেরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ওই নামেই ডাকত।

অনুমতি পেলেন কোম্পানী—কুড়ি হাজার টাকার নজরানার ভিত্তিতে। সাবর্ণ চৌধুরীরা পেলেন কোম্পানীর কাছ থেকে মাত্র তেরশত টাকা। বিকিয়ে দিলেন আজকের কলিকাতা শহরের মূলকেন্দ্র।

বাংলার সুবায় তখন শাহজাদা আজিমুশশানের অধীনস্থ নাজিম মুর্শিদকুলী খাঁ প্রবল প্রতাপান্বিত। এই হস্তান্তরের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। পাটনা প্রবাসী বাদশাহজাদা আজিমুশাশান বিলাসপ্রিয় ছিলেন। অতশত রাজনীতি বা রাজস্বনীতি বুঝতেন না। রাজনীতি বলতে সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু দেখতেনও না। ইংরেজ কোম্পানীকে অনুমতি তিনিই দেন। ষোলশো আটানব্বুই এর ১০ই নভেম্বরের সেই হস্তান্তর দলিল হল—যাতে কলিকাতার মালিক হলেন কোম্পানী। আজও তা ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে।

দাক্ষিণাত্য ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতি ও বাদশাহ আলমগীরের বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষমতায় মোগলসাম্রাজ্য জরাজীর্ণ। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। এই দুর্গ (পুরাতন দুর্গ) বর্তমান জেনারেল পোস্ট অফিসের স্থল ভিষিক্ত ছিল। সতেরোশো খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কালেক্টর কোম্পানীর তরফ থেকে জমি বিলি ব্যবস্থা শুরু করলেন।

সতেরোশো সাত থেকে সাত বছরে ইতিহাসের পট পরিবর্তন হল বারবার—প্রথমে গেলেন 'জিন্দাপীর' আলমগীর—বাদশাহী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল ও ধ্বংসোন্মুখ করে—মার্চ, সতেরোশো সাত। তারপর বাহাদুর শাহ, ফেব্রুয়ারী, সতেরোশো বার।

গৃহযুদ্ধ—ময়ূরসিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর হতে লাগলো। অকর্মণ্য, বদ-খেয়ালী

মইজ্উদ্দিন, বাহাদুর শাহের জ্যেষ্ঠ পুত্র, বসলেন তক্তে, নামকরণ হল জাহন্দর শাহ। আজিমুশশান শাহজাদা তক্তের লড়াইএ পরাজিত আর তাঁরই পুত্র শাহজাদা ফারুখশিয়র তখন বাংলার সুবাদার হয়েছিলেন। বছর ঘুরতে দিলেন না তিনি। আগ্রার যুদ্ধে জ্যেষ্ঠতাত জাহান্দর শাহকে পরাজিত করে সগর্বে প্রবেশ করলেন দিল্লীতে, সতেরোশো তের খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে।

বাংলার সুবাদারী পেলেন মীরজুমলা, নাজিম রয়ে গেলেন মুর্শিদকুলী খাঁ। ইংরেজ-বিদ্বেষী মুর্শিদকুলী রাজস্ব ও শুল্ক নিয়ে নানারকম দাবী দাওয়া উপস্থিত করলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মপরিচালক কাউন্সিল স্থির করলেন বাদশাহ ফারশখশিয়রের দরবারে দূত পাঠাতে। পাটনার (আজিমাবাদ) ইংরেজ কুঠিয়াল জন সুরম্যানএর উপর নেতৃত্ব দিয়ে দৌত্য পাঠালেন দিল্লীর দরবারে। সতরোশো চোদ্দ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে পাটনায় কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা একটি চিঠি পাঠিয়ে দৌত্যের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন—

'একটি বাদশাহী ফরমানে আমাদের আগেকার পাওয়া যাবতীয় সুবিধা দৃঢ়তর ভাবে অনুমোদন করবেন এবং যেখানেই আমাদের আগে বা বর্তমানে কুঠি ছিল বা আছে সেখানেই সে সব সুখ-সুবিধা, কর বা শুল্ক রেহাইএর ফরমান প্রযোজ্য হবে।'

সুরম্যানের সহকারী হিসেবে এডওয়ার্ড স্টিভেনসন, সেক্রেটারী হিসেবে হিউবার্কার, দোভাষী হিসেবে কলিকাতা প্রবাসী আর্মানী বণিক খোজা ইসরাইল সারহাদ আর ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন। দিল্লীতে হ্যামিলটনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কৃতিত্বে কোম্পানীর ব্যবসায়ে স্থিতি—কলিকাতার অস্তিত্ব পাকাপাকি-আর পরবর্তীকালের পরোক্ষ ফল বাংলার মসনদ।

স্কটল্যাণ্ডের অন্তঃপাতী ড্যালজেলের বিখ্যাত হ্যামিলটন বংশ-যাঁর প্রতিষ্ঠাতা পঞ্চদশ শতকের অন্যতম প্রধান স্কচ ব্যারন লর্ড জেমস হ্যামিলটন—সেই বংশে প্রেসবেটেরিয়ন পাদ্রী জন অব বগসের দ্বিতীয় পুত্র উইলিয়ম। স্কটল্যাণ্ডের উদ্যান বথওয়েলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ক্লাইড নদীর কলতানমুখরিত পরিবেশে উইলিয়মের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। তাঁর অন্যতম পিতৃব্য স্যর ডেভিড হ্যামিলটন ছিলেন রাজ পরিবারের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক। সম্ভবতঃ তিনিই উইলিয়মের চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণের অনুপ্রেরণা।

কেউ কেউ বলেছেন যে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রতালিকায় যে উইলিয়ম হ্যামিলটনের নাম আছে তিনিই এই ডাক্তার। মুস্কিল হচ্ছে এই যে সেই তালিকায় কোনও প্রাক্তন ছাত্রের নামের সঙ্গে পিতৃ পরিচয় লেখা নেই। তর্কে গিয়ে লাভ নেই। আমরা যে ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটনকে জানি তিনি চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করেন। কেউ কেউ বলেছেন যে ইংলণ্ডের বাইরে লাইডেন বা রিমসে পড়াশুনা করে থাকবেন তিনি।

সতেরোশো নয় খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তিনি ভাগ্যান্বেষণের জন্যে চাকুরী নিলেন 'শেরবোন' জাহাজে। ছোট্ট জাহাজ—মাত্র আড়াইশ টন। বাণিজ্যপোতের অধ্যক্ষ হেনরী কর্নওয়ালের অধীনে জাহাজের চিকিৎসক। ইণ্ডিয়া অফিসে'র নথিতে পাওয়া যায় যে ঐ ভাগ্যান্বেষীর দু মাসের অগ্রিম বেতন ছিল সাত পাউণ্ড। সতেরোশ দশ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী যাত্রারম্ভ হয় 'শেরবোনের' অক্টোবরে এসে পৌছয় কলিকাতার বন্দরে। পথে জাহাজের অধ্যক্ষের দুর্ব্যবহারে নাবিক ও কর্মীরা গেল বিগড়ে। উইলিয়ম নিরপেক্ষভাবে ধৈর্যধরে দিন কাটাতে লাগলেন। কলিকাতায় এসে 'শেরবোন' জাহাজের গোলমালের গোঁজামিল দেওয়া ফয়-সলা হল তাত্রস্থ কাউন্সিলের মধ্যস্থতায়। কলিকাতা থেকে মাদ্রাজ সেখান থেকে কুদ্দালোর

পর্যন্ত গেলেন উইলিয়ম। মন হাঁপিয়ে উঠেছে তাঁর। জাহাজের নীচে সাগরের নীল আর ডেকের ওপরের জল ক্রমশঃই ঘোলা হয়ে উঠছে হেনরী কর্নওয়াল আর কর্মচারীদের বিবাদ-বিসম্বাদে। জিঞ্জির রাজার সঙ্গে তখন ইংরেজদের যুদ্ধ চলছে ফোর্ট সেন্ট ডেভিডে। সুযোগসন্ধানী উইলিয়ম সেন্ট ডেভিডের কর্তাদের কাছ থেকে সুপারিশ আনলেন যে ফোর্ট সেন্ট ডেভিডে দুর্গতদের চিকিৎসার জন্যে উইলিয়ম হ্যামিলটনকে তাঁদের চাই। এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানলেন হেনরী কর্নওয়াল। ফোর্ট সেন্ট ডেভিডের চাকুরীর আশাও তিরোহিত হয়ে গেল কারণ তত্রস্থ কর্মকর্তারা পৌঁছিয়ে গেলেন কর্নওয়ালের হুমকীতে।

হ্যামিলটন দমবার পাত্র নন। দেশে ফেরবার আকুল আগ্রহ তাঁর অন্তরে। ভাগ্যান্বেষণে জাহাজে চাকুরী নেন। দ্রুত স্বচ্ছল অবস্থায় পেঁছাতে পারবেন এই ভেবে। স্কটল্যান্ডের কাম্বাসনেদারের গির্জার পুরোহিত রবার্ট হ্যামিলটনের কন্যা অ্যানা—তাঁর দূর সম্পর্কিত আত্মীয়াকে নিকটতমা করবার আন্তরিক ইচ্ছাই তাঁকে ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত করেছিল। মানুষ ভাবে এক হয় আরেক। অ্যানাকে বিয়ে করা তাঁর জীবনে সম্ভব হয় নি। যাক সে কথা।

ক্যাপ্টেন হ্যামিলটন নামে তাঁর স্বদেশীয় এক নাবিকের কাছ থেকে একটি চিঠি সংগ্রহ করে ফোর্ট সেন্ট ডেভিডের ডেপুটি গভর্নর ফারমারকে দেখিয়ে তাঁর প্রত্যয় সৃষ্টি করে উইলিয়ম মাদ্রাজে ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে যাচ্ছেন এই অছিলায় স্থানত্যাগের আবেদনপত্র মঞ্জুর করিয়ে নেন। তেসরা মে সতেরোশো এগার। উইলিয়ম হ্যামিলটন একটি দেশীয় নৌকায় চড়ে পলায়ন করলেন শেরবোর্ণ ছেড়ে। শেরবোর্ন ত্যাগ করাই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। দেশে ফেরা আর হোলো না। সে আমলে বছরে দু'এক খানিই জাহাজ যেত আসত সে কথা জেনেও হ্যামিলটন যে কেন পালালেন শেরবোর্ন থেকে তার একমাত্র জবাব বোধ করি নিয়তি কেন বাধ্যতে।

হেনরী কর্নওয়ালের এতই রাগ যে উইলিয়ম হয়ে গেলেন আলেকজাণ্ডার। সে যাই হোক মাদ্রাজের কাউন্সিল আদেশ করলেন উইলিয়মকে শেরবোর্ন-এ ফিরে যেতে।

উইলিয়ম ফেরেন নি। পলায়নের শেষ পর্যায়ে এলেন কলিকাতায়। আর শেরবোর্ন জাহাজের লেজার বইতে হ্যামিলটন নামের পাশে শ্লেষাত্মক মন্তব্য সংযোজিত হলো 'রান'—পলাতক। কলিকাতায় এসেছিলেন দেশে ফেরবার পাথেয় সংগ্রহ করতে। সঙ্গে কাণাকড়িও নেই। ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হলেন। চাকুরী জুটে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতেই। সতেরো-শো এগার খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কোম্পানীর কাউন্সিলে নিয়োগপত্র পাশ হল—

কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতনের তালিকা (সেপ্টেম্বর, সতেরোশো বার) থেকে জানা এই দুজন চিকিৎসকই পেতেন, ষাণ্মাসিক ছত্রিশ পাউণ্ড—অর্থাৎ মাসিক ছয় পাউণ্ড। বছর দু'য়েক কাজ করবার পরই কলিকাতা ছাড়তে হল উইলিয়মকে।

জন সুরম্যানকে কলিকাতার কাউন্সিল ১৩ই মে, সতেরোশ চোদ্দ খৃষ্টাব্দে যে পত্র দেন তাতে উইলিয়মের উল্লেখ ছিল।

জন সুরম্যানের ডাইরীর আরম্ভ ১৫ই আগষ্ট, সতোরোশো চোদ্দ। কলকাতা থেকে থেকে উইলিয়ম হ্যামিলটন, সেক্রেটারী বার্কার নভেম্বর নাগাদ গিয়ে পৌঁছলেন পাটনায়। রওনা দিতে দিতে এপ্রিল, সতেরোশ পনের। কারণ তোড়জোড় করতে সময় লেগে গেল। রাজ-দরবারে যাবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করলেন সুরম্যান।

ইংরেজ দূতেরা বাদশাহ ফারুখশিয়র ও তাঁর সভাসদদের উপহার দেবার জন্যে নানা রকম কাঁচের পাত্র, ঘড়ি, ব্রোকেড, গরম কাপড় চোপড়, সিল্ক ও অন্যান্য জিনিষ নিয়ে প্রায়

তিরিশ হাজার স্টার্লিং পাউণ্ড ম্ল্যের জিনিষ নিয়ে স্রম্যান দৌত্য রওনা হয়। ইংরেজদ্তেরা অত জিনিষপত্র নিয়ে আসবেন তাই পথের নিরাপত্তার আবেদন করেছিলেন তাঁরা। বাদশাহ মঞ্জ্র করেছিলেন আরজি। দিল্লী পৌঁছতে হয়ে গেল জ্লাই, সতেরোশোপনের।

দিল্লী পৌঁছলে বাদশাহী প্রতিনিধিরা তাঁদের স্বাগত জানালেন, বাস ঐ পর্যন্তই। তারপর সব চ্পচাপ। ইংরেজ দ্তেরা যে আবেদন পত্রখানি নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা পড়ে দেখা বা সেই সংক্রান্ত কোনও কাজের কথা শ্নতেই চাইলেন না ফার্খশিয়র। কারণ মর্জি। বাদশাহী মর্জি। রাঠোর রাজবংশীয় যোধপ্রের মহারাজা অজিত সিংহের কন্যা রাই ইন্দা কানওয়ারের সংগে বাদশাহ ফার্খশিয়রের বিবাহ তখন একেবারে পাকা।

২৩শে সেপ্টেম্বর সতেরেশো পনর, মহারাজা অজিত সিংহ সকন্যাকা এসে উপস্থিত হলেন দিল্লী—২৭শে সেপ্টেম্বর রাজনন্দিনীকে ইসলামধর্মে দীক্ষিতা করে সন্ধ্যালগ্নে প্রধান কাজী শরিয়ৎ খাঁনের পৌরোহিত্যে আন্ষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করলেন বাদশাহ ফার্খশিয়র। এক লক্ষ স্বর্ণ ম্দ্রা স্ত্রীধন হিসেবে লেখা হল বাদশাহী আদেশে। প্রোহিত পেলেন দ্'হাজার টাকার উপহার।

বিবাহান্ষ্ঠানের পর উৎসবের আয়োজন চলল। ইংরেজ দ্তেরা না বলা বাণী নিয়ে ম্খব্জে দেরী সহ্য করতে লাগলেন। তাঁদের দিল্লী ত্যাগ করবার অন্মতিও দিলেন না বাদশাহ। 'ন যযৌ ন তস্থৌ'—ত্রিশংকুর অবস্থা। কোম্পানীর কাউন্সিল বলেছিল যে স্র-ম্যানকে যখন যা দরকার সে রকম অর্থ দেওয়া হবে। সেই ভরসায় লেটার্স অব্ ক্রেডিট্-এর বদলে টাকা আনিয়ে দেদার খরচা শ্র্ করলেন বাদশাহী আমীর ওমরাহ ম্ন্সীদের খ্শী করে রাখার জন্যে। দিন যেতে থাকে, ফ্রিয়ে আসে সব সঞ্চয় কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখে বিরক্ত ও ধৈর্যচ্যুত ইংরেজ দ্তেরা চলে আসা স্থির করলেন। আবার সেদিকেও বাধা। দিল্লী ত্যাগের অন্মতি নেই।

কাজের লোকের বসে সময় কাটানো ভাল লাগে না। অগত্যা রোগী দেখে সময় কাটাতে লাগলেন উইলিয়ম হ্যামিলটন। দিল্লীতে প্রথম প্রথম রোগ নিরাময় হতে যাঁরা—হ্যামিলটনের কাছে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মীর মহম্মদ জাফর ওরফে তকার্ব খাঁন, খান সামান। মোগল ওমরাহ মহলে তথা দিল্লী সহরে হ্যামিলটন খ্যাতি অর্জন করলেন অল্প-কালের মধ্যে। ফরাসী চিকিৎসক ম'শিয়ে মার্টিন ছাড়া অনেক নামকরা কবিরাজ, হাকিম, বৈদ্য বাদশাহীবেতনভূক হয়ে দিল্লীর দরবারে ছিলেন। ঈর্ষ্যানলে জ্বলে গেলেন এ'রা হ্যামিলটনের খ্যাতিতে। রাজদরবারে এবং দরবারের বাইরে ক্রমে শত্রসংখ্যা বেড়ে গেল উইলিয়ম হ্যামিলটনের।

ইতিমধ্যে বাদশাহ ফার্খশিয়র কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বিবাহোত্তর উৎসব বন্ধ হয়ে গেল।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে ডাক পড়ল হ্যামিলটনের। হ্যামিলটনের চিকিৎসায় স্স্থ-বোধ করায় বাদশাহ তাঁকে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করেন। রাজদরবারের চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণাধীনে রইলেন বাদশাহ।

সে যাই হোক না কেন অক্টোবর মাস পড়তে না পড়তে বাদশাহ প্নরায় অস্স্থ হয়ে পড়লেন। বাদশাহের জননী ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটনকে ডাকিয়ে পাঠালেন। হ্যামিলটন এলেন। দোভাষী খোজা ইসরাইল সারহাদের সহায়তায় বাদশাহী বেতনভূক চিকিৎসকমণ্ডলীর সংগে পরামর্শ করলেন হ্যামিলটন। দিল্লীতে প্রধান বাদশাহী চিকিৎসক ম'শিয়ে মার্টিন জাতিতে ফরাসী। ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার তাঁকে টেক্কা মেরে যাবে এটা তাঁর পক্ষে অসহ্য।

অন্যান্য স্থানীয় চিকিৎসকদের হ্যামিলটনের বিরুদ্ধে উস্কে দিলেন তিনি। গুজব রটে গেল হ্যামিলটনই বাদশাহকে মেরে ফেলতে চায়। এর পর পরই একদিন রাত্রে লালকেল্লার থেকে বাইরে আসার সময় অজ্ঞাত উৎস একটি প্রস্তরখণ্ড তাঁর ললাটে এসে লাগে। রক্তপাতও হয়। বোধ হয় সেই তর্পণেই পরে কোম্পানীর তক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঘটনাটি বাদশাহকে জানালে সঙ্গে সঙ্গে হ্যামিলটন দেহরক্ষী পেয়ে গেলেন।

বাদশাহের অসুখ গুরুতর রূপ ধারণ করল। ভগন্দরে আক্রান্ত বাদশাহ ফারুখশিয়র যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন—অন্তঃপুর বাসিনীরা শোকে মুহ্যমান—উৎকণ্ঠিত হ্যামিলটন রোগীর শয্যা পার্শ্বে অপেক্ষা করতে থাকেন অধীর আগ্রহে হাতে ছুরি, কাঁচি আর অন্যান্য অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম। যুৎবুঝে অস্ত্রোপচার করলেন সাফল্যের সঙ্গে। বিশে নভেম্বর, সতেরোশ পনের, বাদশাহ ফারুখশিয়রের প্লাস্টার খুলে দিলেন হ্যামিলটন। ধন্য ধন্য রব উঠল দিল্লী সহর জুড়ে। প্রাচ্য প্রথানুযায়ী বাদশাহ আরোগ্যস্নান করে সমবেত প্রজাদের দর্শন দিলেন। সপ্তাহের ব্যবধানে প্রকাশ্য দরবারে ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটনকে পুরস্কৃত করলেন ময়ূর-সিংহাসনের মালিক বাদশাহ ফারুখশিয়র। দুটি বহুমূল্য হীরক অঙ্গুরীয়, শিরপা, কালগি (মুকুটমণি), একটি উত্তম অশ্ব, একটি হস্তী, নগদ পাঁচ হাজার টাকা বহুমূল্য একটি পোষাক হ্যামিলটনকে উপহার দেওয়া হয়। আরও হুকুম হল যে ডাক্তারের যাবতীয় যন্ত্রপাতি সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দাও, কোট, ওয়েস্টকোটের বোতাম হীরক, চুণী বসিয়ে সোণার পাতে মুড়িয়ে দাও। শেষোক্ত হুকুম তামিল হতে অবশ্য এপ্রিল মাসের (১৭১৬) শেষের দিক হয়ে যায়। দোভাষী খোজা সারহাদ পুরস্কার পেলেন একটি ঘোড়া আর একটি শিরপা। মশিয়ে মার্টিনও বাদশাহী সৌজন্যে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন নি।

নীরোগ হলেন বাদশাহ। শুরু হল বিবাহোত্তর উৎসব। সারা মাসব্যাপী উৎসব। লালকেল্লা আলোকমালায় ঝলমল—ফুলে জিলাও খানার রাস্তার চারধার বিছানো। কেল্লার মধ্যে সর্বত্র আতরের খোসবু। ১৭ই ডিসেম্বর রাত নটা নাগাদ যোধপুরের কুটুমবাড়ী থেকে পাওয়া মহামূল্য পোষাক পরে নববিবাহিতা রাজপুতনন্দিনীকে নিয়ে চলমান আসনে বসে দিল্লী দরওয়াজা দিয়ে বের হলেন বাদশাহ। দর্শন প্রার্থীদের দেখা দিয়ে আনন্দকোলাহলমুখর রাত্রির শেষ যামে লাহোর দরওয়াজা দিয়ে কেল্লায় ফিরে এলেন বাদশাহ। আতসবাজীর বর্ণ-চ্ছটা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীদের যৌবনোদ্দীপ্ত নৃত্য, মোগলাই খানা মদ্য ও আরও নানাবিধ পানীয় ভর্তিপাত্রে চুমুক দিয়ে আনন্দ উপভোগ করলেন অভ্যাগত ও রাজঅতিথিরা। রাতকে দিন করবার মত অর্থ ও সামর্থ দেখে ইংরেজ দূতেরা নির্বাক।

দিনের পর দিন যেতে থাকে—বছর ঘুরে যায়—ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গনের মুখে অথচ ফরমান জারী হয় না, অনুমতি পাওয়া যায় না দিল্লী ত্যাগের। মে মাসে বাদশাহ আবার তলব কর-লেন হ্যামিলটনকে। মনে ভয় হয়েছে যে আবার পুরাতন ক্ষত মাথা চাড়া দিচ্ছে। হ্যামিলটন অভয় দিয়ে দিয়ে বললেন—এ সামান্য ব্যাপার ভয়ের কিছু নেই। বাদশাহী হাকিমদের ডাকানো হোক সামান্য পীড়া সহজেই সেরে যাবে। বাদশাহ নারাজ। গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হবে তাঁকে। ময়ূর সিংহাসনের ভাগীদার-দাবীদার অনেক। বারবার অসুস্থতার কথা রাষ্ট্র হতে দিতে চান না দরবারের চিকিৎসক মহলে। পুনরায় হ্যামিলটনের চিকিৎসায় নীরোগ হলেন বাদশাহ।

এতকাণ্ড ঘটে গেল বাদশাহ তবু নীরব। ফরমান জারী হয় না। অপেক্ষাক্লিষ্ট ইংরেজ দূতেরা পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে থাকেন—হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতে থাকেন

প্রয়োজনীয় ও বহু আকাঙ্ক্ষিত ফরমান আজিমুশশান শাহজাদার পুত্র বাদশাহ ফারুখশিয়র দেবেন কি না ?

আরও এক বছর গেল—দেশে ফিরতে দেরী হয়ে যাচ্ছে হ্যামিলটনের। আত্মীয় পরিজন ও প্রণয়িনী এ্যানার বিরহ সহন সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে—মুখেচোখে তার প্রতিফলন—শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। জন সুরম্যান, এডওয়ার্ড স্টিফেনসন হিউ বার্কারও বিলম্বের দরুণ অতিষ্ঠ। বহু তদ্বির তদারক করে, আমীর ওমরাহ মহলে যাতায়ত করে ও ভেট দিয়ে সতেরোশো সতোরর ফেব্রুয়ারীর বিশে বাদশাহ ফারুখশিয়রের সামনে তিনটি ফরমান উপস্থাপিত করলেন। বাদশাহ সই করলেন—দৌত্যের প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। এরপর তিনমাস সময় গেল ফরমানের নকল করতে—বাদশাহী পাঞ্জা দেওয়া ফরমানের নকল মোগলসাম্রাজ্যের অধীন সব রাজস্ব দপ্তরে পাঠাতে হবে তো। আরও নানান ফ্যাঁকড়া উঠল—পড়ল। অবশেষে ২৮মে তারিখে বিদায়ী দূতেরা দেওয়ানী আমে বাদশাহ ফারুখশিয়রকে সম্মানজ্ঞাপক কুর্নিশ ও মেহেরবানী জানাতে গেলেন। সিংহাসনের সামনে এসে এক একজন কুর্নিশ করছিলেন। সুরম্যান, স্টিভেনসন, বার্কার সব শেষে হ্যামিলটন। প্রত্যাগমনোন্মুখ হ্যামিলটন কুর্নিশ করতেই বাদশাহী কণ্ঠে হুকুম জারী হলো হ্যামিলটনের প্রতি "যেতে নাহি দিব।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সভাস্থল থেকে বাদশাহ চলে গেলেন অন্তঃপুরে। প্রত্যাবর্তনের সমস্ত ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে রাজদরবারে চাকুরীর ভাল ভাল প্রস্তাব বাদশাহ দিয়েছিলেন। সেগুলি হ্যামিলটন প্রত্যাখ্যান করেন। তাই পুনর্বিবেচনার জন্য আবার বাদশাহী আদেশ এল। হ্যামিলটন পুনরায় প্রত্যাখ্যান করলেন প্রস্তাব। "বাদশাহ আমাকে আটকাতে চাইলে গারদে পুরে রাখুন, তবু আমি তাঁর রুটি খাব না, চাকুরী তো দূরের কথা।"

এরপর ইংরেজরা বাদশাহের বাল্যবন্ধু ও অমাত্য খাজা আসিস সামসুমদ্দৌলা খান দুরানের কাছে ধর্ণা দিলেন। নিষ্ফল হয়ে প্রধান উজীর আব্দুল্লা খাঁর কাছে হাজির হলেন। হ্যামিলটনের কাকুতি মিনতি দেখে দয়ার্দ্র উজীর বাদশাহকে সব নিবেদন করলেন। সর্তাধীনে বাদশাহ হ্যামিলটনের যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সর্ত হল যে দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজনকে দেখে সপরিবারে ফিরে এসে ডাক্তার হ্যামিলটন মোগল দরবারে কাজে যোগ দেবেন।

সতেরোশ সতের সালের ৬ই জুন হুকুম পেলেন—কলিকাতায় পৌঁছুতে বছর প্রায় কাবার হয়ে গেল। ফিরতি পথে স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে থাকলো—বোধ হয় মৃত্যুলগ্ন অদূরবর্তী বুঝেছিলেন হ্যামিলটন। নদীবক্ষেই সুরজগড়ায়—মুঙ্গেরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে—একটি উইল রচনা করলেন।

ট্রাস্টি হলেন জন সুরম্যান। বাংলাদেশের চার্চে দিয়ে গেলেন এক হাজার টাকা, বন্ধু এডওয়ার্ড স্টিভেনসনকে পাঁচশ টাকা আর একটি হীরক অঙ্গুরীয়ক, জেমস উইলিয়মসনকে পাঁচশ টাকা. হিউ বাঁকারকে এবং ফিলিপসকে এক একটি হীরক অঙ্গুরীয়ক আর বিশ পাউন্ড করে অর্থ দিয়ে গেলেন, ট্রাস্টি জন সুরম্যানকে দিয়ে গেলেন বাদশাহ ফারুখশিয়র প্রদত্ত বহুমূল্য বৃহদায়তন হীরক খচিত অঙ্গুরীয়ক। অ্যানা হ্যামিলটনকে দিয়ে গেলেন পাঁচশত পাউন্ড। পাদ্রী পিতার পুত্র উইলিয়ম শুধু বাংলা দেশের গির্জাকেই যে টাকা দিলেন তা নয়, তার বাকী সম্পত্তি সবটাই লিখে দিলেন পিতৃদেবকে।

কলিকাতায় ফিরলেন হ্যামিলটন—তাঁরই কৃতিত্বে মুখ্যতঃ ফরমান আয়ত্ত হল। ইংরেজদের অধিকার সাব্যস্ত হল সুতানটী, গোবিন্দপুর ও কালীঘাটে। আর এ ছাড়া আরও

আটত্রিশটি গ্রাম কেনবার অনুমতি পেলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। গঙ্গার পশ্চিম তীরে সালিখা—সালকিয়া, হারিরা—হাওড়া, বটের—বেতোর, ব্যাঁটরা, কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণপুর আর পূব তীরে দক্ষিণ পাকপাড়া, কুমেরপাড়া—কামারপাড়া, বেলগসিয়া—বেলগাছিয়া, গোবরা, মিশ্রাপুর—মির্জাপুর, সিমুলিয়া, চৌরাঙ্গী—চৌরঙ্গী, ট্যাংরা সিলতলা—তালতলা সিয়ালদা—শেয়ালদা হিন্তালিয়া—ইনটালী, ক্যাংকরগসিয়া—কাঁকুড়গাছি ইত্যাদি।

'নিয়তি কেন বাধ্যতে।' ডিসেম্বর মাসের চার তারিখে কৃতী চিকিৎসক ও শল্যবিশারদ কলিকাতায় প্রাণত্যাগ করেন। পুরাতন কেল্লার দক্ষিণে তাঁকে সমাহিত করা হল। বাদশাহ দিল্লীতে খবর পোঁছলে অবিশ্বাস করলেন ঘটনা। স্বয়ং লোক পাঠালেন কলিকাতায় সত্যিই হ্যামিলটন সমাধিস্থ কি না জানার জন্যে।

সতোরোশো ছিয়াশি খৃষ্টাব্দে যখন সেণ্ট জনস চার্চ তৈরী হল তখন এই কীর্তিমান ডাক্তার হ্যামিলটনের কবর ও স্মৃতি ফলক সেই চার্চের প্রাঙ্গণের মধ্যে পড়ল। ওয়ারেন হেসটিংস, যিনি এই দৌত্যের ঘটনা জানতেন, তখন পার্লামেণ্টের শত প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে সদ্য দেশে ফিরে গেছেন।। হ্যামিলটনের স্মৃতিফলকটি সহ কবরটি এই গির্জার প্রবেশপথের পার্শ্বস্থ কোনও সমুন্নত জায়গায় যোগ্য মর্যাদা সহকারে রাখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কলিকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক আর কলিকাতার হিতকারী উইলিয়ম হ্যামিলটন দুজনেরই কবর আছে সেণ্ট জনস চার্চে। কিন্তু হেসটিংসের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হয় নি এবং জব চার্ণকের সমাধি মন্দিরেই ডাক্তার হ্যামিলটনের দেহাবশেষ সমাহিত করা হয় শেষ পর্যন্ত। স্মৃতিফলকে লেখা আছে দুটি অনুলেখ, একটি ইংরেজীতে আর একটি ফরাসী ভাষায়। ফরাসী লেখাটি দিল্লীর বাদশাহের কর্মচারীটিই করিয়ে দেন সমাধি ফলকে। শাহানশাহ আলম মহম্মদ ফারুখশিয়র গাজীকে যে ইংরেজ ডাক্তার ও দূত আরোগ্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন এই ফলক তাঁর স্মৃতি বহন করছে। ইংরেজিতে লেখা আছে—

"Under this stone lyes interred the body of Willam Hamilton, Surgeon, who departed this life the 4th December 1717. His memory ought to be dear to this nation for the credit he gained the English in curing Farrukseer, the present king of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great Monarch, and without doubt will perpetuate his memory as well in Great Britain as all other nations in Europe".

দুঃখের কথা এই যে, চিরদিনের মতই ডাক্তার উইলিয়ম হ্যামিলটন থেকে গেলেন উপেক্ষিত নায়ক—ভারতে বৃটিশ রাজত্ব পত্তনে তাঁর কীর্ত্তি অবিস্মরণীয় করে রাখা ছিল উচিত। কিন্তু তা হয় নি। ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে কোনও কারণেই হোক পরবর্তী ইংরেজ রাজপুরুষরা প্রাপ্য সম্মান বা প্রতিষ্ঠা তাঁকে দেন নি। ঐতিহাসিকেরা কিন্তু তা করেন নি। যাই হোক্, অন্ততঃ দু'চার ছত্র প্রত্যেকেই প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করে গেছেন।

রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তা

অরুণ সান্যাল

চৈত্রসংখ্যা সমকালীন-এ রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তার মূল সূত্র গুলো আমরা অনুধাবন করতে চেষ্টা করেছি। এবং লক্ষ্য করেছি একদিকে য়ুরোপীয় অর্থনৈতিক তত্ত্ব ও তথ্যের সঙ্গে সুগভীর পরিচিতি অন্যদিকে ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমস্যার সম্যক জ্ঞান তাঁকে তাঁর স্বাধীন স্বকীয় চিন্তার ক্ষেত্রে উন্নীত করে দিয়েছিল, যে চিন্তালব্ধ ফলপ্রাপ্তি না ঘটলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক আলোচনার ইতিহাসে ভারতীয় চিন্তার সূচনা হত সুদূরে পরাহত। তবে কোন মানুষই যেমন পরিপূর্ণ ভাবে নির্ভুল মত ও পথ গ্রহণ করতে পারে না, রাণাড়েও তেমনি যে সর্ব-ত্রুটি মুক্ত নয়—একথা বলতে লজ্জা নেই। অধ্যাপক ভবতোষ দত্ত তাঁর এক প্রবন্ধে আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে ক্লাসিক্যাল তত্ত্বকে সমালোচনা করতে গিয়ে জার্মান হিষ্টোরিক্যাল স্কুল-এর অর্থনীতিবিদরা যে ভুল করেছিলেন, রাণাড়েও সেই ভুল করেছেন। এ ত্রুটির কথা স্বীকার করলেও রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলো অস্বীকৃত হয় না; কেননা রাণাড়ের চিন্তার এমন কতকগুলো বিশিষ্টতা আছে—যা তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।

ভারতবর্ষে যখন একদিকে আভ্যন্তরীণ অশিক্ষা ও অনগ্রসরতা শিল্পায়নকে বাধাগ্রস্থ করে তুলেছে এবং অন্যদিকে বহির্ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন জাত উন্নতি যখন তাকে আরও বর্দ্ধিত করে তুলেছে—সেই অসহনীয় অবস্থায় যিনি জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবতে সুরু করেছেন, তিনি রাণাড়ে, যিনি 'ইকনমিক ন্যাশন্যালিষ্ট' বলেই স্মরণীয়।

'ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শাসকদের কাছে রক্ষণমূলক কর ধার্য নীতি দাবী করা নেহাতই অমূলক—একথা উপলব্ধি করেই তিনি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থন চেয়েছিলেন, যার ফলে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র খণ্ড কৃষিব্যবস্থা বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামো ভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে; যাতে ভারতবর্ষের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি দ্রুত শিল্পায়নের পথে শিল্পভিত্তিক হয়ে উঠতে পারে; যাতে গ্রামীণ ব্যবস্থা নাগরিক হয়ে উঠতে পারে; যাতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য—বহির্বাণিজ্যে রূপান্তরিত হতে পারে; এবং যাতে অনড় অচল শ্রমিকেরা ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পরতে পারে—অর্থাৎ এক কথায় নিপীড়িত দরিদ্র ভারতবর্ষ যেন মুক্তির পথ পায়। এই মুক্তি পথ উন্মুক্ত করতে রাজ্যকে এগিয়ে আনতে হবে এবং তাকে সক্রিয় সমর্থন করতে হবে। একথা রাণাড়ে বললেও 'ষ্টেট সোসালিজম' বলতে যা বোঝায় তা তিনি চাননি, এমনকি 'ষ্টেট ক্যাপিটালিজম' ও নয়। কারণ তিনি ব্যক্তি প্রচেষ্টার অবিশ্বাসী নন।

রাণাড়ে যখন তাঁর অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলো রচনা করেন, তখন ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জায়গায় ধনতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা একশো ও পঞ্চাশ বছর অতিক্রম করেছে; কিন্তু এই অগ্নিপরীক্ষার ইতিহাসের সঙ্গে সুপরিচিত হয়েও, কেন শিল্পবিপ্লবের অকল্যাণের দিকগুলো রাণাড়ের লক্ষ্যগোচর হয়নি একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কারণ তাঁর রচনার মধ্যে কোথাও শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা, কয়েকজনের হাতে মূলধনের বিপুল সঞ্চয়ের ফলপ্রসূত অকল্যাণের কথা। কিংবা শিল্প সংস্থার মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে 'ট্রেড ইউনিয়ন' দরকার—সেই প্রয়োজনের কথা কোথাও উচ্চারিত হয়নি। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও তিনি গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক

অর্থনীতির বিরোধের কথাটি আবিষ্কার করতে পারেননি। এইখানেই রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তার দুর্বলতা সুপ্রকট।

রাণাড়ে যুগস্রষ্টা হয়ত নন, কিন্তু তিনি যুগের সৃষ্টি। তাই তাঁর ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, যুগবিধৃত। এই যুগের পটভূমিতেই তাঁর লেখনীকে, তাঁর ধ্যানধারণাকে বিচার করতে হবে, স্বভাবতই আমাদের যেতে হবে ১৮৯০-১৮৯৩ সালে যখন তিনি তাঁর অর্থনৈতিক প্রবন্ধগুলো রচনা করছেন। যদিও ১৮৮৩ সালে লিখিত "বেঙ্গল টেনার্নাস বিল" প্রবন্ধে আমরা রাণাড়ের অর্থনৈতিক আলোচনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোণটি প্রথম লক্ষ্য করি।

রাণাড়ে যখন লেখনী ধারণ করেছেন, তখন ইংরেজ সরকার এমন একটি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করেছে, যা ভারতবাসীদের শোষণ করে বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ-তোষণে তৎপর। কারণ 'অবাধ-বাণিজ্য' নীতি গ্রহণের পেছনে যে উদ্দেশ্যটি সক্রিয় ছিল সেটি হল ভারতবর্ষের অবাধ প্রাকৃতিক দানকে এবং ভারতবর্ষের বাজারকে পরিপূর্ণভাবে করায়ত্ব করা এবং প্রকৃতপক্ষে ১৮৮২ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এই 'অবাধ-বাণিজ্য' নীতিই ছিল বলবৎ। অথচ আশ্চর্যের বিষয় যখন ইংরেজ সরকার এই নীতিকে বলিষ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছেন তখন জার্মান, ফ্রান্সও আমেরিকায় বহু পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর এই নীতি পরিত্যক্ত হয়েছে, এমনকি ইংল্যাণ্ডের নিজের ক্ষেত্রেও এ নীতি তার মূল্য হারাতে বসেছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত এই ভারতবিরোধী নীতির সমালোচনা করতে গিয়েই রাণাড়ে তাঁর চিন্তাস্ত্র তুলে নিয়েছেন। তবে এই একই সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও বাৎসরিক শিল্প-সম্মেলন যে প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রকে আরও উন্মুক্ত করে তুলেছিল—এ ঘটনাও স্মরণে রাখা দরকার।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে রাণাড়ে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে :

১। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে অতি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করেন;

২। ওলন্দাজদের প্রবর্তিত কৃষিপদ্ধতি প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন;

৩। ভারতীয় শ্রমিকদের ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পরার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং এ সম্পর্কে সরকারের দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন;

৪। তিনি সরকারকে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প-সংস্থা গঠনে বিনামূল্যে জমি, মূলধনের যোগান, উৎপাদনের চাহিদা সৃষ্টি প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান;

৫। এবং, তিনি জার্মান অর্থনীতিবিদদের মত কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটি যথাযথ ভারসাম্য রক্ষা অর্থাৎ আরও বিস্তৃতভাবে বলতে গেলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটা সুস্থ ভারসাম্য বজায় রক্ষার কথা উচ্চারণ করেন।

এখানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয় যে রাণাড়ে দ্রুত শিল্পায়নের কথা ঘোষণা করলেও, সেই শিল্পায়নকে তরান্বিত করতে হলে যে শুল্ক ব্যবস্থা (ট্যারিফ) একান্ত আবশ্যক এ কথা স্বীকার করেননি; অথচ যে সমস্ত দেশে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয়েছে, সে সমস্ত দেশেই এ ব্যবস্থা প্রথম থেকেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাই সরকার-নিয়ন্ত্রণ দাবী করলেও তিনি যে কর-নীতি দাবী করেননি তার কারণ রাজ্যের রক্ষণমূলক নীতি (ষ্টেট প্রটেকশন) বলতে তিনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজ্যের বিশেষ বিশেষ ভূমিকার কথাই উল্লেখ করেছেন। সরকার কি কি করবে, তা তিনি বর্ণনা করেছেন ১৮৯০ সালের পুণায় আয়োজিত প্রথম শিল্প সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে।

শুল্কনীতি ধার্য করার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে কোনভাবেই প্রভাবিত করা সম্ভব হবে না—সম্ভবত এই ধারণাই তাঁকে শুল্ক ধার্যনীতি সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল।

বাস্তববাদী অর্থনীতিবিদ রাণাড়ে ভারতের দারিদ্র মুক্তি যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত—যিনি শিল্পায়নের মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। কারণ বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সঙ্গে সমানভাবে তাল ফেলে চলতে হলে শিল্পায়ন একান্ত অপরিহার্য। রাণাড়ে জানতেন কৃষিভিত্তিক ভারতীয় অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করতে হলে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। এবং এই ভারসাম্য সৃষ্টি করতে গেলে বিজ্ঞানের প্রয়োগ অপরিহার্য, কারণ শিল্পায়ন বিজ্ঞান-নির্ভর। এবং শিল্পায়ন সংগঠিত হলেই অন্যান্য পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

শিল্পায়ন সম্পর্কে রাণাড়ের শুধু কল্পনা নয়,—সুষ্ঠু পরিকল্পনাও ছিল। তাই যে শিল্পের সম্ভাবনা ভারতবর্ষে সব চাইতে বেশী, সেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সংস্থাপনের কথাই চিন্তা করেছেন রাণাড়ে।

ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সম্পদে ধনী। এই প্রাকৃতিক সম্পদকে জনকল্যাণের কাজে লাগাতে পারলে দারিদ্র অভিশপ্ত ভারতবাসী যে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে একথা অনেকের চেয়ে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন রাণাড়ে।

সুতরাং মুক্তির উপায় থাকা সত্ত্বেও যখন মুক্তির পথ অব্যবহৃত, তখন সেই পথকে উন্মুক্ত করার দায়িত্ব ব্যক্তির ওপর না ছেড়ে দিয়ে, সরকারকে এগিয়ে আনতে হবে-একথা নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেছেন রাণাড়ে। শুধু তাই নয় ১৭ বার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থাপন প্রচেষ্টা কিভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে তার কারণগুলোও সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

১। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বল্পসঞ্চিত মূলধন প্রয়োগের ফলে;

২। উৎকৃষ্ট জ্বালানির অভাব ও দুর্মূল্যতার ফলে;

৩। রেলপথ ও সমুদ্র-পথে যোগাযোগের অসুবিধার ফলে;

৪। সরকারী দ্বিধার ফলে;

৫। দক্ষ ও সৎ ব্যবস্থাপক কর্মীর অভাবের ফলে;

৬। শিল্প সংস্থার পরীক্ষাধীনকালে সরকার তরফের গাফিলতি ও অনিচ্ছার ফলে।

সুতরাং প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যখন কয়েকটি বিশেষ ধরণের অসুবিধার ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যহত হচ্ছে, তখন সেই বাধা দূর করার দায়িত্ব সরকারেরই নিতে হবে, তবেই দেশের প্রকৃত মঙ্গল। বিশেষভাবে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সম্ভাবনা ছিল রাণাড়ে সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে সরকারী সাহায্যের কথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন।

কারণ তাঁর মতে শিল্পায়নের দায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব—'এ গ্রেট টাস্ক।' এই 'গ্রেট টাস্ক' পালন করতে হলে স্বভাবতই এর সঙ্গে বহু সমস্যা উদ্ভূত হবে। প্রথমেই, উপযুক্ত মূলধন সঞ্চয় ও প্রয়োগের প্রশ্ন আসবে; দ্বিতীয়, দক্ষ ও শ্রমিক ও সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে; তৃতীয়, বিজ্ঞানের প্রয়োগের কথা উঠবে; চতুর্থ, শিল্প, শিল্পসংস্থা ও পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে উপযুক্ত যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এবং এই সব দায়িত্ব পালন করতে হলে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ অপরিহার্য। অনেক দিনের প্রচলিত কুসংস্কার ও অশিক্ষা; দক্ষ শ্রমিকদের অভাব, উন্নত দেশগুলির তীব্র প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বহুমুখী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে একথা নিশ্চিতভাবে জেনেও রাণাড়ে বিশ্বাস করতেন জয় অনিবার্য। "ইফ উই কুড ডাইরেক্ট আওয়ার এফর্টস বাই কোয়াপরেশন অন এ লার্জ স্কেল ইন টু দি প্রপার চ্যানেলস।"

মূলধনের প্রশ্ন—যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই মূল প্রশ্ন সম্পর্কে—যাকে রাণাড়ে "দি প্রবলেমস অফ ওয়েস এণ্ড মিনস" বলতেন, সে সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশসহকারে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা আজকের অর্থনীতিবিদদের কাছেও কম মূল্যবান নয়। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ "দি রি-অর্গানাইজেসন অফ রিয়াল ক্রেডিট ইন ইণ্ডিয়া"—যে প্রবন্ধ ১৮৯১ খৃঃ প্রথম শিল্প সম্মেলনে পাঠ করেন, তাতে হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম এবং সুইজারল্যাণ্ডের গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছিলেন তৎকালীন যে মূলধন বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী মূলধন ব্যবহারের সুযোগ আছে, কারণ তাঁরই ভাষা বলি, "হোয়াট ইজ ওয়ানটিং ইজ দি নেসেসারী স্কিল এণ্ড পেসেন্স হুইচ উইল এডজাষ্ট দি ক্যাপাসিটি অফ দি ওয়ান টু দি ওয়ানটস্ অফ দি আদার, এণ্ড মেক বোথ ওয়ার্ক ইন এ স্পিরিট অফ হারমনি এণ্ড কোয়াপরেশন" সরকারী তত্ত্বাবধানে ডিপোজিট এণ্ড ফিনান্স ব্যাঙ্কস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এবং এর সঙ্গে 'পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক ডিপোজিটস্' কেও কাজে লাগাতে হবে। এ ছাড়া সরকারী প্রচেষ্টায় ভারতীয় শিল্প ও অর্থপতিদের নিয়ে ছোট ছোট 'সিটি কমিটি' করতে হবে যারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকে একটি নির্দিষ্ট সুদে টাকা জমা নিয়ে তা একটু বেশী সুদে শিল্পে প্রয়োগ করবে। সরকারী দায়িত্ব এইখানেই শেষ হবে না কেননা নোতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে যে মূলধন লাগবে সরকারী প্রচেষ্টায় বিদেশ থেকে সেই মূলধন সংগ্রহ করে দেশের কাজে লাগাতে হবে।

একথা হয়ত সত্য রাণাড়ে যেভাবে মূলধন সঞ্চয়, সংগ্রহ ও প্রয়োগের কথা চিন্তা করেছেন—বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয়ত সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী নয়, কিন্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে গভীর তথ্যনিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞান না থাকলে এ সমাধানের কথা চিন্তা করাও সম্ভব হত না।

শিল্পায়নের পথে যে অনেক সমস্যা তাও যেমন সত্য তাকে অতিক্রম করার পথও যে সংখ্যায় খুব অল্প নয়—সে কথাও তেমনি সত্য আর এই সত্য আবিষ্কারের পরিচ্ছন্ন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী রাণাড়ে আমাদের দেশের শিল্পায়নের অনুকূলে যে সমস্ত বক্তব্য আছে, সেগুলিকে তাঁর লেখার মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করে রাণাড়ে যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন, তা কিছুটা পরিমাণে গৃহীত হলেও যে সাফল্য সৃষ্টি হত তাতেই 'দি নেশান উড শুন্ স্টার্ট আপন এ নিউ রেস অফ লাইফ'। পরাধীন ভারতবর্ষে অমানিশার শেষে নোতুন জীবনের স্বর্ণালী সকালের যে বিরাট সম্ভাবনা তারই সূচনা করেছিলেন রাণাড়ে তাঁর ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তার মাধ্যমে।

মূলধন আলোচনা প্রসঙ্গে রাণাড়ে সেই সময় বহু আলোচিত 'ড্রেণ থিয়োরী' সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যেখানে এই তত্ত্বের সার সত্যটি যেমন তিনি স্বীকার করেছিলেন তেমনি এর আতিশয্যের দিকটিও স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছিলেন। এর সত্যের দিকটি হল যে রাজ্যশাসন, সৈন্যবিভাগ ও বৃদ্ধ বয়সে পেনসেন দেওয়ার জন্য যে সুপ্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয় তা কোন উৎপাদন-কাজে ব্যবহৃত হলে দেশের অনেক বেশী মঙ্গল হত—কিন্তু এই বক্তব্যের মধ্যে সত্য নিহিত থাকলেও, এ বিষয় নিয়ে অজস্র তর্ক করে সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই, একথাও রাণাড়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি একদল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি কটাক্ষও করেছিলেন যখন তাঁরা এই 'ড্রেণ থিয়োরী'র মধ্যেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যমের অভাবের মূল কারণ আবিষ্কার করেছিলেন।

'ওয়েল বি কমিশন'-এর সদস্য হিসাবে একজন ভারতীয়ও এই মতামত প্রকাশ করেছিলেন। রাণাড়ে এই মতামতের আংশিক অংশীদার হলেও তিনি সমস্যার মূল আবিষ্কার

করেছিলেন অন্যত্র। তাঁর মতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ যে বাধাগুলির অবাঞ্ছিত তাদের মধ্যে "দি ওয়ান্ট অফ প্রপার অর্গাইজেশন, স্কিল্ড লিডারশিপ, এফিসিয়েন্ট ব্যাঙ্কিং সিস্টেম এণ্ড ট্রেনড লেবার" অন্যতম।

শিল্পায়নের সঙ্গে বহু অর্থনৈতিক সমস্যা বিজড়িত। কারণ শিল্পায়নকে সার্থক করে তুলতে হলে অনেকগুলি প্রশ্ন ভাববার আছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হল—উৎপাদন। কি উৎপাদিত হবে? এবং যা উৎপাদিত হবে তার চাহিদা কি? এ প্রশ্নগুলি বিচার করতে গিয়ে রাণাড়ে লক্ষ্য করেছেন অপ্রয়োজনীয় বিলাসবস্তু (লাকসারি গুডস্) উৎপাদিত হলে তার বাজারে চাহিদা নেই—একথা সত্য না হলেও তার যে সব সময় চাহিদা নেই, তা যে 'হাইলি ইলাসটিক' একথা স্বীকার্য; তাই এমন বস্তু উৎপাদন করতে হবে যার একদিকে বৃহত্তর ও স্থির বাজারের চাহিদা আছে অন্যদিকে যা নিত্যপ্রয়োজনীয়। সুতরাং এই জাতীয় বস্তু বলতে দেশের প্রধান পণ্যদ্রব্যই (ষ্টেপল কমোডিটিস) বোঝায় এবং প্রধান পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের শিল্প সংস্থা-গুলি সাধারণত শহরের দিকেই আকৃষ্ট হয় এবং এই ক্ষেত্রেই শিল্পায়ন ও নগরায়ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই বলেছি রাণাড়ে খন্ড বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সমস্যাকে না দেখে সামগ্রিক দৃষ্টিতে তাকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন, বললাম কেননা ভারতবর্ষের তৎকালীন যত অর্থনীতিক সমস্যা ছিল, সবগুলিই তাঁর লক্ষ্যগোচর, হয়েছে এবং সবগুলি সম্পর্কেই তিনি তাঁর সুচিন্তিত প্রকাশ করেছেন বা করতে পেরেছেন—একথা আমরা বলছি না। কিন্তু তিনি যে মূল সমস্যাগুলির প্রতি গভীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েছিলেন এ সত্য স্বীকার করতে বাধা নেই। প্রসঙ্গত বলা চলে রাণাড়ে শুধুমাত্র শিল্পায়নের কথাই যদি চিন্তা করতেন, তবে তাঁকে মোটামুটিভাবে সামগ্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী বলতে হয়ত দ্বিধা হত কিন্তু ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোতে কৃষি যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—এ সত্য আবিষ্কারেও রাণাড়ে অভ্রান্ত দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি—প্রগতিশীল উদ্বৃত্ত অর্থনীতি নয়, বরং গতিহীন অর্থনীতি সুতরাং এই গতিহীন অচল অর্থনীতিকে গতিশীল সবল অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করতে হলে শিল্পায়ন একান্তভাবেই আবশ্যক কিন্তু সেই শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সীমিত। এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই শিল্পকে গড়ে তুলতে হবে ভারতের দারিদ্র মুক্তির জন্য কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কৃষির কথাও স্মরণে রাখতে হবে কেননা, রাণাড়ের ভাষাতেই বলি, "সোসালি, পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইনষ্টাট্রিয়ালি ইণ্ডিয়া ইন ডেসটিনড টু রিসেন এ প্রিডমিনেন্টলি এগরিকালচারাল কানট্রি।" সুতরাং কৃষির গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়ে অসংখ্য কৃষক পরিবারকে বাঁচাতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে তুলতে কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত কাম্য। তাই জাতীয় স্বার্থেই শিল্পায়নের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাণাড়ে কৃষি ব্যবস্থার প্রতিও যোগ্য মনোযোগ দিয়েছিলেন এবং তার উন্নতি-কল্পে অনেকগুলি উন্নয়ন ব্যবস্থা দাবী করেছিলেন। কারণ শিল্পায়নের প্রশ্নটি কৃষির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তিনি প্রধান পণ্য দ্রব্য (ষ্টেপল কমোডিটিস) উৎপাদনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা কৃষি-উন্নতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাই কৃষির যোগ্য ভূমিকাকে তিনি যথাযথ মূল্য দিয়েছিলেন।

কৃষি সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গেই তিনি ভারতীয় জমি-সংক্রান্ত আইনের কথাও আলোচনা করেছেন, তার প্রমাণ আছে তাঁর "প্রুসিয়ান ল্যান্ড লেজিসলেশন এণ্ড দি বেঙ্গল টেন্যানসি বিল," "দি ল অফ ল্যান্ড সেল ইন বৃটিশ ইণ্ডিয়া," ও "ইমানসিপেসন অফ সার্ফস ইন রুশিয়া" প্রবন্ধে।

এই প্রবন্ধগুলি রাণাড়ের প্রস্তুতিকালীন রচনা সুতরাং এই রচনাগুলির মধ্যে কিছু আতিশয্য থাকা আশ্চর্যের নয়, কিন্তু আতিশয্যকে অতিক্রম করে মূল বক্তব্যে পেঁছিলে লক্ষ্য করা যায় যে রাণাড়ে এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে এমন জটিল বিষয়ের অবতারণা করেছেন—যা আজও পুরোপুরিভাবে সুষ্ঠু সমাধান লাভ করেনি।

ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র। তারা পুরুষানুক্রমিক ঋণভাবে জর্জরিত। এই ঋণগ্রস্থ কৃষক সম্প্রদায়ের ওপর ভারতীয় অর্থনীতির মূল ভার কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত। সুতারাং এদের সবল ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী করে তুলতে না পারলে সামগ্রিক কল্যাণ ও অগ্রগতি হবে সুদূরপরাহত—একথা উপলব্ধি করেই রাণাড়ে প্রমুখ অর্থনীতিবিদেরা সেই ঊনবিংশ শতকেও সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমাদের দেশের কৃষকদের প্রকৃত মুক্তি ও উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হয়েছে—বর্তমান শতাব্দীতেও একথা জোর গলায় বলা চলে না। কারণ সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল ও সুদূরপ্রসারী। তা সত্ত্বেও যে সমস্ত মনীষী এই সমস্যার কথা চিন্তা করে-ছিলেন ও সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তাতে তাঁদের সমাধান কল্পনার মধ্যে ফাঁক থাকলেও—সততার মধ্যে ফাঁকি ছিল না।

আবার "দি ল অফ ল্যান্ড সেল ইন বৃটিশ ইন্ডিয়া" প্রবন্ধে রাণাড়ে জমি হস্তান্তর (ল্যান্ড এ্যালিনেশন) সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করে দেখিয়ে-ছেন যে, তখনকার ইংরেজ সরকার ভারতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য য়ুরোপীয় ব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে থাকত এবং য়ুরোপে যে নোতুন ব্যবস্থা গৃহীত হত—ভারতেও তাই গ্রহণ করা হত; অথচ ভারতে ঋণী কৃষকেরা ঋণের দায়ে যখন জমি বেচে দিত কিংবা জোর করে তাদের কাছ থেকে নানান অজুহাতে জমি নিয়ে নেওয়া হত এবং এর ফলে উদ্ভূত হত যে জটিল সমস্যা; সেই সমস্যাকে ভারতীয় অবস্থা ও ব্যবস্থার পটভূমিতে রেখে বিচার করে কোন সার্থক সমাধান সূত্র আবিষ্কার করতে তারা যে কিভাবে ব্যর্থ হয়েছিল তার প্রমাণ আছে, রিডি, মুর, ষ্ট্রচি, এডমান্ডস্টোন, এবং পিয়ারসন সাহেবের দীর্ঘ যুক্তি-তর্কের মধ্যে। এই দীর্ঘ যুক্তি-তর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৮৭২-৭৩ সালে স্যার রেমন্ড ওয়েস্ট তাঁর "দি ল্যান্ড এন্ড দি ল অফ ইন্ডিয়া" পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এই পুস্তিকা তিনি ঘোষণা করলেন, "দ্যাট দি পাওয়ার অফ এ্যালিনেটিং ল্যান্ড সুড বি লিমিটেড" রাণাড়ে এই ব্যক্তির মতের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। সেই জটিল সমস্যা তার পরেও বহুদিন ধরে সমাধানের আলোকপ্রাপ্ত হয়নি তার প্রমাণ ১৯০১ সালে প্রবর্তিত "পাঞ্জাব ল্যান্ড এ্যালিনেশন এ্যাক্ট দ্বারাও এ সমস্যার প্রকৃত সমাধান করা হয়নি। অনেকের মত বাঙ্গালী অর্থনীতিবিদ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, এই আইনের দ্বারা গ্রামীন জীবনের ভাঙ্গন তো রোধ হবেই না বরং দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করে উকিল ও অর্থপতিরা পয়সা লুটবে। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে রাণাড়ের মতই যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

জমি সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গেই আসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা। রাণাড়ে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রসঙ্গ তুলেছেন। ১৭৯৩ খৃঃ ইংরাজ প্রবর্তিত এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলে ভারতে যে ছবিসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তারই সুন্দর ও তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা করেছেন তিনি। একদিকে অর্থলোভী, অনুপার্জিত অর্থের মালিক জমিদার শ্রেণী আর একদিকে তাদের অত্যাচারে জর্জরিত, দারুণ পরিশ্রমী অথচ বঞ্চিত কৃষক শ্রেণী ভারতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছিল। সুতরাং এই অনগ্রসর অর্থনীতিতে কৃষক-দের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে দেশের মঙ্গল ও কল্যাণ সৃষ্টি সম্ভব নয়।

তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে বঞ্চিত ভাগ্যহত কুলকে উন্নত জীবন ধারণের সুযোগ দেওয়া। রায়ৎ ও জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত আছে সেই কল্যাণ। ১৮৫৯ সালে কৃষকদের জমির ওপর অধিকার স্বীকার করে যে আইন (এ্যাক্ট দশ) পাশকরা হল তাতে ভারতীয় দুর্বল বঞ্চিত কৃষকদের অবস্থার যে অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এই আইনের বলে বহুদিনের প্রচলিত নানা অসুবিধা দূরীভূত হয়ে কিছু বিশেষ ধরণের সুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। এর পরেও কয়েকবার এই সংক্রান্ত আইন পাশ করা হয়েছে। '১৮৮৫ সালের "বেঙ্গল টেনানসি বিল" এ যে চেষ্টা ছিল তা হল "টু সিকিওর ফিক্সিটি অফ টেনিওর এন্ড প্রোটেকসান এগেনষ্ট আরবিট্রারি রেণ্টস এন্ড ইললিগ্যাল একজ্যাকশান।" কিন্তু এই আইনগুলির কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ ও শক্তিশালী হয়নি যার সাহায্যে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে. বরং এই আইনগুলির মধ্যে তিনি একটি ক্ষতিকর দিকই আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল এই আইনের দ্বারা জমিদার শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই প্রবল। যৌবনের অমিতশক্তি নিয়ে তিনি এমন এক শ্রেণীর জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, যে সংগ্রামে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে তিনি প্রায় আর কাউকেই পাননি। কারণ জমিদারশ্রেণী ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে বিশেষ কোন উজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি করেনি, যে গৌরব তাদের অপহৃত বা বিনষ্ট হলে দেশের সামগ্রিক অকল্যাণ হবে। তাই এই সংগ্রামে তিনি একক সৈনিক।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর নিজস্ব চিন্তালব্ধ একটি সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, রাণাড়ের মতে তাঁর এই প্রস্তাব "বেঙ্গল টেনানসি বিল"-এর তুলনায় অনেক দিক দিয়েই শ্রেয়। তিনি নিজেই এই শ্রেষ্ঠত্বের দিক গুলো তুলে ধরেছেন তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে।

ভারতীয় অর্থনীতি অনুন্নত অর্থনীতি। এই অনুন্নত অর্থনীতিজাত সমস্যার বিষময় বৃত্তকে (ভিসিয়াস সার্কল) বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রাণাড়ে জমির সঙ্গে জড়িত আর একটি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন. সেটি হল ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একদিন বিখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের বিশ্ববিখ্যাত জনসংখ্যা তত্ত্বের উৎস মুখ ছিল; সেই সমস্যাই রাণাড়েকে চিন্তিত করে তুলেছিল, এবং এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়েই রাণাড়েকে স্থানান্তর (মাইগ্রেশন) ও দেশান্তর (এমিগ্রেশন) সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন।

এখানে স্থানান্তর শব্দটি আমরা 'মাইগ্রেশন' এই ইংরাজী শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবেই গ্রহণ করলাম। এই শব্দটি দেশের আভ্যন্তরীণ যে বাস পরিবর্তন সেই পরিবর্তনকে সূচিত করবে এবং দেশান্তর শব্দটি. যা ইংরাজী 'এমিগ্রেশন' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা এই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিদেশে গিয়ে বসবাসের কথাই ইঙ্গিত করবে। ১৮৯০-১৯০০ সালে যখন প্লেগ ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে হাজার হাজার প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার গেছে কমে, তখনও এই বিশেষ সমস্যাটি রাণাড়ে এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—এই ঘটনাই সমস্যাটির গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন একদিকে প্রাকৃতিক সম্পদ-প্রাচুর্য সত্ত্বেও—ব্যবহারের অযোগ্যতা অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনযুদ্ধকে অসহনীয় করে তুলেছে এবং ভবিষ্যতেও তুলবে।

'জনসংখ্যা বৃদ্ধি'—এই সমস্যার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে বসে রাণাড়ে উপলব্ধি করলেন। সমস্যাটি শুধুমাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের কোন একটি স্থানে এই জনসংখ্যার চাপ, অপর একটি স্থানের জনসংখ্যা চাপের দ্বিগুণ কি তারও বেশী; সুতরাং এই নষ্ট ভারসাম্যকে

উদ্ধার করে ভারসাম্যকে বজায় রাখতে হলে অভিবাসন (ইমিগ্রেশন) বিশেষভাবে প্রয়োজন। কেননা এক এক স্থানের জনসংখ্যার এই চাপকে যদি অপেক্ষাকৃত জনবসতি বিরল স্থানে স্থানান্তরিত করা যায় (জীবিকা অর্জনের সুবিধা দান করে) তবে এই সমস্যার একটি সমাধান হয়ত সম্ভব এবং তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আগেকার রাজাদের এবং ইংরেজ বিশেষজ্ঞ ওয়েকফিল্ড-এর 'কলোনাইজেশন স্কিম' উল্লেখ করলেও, পরবর্তীকালের অর্থনীতিবিদরা তাঁর এই ব্যবস্থাকে কার্যক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োগ-উপযুক্ত বিবেচনা করেননি, কেননা প্রাদেশিকতা এই ব্যবস্থার বাস্তব রূপায়নের অন্যতম বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

রাণাড়ে জনতার অন্তর্দেশীয় স্থানান্তরিতকরণকে সমস্যা সম্পর্কের একটি মাত্র দিক বলেই গণ্য করেছিলেন, তবে তাঁর কাছে বহির্দেশীয় স্থানান্তরিতকরণ অন্তর্দেশীয় স্থানান্তরিতকরণ অপেক্ষা অনেক বেশী ফলপ্রসূ বলেই বিবেচিত হয়েছিল. তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ভারতের বাইরে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ উপনিবেশগুলিতে যদি ভারতীরা গমন করে তবে ভারতের এই নিদারুণ সমস্যাটি একটি সুষ্ঠু সমাধান লাভ করতে পারে। তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি আমেরিকার দার্শনিক ড্রাপারের "হিস্ট্রি অব দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভলপমেণ্ট অব ইউরোপ" গ্রন্থ থেকে যুক্তি সংগ্রহ করেছেন।

ভাবা বোধহয় অসঙ্গত নয় যে রাণাড়ে এক বৃহত্তর ভারতেরই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, যে পরিকল্পনায় যে কোন ধরণের বহির্গমনই সুফলপ্রদ হল মনে হয়েছিল। কারণ এই সময় যে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিককে ভারতের বাইরে (যেমন জ্যামাইকা, মাউরিটিস, দেমেয়ারা—বৃটিশ গায়ক. ত্রিনিদাদ, শিঞ্জি প্রভৃতি) পাঠান হয়েছিল সেই সব শ্রমিকদের স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। কিন্তু রাণাড়ে এর মধ্যেই একটি গুরুতর সমস্যার আশু সমাধান লক্ষ্য করেছিলেন। রাণাড়ে আশাবাদী বলেই ভবিষ্যতের মঙ্গলের আশায় বর্তমানের কষ্ট স্বীকারকে বরণীয় বলে মনে করেছিলেন।

কিন্তু আধুনিক দৃষ্টিতে বিচার করলে তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে যে মস্তবড় দুর্বলতা লুকিয়ে আছে, তা প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন :

"A vast majority of the surplus poor population of an agricultural country can only be naturally filled to work as Agriculturist Labourers, and the slow development of our Manufacturers, borne down as they are by the stress of Foreign competition, cannot provide at present the much needed relief of work suited to their aptitudes. Inland and Overland Emigreation, the overflow of the surplus population from the congested parts of the country to Lands where Labour is dear and highly remunerative, can alone afford the sorely needed present relief".

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যে সত্য নিহিত আছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু দুর্বলতার দিকটিও স্পষ্ট। এই দুর্বলতা—"কারালাস পুয়োর পপুলেশন"কে কেন্দ্র করে। কারণ ভারতে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা ঠিক মত গ্রহণ ও বন্টন অর্থাৎ এককথায় তার উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবহার (মবিলাইযেশন অব রিসোরসেস) করতে পারলে ভারতের জনসংখ্যাকে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা বলা চলে না, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শ্রমিকের পুনর্বাসন ও কাজের জন্য বহির্গমনের কথা বেশ খানিকটা অবান্তর হয়ে পড়ে। আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে রাণাড়ের সমাধান-যুক্তিগুলো দুর্বল হলেও, তখনকার দিনের পটভূমিতে রেখেই তাঁর বক্তব্য বিচার্য।

শুধুমাত্র জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করে ভারসাম্য বজায় রাখলেই ভারতের এই অর্থনৈতিক

সমস্যার সমাধান আশা করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত করার যে উপযুক্ত ব্যবস্থা তাও গ্রহণ করতে হবে। এই ব্যবস্থা-গ্রহণমূলক যে স্তম্ভটির ওপর নির্ভরশীল সেটি হল অর্থ সরবরাহ (ফিনান্স)। ভারতের তৎকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আধুনিককালে যেভাবে ব্যাঙ্কিং প্রথায় পরিচালিত, সেভাবে কোন বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক ব্যবস্থা-নির্ভর ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে মহাজনী কারবারাশ্রয়ী ছিল। কৃষকেরা প্রয়োজনের সময় এই সব মহাজনের কাছে যে কোন সর্তে টাকা ধার করে চাষ-বাস করত এবং ফসল ফলার পর সেই ঋণ শোধ করতেই দেউলিয়া হয়ে যেত। এই অবস্থা লক্ষ্য করে, রাণাড়ে সমবায় প্রথার মধ্যে এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পান। আশাবাদী রাণাড়ে এই সময় আর দুজন ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে তাঁরই চিন্তার সূত্রটি আবিষ্কার করেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিদেশী পণ্ডিত স্যার আর্থার কটন আর একজন হলেন স্যার, ভি, ই, ওয়াঙ্কা—যিনি বিশ্বাস করতেন 'কৃষি ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাই' এই অব্যবস্থা থেকে মুক্তি দেবে। স্যার ওয়াচার 'কৃষি ব্যাঙ্ক' ব্যবস্থার পাশাপাশি রাণাড়ে 'সমবায় ব্যাঙ্ক'-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্যকে দৃঢ়ভিত্তিক করতে গিয়ে তিনি য়ুরোপের অর্থনৈতিক ইতিহাস পাঠ করেন এবং প্রয়োজনীয় অংকগুলি লিপিবদ্ধ করেন। আধুনিক অর্থনীতিবিদ স্যার ক্যাদী বলেছেন যে অনেক অর্থনীতিবিদ রাণাড়ের চিন্তার মধ্যে দুর্বোধ্যতা লক্ষ্য করলেও, তিনি বিশ্বাস করেন যে রাণাড়ের চিন্তার মধ্যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির (কম্প্রিহেনসিভ ভিউ) পরিচয় আছে, এবং কৃষি অর্থনীতি (রুরাল ফিনান্স)-এর পাশাপাশি তিনি যে শিল্প-অর্থনীতির (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স) কথা চিন্তা করেছেন তা তাঁর 'কম্প্রি হেনসিভ ভিউ' এরই পরিচায়ক।

এই প্রসঙ্গেই তিনি ভারতের মোটামুটি ধনিকশ্রেণীর কোটি কোটি টাকার উৎপাদন হীন সোনা ও রূপা সঞ্চয়ের প্রবণতাকে যেমন লক্ষ্য করেছেন, তেমনি লক্ষ্য করেছেন সেই কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর লোকেদের যারা প্রয়োজনে শতকরা ১২ থেকে ১৪ টাকা হারে সুদে অর্থ সংগ্রহ করে জীবিকার্জনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ভারতের এই সমস্যাটির সামগ্রিক মিল পাওয়া যায় ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে যেখানে সমবায় আন্দোলনকে একটি বলিষ্ঠ উপায় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই তিনি অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর "বোডেন ক্রেডিট ইনস্টি-টিউট"-এর কথা বলেছেন। যখন রাণাড়ে এই সমস্যা নিয়ে ভাবছেন তখন পৃথিবীর অন্যান্য নানা জায়গায় সমবায় প্রথার উপযুক্ততা ও অনুপযুক্ততা নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, কিন্তু বিশেষ কোন নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র পথ নির্ধারিত হয়নি; তা সত্ত্বেও বলা চলে তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতার ফলেই তিনি বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারকে এই সমবায় আন্দোলন শক্তিশালী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। লর্ড ওয়েললক সেই সময় নিকলসনকে সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেন। সুতরাং সমবায় আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে যথপোযুক্ত ধারণা করতে যাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাণাড়ে অগ্রণী। আধুনিককালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ের যে গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃতি লাভ করেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই অনগ্রসর পরিপ্রেক্ষিতে—রাণাড়ের এই সুষ্ঠ, স্বচ্ছ প্রগতিশীল চিন্তা সম্বর্ধনার দাবী রাখে।

রাণাড়ের আরও প্রগতিশীল চিন্তার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা চলে। ১৮৭০ সালে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের (ডি-সেন্ট্রালাইজেশন) যে ব্যবস্থা লর্ড মেয়ো গ্রহণ করেন, রাণাড়ে—পুণা সর্বজনীন সভার ত্রৈমাসিক মুখপত্রে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কীয় এক প্রবন্ধে তা সমর্থন করেন। এই প্রবন্ধ আজও যে মূল্যবান, তার কারণ—এই ধরণের একটি স্বন্দমূলক (কন্ট্রো)-

ভার্সিয়াল) সমস্যা সম্পর্কে তিনি গভীর বৈজ্ঞানিক মননের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই বিকেন্দ্রীকারণ সমস্যার আলোচনায় সেই সময়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দাদাভাই নৌরজী গোখেল, এস, এন, ব্যানার্জী, ডি, ই, ওয়াচা এবং সুব্রমনিয়ম অন্যতম।

যাইহোক যেটি লক্ষ্যণীয় সেটি হল চিন্তাশীল তথ্যজিজ্ঞাসু রাণাড়ের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও বুদ্ধি স্বারা বিচার করার আগ্রহ ও প্রবণতা। এই প্রবণতাই তাঁকে বিভিন্ন সংখ্যাতত্ত্ব সম্মত তথ্য সংগ্রহের প্রেরণা দিয়েছিল। তত্ত্ব ও তথ্য দৃষ্টির ফলে বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে তৎকালীন অনেক ভারতীয় অর্থনীতিবিদ যে দৃষ্টির পরিচয় রাখতে পারেননি, রাণাড়ে সেই বিরল দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন।

রাণাড়ের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা শুধুমাত্র দেশের বিভিন্ন সমস্যা ও তার আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, প্রাজ্ঞ রাণাড়ে তাঁর স্বকীয় স্বাধীন চিন্তার সমর্থনে বিদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাসের নজীরও সংগ্রহ করেছিলেন। এই জাতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিজের বক্তব্যকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতার মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর দৃষ্টির বিস্তৃতি অন্যদিকে তেমনি তথ্যজিজ্ঞাসু সচেতন মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এমনি পরিচয় আছে নেদারল্যাণ্ডের কর্ষণপদ্ধতি (কালচার সিস্টেম) সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটি তিনি ১৮৯০ সালে পুণায় অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনের সামনে পাঠ করেন।

প্রসঙ্গটি ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের ভূমিকা কি হওয়া উচিত, সেই সম্পর্কে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে নেদারল্যাণ্ডের যথাযোগ্য ভূমিকা রাণাড়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একথা সত্য, এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলেই খুব অল্প দিনের মধ্যে এই ছোট জায়গাটির বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল—সে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে লর্ড ডাফরিনের কাছে প্রদত্ত ভ্যাণ্ডেসবার্জ-এর 'রিপোর্টের'। এই অর্থনৈতিক উন্নতির কয়েকটি দিক বিশ্লেষণ করে রাণাড়ে দেখিয়েছেন, এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্য, কৃষক ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সমভাবে উপকৃত হয়েছিল, এবং নেদারল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের কিছু কিছু অমিল থাকা সত্ত্বেও রাণাড়ের মতে এমন অনেকখানি মিশ ছিল যাতে এই পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা (এক্সপেরিমেণ্ট) এখানেও গৃহীত হলে সুফলপ্রদ হত। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে রাণাড়েকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কেননা যে উন্নতির কথা বলেছেন, সেই উন্নতি যে এই স্থানের সমগ্র কৃষক-সম্প্রদায়ের কি দারুণ ত্যাগ ও দুর্ভোগের মাধ্যমে এসেছিল—সেই দিকটি রাণাড়ের লক্ষ্যগোচর হয়নি। এই ব্যবস্থা নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। শুধু তাই নয়, তাদের প্রায় দাস পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিল। এমনি একটি ব্যবস্থার প্রতি রাণাড়ে কি করে নির্দ্বিধায় সমর্থন জানিয়েছিলেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

সাহিত্য-সংবাদ

মানব মনের অতলগহনে এমন অনেক নাম বিস্মৃতির অস্বচ্ছ কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়, যার পুনঃস্মরণ বিশেষ উপলক্ষ ব্যতীত সাধারণতঃ ঘটে না। এই মানসিকতার মূলে কোন অদৃশ্য হস্তের রহস্যময় স্পর্শ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, তা আমাদের অজানা। কিন্তু আজকের মানব-মন যে বিক্ষিপ্ত এবং উদভ্রান্ত তা মৃত্যুর মতই সত্য। মানুষ আজ চন্দ্রালোক যাত্রার উগ্র স্বপ্নে অধীর এবং উন্মত্ত,—কোলাহলের অন্ত নেই। অজানাকে আবিষ্কার করা যে মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট একথা স্বীকার করি, কিন্তু আবিষ্কৃত সত্যকে ভুলে যাওয়া কি মানবমনের দুরপনেয় কলংক নয়? যে সকল সত্য চিরায়ত আনন্দ উপলব্ধির সহায়ক, সেই সত্যের আবিষ্কার এবং প্রতিষ্ঠার মূলে যে সব মহাপ্রাণের অক্লান্ত পরিশ্রম এককালে তার ভিত্তিমূল স্থাপন করেছিল, তাঁদের নাম আমরা কত না সহজে ভুলে যাই।

হ্যারিয়েট মনরো এমনই একটি নাম। মহাকবি বলেছেন, নামে কি এসে যায়? কিন্তু তাঁর কাব্যের কুশীলবদের প্রত্যেকেরই নাম আছে এবং বেশ কাব্যমণ্ডিত ও শ্রুতিমধুর নাম। তবে কি নামে কিছু এসে যায়? যায় বৈকি! নামের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নাম আছে বলেই ত জটিলতা কমে গেছে। অবশ্য সব নাম মনে রাখা সম্ভব নয়, কিন্তু সার্থক নাম বিস্মৃত হওয়া সত্যই দুঃখের কথা। অথচ কত সহজে হ্যারিয়েট মনরোর নাম ভুলে গেছি। হয়ত এই আতস-বাজীর যুগে তাঁর কথা মনে রাখার মত অবসর অথবা মানসিকতা আমাদের আর নেই কিন্তু সে ক্ষতি আমাদেরই।

হ্যারিয়েট মনরোর স্মৃতি অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসীগণ মন থেকে মুছে ফেলেননি তাই তাঁকে স্মরণ করে গত বৎসর আমেরিকায় জাতীয় কবি সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় চল্লিশজন কবি এবং কাব্য সমালোচক সেই মহোৎসবে যোগদান করেছিলেন। সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পোয়েট্রি পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন। পোয়েট্রি পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাটি ছিল জয়ন্তী উৎসবের স্মারক। স্বর্গত কবি কামিংস-এর একটি অপ্রকাশিত কবিতা স্মারক সংখ্যাটির অন্যতম আকর্ষণ। ১৯১২ সালে পোয়েট্রি পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। হ্যারিয়েট মনরো পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা ছিলেন। আমাদের যুগের যাঁরা কবি তাঁদের প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর পোয়েট্রি পত্রিকার অমূল্য অলংকার। কবিগুরুর একটি কবিতা পত্রিকাটির ১৯১২ সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং আমেরিকার বিদগ্ধ সমাজ জানতে পারেন যে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র বাঘ ভালুকের দেশ নয় সেখানেও মেঠো সুরে বাঁশী বাজে। কবিগুরু তখনও নোবেল পুরস্কারে লাঞ্ছিত হননি, তখনও স্বদেশে তিনি কবিগুরু নন, কবি মাত্র—অথচ হ্যারিয়েট মনরো তাঁর বাঁশীর সুর ঠিকই শুনেছিলেন। যে রসবোধ থাকলে অজানা বাঁশীর সুরে অচিন রাগিণীর মর্ম উপলব্ধি করে মনকে আপ্লুত করা যায়, সে রসবোধ হ্যারিয়েট মনরোর ছিল, তাই না তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্পাদিকা। অথচ আজ তিনি আমাদের কাছে হয় অপরিচিত অথবা বিস্মৃত। হয়ত এটা বিস্মরণের যুগ, তাই যাঁরা সংস্কৃতির উদ্গাতা তাঁদের আমরা অত সহজেই ভুলে যাই।

নূতনগ্রন্থ

হেমিংওয়ের জীবনকাহিনী জটিল এবং চমকপ্রদ। ইদানীং হেমিংওয়ে সম্বন্ধে বেশ কিছু বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে কিন্তু তাঁর সাহিত্য এবং চিন্তা যে অবহেলার বস্তু নয় তা সমালোচকরা ভালভাবেই জানেন। সাধারণতঃ কোনও বিখ্যাত জীবনীকারের রচনায় আমরা যে হেমিংওয়েকে পাই সে হেমিংওয়ে একজন সাহিত্যিক মাত্র মানুষ হেমিংওয়ে সেখানে অনুপস্থিত। মাই ব্রাদার গ্রন্থটি মানুষ হেমিংওয়ের কথাই বলবার চেষ্টা করছে। অনুজ লিসেস্টার হেমিংওয়ে উপন্যাসের মতই রোমাঞ্চকর এবং স্বভাবতই সুখপাঠ্য। দুঃসাহসিক হেমিংওয়ের কোমল-কঠোর মেজাজটি এখানে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

লিসেস্টার বলেছেন যে তাঁর দাদা ঘরোয়া পরিবেশে যখন গল্প করতেন তখন বারবার লক্ষ্য করতেন যে কোনও ছোটভাই সেখানে উপস্থিত আছে কিনা, কারণ তাদের ঘিরেই তাঁর যত কথা। একটি জটিল প্রশ্নের উত্তরে লিসেস্টার যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল হেমিংওয়ের মানসিক গঠন ছিল অনুভূতিপ্রবণ এবং উগ্র বাস্তবধর্মী। যে হেমিংওয়ে প্রচন্ড মুষ্ট্যাঘাত হেনে মানুষকে বরাশায়ী করতে পারেন, সেই হেমিংওয়েই পরক্ষণে মুমূর্ষু মানবাত্মার আর্তচীৎকারের কাহিনী শোনাবার জন্য প্রস্তুত। এমনই জটিল যাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁরই জীবনকাহিনী মাই ব্রাদার পুস্তকে পরিবেশিত কিন্তু সাহিত্যিক হেমিংওয়ে এখানে একেবারেই অনুপস্থিত। তবু মানুষ হেমিংওয়েকে জানতে পেরে আমরা আনন্দিত।

My Brother, Ernest Hemingway. By Licester Hemingway. New York: Woild Publishing Co. 1962. 283 pp. $4.95.

সম্পাদিকা মাড়িয়া কুনসোভিৎস বর্তমান পোল্যান্ডের সাহিত্য মানসের পরিচয় দি মডার্ণ পোলিশ মাইন্ড গ্রন্থে দেবার দ্রেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রচেষ্টাটি ধন্যবাদ যোগ্য হলেও বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ এবং অনাবশ্যক উৎসাহের পরিচায়ক। এই ধরণের সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনায় যে ধীশক্তি এবং গভীর চিন্তাশীলতার প্রয়োজন এক্ষেত্রে তার অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সম্পাদিকা মারিয়ার উদ্দেশ্য মহৎ কিন্তু কতদূর সফল হয়েছে তার বিচার পাঠক সমাজ করবেন।

প্রথমভাগে দেখা যায় পোলিস সাহিত্যিকদের স্মৃতি বিজড়িত কাহিনী। দূর অতীত অথবা অতি নিকট কালের কাহিনী এখানে আমরা পাই, কিন্তু মধ্যযুগ কেন পরিত্যক্ত হল তা বোধগম্য হল না। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনায় প্রথম ভাগটি অলঙ্কৃত কিন্তু অধিকাংশ রচনাই সাধারণ স্তরের কিম্বা তার উপরে। অথচ আমরা আশা করেছিলাম কিছু প্রতিনিধিত্বমূলক রচনার সাক্ষাৎ পাব। কিন্তু গ্রন্থটিতে তার একান্ত অভাব। কেবল তাই নয় এমন একটি বিশেষ ত্রুটি পরিলক্ষিত হল যা এই ধরণের গ্রন্থে থাকা উচিত নয়। প্রথম ভাগে যে রচনাগুলি স্থান পেয়েছে তার পরিচয়পত্রে বলা হয়েছে যে রচয়িতাগণ সকলেই জীবিত অথচ যতদূর স্মরণ হয় স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক বোরোয়স্কি বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে গত হয়েছেন।

দ্বিতীয়ভাগের রচনাগুলিতে জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। পোলিশ গদ্যরীতির যে নিদর্শন রচনাগুলিতে রয়েছে তা প্রশংসনীয়। অবশ্য অনূদিত রচনার মাধ্যমে যতটুকু মাধুর্য উপভোগ করা যায় সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা বলতে পারি যে এই পর্যায়ের রচনাগুলি সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। অতীতের জীবনযাত্রা এবং বর্তমানের জটিল জীবনযন্ত্রণার মধ্যে যে

পার্থক্য তা মোটামুটি অনুভব করা যায়। তৃতীয় ভাগে আমরা যথার্থ পোলিশ সাহিত্য চিন্তার পরিচয় পাই, যদিও বহু কৃতী সাহিত্যিকের রচনা এই পর্যায়ে সন্নিবেশিত হয়নি তবুও এই অংশ বিশেষ উপভোগ্য সম্ভবতঃ সর্বোৎকৃষ্ট।

সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ হল পোলিশ রস রচনার নিদর্শন। যে রচনাগুলিকে রস রচনা হিসাবে সংকলন করা হয়েছে তা মোটেই উচ্চস্তরের নয় অথচ কি করে বিশ্বাস করি যে ঐতিহ্য-মণ্ডিত পোলিশ সাহিত্যে সত্যই উচ্চস্তরের রসরচনার নিদর্শন নেই। এ ক্ষেত্রে সম্পাদিকার দায়িত্ব যে ঠিকভাবে পালিত হয়নি সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ পরিমার্জ্জিত হবে।

সংকলন গ্রন্থ হিসাবে দি মডার্ণ পোলিশমাইণ্ড তেমন প্রতিনিধিত্বমূলক নয় এবং বহু উৎকৃষ্ট রচনা অবহেলিত হয়েছে তবু সম্পাদিকা মারিয়া কুনসোভিৎসকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব কারণ তিনি একটি মহৎ প্রচেষ্টার অবতরণা করেছেন, হয়ত সফল হননি কিন্তু এই ধরণের চেষ্টা যে সৎ সাহিত্য চিন্তার পরিচায়ক সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

The Modern Polish Mind: Maria Kuncewicz, Ed. Little Brown, 1962. 440 pp. $8.50.

আকর গ্রন্থটি ১৯৪৩ সালে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। বার্ক এবং হাও গ্রন্থটির সম্পাদনা করে সেকালে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বর্তমান সংস্করণটি পরিমার্জিত এবং বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। আরভিং আর হুাইস এই বিরাট আকর গ্রন্থটির সম্পাদনা করে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। ১৬৪০ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত যে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকীর্তি, আমেরিকায় সংঘটিত হয়েছে তার সুষ্ঠু পরিসংখ্যান এই সংস্করণে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রায় আট হাজার সাহিত্যিক, সম্পাদক এবং প্রকাশন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাম, ছয়শত উপন্যাসের পরিচয়, সাতশত পত্রপত্রিকার পরিচিতি এবং দুইশত নাটকের উল্লেখ গ্রন্থটিতে আছে।

আকর গ্রন্থটি সুসম্পাদিত। এই ধরণের আকর গ্রন্থ সাহিত্যের ছাত্র অথবা সাহিত্য পাঠক এবং গ্রন্থাগারের পক্ষে অপরিহার্য।

American Authors and Books: 1640 To The Present Day. By W. J. Burke and Will D. Howe. Augmented and revised by Irving R. Weiss. New York: Crown Publishers, Inc. [1962] ii + 834 pp. $8.50.

অজিত দাস

চেতনা প্রবাহ

আধুনিক গদ্য সাহিত্য একটু নাড়াচাড়া করলেই বোঝা যাবে যে বর্তমান শতাব্দীতে গদ্য সাহিত্যের প্রকাশ-ভংগীর ওপর যে দুজন সাহিত্যিকের প্রভাব সব চেয়ে বেশী তাঁরা হচ্ছেন জেমস্ জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফ। কথা সাহিত্যে চেতনাপ্রবাহ আশ্রয়ী রচনা রীতি এ'রাই প্রথমে অবলম্বন করেন। তার পর থেকে পশ্চিমী সাহিত্যে তো বটেই—এদেশেও বহু তরুণ লেখকেরা চেতনা প্রবাহ রীতির মাধ্যমে গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন।

চেতনা প্রবাহ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হোলো যে এই রীতি অন্তর্মুখী। অর্থাৎ এই রীতিতে রচিত সাহিত্যে পাত্র-পাত্রীর অন্তর্লোকের খবরই বেশী মেলে—বহির্জগতের প্রবেশ সেখানে অন্তর্লোকের মারফৎ। পাত্র-পাত্রীর মনের প্রতিবিম্বে বহির্জগত যতটুকু ছায়া ফেলে ততটুকুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রতিটি যুগের একটি বিশেষ সমস্যা থাকে—থাকে একটি বিশিষ্ট জীবনদর্শন। আর সেই সমস্যা বা জীবনদর্শনকে রূপ দিতে একটি বিশেষ প্রকাশ ভংগীর প্রয়োজন হয়। তাই হয়তো যুগ ভেদে সাহিত্যের প্রকাশ-ভংগী এতো বিভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মহাকাব্যের যুগ চলে গেছে—স্বয়ং বাল্মিকীও এযুগে জন্মালে মহাকাব্য রচনা করতেন না।

আমার তো মনে হয় বর্তমান শতাব্দীতে মানবজীবন যে সব মৌলিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে—জীবন-দর্শন যেভাবে বেঁকেচুরে গেছে—তাতে ঘটনা বা বর্ণনা আশ্রয়ী প্রকাশ ভংগী এযুগের জীবন জিজ্ঞাসাকে সুচারুরূপে প্রকাশ করতে পারবে না। একটা লক্ষ্য করার বিষয় এই যে নানা সমস্যায় জড়িত হয়ে আমরা যখন ক্রমশঃ বহির্মুখী হয়ে পড়ছি—কর্ম বা আমোদ-প্রমোদের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে চাইছি—আমাদের সাহিত্যে ততোই যেন অন্তর্মুখীনতা প্রকট হয়ে উঠছে। অর্থাৎ আমাদের আত্মবিশেলষণ ও অন্তর্মুখীনতার প্রবৃত্তি আর সব দিক দিয়ে বাধা পেয়ে সাহিত্যে ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক মানব মন আত্মবিস্মৃত হবার যতো চেষ্টাই করুক না কেন—পারছে না আত্মবিস্মৃত হতে। আর এই টানা-পোড়েনে ক্ষত-বিক্ষত মানবমন ঘটনা ও বর্ণনার বাঁধাসড়কে না গিয়ে চেতনাপ্রবাহ রীতির অরণ্যে প্রবেশ করেছে।

বর্তমান শতাব্দীতে মানবমন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তার উদ্ভব না হলে চেতনা প্রবাহ রীতি বর্তমান সাহিত্যে এতোখানি বিস্তার লাভ করতো না। অবশ্য অধিকাংশ লেখকই চেতনা প্রবাহ রীতিকে অবিমিশ্রভাবে গ্রহণ করেননি। এই রীতির প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হোলো স্মৃতিচারণ। অনেক লেখক চেতনাপ্রবাহকে পুরোপুরি রূপ না দিয়ে শুধু স্মৃতিচরণের সাহায্যে কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। অবিমিশ্রভাবে চেতনা প্রবাহ রীতি অনুসরণ না করলেও এই রীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রায় সব আধুনিক লেখকের লেখায়ই বর্তমান। প্রথমটি হচ্ছে অন্তর্মুখীনতা। প্রুস্ত, কামু, সার্ত্র মান প্রভৃতি কন্টিনেন্টাল সাহিত্যিকেরা ও ইংরিজী সাহিত্য জগতের বর্তমান রথীরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর অন্তর্মুখী। ঘটনা যে এ সব

লেখকের রচনায় অনুপস্থিত তা নয়—কিন্তু ঘটনা এখানে মুখ্য নয়—রচনার পাত্র-পাত্রীর মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই মুখ্য বক্তব্য।

চেতনা প্রবাহ রীতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোলো বিশ্লেষণ পরায়ণতা। প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি অনুভূতি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন লেখক। সার্ত্র, কামু, ক্যাথারিণ অ্যান পোর্টার প্রভৃতি লেখকেরা বিশ্লেষণের দিকে বেশী ঝুঁকেছেন। এই বিশ্লেষণ-প্রবণতাও আধুনিক লেখকদের প্রায় সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর বর্তমান

বাংলা দেশেও অধুনা চেতনা প্রবাহ রীতির বা অন্তর্মুখী বিশ্লেষণপরায়ণ রীতির প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। তবে এই রীতির অনুবর্তীরা প্রায় প্রত্যেকেই তরুণ।

এই প্রসংগে একটা কথা বলে রাখা ভালো। এই নব্যরীতির অনুবর্তীদের প্রায় প্রত্যেককেই পাঠকদের তরফ হতে দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে জয়েসের ইউলিসিস বহু জায়গায়ই দুর্বোধ্য—কিন্তু এই দুর্বোধ্যতা অনেকটা লেখকের ইচ্ছাকৃত। অনেকটা গোলাপের গায়ের কাটার মতো। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পাঠকের মনে বাঁধা পথ ছেড়ে চলতে অনিচ্ছাই এই অভিযোগের মূল কারণ। অনেক লেখক অবশ্য মনে করেন যে দুর্বোধ্যতা এই রীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আসলে কিন্তু তা নয়—রচনায় দুর্বোধ্য ইমেজ বা অপ্রচলিত শব্দ অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ কোন এফেক্ট সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অথবা কোন কিছুর প্রতীক হিসেবে। অবশ্য এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে এই নব্যরীতির মাধ্যমে লেখকের কল্পনা ও চিন্তা অনেকটা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে—ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরিমিতির অভাব দেখা যায়। কিন্তু এই রচনারীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে হলে পরিমিত বোধ থাকা একান্ত দরকার।

এই নব্যরীতির অনুবর্তীদের আরো একটি বিষয়ে সাবধান হবার প্রয়োজন আছে। আগেই বলেছি যে এই রীতিতে রচিত কথা-সাহিত্যে ঘটনার ঘনঘটা নেই। কিন্তু তার পরিবর্তে যে জিনিষটি থাকা উচিত তা হচ্ছে কোন একটি চরিত্রের আত্মোন্মীলন বা কোন একটি বিশেষ ভাবের রসনিবিড় রূপায়ন। শিথিল বা অসংবদ্ধ চিন্তা ও ইমেজের স্থান এই রীতিতে রয়েছে, কিন্তু তা অধিকাংশ স্থলেই বিশেষ বক্তব্যের সূচক মাত্র। দ্বিতীয়তঃ এই রীতির এমন একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, (যাকে ইংরিজীতে 'অ্যারেষ্টিং ফোর্স' বলা যেতে পারে) যে সৃষ্ট চরিত্রগুলির বিভিন্নতা লোপ পেয়ে বলার ভংগীটিই প্রাধান্য লাভ করতে পারে।

এই রীতির বিরুদ্ধবাদীদের একটি প্রধান অভিযোগ হোলো যে এক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকারা অধিকাংশই অসুস্থমনা, চিন্তাজর্জর জীবনের মূল্যবোধে অবিশ্বাসী এবং অধিকাংশ স্থলেই পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন। তর্কের খাতিরে যদি এ অভিযোগ মেনেও নেওয়া হয়, তবু বলবো যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো লেখকের কল্পনাপ্রসূত নয়—এর উৎস আমাদের বর্তমান জীবনে। বাস্তব জীবনে আমাদের এই আত্মিক বিপর্যয় প্রায়ই অতিরিক্ত বহির্মুখীনতার আড়ালে চাপা থাকে।

আগেই বলেছি যে বাংলাদেশের তরুণ লেখকদের মধ্যে অনেকেই চেতনা-প্রবাহ বা তৎ-প্রভাবান্বিত গদ্যরীতির দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের কাছে পাঠকের প্রত্যাশা অনেক। আর একটি সাবধান বাণী—যেন তাঁরা রীতিসর্বস্বতার দিকে না ঝোঁকেন। এযুগের জীবন যন্ত্রণা ও জীবন জিজ্ঞাসার সুষ্ঠু রূপায়নের জন্যই এই রীতির উদ্ভব। এই যন্ত্রণা ও জীবন-জিজ্ঞাসা যে লেখক অনুভব করতে না পারবেন তাঁর রচনায় এই গদ্যরীতি বেঢপ, বেমানান অলংকারের মতোই মনে হবে।

মীরা বালসুব্রমনিয়ন

সাহিত্য সমীক্ষা।। গোপাল ভৌমিক। জ্ঞানতীর্থ। ১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলকাতা। ৪.০০।

দু দশক ধরে শ্রীগোপাল ভৌমিকের সাহিত্য ও সমাজ-ভাবনার ফল এই গ্রন্থ। এগারোটি প্রবন্ধের সমষ্টি এই গ্রন্থে গত দু দশকের বাংলা তথা ভারতের সাহিত্য ও সমাজ-আন্দোলনের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া বিধৃত হয়েছে। সাহিত্যের সংগে সমাজচিন্তা ও রাজনীতির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আলোচ্য সময় সীমার মধ্যে বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়, তার পরিচয়স্থল এই প্রবন্ধগ্রন্থ।

গোপালবাবুর চিন্তা গোঁড়ামিমুক্ত। ভূমিকায় বলেছেন, "গণতন্ত্রে আমার অখণ্ড বিশ্বাস আছে বলে মত ও পথের ভিন্নতা মেনে নিতে আমার কুণ্ঠা নেই।" লেখক এই ভরসা দিয়েছেন বলে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে।

প্রথম প্রবন্ধ 'অর্ধশতাব্দীর সাহিত্য'-এ বিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের এশীয় সাহিত্যের দ্রুত সিংহাবলোকন। স্বভাবতই এই সমীক্ষা অগভীর। চীন-জাপানের সাহিত্য সম্পর্কে খুব একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে না। লেখক যদি আরো দায়িত্বশীল হতেন, সুখী হতাম। দ্রুত পর্যালোচনার ফলে কয়েকটি অসতর্ক মন্তব্য করা হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে [১৮৭০-১৮৯৯] বিশ শতকের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তি নেই। তাঁর গদ্য-পদ্য রচনা গত শতকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য' প্রবন্ধে লেখক যে ক'জন ভারতীয় চিন্তানায়কের নাম করেছেন। তার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের নাম নেই। রামমোহন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ভারত-সাধনা বিবেকানন্দের সাধনা বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ হতে পারে বলে মনে হয় না।

"নিজে কবিতা লিখি বলেই বোধ হয় কবিতা সম্পর্কে আলোচনাটা একটু বেশী মাত্রায় আছে। আশাকরি, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকারা এই ভারসাম্যহীনতার ত্রুটি ক্ষমার চোখে দেখবেন।" ভূমিকার এই নিবেদনে যে আশংকা প্রকাশিত, তা অমূলক। গোপালবাবুর কাব্যচিন্তা আমাদের কাছে অবশ্যই স্বাগত। কবিতা সম্পর্কে তিনটি প্রবন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সহৃদয় পাঠকরূপে এগুলি পড়ে খুশী হয়েছি বলেই কয়েকটি আপত্তি মনে জেগেছে। শেলী-টেনিসন ভবিষ্যতের স্বর্ণযুগের স্বপ্ন দেখেছেন, "কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে এঁদের এই স্বপ্ন-নিছক কল্পনাই ছিল—কোনো বৈজ্ঞানিকভিত্তি তার ছিল না।" (পৃঃ ১০৭) এই মন্তব্য স্বীকার করা কঠিন। শেলী-টেনিসন একনিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা অন্যায়। টেনিসনের আদর্শের পটভূমিতে বিজ্ঞানচিন্তার ও আধুনিক সমাজচিন্তার প্রভাব ছিল না, একথা মেনে নেওয়াও কঠিন। বাংলা-সাহিত্যে গীতিকবি "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ছিলেন আমাদের সাহিত্যে মাত্র একা রবীন্দ্রনাথ" (পৃঃ ১১১)। এই মন্তব্য বাস্তব-সমর্থিত নয়। রবীন্দ্র-প্রতিভা অমূল তরু নয়। ঊনিশ শতকের মিলিত কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল রবীন্দ্র-কাব্য। এই সত্য আজ মনে করিয়ে দিতে হয়, এটা দুঃখের কথা।

গোপালবাবুর এই গ্রন্থপাঠে সাহিত্য-পাঠকরূপে তৃপ্তিলাভ করেছি, একথা অবশ্যস্বীকার্য। এই গ্রন্থের সবচেয়ে বড় গুণ লেখকের বিশুদ্ধ সাহিত্যনিষ্ঠা—যা অধুনা বিরল হয়ে আসছে।

সাধনায় শৈথিল্য ও জনমনোরঞ্জনের হ্যাংলামির দিনে "সাহিত্যসমীক্ষা" আমাদের সুস্থ সাহিত্য-সাধনার আশ্বাস দান করে। আজকের দিনে এই আশ্বাসলাভ কম কথা নয়।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

যাদু কাহিনী ।। অকুব ঃ রূপা এ্যান্ড কোং ঃ কলিকাতা। মূল্য আট টাকা।

যাদুর যে একটা কাহিনী হতে পারে, আর তা নিয়ে যে, সাহিত্যিক রসোত্তীর্ণ রচনা সম্ভব, এ রকম একটা সত্য নিঃসংকোচে কেউই মেনে নিতে চাইবেন না। কেননা. যাদু যাদুই, ওর রহস্য কেউ জানে না, অথচ লোকের তাক লেগে যায়। ইংরেজীতে যাদুকে বলা হয়েছে 'অকালট সায়েন্স' বা 'সিউডো-সায়েন্স' এই বিদ্যেটি যে সে আয়ত্ত করতে পারে না, এর গোপন তুকতাক কোন্ অনাদি অতীতকাল থেকে মানুষের মনকে প্রভাবিত করে আসছে তার হদিশ কেউ দিতে পারে না। সভ্যতা-পূর্বযুগে যাদু ছিল অনৈসর্গিক অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার আধার। বি, ম্যালিনোস্কি তাঁর সায়েন্স, রিলিজিয়ন অ্যান্ড রিয়্যালিটি গ্রন্থের ম্যাজিক, সায়েন্স অ্যান্ড রিলিজিয়ন অধ্যায়টিতে সমাজচেতনা এবং ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনে যাদুর বিরাট ভূমিকার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, মূলতঃ এটা মানুষী শিল্প, কারণ মানুষ থেকে মানুষে এই বিদ্যেটি ধারাস্রোতের মত নেমে এসেছে গুপ্তবিদ্যার কঠোর নিয়মশৃংখলা, দীক্ষা এবং উপদেশ-নির্দেশের নৌকা বেয়ে। যাঁরা এই বিদ্যেটি জানতেন তাঁরা হতেন প্রভূত সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী লাভ করতেন অপরিমেয় সম্মান ও গৌরব. সমাজে বিশেষজ্ঞরূপে তাঁরা চিহ্নিত হতেন, সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি থাকতো তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। এ'রা নানা অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপের মাধ্যমে সমাজকে সম্মোহিত করতেন; লোকে বিশ্বাস করত, এ'রা না পারেন এমন কাজ নেই, সমাজের সর্বনাশ বা কল্যাণ দুইই এ'দের আয়ত্তে।

যাইহোক. যাদুর সেই সম্মোহিনী শক্তি যুক্তিবাদের বর্তমান গৌরবের যুগেও এতটুকু ম্লান হয় নি। মানবচিত্তকে যে কথার লহরী দিয়ে রসের ভাণ্ডে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, সেই কথা-গুলি যদি সাহিত্যপদবাচ্য হয়, তা'হলে যে যাদু মানুষকে আবহমানকাল সম্মোহিত করে আসছে তার মধ্যে কি এমন কোনও সারপদার্থ নেই যাকে ভিত্তি করে রস পরিবেষণ করা যায়, আর সেই পরিবেশিত রসকে সাহিত্যের মানে উন্নীত করা যায়?

"যাদু কাহিনী" পড়তে পড়তে এ রকম একটা কথাই আমার মনে দানা বেঁধেছে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল, বইখানি বোধ হয় : ম্যাজিক দেখাবার কলাকৌশল নিয়ে লেখা, যে রকম মনে হয়ে-ছিল, বইখানি বোধ হয় : ম্যাজিক দেখাবার কলাকৌশল নিয়ে লেখা যে রকম কয়েকখানা বই আমি অতীতে আমাদের পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম, "যাদু কাহিনী" থেকে যাদুবিদ্যার কয়েকটা কৌশল আয়ত্ত করে নেবো—আর অ, কু, ব'র কাছ থেকে আহৃত এই বিদ্যেটার সময় এবং সুযোগমত সদ্ব্যবহার করে বন্ধুবান্ধবদের তাক লাগিয়ে দেব।

কিন্তু অ, কু, ব সে সুযোগ আমাকে এবং আমার মত অন্যান্য কৌতূহলী যাদু-বিদ্যার্থীকে দিলেন না। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর জগদীশ্বরের কথা পেড়ে গ্রন্থটির প্রস্তাবনা যখন শুরু করলেন, তখন ভাবলাম আমাদের পাড়ায় সেদিন যে যুবকটি "শো" দেখাতে দেখাতে মাঝে মাঝে শূন্য গেলাস থেকে "ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া" ঢেলে মাটিতে ফেলছিলেন, এটা সেরকম একটা বিশেষ

ধরণের কোনও যাদুকরী বাগধারা হবে হয়ত। সুতরাং আশা করে রইলাম, প্রস্তাবনার দার্শনিক তথা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক কথাগুলো শেষ হলেই আসল জায়গায় এসে পড়ব। "শো" দেখাবার নিয়ম-কানুন এবং কৌশলগুলোকে ছাপার অক্ষর থেকে মুক্ত করে নিজের আয়ত্তে এনে ফেলব।

কিন্তু দেখলাম, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অ. কৃ, ব আমাদের নিয়ে ফেললেন তাঁর কাহিনীর মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মত এবার পাতার পর পাতা উলটিয়ে যেতে হবে—'অকালট সায়েন্স বা গুপ্ত বিজ্ঞানটা আর শেখা হবে না। একটির পর একটি করে বিশ্বের সেরা যাদুকররা এসে পাঠকের মনোজগৎ অধিকার করে নেবেন। এক একটা গল্পের নায়করূপে। মাঝে মাঝে মনে হবে, অ, কৃ, ব যাদুবিদ্যার একটা দার্শনিক ভিত্তি গড়ে তুলতে যেন বদ্ধপরিকর। লেখার মুনশিয়ানায় একটা গম্ভীর, অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টি করে প্রথমে পাঠকচিত্তে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন এঁকে দিলেন; পাঠক আঁকুপাঁকু করছেন, একটা বিমুগ্ধ তৃপ্তি মনের ভেতরটায় দানা বেঁধেও বাধছে না—রহস্যটার পিছনে কি আছে তা জানবার জন্যে ব্যাকুলতা বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক এ রকম সময়েই অ. কৃ, ব ছোট্ট একটি বাক্যে রহস্যটি ভেদ করে দিয়ে পাঠককে এক বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলালেন : "ও, তাই।"

পাঠক এবার একটা তৃপ্তির হাসি হাসলেন; বুঝে নিলেন, এতক্ষণ যে কাহিনীটাকে একটা অদ্ভুত অলৌকিক ব্যাপার ধরে নিয়ে তিনি স্তব্ধবিস্ময়ে হতবাক হতে চলেছিলেন, সেই কাহিনী-টার পিছনে রয়েছেন একজন যাদুকর। কখনও তিনি অদ্বিতীয় হ্যারি হুডিনি, কখনও উত্তরদেশের যাদুকর এন্ডারসন, কখনও যাদুকর গণপতি বা রাজা বোস, কখনও যাদুসম্রাট পি, সি, সরকার আর কখনও বা তকমাওয়ালা সাঁই। কাহিনীজনিত থমথমে গাম্ভীর্য যেন হাল্কা হয়ে গেল, পাঠক স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

আঠারোটি অধ্যায়ে যাদুর আঠারোটি দিক নিয়ে নিয়ে অ. কৃ. ব তাঁর কাহিনী শুনিয়েছেন, আর নিদেন পক্ষে জনপঞ্চাশেক যাদুকরকে এসব কাহিনীতে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছেন। যাদুর কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে যাদুকরদের কাহিনীও তিনি বলে গেছেন, যেগুলো যাদুর খেলার চাইতে কম রোমাঞ্চকর নয়।

কিন্তু যে কারণে এই "যাদুকাহিনীকে" বাংলা সাহিত্যের কৃতিত্বে নতুন দিগন্ত আখ্যা দেওয়া যায়, তা'হল : বেতাল পঞ্চবিংশতি বা সহস্র আরব্যরজনীর মত এই কাহিনীগুলো শুধু কাহিনী হিসাবে রসোত্তীর্ণ, তাই নয়, পরন্তু লেখক বার বার যেন একটা বিশেষ মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে পাঠককে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, যাদু মনোরঞ্জন করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও করে চলবে। তবে যুগে যুগে যাদুকরদের রূপ বদলেছে।

লেখকের যাদু-প্রীতি এত গভীর যে, তার স্পর্শ থেকে পাঠকেরও রেহাই পাবার উপায় নেই। জায়গায় জায়গায় তিনি যেন দার্শনিক হয়ে উঠেছেন, সেটা অবশ্য যাদুকরী টেকনিক।

"যাদু কাহিনী"র সাহিত্যিক গুণ ছাড়াও আমাদের কাছে আরও একটি কারণে এই বই-খানিকে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যাদুকরদের সম্বন্ধে এ একখানি চমৎকার 'রেফারেন্স' বই। একে পুরোপুরি জীবনী-সংকলন বলা যায় না, কিন্তু তবু এমন অনেক তথ্যের সমাবেশ এখানে সরস আলেখ্য হয়ে উঠেছে, যেগুলো জানা বা জানতে পারা যে কোনও লোকের কাছেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বোধ হবে।

উপসংহারে লেখকের সঙ্গে আমরাও একমত হয়ে বলছি : মনোরঞ্জক শিল্প হিসাবে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য ও নাট্যকলার যে স্থান, যাদুশিল্পের স্থান তার চেয়ে আদৌ ন্যূন বা তুচ্ছ

নয়। সুতরাং ভারত সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ এই শিল্পটিকেও সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিতে পারেন; আর তা করা হলে, এই লোকরঞ্জক শিল্পটি ভারতের জাতীয় মর্যাদাই বৃদ্ধি করবে।

রামজীবন ভট্টাচার্য

শিউলি ঝরার শব্দে।। শান্তি লাহিড়ী। সাহিত্য প্রকাশ। মূল্য দুই টাকা। পরিবেশনা ইণ্ডিয়ান পাবলিকেশন। ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট। কলিকাতা—১।
অনেক ক্ষতের চিহ্ন— রমাপ্রসাদ দে। প্রকাশক—শক্তি দাস। ৪।১ আফতাব মস্ক লেন, কলিকাতা—২৭। মূল্য—একটাকা।

"শিউলি ঝরার শব্দে" কবি শান্তি লাহিড়ীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থ কালীঘাটের পট পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থটিতে কবির প্রয়াস আরো অনেক বেশী পরিণত। প্রকৃতপক্ষে শিউলী ঝরার মৃদু শব্দের চেয়েও অনেক বেশী স্থির তার নিপুণ শব্দ এবং ছন্দের ব্যবহার। গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতাই তাই সার্থক এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। যেমন ঃ

"আমাকে ছিঁড়তে দাও। আমি আজ নিষ্ঠুর হবার
অপূর্ব সুযোগ ছিঁড়ব বৃন্ত থেকে। পাপড়ির ওপরে
আমার নিজের মুখ দেখবো।(কুসুমগুচ্ছ)

কিংবা ঃ

"বাউল, দেখছনা কেন এইমাত্র বৃষ্টি হয়ে গেছে,
মেঘেরা অনুক্ত তাই, বিদ্যুতের পাঠশালা—ছুটি
বাউল আমি তো দেখেছি মাটি ফুঁড়ে প্রলুব্ধ দোপাটি
প্রথম চরণ ফেলে মায়ামৃগ-মারীচের কাছে।" (পয়ার)

শান্তি লাহিড়ীর কবিতায় প্রথম এবং প্রধানগুণ হলো আন্তরিকতা। এই আন্তরিকতার গুণেই তার অধিকাংশ কবিতা পাঠকের মনে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ছন্দের ও শব্দের ব্যবহারে বৈচিত্র থাকা সত্বেও তার কবিসত্ত্বা পৃথিবীর স্নিগ্ধ সুন্দর অমল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত রূপটি দেখতে ভালোবাসে। গ্রন্থের আটান্নটি কবিতায় ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিগত এবং দেশ কালগত বহুবিধ সমস্যায় তিনি বিদ্ধ হলেও একটি স্নিগ্ধকোমল সহজ ও সুস্থ কাব্য প্রস্থানই যেন তার মূল্য লক্ষ্য। তাই

তোরা যদি কথা দিস দুঃখে কেউ বিমর্ষ হবিনা,
তবে আমি কাঁদবনা কাঁদবনা।
এই দেখ, অশ্রু মুছে দাঁড়ালাম, আর এই দেখ
গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুটে উঠবে এখনি আলোয়।" (জল রং)

রমাপ্রসাদ দে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সের কবি। এই কবির একান্ত কিশোর বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ "এক পাখি" আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। অনেক ক্ষতের চিহ্ন আমাদের মনে কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছে। বয়সে তরুণ হলেও

কবির দৃষ্টিতে কোনো অস্বচ্ছতা নেই। এক সহজ সুস্থ মানসিকতায় গ্রন্থের প্রতিটি কবিতা সংপৃক্ত;

"ঘুম ঘুম মধ্যরাত,
হঠাৎ জানালা খুলে যাওয়া
ছবি।
রাস্তায় গাছের ছায়া। নুয়েপড়া
মায়ের স্নেহের মতো
　　নরম নিবিড়
নরম নিবিড়
কী যেন হারিয়ে পাওয়া
পৃথিবীর　　　　　　　　(মধ্যরাতে সহর)

পরিশেষে কবির কাছে একটি বিনীত নিবেদন এই সার্থক কবিতা রচনা করার পেছনে যে প্রচুর অনুশীলন, ছন্দোজ্ঞান, ও পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য কাব্যকর্মের সঙ্গে কিছুটা প্রাথমিক পরিচয় প্রয়োজন, সে বিষয়ে যেন তিনি অবহিত থাকেন। এই কারণেই গভীর আন্তরিকতাও বহু কবিতাকে অকাল ভরাডুবি থেকে বাঁচাতে পারেনি। বইটির অঙ্গসজ্জা সুন্দর।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

রবীন্দ্র-সাগর সংগমে।। শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা-১২। মূল্য দশ টাকা।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে বাঙলা সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ শাখা ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করছে। একমাত্র শতবার্ষিকী বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত শতাধিক বাঙলা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্র-সাগরসংগমের বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আলোচনা-সঙ্কলনটি থেকে বহু লেখক ও সাহিত্যরসিক মনীষীর রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে মতামত জানা যাবে। সেক্সপীয়রের সাহিত্য সমালোচনার এরূপ সঙ্কলন সমাদর লাভ করেছে।

সম্পাদক একষট্টি জন লেখকের সমালোচনা সঙ্কলন করে তিনটি অংশে সাজিয়েছেন। প্রথম অংশে রবীন্দ্রনাথের ত্রিশটি বইয়ের উপরে বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনা পুস্তক প্রকাশের কালানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে আছে রবীন্দ্র-রচনাবলী সম্পর্কে পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের প্রাসঙ্গিক আলোচনার সঙ্কলন। তৃতীয় অংশে পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলী সম্পর্কে পুস্তকে ও পত্রিকায় প্রকাশিত টীকা-টিপ্পনী এবং খণ্ড মন্তব্যের সুনির্বাচিত সঙ্কলন। সকলের শেষে দেওয়া হয়েছে লেখক পরিচিতি।

এই সঙ্কলন থেকে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার ধারাটি উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বায়রনের মতো অকস্মাৎ একদিন সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হননি। তাঁকে অনেক বিরোধ ও নিন্দাবাদের মধ্য দিয়ে সাফল্যের পথ রচনা করতে হয়েছে। নবীন লেখক বলে তিনি সকলের নিকট থেকে সস্নেহ প্রশ্রয় লাভ করেন নি। একালের যে সব তরুণ লেখক একটু বিরূপ কিংবা

কঠোর নিরপেক্ষ সমালোচনায় বিচলিত হয়ে পড়েন তাঁরা এ বইটি পড়লে সান্ত্বনা পাবেন। রবীন্দ্র-নাথকেও কত অকারণ নিন্দাবাদ শুনতে হয়েছে তা জানতে পারলে তরুণ লেখকরা সাধনার পথে নতুন প্রেরণা লাভ করবেন। অবশ্য আলোচ্য সংকলনে তরুণ কবির রচনা সম্বন্ধে সাধুবাদের নিদর্শনও আছে। যে রুদ্রচণ্ড নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে অস্বীকার করেছেন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্ন ঘোষ বলেছেন : তাঁহার জ্যোতির নূতন আভা অচিরেই সমস্ত রঙ্গে ছড়াইয়া পড়িবে।" যাঁরা বিরূপ সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, নিত্যকৃষ্ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সুরেশচন্দ্র, সমাজপতি, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি। দ্বিজেন্দ্রলালের "চিত্রাঙ্গদা" ভালো লাগেনি; কিন্তু গোরা পড়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার জন্য নয়, বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের বিবর্তনের দলিল হিসাবেও বইটির মূল্য আছে।

সম্পাদক বহু দুষ্প্রাপ্য পত্রিকা ও পুস্তক থেকে আলোচনাগুলি উদ্ধার করেছেন। বিচ্ছিন্ন আলোচনাগুলির পটভূমিকা হিসাবে এবং পূর্বসূত্র উদ্ধারের জন্য অনেক টীকা সংযোজন করা হয়েছে। সম্পাদকীয় টীকা ও মন্তব্যগুলি সুলিখিত ও তথ্যসমৃদ্ধ। রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী পাঠকদের নিকট বইটি সমাদৃত হবে। চল্লিশ জন লেখকের ছবি সংযোজন করায় বইটির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠার সচিত্র বইটির দশ টাকা দাম কমই বলতে হবে।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্র কাব্য সঞ্চয়ন ॥ শ্রীদিলীপকুমার রায় সংকলিত। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড—কলিকাতা—৭। দাম আট টাকা।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক, কাব্য ও গানের সংকলন গ্রন্থ এই প্রথম। এর আগে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কৃপায় তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রকাশ হয়েছিল। যাদের পুরোনো বই রাখবার অভ্যাস আছে তাদের বাড়ীতে খোঁজ করলে এই গ্রন্থাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় বটে কিন্তু হাত দেবার উপায় নেই। পাতাখুলে পড়তে গেলেই গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যের কথা এই যে পঞ্চাশ বছর আগেও যার লেখা গান আর নাটক বাঙালীর একটা বিশেষ সম্পদ হয়ে ছিল আজ তা যাদুঘরে তুলে ফেলা হয়েছে।

এই ছোট সংকলন গ্রন্থে দ্বিজেন্দ্রলালের মত একজন প্রথম শ্রেণীর কবি নাট্যকার ও গীতিকারের প্রতিভার যথার্থ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তবু দিলীপকুমারের পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে এই জন্যে যে পিতার শিল্পসৃষ্টির সমকালীন সাংস্কৃতিক পরিবেশে লালিত হয়ে তিনি নিজেও সংগীত ও সাহিত্য জগতে কৃতী হয়েছেন। আধুনিক সংকলক বা সমালোচকের পক্ষে এই কাজটি নিতান্তই দুঃসাধ্য বলে পরিগণিত হবে এই জন্যে যে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য নাট্য ও সঙ্গীতের যথাযথ প্রয়োগ তাঁদের উপভোগ করা সম্ভব হয়নি। আলোচ্য পুস্তকেই তার প্রমাণ মিলবে। কবিশেখর কালিদাস রায়ের আলোচনা এইজন্যেই মূল্যবান হয়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্র-লালের কাব্য ও গান জনসাধারণের যে কতখানি প্রিয় ছিল তাহা তিনি দেখেছিলেন এবং তাঁর-হৃদয়কেও এককালে রঞ্জিত করেছিল।

দ্বিজেন্দ্র কাব্য, নাটক বা সংগীত উপভোগ করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন পাঠকের সরল দৃষ্টিভংগী। নিতান্তই সহজ বোধগম্য বলে আধুনিক পন্ডিতম্মন্য পাঠক হয়ত দ্বিজেন্দ্র শিল্পের প্রতি অল্পবিস্তর উন্নাসিকভাব পোষণ করতে পারেন কিন্তু এটা জেনে রাখা দরকার যে দ্বিজেন্দ্র কাব্য, নাটকের এইটাই বৈশিষ্ট্য। আধুনিক দুর্বোধ্য সাহিত্য তাঁর ব্যংগমুখর লেখনীর সামনে পড়লে যে কি অবস্থা প্রাপ্ত হত সেটা অনুমান সাপেক্ষই রয়ে গেল এইটাই আমাদের আক্ষেপ। দিলীপকুমারের এই সংকলন আধুনিক পাঠকের সামনে অন্ততঃ দ্বিজেন্দ্র-লালের এই সকল দৃষ্টিভংগীর বৈশিষ্টটুকু তুলে ধরতে পারবে।

বইখানির মধ্যে মোটামুটি দুটি ভাগ। প্রথম ভাগ হল দ্বিজেন্দ্র সাহিত্য, সংগীত ও নাটকের সমালোচনা আর দ্বিতীয় ভাগ হল দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সম্ভারের আংশিক নিদর্শন। সমালোচক গোষ্ঠীর নির্বাচন যথার্থ হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু সর্বত্র সমালোচকের নিষ্ঠা সমানভাবে প্রকাশ পায় নি। কবিশেখর কালিদাস রায়ের সর্বপ্রথম নিবন্ধটি চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী। কবিশেখর নিজে কবি ও হাস্যরসিক। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও সংগীত যখন পুরোদমে প্রয়োজিত হচ্ছে, কালিদাসবাবু সেই সময়ে তার ও প্রয়োগ উপভোগের দায়িত্ব বহন করেছিলেন। তাছাড়া কালিদাস নিজে যতটা না কবি-ততটা লজিক্যাল কাজেই দ্বিজেন্দ্র শিল্প যে তাঁকে মুগ্ধ করবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সাহিত্যের মাধ্যমে শিল্প যাচাই কররার একটা মস্ত অসুবিধা হল এই যে পরিবর্ত্তনশীল ভাষা সব সময়ই ভাব প্রকাশের রীতির মধ্যেও বিবর্তন আনছে। তাই পঞ্চাশ বছর আগেকার ভাব প্রকাশের সহজ ভংগী এখন অচল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রকাব্যের স্ফুরণ এমন এক সময় ঘটেছিল যখন ভাব প্রকাশের সহজভংগী ও পরিচ্ছদ সংবৃত কাব্যিক ভাষার মধ্যে একটা সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। তখন সবে "ভট্টাচার্যের চানা" ও "সবপোড়া-মড়াদহের" যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বাংলা সাহিত্যে এই নূতন সংঘর্ষ। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যু সেই সংঘর্ষের ক্রমবর্ধমান তেজকে কতকটা যে সংহত করে সন্দেহ নেই—তবুও তাঁর সংগীত ও নাটক তাঁর মৃত্যুর বহুকাল পরেও আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে রয়েছে। কবিশেখর শুধু একথাই নয় আরও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তিনি দ্বিজেন্দ্র-লালের বিভিন্ন দিক নিয়ে। তাঁর কাব্য ও সংগীতের বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে ধরে তার বক্তব্যের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছেন। এবং অপূর্ব নিষ্ঠার নিদর্শন দেখিয়েছেন তার এই সমালোচনায়। এদিক থেকে তাঁর সমালোচনার জুড়ি এই গ্রন্থখানিতে দেখা যায় না।

শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর দ্বিজেন্দ্র নাটকের সমালোচনা মনোজ্ঞ ও পান্ডিত্যপূর্ণ। নাট্য সমা-লোচনায় নারায়ণ বাবু বিশেষ পারদর্শী এবং সে পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। শুধু নাটক নয় কাব্য ও সংগীত সমালোচক হিসাবেও তিনি স্বনামধন্য। তার লেখা সংগীত পরিক্রমা গ্রন্থটি তার সংগীত-সমালোচনার খ্যাতি বহন করছে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি কম্পোসার বা সুররচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রচুর সুখ্যাতি করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "তিনি (দ্বিজেন্দ্রলাল) যে একজন অসামান্য সুরকার ছিলেন একথা যথার্থ" অন্য জায়গায় বলছেন যে. "দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত দ্বিজেন্দ্রশিল্পী ব্যক্তিত্বের একটি বিশেষ সমৃদ্ধ দিক—সে সম্বন্ধে সম্যক আলোচনা করতে হলে একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের দরকার। এখানে তার সুযোগ নেই।" তার এই বক্তব্যের সংগে আমরা সম্পূর্ণ একমত। শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সংগীত সমালোচনা সাধারণতঃ গতানুগতিকতা বর্জিত ও যথার্থ সঙ্গীত রসিকের মতামতে ভাস্বর। দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতের ওপোর একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ

সমালোচনা বাংলাসঙ্গীতের একটি গভীর শূন্য ভরাট করত সন্দেহ নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সেই সুযোগ পেয়েও তার ব্যবহার করেননি, তার সঙ্গীত পরিক্রমা গ্রন্থটি বাংলা সঙ্গীতের অনেক সুরকার ও গীতিকারের সমালোচনায় সমৃদ্ধ কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীত সম্বন্ধে তার লেখনী সম্পূর্ণ নীরব। আলোচ্য প্রবন্ধে অবশ্য অন্যত্র তিনি সে কথা প্রায় স্বীকার করেই লিখেছেন যে "এই ক্ষেত্রে (সঙ্গীতের) তার (দ্বিজেন্দ্রলালের) যথার্থ সম্মান তাঁহাকে দেওয়া হয়েছে কিনা সন্দেহ।"

শ্রীযুক্ত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সুরকার দ্বিজেন্দ্রলাল নিতান্তই গতানুগতিক আলোচনা। জ্ঞানপ্রকাশ বাবু গুণী শিল্পী সে হিসাবে সমালোচনার ক্ষেত্রে তার বৈশিষ্ট্য দেখাতে, সক্ষম হননি। প্রধানতঃ প্রয়োগ শিল্পী বলেই বোধকরি তার আলোচনাটি প্রয়োগ বৈচিত্রের দিকে চোখ রেখে করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্রের কাব্য সঙ্গীতে দ্বিজেন্দ্রলাল সে দিক থেকে সমৃদ্ধ না হলেও তথ্যবহুল। বাংলা সঙ্গীতের গবেষক হিসাবে রাজ্যেশ্বর বাবুর কাছে আরও কিছু আশা করতে পারি। এখানে তার লেখা জ্ঞানবাবুরই অনুরূপ স্বল্পপরিসর। স্থানান্তরে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের ওপোর রাজ্যেশ্বর বাবুর আরও সুচিন্তিত মতামতের জন্য অপেক্ষায় রইলুম।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানে শব্দ চয়ন ধ্বনিসম্ভার, ছোট ছোট তানগুলির প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য তাল ও ছন্দ বৈচিত্র, হাঁসির গান ও নাট্যসঙ্গীত অতুল ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে যেটুকু বলেছেন তিনি ঐ কবি শেখর কালিদাস রায়। দুঃখের বিষয় সাহিত্য কাব্য ও নাট্য আলোচনা যতখানি বিস্তৃত হয়েছে, সঙ্গীত আলোচনা ততটা সুষ্ঠু হয়নি।

শ্রীদিলীপ কুমারের আলোচনা "দ্বিজেন্দ্রলালের ছন্দ প্রতিভা" একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। বাংলাছন্দে দিলীপ কুমারের ছন্দজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত এবং বোধকরি সেই কারণেই প্রবন্ধটি গতানু-গতিক ছন্দ বিশ্লেষণের মধ্যে নিবদ্ধ নেই। ইংরাজী ছন্দ প্রধানতঃ সাধারণ উচ্চারিত বাচনভঙ্গীকে গ্রহণ করে। বাংলা ছন্দ অক্ষর মাত্রিক ও স্বর মাত্রিকের দোটানায় পড়ে পূর্ণ বিকাশের আশায় পাঠক, আবৃত্তিকার বা গায়কের ভরষায় সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দের এই বিতন্ডার কাহিনী দ্বিজেন্দ্র কাব্যে কেন রবীন্দ্রকাব্যেও অল্পবিস্তর পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় মহাশয় উদাহরণে পাহাড় তুলে ধরে ছন্দ বৈচিত্রের এই গূঢ় তত্ত্বটুকু বোঝাতে চেষ্টা করে-ছেন। শুধু দ্বিজেন্দ্রকাব্য নয়, তার উদাহরণগুলির মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ. রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ ও ইংরাজ কবিদের উদ্ধৃতিও রয়েছে। তার হাঁসির কবিতা ও গানগুলির ছন্দগুলিকেও দিলীপ কুমার বাদ দেননি।

গ্রন্থখানির এক তৃতীয়াংশ সমালোচনা ও বাকী অংশ দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা। এত অল্প জায়গার মধ্যে দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের যথার্থ নিদর্শন তুলে ধরা যায় না। সংকলক তাই আগেই বলেছেন যে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ গান, কবিতা ও নাট্য কাব্যের সমষ্টি নিয়ে এই গ্রন্থ। সে হিসাবে আংশিক ভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি দেখাতে হয়েছে। গান, কবিতা, নাট্য-কাব্য ও হাসির গান সম্বলিত এই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্য রসিক মাত্রেই সংগ্রহ করবেন আশাকরি।

বইখানির কোনও সূচনা নেই। পড়তে গেলে বড়ই অসুবিধা হয়। আশাকরি প্রকাশক দ্বিতীয় মুদ্রণে কথাটি মনে রাখবেন। বাঁধাই ও ছাপা ভাল। সুদৃশ্য জ্যাকেটে প্রচ্ছদপট পরি-কল্পনা আকর্ষণীয়।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস।। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য। কলিকাতা সংস্কৃত মহা-বিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা। গ্রন্থাঙ্ক ১৮। মূল্য ২.০০

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষে শিক্ষাবিস্তারের জন্য খুব বড় বেশী কিছু করেননি। তবে বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এখানে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক্রমাগতই করেছেন। হিন্দু কলেজের উৎপত্তি প্রধানতঃ তাঁদেরই তাগিদে। সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষার একটি উপায়রূপে সংস্কৃত কলেজের সূত্রপাত হলো, ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে নিয়মিত ক্লাস সুরু হলো। রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত চর্চার জন্য এই অর্থব্যয়ের প্রতিবাদ করে বলেছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানমূলক শিক্ষা এখন প্রয়োজন। জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনস রামমোহনের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে স্বীকার করেন নি, তাঁরা মনে করেছিলেন যে জনসাধারণের মনোভাব পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান সুরু করার উপযোগী নয়। সংস্কৃত কলে-জের প্রথম পাঠ্যক্রমে শুধু সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই আছে। প্রথম অবস্থায় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য-সন্তান ছাড়া আর কারো সংস্কৃত কলেজে পাঠের অধিকার ছিলনা।

প্রথম অবস্থায় সেক্রেটারী ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিই কলেজের কর্তৃপক্ষ ছিলেন। ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন এই সর্তে যে তাঁকে প্রিন্সিপালের ক্ষমতা দিতে হবে। বিদ্যাসাগরের হাতে এই কলেজের কিছু আমূল পরিবর্তন হলো; ব্রাহ্মণ আর বৈদ্যের জন্যেই দ্বার বন্ধ রইলো না। সকলের জন্যেই দ্বার উন্মুক্ত হলো। অব্যবস্থিতচিত্ত ছাত্র ও অভিভাবকদের খামখেয়াল থেকে কলেজকে বাঁচানোর জন্যে তিনি বেতনের হার নির্দিষ্ট করেছিলেন। প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করে সংস্কৃত শিক্ষার দুর্গমতা অনেকটা লাঘব করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের যোগ কতদূর ফলবতী হয়েছিল তা তাঁর ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থাপনার চেষ্টা থেকেই জানা যাবে। বিদ্যাসাগর তৎকালীন সরকারী অদূরদর্শী শিক্ষা-নীতির মধ্যে নিজের শিক্ষা-চিন্তা অনুযায়ী একটি পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন, তার জন্যে কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ জে, আর ব্যালেন্টাইনের সঙ্গে তাঁকে দ্বন্দ্বেও প্রবৃত্ত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত জিত হলো তাঁরই। দিনের পর দিন নিজেদের সীমিত বুদ্ধি নিয়ে, পূর্বার্জিত ধারণার পক্ষপুটে আশ্রিত হয়ে বাংলার পণ্ডিতসমাজ এই অভিমান পোষণ ও লালন করে আসছিলেন যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রই সকল সত্যের মূল এবং শাস্ত্রীয় কোন সংস্কার বৈজ্ঞানিক সত্যের অনুরূপ মনে হলেই আত্মশ্লাঘায় তাঁরা উৎফুল্ল হতেন। অথচ পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁদের কোনই যোগ ছিল না। বিদ্যাসাগর খুব জোর দিয়ে সেদিন যে সব কথা বলেছিলেন তা শুধু তাঁর সাহস ও বৈপ্লবিক চিন্তার পরিচায়ক নয়; দেশের চিন্তাধারাকে একটি নূতন খাতে বইবার সুযোগ তিনিই করে দিয়েছিলেন, তাই তিনি যথার্থ চিন্তানেতা ও দেশ নেতা। তিনি যা বলেছিলেন তার অংশবিশেষ হলো এই,—"বেদান্ত ও সাংখ্য যে ভ্রান্ত দর্শন, এ সম্বন্ধে এখন আর মতদ্বৈধ নাই। মিথ্যা হইলেও হিন্দুদের কাছে এই দুই দর্শন অসাধারণ শ্রদ্ধার জিনিষ। সংস্কৃতে যখন এইগুলি শিখাইতেই হইবে ইহাদের প্রভাব কাটাইয়া তুলিতে প্রতিষেধকরূপে ইংরাজীতে ছাত্রদের যথার্থ দর্শন পড়ানো দরকার।....একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-দর্শনে এমন অনেক অংশ আছে, যাহা ইংরাজীতে সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করা যায় না; তাহার কারণ, সে সব অংশের মধ্যে পদার্থ কিছু নাই।....উন্নতিশীল ইউরোপীয় বিজ্ঞানের তথ্যসকল ভারতীয় পণ্ডিতগণের গ্রহণযোগ্য করা দুঃসাধ্য। তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত

কুসংস্কার দূর করা অসম্ভব। কোন নূতন তত্ত্ব, এমনকি তাহাদের শাস্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ আছে তাহারই পরিবর্ধিত স্বরূপ যদি তাহাদের গোচরে আনা যায় তবে তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। পুরাতন কুসংস্কার তাহারা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে।" এই অবস্থায় বিদ্যাসাগর পাশ্চাত্য দর্শন পাঠের প্রয়োজনীয়তা শুধু অনুভব করেই ক্ষান্ত হননি, নিজের পরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি চালু না হওয়া পর্যন্ত অনমনীয় মনোভাব নিয়ে সরকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যালেণ্টাইনের সুপারিশ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেন। যতদিন বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ততদিন তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে এই শিক্ষায়তনের এক গৌরবময় ঐতিহ্য গড়ে দিয়েছিলেন। ১৮৫৮ সালে তাঁর পদত্যাগও সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অবনিবনারই ফল।

১৮২৪ থেকে ১৮৫৮ খৃঃ পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের গড়ে ওঠার একটি বিশেষ পর্ব। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কলেজের ১২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব উপলক্ষে কলেজ ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন।

সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ গবেষণা গ্রন্থমালায় শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য একটি গ্রন্থ যোজনা করেছেন—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৫৮-১৮৯৫। প্রথম খণ্ডে যে ধারা দ্বিতীয় খণ্ডে তারই অনুসৃতি। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী অধ্যক্ষ ই. বি. কাওয়েল থেকে প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর কাল পেরিয়ে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের কাল পর্যন্ত দ্বিতীয় খণ্ড। লেখকের রচনা তথ্যবহ—ব্রজেন্দ্রনাথের মতোই আতিশয্যবর্জিত, ঘটনা সংকলন। এই প্রসঙ্গে আমাদের আপত্তিটুকু জানিয়ে রাখি; ইতিহাস তো শুধু ঘটনা পরম্পরা নয়, তা তো কোন নিরুত্তাপ হৃদয়ের শুধু তথ্য রোমন্থন নয়। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের দুটি খণ্ডেই আমরা ঘটনা পেয়েছি অনেক, কিন্তু কাহিনীতে প্রাণ নেই। দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, সরকারী অবিমৃষ্য-কারিতার সঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে স্বচ্ছ তেজস্বী বুদ্ধির যে লড়াই চলতো; বিরাট কলেজ ভবনে ঘরে ঘরে মনীষী শিক্ষকদের ভাষণে যে অনুরণন উঠতো তার দু-একটি ক্ষীণ কম্পন ধরে দিলেও ইতিহাস জীবন্ত হতো। পাঠক শুধু সংস্কৃত কলেজ বলতে কয়েকটি ব্যক্তি আর তারিখ বুঝতো না বুঝতো একটি জাগ্রত প্রাণপ্রবাহকে।

তবু যা নেই তা নেই, যা আছে তা অল্প নয়। শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসরের ইতিহাস নিপুণতার সঙ্গে সঞ্চয় করেছেন। ই. বি. কাওয়েল, প্রসন্নকুমার, মহেশচন্দ্র—এ সব নাম বাঙ্গালী আজ ভুলে গেছে। অথচ এদেরই মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মনীষা আশ্রয় পেয়েছে। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসের ২য় খণ্ড শুধু সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসই নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসেরও একাংশ। বাঙ্গালী পাঠক এ গ্রন্থের সমাদর করবেন। মূল্য স্বল্পই, আশাকরি মধ্যবিত্ত পাঠক স্বল্পমূল্যের সুযোগ নেবেন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রেডিয়েন্ট প্রসেস

Regd. No. C3597 Phone : 23-5155 June '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAJ

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কেয়ো-কার্পিনেই
শ্রীমতীর আস্থা
কারণ শ্রীমতী
জানেন কেশপ্রসাধনে
কেয়ো-কার্পিন
ব্যবহার করলেই
আভিজাত্য খোলে,
রূপ-ব্যক্তিত্বমণ্ডিত হয়।
রূপ এবং
আভিজাত্যের
বিকাশের জন্য
নিত্য কেশপ্রসাধনে
কেয়ো-কার্পিন
ব্যবহার করুন।
HERBAL
HAIR OIL
কেয়ো-
কার্পিন
মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী · কটক

একাদশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' সত্তর

সমকালীন ঃ প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সূচীপত্র

সম্পাদক ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্‌ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আষাঢ়
তেরশ সত্তর

একাদশ বর্ষ
৩ সংখ্যা

সমকালীন

মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

সতীশচন্দ্র আচার্য ১৭৯২ সকাব্দের ৫ই শ্রাবণ (১৮৬৯ খৃঃ অঃ) ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত খানকুলা গ্রামে এক গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম ছিল পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। সতীশচন্দ্রের জন্মের শতাধিক বর্ষ পূর্বে আচার্য পরিবার নবদ্বীপ হইতে ফরিদপুর জেলায় খালকুলা গ্রামে গিয়া তথায় বসবাস আরম্ভ করেন। শৈশবেই সতীশচন্দ্রের পিতৃ বিয়োগ হয়। দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া সতীশচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত বৃত্তিলাভ করিয়া প্রাথমিক পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হন। অতঃপর উচ্চশিক্ষালাভার্থে তিনি নবদ্বীপে আসেন এবং তত্রস্থ নবদ্বীপ হিন্দু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র সংস্কৃতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি নবদ্বীপের বিদগ্ধজননী সভার একটি পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাইয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই সতীশচন্দ্র আচার্য কৌলিক উপাধির পরিবর্তে বিদ্যাভূষণ উপাধিতেই জনসাধারণের নিকট পরিচিত হন। এম. এ. উপাধিলাভের পর তিনি কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদলাভ করেন। এই সময় তিনি পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্নের নিকট কাব্য ও নবদ্বীপের যদুনাথ সার্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিতেন, অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইয়া তিনি দুইজন দেশীয় পণ্ডিতের নিকট বিনীতরূপে পাঠ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কৃষ্ণনগর কলেজে কয়েকবৎসর অধ্যাপনা

করার পর বুদ্ধিষ্ট্‌টেক্সট্‌ সোসাইটির অনুরোধে সরকারী শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক সতীশচন্দ্রকে এই সমিতির কার্যে নিয়োগ করা হয়। বুদ্ধিষ্ট্‌টেক্সট্‌ সোসাইটির কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৯৭ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র দার্জিলিং এ অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি তিব্বত পর্যটক ও বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ শরৎচন্দ্র দাস (১৮৪৯-১৯১৭) মহাশয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং এই পণ্ডিতের ইংরাজী-তিব্বতী অভিধান সংকলনের সহায়তা দান করেন। এই সময় তিব্বতের প্রসিদ্ধ লামা লাসা বাসী পণ্ডিত ফুন্‌ছুগ্‌ ওয়াংগডেন্‌ দার্জিলিংগে অবস্থান করিতেন। জ্ঞান-ভিক্ষু সতীশচন্দ্র প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এই পণ্ডিতের নিকট যত্ন সহকারে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বুদ্ধিষ্ট্‌টেক্সট্‌ সোসাইটির কার্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সতীশচন্দ্র পুনরায় সরকারী শিক্ষা বিভাগের কার্যে যোগদান করেন। এইবার তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সময় কিছু সিংহল ও ব্রহ্ম দেশীয় ভিক্ষু কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। এই সুযোগে সতীশচন্দ্র ইহাদের সাহায্যে উত্তমরূপে পালিভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর প্রযত্নে প্রবর্তিত পালিভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে স্থানলাভ করেন। ইতিপূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কেহই পালিভাষায় পরীক্ষা দেন নাই। স্বদেশে উপযুক্ত পরীক্ষক না পাওয়াতে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শাস্ত্র ও পালিভাষাবিদ্‌ অধ্যাপক রীজ্‌ ডেভিডসের (১৮৪৩-১৯২২) নিকট লণ্ডনে প্রশ্নপত্রের উত্তর প্রেরণ করা হয়। সতীশচন্দ্রের উত্তরপত্র দেখিয়া অধ্যাপক রীজ ডেভিডস্‌ মুগ্ধ হইয়া যান এবং এই অজ্ঞাত পরীক্ষার্থীর পালিভাষা জ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সতীশচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইহার পূর্ব হইতেই সতীশচন্দ্র স্বদেশ ও বিদেশের নানা পত্র পত্রিকায় ইংরাজী ও বাংলায় পালিভাষা, বৌদ্ধধর্ম, ন্যায় দর্শন, সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন ও এইগুলি স্বদেশ ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে তাঁহার কতকগুলি পুস্তক ও প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত হইতে মহামান্য তাসিলামা ভারত সরকারের অতিথি রূপে ভারতের বৌদ্ধতীর্থগুলি দর্শন করিতে আসেন। সতীশচন্দ্র ভারত সরকারের নির্দেশে তাঁহাদের প্রতিনিধি রূপে তাসিলামাকে লইয়া বৌদ্ধতীর্থগুলি পরিদর্শন করেন ও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহাকে সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। তাসিলামা সতীশচন্দ্রের বিদ্যাবত্তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়া সবিশেষ মুগ্ধ হন এবং সতীশচন্দ্রকে তাঁহার ভ্রমণ-সংগী নিযুক্ত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ব্যক্তিগত প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তাসিলামা সতীশচন্দ্রকে একটি বহুমূল্য রেশমী গাত্রাবরণী (খাটাগ্‌) উপহার দেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের নববর্ষের দিনে সতীশচন্দ্র ভারত সরকার কর্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগে ভারতের ন্যায়শাস্ত্রের ধারা (মিডিভ্যাল স্কুল অফ্‌ ইণ্ডিয়ান লজিক্‌) সম্বন্ধে লিখিয়া সতীশচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধি লাভ করেন। অপর একটি নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীফীথ পুরস্কারও লাভ করেন। এই সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণ আসন্ন হইয়াছিল। এই পদে গভর্নমেন্ট্‌ কোন বিদেশী পণ্ডিতকে

নিয়োগের সংকল্প করেন, তাঁহাদের বিচারে কোন ভারতীয়ই এই পদ গ্রহণের উপযুক্ত ছিলেন না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ের কর্ণধার সার আশুতোষ ইতিপূর্বেই তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অত্যুজ্জ্বল রত্নটির সম্যগ্ পরিচয় পাইয়াছিলেন। তিনি বাংগলার তদানীন্তন ছোটলাট (লেফ্‌নাণ্ট্ গভর্নর) সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের নিকট অনুরোধ জানাইলেন যেন সতীশ চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া আর কাহাকেও অধ্যক্ষ না করা হয়। ছোটলাট শিক্ষা বিভাগের পরামর্শ ক্রমে আশুতোষকে জানাইলেন যে কোন কোন বিষয়ে সতীশ চন্দ্রের শিক্ষার অপূর্ণতা আছে। তাহার প্রত্যুত্তরে সার আশুতোষ জানাইলেন যে বর্তমান অধ্যক্ষের অবসর গ্রহণের বিলম্ব আছে এই সময়ের মধ্যে সতীশ চন্দ্রকে আরও কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষিত হইতে সাহায্য করা শিক্ষা বিভাগের উচিত কর্তব্য। সার আশুতোষের পরামর্শ উপেক্ষা করা বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার দৃঢ়তা শিক্ষা বিভাগের ছিলনা, তাঁহাদের নির্দেশে সতীশ চন্দ্রকে বৌদ্ধদর্শন ও পালি ভাষা বিশেষরূপে অধ্যয়নার্থ সিংহলস্থিত কলম্বো বিদ্যোদয় কলেজে প্রেরণ করা হইল। এখানে আচার্য সুমঙ্গল ভিক্ষুর নিকট সতীশ চন্দ্র কিছুকাল বৌদ্ধদর্শন ও পালিভাষা এই দুইটি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি বারানসী আগমন করিয়া তত্রস্থ পণ্ডিতদের নিকট বেদ ও দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিবকুমার শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় ভাগবতাচার্য, বামাচরণ ন্যায়াচার্য প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতদের নিকট শ্রুতি, অদ্বৈত দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন দ্বারা সতীশ চন্দ্রের পাণ্ডিত্য গভীর ভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বারানসী বাসকালে জৈনধর্ম ও জৈন দর্শন ও তিনি জৈন পণ্ডিতদের নিকট যত্ন সহকারে আয়ত্ত করেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি জার্মান অধ্যাপক থিবোর নিকট জার্মান ভাষা ও ইউরোপীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর সতীশ চন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়া সার আশুতোষের বাসনা পরিতৃপ্ত করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সার আশুতোষ সতীশ চন্দ্রকে আংশিক সময়ের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিভাষারও অধ্যাপক নিযুক্ত করেন, ইহার বহুপূর্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ (ফেলো) লাভ করিয়াছিলেন। নানা পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়া সতীশ চন্দ্রের খ্যাতি অতঃপর বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে। সতীশ চন্দ্র ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বারানসীতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত দিগম্বর জৈন সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতিপদে বৃত হন। সভায় তাঁহাকে "সিদ্ধান্ত মহোদধি" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যোধপুর নিখিলভারত শ্বেতাম্বর জৈন সম্মেলনও তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জৈন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "শাস্ত্র-সুধাকর" উপাধি দান করেন। এই বৎসর হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংস্কৃত সম্মেলনেও তিনি অধিনায়কত্ব করেন। ইংরাজী, পালি ও সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াও সতীশ চন্দ্র বঙ্গভারতীর নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন। বাংগলায় অনেকগুলি সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা ব্যতীত অনেকগুলি বাংগলা সাময়িক পত্রের (বিশেষভাবে নব্যভারত) তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাসের পর হইতে একদিকে তিনি যেমন এশিয়াটিক সোসাইটির সহিত গভীরভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন অন্য দিকে তেমনি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবায়ও তৎপর ছিলেন। পরিষদের মুখপত্র "সাহিত্য পরিষদ,

পত্রিকা"টি তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত সম্পাদন করেন। বাঙলার সাহিত্যিকেরা সর্বশাস্ত্রজ্ঞ এই মহামহোপাধ্যায়কে তাঁহাদেরই একজন বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের নবম অধিবেশন যশোহর শহরে সতীশ চন্দ্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি হিসাবে তাঁহার তথ্যপূর্ণ অভিভাষণ সাতিশয় মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পুণা নগরে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলনের (ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্স) পালিভাষা ও বৌদ্ধধর্ম বিভাগের সভাপতিত্বের ভার সতীশ চন্দ্রের উপর অর্পণ করা হয়।

গুরু পরিশ্রমের ফলে সতীশ চন্দ্র ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসক ও বন্ধুদের পরামর্শে তিনি তিনমাস ছুটি লইয়া বিশ্রাম উপভোগ করেন। স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল কার্যে যোগদান করেন, কারণ অকালে অবসর গ্রহণ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। অসুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিতে গিয়া ২৫শে এপ্রিল সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া সতীশ চন্দ্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুকালে সতীশ চন্দ্র তিব্বতীয় তেঙ্গুর ও কেঙ্গুর নামীয় অতিকায় গ্রন্থদ্বয় অনুবাদে ব্রতী ছিলেন। সতীশ চন্দ্র নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিনয় তাঁহার চরিত্রের ভূষণ ছিল। নানাগুণে ভূষিত বৌদ্ধশাস্ত্র বিশারদ সতীশ চন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুজনেরা 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত করিতেন, সতীশ চন্দ্র ইহাতে সাতিশয় কুণ্ঠিত ও বিব্রত বোধ করিতেন।

সতীশ চন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশায় ভারতীয় ন্যায়দর্শন, বৌদ্ধ ও জৈনদর্শন সম্বন্ধে একজন দিকপাল রূপে পরিগণিত হইতেন। তাঁহার এই কীর্তি অদ্যাপিও ম্লান হয় নাই। সতীশ চন্দ্রের অজস্র রচনাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাধ্যমিক স্কুল অফ্ বুদ্ধিষ্ট ফিলসফি (জার্নাল অফ্ বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটি, ১৮৯৩); কাচ্চায়নের পালি ব্যাকরণ—(ইং অনুবাদসহ সম্পাদিত, মহাবোধি সোসাইটি, ১৯০১), টিবেটেন্ প্রাইমার (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, লামা ওয়াঙ্গডানের সহযোগিতায়, কলিকাতা, ১৯০২); বৌদ্ধস্তোত্র সংগ্রহ (সম্পাদিত, ১৯০৮, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, কলিকাতা, ১৯০৮); দি ন্যায়াবতার অফ্ সিদ্ধসেন দিবাকর (ইং, সম্পাদিত); হিষ্ট্রি অফ মিডিভ্যাল স্কুল অফ ইণ্ডিয়ান লজিক (ইং, কলিকাতা); গ্রিমস্ ফনেটিকল অফ ইণ্ডো এরিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ (কলিকাতা, ১৯০৫); মহাযান য়্যাণ্ড হীনযান (ইং, হার্টফোর্ড, ১৯০০), পরীক্ষা-মুখ সূত্র (সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০৯ দিগম্বর জৈনসম্প্রদায়ের তর্কবিদ্যা বিষয়ক); মহাব্যুৎপত্তি (ক্ষোমা দ্য কোরশ্ সঙ্কলিত ও অনূদিত তিব্বতী শব্দমালার ইংরাজী অনুবাদ, ডেনিসন রসের সহযোগিতায় সম্পাদিত, এশিয়াটিক সোসাইটি মেমোইরস, কলিকাতা ১৯০৯); আত্মতত্ত্ব প্রকাশ (ন্যায়দর্শন, বাঙলা, ১৯০২); ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য (কলিকাতা ১৮৯৯); ভবভূতি (কলিকাতা, ১৮৯৯); বুদ্ধদেব (কলিকাতা, ১৯০৪), ন্যায়-প্রবেশ; লঙ্কাবতার সূত্র, অবদান কল্পলতা, স্রগধারা স্তোত্র (সম্পাদিত।) শ্রীহর্ষের রত্নাবলী (ইং ও বাং অনুবাদ সহ সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯০৩) প্রভৃতি।

পত্র-সাহিত্যে বিবেকানন্দ

রতন সান্যাল

কোন ব্যক্তিপুরুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, মহৎ কর্ম প্রচেষ্টার সংকল্প ও কর্ম জীবনের মানসিক প্রস্তুতির প্রকৃতরূপ তার লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে যেমন নিখুঁত ভাবে পরিস্ফুট তেমন বোধকরি কোন কিছুতেই নয়। বিশেষ সে ব্যক্তিপুরুষ যদি সাধারণ মানুষের গণ্ডিকে অতিক্রম করে আপন ব্যক্তিত্বে ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। তার চারিত্রিক গঠন, মননশীলতা ও প্রস্তুতিপর্বের বিশদ বিবরণ সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির লিখিত পত্রাদির মধ্যে কোন-না-কোন রকম ভাবে প্রকাশিত। স্বামী বিবেকানন্দের ঘটনা বহুল জীবনের বাস্তব পরিচয়, তাঁর চিন্তা মনন ও ধ্যান-ধারণার নিখুঁত বিবরণও তাঁর লিখিত অসংখ্য পত্রের মধ্যে বিধৃত। প্রকৃত তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে এই পত্রাবলী স্বামী বিবেকানন্দের মত নির্ভীক বাগ্মীপুরুষের যথার্থ পরিচয় দানে একমাত্র নির্ভরশীল দলিল, সে-বিষয় সন্দেহর কোন অবকাশ নেই। তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী—পরবর্তী-কালে যা কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছে, বিশেষ বিবেকানন্দের অনুরক্ত ভক্তবৃন্দের মধ্যে যে সব অলৌকিক ঘটনার প্রভাব অনতিক্রম্য--তার বাস্তবরূপ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃত ঘটনার পরিচিতি এই পত্রাবলী ইতিহাসবেত্তা মাত্রেই এই পত্রাদির উল্লেখিত সন তারিখ সংবলিত স্থানকাল ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে বিবেকানন্দের মত বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটনে সমর্থ হবেন। এবং এই পরিচয় বহুলাংশে যে বিবেকানন্দের কর্মবহুল জীবনেরই পরিচয়, তার নিখুঁত অক্লান্ত ও মর্মস্পর্শী বর্ণনা এই পত্রাদির মধ্যে বিবৃত। তাঁর অন্য কোন রচনায় তিনি এমন ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন নি; আপন আদর্শ, স্বধর্ম ও স্বদেশের জন্য এমন করে নিজেকে উজাড় করে দেননি। দেশের আপামর জনসাধারণকে কর্মমন্ত্রে উদ্দীপ্ত করার আহ্বান এমন তীব্রভাবে হৃদয়ে পেঁৗছে দেয় না। এই চিঠিপত্রের মধ্যেই বিবেকানন্দকে আপনজনের মত একান্ত ভাবে পাওয়া যায়। সেখানে আর তিনি সন্ন্যাসী নন, আমাদেরই মত গৃহী। স্নেহে মমতায় আবেগে সহমর্মী বন্ধু, ভর্ৎসনায়, উপদেশ দানে অগ্রজপ্রতিম। তাঁর চিঠিপত্রের ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলিত কথ্য ভাষা, যা অনায়াসে বাঙালীর হৃদয়ে পেঁৗছে দেয়। এই অসাধারণ সারল্যের প্রতীক বিবেকানন্দের মত ব্যক্তিপুরুষকে উপলব্ধির পক্ষে এই চিঠিপত্র অনেকখানি সহায়ক। সেদিক থেকে বিবেকানন্দের পত্রাবলীর ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। ডক্টর শ্রীঅধীর দে 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ধারায় বিবেকানন্দের পত্রাবলীর সাহিত্যমূল্যের উল্লেখ করে বলেছেন, "বিবেকানন্দের কতগুলি পত্র তাঁহার ধর্ম-চিন্তার ঐশ্বর্য এবং বিশাল বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের অন্তরঙ্গ স্পর্শে প্রবন্ধ-সাহিত্যগত গুণে মহিমান্বিত হইয়াছে। তাঁহার বিলাত যাত্রীর পত্র পর্যায়ের অধিকাংশ পত্রই প্রবন্ধ ধর্মী।" বিবেকানন্দের পত্রাবলী এই বিশেষ প্রবন্ধ গুণের জন্য তা আর পত্র মাত্রে পর্য-বসিত হয়নি; শিক্ষা ধর্ম রাষ্ট্র সমাজ ও রাজ-নীতি বিষয়ক নানা মতামত প্রকাশে, ভারত-বর্ষ ও বিশ্বের নানা সমস্যার যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ও সমাধানের জন্য এই পত্রাবলী বিশেষ প্রবন্ধেরও মর্যাদা লাভ করেছে।

প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন স্বামী

বিবেকানন্দের অধিকাংশ সংগৃহীত পত্র ১২ই আগষ্ট ১৮৮৮ থেকে ১৪ই জুন ১৯০২ খৃীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর সূচনা অর্থাৎ দুই শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণ তাঁর পত্রাবলীর সময়কাল। এই নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে মানবজাতির রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মবিষয়ক যে সকল সমস্যার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল সমস্যার সংগে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এবং আপন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে এই পত্রগুলি লিখিত। মানবজাতি বলা হচ্ছে, কেননা শুধু ভারতবাসীই তাঁর লক্ষ্য ছিল না, রাষ্ট্র বলতে তিনি শুধু ভারতরাষ্ট্রকেই বোঝান নি; সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কেও বলা যায় বিশ্বসমাজ ও মানবধর্মই তাঁর সমাজ ও ধর্মচিন্তার মূল লক্ষ্য। যদিও সনাতন হিন্দুধর্ম ও তার মহান আদর্শ মানবজাতির কল্যাণের বলে তিনি রায় দিয়েছেন এবং তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে-চেষ্টা কখনো অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীকে হীন প্রতিপন্ন করেনি; বরং অন্য ধর্মের গোঁড়ামি, মানবধর্ম বিরোধী আচরণ, একদেশদর্শিতা, ধর্মনির্দেশ ও আচরণের অসংলগ্নতার তীব্র সমালোচনা হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। কোন কোন পত্রে তাঁর অন্তরমথিত বেদনা ও নিরাশা প্রাধান্য লাভ করেছে, কখনো আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল এই পৃথিবীকে তিনি স্বর্গ বানাতে চেয়েছেন। "যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর হয়, যেখানে পৌরহিত্য যুগের জ্ঞান, সামন্ত যুগের সংস্কৃতি, বণিক যুগের বন্টনের আদর্শ এবং শ্রমিক যুগের সাম্যের আদর্শ অব্যাহত থাকিবে, অথচ তাহাদের দোষগুলি থাকিবে না, তাহাই হইবে আদর্শ রাষ্ট্র।" এই আদর্শ রাষ্ট্র কল্পনায় বিবেকানন্দ আশাবাদী হয়েও ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশকে অস্বীকার করতে পারেন নি। দিব্য-দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছেন আগামী যুগের পরিবর্তিত রূপ, যেখানে অদূর ভবিষ্যতে মানুষের ক্ষমতাধিকারে এক নবযুগের সূচনা করবে। ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দের এই ভবিষ্যৎ বাণীর কথা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর বিদেশী শিষ্য সিষ্টার ক্রিষ্টিন তাঁর স্মৃতিকথায়। স্বামীজীর এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের যথার্থতা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। জগতে এখন বৈশ্যাধিকারের (বণিক) তৃতীয় যুগ চলিতেছে। চতুর্থ যুগে শূদ্রাধিকার (প্রলেটারিয়েট) প্রতিষ্ঠিত হইবে।" এই শূদ্র (শ্রমিক) যুগকে তিনি সমর্থন করে বলেছেন, "আমি নিজে একজন সমাজতন্ত্রবাদী (সোশ্যালিষ্ট),—এই ব্যবস্থা সর্বাংগসুন্দর বলিয়া নহে, কিন্তু পুরা রুটি না পাওয়া অপেক্ষা অর্ধেক রুটি ভাল।" এই পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক চিন্তাধারারও সুষ্ঠ পরিচয় লাভ করা যায়। তিনি স্বর্ণের ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য করার বিরোধী ছিলেন। পৃথিবীর সকল দেশের আন্তর্জাতিক মূল্যমান এই স্বর্ণদ্বারাই নির্ধারিত হয়ে আসছে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "স্বর্ণ অথবা রজত কোনটির ভিত্তিতে দেশের মুদ্রা প্রচলিত হলে কি কি অসুবিধা ঘটে তা আমি বিশেষ জানিনা—(আর বড় একটা কেহ জানেন বলে বোধ হয় না) কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে সকল মূল্য ধার্য্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে।......রূপার দরে সব দর ধার্য হলে গরীবরা এই অসমান জীবন সংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাবে।"

"আমি এমন এক ধর্ম্ম প্রচার করিতে চাই, যাহাতে মানুষ তৈরী হয়।" এই মানুষ গড়ার সাধনাই কর্মযোগী বিবেকানন্দের জীবনের সাধনা। মানুষের লক্ষণ বোঝাতে তিনি বলেছেন, "রমণী সুলভ কোমল হৃদয়, অথচ শক্তিমান ও বলীয়ান সর্বতোমুখী স্বাধীনতা-

প্রিয়, অথচ বিনীত আজ্ঞাবহ—ইহাই মানুষের লক্ষণ!" মঠের উদ্দেশ্য বলতে এই মানুষ তৈরীর কাজই তিনি বুঝিয়েছেন; ব্যক্তিগত ভাবে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের গড়ে তোলার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি বলেছেন, "মনুষ্যত্বলাভই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। এই অভিনব বার্তাই আমি জগতে প্রচার ,করিতেছি। যদি অন্যায়কর্ম করিতে হয়, তবে তাহাও মানুষের মত কর। যদি দুষ্টই হইতে হয়, তবে একটা বড় রকমের দুষ্ট হও।"

আলাসিংগা পেরুমলকে লিখিত এক-খানি পত্রে ভারতবর্ষের দরিদ্র সাধারণ মানুষ-দের দুরবস্থা ও সামাজিক নিষ্ঠুরতার কথা বর্ণনা করেছেন এবং দেশের এই সীমাহীন দুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন হৃদয়হীন সমাজকে।

দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার না হলে ধর্মপ্রচার করা বৃথা। তাঁর মতে "শিক্ষাকেই চাষীর লাংগলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে পোঁছিতে হইবে।" এবং কী উপায়ে শিক্ষাকে সাধারণের কাছে পোঁছে দেওয়া যায় সে সম্পর্কেও তিনি বলেছেন, "মনে করুন, কোন একটি গ্রামের অধিবাসিগণ সারাদিনের পরিশ্রমের পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া কোন একটি গাছের তলায় অথবা অন্য কোন স্থানে সমবেত হইয়া বিশ্রম্ভা-লাপে সময়াতিপাত করিতেছে। সেই সময় জন দুই শিক্ষিত সন্ন্যাসী তাহাদের মধ্যে গিয়া ছায়াচিত্র কিংবা ক্যামেরার সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে কিংবা বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে ছবি দেখাইয়া কিছু শিক্ষা দিল। এইরূপে গ্লোব, মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে মুখে কত জিনিসই না শেখান যাইতে পারে!" দেশের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তারে বিবেকানন্দ প্রদর্শিত পন্থাই বোধ-করি বাস্তব এবং অনায়াসসাধ্য। বিবেকা-নন্দের শিক্ষা চিন্তার প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এবং এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দেওয়া নয়। "আমার বিষয়টা সর্ব-সাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পোঁছায় না সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃ-ভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী।" জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষাই একমাত্র সহায়ক। এই মাতৃভাষার সাহায্যেই দেশের যেখানে শিক্ষার আলোক পোঁছয় নি, মনের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যেখানে পানীয় জলের প্রয়োজন সেখানে তারি ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও তিনি এ-বিষয় বিশ্ববিদ্যালয়কেই এগিয়ে আসতে বলেছেন এবং দেশব্যাপী শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে এক সাধারণ পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অনুরোধ করেছেন।

ধর্ম বিশেষ কোন মানবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের নয়। ধর্মের সর্বজনীনতা, ধর্মের অসাম্প্রায়িক মনোভাব সকল মানুষের কাছে ধর্মকে পোঁছে দেয়; আর সংকীর্ণতা বা সম্প্রদায়গত একনিষ্ঠতা ধর্মকে মানুষের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অতএব ধর্মকে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ হতে হবে। বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার এটিই মূল কথা। "আমরা এই জন্যে একটি অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে চাই। সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা, তাও পাব, আবার তাতে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মের উদারভাব থাকবে।" এই অসাম্প্রদায়িক সম্প্র-দায়ে বিশেষ কোন মতবাদ বা ধর্মচেতনার যেমন স্থান নেই তেমনি কোন মতাবলম্বীকেও বাদ দিলে চলবে না। বিবেকানন্দ সকল ধর্মাবলম্বীকেই আহ্বান করে বলেছেন, "আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে

চাই না। একমাত্র নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হউক বা ' সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ এই মতে বিশ্বাসবানই হউক, অদ্বৈতবাদী হউক বা বহুদেবে বিশ্বাসীই হউক, অজ্ঞেয়বাদীই হউক বা নাস্তিকই হউক, আমরা কাউকেও বাদ দিতে চাই না।" ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্যও তিনি সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বিচারের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। "যাতে উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ বা অধর্ম, আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে, তাই ধর্ম। তারপর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোনটাতে তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেছে নিয়ে সেই পথে যাক; এ বিষয়ে আমরা সকলকে স্বাধীনতা দিই।" এই পত্রে তিনি আরো বলেছেন, "একজনের হয় ত মাংস খেলে উন্নতি সহজে হতে পারে, আর একজনের ফলমূল খেয়ে থাকলে হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক।.... কতকগুলি লোকের হয় ত সহধর্ম্মিনী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয় ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বলবার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ভুল পথে যাচ্ছ, জোর করে তাকে নিজের মতে আনবার চেষ্টা ত দূরের কথা।" এই উদার ধর্মীয় চিন্তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রবর্তিত মানবধর্মের বিশেষত্ব। বিবেকানন্দ এই পত্রে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্ম স্বরূপ।....এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছেন।.. প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলে চিন্তা করা ও তার সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত ব্যবহার করা উচিত, আর তাকে কোন মতে বা কোনরূপে তার ঘৃণা, নিন্দা বা কোনরূপে তার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়।" এই জ্ঞান লাভ হলে এবং প্রত্যেক নরনারীর আচরণে যদি এই আদর্শরূপ পরিগ্রহ করে তবে মানুষে মানুষে কোন বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। ধর্মের ভিত্তি এই আদর্শ জীবন-চর্চাই হওয়া উচিত। তাছাড়া মানুষে মানুষে যে পার্থক্য তা বাইরের, আচরণেই বিভেদ সৃষ্টি হয়। "আমাদের বিশ্বাস,—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও একথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে।" অতএব আত্মার সঙ্গে আত্মার কোন ভেদাভেদ নেই, বিভেদ শুধু আচরণে। ধর্মের মহান আদর্শ সম্পর্কে অপর একখানি পত্রে তিনি আরো জোরালো ভাষায় বলেছেন, "যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম?" অর্থাৎ ধর্ম্মকে মহান হতে হবে, মানবাত্মার উচ্চাদর্শ প্রচার করতে হবে, তবেই না মানুষকে আদর্শ মানুষ অর্থাৎ দেবতা বা সুপার ম্যান-এ উন্নত করা সম্ভব! আদর্শ মানবধর্মই বলতে পারে "লেট আস বি গড এ্যান্ড দেন হেলপ আদারস টু বি গডস"। এবং আমাদের লক্ষ্য "আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই, যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই; অথচ ইহা বেদ, বাইবেল ও কোরাণের সমন্বয়ের দ্বারাই সাধিত হইতে পারে। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্ম সকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র।" এই সমন্বয় সাধনাই মানব-ধর্মের মূল কথা।

বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি বিবেকানন্দের পরিচয় এই সব চিঠিপত্রের মধ্যে নিহিত। এইখানে তিনি অভিজ্ঞ, সচেতন এবং অনেকাংশে বৈষয়িক। তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ। বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালের পূর্বেকার ইতিবৃত্ত যা ঐতিহাসিক তথ্য বলে মর্যাদা পেতে পারে তা এই পত্রাদির মধ্যে পাওয়া যায়। মিশন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার যেটি অন্যতম প্রধান

অঙ্গ সেই আর্থিক দিকের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এবং তিনি মাঝে মাঝে অর্থচিন্তায় বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়তেন। কখনো কখনো তিনি এ-বিষয়ে বিরক্তিও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁকে সব সময় অনলস ও অর্থ-সংগ্রহ কার্যে ব্যাপৃত দেখা গিয়েছে। মঠের জমিজমা সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি ব্যাপারে, জমি ক্রয়, গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে নানা পত্রে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন। দূর দেশ থেকে লেখা এই সকল পত্র মঠের শিষ্যবৃন্দের মনে উদ্দীপনা ও প্রেরণা সঞ্চার করেছে; লোকশিক্ষা, ধর্ম প্রচার, সেবাকার্য ইত্যাদিতে তাঁরা উৎসাহ পেয়েছেন। সবার আগে যাতে রামকৃষ্ণের গৃহ নির্মাণ কার্য অগ্রাধিকার পায় সেদিকেও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। টাকাকড়ি সংক্রান্ত তাঁর বিচক্ষণ ও হিসাবী বুদ্ধির পরিচয়ও নানা স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষ তাঁর সাবধান বাণী: 'টাকার জন্য আপনার বাপকেও বিশ্বাস নাই, ইত্যাদি উক্তি প্রণিধান যোগ্য।

পরিহাস প্রিয় রসিক বিবেকানন্দের পরিচয়ও চিঠিপত্রের নানা স্থানে ছড়ান আছে। বিষয় বিশেষে তাঁর পত্র শ্লেষ-বিদ্রূপ, পরিহাস ও রঙ্গ-রসিকতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। উদাহরণ স্বরূপ দার্জ্জিলিং থেকে লেখা একখানি পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সময় তিনি তাঁর জনপ্রিয়তায় এবং খ্যাতিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। শহরের পথে পথে শুধু তাঁকে দেখবার জন্য জনতার ভীড় হত। তিনি পরিহাস করে লিখেছেন, "নাম যশটা সব সময়ই বড় সুখের নয়। আমি এখন মস্ত দাড়ি রাখছি; আর এখন তা পেকে সাদা হতে আরম্ভ হয়েছে—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিসই না ঢেকে রাখতে পার, তোমার জয় জয়কার, হাঃ হাঃ!"

ভাষা সম্পর্কে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা স্বকীয়তা দাবী করতে পারে। সাহিত্যের ভাষা কী হওয়া উচিত, সাধু ও চলিত কোন রীতিতে সাহিত্য সৃষ্টি করা উচিত এ-বিষয়ে তিনি চিন্তা করেছেন। চলিত ভাষা আমাদের মুখের ভাষা এবং এই রীতিতেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও কৃত্রিম সাধুভাষায় মনের ভাব প্রকাশ না করে চলিত রীতিতে প্রকাশ করা উচিত। বিবেকানন্দের ভাষা সম্পর্কিত চিন্তাযুক্ত পত্রের অংশ বিশেষ 'বাঙ্গালা ভাষা' শিরোনামায় 'ভাববার কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই পত্রে তিনি লিখেছেন, "চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভুতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়?....স্বাভাবিক যে ভায়ায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হ'তে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোন তৈরী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না।" কথা উঠতে পারে, বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলায় রকমারি ভাষা প্রচলিত, কথ্য ভাষার মধ্যে কোনটি বেছে নিতে হবে? সে-বিষয়েও তাঁর সুচিন্তিত মতামত নিরপেক্ষতা

দাবী করতে পারে : "প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।"

বিবেকানন্দের আত্মোপালব্ধি, যা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি বলেও মনে করা যেতে পারে, শেষ বয়সে লিখিত কয়েকখানি পত্রে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসন্ন মৃত্যুর ছবি তিনি দেখতে পাচ্ছেন। বিশেষ মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যতোক্তি উল্লেখযোগ্য। 'দিন ফুরিয়ে এসেছে" এই উপলব্ধি তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে। এই বস্তু জগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা পালটে যাচ্ছে। কর্ম করে করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। নেতৃত্ব দেবার তাগিদ যেন আর বোধ করেন না। তাঁর কাজ তিনিই করাবেন। এ-জাতীয় উপলব্ধি স্থূলকর্ম থেকে সূক্ষ্ম অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কর্ম সাধনায় তাঁর চিন্তাকে টেনে নিতে চাইছে। কখনো নিজেকে নিজে প্রশ্ন করছেন 'আমি কে, যে কারো কাজে হাত দেব?' 'কে কাজ করে, আর কার কাজ?' কিংবা 'কর্ম আবার কি? কার কর্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম?' এ-প্রশ্নও তাঁর নিজেকেই। আত্মজিজ্ঞাসায় ম্রিয়মান। অন্তরে দ্বিধা। মনে সংশয়। এই গুরু দায়িত্ব, রামকৃষ্ণের প্রচার, আশ্রম পরিচালনা ভার কার উপর ন্যস্ত করে যাবেন? তাই তাঁর চিঠিপত্রে দেখা যায় কার উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হবে, পর্যায়ক্রমে কে কোন কাজের ভার নেবে, মঠের ক[illegible] নির্বাচন পদ্ধতিতে কিভাবে ভবিষ্যতে পরিচালনা করা হবে সে-বিষয় নির্দেশ দিচ্ছেন। এমন কি চিঠিপত্র, মঠের নিয়মাবলী, নিমন্ত্রণ পত্র ইত্যাদির খসড়াও তিনি করে দিচ্ছেন। আবার মাঝে মাঝে ভেঙেও পড়ছেন, মানসিক অবসাদ বোধ করছেন। কখনো অতীত কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হচ্ছে। অতীতের সঙ্গে বর্তমান পুরোপুরি মিলে যাচ্ছেনা। নতুন উপলব্ধি তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে; যেন তাঁর অন্তর্নিহিত আর এক সত্তা বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। বৈরাগ্য আচ্ছন্ন করছে চেতনা, নিস্পৃহতা সঞ্চার করছে মনে। সমগ্র বিশ্ব সংসারকে তিনি আর বস্তুগতভাবে দেখছেন না, যেন তাঁর ধ্যান-দৃষ্টি বস্তুর পরিবেষ্টনে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। বস্তু অতিক্রান্ত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যেন তাঁর তৃতীয় নেত্র খুলে দিচ্ছে। "আত্মাই এক এবং অখণ্ড সত্তাস্বরূপ আর সব অসৎ —এই জ্ঞান হয়ে গেলে আর কি কোন ব্যক্তি বা বাসনা মানসিক উদ্বেগের হেতু হতে পারে? মায়ার প্রভাবেই পরোপকার করা ইত্যাদি খেয়ালগুলো আমার মাথায় ঢুকেছিল, এখন আবার সরে যাচ্ছে। চিত্তশুদ্ধ অর্থাৎ চিত্তকে জ্ঞানলাভের উপযোগী করা ছাড়া কর্মের যে আর কোনও সার্থকতা নাই—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ক্রমশঃ দৃঢ় হচ্ছে।" 'জো' (মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড) কাছে লিখিত একখানি পত্রে বিবেকানন্দের এই বিশেষ উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের আত্মোপলব্ধি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে, ব্যাখ্যা করছে, কখনো আত্মসমালোচনার আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। "কর্ম করা সব সময়েই কঠিন। আমার জন্য প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা ঘুচে যায়।" "বালক ভাবটাই হচ্ছে আমার আসল প্রকৃতি—আর কাজকর্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর বাণী শুনতে পাচ্ছি—....বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে!—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে!" অন্য একখানি পত্রে বিবেকানন্দের এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। "এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে; এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য

কোন দর্শন, এমন কি, কাজটার উপরে পর্যন্ত কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি—আর এই জগতে, এই নরকে, ফিরে আসছি না। এমন কি, এই কাজের আধ্যাত্মিক উপকারের দিকটার উপরও আমার অরুচি হয়ে আসছে। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে আসতে না হয়।" এই বস্তুজগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বন্ধমূল হচ্ছে, এবং এই জড় জগৎ থেকে পালিয়ে আর এক জগতে তিনি আত্মগোপন করতে চাইছেন। সে জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ। সে জগৎ ধ্যানের জগৎ। সেখানে এই জড় জগতের অস্তিত্ব নেই। "জগৎ বলে কিছু নেই—এত সব স্বয়ং ভগবান। ভ্রমে আমরা একে জগৎ বলি। এখানে আমি নাই, তুই নাই, আপনি নাই—আছেন শুধু তিনি, আছেন প্রভু—"একমেব অদ্বিতীয়ম।" শুধু এই উপলব্ধিই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবনের কৃতকর্মের একটা কৈফিয়ত দিতে চাইছেন। জগতের কাছে যা কিছু তার পাওনা, পেয়েছেন, জগতকে যা দেবার তাও তিনি দিয়েছেন। চির জীবনের মত দেনা-পাওনা চুকে গিয়েছে। এবার চির বিদায়ের পালা। তিনি মুক্তি চাইছেন। এই জীবন থেকে, এই জগৎ সংসার থেকে। 'নির্বাণের শান্তি-সমুদ্রে' ডুব দিতে চলেছেন। মোটকথা, প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি পরাজিত—মানসিক দিক থেকে এমন একটা ধারণা প্রকট হয়ে উঠেছিল। এর জন্য অনেকখানি দায়ী তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। স্নায়ু দুর্বলতা তাঁর শরীরকে ভেঙে দিয়েছিল। তিনি বেশ বুঝতে পাচ্ছিলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই এই জীবনের হিসাব-নিকাশ। "আমি যে জন্মেছিলুম, তাতে আমি খুশী আছি; এত যে দুঃখ ভুগেছি, তাতেও খুশী; জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করেছি, তাতেও খুশী; আবার এখন যে নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্ছি, তাতেও খুশী।....দেহটা গিয়েই আমায় মুক্তি দিক, অথবা দেহ থাকতে থাকতেই মুক্ত হই, সেই পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্য গেছে—আর ফিরছে না! শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে কেবল পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চির-শিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!" সেই প্রভু, যাঁর আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন, কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সারা পৃথিবী তোল-পাড় করে বেরিয়েছেন; সেই 'বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়' আবির্ভূত মহাপুরুষের বাণীর ধারক ও বাহক হয়ে বিশ্বজগতকে তিনি যে অমৃত মন্ত্রে সঞ্জীবীত করে চলেছেন, সেই প্রভুর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রভুই যেন তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন, "ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে (সংসারের ভাল-মন্দের সংস্কার সংসারীরা দেখুকগে), তুই (ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে) আমার পিছে পিছে চলে আয়!'—যাই, প্রভু, যাই। প্রভুর ফিরে যাবার আহ্বানেও তিনি সাড়া দিচ্ছেন। এই যাওয়াটা কিন্তু সাধারণ যাওয়া নয়। বস্তু থেকে নির্বস্তুতে, কর্ম থেকে আধ্যাত্মিক চেতনায় উত্তরণ। কর্মী পুরুষের দার্শনিক উপলব্ধি। একে শুধু দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে বিচার করলে চলবে না। কবি চেতনা তথা সাহিত্যিক চেতনার দিক থেকেও বিচার্য।

বিবেকানন্দের পত্রাবলী দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, নবতর ধর্মীয় ব্যাখ্যা ও সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত গভীর চিন্তাধারাই শুধু প্রকাশ করে না, বিবেকানন্দের সৌন্দর্য ও রস পিপাসু কবি মনেরও পরিচয় বহন করে। কবি বিবেকানন্দের সাহিত্যিক প্রকাশ এই সব পত্রাংশে ছড়িয়ে আছে। আলোচ্য পত্রাংশে তাঁর সাহিত্যিক তথা কবি মানসের উপলব্ধি সুপরিস্ফুট। তিনি এই পত্রে অপার্থিব

চিরশান্তির জগতে তাঁর দার্শনিক যাত্রাকে সাহিত্যিক প্রকাশের গৌরবে অক্ষয় করে রাখতে চাইছেন। কল্পনা শক্তির কাব্যময় স্পর্শে তাঁর বর্ণনা গভীর ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠেছে। "তাঁর ইচ্ছাস্রোতে····আবার···· গা ভাসান দিয়েছি। উপরে দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার করছেন, পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদশালিনী হয়ে শোভা পাচ্ছেন, দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই কত নিস্তব্ধ, কত স্থির, শান্ত!—আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থির ভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছা রূপ প্রবাহিনীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলেছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গতে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্ছে না— পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙে যায়! প্রাণের এই শান্তি ও নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! ইতঃপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর মান-যশের ভাবও উঠত; আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তি বিচার আসত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসত। এখন সে সব উড়ে যাচ্ছে; আর, আমি সকল বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলেছি। যাই! মা যাই!—তোমার স্নেহময় বক্ষে ধারণ করে যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই অশব্দ, অস্পর্শ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে— অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবল-মাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নেই!"

ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে বিবেকানন্দের পত্রাবলী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিচিত্র বিষয় আশ্রিত ও বিশিষ্ট তর্কমূলক বিষয় সমৃদ্ধির জন্য তাঁর লিখিত পত্রাদি প্রবন্ধধর্মী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরল রচনারীতি ও চলতি ভাষার প্রাধান্যের জন্য আরো বেশি হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর ইংরেজি ভাষায় লিখিত পত্রাদির সাহিত্যগুণ অস্বীকার করা যায় না, সেখানেও তাঁর ভাষা ও রচনারীতি ইংরেজি সাহিত্যের বিশিষ্ট পত্র-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। সংস্কৃত ভাষায়ও তিনি কয়েকখানি পত্র রচনা করেছিলেন, কিন্তু তার সংখ্যা তিন চারখানার অধিক নয়। বাংলা পত্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের পত্রাবলী বিশিষ্ট পত্র-সাহিত্যের সমগোত্রীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর লিখিত পত্র তথ্য-সমৃদ্ধির কথা বাদ দিলেও শুধুমাত্র সাহিত্য সমৃদ্ধির জন্যও বিশিষ্টতা দাবী করতে পারে। এই বিশিষ্টতার মধ্যে বিবেকানন্দের পত্র রচনার ভাষা ও রচনারীতি অন্যতম। কেননা, অধিকাংশ পত্র রচনার ক্ষেত্রে বিষয়ের গভীরতার উপর রচনার সাবলীলতা নির্ভর করে। তত্ত্ব-গর্ভ ও গভীর চিন্তামূলক বিষয় আশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দের পত্র কোথাও দুরূহ বা অনধিগম্য হয়ে ওঠেনি বরং বক্তব্য বিষয়কে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে তাকে রচনা-কারের সঙ্গে একই সঙ্গে ভাবিত করে তোলে এবং আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব পাঠকের কাছে সহস্রগুণ বর্ধিত হয়। সার্থক পত্র রচনার জন্য বিবেকানন্দের পত্রাবলী পত্র-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মর্যাদা পেতে পারে।

বিদেশীদের চোখে দেশী ভাষা

চন্ডী লাহিড়ী

প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের প্রথম যোগসূত্র স্থাপন করে পর্তুগীজরা। শুধু ভারত নয়, প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরগুলিতে ১৫৪০ এর মধ্যে পর্তুগীজরা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে অল্পদিনের মধ্যে কেবল তারাই যে বহু ভারতীয় শব্দ গ্রহণ করেছিল তা নয়, ঘনিষ্ঠ সংসর্গের ফলে আমরাও বহু পর্তুগীজ শব্দ গ্রহণ করেছিলাম। কালক্রমে দেখা গেল, পর্তুগীজ প্রমুখাৎ অন্যান্য ইওরোপীয় দেশগুলিতেও বহু ভারতীয় শব্দ চালু হয়ে গেছে। ভারতের উপকূলবর্ত্তী বন্দরগুলিতে পর্তুগীজ ভাষা এমন পরিচিত লাভ করেছিল যে, ইংরেজ ডাচদের প্রথম দিকে পর্তুগীজ ভাষা শিখে নিয়ে ভারতের বন্দরে বাণিজ্যিক লেন দেন করতে হত। পর্তুগীজ মিশনারীরা বাংলাভাষা সযত্নে মাতৃভাষার মত আয়ত্ব করেছিলেন, বাংলা ভাষার প্রথম তিনখানি গ্রন্থ রোমান অক্ষরে প্রকাশিত হয় লিসবনে। এই ইন্দো-পর্তুগীজ বাক্ প্রণালী আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত এদেশে বেশ সক্রিয় ছিল। আজও বহু পর্তুগীজ শব্দ আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় শব্দভাণ্ডারে অপরিহার্য রূপে সংরক্ষিত।

এর আর এক কারণ, পর্তুগীজদের সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ। ইওরোপের দেশগুলির মধ্যে পর্তুগীজরা ব্যবসায়ী হিসাবে যত সুনাম অর্জন করেছে তার অনেক বেশী দুর্নাম অর্জন করেছে জলদস্যু বা বোম্বেটে রূপে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তারা নারী অপহরণ করত বে-পরোয়াভাবে। এদেশীয় রমণীদের তারা বিয়ে করেছে নির্দ্বিধায়। ইঙ্গপর্তুগীজ বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তানদের নাম কোথাও ফিরিঙ্গি, কোথাও মেষ্টিক। এছাড়াও বহু পর্তুগীজ পরিবার ভারতে পুরুষানুক্রমে বসবাস করতে করতে সকলের অজ্ঞাতে ভারতীয় রীতিনীতি গ্রহণ করে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছে।

বার্ণিয়ে ভারত সফর কালে (১৬৬০) লিখেছিলেন

"তিনি (সুলতান সুজা) পর্তুগীজ ধর্মযাজকদের খুব খাতির করেন। তারাও সুলতানকে খুসী রাখে। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে বঙ্গদেশে আট/নয় হাজার ফরাসী অথবা পর্তুগীজ পরিবার আছে। তারা সবাই হয় দেশী অধিবাসী অথবা মেষ্টিক (বর্ণ সংকর)"

এই সপ্তদশ শতকেই ভারতে এসেছিলেন হ্যামিলল্টন। তিনিও লিখেছেন

"সমুদ্র উপকূলবরাবর পর্তুগীজরা তাদের ভাষা চালু করেছে। এই ভাষা কিছু বিকৃত। কিন্তু এই ভাষাই প্রত্যেক ইওরোপীয় ভারতে ব্যবহারিক কথোপকথনের জন্য এবং সাধারণভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতবাসীর সহিত লেনদেনের সুবিধার্থ ব্যবহার করে থাকে।"

লকইয়ার বলেছেন এই কথাই—

"তারা (পর্তুগীজরা) ভারতের বন্দরগুলিতে একরকম ভাষা-মাধ্যম সৃষ্টি করেছে, যেভাষা অন্যান্য ইওরোপীয়দের প্রভূত সাহায্য করে। এভাষা বাদ দিলে অনেক স্থানে ইওরোপীয়রা নিজেদের কথা বোঝাতে পারেনা"

ফলদাঁড়িয়েছে এই যে, পরবর্তীকালের ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দভাণ্ডারের বহু ভারতীয়

শব্দকে আমরা ইংরেজী শব্দ মনে করে গ্রহণ করেছি। ইংরেজরা সেই শব্দ পেয়েছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে। এই শব্দাবলীর অনেকেই আজ অচল, কিছু অঞ্চল বিশেষে প্রচলিত, কিছু পরিচিত হলেও নিষ্ক্রিয়। যে সব পর্তুগীজ শব্দ ভারতস্থিত ইংরেজরা বেমালুম আত্মসাৎ করেছে তার মধ্যে গ্রাম, প্লানটেন, মাষ্টার, কাষ্ট পিওন, পাদ্রী, মিস্ত্রী, আলমিরা, আয়া, কোব্রা, মসকুইটো, পামফ্রেট, কামিজ, পামিরা ইত্যাদি আজও বেপরোয়া ব্যবহৃত হচ্ছে।

জাগেরনাথ (জগন্নাথ) পণ্ডিত, শাল, টিপয়, চুরুট, লুট, বারান্দা, সেপাই, কড়ি, ম্যাঙ্গো, মঙ্গুস, বারী, পারিয়া প্রভৃতি ভারতীয় শব্দকে জাতইংরেজ লেখকরাও মাতৃভাষার জ্ঞানে গ্রহণ করেছে এবং আজও ব্যবহৃত হচ্ছে। আর কিছু শব্দ আছে যেগুলি ভারতের বা ভারত-ফেরৎ ইংরেজরা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলেও ইংলণ্ডের ইংরেজরা যেন একটু সসংকোচে ব্যবহার করেন। যেমন—কম্পাউণ্ড, বাটা পাক্কা, বাবু, মাহুত, আয়া, নাচ ইত্যাদি। এছাড়া আরও কিছু ভারতীয় শব্দ আছে যেগুলি বিশেষ্য (প্রপার নাউন), ইংরেজীতে গ্রহণের সময় সেগুলির সামান্য রদ-বদল হয়েছে। যেমন—ব্যাম্বু, প্যাগোডা, মনসুন, টাইফুন, প্যালাঙ্কিন, ট্যামারিণ্ড, ইত্যাদি।

আরবদের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক সুপ্রাচীন। স্বভাবতই, ভারত যেমন আরবদের নিকট থেকে বহু শব্দ আহরণ করেছে, আরবরাও বহু ভারতীয় শব্দ সানন্দে গ্রহণ করে পশ্চিমের দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ-ভাণ্ডার গড়ে ওঠার বহু পূর্বেই ইওরোপে এই সব আবী-ভারতীয় শব্দ পৌঁছে গিয়েছিল এবং ভূমধ্য-সাগরীয় দেশগুলিতে ব্যবহারিক শব্দরূপে চালু হয়েছিল। যেমন বাজার, কাজী, হামাল (মুটে) ব্রিনজাল (বেগুন) মেরামত, দেওয়ান

এমন বহু শব্দ আছে যেগুলি মূলতঃ ভারতীয় শব্দ, পরে পর্তুগীজরা গ্রহণ করে এবং তাদের মারফৎ গ্রহণ করে ইংরেজরা। সর্বশেষে ইংরেজদের কাছ থেকে আমরা সেই সব ভারতীয় শব্দকে ইংরেজী শব্দ মনে করে গ্রহণ করেছি। কিভাবে বিভিন্ন ভারতীয় বা বিদেশী শব্দঅবগুণ্ঠিত হতে হতে নবকলেবরে ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ-ভাণ্ডারে স্থানলাভ করেছে তা নিয়ে উনিশ শতকেই মূল্যবান গবেষণা করেছেন ভাষাতাত্ত্বিকেরা। তাঁদের গবেষণার নমুনা কিছু উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা হয়ত।

প্যাগোডা—মূল সংস্কৃত শব্দ ভগবতী, দ্রাবিড়দের কণ্ঠে পাগোডী। কুর্গেও পাগোডী। ভগবতী > পগবতী > পগোডী > প্যাগোডা

প্যালঙ্কিন—মূল সংস্কৃত শব্দ পালঙ্ক, তদ্ভব পাল্কী। মালয়ালমে পেলাঙ্কি। মালয়-জাভায় পেলাঙ্কি। পর্তুগীজরা বলত প্যালাঙ্কিন।

ব্যাঙ্কশাল— সংস্কৃত ভাণ্ডারশালা, কানাড়ী, ভণ্ডোসাল, পর্তুগীজ ব্যাংগাকলে ইংরেজী ব্যাঙ্কশাল।

ব্যাণ্ডেল মূল ফার্সী শব্দ বন্দর। তার থেকে পর্তুগীজ শব্দ ব্যাণ্ডেল।

ম্যাণ্ডারীজ—সংস্কৃত মন্ত্রিণ। মালয়-জাভাতেও মন্ত্রী। রাজপুরুষ অর্থে ম্যাণ্ডারিণ শব্দ ব্যবহৃত হত।

ম্যাঙ্গো—মূল তামিল শব্দ মান-কে বা মান-গে, পর্তুগীজরা বলত ম্যাঙ্গা, ইংরেজী ম্যাঙ্গো।

মঙ্গুস—(বেজী)—তেলেগু মাঙ্গুইস।

বিদেশীদের মধ্যে বাংলা তথা ভারতে (পর্তুগীজ উপনিবেশগুলি ছাড়া) ইংরেজদের প্রভাব সর্বাধিক। প্রথম দিকে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক শেষ দিকে ঘনিষ্ঠতর সাংস্কৃতিক আত্মীয়তায় পর্যবসিত হয়েছে। পার্থক্য এই, পর্তুগীজরা উনিশ শতকের আগেই (গোয়া ব্যতীত) নিঃশেষে মিশে

গিয়ে ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। খাস কলকাতায় এখনো কিছু গঞ্জালেস, ডিসুজা, পেড্রুম, ডিক্রুম, গোমেশ, রোজারিওদের দর্শন মেলে। নাম ও ধর্ম ছাড়া অবশ্য পর্তুগীজদের সঙ্গে এদের দূরতম সম্পর্কও নেই। পর্তুগীজভাষা প্রায় কেউই বোঝেনা। পুরুষানুক্রমে বসবাসের ফলে কলকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যেও ভাষার পরিবর্তন ঘটেছিল বিপুল। স্মরণীয় যে, আত্মস্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখার আগ্রহে এই ইংরেজ-নন্দনেরা দেশী উচ্চকোটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনে তেমন উৎসাহ প্রথম দিকে দেখান নি। বাড়ীর আয়া বেহারা, খিদমতগার, খানসামা জাতীয় ভৃত্যকুলের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল অধিক। এই অনভিজাত নফরকুলের ভাষাকেই ষ্ট্যান্ডর্ড ভারতীয় ভাষা মনে করে অনেকে শিখেছিলেন। এই গৃহভৃত্যদের শতকরা পাঁচজনও বাংলাদেশের অকৃত্রিম অধিবাসী নয়। রক্তের আভিজাত্যে তারা কেউ খানদানী নয়। উর্দু, ফার্সী, হিন্দী, ও বিভিন্ন দক্ষিণী ভাষার এক বিচিত্র সাড়ে বত্রিশভাজাকে তারা মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করত এবং এই ভাষা আয়ত্ব করে সাহেব মেমের দল কাজ চালাতেন। (আজও এই বিচিত্র ভাষাই সাহেব পাড়ায় দেশী ভাষারূপে অক্ষুন্ন বেগে প্রচলিত) ফলে বহু অশ্লীল, অরুচিকর, ইতর শব্দও ইংরেজরা পবিত্র শব্দজ্ঞানে গ্রহণ করেছিল।

প্রত্যেক কসমোপলিটান সহরে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু বর্ণের আনাগোনার ফলে এক মিশ্রভাষার সৃষ্টি হয়। কলকাতায় ইংরেজদের প্রাধান্য থাকলেও ব্যবসায়িক বা অন্যান্য প্রয়োজনে অন্যান্য দেশের অধিবাসীরাও অল্পাধিক এসেছে। ডাচ, পর্তুগীজ ও ফরাসীদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটীও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল। ফলে এক সঙ্করভাষা এখানে অপরিহার্যরূপে গড়ে উঠেছিল। এই ভাষার নাম এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইংরেজী। কোম্পানীর নবাগত কর্মচারীদের সুবিধার জন্য ডাঃ গিলক্রাইষ্ট যে "ষ্ট্রেঞ্জার্স ইষ্ট ইন্ডিয়া গাইড" লেখেন তাতে বহু ইতর শব্দ ভদ্র শব্দরূপে স্থান পেয়েছে। হাডলি বা ফার্গুসনও তাঁদের অভিধানে বহু অশোভন শব্দ ব্যবহারিক শব্দরূপে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

কলকাতার এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ইংরেজীর এই জগা-খিচুরীয়ানা দূর করার জন্য সমালোচনা ও চেষ্টা কম হয়নি। একটি খাঁটী হিন্দুস্তানী অভিধান প্রস্তুত করার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে "ক্যালকাটা জার্নালে" জনৈক ইংরেজ (যিনি বহুকাল চাঁদনীচকে বসবাস করে খাঁটী হিন্দুস্তানী আয়ত্ব করেছেন) এক দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন।

"Will any man deny that the language, or rather lingo, now current in Calcutta, among the Sircars Sabiogs is anything but mere cant and gibberish, composed of Arabic, Persian, English, Italian, Spanish as well as all the dialects of Dukhin, corrupted, curtailed and amalgamated with the pure Hinduee, in such a manner as to bid defiance to all grace and grammer. This is a serious (1819) truth".

এই ভাষা-সঙ্করকে পত্রলেখক "জিপসী-জার্গন" নামে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এই বিকৃতির জন্য কারও প্রতি দোষারোপ করেননি। স্বীকার করেছেন, উভয়পক্ষের অনুধাবনের সুবিধার্থেই এমন ভাষার উদ্ভব হয়ে থাকে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

"কলকাতায় যে হিন্দুস্তানী প্রচলিত তার অর্দ্ধাংশ, কখনও বা দুই তৃতীয়াংশ ইংরেজী। সেও বিশুদ্ধ ইংরেজী নয়, ইংরেজীর অপভ্রংশ। বিকৃতি। হয়ত এই অপভ্রংশের ব্যাপারে আমরাই (ইংরেজরা) স্বকৃতভঙ্গ। নেটিভরা যাতে সহজে বুঝতে পারে

তজ্জন্য আমরা, অথবা আমরা যাতে বুঝতে পারি তজ্জন্য নেটিভরা শব্দের রূপান্তর ঘটায়। উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যাক। যদি কোন ক্যালকাটা নেটিভকে ব্রিচেস, বিফ-ষ্টিক, বক্স, ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে হয়, তবে সে শব্দগুলি উচ্চারণ করবে বিরগিস, বিফিষ্টিক, বাকাস। আমরাও কম যাইনি। আমরা নিজেদের সুবিধার জন্য পরিচিত ইংরেজী শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বয়কে বলি বোয়, বেনিয়াকে বলি বানিয়ান, ডালিকে বলি ডলী। অবশ্য এই উচ্চারণঘটিত ত্রুটীর জন্য দোষ দিইনি। কারণ হিন্দুরা ব্রিচেস পরেনা, বিফষ্টিক খায়না। অতএব অনুরূপ শব্দ তাদের নেই। আমরাও নেটিভ শব্দের যে বিকৃতি ঘটিয়েছি তাও অনুরূপ কারণে। বকসিস্ বলতে গিয়ে বলি বক্সেস, হাগনাহাগ বোঝাতে বলি হকনক, খলিফা বলতে বলি কালি-পাও—অর্থাৎ পরিচিত কোন ইংরেজী শব্দের অনুরূপ উচ্চারণ করি।"

কলকাতার সাহেব সমাজে কি রকম ডায়ালগ চালু ছিল তারও কিছু নমুনা পত্র-লেখক উদ্ধৃত করেছেন এবং পরবর্তীকালেও সেই বিচিত্র ইংরেজী-হিন্দী-উর্দুর শব্দ-সম্ভারে জারিত ভাষা চালু আছে। উদা-হরণ—

(1) Pray be silent.
(2) Khidmutgar, bring the boxes of wafer from the desk.
(3) You gardiner, bring me some vegetable.
(4) Order a bottle of champagne.
(5) My friend, I fear you exaggerate.
(6) The mango fish is not fresh, do you hear?

(1) Chup, you soor.
(2) Kis-my-gar, bakas ke weper dekus se low.
(3) You Molly, dolly low.
(4) Hookum kuro, ek bowttul Simpkeen.
(5) Joot, you d—d soor.
(6) Mungo pish fo kurta, you soono.

বিদেশীদের ভারতীয় ভাষা অনুশীল-নের ইতিহাসে শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস ও ফোর্ট উইলিয়মের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লিসবনে প্রকাশিত, রোমান হরফে মুদ্রিত তিনখানি বাংলা গ্রন্থ বাদ দিলে, বংগাক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ 'এ গ্রামার অব দি বেংগল ল্যাংগুয়েজ।' ১৭৭৮ সালে হুগলির মিঃ এনড্রুজের প্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থকার ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হাল-হেড। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য টাইটেল পেজে সংস্কৃত ভাষায় দেওয়া আছে।

বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপ-
কারার্থং ক্রিয়তে হালেদ গ্রেজী

তিনি সবিনয়ে আরও বলেছেন—

ইন্দ্রদয়োপি যস্যান্তং নয়যুঃ শব্দ
বারিধেঃ।
প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নবঃ
কথম্॥

হ্যালহেডের সঙ্গে একযোগে স্মরণীয় চার্লস উইলকিনসের নাম। সরকারী গ্রন্থ-শালার অধ্যক্ষ ভারততত্ত্ববিদ উইলকিনস পঞ্চানন কর্মকারের সাহায্যে কাঠ-খোদাই বাংলা অক্ষর প্রস্তুত করেন। তারই সাহায্যে মুদ্রিত হয় হ্যালহেডের ব্যাকরণ। যে অসা-ধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা সহযোগে উইল-কিনস বাংলা টাইপ প্রস্তুত করেছিলেন তজ্জন্য বংগবাসীমাত্রই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। ভবিষ্যৎ বংগভাষার দুকূলপ্রসারী বিস্তার, তার ক্রমবর্দ্ধমান রূপৈশ্বর্য, বিশ্বের দরবারে একটি স্থায়ী গৌরবের আসন অর্জনের ভগীরথ এই উইলকিনস। উইলকিনসের প্রস্তুত বাংলা টাইপের সাহায্যে পরে

কোম্পানীর প্রেস থেকে কয়েকটি আইনের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। জোনাথান ডানকান ১৭৭৫তে অনুবাদ করেন ইম্পে কোড, ফরষ্টার অনুবাদ করেন কর্ণওয়ালিস কোড। এছাড়া আরও দুটি আইনের অনুবাদ ১৭৯১ ও ১৭৯২ সালে মুদ্রিত হয়। ব্রিটিশ মিউ-জিয়ামে এদুটি রক্ষিত আছে।

হ্যালহেডের ব্যাকরণের পর উল্লেখযোগ্য আপজনের "এ্যান এক্সটেনসিভ ভোকা-বুলরী, বেঙ্গলী এন্ড ইংলিস" (১৭৯৩)।

এবং তারপর ফরষ্টারের "এ ভোকা-বুলরী ইন টু পার্টস, ইংলিশ এন্ড বেঙ্গলী, এন্ড ভাইসভার্সা" এই অভিধানের প্রথম খন্ড মুদ্রিত হয় ১৭৯৯ ও দ্বিতীয় খন্ড ১৮০২ সালে। কলকাতার ক্রনিকল প্রেসে দুটিই ছাপা হয়। ফরষ্টারের ভোকাবুলরী যে বৎসর প্রকাশিত হয় ঐ বৎসরই শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ উইলিয়ম কেরী অবশ্য মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই মদনাবাটীতে (উত্তরবঙ্গ) একটি প্রেস বসিয়েছিলেন। এখন সহকর্মী জোসুয়া মার্সম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের সাহায্যে সেই প্রেসটি মদনাবাটী থেকে শ্রীরামপুরে নিয়ে আসেন। শ্রীরাম-পুরের ডেনিশ গভর্নর কর্ণেল বাই মিশনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮০১-১৮৩২ সালের মধ্যে চল্লিশটি ভাষায় মোট বারো হাজার দুশো খন্ড মুদ্রিত হয়। এই চল্লিশটি ভাষার প্রত্যেকটির টাইপ তাঁদের নিজেদের তৈরী করে নিতে হয়েছে। প্রথম দিকে খৃষ্টধর্ম প্রচার যদিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল এবং "নিউ-টেষ্টামেন্টর" বঙ্গানুবাদ দিয়েই যদিও এই মুদ্রণ পর্বের সূত্রপাত হয়েছিল, পরে মৌলিক গ্রন্থও তাঁরা রচনা করেছেন ও বাংলা ভাষায় ছাপিয়েছেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশী-রামের মহাভারত বা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল প্রথমী মুদ্রিত হয়েছে বিদেশী মিশনারীদের পরিচালিত শ্রীরামপুর মিশন থেকেই।

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্র-চর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তামিল গীতাঞ্জলি

আঞ্চলিক ভাষার একজন প্রধান কবি গীতাঞ্জলির পদ্যানুবাদে আত্মনিয়োগ করেছেন, একথা মলয়ালম ভাষার পক্ষে যতটা সত্য এমন আর অন্য কোনো ভাষা সম্পর্কে নয়। গীতাঞ্জলির পদ্যানুবাদ কাজটা খুবই দুরূহ সন্দেহ নেই এবং একান্ত নিষ্ঠা সত্ত্বেও এক্ষেত্রে সংশয়াতীত সাফল্য না-ও হতে পারে। একজন স্বভাব কবির পক্ষে এই কাজে ব্রতী হওয়ার বাধা অনেক। মালয়ালী কবি জি শঙ্কর কুরুপের প্রচেষ্টা এই কারণেই অভিনন্দনীয়।

তামিলনাডের কোনো কবি এ পথে কেন অগ্রসর হননি ভেবে পাইনে। শুনেছি, বিশিষ্ট কবি দেশিক বিনায়কম পিল্লে নাকি এক সময়ে এ কাজে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু সে বই দেখার সুযোগ হয়নি, এমন কি বিনায়কম-এর অনুবাদ কবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে জানা নেই, আদৌ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। ললিত কলা অকাদেমীর রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে এর উল্লেখমাত্র নেই।

ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে কাব্যরচনার উপযোগিতা সবচেয়ে বেশি বোধ করি বাংলা, উর্দু ও তামিলের। উর্দুর ক্ষেত্রে খুবই সীমিত। বাংলার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথে, আর তামিলের পরম গৌরব তার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য। রবীন্দ্র-কাব্যের ভক্তিমূলক চিন্তাধারার সঙ্গে সর্বাধিক সংগতি লক্ষ্য করা যায় তামিল বৈষ্ণব কবি আড়বার বা আলোয়ার সম্প্রদায়ের রচনায় অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন যুগ ও পরিবেশে যতটা সংগতি সম্ভব। তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত একখানি "তামিল গীতাঞ্জলি" প্রকাশিত হল না ভাবতে অবাক লাগে। আধুনিক তামিলনাডে এমন একটি অগ্নিময়ী কবি-প্রতিভার আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল যা দীর্ঘস্থায়ী হলে এদিক থেকে ফলপ্রসূ হতে পারতো বলে আমাদের মনে হয়। তিনি সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১)। সাংসারিক দুর্গতি, রাজনৈতিক উৎপীড়ন প্রভৃতি নানা বিপর্যয়ের মধ্যে থেকেও যিনি বর্তমান তামিলনাডের কন্ঠে নতুন যুগের ভাষা দিয়ে যেতে পেরেছেন, জাতিধর্মনির্বিশেষে মহতের বন্দনা-গানে যিনি ছিলেন চির-তৎপর, যিনি তাঁর মাতৃভাষায় অনুবাদ করে গেছেন বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম" ও রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্প, সেই কবির কাছে গীতাঞ্জলির পদ্যানুবাদ কিছুমাত্র অপ্রত্যাশিত ছিল না। এবং এক্ষেত্রে তিনিই ছিলেন যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু অকালমৃত্যু ভারতীর সারস্বত সাধনাকে প্রতিভার অনুরূপ পূর্ণতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। "তামিল গীতাঞ্জলি" ও আর তৈরী হল না।

গীতাঞ্জলির তামিল গদ্যানুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। অনুবাদক ভি আর এম চেট্টিয়ার। আজ পর্যন্ত আমাদের জানা এইটিই একমাত্র অনুবাদ, এবং সে অনুবাদ ইংরেজী থেকে। এই তথ্যটুকু থেকেই তামিলনাডে গীতাঞ্জলি তথা কাব্য কতটা সমাদৃত বোঝা যায়।

এই অনাদরের মূলে দুটি সম্ভাব্য কারণের উল্লেখ করছি। প্রথমত প্রাচীনপন্থী তামিলনাডে কিছুটা এধরণের মনোভাব যে পুরোনো শৈব কবি নায়নমার এবং বৈষ্ণব কবি আলোয়ারদের পরে ভগবদভক্তির বিষয়ক আর নতুন কী পরম কাব্য হতে পারে? দ্বিতীয়ত নব্যপন্থী তামিল-

নাডে সুব্রহ্মণ্য ভারতীর মতো কবি-প্রতিভার ব্যাপক প্রভাব—যাঁর কথা ভাবতে গেলে আমাদের মানস চোখে নজরুলের চিত্র জেগে ওঠে। ভারতী তামিলভাষীর অন্তরে যে রাজনৈতিক মুক্তির জ্বালা ধরিয়েছিলেন তার সামনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-কলা কুন্ঠিত হয়ে রইলো। মনে রাখা প্রয়োজন, ভারতী আজও তামিলনাডের জীবন্ত কবি, তাঁর স্মৃতি এখনও অম্লান। মাতৃভাষার শক্তিধর কবি অন্য ভাষার সমকালীন যোগ্যতর কবিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, সাহিত্যের ইতিহাসে এটা কিছু দুর্লভ ঘটনা নয়।

রবীন্দ্রকাব্যের উপযুক্ত মূল্যায়ন ও রসাস্বাদনের পথে যে অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা হল, কবির জন্মশত বার্ষিকীর পরেও তা দূর হয়েছে বলে মনে হয় না। ইংরেজী গীতাঞ্জলির গদ্যানুবাদ হলেও ভি আর এম চেট্টিয়ারের প্রচেষ্টাকে তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। সহজ সরল গদ্যে রক্ষণশীল তামিল ভাষীদের কাছে রবীন্দ্রকাব্যের অন্তত আংশিক আবেদন পেঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন।

খুব সম্প্রতি প্রকাশিত একখানি তামিল বই হাতে পেয়ে আমরা কিছুটা উল্লসিত হলাম। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ইংরেজী কাব্যগ্রন্থ থেকে চয়ন-করা ১২০টি কবিতার তামিল পদ্যানুবাদ "কবি সম্রাটের কবিতা" (কবিয়চর্ কণ্ড কবিতে) নামে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। হুমায়ুন কবীরকে উৎসর্গ করা এই কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা নেওয়া হয়েছে ফ্রুট গ্যাদারিং থেকে, ১৬টি দি ক্রিসেন্ট মুন থেকে, ২৪টি দি গার্ডেনার থেকে এবং পোয়েমস থেকে ২৫ টি। ইতস্তত সংগৃহীত ৪টি কবিতা ছাড়া বাকি ৪৫টি গীতাঞ্জলির, বলা বাহুল্য ইংরেজী গীতাঞ্জলির।

কবিতার সংখ্যার দিক থেকে একক গ্রন্থ হিসাবে গীতাঞ্জলির প্রাধান্যের কথা ভেবে আমরা এটিকে সেই পর্যায়েই আলোচনা করছি। অনুবাদক শ্রীনিবাস রাঘবন (সাহিত্যক্ষেত্রে যিনি "নাণল" এই ছদ্মনামে পরিচিত) তুত্তুক্কুড়ি (তুতিকোরিন) কলেজের অধ্যক্ষ এবং তামিলনাডে ইংরেজী সাহিত্যের একজন নামী অধ্যাপক। পাশ্চাত্য কাব্য-নিষ্ণাত পণ্ডিতের পক্ষে রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে দীর্ঘকাল উদাসীন থাকা অস্বাভাবিক। গ্রন্থের আরম্ভে "এই অনুবাদ" প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ অনুবাদ করাটাই একটা শক্ত কাজ। তার উপর কবিতার অনুবাদ। এ যেন হাওয়াকে ধরে নিয়ে পাত্রে ভর্তি করার মতো। তা সত্বেও বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতি আমার বহুবর্ষব্যাপী অনুরাগ এবং সেই কবিতার তামিল রূপদানে আমার অনেক কালের আগ্রহ আমাকে এই কাজে নামিয়েছে।

বাংলা না জেনেও রবীন্দ্র কাব্যের পদ্যানুবাদে শ্রীনিবাস রাঘবন যে আগ্রহ অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। অনুবাদকের মূল অবলম্বন ইংরেজী হলেও বাংলাকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই ঃ যে কবিতাগুলির প্রথম প্রস্ফুটন বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তাদের ইংরেজী রূপকে ভিত্তি করে তামিলে অনুবাদ করা সঙ্গত কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরজেী কবিতার অধিকাংশই তাঁর নিজের অনুবাদ। কবি-কৃত অনুবাদকে মূলের মতো ধরে নিয়ে যদি তামিলে রূপান্তরিত করা যায় নিশ্চয়ই সেটা দোষের বলে গণ্য হবে না। তা সত্বেও আমার মনে হয়েছিল মূল বাংলা কবিতাগুলি একবার দেখে নিতে পারলে উপকারই হবে। সৌভাগ্যক্রমে তেমনি একটা সুযোগ জুটে গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

জনৈক বাঙ্গালি পণ্ডিতের সাহায্য নিয়ে বাংলা অনভিজ্ঞ তামিল পণ্ডিতের পক্ষে যতটা বোঝা সম্ভব তারই ভিত্তিতে অনুবাদক কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এবং তার কোনোটিই অযৌক্তিক বলে মনে হয়নি। সংক্ষেপে সেগুলি হচ্ছে ঃ

১। রবীন্দ্রনাথের সরল ও কবিত্বপূর্ণ ইংরেজীতে মূল বাংলা কবিতার তাৎপর্যসমূহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

২। ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে কবি মূল বাংলার কোনো কোনো অংশ বর্জন করেছেন, কোথাও বা সংক্ষেপে করেছেন। বাঙালিরা স্বীকার করবেন কিনা জানি না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে, এই বর্জন ও সংক্ষেপীকরণের ফলে অনেকগুলি ক্ষেত্রেই মূলের চেয়ে অনুবাদ উৎকৃষ্ট হয়েছে।

৩। প্রত্যেক ভাষার মতো বাংলা কাব্যেও কতগুলি বিশিষ্ট শব্দ আছে যার অনুবাদ অসম্ভব। এর সঙ্গে আছে কবিতার নিজস্ব ছন্দ, রীতি, ধ্বনি ইত্যাদি যেগুলির প্রত্যক্ষ অনুবাদ সম্ভব নয়।

স্বতন্ত্রভাবে বিচার করলে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এগুলি প্রত্যয়ের মতো কাজ করে অনুবাদকের দুর্গম পথকে সহজ করে দিয়েছে। বাংলা না জেনেও তিনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে অনুবাদের উপর নির্ভর করে তার পদ্যানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সফল অনুবাদকের পক্ষে এই স্বচ্ছন্দ-চিত্ততা একটি অত্যাবশ্যক গুণ। কবি-কৃত অনুবাদে এর পরিচয় অজস্র। "কইতে কী চাই, কইতে কথা বাধে; হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে"—এ এ অংশের অনুবাদে কবি লিখলেন ঃ—

I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffiled. (No. 3).

"ছাড়তে চাই অনেক করে, ঘুরে চলি, যাই সে সরে, মনে করি আপদ গেছে—আবার দেখি তারে"—এই পংক্তিগুলির ইংরেজী রূপ হয়েছে সংক্ষিপ্ত ঃ

I move aside to avoid his presence but I escape him not (No. 30).

অনুবাদে কেবল পরিবর্তন বা সংক্ষেপীকরণ ঘটেনি, পরিবর্জনও হয়েছে। এবং তার ফলে কবির মূল কবিতায় কোনো কোনো অংশ অনুবাদের মধ্য দিয়ে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন ধরুন এই কবিতাটি—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুখের অশ্রুধারা।
জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।

এখানে দ্বিতীয় ছত্রের দিকে লক্ষ্য করুন। বলা হয়েছে, আমি তোমার গলার মুক্তাহার গাঁথব। কী দিয়ে? দুঃখের অশ্রুধারা দিয়ে। বাংলা কবিতাটিতে এই সম্পর্ক অসম্ভাবিত। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে "তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ" এই অংশটুকু বর্জন করে আসল কথাটি পরিস্ফুট করা হয়েছে এইভাবে ঃ

Mother, I shall weave a chain of pearls for thy neck with my tears of sorrow (No. 83).

এর থেকে বোঝা যায়, অনুবাদ ঠিক অনুসরণ নয়, অনুসর্জন। অনুবাদ যে কতকাংশে নতুন সৃষ্টি, কবির রচনায় তার অনেক চিহ্ন রয়ে গেছে। মনে হয় বাংলা কবিতাটা সামনে রেখে তিনি ইংরেজী কবিতা রচনা করেছেন, তর্জমা মাত্র করেন নি। "আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না" এই কবিতায় কবি উত্তম পুরুষ, ঈশ্বর মধ্যম পুরুষ। কিন্তু ইংরেজী অনুবাদে কবি নিজেই মধ্যম পুরুষ ঈশ্বর হলেন নামপুরুষ।

বাঙালি বন্ধুর কাছে রবীন্দ্রকাব্যের, বিশেষ করে গীতাঞ্জলির, মূল ও অনুবাদের এই রহস্যটুকু জেনে নিয়ে তামিল অধ্যাপক অনুবাদে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর মূল লক্ষ্য শব্দের প্রতিশব্দ রচনা নয়, কবি-হৃদয়কে প্রতিধ্বনিত করে তোলা। বহুকাল কাব্যচর্চার ফলে তামিলে একটা বিশিষ্ট কাব্যভাষা গড়ে উঠেছে। সেই ভাষা ও ছন্দের মধ্যে কিভাবে রবীন্দ্রকাব্যের তাৎপর্য, সুর, ধ্বনি ও

অনুভূতিকে সঞ্চার করা যায় এইটেই ছিল অনুবাদকের প্রধান চেষ্টা। আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে যতটুকু বুঝেছি এ চেষ্টায় তিনি অনেকাংশে সফল হয়েছেন।

একজন পণ্ডিত অনুবাদক নিতান্ত নিরুপায় হয়ে মূল থেকে যে কতটা সরে যেতে বাধ্য হন তারও পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থে।—

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু
জাগি নি।

কী ঘুম তোরে পেয়েছিল, হতভাগিনী।
--এই অংশের ইংরেজী অনুবাদ অনেকটা মূলানুযায়ী—

He came and sat by my side but I woke not. What a cursed sleep it was, O miserable me!

কিন্তু তামিল অনুবাদ করা হয়েছে এই ভাবে ঃ হে সখী, সে যে এলো তার ফল হল কী? সে যে আমার খুবই কাছে বসেছিল তার ফল হল কী?—

বন্দুম্ পয়ন্ এন্নডি—অবন্ বন্দুম পয়ন্ এন্নডি?

এন্দনৈত্ তোট্টু অরুকিল্— অবন ইরুন্দুম পয়ন্ এন্নডি?

আরেকটি উদাহরণ দেখুন—

বাংলা ঃ ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে।

ইংরেজী ঃ Leave this chanting and singing and telling of beads!

তামিল ঃ ইয়ার অডা মন্তিরম্ মুণুমুণুত্তে জপমালৈয়ৈ উরুট্টিকিণ ড্রায়। অর্থাৎ কে তুই মুনমুন করে মন্ত্র পড়ে জপমালা ঘোরাচ্ছিস?

বাংলা ও ইংরেজীর সঙ্গে এই অনুবাদের ভাবগত সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রকাশ-ভঙ্গির মিল কিছুমাত্র নেই। বাংলা ও ইংরেজীর অনুজ্ঞা তামিলে পরিণত হল প্রশ্নে।

এ জাতীয় বৈষম্য খুব বেশি নেই। আমরা দু একটা চরম রূপের উদাহরণ দিলুম মাত্র।

মলয়ালম গীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি, জি শঙ্কর কুরুপ কিভাবে মূল বাংলার তৎসম শব্দগুলিকে কাজে লাগিয়েছেন। তামিলে তার আভাস মাত্র নেই। তামিল ও মলয়ালম পাশাপাশি দুটি ভাষা, নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে দুস্তর ব্যবধান। "তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী, অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি"—এই অংশের মলয়ালম অনুবাদে কুরুপ লিখলেন--

এত্র **মনোহর মাণ** বিডত্তে **গানালাপন শৈলি!**
নিভৃতম্ ঞানতু কেলপ্পূ **সততম্ নিতান্তবিস্ময়শামিল।**

উপরের চিহ্নিত অংশগুলি পুরোপুরি তৎসম। তামিল অনুবাদে তৎসম একটিও নেই। এক-আধটি তদভব মাত্র চোখে পড়ে — এন্দ বণ্ণম পাড়ুকিরায়, ইরৈবা, অরিয়েন, এন-ড্রেন্ড্রুম্, মুন্দু মোনপ পেরুবিয়াপ্পিল মূলুগি ইরুন্দু কেট্টিড়ুবেন্।

জি শঙ্কর কুরুপ্ বাংলা থেকে অনুবাদ করেছেন বলে মলায়ালম্ গীতাঞ্জলিতে মূলের গীত-ভঙ্গীটুকু অনুসরণের চেষ্টা আছে। যেমন, "আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে"—এই অংশটি বাংলার অনুসরণে কুরুপের অনুবাদেও বারে বারে এসেছে--

এন্তিনে ন্নেত্তনিচ্চিনি নিন্ বাতিলক্কল নিত্তুর্ণ্ণু নী?

তামিল অনুবাদে, ইংরেজীর অনুসরণে, মাত্র একবার পাওয়া যায় প্রথম স্তবকে—

এনো, অন্ব, উন্ বাচলিলে ইন্দ
এট্টৈয়েক্ কাত্তুক্ কিডক্ক
বিট্টায়্?

বাংলা গানের সুরের যে রেশটুকু মলায়ালম্-এ সঞ্চারিত হয়েছে, ইংরেজী নির্ভর তামিল অনুবাদকের পক্ষে সেটি আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি। অন্যথায়, এই কবিতাটির

অনুবাদে অধ্যাপক রাঘবন্ মেঘলা দিনের বিষাদ ব্যাকুলতাকে পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। বাংলা গানের ধ্বনি যেখানে ইংরেজীতেও সঞ্চারিত, তামিল অনুবাদক সেখানে পিছ-পা হন নি। "যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন" এই গানখানির প্রতিটি স্তবকের শেষে এসেছে "সবার পিছে, সবার নীচে, সব-হারাদের মাঝে", এবং ঠিক একই ভাবে ইংরেজীতে পাই—

Among the poorest, and lowliest, and lost.

অধ্যাপক রাঘবন লিখেছেন একই ক্রম ধরে—

এড়ৈয়রুম্ এদলরুম ইড়িনদোর তামুম
ইরুক্কিন্ড্র ইডমে উন্ পাদপীঠম্।

"কবিয়রচর্ কণ্ড কবিতৈ" পুরোপুরি গীতাঞ্জলির অনুবাদ নয় একথা আমরা পূর্বেই বলেছি একবার। এখানে কেবল গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা নিয়েই আলোচনা হল। সমগ্র গ্রন্থের ১২০টি কবিতাকে শিশু, প্রেম, সৌন্দর্য, চিন্তা ইত্যাদি কয়েকটি অংশে বিষয় অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। রবীন্দ্রভাবধারা অনুসরণে তামিল পাঠকের সাহায্যের জন্য প্রত্যেকটি কবিতার উপর সরল গদ্যে সংক্ষেপে দু-চার লাইনে দেওয়া হয়েছে কবিতাটির মর্মার্থ। যেমন "আর নাই রে বেলা, নামল ছায়া" কবিতাটির প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: সন্ধ্যা বেলা। নদী থেকে জল আনতে যাচ্ছি। কোথা থেকে ভেসে এলো বাঁশির সুর। আর কি আমার ঘরে ফেরা হবে?

মোট কথা, রাঘবন্ কেবল অনুবাদ করেই ছেড়ে দেননি। টীকা-টিপ্পনী সমেত কবিতাগুলিকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিজস্ব রুচি ও রসগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন "রবীন্দ্রনাথের কবিতা" সম্পর্কে একটি সতেরো পৃষ্ঠার ভূমিকা। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়।

সাহিত্য সংবাদ

গত শতাব্দীর কোনও এক দশকে হাইল্যান্ড স্কটস্ জ্যাকোবাই সম্প্রদায়ভুক্ত এক পরিবার ভাগ্যান্বেষণের দুরন্ত আশায় নূতন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকায় পদার্পণ করেন। স্কচ্ পরিবারটির প্রথমে কনেক্টিকাট্ প্রদেশে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু পরিবারের কর্তারা যখন বুঝলেন যে, আমেরিকার বাতাসে যথার্থ স্বর্ণরেণু ভেসে বেড়ায় না বরং স্বদেশের মতই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অন্নসংস্থান করতে হয়, তখন হঠাৎ বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন তাঁদের মন থেকে উধাও হয়ে গেছে এবং আমেরিকা দেশটা যে মাটির, তা মনরো পরিবার বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কর্মসংস্থানের আশায় যখন তাঁরা পশ্চিম-নিউইয়র্কের পথে পাড়ি দিলেন তখন যুবক হেনরী স্ট্যানটন মনরো কিন্তু তাঁর কর্মস্থল হিসাবে শিকাগো সহরটি মনোনীত করলেন। হেনরী তখন উদীয়মান আইনজীবী। মিচেল পরিবারের মার্থা নাম্নী এক যুবতীর পাণিগ্রহণ করে হেনরী শিকাগো সহরে নূতনভাবে জীবন আরম্ভ করলেন। হেনরী ক্রমশঃ আইন ব্যবসায়ে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন, সেটা ১৮৫২ সালের কথা।

শিকাগোর মনরো পরিবার ক্রমে বর্দ্ধিত হতে থাকে, মার্থার তিনটি সন্তান শিশুকালেই গত হয়। কিন্তু ডোরা লুইস, হ্যারিয়েট, লুসি এবং উইলিয়স স্ট্যানটন এই তিন কন্যা এবং একমাত্র পুত্রকে মার্থা অকালমৃত্যুর স্পর্শ থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা হ্যারিয়েট, (যাঁর ডাক নাম ছিল হ্যাটি) মনরো বংশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র।

হ্যারিয়েট মনরো ১৮৬০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। এই ক্ষীণ-কায়া শিশুটির প্রতি পিতার স্নেহ যেন একটু বেশী ভাবেই বর্ষিত হত, যার ফলে বালিকা মনরো চঞ্চলা হরিণীর মত যত্রতত্র বিচরণ করত, তাকে বাধা দেবার কেউই ছিল না। পিতার স্নেহ এবং প্রশ্রয় হ্যারিয়েটকে দিয়েছিল অবাধ স্বাধীনতা, তার মনে জাগিয়েছিল দুর্দমনীয়তা ও অপার মমত্ত্ববোধ। এই মানসিকতা ছিল হ্যারিয়েটের অমূল্য সম্পদ, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে এনেছিল এক দুর্লভ সম্মানের জয়মাল্য।

১৮৭১ সালের অগ্নিকাণ্ডের ধ্বংসলীলায় শিকাগো সহর ভস্মীভূত হয় এবং মনরো পরিবারকে নিঃস্ব করে। এই দুর্বিপাক মনরো পরিবারে আনে অর্থকষ্টের যন্ত্রণা এবং দুঃসহ দুঃস্বপ্নের অবকাশ। এমত দোদুল্যমান অবস্থায় হেনরী দিশাহারা হয়ে নানা রকম বিকল্প কর্মসংস্থানের সংস্পর্শে আসেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরিবারের আর্থিক ভারসাম্যে প্রচণ্ড আঘাত হানে। যাইহোক, অবশেষে যখন মনরো পরিবারে কিঞ্চিৎ আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এল তখন জর্জটাউনের ভিজিটেসন কনভেণ্ডে হ্যারিয়েটকে ভর্তি করে দেওয়া হয়, ১৮৭৭ সালের কোনও এক সময়ে। কনভেণ্টে সিস্টার জেন ফ্রান্সেস রিপলে এবং সিস্টার পলিনার সস্নেহ অবিভাবকত্বে হ্যারিয়েট শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হন। উক্ত সিস্টারদ্বয় হ্যারিয়েটের জীবনে

আনে এক নূতন পৃথিবীর আলোময় অভিজ্ঞতার সংবাদ। বিশেষতঃ সিস্টার পলিনা সাহিত্য জগতের অর্গলবন্ধ দ্বারের স্বর্ণ-চাবিটি হ্যারিয়েটের হাতে তুলে দেন। তাঁরই অবিভাবকত্বে চঞ্চলা এবং অভিমানী হ্যারিয়েট এক বুদ্ধিমতী ও রুচিসম্পন্না যুবতীতে পরিণত হন। সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আরও গাঢ় হয় যখন হ্যারিয়েট, সাংবাদিক ইউজেন ফিল্ডের সংস্পর্শে আসেন। ইউজেন ফিল্ড ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক বরার্ট লুই স্টিভেনসনের অন্যতম সংবাদদাতা।

সাংবাদিক হলেও, প্রকৃত পক্ষে ইউজেন ফিল্ড ছিলেন প্রতিভা অনুসন্ধানী। হ্যারিয়েট মনরোর মনে কাব্যনির্ঝরের যে উদ্দাম স্রোত এতকাল অবরুদ্ধ ছিল, ইউজেনের স্নেহময় প্রভাবে তার উৎসমুখ খুলে যায় এবং হ্যারিয়েট শেলীর প্রতি প্রণতি জানায়, জন্ম নেয় একটি সনেট। সেঞ্চুরী পত্রিকায় সনেটটি প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮-৮৯ এই দুই বৎসর সময়ে হ্যারিয়েট বহু উদীয়মান সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসেন। হেনরী হারলাণ্ড (যিনি "ইয়োলো বুক" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক) সম্ভবতঃ হ্যারিয়েটের জীবনে একমাত্র বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি।

পরবর্তী দুইটি দশক হ্যারিয়েটের পক্ষে ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাল। ১৮৯০ সাল অবধি হ্যরিয়েট স্বল্পখ্যাত সাহিত্যিক মাত্র। তারপর তাঁর জীবনে এল এক সুবর্ণ সুযোগ। নবগঠিত এবং ক্রমবর্ধমান শিকাগো সহরে ১৮৯৩ সালে বসল বিশ্বমেলা। বিশ্বমেলার প্রশস্তিগান রচনার জন্য রাজ্য সরকার হ্যারিয়েটকে অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন, রচিত হল "দি কলম্বিয়ান ওড"। হ্যারিয়েট বিশ্বমেলায় স্বরচিত কাব্যটি আবৃত্তি করলেন। পারিশ্রমিক পেলেন এক হাজার ডলার এবং নিউ ইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকার কাছ থেকে খেসারত স্বরূপ পেলেন পাঁচ হাজার ডলার, কারণ তাঁর কাব্যটি তাঁরা অকালে প্রকাশ করেছিলেন। যদিও এই সময় তাঁর লেখনী কবিতা, প্রবন্ধ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক বহু রচনা শিকাগোর পাঠক সমাজকে উপহার দেয় কিন্তু পরিবারের অর্থকষ্টের যন্ত্রণা তাতে কিছুমাত্র লাঘব হয়নি। এদিকে দেশ ভ্রমণ ছিল হ্যারিয়েটের একমাত্র বিলাসিতা। অর্থকষ্ট, দেশান্তরী হবার অন্যতম অন্তরায় হলেও দৃঢ়মনা হ্যারিয়েট তা অবলীলাক্রমে জয় করতেন। ক্ষীণ-কায়া হলেও তাঁর মনের গঠন ছিল অত্যন্ত দৃঢ়সংবদ্ধ এবং কর্তৃত্ব-আশ্রয়ী অথচ রুচিশীল।

সাহিত্য সেবায় বেশ কয়েক বৎসর নিয়োজিত থাকার পর হ্যারিয়েট নূতন কিছু করার ইচ্ছায় অদম্য উৎসাহে মনপ্রাণ নিয়োজিত করলেন। বহুদিন যাবৎ একটি সম্ভাবনা তাঁর চিন্তাকাশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তারই বাস্তব রূপায়ণে হ্যারিয়েট অর্থের জন্য শিকাগো সহরের ধনী সম্প্রদায়ের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ধর্ণা দিলেন। ইচ্ছা, কেবলমাত্র কবিদের জন্য একটি পত্রিকা প্রকাশ করা কারণ তখনও পর্য্যন্ত তাবৎ কবিকুলের কোনও নিজস্ব মুখপত্র ছিল না। প্রায় একশত পৃষ্ঠপোষক তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দিলেন। হ্যারিয়েট পৃথিবীর তাবৎ কবিকুলের নিকট আবেদন করলেন যে তাঁর পত্রিকায় তাঁরা যেন নিয়মিত কবিতা উপহার দিয়ে পত্রিকাটির আয়ুবর্দ্ধন করেন।

১৯১২ সালে ২৩ সেপ্টেম্বর একটি বিশেষ শুভদিন কারণ উক্ত দিনে **পোয়েট্রি—এ ম্যাগাজিন অব ভার্স**। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। আত্মপ্রকাশের মুহূর্ত্ত থেকেই পোয়েট্রি পত্রিকা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় এবং বিংশ শতাব্দীর কাব্য আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র রূপে চিহ্নিত হয়। হ্যারিয়েটের চিন্তাধারা ছিল অতি আধুনিক এবং দূরদৃষ্ট সম্পন্ন, কোনও রকম গোঁড়ামীর স্পর্শ তাঁর মনকে কলঙ্কিত করতে পারেনি। তাই পোয়েট্রির তৃতীয়

সংখ্যায় যখন কবিগুরুর কবিতা প্রকাশিত হতে দেখি তখন আশ্চর্য্য হওয়ার অবকাশ থাকে না। সুদূর ভারতের নবজাগরণের বাণী কবিগুরুর কাব্যের মাধ্যমে আমেরিকার জনমানসের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে যে কৃতিত্ব হ্যারিয়েট প্রদর্শন করছেন তার পশ্চাদপটে আছে একটি আধুনিক মনের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রুচিশীলতা।

প্রথম যুগে পোয়েট্রির সম্পাদনা হ্যারিয়েটের কাছে কিঞ্চিৎ দুরূহ ব্যাপার বলে মনে হত কিন্তু এমন এক কবির স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং চিন্তাশীল সাহচর্য্য তিনি লাভ করেছিলেন যার ফলে ,তিনি কয়েক মাসের মধ্যেই একজন প্রথম শ্রেনীর সম্পাদিকা রূপে নিজেকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। এই চিন্তাশীল অবিভাবকটি হলেন নবকাব্য আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি এজরা পাউন্ড, যিনি মনুষ্য চক্রান্তে আজ উন্মাদাশ্রমে নিক্ষিপ্ত।

কাব্যের ক্ষেত্রে হ্যারিয়েটের অবদান যদিও প্রথম শ্রেণীর নয় তবুও তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সম্পাদিকার সম্মান থেকে বিচ্যুত করার মত ব্যক্তিত্বের উদয় এখনও হয়নি। তাঁর আত্মপ্রকাশের জন্য প্রত্যেকটি কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদিত হত। উদীয়মান কবিদের যে মমতাপূর্ণ উপদেশ হ্যারিয়েট দান করতেন তার মূল্য কিছু কম ছিল না। সম্পাদকের প্রকৃত কর্ত্তব্য কি, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে সম্ভবতঃ হ্যারিয়েট মনরোর কর্ম্মতৎপরতার উদাহরণই যথাযোগ্য। পোয়েট্রি পত্রিকার অনুকরণে বহু পত্রিকা এককালে আত্মপ্রকাশ করেছিল কিন্তু তার সবকটিই অকালে ঝরে গেছে, অথচ পোয়েট্রি অদ্যাবধি সসম্মানে বিদ্যমান। এই অভূতপূর্ব্ব বিদ্যামননতার অন্যতম কারণ হল পত্রিকাটির প্রথম যুগে যে অনুসন্ধানী আদর্শ পালিত হত তা আজও অনুসরণ করা হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কাব্য জগতে যে প্রচণ্ড আন্দোলন উচ্ছ্বসিত হয় সেই ইমেজিস্ট আন্দোলন হ্যারিয়েট মনরোর স্নেহময় ক্রোড়ে একান্ত মমতায় যে লালিত হয়েছিল তা অস্বীকার করার মত আত্মবিশ্বাস আমাদের নেই। কেবল তাই নয় নূতন কবির গান শোনবার মহৎ দায়িত্ব ওই ক্ষীণকায় মহিলাটির স্কন্ধেই ন্যস্ত ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে যাঁরা মহৎ কবি নামে অভিহিত হন তাঁদের সকলের সঙ্গেই পোয়েট্রি পত্রিকার আত্মিক যোগ ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পোয়েট্রি পত্রিকাতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

পোয়েট্রি পত্রিকার দুর্ব্বার অগ্রগতির পশ্চাতে যে শক্তি নির্লিপ্তভাবে নিয়োজিত হত, তার মধ্যমণি ছিলেন হ্যারিয়েট একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অদম্য উৎসাহু আপামর পাঠক সমাজের তৃষিত মানসে আনন্দের পশরা বয়ে এসেছে বটে কিন্তু তার চরম মূল্য দিতে হয়েছে হ্যারিয়েটকে। পত্রিকা সম্পাদনার কাজে মগ্নতা এতই গভীর ছিল যে জীবনের আস্বাদ থেকে হ্যারিয়েটকে বঞ্চিত হতে হয়েছে আজীবন কুমারী জীবন যাপন করে, কিন্তু কোনও খেদ ছিল না তাঁর মনে। মানসকন্যা পোয়েট্রি পত্রিকার লালনে হ্যারিয়েটের দিনগুলি কোথা দিয়ে কেটে যেত তা তিনি নিজেই খেয়াল করতে পারতেন না।

প্রৌঢ়ত্বের অভিশাপ হ্যারিয়েটের কর্ম্মক্ষমতাকে কোনকালেই স্পর্শ করতে পারেনি। দূরদেশের হাতছানি অবহেলা করার মত মানসিকতা হ্যারিয়েটের ছিল না। তাই যখনই সুযোগ পেয়েছেন, একটু মুক্তির আস্বাদ গ্রহণের জন্য মুক্ত গ্রামাঞ্চলের পান্নাসবুজ ক্রোড়ে আশ্রয়লাভের আশায় হ্যারিয়েট সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন অবাধ ভ্রমণের মাধ্যমে। কিন্তু এই দেশ ভ্রমণের অনুরাগ যে তাঁর জীবনের অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে তা যদি তাঁর জানা থাকত তাহলে হয়ত পোয়েট্রি পত্রিকা এবং তৎকালীন কবি-

কূল অকস্মাৎ মাতৃহারা হতেন না।

বুয়েনার্স এয়ার্সে পি, ই, এন, সাহিত্য সংস্থার সভায় যোগদান করার কালে ইন্‌কা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের জন্য ১৯৩৬ সালে হ্যারিয়েট পেরু প্রদেশের আন্দিজ পর্ব্বতমালায় ভ্রমণ করার সংকল্প করেন। আরিকুইপা এক অন্যতম উচ্চ শিখর-দেশ। আরিকুইপার উচ্চতা একদিন একটি মহান জীবনের স্পন্দনটুকু নিষ্ঠুরভাবে স্তব্ধ করে দিল। ছিয়াত্তর বৎসর বয়স্কা হ্যারিয়েটের সেই ভয়াবহ উচ্চতা সহ্য হল না, মস্তিষ্কের শিরা বিদীর্ণ হয়ে তিনি ইহজগতে ত্যাগ করলেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে একটা যুগের পতন হল বটে কিন্তু তাঁর মমতা দিয়ে গড়া সেই ঐতিহ্যের মৃত্যু ঘটল না। মর্টন ডয়েনজাবেল পোয়েট্রি পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু শিক্ষকতার খাতিরে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জর্জ্জ ডিলন হলেন নূতন সম্পাদক। ডিলনকে হ্যারিয়েটই আবিষ্কার করেছিলেন।

পোয়েট্রি পত্রিকা অদ্যাবধি কবি যশ প্রার্থীগণের আশ্রয়স্থল। যে মহাপ্রাণা বিদুষী এই পান্থশালার দ্বার উন্মুক্ত করে আত্মবিসর্জ্জন করেছেন তাঁর নাম বিস্মৃত হওয়া অপরাধের নামান্তর মাত্র। হ্যারিয়েট মনরোর রচনাবলীর পরিচয় :—

কবিতা

ভ্যালেরিয়া এণ্ড আদার পোয়েমস্ (১৮৯১), দি কলম্বিয়ান ওড (১৮৯৩) ইউ এণ্ড আই (১৯১৪), দি ডিফারেন্স এণ্ড আদার পোয়েমস্ (১৯২৩), চোজেন পোয়েমস্ (১৯৩৫)।

গদ্যরচনা

জন ওয়েলবার্ণ রুট : আর্কিটেক্ট (১৮৯৬), দি পাশিং শো (১৯০৪), পোয়েটস এণ্ড দেয়ার আর্ট (১৯২৬), এ পোয়েটস্ লাইফ (১৯৩৮)।

সম্পাদনা

দি নিউ পোয়েট্রি (এ, সি, হেণ্ডারসন সহ) (১৯১৭/১৯৩২), পোয়েমস্ ফর এভরি মুড (১৯৩৩)।

নূতন গ্রন্থ

ডি, এইচ, লরেন্স : এন্থনি বীল।

লরেন্স ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক নাম। তাঁর সাহিত্য কীর্তির প্রকৃত মূল্যায়ন কবে হবে এমন প্রশ্ন, প্রত্যেক সাহিত্য পাঠকের মনে নিয়তই উৎসরিত হয়ে থাকে বলেই আমাদের বিশ্বাস। বহু গুণী সাহিত্য সমালোচক লরেন্সের সাহিত্যের উপর আলোকসম্পাত করার চেষ্টা করেছেন এবং করছেন। এন্থনি বীলের ডি, এইচ, লরেন্স গ্রন্থটি একটি নবতম প্রচেষ্টা।

বীল প্রধানতঃ লরেন্সের উপন্যাসগুলির সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি উপন্যাসের জন্য এক একটি অধ্যায়ে যে সমালোচনা করা হয়েছে তা বিশেষ উচ্চস্তরের নয়। দি রেনবো উইমেন ইন লাভ এবং লেডি চ্যাটার্লিস লাভার এই তিনটি উপন্স্যাস গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে কিন্তু লরেন্সের অন্যতম উপন্যাস সানস্ এণ্ড লাভারস্ কেন যে পরিত্যক্ত হল তা বোধগম্য হল না। সমালোচনার ধারা লরেন্সের রচনার মূল নীতিসূত্রকে অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়েছে, অত্যন্ত জটিল তার প্রকাশভঙ্গী। এই অকারণ জটিলতা অনাবশ্যক বলেই আমাদের মনে হয়েছে। আশা ছিল সমালোচনাগুলি সরল সমীক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশের মাধ্যমে লরেন্সের দার্শনিকতার প্রকৃত মূল্যায়নে উৎসর্গিত হবে কিন্তু বীলের রচনায় তার ইঙ্গিত মাত্র নেই। উপরন্তু লরেন্সের ছোটগল্প, কবিতা, ভ্রমণসাহিত্য এবং সমালোচনা সাহিত্য প্রভৃতির অলোচনা, বীল

মাত্র একটি অধ্যায়ের মধ্যে সংযোজিত করেছেন। এই কৃপণতাসুলভ সঙ্কুচনের পশ্চাতে কি উদ্দেশ্য নিহিত আছে তা বোধগম্য নয়। গ্রন্থটির সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল মুখবন্ধ অধ্যায়টি যা এক কথায় অপূর্ব্ব। মুখবন্ধের তুলনায় অন্যান্য অধ্যায়গুলি বেশ নিষ্প্রভ।

D. H. Lawrence. By Anthony Beal, pp. 128. Oliver and Boyd, Edinburgh and London, 1961.

এ শর্ট হিস্ট্রি অব ইটালি : হিয়ার্ডার এণ্ড ওয়েলি, সম্পাদক।

যে দেশের মাটিতে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্মেষ এককালে হয়েছিল তার ইতিহাস সকল শ্রেণীর পাঠককে যে আকৃষ্ট করবে তা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি ইতালির একটি ক্ষুদ্র অথচ তথ্যপূর্ণ ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ব্রিটেনের নৌবিভাগে নাবিকদের জন্য ইতালির একটি ক্ষুদ্র পরিচিত পুস্তক দুইখণ্ডে প্রকাশ করে। পুস্তকটির উক্ত সংস্করণে স্বর্গত শ্রীমতী সি, এম, এডি এবং শ্রী এ, জে, হোয়াইটো ইতালির প্রাচীন ইতিহাসের অধ্যায়টি রচনা করেছিলেন কিন্তু সে ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল।

বর্ত্তমান কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে উচ্চ অধ্যায়টি ডক্টর হিয়ার্ডার এবং ওয়েলি কর্তৃক আমূল সংস্কৃত হয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসরের ইতালির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থটিতে সফলভাবে সংযোজিত হয়েছে।

যদিও মাত্র ২৫০ পৃষ্ঠায় ইতালির সভ্যতার ইতিহাস বিধৃত করা যায় না তবুও ক্লাশিক যুগ হতে ইদানীং কালের ইতালির পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে জানতে হলে গ্রন্থটি অপরিহার্য্য। ১৫টি মানচিত্র এবং আকর গ্রন্থের একটি ক্ষুদ্র তালিকা ইতিহাস গ্রন্থটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। সাহিত্য পাঠক এবং ছাত্র সমাজে গ্রন্থটির বহুল প্রচার প্রচার কামনা করি।

A Short History of Italy: Ed. By Dr. H. Hearder and Dr. D. P. Waley. 250 pp. Approx. Cambridge University Press. £0. 22s. 6d.

সাহিত্য : রেনেসাঁস্-বিপ্লব-বিশ্বযুদ্ধ

সাহিত্যের উৎসকাল হ'তে নানা বিতর্কিত পথে এর অগ্রগতি ঘটেছে। এই ক্রমবিবর্তন-পথে সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন ও সংজ্ঞানির্ণয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে বাক্যস্ফীতি ঘটেছে—সমাধান কিন্তু আজও আগের মত ধূসর। বিভিন্ন মতবাদীরা এ আসরে সমবেত হ'য়ে শেষ সিদ্ধান্তের রায় বলেছেন, কিন্তু শেষ-উপস্থাপনারও তীব্র ও সুচিন্তিত সমালোচনা শেষে নব-বাদের জন্ম হয়েছে। বিতর্কে প্রবেশ না ক'রেও সহজেই বলা চলে, এ আলোচনা অনর্থক তো নয়ই বরং অবশ্যম্ভাবী ও শুভ। মূল্যায়নে ও সংজ্ঞানির্ণয়ে বিচিত্র মননের প্রকাশ, বিষয়বস্তু নির্বাচনে অনন্যতা ও চতুরতা এবং সর্বোপরি প্রবহমান মানবসমাজেও বাস্তব অভিজ্ঞতা দিনে দিনেই পাঠককে মুগ্ধ ও চমকিত করেছে—যদিও বাদানুবাদের প্রসারতা ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু সাহিত্যবিষয়ক অন্য একটি অতি-প্রধান বিষয়ে কোনোকালেই চিরন্তনকালের অক্ষয় বার্তা প্রচার করলেও যুগচিত্ত, যুগ-চেতনার আভাস সেখানে বিধৃত থাকতে বাধ্য, তা' যত ক্ষীণ হয়েই থাকুক না কেন। সাহিত্যিক যত কল্পনাপ্রবণই হোন না কেন, তিনি সমাজেরই একজন। আর তাই তাঁর চিন্তা-ভাবনা-কর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমাজের প্রভাব পড়তে বাধ্য। পরিবেশ-অচেতনতার মধ্যে সর্বকালীন সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না—আর পারে না বলেই সাহিত্য পাঠকালে তৎকালীন সামাজিক ও কিছুটা রাষ্ট্রিক ইতিহাস জ্ঞাত থাকলে সাহিত্যের অন্তরূপকে অনুধাবন করতে যথেষ্ট সুবিধা হবে। তবে একথাও স্বীকার্য, এ-সবের অতিরেকে সাহিত্য-মূল্যায়ণে বাধা জন্মাবে কারণ অনেককিছু মেনেও সাহিত্য-রসকে কোনোমতেই ক্ষুণ্ণ হতে দিলে চলে না। উপর্যুক্ত মন্তব্য অবশ্য সুপ্রমাণিত হবে রেণেসাঁস-যুগ হতে আর এ আলোচনাও সেই কাল হতেই আরম্ভ।

অবশেষে কনস্তান্তিনোপলের পতন হল। সেদিনেরও প্রতিকূল পরিবেশে অনেকে একে চরমতম দুর্ভাগ্য ও অসাধারণ হতাশাব্যঞ্জক বলেই ভাগ্যকে দোষারোপ করেছিল। স্তব্ধ জ্ঞানভাণ্ডার পদতলের নিরাপদ আশ্রয় হারিয়ে প্রাণ ও সম্মানরক্ষার্থে প্রাচীন বিপদমুক্ত আস্তানায় এল ফিরে। তাৎক্ষণিক নিরাশ্রয়তা কিন্তু এই জ্ঞান-তাপসদের বিমূঢ় করে রাখতে পারে নি. তাঁদের অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতাগুণ ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা, সর্বোপরি সর্বকিছু জানবার ও জানাবার অদম্য নেশা ও কৌতূহল চতুর্দিকের সচেতন মানুষকে আলোড়িত করে তুলল। তাছাড়া তাঁরাও তাঁদের উদ্বোধক-মন্ত্রের সঞ্জীবনী-শক্তির পরিচয় ও ব্যাপকতায় গত দুঃখ ভুলতে চাইলেন। এখানেই অন্ততঃ তাঁদের পক্ষ থেকে তাঁদের জীবনের পরমতম সার্থকতা ও চরমতম পরিপূর্ণতা।

ভুলে থাকা অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটল। সুণ্ঠু শাসনক্ষমতায় অপারগ অপদার্থ বিলাসী সম্রাটকুল যতটা রাখত নিজ দেহ-ভোগ-সামগ্রীর সংবাদ, তার সহস্রাংশও জানত না তার প্রজাপুঞ্জের খবর। রাজনুগৃহিত কিছু স্তাবকও রাজার প্রদর্শিত পথেই চলতে

ছিল অভ্যস্থ। অসাংস্কৃতিক এই উচ্ছৃংখল আবহাওয়ায় কিছু-না-পাওয়া সাধারণ মানুষও দুর্ভাগ্যের প্রথাগত স্রোতে দেহ ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য পথ পায় নি। তাই এই মধ্য-সময়ে দুই-একজন অসধারণ সাহিত্য-ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেলেও তার পঠন ও প্রভাব সুবিস্তৃত ছিল না অকর্ষিত ভূমির প্রাচুর্যে। রেনেসাঁসের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কয়েকজন সাহিত্য-সাধকের প্রতিভায় এই পর্বের দ্রুত আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল; আর পর-পর্বে বহুর মাঝে এর বিস্তৃতিতে সকল-কিছুর নব-অভ্যুদয় ঘটল। শুধুমাত্র অতীত-ঐতিহ্যের স্মৃতিচারণ যেমন সমাজে পরম ফলপ্রসূ নয়, তেমনি অতীতকে বিস্মৃত হওয়ার মধ্যেও কেবলমাত্র আগামীদিনের কেই নিশ্চিত করা হয়। অতীতের সুষ্ঠু রূপ দিয়ে এ ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশকে জাগ্রত ও উর্বর করবার প্রচেষ্টাতেই এ রোমন্থন সার্থক। তখনকার মানুষ চিন্তা করত পূর্বে কি ছিলাম, আর নানা রঙিন স্বপ্ন দেখত ভবিষ্যতের; অবশ্য এও জানত সে শুধু স্বপ্নই। কিন্তু এই পঙ্কিলময় বর্তমান হতে উত্তরণের কোনো চিন্তা তার মনকে বিচলিত না করে স্থবির করে রেখেছিল। রেনেসাঁস এসে চিন্তারাজ্যে ঢেউ তুলে জানিয়ে দিল অতীতের সেই স্বর্ণময় দিনগুলোকে ফিরে পেতে হবে—যেখানকার সব-কিছু অস্পষ্ট হলেও মোহময়, অনায়াস লভ্য না হয়েও একান্ত কাম্য।

মানবতাবাদ ও বিশুদ্ধতার অনুধ্যান সার্থকরূপে আরম্ভ হল। জন্ম হল মানবপ্রকৃতিবেত্তাদের। মধ্যযুগীয় পাশবিক অত্যাচার এবং মানুষের প্রতি অযৌক্তিক অবিশ্বাস ও অবমাননা এতদিন ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। অত্যাচারীর কাছে দোষী ও নির্দোষী নির্বিচারে নিগৃহীত হবে আর শক্তির কাছে মানবিক স্বাভাবিক দুর্বলতা অপাংক্তেয় হয়ে রইবে—এই যেন আবহামানকালের অনঢ় বিধান। ব্যাষ্টির অনাচার গোষ্ঠীকে মূক করে রাখবে এর অন্যথা প্রায়শই দুর্লভ। কিন্তু এই অবমাননার মধ্যে দেখা দিল মানবীয় দৃষ্টি। হয়তো সেদিনের প্রতিকূলতার মধ্যে তার প্রতিবিধান একরূপ ছিল অসম্ভব কিন্তু চিন্তাজগতে একে স্বীকৃত দেওয়া হল। মানুষের অধিকার অন্ততঃ ভাবরাজ্যে ও হৃদয়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু এর সদম্ভ প্রতিবাদের জন্য আমাদের আরও তিন-শ' বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে

পুঁথির নিগড়ে সাহিত্যের বন্ধন হাজার হাজার বছরেও শিথিল হয় নি। রেনেসাঁস এসে পুঁথিকে গ্রন্থাগার থেকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষিত-মানুষের হাতে তাকে পৌঁছে দিল। যে জ্ঞানভাণ্ডার সীমিত মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত করছিল, সার্বিক মুক্তি যার এতদিন ব্যাহত ছিল, সে আজ অযুক্তপক্ষ হল। এ [illegible] বৈপ্লবিক ও দূরপ্রসারী। সাহিত্য কুলবধূর মর্যাদা হারিয়ে মুক্ত-অঙ্গনে উর্বশী হল। যে ছিল শো-কেসে কিউরিও, তার মধ্যে এল প্রাণাবেগ।

সাহিত্যে এতদিন যাবৎ গোষ্ঠীচেতনা সুদৃঢ় ছিল। সাহিত্যসৃষ্টির পেছনে ক্ষীণাকারে একটি উপদেশের রেখা দেখা দিত। হয়তো এটি ঘটত অগোচরে কিন্তু একটি অনুশাসনের স্তিমিত ধারাকে অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের একান্ত অভাব তখন সংলক্ষ্য। লেখকের ব্যক্তি' সেখানে অনেকাংশেই অনুপস্থিত। আর ' ভালগার পিপল'-এর জন্য শিক্ষিত খ্যাতনামাদের লেখাও খুব মার্জনীয় ও প্রশংসনীয় ছিল না। তাই কথা-সাহিত্যের আদি-স্মরণীয় ব্যক্তি বোকাচিও ফিরে গিয়েছিলেন সাধারণ মানুষের মধ্য হতে জ্ঞান-মন্দিরে। রেনেসাঁস-পর্ব সময়ে সাধারণের প্রতি একটি মানবিক আকর্ষণ ও অন্যধারে উচ্চ-সমাজব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আনুগত্যস্বীকার—এই দ্বিবিধ সত্তাই তখন বর্তমান। রেনেসাঁস-

উত্তরযুগে এই সকুণ্ঠ-দৃষ্টির বিমুক্তি ঘটল।

মধ্যবিত্ত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের সার্থক চিত্র ফুটিয়ে তুললেন বিশ্বের প্রথম আধুনিক কবি-কথা-সাহিত্যিক বোকাচিও। তাঁর দৃষ্টির এই নূতনত্বের কতকগুলো কারণও ছিল, তার মধ্যে প্রধান তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনাচরণ। তাঁর জন্ম-ইতিহাসটি খুব গৌরবপূর্ণ নয়। ফরাসী মাতার গর্ভে পারীতে তাঁর জন্ম হয়। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইতালির অনেকাংশে ঘুরবার ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা বিস্তৃত হয়েছিল। মারিয়ার সঙ্গে বিবাহিত-জীবনেও তিনি বিচিত্র মানুষের মনের পরিচয় পেলেন। মধ্যজীবনে পিতার আর্থিক দুর্গতির ফলেও গভীর দুঃখ ও হতাশার মধ্যে দিন কাটাতে হয়; কিছু পরে 'ব্ল্যাক ডেথে' পিতা ও মরিয়ার জীবনাবসান। এইরূপ মানসিক অস্থিরতা ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার মধ্যেই পাঁচ-বছরের সাধনার ফসল 'দেকামেরণ',—প্রথম জনগণের অকুণ্ঠ জীবনবার্তা। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ভয়াবহ দশ-রাত্রির দশ-বন্ধুর শত-গল্পের মধ্যে যেন সাধারণ-মানুষ প্রাণ পেল। যদিও যুগ-প্রভাবে, তৎকালীন সামাজিক ও নৈতিক অধোগতির জন্য রুচি-কলুষিত কিছু দৃশ্য আছে (যেমন, বস্ত্রবিমুক্ত প্রণয়াস্পদাকে একটি উন্মুক্ত উচ্চস্থানে উঠিয়ে প্রতিশোধগ্রহণের স্পৃহায় প্রণয়ীর মইটি তুলে নেওয়া) তবু একথা স্বীকার করতেই হবে, এত অভিজ্ঞতা ও মধ্যবিত্তের প্রতি সহানুভূতি দিয়ে আর কেউ তাদের এমন করে চিত্রিত করেন নি বোকাচিওর আগে।

যে সামাজিক নিবিড় অভিজ্ঞতা ও দরদী দৃষ্টি নিয়ে কথা সাহিত্যে বোকাচিওর তীক্ষ্ণ প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছিল তাতে পৃথিবীর কথাসাহিত্য এক নবীন প্রতিভার স্পর্শে চিরধন্য হতে পারতো। কিন্তু তেরশ' পঞ্চাশ খৃষ্টাব্দের কোনো এক বিশেষ দিনে এক বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেল—পরিচয় হল বোকাচিওর সঙ্গে তৎকালীন ইতালির শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ পেত্রার্কের। ব্যক্তিগত জীবনে ক্লাসিক সাহিত্যের নিরেট রসের মধ্যে ডুবে থেকে পরম পরিতৃপ্ত হলেও পৃথিবীর সাহিত্য বোকাচিওকে এরূপে দেখে ব্যথিত হল, যার কথা আগে বলেছি।

অতি-ব্যবহারে অধুনা রেনেসাঁস অভিধাটি স্বধর্মচ্যুত। একদা ইতালির ক্ষুদ্র-পরিসর স্থান অতিক্রম করে এ ইউরোপের অন্যান্য দেশকেও প্লাবিত করেছিল। তার স্বাক্ষর মুক্ত চিন্তায়-সাহিত্যেশিল্পে-ভাস্কর্যে বিধৃত। রেনেসাঁস যে আলোড়ন এনে দিল সেটা তখন তেমন করে অনুভূত হয় নি যেমন হয়েছিল পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের নিকটে। আধুনিক সভ্য ও সংস্কার-বিমুক্ত প্রগতিশীল বিশ্বের কাছে এটা একটা মস্ত বড় অবদান নিঃসন্দেহে, কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে এ জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল সার্বিকরূপে নয়, বুদ্ধিজীবীদের স্বল্প-পরিসর গণ্ডীতে। এ যেন বুদ্ধি-প্রসূত স্ফুরণ। ব্যষ্টি-মানুষের কাছে এটি অনুভূত হলেও সমষ্টির কাছে তেমন করে হয় নি, আর ক্ষীণ পরিমাণে হলেও আবেদনগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। অনেককিছুর পরিপূরক হয়েও কোথায় যেন বিরাট ফাঁক রয়ে গিয়েছে। বিশ্বমানবের চিরায়ত সমস্যাবাণীকে অকুণ্ঠ রূপদানেও কোথায় যেন দ্বিধা। এখানে দ্বারের মৃদু-উদঘাটন।

রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম লৌহ-আঘাত পড়ল ফরাসী বিপ্লবে। এ আঘাত শুধু রাজতন্ত্রের উৎপাটনেই স্থির রইল না,—সাহিত্যে আনল উচ্ছল জোয়ার। রুশো-মিরাবু-লাফায়েৎ ও শত-সহস্র জনগণের স্বপ্ন বাস্তব রূপ পেল। বাস্তিলের পতনে লুই একে বিদ্রোহ আখ্যা দিতে অন্য একজন দূরদ্রষ্টা তাঁর ভুল সংশোধন করে বলেছিলেন, এ বিপ্লব, শুধুমাত্র বিদ্রোহ নয়। এ বিপ্লব, শুধু একটি দেশকালের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ

না থেকে আধুনিক পৃথিবীর মুক্তির নবদ্বার উন্মোচন করল। জাতীয় বৈরীতাশেষে দেখা দিল বিশ্ব-মানবতা, মৈত্রীবন্ধন।

ফরাসী-বিপ্লবের প্রস্তুতি মানুষের অন্তর্জগতে বহুদিন হতেই সক্রিয় ছিল। আত্মিক ও দৈহিক উৎপীড়নে তার প্রকাশকাল দ্রুত হয়ে এল। তাই যখন ডাক এল তখন একটি উৎপীড়িত মানুষও ঘরের মধ্যে নিশ্চিন্ত বসে থাকতে পারল না। যে দুর্মদ শক্তি বাস্তিল-দুর্গ ধূলিসাৎ করল, সে শক্তি আরও শত বাস্তিল ধূলিসাৎ করতে পারত। উন্মাদনার প্রাবল্যে সামান্য কাজেও অতি-শক্তি ক্ষয়িত হল। আর এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে কিছুটা নৃশংসতাও দেখা গেল। কিন্তু এই জড়প্রাণে প্রাণরঙ্গময়তার আহ্বানে এটিও ছিল স্বাভাবিক। আর এই রক্তবন্যায় শিহরিত হয়েই ইংলণ্ডের কবি-দার্শনিক একে সঠিক মর্যাদা দিতে পারেন নি, কিন্তু বোধকরি অন্তরে এর প্রসারতাকে অস্বীকার করতে পারেন নি।

এ বিপ্লবের আশ্চর্য দান বহু-মানুষের মুক্তি। এ মুক্তি যেমন সমাজবন্ধনের তেমনি মানুষের মনোজগতেরও। রেনেসাঁসে দেখেছি মানবতাবোধের জন্ম হলেও কুণ্ঠাহীন পদক্ষেপ তখনও সহজ-দৃষ্ট নয়, আর সেখানে সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেশচেতনা ও সর্বজনীনতার অভাব। কিন্তু এই বিপ্লবে মানুষ পেল মুক্তির স্বাদ; শুধু বুদ্ধি জীবীদের মধ্যেই নয়, সাধারণের মধ্যেও অনেকদিনের না-মেটা ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটল। রেনেসাঁস ইতালির বাইরে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়লেও যে একাত্মতা সেখানে গড়ে উঠল সেটা বিশুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে।। আর ফরাসী-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অনেক মানুষের সঙ্গে অনেক মানুষের কেমন যেন একটা সহজ বন্ধন গড়ে উঠল।

বিপ্লব মানুষকে পরিবেশ-সচেতন করল। পরিবেশ-অচেতনতার মধ্যে সাধারণ মানুষের দরদী-শিল্পী জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। সাহিত্যের প্রাচীন ও একঘেয়ে রীতিকে অস্বীকার করে বিপ্লব-উত্তর-কালের শিল্পীরা 'মানুষের কবি' হলেন। সাহিত্যে হাটবাজারের মানুষের লাগল ভিড়। চেনা-জানা, অতি-পরিচিত মানুষের জীবনের কথাই সাহিত্যের উপজীব্য। পতিতা আর তার শুধু দেহ-সর্বস্বতা নিয়েই রূপায়িত হল না; তারও যে মানবিক বৃত্তি, ক্লেদাক্ত জীবনের প্রতি ঘৃণা ও কামোত্তীর্ণ ভালবাসার স্পৃহা থাকতে পারে তারই উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র প্রতিভাত হল। শ্রমিক যে এককালে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ ছিল, যন্ত্রের পেষণে আজ যে সে ব্যবহারে-কর্মে ভয়ঙ্কর—এরূপে দেখা দিল সহানুভূতি ও নবদৃষ্টি। মোটকথা সাহিত্যে পরিপূর্ণ মানুষ দেখা দিল—সে পতিতা নয়, শ্রমিক নয়, কশাই নয়, তার আরও বৃহৎ পরিচয়—সে মানুষ। এই উদ্বোধনই এর পটভূমি, এর বিস্তৃতি, এর গতি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তাই ফ্রান্সে দেখা দিল সাহিত্যের ঋষি-মণ্ডলী, মানুষের জয়গান প্রচারে যাঁদের কণ্ঠ অকুণ্ঠ। এত বড় স্বীকৃতি এর পূর্বে আর ঘটেনি। বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০,) ফ্লবেয়ার (১৮২১-১৮৮০), বোদলেয়ার (১৮২১-৮০) মালার্মে (১৮৪২-৯৮), পল ভার্লেন (১৮৪৪-৯৬), মোপাসা ১৮৫০-৯৩ প্রভৃতি বিপ্লব-উত্তর-কালের স্বতন্ত্র ভাবধারা প্রচারের অগ্রদূত। ফরাসী বিপ্লবের মাত্র কিছুদিন আগে একই সালে রুশো ও ভলেতেয়ারের মহাপ্রয়াণ ঘটলেও তাঁদের প্রভাব যেমন বিপ্লবকে ত্বরান্বিত ও সফল করেছিল উপযুক্ত কথা-শিল্পী ও কবিদের প্রভাবও তেমনি পরবর্তীকালের সাহিত্যের পথ নির্দেশ করেছে। ফরাসী সিমবলিজমের অন্যতম ধারক কবি মার্লামের প্রভাব তো সুবিদিত আর গুরু ফ্লবেয়ারের সর্বব্যাপী প্রভাব বহু আলোচিত।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিবৃত্ত তীব্র মানসিক যন্ত্রণার ব্যাপক ইতিহাস। আর স্বভা-

বত-কারণেই মনো-বিশ্লেষণের প্রতি অতি-উৎসুক্য। মনস্তত্ত্বের গূঢ় রহস্য সন্ধানে বিংশ-শতকের কথাশিল্পী অতিব্যস্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এর সুস্পষ্ট আভাস লক্ষিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এর পরিপূর্ণ বিকাশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই দেখা দিল রুশ বিপ্লব। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নবদৃষ্টি ও নববাদ-প্রচারে ও প্রতিষ্ঠায় এ বিপ্লব অবিস্মরণীয়। অন্যান্য বিপ্লব ইউরোপকে জাগরিত করলেও আফ্রিকা ও এশিয়ার মুক্তিডঙ্কা বাজাতে পারে নি। কিন্তু এই সর্বব্যাপী আলোড়ন ও জন-মুক্তির সকল আহবান এশিয়া আফ্রিকার ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করল। পথ ও দৃষ্টি হল প্রসারিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীকে এক ছাঁচে ঢেলে দিল। এত দেশ বাধ্য হল যুদ্ধের কবলে জড়িয়ে পড়তে। বৈজ্ঞানিক আবিস্কারে ও যাতায়াতের সুবিধায় পৃথিবীর এক অংশের মানুষ অন্যের সাথে সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধা পড়ল। আর তাই আজ একদেশের আন্দোলন, সে আন্দোলন সাহিত্যেই হোক আর সমাজ-জীবনেই হোক, অন্যদেশের মানুষকে ভাবিত ও প্রভাবিত করে তোলে। মানুষের জীবন-যাপন জটিলতর হল, নতুন সমস্যার জন্ম হল। আর এ সমস্যা বর্তমানে বিশ্বজনীন। ইউ-রোপে আমেরিকার সভ্যতা সংস্কৃতি অন্য দেশের বহুকালসঞ্চিত সংস্কৃতির মূলে আঘাত করল। কিছু সমাজ-হিতৈষী রক্ষণশীল একে রক্ষা করতে চাইলেও এর সর্বগ্রাসী প্রভাবকে প্রতিহত করতে পারলেন না।

এবং এই কারণেই আজকের কোনো দেশের উপন্যাসে বর্ণিত সমস্যা শুধু উল্লিখিত দেশের বা লেখকের দৃষ্ট সমস্যা নয়, পাত্র-পাত্রীর নাম উহ্য রাখলে যে জটিলতা, সে সমস্যা আজ প্রতিদেশের নাগরিকের। সভ্যতা আজ নগরে কেন্দ্রীভূত, তাই এ সত্য আরও প্রকটরূপে স্বীকৃত। উওম্যান অব রোম-এ একটি যুবতীর নীড় বাঁধবার আশা পরিবেশে ও সামাজিক অব্যবস্থায় কিভাবে ভেঙ্গে পড়ল তার চিত্র পাই। আর এরই পথ ধরে সে হয়ে উঠল দেহব্যবসায়ী। এ চিত্র আর এ ঘটনা তো আজ আমাদের দেশেও সংলক্ষ্য। আবার আলবার্তো জোরাভিয়ার অন্য উপন্যাস টু অ্যাডোলেসেন্স-এ ইতালির কৈশোর-জীবনের যে সমস্যা ও বক্রতা দেখা দিয়েছে, সেটি বহুলাংশে নাগরিক-জীবনে আর সর্ব-সমাজেই প্রযোজ্য। অপুকে রোমের পরিবেশে স্থাপন করলে বেমানান হবে, কারণ যুদ্ধ-পূর্বকালের প্রাচীন প্রকৃতিতে অপুর মনের প্রসার। কিন্তু আজকের দিনের সহর পরিবেশের কিশোরের মানসিকতা প্রায় সবদেশে একই। এখন সমাজ-বন্ধন অন্যরূপ নিয়েছে, প্রচলিত ব্যবহার-সিক্ত ধারণা উপেক্ষিত। অবশ্য এসকল কালের অবশ্যম্ভাবী ফসল।

পাশ্চাত্যের মনোবিশ্লেষণ, তনুক্ষুধা আর সমাজ-শিথিলতা এশিয়া ভূখণ্ডের সান্নিধ্যের মধ্যেও আবাস করে নিল, কারণ চিন্তা ও ব্যবহারে সমতা। সূক্ষ্ম শিল্প আর শুভ্র রুচির উপাসক জাপানী সাহিত্যিকরাও ও প্রভাব এড়াতে পারলেন না। তারই এক রূপ পাই তানিজাকির 'দি কি' উপন্যাসে। ডায়েরির আকারে স্বামী, স্ত্রী ও কন্যার যে মানসদ্বন্দ্ব ও মনোবিশ্লেষণ এখানে অঙ্কিত, তাতে লেখকের সামর্থের স্পষ্ট পরিচয় মুদ্রিত। স্ত্রী ইকুকোর তটভাঙ্গা দৈহিকক্ষুধা নির্লজ্জভাবে স্বামীকে উত্তেজিত করত যার ফলে দৈহিক-পরিশ্রমে তাকে বাধ্য করায় সে একদিন স্ত্রীর বুকে ঢলে পড়ে। কন্যা তোমিকা ও মা ইকুকোর উভয়ের প্রণয়ীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ আর এক চরম বিষাদের মধ্যে মা ও মেয়ের মিলন হয়।

মানসিক দ্বন্দ্ব বিবরণে মনোবিশ্লেষণে যুদ্ধোত্তর কালের এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। কিভাবে পূর্বের সেই অনায়াস শুচিতা, বাধ্য

হয়ে সমাজ-পরিবেশে ভেঙ্গে পড়ছে, স্বামী-স্ত্রীর ব্যবহারে সন্দেহ ও পারিবারিক জীবনে ক্লেদাক্ততা, মা-মেয়ের মধুর সম্বন্ধ কিভাবে বিলাসিতা আর অত্যধিক কামনায় জঘন্য রূপ নিচ্ছে আজকের দিনে তারই উজ্জ্বল রেখাচিত্র এই উপন্যাসটি। আর অশ্লীলতা আপেক্ষিক একথা বলেও ইকুকোর ব্যবহারের কথা মনে রেখেও বলা যায়—রিয়াল আর্ট ক্যান বি অবসিন উই দাউট বিয়িং পর্ণো-গ্রাফিক। সার্ত্রের ইনটিম্যাসি ছোট গল্পগুলো-তেও এধারার পরিচয় পরিস্ফুট।

বিশ্বের সাহিত্যিকদের মধ্যেও চলছে এই ভাবধারা। সকলের মধ্যে প্রায় এক অনুভূতি ব্যাপ্ত না হলে যেন ছন্দপতন ঘটল। তাই অনেকসময় একাত্মতা, এক-চিন্তার পারম্পর্য রক্ষা করতে গিয়ে পাশের অনেক বিরাট পরি-বর্তনও উপেক্ষিত পড়ে থাকে। যুদ্ধোত্তর কালের পাশ্চাত্য-সাহিত্য বাংলার সাহিত্যিক-দের যেভাবে প্রভাবিত করল, নিজ দেশের এক স্মরণীয় পরিবর্তনও তাদের সেভাবে আলো-ড়িত করতে পারে নি। যুদ্ধশেষে বাংলা-বিভাগে দৃশ্যপট পালটে গেল, সমাজে বিপুল পরিবর্তন এল, এক মিশ্র নতুন সমাজ গড়ে উঠল। পল্লীর সাধারণ মানুষ সহরের পরিবেশে প্রথম হতচকিত ও পরে অন্নত্যাগিদে অন্য রূপ নিল। এক আশ্চর্য পট-পরিবর্তন অকল্পনীয় উপেক্ষা, চরম হতাশা ও শোচনীয় দুর্দশার মধ্যেও সত্যকার মানুষের মত বাঁচবার অসীম আকুলতা, ব্যগ্রতা; কিন্তু চতুর্দিকের দৃঢ় ভূমির অভাব। এ বিভাগ সাহিত্যে যে অফুরন্ত উপাদান সংগৃহীত করে দিতে পারত, সেবিষয়ে আমাদের বাংলার সাহিত্যিকগণ রইলেন একেবারে অনবহিত। বিশ্বের দিকে দৃষ্টি রাখতে, তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এত বড় অবিস্মরণীয় পরি-বর্তন উপেক্ষিত হয়ে রইল। এটি ক্ষোভের কথা নিঃসন্দেহে; কিন্তু এর জন্য শিল্পীদের সর্বাংশে দোষারোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ আজকের দিনের বিশ্বের প্রবণতাই এই দিকে। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে, আমা-দের উন্নাসিকতা ও ইনটালেকচুয়াল স্নবারির উৎকট প্রকাশও এ বিষয়ে সক্রিয়।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

বিবিধার্থ অভিধান ॥ সুধীরচন্দ্র সরকার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

যে কোনও প্রাণময়ী শ্রীময়ী ভাষা আপন প্রাণ প্রবাহের ঐশ্বর্যে অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের আসরে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কোনও সাহিত্য ও ভাষার প্রাণ প্রবাহের উৎস সন্ধানে তার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বিশিষ্টার্থক শব্দ এবং বাক্যাংশের মূলধন, দেশজ শব্দ সম্ভার এবং অর্থ সঙ্কোচ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহারিক কার্যকারিতা, প্রবাদ ও প্রবচনের ভূমিকা অবশ্যই অন্যতম হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এবং যেহেতু ভাষার রক্তপ্রবাহে ইত্যাদি বিচিত্রতা সমন্বয় ভাষাকে আরো শ্যামল, উজ্জ্বল করে তোলার পক্ষে সহায়ক এবং যেহেতু উপরিউক্ত শ্রেণীর বিচিত্রতাসমন্বয় কোনো ভাষার গতিপ্রবাহকে অবরুদ্ধ করতে অপরাগ এবং ফলশ্রুতি হিসেবে বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগে ভাষাকে আরো ভাবসমৃদ্ধ, রূপময়, জরাত্তীর্ণ করে তোলে। বলা বহুল্য প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এই সমস্ত বিশিষ্টার্থক শব্দ সম্ভারের জন্ম। কোনও ভাষার প্রবাদ প্রবচন ও লোক সাহিত্যও এ জন্য সম পরিমাণে দায়ী। নতুন নতুন ভাবপ্রকাশের অন্যতম বাহন হলো এই নতুন বিশিষ্টার্থক শব্দ সম্ভার।

প্রত্যেক ঐশ্বর্যময়ী ভাষা তার আপনার বৈশিষ্ট্যময় বিশিষ্টার্থক শব্দ, প্রবাদ প্রবচন এবং অন্যান্য নানা ধরনের অর্থদ্যোতক ক্রিয়া বাচক, বিশেষ্য ও বিশেষণবাচক শব্দ ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ।

প্রত্যেক ভাষার শব্দ ভাণ্ডারের বিপুলতা তৎসহ স্বাভাবিক প্রয়োগরীতির বিবিধার্থ অর্থ দ্যোতনায় সেই ভাষার প্রাণপ্রবাহ তথা সজীবতাকেই ঘোষণা করে থাকে। যে কোনও সম্পদশালিনী ভাষার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই সত্য অবশ্য বর্তমান। এবং বলা বাহুল্য, সম্পদশালিনী যে কোনো ভাষার ইতিহাস অনুধাবন করলে এ সর্ত অবশ্যই প্রমাণিত হবে।

শব্দের বিবিধার্থ প্রয়োগ, অর্থ বিস্তার, প্রবাদ প্রবচনের একান্ত ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বিদেশে একাধিক সঙ্কলনের উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ভূমিকা অন্যতম, এবং বাংলা ভাষা তার আপনার অনন্য পারদর্শিতায় তার নিজস্ব শব্দ ভাণ্ডারকে অন্যান্য ভগিনীভাষার মধ্যে, পরন্তু বিশ্বের অন্যান্য ভাষার মধ্যে নিজের আসনকে স্বীয় ঐশ্বর্যে বিশিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত করে তুলেছে। বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য, ভাব ও ঐশ্বর্যের সম্মিলন, নতুনতর গতিপ্রবাহ আজ সর্বজন বন্দিত। প্রত্যেক সম্পদশালিনী ভাষার মতো বাংলা ভাষার বৈচিত্র্য, সৌন্দর্য, ভাব ও ঐশ্বর্যের নেপথ্যেও বিশিষ্টার্থক শব্দাবলী, নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন অর্থ দ্যোতক বাক্যাংশ, প্রবাদ প্রবচন, দেশজ শব্দ, লোক বচন, আগত বিভিন্ন দেশীয় শব্দ সম্ভার ক্রিয়াশীল। এমনি অনেক শব্দ ইডিয়ম, ফ্রেজ-এর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন ভাবপ্রকাশের সূত্র অচ্ছেদ্য, ক্ষেত্রবিশেষে তার

অর্থও ভিন্নতর। অনেকে সে সমস্ত শব্দের কাঠামো, ব্যবহারিক অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত এবং অনেকে আছেন যাদের কাছে সে সমস্ত শব্দের আন্তরধর্ম বা ভিতরের অর্থ সুস্পষ্ট নয়। অথচ আশ্চর্যের যে প্রতিটি বিশিষ্টার্থক শব্দের ভিতর ও বাইরের অর্থ অভিন্ন নয়, এবং যে হেতু কেবলমাত্র ব্যবহারিক দিক থেকে, দৈনন্দিন জীবনচর্যার সূত্রে সে সমস্ত শব্দাবলী আমাদের নিকট অপেক্ষাকৃত পরিচিত সে হেতু তার ব্যবহারিক দিক থেকে প্রতিভাত অর্থ সম্পর্কে আমরা অবহিত কিন্তু তার ভেতরকার অর্থ শব্দের জন্মসূত্র সাধারণের কাছে থেকে যায় অজ্ঞাত। অথচ ঐ সমস্ত শব্দাবলী ইত্যাদির ভেতরকার অর্থ, জন্মসূত্র সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে এক অদম্য কৌতূহল ও ঔৎসুক্য বর্তমান। 'বিবিধার্থ অভিধান' সাধারণ পাঠকের সেই কৌতূহল নিরসনে সহায়ক হবে।

'বিবিধার্থ অভিধান' নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য একটি সঙ্কলন। বাংলা ভাষায় বিশিষ্টার্থক শব্দাবলীর অপ্রতুলতা নেই এবং পাশাপাশি প্রবাদপ্রবচন, লোকবচন, অর্থ-দ্যোতক শব্দ ভান্ডারে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ। এ গুলির সঙ্গে আমরা অনেকেই হয়তো বা পরিচিত কিন্তু এ গুলি নানা ভাবে বাংলা ভাষার শাখা প্রশাখায়, সমাজ জীবনে এতদিন ছড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে ছিল। চয়ন করা কিছু বিশিষ্টার্থক শব্দ, ইডিয়ম-ফ্রেজ ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি সীমিত সংখ্যক পৃষ্ঠায় ছাত্রপাঠ্য হয়ে ব্যবহারিক জীবনে প্রবেশের অপেক্ষায় কালাতিপাত করতো; প্রবাদ প্রবচনকে কেন্দ্র করে সঙ্কলিত গ্রন্থের অসদ্ভাব অবশ্য নেই। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনের সাথে পরিচিত বিশিষ্টার্থক শব্দাবলী, প্রবাদ প্রবচন, প্রচলিত বিদেশী এবং ভিন্ প্রদেশী শব্দ, দেশজ শব্দ তৎসহ বিবিধ পরিভাষার মোটামুটি সংগ্রহের একত্রিত সমাজ বাংলা ভাষায় এই প্রথম। আক্ষরিক অর্থচেতনায় 'বিবিধার্থ অভিধান' নিঃসন্দেহে ভাবপ্রকাশের দর্পণ এবং বলা বাহুল্য তার অপেক্ষা বেশি কিছু। 'সাধারণতঃ অভিধান অর্থে আমরা বুঝি—কোন শব্দ বা বাক্যের প্রতিশব্দ বা অর্থ যে গ্রন্থে আছে। কিন্তু এই অভিধানকে এই পর্যায়ে ফেলিলে প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হইবে না। ইহার বিষয়, বস্তু ও শ্রেণীর বিভাগ স্বতন্ত্র, এবং এই স্বাতন্ত্র্যই এই অভিধানকে একটি বিশেষ শ্রেণীতে পরিণত করিয়াছে। এই সকল বিষয়বস্তু কিন্তু বাংলা ভাষার অন্তর্গত ও প্রত্যহ ব্যবহৃত। ইহারা ব্যাকরণে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বিভিন্ন দিক হইতে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই সকল নিত্যব্যবহার্য ও অত্যাবশ্যক বিষয়গুলিকে বন্টন ও শ্রেণীবদ্ধভাবে সংগ্রথন করিয়া এই অভিধান প্রকাশ করা হইয়াছে।'

এ জাতীয় সুষ্ঠু সঙ্কলন কর্মকান্ডে প্রয়াসী হওয়া নিঃসন্দেহে যত্ন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার। 'বিবিধার্থ অভিধানে'র সর্বাঙ্গে সেই সযত্ন প্রয়াস উৎসাহী পাঠক লক্ষ্য করবেন। বাংলায় এ জাতীয় একটি সঙ্কলনের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকালের, 'বিবিধার্থ অভিধান' প্রকাশের মাধ্যমে সেই অভাবের মীমাংসা হয়েছে বলা যেতে পারে। 'বিবিধার্থ অভিধানে'র বিষয় সমূহ বিবিধ অর্থসমেত মোটামুটি ভাবে কুড়িটি বিভাগে সন্নিবেশিত। বিশিষ্টার্থক শব্দ ও বাক্যাংশ; প্রবাদ ও প্রবচন; দেবদেবী, নাম, স্থান ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত বিশিষ্টার্থক শব্দ বা প্রবাদ; বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ; এই ভাষায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক শব্দ; বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বাচক শব্দ তৎসহ সমষ্টিগত জিনিসের নাম; শব্দদ্বৈত; প্রতিচর শব্দ এবং উপচর বা বিকার শব্দ; বিপরীতার্থক যুগ্মশব্দ; বিভিন্ন শব্দ, প্রকার পশুপাখির ডাক বা আওয়াজ, নানা বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি, নানা ধরনের পদক্ষেপের আওয়াজ, শব্দধ্বনির বিচিত্রতা,

মধুরতা, কর্কশতা, কোমলতা জ্ঞাপক বিম্ব-মূলক শব্দসম্ভার; বাংলা শব্দের বিকৃত এবং গ্রাম্যরূপ; যুদ্ধোত্তর কালে অনুপ্রবেশিত নতুন বাংলা শব্দ; রাজনৈতিক, সাংবাদিক প্রভৃতি পরিভাষা; বাংলা কক্‌নি বা অপশব্দ; নানা ভাষার সংমিশ্রণে জাত ইঙ্গ-ভারতীয় শব্দ; তৎসহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার-উদ্ভাবিত পরিভাষা-সংগ্রহ ইত্যাদি পর্যায়ে প্রায় পঁচিশ হাজার শব্দ আলোচ্য সঙ্কলনে স্থান লাভ করেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বিভিন্ন কারণে ভারতের মাটিতে নানা জাতির পদচারণা ঘটেছে। এবং ফলত সেই সমস্ত দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির কিছু স্বাক্ষর নানাভাবে এ দেশে থেকে গেছে। এর ভেতরে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ভাব প্রকাশের মাধ্যম অর্থাৎ ভাষা। বাণিজ্যিক যোগসাধন বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক কোনও দেশের আগত শব্দ বা ভাষার প্রভাব সেই দেশের ওপর অনিবার্য ভাবে কিঞ্চিৎ বিস্তার লাভ করে। ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে বিদেশী শব্দকে একান্ত নিজস্ব করে নেওয়ার পটুত্ব বাংলা ভাষার যতখানি ততখানি অন্য ভাষায় অনুপস্থিত। সংস্কারমুক্ত বলেই বাংলা ভাষা অল্প সময়ের মধ্যেই তার শব্দভাণ্ডারকে বিচিত্রতর করে তুলতে পেরেছে। বাংলা ভাষায় এমন অনেক বিদেশী শব্দ আছে যা বর্তমানে বাংলা ভাষার সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছে এবং অনেকে হয়তো যথেষ্ট অবহিত নন যে ঐ গুলি আগন্তুক শব্দ বা অন্য কোনও দেশের মাটিতে এর প্রথম আবির্ভাব। বাংলার শব্দ ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ইংরেজি, আরবী, ফারসী, ওলন্দাজ, ফরাসী পোর্তুগীজ, জাপান, বর্মী, চীনা, গ্রীক প্রভৃতি শব্দ বর্তমান। দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত যার আদি উৎস আমাদের অনেকের কাছে হয়তো অজানা। উৎসাহী পাঠক সেই বহু-পরিচিত শব্দের (আগন্তুক শব্দ) উৎসভূমির পরিচয় জানতে পারলে নিশ্চয়ই কৌতূহল অনুভব করবেন। অবাহুল্য বিবেচনায় বাংলায় পরিবেশিত অল্প কয়েকটি অতিপরি-চিত আগন্তুক শব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে : গ্যারাজ, সাবান—ফরাসী; ইস্পাত, কেরানী—পর্তুগীজ (ইস্পাত আবার গ্রীক শব্দও বটে); দাম (অর্থাৎ মূল্য)—গ্রীক: ইশারা, কারিগর—আরবী; আমদানি, জঙ্গী, বন্দর—ফারসী; লিচু, চা—চীনা; রিকস—জাপানী; রোয়াক, তোপ, বন্দুক—তুর্কী; এ ছাড়া বহু সংখ্যক বহুপরিচিত ইংরেজি শব্দ তো রয়েছেই।

"বিবিধার্থ অভিধান" প্রকৃত প্রস্তাবে একটি সুসম্পাদিত সঙ্কলন। "পৌরাণিক অভিধান" সঙ্কলনের ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় যে নিষ্ঠা এবং গবেষকের কর্ম-কুশলতা প্রদান করেছিলেন আলোচ্য সঙ্কলনের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। শব্দ নির্বাচন এবং বিষয়বিভাগের দিক থেকে শ্রীযুক্ত সরকারের পর্যায়ক্রম রীতিটি প্রশংসনীয়। বলাবাহুল্য বিবিধার্থ অভিধান মারফৎ বঙ্গভাষার একটি স্থায়ী উপকার সাধিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীর পাশাপাশি সাধারণ পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি যে এই সঙ্কলন গ্রন্থ সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন তা গ্রন্থের শব্দ নির্বাচন তৎসহ বিষয়ক্রমের পরিচয় প্রদান রীতির মধ্যেই বিধৃত। উল্লেখ প্রয়োজন, প্রবাদ প্রবচন পর্যায়ক্রমে বহু পরিচিত কিছু কিছু প্রব-চনের অনুপস্থিতি আলোচ্য সঙ্কলনে পাঠক লক্ষ্য করতে পারেন; নিরানব্বইয়ের ধাক্কা; বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরো; পুড়িলে নগর দেবালয় কি এড়ায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। আশা করা যায়, পরবর্তী সংস্করণে শ্রীযুক্ত সরকার অনুপস্থিত অন্যান্য শব্দাবলী, প্রবাদ প্রবচন ইত্যাদির সংযোগ সাধন করিবেন। গবেষক, উৎসাহী পাঠকের নিকট বিবিধার্থ অভিধান পরম সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে। "বিবি-

ধার্থ অভিধান" সম্মুদ্রিত; গ্রন্থসজ্জা প্রথম শ্রেণীর। পৌরাণিক অভিধানের মতো এক্ষেত্রেও সংকলক শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার বঙ্গভাষার পাঠকদের অজস্র অভিনন্দনের অধিকারী হবেন বলা যেতে পারে।

মলয়শংকর দাশগুপ্ত

বাঙালী ॥ প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা। ছয় টাকা।

বাঙালীর ইতিহাস নেই—বঙ্কিমচন্দ্র একদিন অতিদুঃখে বলেছিলেন। কিন্তু তারপর বহুদিন কেটে গেছে—ইতিহাস আলোচনায় বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীরা দিনের পর দিন নতুন নতুন দ্বার খুলে লুপ্ত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার করে বাংলার একটা মোটামুটি ইতিহাস গড়ে তুলেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে একালে যদুনাথ সরকার পর্যন্ত কত লেখক কত যে অজানা অতীতকে পরিক্রমণ করলেন তার শেষ নেই। এই সব ইতিহাসের অধিকাংশই কিন্তু ইতিহাসবেত্তাদের জন্যে। যদিও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষা ছিল সরল তবু তাঁর বিষয়বস্তুও সাধারণের জন্যে নয়। তাই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ইতিহাসের বোধ ও ধারণা এই সব লেখকদের লেখা থেকে জন্মায় না। ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাসের কতকগুলি নাম মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু বাঙ্গালীর মনোজগতে বাংলাদেশ যে দূরে সেই দূরেই থেকে যায়।

এমন একটি বইয়ের দরকার ছিল যা তথ্যসম্ভার মাত্র নয়, শুধু রাজবংশতালিকা নয় শুধু উন্মত্ত সৈন্যদলের লুটতরাজের ছবি নয়, যার মধ্যে বাংলা দেশের যথার্থ প্রাণ প্রবাহ অনুভব করা যাবে অথচ যা অপণ্ডিতের পক্ষে সহজগ্রাহ্য হবে। প্রবোধচন্দ্র ঘোষের বাঙালী সেই জাতীয় গ্রন্থ যা পড়তে গিয়ে পদে পদে অজানা নাম আর তত্ত্বের বাধায় হোঁচট খেতে হয়না—নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কাহিনীর মত অবলীলাক্রমে প্রায় দুশো পাতা পার হয়ে যাওয়া যায়। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ও সামাজিক ইতিহাসকে লেখক দুটি খণ্ডে ভাগ করে দিয়েছেন। তাতেও সাধারণ পাঠকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি যে কত মনোযোগী তা বোঝা গেল।

পুরাবৃত্ত আলোচনায় লেখকের নিজস্বতা ফলাবার কোন চেষ্টা নেই—সেটাই স্বাভাবিক। এত অল্প পরিসরে নিজস্ব একটা মতামত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা না করাই ভাল—তা ছাড়া পুরোনো ইতিহাসের চেয়ে আধুনিক কালই আমাদের চিন্তিত করছে বেশী। লেখক দ্বিধাবিভক্ত বাংলার সমস্যাগত যে আলোচনা করেছেন তা সত্যিই উল্লেখযোগ্য। ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় পাঠক ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন, যে আলোচনাটি আছে তা যেমন অন্তর্ভেদী তেমনি গভীর। অথচ রচনার সরলতায় এবং প্রসাদগুণে তার আবেদন শুধু ঐতিহাসিক সত্যের নয়, মানবতারও।

যাই হোক বাঙ্গালী সাধারণ পাঠকের মতো ইতিহাস গ্রন্থ এটি। এটি স্কুল কলেজের ছেলেদের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এবং এ জাতীয় গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি বলেই এ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য অল্পতর হোক এই যুক্তি সমর্থন করি।

সহজে এই জাতীয় বই যদি পৌঁছায় বাংলার ছাত্র ও যুবকসমাজের হাতে তবে হয়তো দেশের দিকে দৃষ্টি একটু ফিরবে—সে দৃষ্টি উন্মত্ত ভাবালুতা হবে না তারই মধ্যে জাগবে বিচার বুদ্ধি ও বিবেক। যদি এ কামনার শতাংশের একাংশও পূর্ণ হয়—সেই হবে লেখকের পুরস্কার।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

আমার ঘরের আশেপাশে ॥ ডঃ তারকমোহন দাস। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী। কলিকাতা। ৫ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন নাটক গল্প এবং কবিতা নিয়ে এই দুঃখ রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার যেটা রসের দিক সেটাতে তাঁর যেমন স্বাভাবিক অধিকার ছিল তেমনি যেটা শক্তির দিক সেটাতেও তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। বুদ্ধি জাগবে, বিচার শক্তি সক্রিয় হবে, নানাভাবে মন সচেতন হবে—জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা আলোচনার দ্বার খুলে যাবে এই ছিল রবীন্দ্রনাথের একান্ত কামনা। তিনি নিজেও তাই সমাজ, ইতিহাস, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের উপরে সহজ লোকবোধ্য গ্রন্থ লিখে নতুন আদর্শও ধরে দিয়ে গেছেন।

তারপর থেকে বাংলাভাষার কিছু কিছু বই লেখা হয়েছে সেইজাতের যাকে ইংরাজীতে বলে popular science. আলোচ্য গ্রন্থটি সেইজাতের বললে যেন সব বলা হবেনা। লেখক যে শুধু গাছপালার গঠন, তাদের ল্যাটিন নাম, উপকারিতা দেখিয়েছেন তাই নয়, তিনি তারই মধ্যে মধ্যে কাব্যের উল্লেখ, পৌরাণিক পটভূমিকার নির্ণয়, এবং বাংলার প্রকৃতিতে গাছপালার শোভা ও সৌন্দর্যের মনোরম আলোচনা করেছেন। আমার ঘরের আশেপাশে নামকরণটিই লেখকের কাব্যিক মনোভাবের পরিচয় বহন করছে। অতি কাছে আছে বলেই, অতি অবহেলাতেও বেড়ে ওঠে বলেই এদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট মমতা নেই। আমাদের আশেপাশের বৃক্ষজগত যে কত সজীব কত প্রাণচঞ্চল তার কতটুকু হিসাবেই বা আমরা রাখি। লেখক সেই চিরদিনের অতিপরিচিত বন্ধুগুলিকে আমাদের কাছে আর একবার এনে দিয়েছেন।

ভূমিকার 'উদ্ভিদ বিষয়ে আমাদের উত্তরাধিকার' অংশে লেখা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে, মহাকাব্যে কালিদাসের কাব্যে ফুলের বহুল ব্যবহার সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা শুধু বৃক্ষলতার সৌন্দর্যের প্রতি সচেতন ছিলেন তাই নয়—তাঁরা উদ্ভিদের জীবনতত্ত্ব, তাদের ব্যবহাররীতি ও গুণাগুণ সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। অতীত ভারতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা দুহাজার গাছের নাম জানতেন, ভেষজ হিসাবেই নাকি ঋগবদে ১০৭ রকম উদ্ভিদের উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের পরে চরক ও সুশ্রুতের যুগে এই জ্ঞান পেঁৗছেছিল উত্তুংগ শিখরে।

ফুল ও ফলের গাছ এবং ছত্রাক নিয়ে প্রায় ৫০টি নানাধরণের উদ্ভিদের আলোচনা এ গ্রন্থে আছে।

বর্তমান কলকাতা শহরের ছেলেরা বোধহয় পাঁচটি গাছেরও নাম জানেনা। তাদের গাছের সংগে পরিচয় টবে বসানো ফুলগাছ পর্যন্তই। বাকী যে সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ তা শুধু কাব্যবচন মাত্র—সে দেশের সংগে এদের পরিচয় নেই। যারা গ্রামাঞ্চলের ছেলে তারা কিছু গাছ চেনে এইমাত্র কিন্তু এই নীরব চিরসুহৃদ প্রতিবেশীটির প্রতি এদেরও যে খুব একটা দরদ আছে তা নেই। এই বই যদি কেউ মন দিয়ে পড়ে সে যে শুধু জ্ঞানলাভ করবে তা নয়, গাছপালাকে ভালবাসতেও শিখবে। লেখকের সার্থকতা সেইখানে। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি নিয়ে বই লিখতে বসেন নি তিনি ভালবাসা দিয়ে লিখেছেন তাই এ রচনা পাঠক মাত্রেরই বুদ্ধিকে নাড়াবে এবং হৃদয় জয় করবে। বইটির ছাপা ভাল, গাছপালার বহু ছবিতে কৌতুহল জাগানোর এবং নিবৃত্ত করানোর উপায় আছে।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীনন্দলাল বসু॥ কানাই সামন্ত। কথা-শিল্প প্রকাশ, ১৯নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে ছয় টাকা।

গত বৎসর অঘ্রাণ মাসে আচার্য নন্দলাল আশী বছরে পা দিয়েছেন,— সেই উপলক্ষে তাঁর ভক্তশিষ্য, কবি ও শিল্প সাহিত্য-সমালোচক শ্রীকানাই সামন্ত গুরু প্রণামী হিসাবে এই গ্রন্থখানি উপস্থিত করেছেন। গ্রন্থখানিকে ঠিক চরিত-কথা বলা চলে না; এতে জীবন-কথা অবশ্যই আলোচিত হয়েছে কিন্তু সেটা এর মুখ্য বিষয় নয়। আচার্য বসুর শিল্প প্রতিভার অঙ্কুরণ,, উন্মেষ, বিবর্তন ও পরিণতি বোঝাবার জন্যে যতটুকু চরিত্র-কথা আলোচনা না করলেই চলে না, তার বেশী এ-গ্রন্থে নাই। গ্রন্থের সূচীপত্র থেকেই তার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থের প্রবেশক হিসাবে প্রথমে এসেছে 'রূপরাগের কবি চিত্রকর' শীর্ষক একটি কবিতা, ভাষায়-রচা একটি ছবি। তাতে আচার্য নন্দলালকে পরিস্ফুট করা হয়েছে তাঁর বিশিষ্ট পরিবেশের মধ্যে। ঐ বিশেষ পরিবেশের বাইরে দেখলে সাধক নন্দলালকে যেন ঠিকমত বোঝা যায় না। এই প্রবেশকের পর ক্রমান্বয়ে এসেছে; জীবন-কথা, প্রতিভা ও রূপশৈলী, নূতন রূপকৃতি; নূতন তাৎপর্য —এই চারটি প্রবন্ধ। এই চারটিতেই মুখ্যতঃ নন্দলালের শিল্প-প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষে এসেছে ঃ চিত্রপঞ্জী— শিল্পীর রচনার একটা তথ্য-সমৃদ্ধ তালিকা। নন্দলাল তাঁর দীর্ঘ জীবনে নানা আঙ্গিকে বহু এবং বিচিত্র শিল্পকর্ম করেছেন—তার অনেকগুলিই এখন কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টির বাইরে। সুতরাং এই পঞ্জীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থকার তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্যে এই গ্রন্থমধ্যে আচার্য-কৃত যে ছবিগুলি সন্নিবিষ্ট করেছেন—সংখ্যায় মোট ঊনিশটি, তার মধ্যে পনেরো খানি পূর্ণ পৃষ্ঠায় এবং দুখানি রঙীন—সেগুলি যে সুনির্বাচিত, শিল্পীর প্রতিভার বিশেষত্ব-সূচক, এ-কথা নিঃশংসয়ে বলা চলে।

এ তো গেল গ্রন্থের বাহ্য পরিচয়। এখন এর ভিতরে প্রবেশ করা যাক্। কথাটা ঠিক বলা হল না; বই-এর পরিচয় বই-ই দেবে,— বইখানি পড়তে পড়তে, প্রসঙ্গত, আমাদের মনে যে-সব চিন্তা, তর্ক উঠেছে এবার আমরা তার কথাই বলব।

ঊনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের আরম্ভের কালটা ছিল বাংলাদেশের হৃদ কমলের দল মেলার কাল। সে সময় বাঙালী কবি গেয়েছিলেন ঃ বাংলা দেশের হৃদয়

হতে কখন আপনি
বাহির হয়ে এলে জননী!—

বঙ্কিমের মানসী মাতৃমূর্তি একটা নাতি-স্পষ্ট ভাবমূর্তি নিয়ে নেমে এসেছিল বাঙালীর হৃদয়ে। বাঙালীর সত্তা সক্রিয় হয়ে ওঠে বুদ্ধির মাধ্যমে ততটা নয়, যতটা তার হৃদয়ের মাধ্যমে। সে-সময় সমগ্র জাতটাই যেন কী-এক অজানা প্রকাশ বেদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। সে চাঞ্চল্যের একটা অতুলনীয় প্রকাশ আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায়। বাঙালী সেদিন একটা ডাক শুনেছিল, কিন্তু; কার ডাক, কেন সে-ডাক, তা বোঝে নাই ঃ—'কে সে? জানি না কে।'— যাক্ সে-কথা। সে দিনের সেই অস্পষ্ট ভাবমূর্তি—ভাব-শক্তি বলাই—যাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার মধ্যে একটা দৃঢ় আশ্রয় পেয়েছিল, আচার্য নন্দলাল তাঁদেরই অন্যতম, সম্ভবতঃ কনিষ্ঠতম। এই হিসেবে তিনি তাঁর নিজ জাতির যুগের শিল্পী, কিন্তু যে ভাব-মূর্তি তাঁর শিল্পে আশ্রয় খুঁজেছে এবং পেয়েছে, সেটা দেশ-কালের-মধ্যে-সংঘটিত হয়েও দেশাতীত এবং কালাতীত বলে নন্দলালকে কোনোমতেই সঙ্কীর্ণ-অর্থে জাতীয় বা যুগীয় বলা চলে না। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র-অরবিন্দ, অবনীন্দ্র-নন্দলাল—সেদিনের ভাবশক্তি এই সব যাঁদের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের

কেউই সঙ্কীর্ণ-অর্থে জাতীয় বা যুগীয় ন'ন। এই কারণেই। বর্তমান ভারতের যে-কোনো রূপকারের তুলনায় অবনীন্দ্র-নন্দলালকে একটা বিশেষ এবং স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্রষ্টা বলা চলে। এ'রা হচ্ছেন এদেশের ও একালের শিল্প-লোকের 'মহাজন'—'মাস্টার'।

শিল্প-প্রীতির উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছিলেন নন্দলাল,—সে প্রীতি দানা বাঁধতে পেরেছিল অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্বলাভ ক'রে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্কটা ছিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্পর্কের মত—অতি সহজ, অতি-মধুর; শিষ্যের প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যকে চিরদিন শ্রদ্ধা করেছেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্র ও নন্দলালের প্রতিভার পার্থক্য, বিশেষতা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন শ্রীসামন্ত। সেটা তো আলোচ্য গ্রন্থেই পাওয়া যাবে; এ সম্পর্কে আমাদের যা মনে হয় সেটাই এখানে বলা যাক্।

নন্দলালের প্রকৃতি অবনীন্দ্রনাথের থেকে স্বতন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণ-চঞ্চল কৌতূহলী শিশু, যা ভালো লাগত তাঁর, তার মধ্যে ডুব দেবার একটা শক্তি নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। নন্দলালের মধ্যে আছে এক ধ্যানীপুরুষ—অন্তরের অন্তস্তলে আভাসে-জানাকে তিনি স্পষ্ট করে চলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ—ঠাকুরবাড়ীর বিশেষ আবহাওয়ায়, বিশেষতঃ দেবেন্দ্র-নাথের প্রভাববশতঃ—সৌন্দর্যভোগকে উপাসনার মত করে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। নন্দলাল তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতির অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট রূপ দেওয়া তাগিদে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ সুন্দরকে দেখে তার রূপ চাখ্‌তে চাখ্‌তে আত্মোপলব্ধি করেছিলেন, সুন্দরের ঐশ্বর্যময় রূপ তাঁকে মুগ্ধ করত। নন্দলাল আত্মোপলব্ধি করার তাগিদে রূপের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে তাঁর তুলিতে রূপ ক্রমেই সহজতর সরলতর হয়ে এসেছে। পুরানের গল্পই রামকৃষ্ণের মুখে শোনা গেছে-কিন্তু এ দুয়ের স্বাদ বিভিন্ন; অবনীন্দ্রনাথে ছিল পুরানের ঐশ্বর্য, বর্ণাঢ্যতা, আভিজাত্য; নন্দলালের মধ্যে পাই সরল সহজ হওয়ার সাধনা। অবনীন্দ্র ও নন্দলাল দুজনেই মহাশিল্পী, কিন্তু দুই রকমের। আর এক কথা। ঠাকুরবাড়ীর আবহাওয়ার জন্যে, ব্রাহ্ম-সংস্কারের জন্যে, আন্তরিক স্বাদেশিকতা সত্ত্বেও অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবেই পরিচিত হয়েছিলেন কিছুটা বাইরে থেকে; নন্দলালের মধ্যে দিয়ে যে-সংস্কৃতি অনেক সহজে প্রবাহিত হয়েছে। এদেশের লোকজনকে অবনীনাথ জেনেছিলাম আলগোছে; নন্দলাল তার মধ্যে থেকে। এই মধ্যে থেকে বোধ-করা একদিক থেকে যেমন স্বাভাবিক তেমনি অন্যদিক থেকে অতি-কঠিনও।

শ্রীসামন্ত ঠিকই বলেছেন, দেশবিদেশের বহু শিল্পীসাহিত্যিক এটা লক্ষ্যও করেছেন—যে কোনো শিল্পীর মূল বিষয় হচ্ছে একটি, ধ্যানের নিভৃত ধন হচ্ছে একটি। শিল্পী তাকে বিচিত্রভাবে রূপ দিয়ে ধরতে চায় তার পূর্ণরূপটা। নন্দলালের মূল বিষয় হল—শিব—গ্রামের কুমোরবাড়ীতে বসে যার মূর্তি গড়া শিখেছিলেন। সেই শিবকেই তিনি দেখে চলেছেন তাঁর পবিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তা সে ছবি গাছেরই হোক আর ছাগলেরই হোক।

আর কথা বাড়াব না। নন্দলালকে জানা হচ্ছে যে-কোনো মানুষেরা পক্ষে, বিশেষতঃ ভারতীয়র পক্ষে একটা শিক্ষা। শ্রীসামন্ত তাঁর গ্রন্থে চমৎকার সাহিত্যিক ভাষার এবং সুসঙ্গত যুক্তি-যুক্ত বিন্যাসের দ্বারা নন্দলালকে জানার কিছু ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্যে বাঙালী রসিক মাত্রই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

শুভেন্দু ঘোষ

বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর : স্বাধীন সুলতানদের আমল ॥ সুখময় মুখোপাধ্যায় পরিবেশক : ভারতী বুক স্টল। কলিকাতা। মূল্য ১৩·৫০ নঃ পঃ

বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রই বোধ হয় সর্বপ্রথম আলোচনার সূত্রপাত করেন। কিন্তু সেই আলোচনা প্রধানতঃ একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়েছে, তাতে মুসলমানদের কথা অনুল্লেখিত থেকে গিয়েছে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় সিরাজদ্দৌলার গুণগান করেছেন যদিও পরবর্তী গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে উক্ত রোমান্টিক নবাব একটি পরিপূর্ণ পাষন্ড ছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা দেশে মুসলমান আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনার পথিকৃৎ। অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় বাংলা দেশের প্রামাণ্য ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' মুসলমান যুগের প্রাক্-কালে এনে সমাপ্ত করেছেন। মুসলমান আমলের ইতিহাস রচনার প্রতিশ্রুতি তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় দিয়েছিলেন কিন্তু তা এখনো পূরণ করা হয়নি। লক্ষ্মণ সেনের আমলেই বাংলা দেশ মুসলমানের কবলে যেতে আরম্ভ করে। তারপর থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রায় প্রথমার্ধ পর্যন্ত দিল্লীর বাদশাহদের নিয়ন্ত্রনাধীনে বাংলা দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। যদিও তাকে শাসন- ব্যবস্থা না বলে অবাধ লুন্ঠন ও হত্যার ব্যাপক ব্যবস্থা বলাই ভাল। বাংলা দেশের জলবায়ু এবং ভূমিপ্রকৃতিতে কিছু স্বাতন্ত্র্যের উপাদান রয়েছে। তাই আমরা দেখি যে, বাংলা দেশ কখনই দিল্লী বা আগ্রার অবাধ আধিপত্য নির্বিবাদে মেনে নেয়নি। সুযোগ পেলেই সে তার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে। ইংরেজ আমলেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বাংলা দেশে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৩৩৮ খৃীষ্টাব্দে ফাখরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন থেকে সুরু করে ১৫৩৮ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত গিয়াসুদ্দীন মাহ্-মুদ শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত পুরোপুরি দুশো বছর বাংলাদেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। বাংলা দেশের এই দুশো বছরের ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বাঙ্গালীর এক গৌরবময় যুগ। ঐ সময়েই বাঙ্গালীর ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মানস প্রবণতা এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস রচনার পক্ষে ঐ যুগটির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যুগের ইতিহাস এতাবৎকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় এই যুগের প্রমাণ্য ইতিহাস রচনা করে ইতিহাস-সচেতনতার অভাব সম্পর্কে বাঙ্গালীর যে দুরপনেয় কলঙ্ক রয়েছে তার অপনোদন করেছেন। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থ বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে মুঘল যুগের অব্যবহিত পূর্বে শেরশাহের অধিকার পর্যন্ত বাংলা দেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।

সুখময়বাবু তাঁর আলোচনাকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগে ১৩৩৮ খৃীষ্টাব্দে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহের রাজত্বকালের প্রারম্ভ থেকে ১৪১৫ খৃীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের শাসনকাল পর্যন্ত বাংলা দেশের তথাকথিত তমসাচ্ছন্ন যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে রাজা গণেশের আমল থেকে ১৫৩৮ খৃীষ্টাব্দে হোসেন শাহী বংশের অন্তিমকাল পর্যন্ত আলোচনা সন্নিবদ্ধ হয়েছে। ভাগীরথী-পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত বিশাল এই দেশে দুশো বছর রাজত্ব করেছেন স্বাধীন সুলতানরা। অমিত শক্তি আর অদম্য পুরুষাকারের বলে তাঁরা ছিন্ন করেছিলেন দিল্লীর

অধীনতা-পাশ, উদ্দীপ্ত তেজে তাঁরা উড়িয়ে ছিলেন নিজেদের বৈজয়ন্তী পতাকা। এই অধ্যায়টিতে অভিনব, কত বিচিত্র, কত চমকপ্রদ ঘটনার সমারোহ। কত জয়ের, কত কীর্তির, কত গৌরবের কাহিনী। সুলতানরাও কত অসামান্য প্রকৃতির। তাদের ইতিহাস পড়লে মনে হবে যেন নানা বিচিত্র চরিত্রের এক উজ্জ্বল শোভাযাত্রা চলেছে। কিন্তু এই যুগের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সময়ই বাংলাসাহিত্যের উল্লেখজনক বিকাশ ঘটে। এই সময়ে যেসব শক্তিশালী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে তাঁদের অনেকেই তৎকালীন শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুখময়বাবু এই যুগের বাংলার ইতিহাসরচনায় এইসব সাহিত্যিকদের রচনার উপরেই প্রধানভাবে নির্ভর করেছেন।

অনেকেরই ধারনা এই যে, বাংলা দেশে মুসলমান যুগের ইতিহাস রচনা করতে গেলে আরবী, পারসীতে লেখা মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণই একমাত্র আশ্রয়স্থল। সুখময়বাবু এই ভ্রান্ত ধারনার অপনোদন করেছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকদের বিবরণী তিনি উপেক্ষা করেননি, বরং গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের বিবরণ তিনি যাচাই করেছেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলি, চৈতন্যজীবনীগ্রন্থগুলি এবং এই জাতীয় অন্যান্য গ্রন্থই যে বাংলাদেশের সামাজিক তথা রাজনৈতিক ইতিহাস নির্মাণের প্রধান উপকরণ তা অভ্রান্ত যুক্তি ও তথ্য দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে গ্রন্থকার তার "রাজা গণেশের আমল" এবং "কৃত্তিবাস পরিচয়" গ্রন্থে বাংলার সামাজিক ইতিহাস-রচনার আলোচনার যে সূত্রপাত ঘটান বক্ষ্যমান গ্রন্থে সুবিস্তৃত (ছয় শতাধিক পৃষ্ঠা) পরিসরে তার সৌধ নির্মাণ করেছেন।

সুখময়বাবুর এই গ্রন্থ বাংলা দেশ তথা বাঙ্গালী জাতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের দিক নির্দেশের দাবী রাখে। বাঙ্গালীর রাজনীতি, ধর্মাচার, লোকাচার, সাহিত্যিক-প্রচেষ্টা, তার ভীরুতা ও সাহসিকতা প্রভৃতি সবকিছুই এই গ্রন্থে অকাট্য তথ্যের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস যে শুধু রাজা-রাজড়ার কাহিনী নয় তা বোধ হয় বাংলা ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থে এই প্রথম সার্থকভাবে জানা গেল। সুবিপুল এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয় এই আলোচনায় তুলে ধরা সম্ভবপর নয়। তবে এর দুয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হোসেন শাহ সম্বন্ধে সকলই বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র-গবেষকবৃন্দ একটি স্বপ্নময় রোমান্টিক ধারণা পোষণ করে থাকেন তাঁরা এই ধারণার বীজটিকে ক্রমশঃ বৃহৎ মহীরুহে পরিণত করে তাকে পত্রে-পুষ্পে সুশোভিত করে তুলেছেন। "হোসেনশাহী আমল" নামে একটি অধ্যায় যোজনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই তথাকথিত মহানুভব ব্যক্তিটিকে তাঁরা অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের বিধাতা এই ব্যক্তিটি সম্পর্কে অন্যরকম সাক্ষ্য-প্রমাণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। হোসেন শাহ যে ঘোরতর অত্যাচারী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন সুখময়বাবু অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন। সুখময়বাবুর গ্রন্থের ভূমিকায় দিকপাল ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসলেখকেরা যে কাল্পনিক কাহিনী ইতিহাস বলে চালিয়ে এসেছেন আলোচ্যগ্রন্থে তা একেবারে ভূমিসাৎ হয়েছে। এটি গ্রন্থকারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক অবদান বলে মনে করি। ডক্টর মজুমদার এই তরুণ অধ্যাপকের গবেষণাকার্যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেছেন—'আলোচ্যগ্রন্থে গ্রন্থকার যে সকল নূতন তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন এবং জটিল ঐতিহাসিক সমস্যাগুলি যেরূপ নিপুণভাবে ও যুক্তির সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাসে তাঁকে

একজন বিশেষজ্ঞ বলে অভিনন্দিত কর্তে কারও কিছুমাত্র কুণ্ঠা হবেনা বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।"

বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। ইতিপূর্বে বাংলা দেশের ইতিহাস সম্পর্কে একখানি গ্রন্থে স্যার যদুনাথ সরকারের ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থখানি প্রকাশের পূর্বেই ঐ ভূমিকালিপিটি কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রভূত ঢক্কানিনাদের সংগে প্রচারিত হয়। ফলে গ্রন্থটির ভাগ্যে একটি মোটা অঙ্কের পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকাও ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থকারের যদি বিষয়বুদ্ধি থাকত তবে এই মূল্যবান ভূমিকাটিকে তিনি নানাভাবে কাজে লাগাতে পারতেন।

উপসংহারে একটি উপদেশ দিতে চাই। বাংলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি, বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা যেন এই অমূল্য গ্রন্থখানি একবার উল্টেপাল্টে দেখেন। অত্যন্ত সরস ও প্রসাদগুণসমৃদ্ধ ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থপাঠে তাঁরা উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠের আনন্দ পাবেন।

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময় শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ।। বাক্‌-সাহিত্য. ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই একটা দেশের চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। একটা দেশকে ভালো করে চিনতে ও বুঝতে হলে সে-দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্পণের সাহায্য নেওয়াই বোধকরি সবচেয়ে নিরাপদ। কারণ, দর্পণ কখনও মিছে কথা বলে না। সে সংগে আসে সময়ের প্রশ্ন। সময়ের পরিবর্তনে যেমন মানুষের রূপ বদলায়, ঘরবাড়ির চেহারা পালটায়, তেমনি তার প্রতিফলন পড়ে দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে। সময়ের সংগে সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্পর্কটা সত্যই সুনিবিড়।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়—অনুপ্রাসবন্ধ এই তিনটি শব্দের মধ্যে যে একটা নিকট আত্মীয়তা রয়েছে তা অনস্বীকার্য। সাধারণত আমরা দেখি সাহিত্য-রচনায় যাঁরা প্রবৃত্ত হন তাঁরা যদি সাহিত্যের প্রায় সকল দিকেই লেখনী চালনা করেন, তাহলে যৌবনকালটা বেছে নেন কবিতা রচনার জন্য, তারপর হাত দেন গল্প-উপন্যাস, আর 'প্রবীণের তালিকাভুক্ত হয়ে' প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, এর সংগে সেই সময়েরই সম্পর্ক। যৌবনকালের আবেগ-উচ্ছ্বাসেই কবিতার উৎস উৎসারিত হয়, মধ্যজীবনের বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে জন্ম নেয় গল্প-উপন্যাস, আর শেষ জীবনের বিচারবুদ্ধি ও ও বিশ্লেষণী শক্তিতে সৃষ্ট হয় প্রবন্ধ। কথাটা সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য না হলেও, আলোচ্য প্রবন্ধ-গ্রন্থের রচয়িতার ক্ষেত্রে বোধকরি অপ্রযুক্ত নয়। নন্দগোপালবাবুর কবিতা গল্প-প্রবন্ধ-রচনার ইতিহাস তো সেই কথাই বলে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত নামটা আজকাল বহু আলোচিত না হলেও, বাংলা সাহিত্যের ধারার সংগে যাদের সুস্পষ্ট পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন সেনগুপ্তমশাই একজন জাত-সাহিত্যের কবি হিসাবেই একদিন তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন। তাঁর সেই প্রতিষ্ঠা আধুনিক সময়ের পাঠকবৃন্দের কাছে কতখানি আছে জানি না, কিন্তু সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সাংবাদিকতা করতে করতেই তিনি বহু বিষয়ে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ-সংগ্রহ 'শতাব্দী ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয় ১৯৪৩-৪৪ সালে। আর, আলোচ্য

দ্বিতীয় প্রবন্ধসংগ্রহ "সাহিত্য-সংস্কৃতি-সময়" প্রকাশিত হলো তার প্রায় কুড়ি বছর পরে। সময়ের এই ব্যবধানে শেষোক্ত গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে স্বভাবতই অধিকতর বিশ্লেষণীশক্তির ছাপ পড়েছে।

আলোচ্য প্রবন্ধ-সংগ্রহে বিভিন্ন সময়ের লেখা চৌত্রিশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।। তার মধ্যে কতকগুলি রয়েছে সাহিত্যের বিভিন্ন দিক ও তার আঙ্গিক গুণাগুণ সম্পর্কে, আর কতকগুলি রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্য তথা কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের রচনাকে ভিত্তি করে। সাহিত্যের তত্ত্ব ও বস্তু সম্পর্কে প্রবন্ধকারের মতামতের সঙ্গে সকলে একমত হবেন এমন কথা নেই। কিন্তু, তাঁর চিন্তার গভীরতা ও বিশ্লেষণী-শক্তির বৈশিষ্ট্যগুণে প্রবন্ধগুলি সমুজ্জ্বল। নন্দবাবুর এই প্রবন্ধগুলির যে-দিকটা সবচেয়ে ভালো লাগে তা হলো তাঁর ভাষার সাবলীল ভঙ্গি ও যুক্তির স্বচ্ছতা। তাঁর রচনায় পাণ্ডিত্যাভিমান নেই, দুরূহ যুক্তিজাল বিস্তার করে পাঠকের মনকে বিভ্রান্ত করবারও তিনি কোনো চেষ্টা করেননি। আগ্রহ ও কৌতুহল নিয়েই তাঁর প্রবন্ধাবলী পাঠ করে যাওয়া যায়।

"তুলনায় সাহিত্য-বিচার" প্রবন্ধে নন্দবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের হবু ডক্টরদের উদ্দেশে যে-কথা লিখেছেন তা পড়ে হয়তো তাঁদের মনে প্রবন্ধকারের প্রতি বিরাগ-ভাব জন্মাবে, কিন্তু সে-কথাটা বোধকরি আধুনিককালের একটা নির্মম সত্য। যথা—"চর্যাপদ, কৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, বাউল গান ও চরিতামৃত মাত্র সম্বল করে দন্ত কিড়িমিড়ি করা বিকট বাংলায় থিসিস লেখাকে তাঁরা যেন পাণ্ডিত্য বলে ভুল না করেন। ....আসল পাণ্ডিত্য বুদ্ধির মুক্তিতে, চিন্তার প্রসারে, কল্পনার স্ফুরণে এবং তা সম্ভব একমাত্র নানা দেশে ও নানা যুগে মানুষ যে জ্ঞান ও চিন্তার ঐশ্বর্য সৃষ্টি করছে, তার পুণ্যসঙ্গমে অবগাহন করায়। সে পাণ্ডিত্য ইউনিভার্সিটির বাঁধা ছকে তৈরী হয় না।"

"মহৎ সাহিত্যের দিন", "সাহিত্যের ভবিষ্যৎ"," ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সাহিত্য", "ছোট গল্পের গুণ ও গোত্র", "সাহিত্য প্রসঙ্গ ঃ অনুবাদ ও আনুষাঙ্গিক", রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য, যতীন সেনগুপ্তের কবিতা, আর নজরুল কথা এই কয়েকটি প্রবন্ধ নানাকারণে উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছে। সবক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিতে না পারলেও, তিনি এই সব প্রবন্ধে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারার যে পরিচয় দিয়েছেন তা নিয়ে চিন্তা করবার অবকাশ আছে। প্রবন্ধকার সবক্ষেত্রেই যে নতুন কথা বলেছেন এমন নয়, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আমরা তাঁর স্পষ্টোক্তির পরিচয় পেয়েছি।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য প্রবন্ধে নন্দবাবু লিখেছেন—"কবিতায় যুগের বাণী, জীবনের বাণী, মানুষ ও মনুষ্যত্বের বাণী যতটা পর্যন্ত আশা করা উচিত ছিল এ-যুগে, তার অতি সামান্যই এখনও পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কবিদের রচনা দেশে সমাদৃত হয়েছে। এদের মধ্যে বুদ্ধদেব জনপ্রিয় কবি, যদিও সর্বাধিক রবীন্দ্র-প্রভাবিত, প্রেমেন্দ্র মিত্র সর্বাধিক প্রজ্ঞানুগামী, আর জীবনানন্দ সর্বাধিক দুর্বোধ্য। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এরাই মুখ্য কবি। এদের পর কবিতার ক্ষেত্রে যে-সব পরীক্ষা সুরু হয়েছে, তার সম্বন্ধে একটা মোটা কথা শুধু বলা আবশ্যক যে, যে-যুগে সর্বজনের উন্নয়নে এবং সর্ব-মানবের মধ্যে শিল্প-সংস্কৃতির পরিব্যাপ্তিতে মানুষের মুক্তি বলে স্বীকৃত হচ্ছে, সে-যুগে শিক্ষিত মানুষেরও কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না, এমন সব রচনাকে মহৎ কবিতা বলা এবং সেই সব কবিদের প্রগতিশীলরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে, এটা কি সাহিত্যের সঙ্গে শঠতার মতো নয়?" মতো নয় বলে নন্দবাবু শেষে একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন

বসিয়েছেন। তিনি—এটা কি সাহিত্যের সঙ্গে শঠতার মতো নয়—না লিখে সুস্পষ্টভাবেই লিখতে পারতেন—'এটা তো সাহিত্যের সঙ্গে একটা নির্লজ্জ শঠতা।' অবশ্য, তথাকথিত প্রগতিশীলরূপে চিহ্নিত-রা হয়তো বলবেন—যারা মডার্ন আর্ট বোঝে না, বিশেষ করে ইমপ্রেশনিজম-এর মাধুর্য যারা উপলব্ধি করতে পারেনা তাদের জন্য আমাদের কবিতা নয়।। বোধগম্য-ই যদি হবে তা হলে আর আধুনিকতার পরিচয় দেওয়া হলো কিসে!

সাহিত্যকে যারা সত্যই ভালোবাসেন, সাহিত্যের উন্নতি ও প্রগতিতে যাঁদের আস্থা আছে তাঁদের কাছে নন্দগোপাল সেনগুপ্তের সাহিত্য-সংস্কৃতি সময় বইখানি নানাদিক থেকে চিন্তার খোরাক জোগাবে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে গ্রন্থকার যদি তাঁর স্বল্পায়তনের কতকগুলি প্রবন্ধকে বিস্তৃত করেন তাহলে সেগুলি (যেমন—সাহিত্যিক সম্পর্কিত প্রবন্ধ-গুলি) থেকে পাঠকেরা আরও বেশি জানবার ও বোঝবার সুযোগ পাবেন

মনোজিৎ বসু

ধুলো-পায়েলগ্ন ॥ কুশল মিত্র। প্রকাশক—গ্রন্থজগৎ—৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলি—১২। দাম দেড়টাকা।

কবিতা হচ্ছে সেই জাতের—যার বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা মেলেনা। কিন্তু তা বলে কি কবিতায় কবির বুদ্ধিবৃত্তির কোন ছাপ থাকবেনা। না, তা নয়। বুদ্ধির সঙ্গে বিশুদ্ধ আবেগের, অনির্বচনীয় অনুভবের পরিণয় সাধনই বোধ-হয় কবিতার পরিণত শরীরের ছবি। সেই পরি-ণত শরীরের উজ্জ্বল ছবি—প্রতিষ্ঠিত তরুণ কবি কুশল মিত্রের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ ধুলো-পায়ে লগ্ন—এর কবিতাগুলি। মোট সতেরোটি মিষ্টি কবিতা কবির এই দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বইটিতে কবির অনুভব বুদ্ধির সঙ্গে পরিণীত হয়ে যথার্থই সম্পূর্ণ আকার ধারণ করেছে। তার উদাহরণ কাব্যগ্রন্থের এখানে-সেখানে অজস্র পাওয়া যাবে। বইটির নামের মধ্যেই এক আশ্চর্য অনুভূতির স্পন্দন। কাজল কবিতায়, যেমন, কবি যখন বলেন—

আমার গভীর থেকে তোমার মনের মানুষ
উঠে আসবে চুপে, চুপে।
ফিরে আসবে পৃথিবীর খোলা মাঠ থেকে
তোমার সিঁড়ির কাছে।

তখন সহজেই হৃদয়ের দর্পণে ছায়াপাত করে বুদ্ধির সঙ্গে অনুভবের এক নিপুণ সঙ্গমের ছবি। বুদ্ধি বা জ্ঞান যেন পৃথিবীর খোলা মাঠ গভীর থেকে উঠে আসা মনের মানুষ যেন অনুভব আর সিঁড়ি যেন চেতনার প্রতন্ত প্রদেশ। কি নিপুণ শব্দ ও প্রতীক চয়নের মাধ্যমে এদের একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে। যেন কোন নারীর তিনগুচ্ছ বেণী।

শুধু বুদ্ধির সঙ্গে অনুভবের সংমিশ্রণ নয়; যন্ত্রণা থেকে আহরণ করা সংবেদনশীল জীবনবোধের কবি হিসাবেও কুশলমিত্র যে কত দরদী আর নিপুণ শিল্পী তার পরি-চয়ও বইটিতে অজস্র পাওয়া যাবে। যেমন—

আমার দীর্ঘ যন্ত্রণার প্রবাসী দিনগুলি
কাঁটার আড়াল থেকে মুখ তুলছে স্থির
প্রস্ফুটিত রক্তাক্ত গোলাপের মত,
আর সেই রূপসী মেয়েটি
অভিমানের কঠিন গ্রীবায় মুখ ফিরিয়ে
দাঁড়িয়ে,
যেন সে তার রক্তঝরা আঙুলের মেঘে
মেঘে
আমার বিবাহের গোধূলি আকাশ নিয়ে
খেলছে
শুধু একটি রক্তাভ গোলাপ নাড়তে
নাড়তে
উদাসীন যন্ত্রণায়।

(যখন আমি ফিরে আসবো)

কিংবা—

রক্তের আদিম অন্ধকার
গাঢ় হয় বেদনার ঘন নীল বিষে।
করবীর ডালে, ডালে হলুদ ফুলের
দিনগুলি
একদিন নুয়ে পড়ে যন্ত্রণার ছায়া
বিষফলে।
(করবীর ডালে ডালে)

এরকম আরো বহু উদাহরণ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তা উদ্ধৃত করার মত পরিসরের বিশালতা এখানেই নেই। তাই প্রসঙ্গান্তরে যাওয়াই শ্রেয়।

যদিও কবি জীবন যন্ত্রণায় বিশ্বাসী তবুও এরই মধ্যে থেকে কবি খুঁজেছেন কয়েকটি আশাবাদী আলোকিত মুহূর্ত। এই মুহূর্তগুলি প্রেমের কবিতায় আশ্চর্য বাঙময়। যেমন—

তবে মৃত্যুতেই শেষ নয় অন্ধকার,
শেষ নয়
তৃপ্তির সবুজ ঘাসে। কে যেন সাজায়
সৌরভের
গোপন ফুলের চারা বাগানের অন্ধ-
কারে বসে
আর সেই অন্ধকারে দুলে দুলে
উঠেছে ভালবাসা
ফুলের চারার মত। (জীবনমৃত্যু)

এতো গেল বক্তব্যের কথা। কিন্তু শুধু বক্তব্যের সৌন্দর্য্যেই কবিতা সার্থক হয়না। আঙ্গিকেও কবিতার অন্যতম সম্পদ। তাই কবিতায় প্রয়োজন হয় যথাযথ শব্দ চয়ন, সুন্দর পংক্তি গ্রন্থন ও ভাষার আন্তরিকতা। যদিও সিন্ধুর পরিচয় এখানে অসম্ভব, তাই বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ স্বরূপ কয়েকটি পংক্তি তুলে দিচ্ছি।

(১) হে আকাশ, হে বাতাস মেলে দিলে
ষোড়শী নারীর
জ্যোৎস্না-উজান-গ্রীবা,

(২) নদীর চৈতন্য এলে জল হয় প্রাণের
প্রবাহ,
কিশোরীর হাসিখুসী স্রোত
নদীর দেহের মত একদিন নারী হতে
চায়।

(৩) আমার জীবনে এই আলো, হাওয়া, মেঘ
তোমার শরীর সবই—ছবির ছায়ারা
হঠাৎ দুপুরে এলে, সব নিয়ে এই
ঘরে ঢুকে
নিবিড় নির্জন ঠোঁটে কথা আঁকো,
সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে যাও
দেয়ালের ফটো কিংবা ভরা পিলসুজে
আমার রক্তের স্রোত—
তৃষ্ণা পেলে ঢেলে নিই জানালার দূরে
শিরাপথে।

কবিতার প্রায় সব কটি পংক্তি।

এছাড়া একটি প্রবাদ আছে যে সুন্দর আরম্ভের মধ্যেই কোন কিছুর অর্ধেক সাফল্য। এ প্রবাদের যথার্থ সমর্থন বহন করছে বইটির আশ্চর্য্য বলিষ্ঠ প্রচ্ছদ। এঁকেছেন স্বনামধন্য শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। কবিতা গ্রন্থটির আশ্চর্য্য ভাষারূপ ফুটে উঠেছে রঙের দ্যোতনায়। তাই সবই ভাল লাগল বইটির।—নিপুণ শব্দচয়ণ, বক্তব্যের বৈচিত্র্য এবং প্রকাশের আন্তরিকতা। কিন্তু কবির ছন্দোবন্ধ কবিতার প্রতি চেষ্টাকৃত ঔদাসীন্যের কারণ অনুধাবন করতে পারিনি। (কবি যে ছন্দোবন্ধ কবিতাতেও নিপুণ তার প্রমাণ 'রাতের কোকিল' 'কোথায় যেন' প্রভৃতি কবিতা)

তবু যার সব ভাল, তার শেষও ভাল। তাই 'ধুলো পায়ে লগ্ন' সকলের প্রশংসার দাবী রাখে। সেহেতু কবি ও শ্রদ্ধেয় শিল্পী তাঁদের শিল্পকৃতির নিপুণতার জন্য ও প্রকাশক এমন একটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য যথার্থই সকলের ধন্যবাদার্হ।

কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। **গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না**—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা **শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের** বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

Regd. No. C3867 Phone: 25-5135 July '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKA

সমকালীন

একাদশ বর্ষ ॥ শ্রাবণ ১৩৭০

অতন্দ্র...
হঠাৎ বিরাট এই দেশের উৎপাদন পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজার দরকার হ'য়ে পড়েছে। আরো ট্রাক, আরো ট্যাঙ্ক, আরো কামান-বন্দুক তৈরী করার জন্যে চাই আরো বেশী ইস্পাত। আর, সমস্ত পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্যে দরকার আরো বেশী অক্সিজেন। অক্সিজেন চাই—ইস্পাত উৎপাদনের জন্যে, ট্রাক ও ট্যাঙ্ক তৈরির কাজে ইস্পাতের পাত কাটা এবং ওয়েল্ড করার জন্যে। অক্সিজেন চাই—ভারতীয় বিমান বাহিনীর পাইলটের অনন্ত আকাশ পরিক্রমার জন্যে আর যুদ্ধে আহতদের জীবনীশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে ...
ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন দেশের শিল্প ও চিকিৎসা জগতের পক্ষে অপরিহার্য গ্যাস এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাব পূরণে ব্রতী এবং এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে রয়েছে ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানি মণ্ডলীর পূর্ণ সহযোগিতা। ব্রিটিশ অক্সিজেন কোম্পানি মণ্ডলী "অকপটে তাদের কুশল কারিগরি দক্ষতা ও যন্ত্রবিদ্যা" ভারতের সেবায় নিয়োগ করেছে।
ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড
IOC-64 BEN

বিবেকানন্দ শত-বর্ষ

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগীতা

(সারা ভারতের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয়সমূহ :

ইংরাজী : বিবেকানন্দ ইন ফরেন আইজ

বাংলা : রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

হিন্দী : সমাজ সংস্কারক বিবেকানন্দ

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি :

ইংরাজী : অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলা : ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী : শ্রী কে, পি, খৈতান, বার-এ্যাট-ল

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিল করিবার শেষ তারিখ ২রা অক্টোবর, ১৯৬৩

পুরস্কার

উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় ১ম পুরস্কার : একটি স্বর্ণপদক, প্রতি মাসে ১৬৲ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও তৎসহ ৫০৲ টাকার বই।

২য় পুরস্কার : একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক, প্রতি মাসে ১২৲ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও ৩০৲ টাকার বই।

৩য় পুরস্কার : একটি রৌপ্যপদক, প্রতি মাসে ৮৲ টাকা করিয়া এক বৎসর স্টাইপেণ্ড ও তৎসহ ২০৲ টাকার বই।

এতদ্ব্যতীত উপরোক্ত প্রতিটি ভাষায় ১০টি যোগ্যতানুসারে সার্টিফিকেট অব মেরিট ও ২৫৲ টাকা নগদ পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বিশদ বিবরণ ও এনরোলমেণ্ট ফরমের জন্য লিখুন :

—অবৈতনিক সম্পাদক—

বিবেকানন্দ শত-বর্ষ সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক, কলিকাতা-৩২।

একাদশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

শ্রাবণ
তেরশ সত্তর

একাদশ বর্ষ
৪ সংখ্যা

জাতীয় চরিত্র

মানসী দাশগুপ্ত

সেদিন দেশের সর্বাঙ্গীন দুর্দশা নিয়ে আনুপূর্বিক চা বৈঠকী আলোচনা হবার পরে জনৈক সহকর্মী বললেন, 'এ সবেরই কারণ হচ্ছে এই যে, আমাদের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে।'

কথাটা অনেকেরই মনে ধরায় সেদিনকার মতো আলোচনা শেষ হল। জাতীয় চরিত্র নিয়ে নতুন যে আলোচনা উঠতে পারত, সে আর উঠল না। অথচ, কথাটা ভেবে দেখা দরকার।

কোনো একটা জিনিষের অধঃপতনের কথা উঠলে তার অতীত উচ্চাবস্থার কথা স্বতঃই মেনে নেওয়া হয়। আমাদের জাতীয় চরিত্র (আমাদের মানে কি? বাঙালীর? সব ভারতীয়ের? যাঁরা জাতীয় চরিত্র নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে ভালবাসেন, তাঁরা সে কথা স্পষ্ট করে বলে দেন না!) ঠিক কোন সময় দিয়ে উচ্চাবস্থায় ছিল, সে হলো ঐতিহাসিকদের গবেষণার বিষয়। আমি ঐতিহাসিক নই, হতে চাইনে। কিন্তু সমাজকে দেখেশুনে, সাহিত্য নেড়ে ঘেঁটে যেটুকু পেয়েছি তাতে মনে হয়, ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সামাজিক প্রবন্ধে যে সমাজকে ডাকাডাকি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ জাপানে ঘুরে এসে সেখানকার শোভনতা এবং স্বল্পবাক সংযম নিয়ে অজস্র সাধুবাদ করে দেশের সমাজের যে অশোভন অসংযমকে পরোক্ষে লজ্জা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন, সে সমাজে জাতীয় চরিত্র মস্তো বড়ো মানের কিছু ছিল—এমন অনুমান করা শক্ত। এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি অতীতে কোনও সময়েই যে জাতীয় চরিত্র অত্যন্ত উন্নত এবং আত্মসংহত ছিল, এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে চাইছি। এরকম চেষ্টা আমি একেবারেই করছিনে। এ রকম হতেই পারে যে জাতীয় চরিত্রের সোনার ফসল সেকালে অনেক ফলেছে। কিন্তু স্থান, কাল, ব্যাপ্তি এবং রূপ আমার যথেষ্ট জানা নেই। বরং জাতীয় চরিত্র নিয়ে গত পঞ্চাশ. ষাট, সত্তর বছর ধরে যে আক্ষেপ চলেছে, তার কিছু কিছু জেনে উঠতে পেরেছি। এবং, সেই কারণে, জাতীয় চরিত্রের অসম্পূর্ণতার কথাই চোখে পড়েছে বেশি।

একথা অবশ্য এখানেই বলে রাখা ভালো যে, জাতীয় চরিত্রের মূল্যকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাব, অন্তর্ধানের সংগে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে

বাংলামুল্লুকে, মহারাষ্ট্রে এবং অন্যান্য নানা অঞ্চলে অসংখ্য সার্থকব্যক্তিত্ব দেখা দিয়েছে বলেই এরকম ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় চরিত্র আজকের থেকে অনেক উন্নত ছিল। কোনো মহৎ ব্যক্তিত্ব দেখলেই আমাদের বলতে লোভ হয় যে, 'ওর মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন হয়েছে।' কিন্তু বলতে লোভ হয় বলেই যে এ বক্তব্যে সারবত্তা আছে, এমন নয়। এ কথা সত্য যে, জাতীয় চরিত্র কাকে বলে এ নিয়ে সুধী মহলে বাদপ্রতিবাদ আজো শেষ হয়নি। কিন্তু মোটামুটি এরকম বলা যায় যে **জাতীয় চরিত্র হলো সেই চরিত্র যা আলোচ্য জাতির অধিকসংখ্যক চরিত্রকে চিহ্নিত করছে।** ভারতবর্ষের মতো বিশাল ভূখণ্ডে, বিচিত্র জনতার ভিতরে এরকম একটি মাত্র চরিত্ররেখা টেনে দেওয়া শক্ত, যেখানে তার ষাট ভাগ মানুষ মিলছে। এদেশের সমস্ত ব্যাপ্তি জুড়ে অমন তিনটে চারটে জাতীয় চরিত্রের নিশানা খাড়া করা যায়। এবং এর সবগুলিই হবে আমাদের জাতীয় চরিত্রের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। এই সব চরিত্র লক্ষণগুলি যথার্থ কিসে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে সে হিসেব করবার সব চেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে অন্যান্য জাতির চরিত্রচিত্র থেকে এদের তফাতগুলি প্রথমে ছকে নেওয়া। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এক জাতির জাতীয় চরিত্রের কোনো একটি নমুনার সংগে অন্য জাতির জাতীয় চরিত্রের অন্যতম নমুনার অনেক মিল পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ জাতিতে জাতিতে চারিত্রিক প্রভেদকে যত দুর্লঙ্ঘ্য বলে ধরবার প্রবণতা অনেকের আছে, সে প্রভেদ তেমন দুস্তর নয়। কাজেই তফাত খুঁজতে গেলে প্রায়ই সমগ্র চারিত্রিক নমুনার বদলে একটি দুটি চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করাই সঙ্গত বোধ হয়।

জাতীয় চরিত্রের হিসেব, মানবচরিত্রের মতোই, দু দফায় নিতে হয়। এক, তার নিত্য ব্যবহারে, আর, তার মূল্যবোধে। এ দুইয়ে মিলে গেছে এমন সুখের সমাজ আমাদের সকলেরই ধ্যেয়, কিন্তু লভ্য নয়। কাজেই দুয়ের হিসেব পৃথক রেখে, কোথায় কোথায় এ দুইয়ে মিললো এদিকে নজর রেখে না এগোলে পদে পদে ভুল দেখারই সম্ভাবনা।

নিত্য ব্যবহারে আমাদের জাতীয় চরিত্রের অঞ্চল ভেদে খুব বড়ো বড়ো প্রভেদ আছে। যেমন, বাঙালী শ্রমবিমুখ, কিন্তু পাঞ্জাবীরা পরিশ্রমী ; আহারে বাঙালীর নৈপুণ্য, দক্ষিণভারতীয় স্বল্পাহারী। এমনি করে দোষেগুণে, নিত্য ব্যবহারের জগতে আমরা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে বড়ো করে তুলেছি। তার ভিতরেও সমগ্র জাতিকে মেলানো যায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য কোথাও খুঁজলে মেলে না তাও নয়, যেমন কী উত্তর ভারতীয়, কী পূর্ব ভারতীয়, কী দক্ষিণ ভারতীয় —আমরা সবাই চেঁচিয়ে কথা বলতে পেলে কিছুই চাইনে। এই রকম নানা ছোট বড়ো মিল এবং বৈপরীত্যকে হিসেবের ভিতরে একে একে হিসেব নিলে মোটা রকম যে কয়েকটি মিল সহজে চোখে পড়ে, তারই ভিতরে আবার যেকটি প্রধান দোষাবহ বৈশিষ্ট্য সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো পরিবার বদ্ধতা, বিশৃঙ্খলতা, বুভুক্ষা, নিশ্চেষ্টতা এবং বীরপূজা। বলাই বাহুল্য যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র কেবলমাত্র এই কয়েকটি দোষের সমষ্টিই নয়, আরো নানা দোষ এবং গুণের সমাহার। তা স্বত্বেও কেবল কয়েকটি মাত্র দোষ বেছে নিয়েই এ আলোচনার কারণ হচ্ছে যে, এ থেকে ছোট মাপে এ কথা বোঝা সম্ভব হবে যে, যে সমস্ত দোষ আজকের দিনের জাতীয় চরিত্রে বেশ বড়ো মাপে দেখা যাচ্ছে সেগুলি সম্পূর্ণ-ই আজব নতুন কিনা, এবং তা না হয়ে থাকলে এই উল্লিখিত দোষ বাবদে প্রাচীন-

কালের তুলনায় আমরা সম্প্রতি নতুন করে কিছু বেশি নিচু হতে সুরু করেছি কিনা। এটা জানা দরকার, কেননা, এরকমই যদি হয়ে থাকে যে এসব গলদ নতুন, তাহলে তার ওষুধ একরকম। অন্যদিকে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে এসব দোষ যদি বহুকাল যাবত বাসা বেঁধে থেকে একটা দোষের ধাত জন্মে দিয়ে থাকে তাহলে জাতকে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে ঢেলে সাজানোর কাজ সুরু করা দরকার। সে হলো এক ধরণের গুরুতর অস্ত্রোপচারের কাজ, ছোটখাট অষুধ বিষুধ দিয়ে ইঞ্জেকসন ফুঁড়ে উতরে দেবার মত কাজ নয়।

পরিবার বদ্ধতা : পরিবার বদ্ধতার বৈশিষ্ট্য বাঙালীর মধ্যে যত প্রকট, সর্বভারতীয় স্তরে ঠিক অতটাই প্রকট কিনা নিঃসন্দেহে বলা শক্ত। কিন্তু অন্যান্য অনেক জাতির তুলনায় (বিশেষতঃ প্রধান প্রধান পাশ্চাত্য জাতিগুলির তুলনায়) এ বদ্ধতা যে ভারতবর্ষে অত্যন্ত বেশি, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং এ বৈশিষ্ট্য ভারতবর্ষে কিছু নতুন দেখা দেয়নি। বহুকাল যাবতই এই দোষ আমাদের জাতীয় চরিত্রে বাসা বেঁধেছে এবং এতে যে আমাদের কতো চেপে, কতো চিরশিশু করে রাখা হয়েছে, তা নিয়েও বেশ কিছুকাল ধরে বহু মনীষী এবং সুধীজন কথা কয়ে দেখেছেন। এ সমস্ত বলাবলি আলোচনার পরে সামান্য যা কিছু ফল দেখা দিয়েছে তার স্বাদ বরং অধুনাই কিছু কিছু মিলছে। বর্তমানে জনসংযোগ বাড়ায়, জনকল্যাণকর কাজে ছোট বড়ো সকলেই কিছু কিছু হাতমুক্ত করতে অভ্যস্ত হয়েছে এবং অভ্যস্ত হতেও হয়েছে। পরিবারের চার দেয়ালে ঘেরা নয় যে সমাজ, সে সমাজও যে আমাদেরই, তার প্রতিও যে আমাদের করণীয় কিছু আছে, এ বোধ অতি সম্প্রতি আসছে, অথবা আসি-আসি করছে বললেই যথার্থ বলা হয়। আমাদের জাতির ভিতরে ছোট ছেলেদের সামাজিক কর্তব্য কি এবং বৃহত্তর সমাজজীবনের সংগে তাদের যোগসাধন ঘটিয়ে দেবার জন্য কি করা দরকার, এ নিয়ে যে কোনও সুনিশ্চিত পদ্ধতি আজ পর্যন্ত কোথাও বের হয়নি, এ এই পরিবার বদ্ধতার একটা বিশেষ প্রকাশ বই কিছুই নয়। আমরা বাল্যকাল থেকে বাড়ির সঙ্গে আচার ব্যবহারই শিখি এবং বাড়ির ভিতরে, আত্মীয়স্বজনের ভিতরে ঘোরাফেরাতেই অভ্যস্ত আরাম পাই। বড়ো হয়েও তাই আমরা কথায় কথায় বাড়ি যেতে চাই। বাড়িতে কাজ থাক, চাই না-ই থাক, বাড়িতে থাকাই একটা কাজ। অফিস থেকে কোনমতে বাড়িতে ছুটতে পেলে তার চেয়ে বেশি আনন্দ কিছুতেই কেউ পাইনে। আমাদের ছোটছেলেরা ঘরোয়া জীব, মেয়েরা ঘরোয়া জীব, তরুণদের ভালমন্দ দায়ভাবনা সমস্তই ঘরের, বাইরের হলেন কেবল গুটিকতক গতকেশ কিংবা পলিতকেশ বৃদ্ধ যাঁদের বাড়িতে, বাইরে, কোথাও আর কিছু করবার সাধও নেই, সামর্থ্যও নেই। তাও আবার তাঁরাও যা কিছু সঞ্চয় দেবার মতো—তা যাবার সময়ে নিজেদের ছেলেমেয়ে পৌত্র প্রপৌত্রকেই দিয়ে যাবেন। বহুকাল ধরে এ বদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবার দুটিমাত্র উপায়ই সকলের জানা ছিল, এক হলো সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে যাওয়া, আর বার-বাড়ির বিলাসে গা ভাসিয়ে সমাজ খুইয়ে দিন কাটানো। এই দুই ভিন্ন অর্থে জাত-কুল খোওয়ানো দল ছাড়া, সমাজের, জাতির বাকি সকলের দেখাসাক্ষাত, খাওয়াদাওয়া, ভালমন্দের আদালত সবই পরিবার কেন্দ্রী সমাজচক্র। দেশের আইন কী বলে এর চেয়ে অনেক বড়ো কথা হয়ে থেকেছে পিসতুতো ভাইয়ের সেজশালা কী বললে অথবা মামাতো ভাজের মেজমামী কী বলতেন। এতে করে দৃষ্টিকোণ অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং

তেরছা হবারই কথা।

এই সংকীর্ণতা এবং বিকৃতি আমরা বাইরের সমাজের চাপে আজ কাটিয়ে ওঠারই চেষ্টা করছি, কাজেই জাতীয় চরিত্র এ বাবদে খুব বেশি খাটো হয়েছে এমন বলা যায় না।

২। **বিশৃঙ্খলতা:** বিশৃঙ্খলতা আমাদের আর একটি বহুকালগত বৈশিষ্ট্য। আমরা এলিয়ে ছড়িয়ে থাকতে ভালবাসি। গোছগাছের পক্ষপাতী কাউকে দেখলে তাদের সাহেবীয়ানা নিয়ে গালমন্দ করে আনন্দ পাই। রেলে-ইস্টিশনে, পথেঘাটে, কোথাও কোনরকম নিয়ম শৃঙ্খলা আমরা পছন্দই করিনে। তবু যে আমরা লাইন দিতে শিখেছি, যে প্রথমে আসবে সেই প্রথম পাবে, এ নিয়ম রাগদুঃখু করেই হোক, কী যেভাবেই হোক, অল্পসল্প কিছু কিছু মেনে নিতে শিখেছি, সে যুদ্ধোত্তর যুগের এই ভারতবর্ষে। কাজেই এক্ষেত্রেও আমাদের জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে বা ঘটেছে, এ বলা ঠিক নয়।

৩। **বুভুক্ষা:** বুভুক্ষা এ জাতির সর্বাঙ্গে, এ কথা যেমনি কষ্টকর সত্যও বটে, তেমনি হাস্যকর সত্যও বটে! আমাদের উৎসবে, ব্যসনে, জন্মে মৃত্যুতে সর্বত্র ফলাও ভোজের যেমন ব্যবস্থা, এমনটি সব সমাজে দেখা যায় কি না সন্দেহ। ছেলে হয়েছে, "খাওয়াও", মা মারা গেলেন, "ফলার করো", খাওয়ার যেন বিরাম নেই। আর এরকম বৃহৎ পর্ব ছাড়াও, সাধারণ কথায় খাই-খাই তো রয়েছেই। কেউ পাশ করেছে, "খাওয়াও", কারো চাকরী হল, "খাওয়াও", অনেকদিন পরে দেখা হল, "এক কাপ চা খাওয়াও না ভাই!" মন ভাল থাকলেই যেন খাওয়ার কথা ছাড়া অন্য কথা জমতেই পারে না। মিষ্ট কথার চেয়েও মিষ্টান্নের হাঁড়ির সংগে বাল্যকাল থেকেই আমাদের যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত। কোন বাড়িতে গেলে আলাপচারী যা-ই হোক না-ই হোক, মিষ্টিমুখ না করে যেতে নেই। লোক বাড়িতে এলে তাকে অপছন্দ হলে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে দেবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে তার প্রাপ্য রসগোল্লার থালাটি তাড়াতাড়ি হাতে ধরে দেওয়া। বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি। নতুন করে আমরা আজ খাই-খাই হ্যাংলামি করে নিজেদের খেলো করছি তা নয়, বহুকাল ধরে এ অভ্যাস আমাদের রপ্ত।

৪। **নিশ্চেষ্টতা:** পূর্ববর্তী ব্যবহার বৈশিষ্ট্য থেকে এই ধাতের তফাত হলো এই যে, এ শুধু মাত্র ব্যবহারের অভ্যাস নয়, এর ভিতরে মূল্যবোধগত দৃষ্টিভঙ্গীও কিছু ছায়া ফেলেছে। আমরা কেবল চেষ্টা করিনে তাই নয়, আমরা প্রত্যহের ব্যবহারে এবং আদর্শে সেটাকে মর্যাদা দিই না। আমাদের মর্যাদা হল দৈবলব্ধ ক্ষমতায় এবং সম্পদে। "কি না হয় চেষ্টায়" বাক্যাংশটি যে আমাদের বাংলা ভাষায় হাসির কবিতায় স্থান পেয়েছে, এ বুলি নিতান্ত আকস্মিক যোগাযোগ নয়। অপৌরুষেয় বেদ থেকে সুরু করে যা কিছু দৈবপ্রাপ্ত, দেবদুর্লভ। তাই আমাদের ধ্যেয় এবং প্রার্থিত। আমরা উপরি পাওনায় বিশ্বাসী। আমাদের ধারণা হচ্ছে: চেষ্টা করে যা কিছু পেতে হয় তা কিছু খেলো! নিজের জন্ম অধিকারে "না চাহিতে যারে পাওয়া যায়", সেই আমাদের কাম্য। আমরা পড়তে চেষ্টা করি না, কিন্তু শিক্ষার আশা করি। আমরা কাজ করতে চেষ্টা করি না, কিন্তু সমৃদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে "ভারত আবার শ্রেষ্ঠ আসন লবে" বলে গান গাইতে ভালবাসি। আমি দৃষ্টান্তগুলি কেবল বাংলা ভাষা থেকেই তুলে দিচ্ছি তার কারণ এই যে, এই একটি ভারতীয় ভাষাই

আমার ভদ্ররকম দখলে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা অন্যান্য ভারতীয় ভাষার আঁচল থেকেও এ ধরণের রত্ন অনেক মিলবে।

এর মোট ফল হিসেবে আমরা প্রার্থনায় বিশ্বাস করি যাতে দেবতা দয়া করে আমাদের অনেক কিছু দিয়ে দেন, কিন্তু প্রয়াস করিনে যাতে নিজের চেষ্টায় যা সাধ্য পেতে পারি।

৫। **বীরপূজা :** এর সংগে বীরপূজার সম্পর্ক অতি প্রত্যক্ষ। দৈবশক্তিতে শ্রদ্ধাশীল মানুষ দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষকে পূজা করা ছাড়া কি উপায়ে তার শক্তির ভাগ পেতে পারে? তাঁকে অনুসরণ করতে হলে চেষ্টা করতে হয়। পূজার জন্য দরকার কেবল পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়া। তাতে আমরা রীতিমতো উদ্যোগী এবং অভ্যস্ত। ওতে খাটুনী আছে, প্রচেষ্টা নেই। এ দুয়ের তফাৎ আজকের পাঠকদের কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয়। তবু যদি থেকে থাকে তাহলে একটি উদাহরণ দিয়ে সেকথা স্পষ্ট করে তোলা যায় : ভিক্ষাবৃত্তিতে খাটুনী অল্প নয়, কিন্তু ওরকম নিশ্চেষ্ট জীবনযাত্রার দ্বিতীয় প্রণালী বের করা শক্ত।

বীরপূজা এবং নিশ্চেষ্টতার ক্ষেত্রে, মনে হয়, জাতীয় চরিত্রের অধঃপতন সত্যি কিছু দেখা দিয়েছে। খবরের কাগজের চিঠির পর্ব সংগ্রহ করলে, ছোটখাট সভা-সমিতির আলোচনার দিকে মনোযোগ অর্পণ করলে এই অধঃপতনের গতি চোখে পড়বার কথা।

আজকের দিনে রাজনৈতিক নেতা থেকে সুরু করে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, কবি সকলকেই বেদীতে বসিয়ে মাল্যচন্দন দান করে তাঁদের সৃষ্টিশীলতার প্রতি সকলের কর্তব্যকাজ করবার যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে, ঠিক এতখানিই সর্বদা ছিল বলে মনে হয় না। আগে আগে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ সমাজবেত্তার সম্মান যারা যখন দেখাতে চেয়েছেন, তাঁরা এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেখা পড়ে, তাঁদের অনুসরণ করে, তাঁদের পিছু পিছু ঘুরে, বক্তৃতা করে, কখনো বা জেলে গিয়েই সে সম্মান তাঁরা দেখিয়েছেন। কিন্তু এই যে ঘট বসিয়ে দুটো ফুল আর দুখানা গান সহযোগে 'নমঃ শিবায়ঃ' বলে আশু তোষণের চেষ্টা, এমনটি বড়ো দেখা যায়নি।

নিশ্চেষ্টতা বিষয়েও এরকম বলা যায় যে, নিশ্চেষ্টতা আগে যে ভক্তিভাব থেকে, বিশ্বাস থেকে আসত, সে ভক্তিভাব, সে বিশ্বাস আজ নেই, তার বদলে কেমন এক ধরণের ধোঁয়াটে জন্মগত অধিকারের দাবী দিনে দিনে ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। ফলে, নিশ্চেষ্টতা যেমন ছিল, তেমনি পর্বতপ্রমাণ হয়ে তো আছেই, অন্যদিকে তার যেটুকু শ্রী-নম্রতা ছিল সেটুকুর আবরণও ঘুচে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অতিশয় দৃষ্টিকটু হয়ে উঠেছে। আজকের দিনে সমাজের বেশ বৃহৎ একটি অংশ যে বোধ ছড়িয়েছে, তার মোট কথাটা হচ্ছে : ভোগে আমাদের অধিকার, শিক্ষায় আমাদের অধিকার, চাকরীতে আমাদের অধিকার, কিন্তু জাতীয়-সম্পদ বৃদ্ধির দায় আমাদের নয়, পরিবার সংকোচনের দায় আমাদের নয়, পড়াশুনোর দায় আমাদের নয়, কাজের দায়ও পারতপক্ষে আমাদের নয়। যারা এতদিন মন্দিরে হাতজোড় করে এই সব অধিকারের অংশ চেয়ে প্রার্থনা পেশ করেছে, তারা এখন হাত মুঠো করে "আমাদের দাবী মানতে হবে" বলে,—যেখানে লাগে লাগুক—শূন্যে চাহিদা উৎক্ষেপ করতে উৎসুক। ফলে, আমরা নত হতে ভুলে গেছি। সচেষ্ট হতেও শিখিনি। এতে সমস্ত অবস্থাটা যে আরও দুঃসহ হয়েছে তার কারণ এই যে, নাগালের বাইরের একটা খেলনা

পাবার জন্য নড়ে, চড়ে, বলে, যেটুকু চেষ্টা করার সে চেষ্টা কিছুমাত্র না করে কেঁদে কঁকিয়ে, বায়না করে যে ছেলে সেটি সংগ্রহ করতে চায় তাকে দেখে আমাদের বড়োজোড় বিরক্ত লাগে, কিন্তু যে ছেলে ঐ অবস্থায় আবার কাঁদার বদলে মেজাজ দেখিয়ে, চেঁচিয়ে, হুকুম করে খেলনাটি দখলে পাবার ব্যবস্থা খোঁজে তার ব্যবহার অসহ্য। এই ধরণের অসহ্য ব্যবহার আমরা আজকে সমাজে বড়ো বেশি দেখছি। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সৃষ্টিছাড়া দাবী সবচেয়ে চোখে ঠেকে। পরীক্ষায় পাশ করা নিয়ে যে মাতামাতি, হাতাহাতি, সভা-সমিতি খবরের কাগজের সীমা ছাপিয়ে বিধানসভা পর্যন্ত ঠেলে ওঠবার প্রয়াস পাচ্ছে, তা দেশব্যাপী অশিক্ষারই প্রমাণ। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদে লক্ষ্মীর এখন জয়জয়কার এবং সেই সংগে গণেশের। লেখাপড়া ছেলেমেয়েদের হোক চা-ই না-ই হোক, বিদ্যায় অধিকার জন্মাক কী না-ই জন্মাক, বিদ্যাসরস্বতীর ছাপ ওই "পাশের হার" উঁচু রাখতেই হবে, কেননা এক তো ছেলেপিলে পাশ না করলে ইস্কুল কলেজ চলবে কিসের টাকায়, ভর্তি হবে কারা, তা ছাড়াও, জনমত তা নইলে শুঁড় উঁচিয়ে বিপ্লবের বান ডেকে আনবে। স্কুলে পড়ার নামে শিক্ষাহীন দিন কাটুক এতে জনমত নির্বাক, পাঠ্যপুস্তকের নামে অপাঠ্য বইয়ে বাজার ছেয়ে গেল, এতে জনমত নিস্তব্ধ, কিন্তু পাশের বেলা এদিক ওদিক হলেই আর কথা নেই। সুপ্ত জনমত "নইলে গদী ছেড়ে দাও" বলে একেবারে নিদ্রাভঙ্গে কুম্ভকর্ণের মতো গর্জন করে ছুটবে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, কতকগুলি অধিকার মানুষকে মানুষ বলেই দিতে হবে। এমনকি, সে সব অধিকার যদি সে খাটাতে না জানে, তা-ও। যেমন, অন্নের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার, আশ্রয়ের অধিকার! পাগল বিশ্রাম নিতে জানে না। তবু, যতক্ষণ আমরা আশা করি মানুষটা আবার মানুষ হয়ে বেঁচে উঠবে, সেরে উঠবে, ততক্ষণ আমরা তাকে বিশ্রাম নিতে পাঠাই, জোর করে তার অধিকার তাকে পেতে দিতে সাহায্য করি।

অন্যদিকে, এ কথাও সত্য যে, এক গর্ভস্থ শিশু ছাড়া এই সমস্ত অধিকারের বিনিময়েই দায় এবং দায়িত্ব সমস্ত মানুষকে বর্তায়। এবং বিশেষ কতকগুলি ক্ষেত্র বাদ দিলে যোগ্যতার প্রশ্ন তো আছেই। ব্যক্তিগত যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্নের সংগে গণতান্ত্রিক মৌল অধিকারের প্রশ্নকে গুলিয়ে ফেলা কোনও কাজের কথা নয়। যেমন, প্রত্যেক মানুষের খাবার অধিকার আছে বলেই অজীর্ণ রোগীকে সেরে সেরে দুধ খাইয়ে দেওয়াটা ঠিক নয়, ঠিক তেমনিই, যে যথেষ্ট বিদ্যে হজম করতে পারে না তাকে স্তরের পর স্তর ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে এম. এ. ক্লাশের বেঞ্চিতে বসিয়ে দিতে পারলেই মোক্ষলাভ হলো এবং গণতন্ত্রের জয়জয়কার হলো মনে করার ভিতরেও গলদ আছে। কিন্তু সেই গলদই আমাদের চিন্তাকে আজ বহুল পরিমাণে দূষিত করছে। এককালে আমরা যে-রকম একরোখা জেদের সংগে "অধিকারীভেদ" তত্ত্ব মানতাম, এখন প্রায় তেমনি একগুঁয়ের মতো সকলের সকলপ্রকার শিক্ষায় সমান অধিকার বলে ব্যক্তিভেদের তত্ত্বকে বেমালুম উড়িয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছি। জাতিভেদ মানার ফলে একসময়ে আমাদের জাতীয় চরিত্রের সার্থকতা যেভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, ব্যক্তিভেদ একেবারে অগ্রাহ্য করার ফলে আমাদের জাতির বিকাশ তার চেয়েও বেশি পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হচ্ছে কিনা বলা শক্ত হলেও অন্ততঃ সেই পরিমাণেই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, এতে সন্দেহ নেই।

কাজেই মনে হয়, ব্যবহারিক জীবনে, অভ্যাসগত দিনক্ষেপে, যে গ্লানি পরিস্ফুট, সেখানে জাতীয় চরিত্রের অনেকগুলি চিরাগত অথবা বহুকালগত দোষ দুর্বলতার প্রভাব থাকলেও ব্যবহারের আদর্শগত দিকে জাতীয় চরিত্রের অধোগতির কথাটা প্রয়োগ করা সম্ভব। এবং তার ফলেই হয়ত গোলমালের মূল খুঁজতে গিয়ে জাতীয় চরিত্রের অধঃপতনের কথাটা অনেকের মনে আসছে।

আদর্শ দৃষ্টিবোধের দিকে চোখ ফেরালে সেখানে যা চোখে পড়ে, সে অবস্থাকে অধঃপতন বলা হবে কি অসামঞ্জস্য বলা হবে সে নিয়ে তর্ক তোলা যায়। কেননা, পূর্বে আমাদের মূল্যবোধ শ্রেয়তর ছিল, এখন অধঃপতিত হয়েছে এ কথা বলার চেয়ে আমাদের মূল্যবোধের মান নানা গোলমালে হারিয়ে গেছে বলাই বোধহয় ঠিক। আসলে যা হয়েছে তা কতকটা এইরকম। পূর্বে কী ভালো, কী মন্দ, কী নিয়ম কখন মানতে হবে, কাকে বলে পাপ, কাকেইবা বলে পুণ্য, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রসম্মত মত দ্বিধাহীন ভাষায় প্রচার পেত, এবং সকলেই তা মেনে চলবার প্রয়াস পেত। বর্তমানের অভিজ্ঞতার এই সমস্ত অঞ্চল জুড়ে অস্বাভাবিক শূন্যতা বিরাজ করছে। কী কী মানতে নেই, তা প্রায় আমরা সবটাই মোটামুটি আয়ত্তগত করেছি, কিন্তু কী মানতে হবে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকার বোধ জন্মাচ্ছে এমন প্রমাণ নেই। অথচ, এ রকম নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে সমাজে, জীবনে স্বস্তি মিলবে কী করে? আমাদের বিশ্বাসের বল গেছে ঘুচে। যে বিশ্বাসের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সমাজের ধমনীতে রক্ত বিশুদ্ধ করে তোলে তা আর আমাদের হাতে নেই। আমাদের বহুকালের অভ্যস্ত নিত্যব্যবহারের যে দোষ-ত্রুটি আদর্শের প্রলেপে ঢাকা থাকতো, সে আড়াল, সে আবরণ ঘুচে যাওয়ায় জাতীয় জীবনকে সমগ্রভাবে বে-আবরু মনে হচ্ছে, খেলো মনে হচ্ছে। বহুদিনের জরাজীর্ণ অভ্যাস এবং তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠলো, মূল্যবিশ্বাসের মলমে তাকে ঢেকে দেওয়ার, জ্বালা জুড়িয়ে দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত রইলো না কোথাও। অনাস্থা আমাদের মজ্জায় মজ্জায় পেয়ে বসেছে। অথচ আস্থার প্রতি টান আমাদের দীর্ঘদিনের, তাই কেবলই রাগ এবং আক্ষেপ জমছে, কাজ এগোচ্ছে না। এই বিচিত্র, কৌতুককরুণ অসামঞ্জস্যের যে বিকার, তা নতুন কালেরই জিনিস। সেই হিসেবে আজকের জাতীয় চরিত্রে দেখবার মতো অধঃপতন উদ্ভব হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে, এ বিকার যে জন্মালো, তার মূলে চিন্তার যে শৈথিল্য ও আলস্য, ব্যবহারে যে বিশৃঙ্খলা কাজ করছে, তা আজকের জিনিস নয়। তা প্রায় আমাদের এই সভ্যতার মতোই পুরোনো। তাকে পালটাতে হলে আমাদের জাতীয় সভ্যতাকে আগাপাশতলা ঢেলে সাজাতে হয়। আমরা কি সেই প্রলয়ঙ্কর শুভশক্তিকে আহ্বান করতে প্রস্তুত? আমরা কি বদলাতে চাই?

রমাপ্রসাদ চন্দ

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রমাপ্রসাদ চন্দ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত শ্রীধরখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ। বাংলা সাহিত্যে কালীপ্রসাদের সমধিক অনুরাগ ছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শন" ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত "বান্ধব" পত্রিকার গ্রাহক ও নিয়মিত পাঠক ছিলেন, তাঁহার গৃহে বহু বাঙ্গলা পুস্তক রক্ষিত ছিল। এই পরিবেশের মধ্যে রমাপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যান। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া রমাপ্রসাদ পাঠ্যপুস্তক অপেক্ষা পাঠ্যবহির্ভূত গ্রন্থ অধ্যয়নেই অধিক মনোযোগ প্রদর্শন করিতেন. এই স্বভাবের জন্য কোন পরীক্ষাতেই তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার অল্পদিন পূর্বে রমাপ্রসাদের পিতা পরলোক গমন করায় তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থার অবনতি হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রমাপ্রসাদ.কলিকাতার ডাফ কলেজে (বর্তমানে স্কটিশচার্চ) প্রবিষ্ট হন ও এই কলেজ হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার বিবাহ হয়। কলিকাতায় জীবিকা সংস্থানে ব্যর্থ হইয়া রমাপ্রসাদ গাজীপুরে এক বাঙ্গালী পরিবারে কিছুদিন গৃহশিক্ষকতা করেন। রমাপ্রসাদের বাল্যকালের পাঠানুরাগ বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হয়। গাজীপুরে অবস্থানকালে রমাপ্রসাদের সহিত তথাকার এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অতুল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের (পরে সার ও লণ্ডনে ভারতের হাইকমিশার) পরিচয় হয়। সুশিক্ষিত অতুল চট্টোপাধ্যায় সামান্য গৃহশিক্ষকের কাজে কর্মরত রমাপ্রসাদের পাণ্ডিত্য, অনুসন্ধিৎসা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া যান। কলিকাতায় আসিলে অতুল চট্টোপাধ্যায় বন্ধুবান্ধবদের নিকট এই অজ্ঞাত জ্ঞান-সাধকের বিষয় গল্প করিতেন। কিছুদিন গাজীপুরে থাকিয়া রমাপ্রসাদ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। এবারেও তাঁহার ভাগ্যে গৃহশিক্ষকতা ব্যতীত অন্য কোন কর্ম জুটে নাই। সামান্য উপার্জন হইতেই গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া রমাপ্রসাদ পুস্তকাদি ক্রয় করিতেন এবং নিয়মিতভাবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পাঠ করিতে আসিতেন। এই লাইব্রেরী তৎকালে ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে অবস্থিত ছিল। শ্যামবাজার হইতে এই দীর্ঘ পথ অর্থাভাবে তাঁহাকে প্রত্যহ দুইবার পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত। কিছুকাল পর বন্ধুবান্ধবদের চেষ্টায় রমাপ্রসাদ হিন্দু স্কুলে ৬০৲ বেতনে ইতিহাসের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা হওয়াতে রমাপ্রসাদ আরও গভীরভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। হিন্দু স্কুলে কাজ করার সময় বোম্বাই-এর "ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট" পত্রিকায় ও কলিকাতার ডন সোসাইটির পত্রিকায় তিনি কয়েকটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন! বোম্বাই হইতে প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটির নাম ছিল "ভারত ও ব্যাবিলন (১৯০৫)" এবং "বাঙ্গালী

জাতির উৎপত্তি (১৯০৭)"। এই প্রবন্ধ দুইটি পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রশংসা লাভ করে।

তরুণ বয়সেই রমাপ্রসাদ ইতিহাস ও নৃতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঢাকায় কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি বাঙ্গালী হিন্দুর দৈহিক ও মানসিক অবনতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া বান্ধব সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষকে উহা দেখিতে দেন। কালীপ্রসন্ন অজাতশ্মশ্রু তরুণের এই বিতর্কমূলক রচনা তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। তিনি রমাপ্রসাদকে আরও গভীরভাবে এ বিষয়ে চর্চা করিতে উপদেশ দেন। ভারত সরকারের সেন্সাস কমিশনার সার হারবার্ট রিজলী ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে এই মত প্রকাশ করেন যে ভারতবাসীর মধ্যে আর্যরক্তের ভাগ অতি অল্প এবং বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে আর্য রক্তের ধারা নাই বলা চলে। রিজলীর এই মন্তব্যে বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মমর্যাদা বিশেষভাবে আহত হয়। এই ঘটনা হইতেই রমাপ্রসাদ অধিকতর উৎসাহের সহিত নৃতত্ত্বের গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। অতি পরিমিত আয় সত্ত্বেও তিনি পণ্ডিতদের বেতন দিয়া তাঁহাদের নিকট পাণিনি ব্যাকরণ ও প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, এইসব পুস্তক হইতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার সাক্ষ্য সংগ্রহই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। পুস্তক পাঠ ব্যতীত নৃতাত্ত্বিক গবেষণার উপযোগী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া তিনি বাঙ্গালীর নানা বর্ণের লোকদের দেহবৈশিষ্টগুলি নৃতাত্ত্বিক রীতি অনুযায়ী পরীক্ষা করিতে থাকেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, লাহোর ও এলাহাবাদের কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ও দিনাজপুর জেলার সাঁওতালদের সহিত মিশিয়া তিনি এইসব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বহু নৃতাত্ত্বিক তথ্য সংগ্রহ করেন।

কলিকাতার হিন্দু স্কুলে কিছুকাল কাজ করার পর তাঁহাকে রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুলে বদলী করা হয়। রাজশাহী আগমনের পর তিনি এই স্থানের বিশিষ্ট নাগরিক দীঘাপাতিয়ার কুমার বিদ্যোৎসাহী শরৎকুমার রায় ও ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সহিত পরিচিত হন। ত্রিমূর্তির এই সম্মেলন বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে অতিশয় শুভফলদায়ক হইয়াছিল।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এই তিনজনের প্রচেষ্টায় রাজশাহী শহরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে রমাপ্রসাদ বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সম্মেলন সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র ও সম্মেলনের সম্পাদক আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই প্রবন্ধ লেখকের পাণ্ডিত্য দেখিয়া চমৎকৃত বোধ করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত হয়। শরৎকুমার ও অক্ষয়কুমার সহ রমাপ্রসাদ এই অধিবেশনে যোগদান করেন ও তাঁহার প্রবন্ধের শেষ অংশটুকু পাঠ করেন। সম্মেলন অন্তে তাঁহারা ভাগলপুর সংলগ্ন ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণের সময় তিন বন্ধু এই সঙ্কল্প করেন যে তাঁহারা এইরূপে বাঙ্গলা বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক স্মৃতি সমৃদ্ধ স্থানগুলিও একত্রে দর্শন করিবেন। রাজশাহী প্রত্যাবর্তনান্তে এই ক্ষুদ্র দল সহ রমাপ্রসাদ রাজশাহী সন্নিহিত স্থানগুলি ভ্রমণ করিয়া একটি অনুপমা পার্বতীমূর্তি সহ ৩২টি ভাস্কর্য নিদর্শন সংগ্রহ করেন। পার্বতী মূর্তিটি মাণ্ডোইল নামক গ্রামে পাওয়া যায়, পাল রাজত্বকাল বাঙ্গালীর ভাস্কর্য সাধনা কত উচ্চকোটিতে পহুঁছিয়াছিল এই পার্বতী মূর্তিতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই আবিষ্কারে উৎসাহিত হইয়া তাঁহারা রাজসাহী ও বগুড়া জেলা হইতে আরও বহু প্রত্ন দ্রব্য উদ্ধার

করেন। এইগুলির সংরক্ষণ, আরও পুরাবস্তু সংগ্রহ এবং ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজশাহী শহরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কুমার শরৎকুমার ও অক্ষয়কুমার যথাক্রমে সমিতির সভাপতি ও পরিচালক (ডিরেক্টর) নির্বাচিত হন, রমাপ্রসাদ অবৈতনিক সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বৎসরের পর সমিতির সংগ্রহ সমৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কুমার শরৎকুমার রায়ের বদান্যতায় সমিতির নিজস্ব কার্যালয় ও সংগ্রহশালা নির্মিত হয়। সমিতি প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই রমাপ্রসাদ রচিত 'গৌড়রাজমালা' বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গৌড়-বিবরণ গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। রমাপ্রসাদ রচিত 'গৌড রাজমালা' আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে শিলালেখাদির তথ্যের ভিত্তিতে রচিত বাঙ্গলা ভাষার প্রথম প্রকৃত ইতিহাস। ইতিপূর্বে মুসলমান শাসনকাল হইতেই বাঙ্গলার ইতিহাস রচিত হইত। ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে রমাপ্রসাদ বাঙ্গলার ইতিহাসকে আরও ছয়শত বৎসর পশ্চাতে লইয়া যান। রমাপ্রসাদই বাঙ্গলা দেশের প্রথম ঐতিহাসিক যিনি প্রথম প্রমাণ করেন যে খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বাঙ্গলার পালরাজগণ অতুল বিক্রমে উত্তর ভারতেও নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির দ্বিতীয় পুস্তক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'গৌড় লেখমালা' (রাজশাহী ১৯১২) গ্রন্থখানিও বাঙ্গলার ইতিহাস সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

রমাপ্রসাদ রচিত নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'ইণ্ডো-এরিয়ান' রেসেস্ : এ ষ্টাডি অফ দি ইণ্ডো এরিয়ান পিপল এণ্ড ইন্সটিটিউশনস্ রাজশাহী হইতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ৫ম গ্রন্থমালারূপে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রিজলীর সেন্সাস রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত রমাপ্রসাদের সমস্ত নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও গবেষণা প্রসূত এই পুস্তক বিশ্বের নৃতাত্ত্বিক সমাজে বহুলভাবে আদৃত হয়, এই সময় হইতেই তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত বলিয়া পরিগণিত হন। এই পুস্তকে চন্দ রিজলীর মতসমূহ বহুলাংশে খণ্ডন করেন। উত্তরকালে ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ প্রভৃতির গবেষণার ফলে রিজলী চন্দ বাদানুবাদের ক্ষেত্রে চন্দের মতামতগুলিই অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ভারত তত্বজ্ঞ এ-বি কীথ্ লণ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই পুস্তকটির বিস্তৃত সমালোচনায় 'গ্রন্থটির' বিশেষ প্রশংসা করেন (জে, আর, এ, এস, ১৯১৭)।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কার্যক্ষেত্র ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হইতেছিল, সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধান কার্য চালাইতে হইলে উত্তর বঙ্গের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ খননের প্রয়োজনীয়তা সমিতি বিশেষ ভাবে অনুভব করিতে থাকেন। এই কার্য সাধারণ কুলিমজুর ও ওভারসীয়র দ্বারা নির্বাহ করিতে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা এই জন্য ঐতিহাসিক স্থান খননের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে। সমিতি রমাপ্রসাদকে এই শিক্ষা লইবার সুযোগ করিয়া দিতে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। সমিতির অনুরোধে প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের (আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া) তদানীন্তন অধ্যক্ষ সার জন মার্শাল রমাপ্রসাদকে বেতনভুক্ শিক্ষার্থি (স্কলার) রূপে স্বীয় বিভাগে গ্রহণ করেন। শিক্ষার্থি রমাপ্রসাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে যোগদান করিয়া অন্যান্য কর্মিদের সহায়তায় সাঁচীস্থ প্রত্নসংগ্রহশালার প্রত্নদ্রব্যসমূহের একটি বিস্তৃত 'ক্যাটালগ' প্রস্তুত করেন। এই বিভাগের গবেষণা পত্রে রমাপ্রসাদের দুইটি গবেষণামূলক নিবন্ধও প্রকাশিত হয় (ডেটস্ অফ্

ভোটিভ্ ইন্সক্রিপসন্স্ অন্ দি স্তুপ য়্যাট্ সাঁচী—১নং মেমোয়রস্; আর্কিওলজি য়্যাণ্ড বৈষ্ণব ট্রাডিশনস্—৫ নং মেমোয়রস্)। একজন শিক্ষার্থি রচিত এই নিবন্ধগুলি বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের কীর্তিকে ম্লান করিয়া দেয়। দুইবৎসরকাল তক্ষশীলা, মথুরা, সারনাথ ও দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থান খননের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর রমাপ্রসাদের শিক্ষানবিশি কাল অতিক্রান্ত হয়। সার জন মার্শাল রমাপ্রসাদের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সরকারী বেতনে রাজসাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু তদানীন্তন বঙ্গীয় সরকারের প্রতিবন্ধকতায় তাঁহার এই চেষ্টা সফল হয় নাই। এখন রাজশাহী কলিজিয়েট স্কুলের অল্পবেতনের সহকারী শিক্ষকতায় পুনরায় ব্রতী হওয়া ব্যতীত রমাপ্রসাদের আর কোন উপায় ছিল না। রমাপ্রসাদের অন্যত্র অবস্থিতি কালে রমাপ্রসাদের পত্নী এইস্থানে পরলোকগমন করেন—এই জন্য অতঃপর রাজশাহীতে বাস করিতে তাঁহার অনিচ্ছা জন্মে।

এই সময়ে সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয়ে এম, এ বিভাগের প্রবর্তন করেন। নানা রচনার মধ্যে রমাপ্রসাদের অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া তিনি রমাপ্রসাদকে এই বিভাগের লেকচারার নিযুক্ত করেন। একজন বি-এ পাশ স্কুল শিক্ষককে স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করার ব্যাপারে সার আশুতোষ যে উদারতা, সাহস ও গুণগ্রাহিতা দেখাইয়াছিলেন তাহা তুলনা রহিত। বাধ্য হইয়াই রমাপ্রসাদকে রাজশাহী ত্যাগ করিতে হয়, তাঁহার অতি প্রিয় বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্যক্ষ সেবা করা তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই, ইহা তাঁহার ও তাঁহার সুহৃদদের পক্ষে সবিশেষ ক্ষোভের কারণ হয়। অল্পদিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগ প্রবর্তিত হইলে সার আশুতোষ রমাপ্রসাদকে এই বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রমাপ্রসাদ যোগ্যতার সহিত নবপ্রতিষ্টিত নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষতা করেন। এই বৎসর তাঁহার পৃষ্ঠপোষক সার জন মার্শালের নির্বন্ধাতিশয্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া রমাপ্রসাদ কলিকাতা মিউজিয়মের (যাদুঘর) প্রত্নতত্ত্ব শাখার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন (সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট অফ দি আর্কিওলজিক্যাল সেকশন, ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়ম)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিলেও বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বহু ব্যাপারে সার আশুতোষ রমাপ্রসাদের পরামর্শ লইতেন। মিউজিয়মে কর্মরত থাকা কালে রমাপ্রসাদের চেষ্টায় বহু নূতন প্রত্ন দ্রব্য সংগৃহীত হয় ও সংগ্রহশালাটি বৈজ্ঞানিক প্রথায় পুনর্বিন্যস্ত হয়। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে খননকার্য (এক্সপ্লোরেশন) দ্বারা রমাপ্রসাদ বহু প্রত্নদ্রব্য উদ্ধার করেন এবং ময়ুরভঞ্জ রাজার অর্থানুকুল্যে তথায় একটি চমৎকার সংগ্রহশালা স্থাপন করেন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে (বৈশাখ ১৩৩০) রমাপ্রসাদ বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে রাধানগরে ইতিহাস শাখার সভাপতি রূপে বাংলার মূর্তি ও মন্দির স্থাপত্য বিষয়ে একটি সারগর্ভ ভাষণ দান করেন। এই অভিভাষণে তিনি বলেন যে 'কুষাণ গুপ্ত যুগের সাহিত্য শিল্প এবং দর্শন আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি হওয়া উচিত···আমাদেরও মুক্তির জন্য কুষাণ গুপ্ত যুগের শিক্ষার পুনরুজ্জীবন আবশ্যক, এই পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করিতে হইবে বাঙ্গলা সাহিত্যকে। বাঙ্গলা সাহিত্যই 'বাঙ্গালীর ভরসা।' এই অভিভাষণটি 'মূর্তি ও মন্দির' নামে কলিকাতা হইতে

প্রকাশিত হয় (বুক কোং, কলিকাতা, ১৯২৪)।

নৃতত্ত্ব, ভারতীয় ইতিহাস ও স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা এবং প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগে কর্মদক্ষতা প্রদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতগভর্ণমেণ্ট রমাপ্রসাদকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২১ হইতে ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা বিভাগের মেমোয়রস্ ও বাৎসরিক রিপোর্টে রমাপ্রসাদের নিম্নলিখিত মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—

১। পূর্বভারতের ভাস্কর্যশিল্পের উৎপত্তি (দি বিগিনিংস অফ আর্টইন্ ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু স্কাল্পচারস্ ইন দি ম্যুজিয়ম্, ৩০ নং মেমোয়ারস্)

২। বৈদিক যুগের সিন্ধু উপত্যকা—
(দি ইণ্ডাস্ ভ্যালি ইন্ দি ভেডিক্ পিরিয়ড্, ৩১ নং মেমোয়রস্)

৩। সিন্ধু যুগের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আত্মরক্ষা (দি সারভাইভ্যাল অফ্ দি প্রি-হিষ্টরিক্ সিভিলিজেশন অফ্ দি ইণ্ডাস্ভ্যালি, ৪১ নং মেমোয়রস্)

৪। উড়িষ্যায় প্রত্ন দ্রব্য অনুসন্ধান (এক্স প্লোরেশন ইন্ ওড়িশা, ৪৪ নং মেমোয়ারস্)

বাৎসরিক রিপোর্ট

(১) ভরাহুত ও বিশ্বান্তর জাতক (দি বিশ্বান্তর জাতক য়্যাট্ ভরাহুত, ১৯২১-২২)

(২) মথুরার স্থাপত্য রীতি (দি মথুরা স্কুল অফ্ স্কাল্পচার, ১৯২২-২৩)

(৩) ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির (দি লিঙ্গরাজ অব গ্রেট্ টেম্পল অফ্ ভুবনেশ্বর, ১৯২২-২৪)

(৪) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনমূর্তি (দি শ্বেতাম্বর য়্যাণ্ড দিগম্বর ইমেজেস্ অফ্ দি জৈনস ১৯২৫-২৬)

(৫) সারনাথের খনন (এক্সক্যাভেশনস্ য়্যাট সারনাথ, ১৯২৭-২৮)

চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া রমাপ্রসাদ কলিকাতায় গৃহনির্মাণ করিয়া বালীগঞ্জে বাস করিতে থাকেন। অবসর গ্রহণ করিয়া অধিকতর উৎসাহের সহিত তিনি অধ্যয়ন ও গবেষণায় মগ্ন হন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতের প্রতিনিধিরূপে চন্দ মহাশয় 'ইণ্টার ন্যাশনাল কংগ্রেস অফ্ য়্যানথ্রোপোলজি য়্যাণ্ড এথনোলজিক্যাল সায়েন্সে 'যোগদান করিতে লণ্ডন গমন করেন। এই আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ববিদ সম্মেলনে তিনি ভারতের জাতিসমূহ সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করেন। উহা এই বৎসরই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (রেস য়্যাণ্ড কাল্ট্ ইন্ ইণ্ডিয়া, লণ্ডন ১৯৩৪)

এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের সংগ্রহে মধ্যযুগে নির্মিত উত্তরভারতের ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি দেখিয়া চন্দ মহাশয় বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। প্রথম দর্শনে এইগুলি সাধারণ দর্শকের মনকে আকর্ষণ করিতে পারিত না যদিও কলা কৌশলের দিক হইতে এইগুলির তাৎপর্য অতি গভীর ছিল। সাধারণ দর্শকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার জন্য রমাপ্রসাদ এই সংগ্রহ সম্বন্ধে একটি স্বল্পায়তন

অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া দেন, এই পুস্তকটি পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ম কর্তৃক প্রকাশিত হয় (মিডিভ্যাল্ ইণ্ডিয়ান্ স্কাল্পচার ইন্ দি ব্রিটিশ মিউজিয়ম, লণ্ডন ১৯৩৬)।

সার জন মার্শালের অধিনায়কত্বে রমাপ্রসাদের পুরাতন সুহৃদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় মহেঞ্জোদারোর প্রত্ন সম্পদগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতেই রমাপ্রসাদ সিন্ধু-সভ্যতার নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন। এই সংক্রান্ত তাঁহার কয়েকটি নিবন্ধ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গবেষণা মালায় (মেমোয়ারস্ এ) প্রকাশিত হয় পূর্বেই তাহা বলা হইয়াছে। সিন্ধু সভ্যতার প্রত্ন সম্পদগুলি আবিষ্কৃত হওয়ার পর মার্শাল দিল্লীতে এইগুলির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। বিভাগীয় অভিজ্ঞ কর্মচারী হিসাবে এইগুলি বিন্যাস করিতে গিয়া রমাপ্রসাদের দৃষ্টি একটি ছাপের (সীল) প্রতি আকৃষ্ট হয়। সংস্কৃত শাস্ত্র পাঠের অভিজ্ঞতা হইতে তিনি এটিকে নাসাগ্রবদ্ধ দৃষ্টি যোগী মূর্তি বলিয়া স্থির করেন ও এবিষয়ে মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রাক বৈদিক সভ্যতার স্মৃতিবাহক সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যোগী মূর্তির অস্তিত্বকে কাল্পনিক বলিয়া মার্শাল প্রথমে রমাপ্রসাদের উক্তি অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, যুক্তিতর্ক প্রয়োগ দ্বারা রমাপ্রসাদ পরে মার্শালকে স্বমতে আনয়ন করেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের নৃতত্ত্ব শাখার সভাপতিরূপে রমাপ্রসাদ তাঁহার ভাষণে ইহাই প্রমাণিত করেন যে বৌদ্ধ ও জৈনভাবধারা বৈদিক মতের বিরুদ্ধে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত হয় নাই, ভারতের প্রাক বৈদিক অথবা প্রাক আর্য চিন্তাধারায় খৃষ্টজন্মের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে ইহার বীজ নিহিত ছিল, তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে যোগ ও শৈব মতবাদ প্রাক্‌বৈদিক সিন্ধু-সভ্যতার যুগের দান। ভারত সভ্যতার উৎস এই সিন্ধু-সভ্যতার মধ্যেই সন্ধানযোগ্য।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে রমাপ্রসাদ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দ হইতে বহুবৎসরাবধি তিনি সোসাইটির নৃতত্ত্ব বিভাগের সম্পাদক পদে সমাসীন ছিলেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহা সম্পাদিত 'সায়েন্স এণ্ড কালচার' পত্রিকায় অষ্টম খণ্ডে—(১৯৪২-৪৩) নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানে রমাপ্রসাদের বিশেষ গবেষণাগুলির তাৎপর্য বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ২০১—২০৫, ২৫১—২৫৬, ২৯২—২৯৫,)।

ভারতীয় নৃতত্ত্ব আলোচনায় প্রবর্তকের সম্মান রমাপ্রসাদের প্রাপ্য। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ইংরেজী ভাষায় গবেষণা গ্রন্থাদি রচনায় ব্যস্ত থাকিলেও রমাপ্রসাদ বঙ্গভারতীর সেবাতেও তৎপর ছিলেন। বাঙ্গলা মাসিক পত্রাদিতে তাঁহার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। রাজা কংশনারায়ণ, বাঙ্গলার বারভুয়া ও রাজা শশাঙ্ক সম্বন্ধে লিখিত তাঁহার প্রবন্ধগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শেষ জীবনে রমাপ্রসাদ রাজা রামমোহন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আহরণ করেন, এইগুলি যতীন্দ্রকুমার মজুমদারের সহযোগিতায় কলিকাতা হইতে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (সিলেক্‌সনস্ ফ্রম অফিসিয়াল লেটারস্ য়্যাণ্ড ডকুমেণ্টস্ রিলেটিং টু দি লাইফ অফ্ রাজা রামমোহন রায়, চন্দ ও মজুমদার সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯৩৮)।

রমাপ্রসাদ বিভিন্ন পত্রিকায় যে সব প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন তাহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) মাদল পঞ্জী (নোটস্ ফ্রম্ মাদল পঞ্জী, জার্নাল অফ্ বিহার য়্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, ১৩শ খণ্ড)

(২) ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্তি (নোটস্ অন্ এনসিয়েণ্ট মন্নুমেণ্টস্ অফ্ ময়ূরভঞ্জ, ঐ ঐ)

(৩) পুষ্যমিত্র ও সুঙ্গ সাম্রাজ্য (পুষ্যমিত্র য়্যাণ্ড্ সুঙ্গ এম্পায়ার, ইণ্ডিয়ান্ হিষ্টোরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ৫ম খণ্ড)

(৪) বৌদ্ধ ও জৈনদের কেশ ও শিরস্ত্রাণ (দি হেয়ার য়্যাণ্ড উষ্ণিস্ অফ্ দি বুদ্ধস য়্যাণ্ড জৈনস্, ঐ, ৭ম খণ্ড)

(৫) প্রাচীন বাঙ্গলার নির্বাচিত দুইটি রাজা (ইলেকসান্ অফ্ টু অফ্ দি আর্লি কিঙ্গস্ অফ্ বেঙ্গল, মডার্ণ রিভিউ, ৫৭তম খণ্ড ১৯৩৫)

(৬) ভারতের জাতিসমূহ (রেসেস অফ্ ইণ্ডিয়া, জার্নাল অফ্ ডিপার্টমেণ্ট্ অফ্ লেটরস্ অফ্ দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ভল্যুম ৮, ১৯২২)

শেষ জীবনে রমাপ্রসাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৮ মে এলাহাবাদে তিনি পরলোকগমন করেন।

প্রচুর অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার দ্বারা প্রত্নতত্ব, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলা বিষয়ে তিনি যে সব গ্রন্থ ও নিবন্ধ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতবিদ্যা চর্চার ইতিহাসে তাঁহার স্মৃতি ভাস্বর করিয়া রাখিবে।

কার-ঠাকুর কোম্পানী

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

সরকারী কর্মচারী থাকাকালীনই যুবক দ্বারকানাথ নানা দেশহিতকর কার্যে যোগ দিতে আরম্ভ করেন। সতীদাহ-নিবারণ ও অন্যান্য বিষয়ে রামমোহন রায়ের সহিত সহযোগিতার বিষয় আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও কর্মপ্রণালীও বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। তিনি কেবল ইংরাজী ভাষা বা আদবকায়দাই নয়, এমন কি সঙ্গীত পর্যন্ত শিখেছিলেন। (১) এই ভাবে সাহেবিয়ানা পুরাদস্তর রপ্ত করে সাহেবদের সঙ্গে সমানভাবে মেলা-মেশা আরম্ভ করলেন। তা' বলে তিনি যে নিজস্ব ভাবধারা ত্যাগ করেছিলেন তা' নয়। 'শিক্ষায় সংস্কৃতিতে পরিশীলিত এবং কুসংস্কারমুক্ত মননের অধিকারী দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্পর্কে সাধারণ্যে প্রচলিত একটি দীর্ঘকালীন ধারণা যে তিনি অধিক রকমের ইংরেজ অনুগামী ছিলেন। * * * বলতে গেলে তিনি একান্তভাবে নিজের চেষ্টাতেই বড় হয়েছিলেন। তার এই স্বর্ণিল সাফল্যের মুলে ছিল তাঁর অদম্য কর্মশক্তি ও প্রগাঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা, যে দু'টি গুণের প্রতি ইংরেজদের অসীম শ্রদ্ধা। সেই কারণেই ইংরেজী-শিক্ষিত দ্বারকানাথ তাঁহার ইংরেজ বন্ধুদের অবিরল সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন। (২)

এইরূপে তখনকার "প্রগতিশীল" দলের পুরোভাগে এসে তিনি তখনকার বড়লাট প্রভৃতির বিশেষ প্রিয়পাত্র হ'ন। কোন উৎসব উপলক্ষে তিনি একবার লর্ড বেন্টিংককে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করলেন। লাটসাহেবের বাড়ীর অন্যান্য সকলেই আসেন কিন্তু বড়লাটসাহেব নিজে সে উৎসবে

---

(১) 'আমার বাল্য কথা ও বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে দেখি যে সত্যেন্দ্রনাথকে বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ প্রফেসার ম্যাক্সমূলার দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বলেছেন—'তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এবং ইটালীয় ও ফরাসী সঙ্গীত খুব পছন্দ করতেন। তিনি গান করতেন এবং আমি সেই গানের সঙ্গে পিয়ানো বাজাতাম। তিনি বেশ সুকণ্ঠী ছিলেন * * * খাঁটি ভারতীয় সঙ্গীত গাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তিনি মৃদু হেসে বললেন 'তুমি তা উপভোগ করতে পারবে না।' তারপর আমার অনুরোধ রক্ষার জন্য একটি গান নিজে বাজাইয়া গাইলেন। সত্য বলতে কি, আমি বাস্তবিকই কিছু উপভোগ করতে পারলাম না। আমার মনে হয় সে গানে না আছে সুর, না আছে ঝঙ্কার, না আছে সামঞ্জস্য। দ্বারকানাথকে একথা বলায় তিনি বললেন 'তোমরা সকলেই এক রকমের। যদি কোন জিনিস তোমাদের কাছে নতুন ঠেকে বা প্রথমেই তোমাদের মনোরঞ্জন করতে না পারে, তোমরা অমনি তার প্রতি বিমুখ। প্রথম যখন আমি ইটালীয় গীতবাদ্য শুনি আমিও তাতে কোন রস পাইনি, কিন্তু তবু আমি ক্ষান্ত হইনি। আমি ক্রমাগত চর্চা করতে লাগলাম যতক্ষণে না আমি তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলাম। সকল বিষয়ই ঐরূপ। * * *

(২) কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আসেন নাই। বেণ্টিংকের অনুপস্থিতিতে দুঃখিত দ্বারকানাথ কারণ জিজ্ঞাসা করায়, লাটসাহেব বুঝিয়ে বলেন যে তিনি তাঁর নিজের কাউন্সিলের সদস্যদেরও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। দ্বারকানাথ নিমকি বোর্ডের দেওয়ান অর্থাৎ তাহারই অধীনস্থ কর্মচারী। এমতাবস্থায় নিমন্ত্রণ স্বীকার করা তাঁর অনুচিত এবং গ্রহণ করিলে ইউরোপীয় মহলে হুলুস্থুলু পড়িয়া যাইবে।

দ্বারকানাথ বুঝিলেন যতকাল তিনি কাহারও অধীনস্থ কর্মচারী থাকবেন, ততকাল যতই হৃদ্যতা থাক, সমান ভাবে সকলে তাঁহার সহিত মিশিবে না; উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা তাঁহাকে কোম্পানীর কর্মচারীরূপেই দেখিবে—উপযুক্ত মর্যাদা পাওয়া সম্ভব হইবে না। এই সব চিন্তা করিয়া এবং ক্রমশঃ ব্যবসায় ফলাও করিবার আকাঙ্খায় ৩৮ বৎসর বয়সে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের পয়লা আগষ্ট তিনি পদত্যাগ-পত্র পাঠালেন। তার উত্তরে ৭ই আগষ্ট বোর্ডের তরফ থেকে লেখা হয়—

"নিজস্ব ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজের চাপে আফিসের কাজে যতটা মনোযোগ দিতে পারিলে নিজে খুসী হ'তেন ততটা মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ায় আপনি যে আবগারী, লবণ ও অহিফেন সংক্রান্ত বিভাগের দেওয়ানের পদ থেকে ইস্তফা দিতে চেয়ে পয়লা তারিখে পত্র লিখেছিলেন তার প্রাপ্তি স্বীকার করছি। আপনার চিঠি বোর্ডের নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং তাহারা আপনার পদত্যাগপত্র মানিয়া লইয়াছেন বলিয়া জানাইতে আজ্ঞা দিয়াছেন। তৎসহ একথাও তাহারা জানাইয়াছেন যে বোর্ডের অধীনস্থ রাজস্বের অতি প্রয়োজনীয় অংশগুলির সমূহ উন্নতি সাধনে আপনার বুদ্ধি, উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা এতাবত যে নিপুণভাবে নিয়োজিত ছিল, তাহার সাহায্য হইতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁহারা নিরতিশয় দুঃখিত। আপনার নিপুণতা ও বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে বোর্ডের যে অত্যুচ্চ ধারণা এবং এই বিভাগের সহিত আপনার ঘনিষ্টতায় সাধারণ যে বিবিধ প্রকারে উপকৃত হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত বোর্ডের কার্যবিবরণীতেই লিখিত হওয়ায় বর্তমানে এইমাত্র বলাই যথেষ্ট যে আপনার কর্মকুশলতার জন্য বোর্ড আপনাকে অসংখ্য সাধুবাদ দিয়াছেন।"

এ ছাড়া সদর বোর্ডে সেক্রেটারী হেনরী মেরেডিথ পার্কার সাহেব নিজে একটি পত্র লেখেন—

প্রিয় দ্বারকানাথ,—কার প্রেরিত আপনার পত্রখানি আমি পেয়েছি। একথা বলা আবশ্যক যে আপনার পত্রখানি আমাকে অভূতপূর্ব আনন্দ দিয়েছে। যাদের আমরা শ্রদ্ধা করি তাদের ভাল মতামত পাওয়া খুবই আনন্দের বিষয়। আমার আনন্দের আরো বেশি কারণ এই যে—আপনার মত এত বেশি শ্রদ্ধা আমি আর কাউকে করি না। বন্ধুত্বের খাতিরে আমি আপনার জন্য সামান্য যা কিছু করেছি তাকে আপনি এত বাড়িয়ে বলেছেন দেখে আমি বাস্তবিকই লজ্জা অনুভব করি। বন্ধুত্ব ছাড়াও আপনার সাধুতা এবং মহৎ চরিত্রের জন্য বিবেকের খাতিরে আমি এ না করে পারতাম না। বাস্তবিক একথা আমি মন থেকেই বলতে পারি যে, যে বিচিত্র পরিস্থিতিতে কার্যোপলক্ষে আপনি অবস্থান করছিলেন তখন আপনার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত কাপুরুষোচিত এবং প্রতিহিংসামূলক আক্রমণের বিরুদ্ধে কিছু করবার জন্য যদি আমি নিমিত্তমাত্র হই, তা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আমার পদমর্যাদার জন্যে। যাকে আমি সুবিচার মনে করি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই আমি এরূপ করেছি। এ ছাড়া জনস্বার্থমূলক কাজে আপনার সাহায্য কত অমূল্য সেটাও আমি অনুভব করেছি। আপনার কাজ যে-কোন সংস্কারমুক্ত লোকের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান মনে হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই।

যে কাজ আপনি আনন্দের সঙ্গে সম্পাদন করছিলেন, এবং যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য ছিল অপরিহার্য, সে-কাজ থেকে আপনার অবসর গ্রহণ করাকে যদি আমার পক্ষে খুবই দুঃখজনক ব্যাপার বলি, তা হলে আপনার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি যে-দুঃখ অনুভব করছি তা সে দুঃখকে অত্যন্ত ক্ষীণভাবেই প্রকাশ করবে। তবু আমি এরূপ দুঃখ প্রকাশ করছি শুধু এ ভরসায় যে, আপনি পুনরায় কোন সরকারী কাজে নিযুক্ত হবেন, সে-কাজ সরকার কর্তৃক আপনার প্রতিভার স্বীকৃতিমূলক উচ্চতর কোন কাজ এবং যে-কাজ আপনি ছেড়ে দিয়েছেন তার চাইতেও আপনার গ্রহণের যোগ্য অধিকতর উপযুক্ত কোন কাজ। যে সম্মানজনক কর্মজীবনে আপনি প্রবেশ করেছেন তার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেও এমন অনেক চাকরী আছে যা আপনি কৃতিত্বের সঙ্গে করতে পারেন। এমন কোন সম্মানজনক কাজ গ্রহণ করার জন্যে যদি আপনার নিকট কখনও প্রস্তাব আসে আশা করি আপনি তা গ্রহণ করবেন! কারণ এটা আমি অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি নিজের সম্মান বজায় রেখে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করতে পারেন এমন লোক আপনার মত খুব বেশি নেই। আপনি বলেছেন আপনি আমার অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। পারিনে এজন্য যে, বন্ধুত্বের মধ্যে অনুগ্রহ প্রকাশের কোন প্রশ্নই ওঠে না। যাকে আপনি দয়ার কাজ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন তাকে আমি সুবিচারের কাজ ছাড়া আর কিছু বলতে পারিনে। প্রিয় দ্বারকানাথ, কী ভাবে আপনি এধরণের কাজ করতে পারেন তা এখন আপনাকে বলি। আপনার দেশবাসীর সামনে আপনি আত্মমর্যাদা এবং সাধুতার একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করুন। লোকে ভাল বলুক মন্দ বলুক—সত্য পথে অবিচলিত থেকে আপনি কাজ করে যান। সে-কাজ হবে আপনার বিবেক অনুসারী। জ্ঞান ও বুদ্ধিবিত্ত সভ্যতার পথে আপনি পদাতিক হন। এ যদি আপনি করে যান তা'হলে আপনার প্রতি আমার তুচ্ছ আনুকূল্যের জন্য নয়, বরং আপনার প্রতি বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধাবশত আমি যা স্বেচ্ছায় করতে চাই তার জন্য, আমার কাজ শতসহস্রগুণ পুরস্কৃত হয়েছে অনুভব করব। আপার উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির জন্য আমার সপ্রীতি সদিচ্ছা রইল, আপনার সৎপ্রবৃত্তি এবং আন্তরিক শুভেচ্ছার প্রেরণায় অপরের সুখ সম্পাদনের জন্য আপনি যে চেষ্টা করে থাকেন, সে সুখ যেন আপনাকে ঘিরে থাকে। প্রিয় দ্বারকানাথ, আমার এ শুভ কামনাকে আশা করি আপনি বিশ্বাসের চোখে দেখবেন। (৩)

আপনারই অনুরক্ত বিশ্বস্ত বন্ধু
এইচ, এস, পার্কার

সুস সাগর
১৪ই অক্টোবর, ১৮৮৪

সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিবার দুমাসের মধ্যেই তিনি স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করবার জন্য নিজের কুঠী খোলেন। এই কুঠীর নাম হল কার টেগোর এণ্ড কোম্পানী—মূলধন দশলক্ষ টাকা।

এর আগে পর্যন্ত এদেশীয় ব্যবসাদাররা বিলাতী কুঠীর হুকুমমত মাল ও টাকা জুগিয়ে দস্তুরীটুকু নিতেন। তাঁদের বলা হত বিলাতী কুঠীর বেনিয়ান। তাঁরা নিরাপদে নিশ্চিন্তভাবে লাভের সামান্য যে অংশ পাইতেন তাহাতেই খুসী থাকিতেন—নিজেরা চালানী কারবারে নামিয়া পুরালাভ করিবার পথে যাইতেন না। কারণ ইউরোপের সঙ্গে বিশেষভাবে যোগ না থাকিলে একাজে নামা যুক্তিযুক্ত

(৩) পত্রের অনুবাদক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

ছিল না এবং অবস্থাপন্ন ভারতীয় মহলে তখনও চেষ্টা ছিল সাহেবদের সঙ্গে মাখামাখি যতটা কম হয় ততই ভালো। এই পন্থা ভেঙে দ্বারকানাথ ঠিক করলেন যে ইউরোপীয় আদর্শে "হাউস" বা কারবারী গোষ্ঠী খুলবেন। "ভারতবাসীদের দ্বারা এরূপ স্বাধীন বাণিজ্যকুঠী কলিকাতায় স্থাপনে বড়লাট বেন্টিঙ্ক সন্তোষ প্রকাশ করিয়া দ্বারকানাথকে অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। একজন লেখক বলিয়াছেন যে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ইংরেজি শিক্ষা-সংক্রান্ত ঘোষণা অপেক্ষা ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্তৃক কার ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। কারণ ইহার পূর্বে বাঙালিরা বড় বড় ইংরেজ কুঠিয়ালকে সুদে টাকা ধার দিয়া মুৎসুদ্দী নামে পরিচিত হইত এবং তাহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া চলিত। ইহাতে কেহ কেহ লাভবান হইলেও ব্যবসা ও শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠাদ্বারা ইংরেজেরা যেরূপ স্বদেশের উন্নতি করিয়া চলিতেছিল, তাহাদের দ্বারা তেমনটি হইবার মোটেই সম্ভাবনা ছিল না। দ্বারকানাথ এই বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করেন, এবং কার ঠাকুর কোম্পানি গঠন করিয়া জাতীয় উন্নতির একটি পথ বাঙালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করিয়া দেন।"

কার-ঠাকুর কোম্পানির প্রতিষ্ঠার সংবাদ দিয়ে সমাচার দর্পণ ১৮৩` সালের ৪ঠা অক্টোবর লেখেন—

কার-ঠাকুর কোং।—কার-ঠাকুর কোম্পানির নূতন বাণিজ্য-কুঠির ব্যাপার অদ্য আরম্ভ হইল। ঐ কুঠির দ্বিতীয় অংশী বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পূর্বে সাল্টবোর্ডের দেওয়ান ছিলেন, তিনি এই সাধারণ বাণিজ্য কার্য ও এজেন্সী কার্যে প্রবৃত্ত হওনার্থ ন্যূনাধিক ছয় সপ্তাহ হইল ঐ দেওয়ানী কার্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদ্বিষয় মনোযোগ করণের যোগ্য বটে, যেহেতু কলিকাতার মধ্যে ইউরোপীয়দের ন্যায় বাণিজ্য করিতে এবং এজেন্সী ও বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে যে হিন্দু প্রথম প্রবর্ত্ত হন তিনি উক্ত বাবুই কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বোম্বাই নগরে পারসীয়েরা এতদ্রূপ বিদেশীয় বাণিজ্যকার্য অনেক কালাবধি করিতেছেন। সাল্ট বোর্ডের দেওয়ানী কার্য্য বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের (২) হইয়াছে তিনি তমলুকের এজেন্টের দেওয়ানী কার্য্য ত্যাগ করিয়া ইহা গ্রহণ করিলেন।"

প্রথম প্রতিষ্ঠার সময় কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন উইলিয়াম কার, (৩) দ্বিতীয় দ্বারকানাথ ও তৃতীয় উইলিয়াম প্রিন্সেপ। শোনা যায় কার সাহেবকে দ্বারকানাথ বড়লাট বেন্টিকের পরামর্শ মতই অংশীদার নেন। সেটা ঠিক হউক বা না হউক, ইউনিয়ন ব্যাংক সংক্রান্ত ব্যাপারে দ্বারকানাথ আগেই কার সাহেবের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর ব্যবসা ও অর্থ বিষয়ক ব্যাপারে পারদর্শিতা দেখতে ও জানতে পেরেছিলেন। পরে মেজর এইচ, বি হেণ্ডারসন, ডাব্লিউ

২। পরে তিনি কিছুদিন কার ঠাকুর কোম্পানীতেও চাকুরী করেছিলেন। তারপর সদর দেওয়ানী কোর্টে ওকালতি করিতে চলিয়া যান ও প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জ্জন করেন। ইহার পিতা গোপীমোহন ঠাকুর ও দ্বারকানাথের পিতা খুড়তুতো ভাই।

৩। কার সাহেব ১৮২৯ খৃঃ পামার কোম্পানীর কর্ম্মচারী হয়ে আসেন এবং কিছুদিন মধ্যেই ইউনিয়ন ব্যাংকের সেক্রেটারীরূপে যোগ দেন।

সি এম প্লাওডেন (৪) ডাক্তার ম্যাক্ ক্যারসান, (৫) ক্যাপ্টেন টেলর, (৬) দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিভিন্নসময়ে ইহার অংশীদার হ'ন। ডি এম গর্ডন প্রথমে এই কুঠীতে কর্ম্মচারী হয়ে আসেন পরে অংশীদার পর্য্যন্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরই ছিলেন এই কোম্পানীর প্রাণ। তিনিই ইহার পরিচালন করিতেন ও অর্থ যোগাইতেন। আসলে আর্থিক ব্যাপারে তিনিই ছিলেন এ কোম্পানীর সর্ব্বময় কর্ত্তা; অন্য কোনও অংশীদারকে আর্থিক বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। (৭) তাঁর নিজের অর্থবল, ইউনিয়ন ব্যাংকের সহিত তাঁহার যোগ, এবং অন্যান্য ব্যাংক ও কুঠিতে তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাসের ফলে কারবারের জন্য যখন যত বেশী টাকারই দরকার হউক, তৎক্ষণাৎ তাহা জোগাড় করিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হয় নাই। (৮) আইন ব্যবসার সময়ে যে সকল জমিদারকে সাহায্য করিয়াছিলেন, দ্বারকানাথের মুখের কথায় তাঁরাও অকুণ্ঠিত চিত্তে টাকা দিয়েছেন। (৯)

কার ঠাকুর কোম্পানীর আফিস প্রথমে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে রাণী মুদি গলির (১০) কোণে ছিল। পরে ষ্টাণ্ড রোডের সন্নিকটে উঠিয়া গিয়াছিল। কোম্পানী ব্যবসা বন্ধ করার পর এর দপ্তর জোড়াসাঁকো ঠাকুরদের বসতবাড়ীতে তুলে আনা হয়।

কার ঠাকুর তথা দ্বারকানাথের বাণিজ্য খুব তাড়াতাড়ি নানা বিষয়ে জড়িয়ে পড়ে তার কারণ ছিল। ১৮৩৩ খৃঃ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের সওদাগরী ভাবটা পুর্ণরূপে ছাড়তে পারেন নি। রেশম প্রভৃতি কয়েকটা জিনিষের কারবার তাঁরা একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। ঐ বৎসর যখন কোম্পানীর সনদ পুনঃ প্রদত্ত হয় তখন এক নতুন সর্ত্ত থাকে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনী আর কোনরূপ ব্যবসায় নিজেদের জন্য করিতে পারিবে না। এবং ইচ্ছা করিলে ইংরাজরা ভারতে জমি

৪। ইনি যখন ২৪ পরগনার কলেক্টর তখন তাঁর সেরেস্তাদার হয়ে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ প্রথম সরকারী চাকুরীতে ঢোকেন।

৫। রামপুর বোয়ালিয়ার সিভিল সার্জ্জান।

৬। ইনি মাদ্রাজ সামরিক বিভাগে কাজ করতেন।

৭। নটিংহাম ইউনিভার্সিটীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত বেন্টিংক পেপার্স থেকে অমলেশ ত্রিপাঠী মহাশয় কার ঠাকুর কোম্পানী সম্বন্ধে বেন্টিংককে লেখা দ্বারকানাথের এক চিঠির উল্লেখ করেছেন। তা'তে দ্বারকানাথ ২০ অগষ্ট ১৮৩৪ লিখছেন—বাংলার ব্যবসায়ের ইতিহাসে এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব এইজন্য যে বাঙ্গালী ব্যবসায়ী ও তাহার মূলধনের সঙ্গে ইংরেজদের প্রকাশ্যভাবে অংশীদারী এবং তার সরাসরি স্বীকৃতি এই প্রথম।

৮। কিশোরীচাঁদ মিত্র।

৯। "দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তখনকার কলিকাতার প্রভূত ধনশালী ৺রামদুলাল সরকারের বংশধরেরা, ৺জয়রাম মিত্র, রাজচন্দ্র দাস (মাড়), রাণী কাত্যায়নী (পাইকপাড়া) প্রভৃতি এবং কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি, অনেক সময় বিস্তর টাকা বিনা লেখাপড়াতেই কর্জ্জ দিতেন।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

কিনিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতে পারিবেন। ফলে ১৮৩৪ সাল হইতে ভারতের সাহেব ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য অবাধ ভাবে বিস্তৃতি লাভ করিল এবং পূর্ব্বে যেখানে বেনামিতে ভয়ে ভয়ে জমিদারী কিনিতেন বা কর দিয়া লইতেন এখন প্রকাশ্য ভাবে সে সব করিতে পাইয়া নীলচাষ এক বৃহৎ কারবার হইয়া পড়িল। (১০)

দ্বারকানাথের পৈত্রিক জমিদারী বিরহিমপুর পরগণার প্রধান মৌজা কুমারখালিতে কোম্পানীর একটা রেশমের কুঠী ছিল। এখন কোম্পানীর বাণিজ্য রহিত হওয়াতে ঐটা বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত হইল। দ্বারকানাথ তাহা কিনিয়া লইলেন। এতকাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রেশমের ব্যবসায় একচেটিয়া করে রেখেছিলেন। এদেশের তৈরী রেশম কাচামাল হিসাবে কিছু ইউরোপ ও কিছু অংশ চীনে বিক্রয় করিতেন ; কিন্তু চীনদেশের তৈরী অতিসূক্ষ্ম রেশমবস্ত্র কিনিয়া তাহা বেশী পরিমাণে ইউরোপে রপ্তানি করিবার ঝুঁকি লইতেন না। তাই চীনা রেশমের তখন খুব দাম। কোম্পানী রেশমের ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে দ্বারকানাথ তাহা লইলেন এবং তা' ছাড়া চীন হইতেও রেশম আমদানি আরম্ভ করিলেন। এই চীনা রেশমের কারবার প্রথম আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথ যখন বিলাত যান, তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্য অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যের সহিত কয়েকখণ্ড চীনা রেশম ও দুষ্প্রাপ্য পদার্থ বলিয়া উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

এ ছাড়া তিনি রামনগরে চিনির কারখানা খুলিলেন ও রাণীগঞ্জে খনি হইতে কয়লা তোলার ব্যবসায় সুরু করিলেন।

এসব ছাড়াও কারটেগোর কোম্পানীর যে ব্যবসায় সবচেয়ে বিস্তৃত ছিল তা' নীলের। শিলাইদহ প্রভৃতি নানাস্থানে তাঁহাদের নীলের কুঠি ছিল। তাঁহাদের আফিসকে লোকে নীলের হাট (ইণ্ডিগো মার্ট) বলিয়া চিনিত। তখনও নীল বাংলার অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় নাই—বরং নীলচাষকে দেশের উন্নতির কারণ বলেই এদেশীয় সকলে মেনে নিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের পরিচালিত সংবাদ কৌমুদীতে "এ ল্যাণ্ড হোল্ডার" বা জমিদার এই ছদ্মনামে একজন ১৮২৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী লিখছেন—

তাঁরা মৌখিক ও লিখিত আলোচনায় সাধারণতঃ দেশময় সাহেবদের নীলচাষ করায় অসুবিধা ও ক্ষতির কথা বলিয়া অপবাদ দেন এবং সাধারণকে বুঝাইতে চান যে ধান্য ইত্যাদি ফসলের উপযুক্ত জমির অধিকাংশ সাহেবরা ইতিমধ্যেই নীলের আবাদের জন্য জবরদখল করায় দেশবাসীর প্রধান খাদ্যসামগ্রী চাউলের অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছে এবং জীবনধারণের অবশ্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে গরীবলোকেরা বিশেষ দৈন্য ও ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

যাঁদের গ্রামে জমিজমা আছে এবং জমিদারীর তদারক করেন তাঁদের কাছে কিন্তু এটা সর্ব্ব-জনবিদিত যে নীলচাষের ফলে কত বিস্তীর্ণভাবে পতিত জমির উদ্ধার করে আবাদ হচ্ছে।

নীলকরদের পয়সা দেশে ছড়িয়ে পড়ায়-গরীব লোকেরা বরং ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছে। যেসব চাষীরা পূর্ব্বে বিনাপয়সায় কিম্বা কয়েকমুঠা চালের বিনিময়ে জমিদারের জন্য বেগার খাটিতে বাধ্য হইত তারা নীলকরদের কাছে মাসিক চারিটাকার মত মজুরী পেয়ে আজকাল কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য

১০। বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট ;

ও স্বাধীনতা ভোগ করছে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকে যাঁরা পরিবারের ভরণপোষণ কি ভাবে চলিবে ভাবিয়া বিব্রত হইতেন তাঁহারা এখন জমিদার বা বড়লোক বেনিয়ানের শরণাপন্ন না হয়ে বেশী মাহিনাতে নীলকরদের সরকার ইত্যাদি চাকুরিতে নিযুক্ত আছেন।

এমন কি স্বয়ং রামমোহন রায় ১৮২৯ সালে ন্যাথনিয়েল এলেক্‌জাণ্ডার সাহেবের চিঠির উত্তরে লিখছেন দেখছি—

"The advances made to ryots by the indigo planters have increased in mot factories in consequence of the price of indigo having risen, and in many, better prices than formerly are allowed for the plant.... I am positively of opinion that upon the whole the indigoplanters have done more essential good to the natives of Bengal than any other class of persons. This is a fact which I will not hesitate to affirm whenever I may be questioned on the subjeet either in India or in Europe. I at the same time must confers that there are individuals of that class of society who either from hasty disposition or want of due discretion have proved obnoxious to those who expected milder treatment from them. But my dear Sir, you are well aware that no general good can de affceted without some partial evil, and in this instance I am happy to say that the former greatly preponderates over the latter. If any class of the natives "would gladly see them all turned out of the country," it would be the zeminders in general, since in many instances the planters have successfully protected the ryots against the tyranny and oppression of their landlords."

আরেকটী বিষয়েও দ্বারকানাথের কোম্পানী অগ্রণী হন। সে হল চায়ের ব্যবসায়। দেবেন্দ্রনাথ গল্প করেন যে "আমার চা" কার-ঠাকুর কোম্পানীই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আমদানী করেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিংক যখন চীনদেশীয় চা গাছের চারা নিয়ে কুমায়ুন প্রভৃতি হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে পরীক্ষা করাইতেছিলেন। সেই সময়েই আসামে চায়ের আবিষ্কার হয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আসাম থেকে চায়ের অনেকগুলি নমুনা কলিকাতায় পাঠানো হয়। অনুমান করা বোধহয় ভুল নয় যে কার ঠাকুর কোম্পানীর দ্বারাই এ কাজ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আসাম কোম্পানীকে সমস্ত দিয়া দেন। এই কোম্পানীর চেয়ারম্যান দেখি দ্বারকানাথের বন্ধু ও ইণ্ডিয়ান জেনারেল ষ্টীম ন্যাভিগেসন কোম্পানীর চেয়ারম্যান জন স্টর্ম। এই কোম্পানীতেও দ্বারকানাথের নিজের নামে বা কার টেগোর কোম্পানীর নামে শেয়ার ছিল।

প্রতিষ্ঠার দশ বৎসরের ভিতর কার ঠাকুর কোম্পানীর ব্যবসায় বিশাল আকার ধারণ করে। ১৮৪২ সালের অবস্থার বর্ণনায় দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী ও নীলের কুঠি, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার।

ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়।"

এই কার-ঠাকুর কোম্পানীর স্থাপন ও কারবার দ্বারকানাথের জীবনের একটী অন্যতম সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। তিনি উইল করিবার সময়ও নিজের পরিচয় স্বরূপ লিখেছেন "কলিকাতার কার-ঠাকুর কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার বাংলাদেশের কলিকাতাবাসী আমি দ্বারকানাথ ঠাকুর।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কোম্পানী সম্বন্ধে প্রামাণ্য কাগজপত্র প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। "দ্বারকানাথের দুইখানি দলিলের ও কয়েকটি মোকদ্দমার বিবরণ; এবং ইউনিয়ন ব্যাংকও কার-ঠাকুর কোম্পানী সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদ পত্রের নানা উল্লেখ—এই সকল হইতেই এখন এ বিষয়ের যাহা কিছু তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়।" কার-ঠাকুর কোম্পানী নিলামে চড়ার পর আফিস যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে উঠে আসে তখন সমস্ত কাগজপত্র দ্বারকানাথের বসতবাড়ীর (বর্ত্তমান মহর্ষিভবনের) নীচের তলায় জড়ো করিয়া কয়েকটা ঘরে বন্ধ রাখা হয়। তার প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর বাদে যখন ঠাকুরবাড়ীতে সাহিত্যের হাওয়া জোর বইছে এবং নিত্যনূতন আসর বৈঠকের জন্য স্থানাভাব হচ্ছে সেই সময়ে ঐ সব কাগজ স্তূপীকৃত করে পিছনের (পূর্ব্বদিকের) বাগানে রবীন্দ্রনাথের আদেশে ও তাঁহার তত্বাবধানে ভস্মীভূত করা হয়। দুচারটা কাগজ ও ছবি দৈবক্রমে রক্ষা পায়। ঐ অর্দ্ধদগ্ধ কাগজ ও ছবি ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে দেখিয়াছি। (১১) ঐ কাগজ থেকে দেখা যায় যে কার-ঠাকুর কোম্পানীর দৈনিক পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকার কারবার চলিত।

"কার-ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য যত বহুমুখীন হইয়া প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই ইহার ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে আর্থিক দায়িত্বের পরিমাণ অধিক হইতে অধিক বর্ধিত হইতে লাগিল। * * *

এদিকে আবার এই সময়েই বাণিজ্য-জগতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ১৮৪০ সালের কাছাকাছি হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় ফেল হইল। যতদিন দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাণিজ্য-জগতের এই সকল ঝঞ্ঝাবর্ত-প্রসূত বিপদ, এবং নিজ মুক্তহস্ততা-প্রসূত বিপদ, এই উভয় বিপদ অতিক্রম করিয়া, অসাধারণ বুদ্ধিবলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার-ঠাকুর কোম্পানীকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। * * * তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত উভয় ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভটী যেন খসিয়া পড়িল।"

কিন্তু তৎপূর্বেই কার-ঠাকুর কোম্পানীর সুদৃঢ় ভিত্তিতে ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়েছে। দ্বারকানাথ বেঁচে থাকিতেই কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার গর্ডন সাহেব ব্যবসায়ে বিশৃঙ্খলতার কথা জানিয়েছিলেন। সে বিষয়ে দেখি মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও দ্বারকানাথ তিরস্কার করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২২ মে ১৮৪৬)—"* * * তোমার গাফিলতির পরিচয় পাইয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়াছি। * * * গর্ডন সাহেব যা জানাইয়াছেন এবং অন্যান্য সূত্রেও যা শুনেছিলাম এখন প্রত্যয় হয় তার সবই সত্য। তোমার হাতে যে সব জরুরী কাজের ভার আছে, সে সমস্ত নিজে দেখাশুনা

(১১) বর্তমানে ঐগুলি সম্ভবতঃ ক্ষিতীন্দ্রনাথের গ্রন্থাগার ও চিঠি-পত্র যাহা মেনকা দেবী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন তাহারই মধ্যে কোন স্থানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে।

না করে আমলাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছ! সম্পত্তি রক্ষার বদলে খবরের কাগজে লেখালেখি আর মিশনারীদের সঙ্গে ঝগড়া করিতেই তোমার সমুদয় সময় ব্যয় হইতেছে। দেশের জলবায়ু সহ্য করিবার মত সুস্থ থাকিলে আমি নিজে দেখাশুনার জন্য এই মুহূর্তে লণ্ডন থেকে দেশে রওনা হইতাম।"

তাঁহার অবর্তমানে দেবেন্দ্রনাথ যাহাতে ব্যবসা সুচারুরূপে চালাতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে "হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিবার পর ইঁহার পিতা ইহাকে নিজ-স্থাপিত 'কার-ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী' এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বাণিজ্য কার্যালয়ে কার্য শিখিতে নিযুক্ত করিয়া দেন।" (১২) কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের বিষয় কর্মে মন দেওয়া অপ্রীতিকর বোধ হইতেছিল। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে "তখন আমার পিতা ইংলণ্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্যের ভার সকলই আমার উপরে পড়িল। কিন্তু আমি কোন কাজকর্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত; আমি কেবল বেদবেদান্ত, ধর্ম ও ঈশ্বর ও চরমগতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কাজ-কর্মের প্রতিঘাতে আমার উদাসভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল।" এই উদ্দেশ্যে "১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে বাহির হইলাম।" দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যাইবার পূর্বে ট্রাষ্টডীড সম্পাদন করেন "তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা লইয়া মত্ত ছিলেন। ... ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাসে যখন দ্বারকানাথ উইল করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালা ও পত্রিকা লইয়া মত্ত ছিলেন। এ সমস্ত দ্বারকানাথ লক্ষ্য করেন নাই তাহা নহে। 'তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায়-কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈত্রিক বিষয় বিরহিমপুর ও কটকের জমিদারীও থাকবে না। তাঁহার বাণিজ্য-ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল।"

এইজন্যই দেখি যে দ্বারকানাথের যে উইল ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর সুপ্রীম কোর্টে রেজিষ্ট্রার টি, টার্টন সাহেব দাখিল করেন তাতে দ্বারকানাথ তাঁর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে কার-ঠাকুর কোম্পানীর দেনাপাওনা ও যোগাযোগ বিষয়ে সবিস্তারে লিখে গেছেন, "যাহাতে আমার সম্পত্তির হানি না করে ঐ ব্যবসায় হাউসের রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

যদি দেবেন্দ্রনাথ ব্যবসায় চালাইতে অনিচ্ছুক হ'ন ত' দ্বারকানাথের অন্যান্য পুত্রদের কেহ ঐ ব্যবসায়ের ভার লইতে পারিবে এমত ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর এমন এক অবস্থার উদ্ভব হইল যা দ্বারকানাথও আশা করেন নাই। কতকটা তত্ত্বাবধান ও ব্যবসার বুদ্ধির অভাবে কতকটা তৎকালীন বাণিজ্য বিপর্য্যয়ের জন্য জমিদারীর আয়ের টাকাও ক্রমশঃ ঐ হাউসের কাজে ব্যয়িত হইতে লাগিল। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "গিরীন্দ্রনাথ তাঁহাকে

(১২) নববার্ষিকী ১২৮৪ বঙ্গাব্দ পৃ ২২১

বুঝাইলেন যে, এখনো দেখুন কি হইতেছে, আমাদের জমিদারীর সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে; যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে, ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে; তাহার এ রাক্ষসী ক্ষুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীদাররা ইহাতে এক পয়সাও দেন না। এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হাউসের উপর কর্ত্তৃত্বভার দিলাম, এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য প্রচুর অবসর পাইলাম।" ইহার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথকে কোম্পানীর অংশীদার করিয়াছিলেন।

"আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানী নামে যে বাণিজ্য-ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার আয় আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবরা ছিলেন, ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।" (১৩)

"গিরীন্দ্রনাথের খুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউসের উপরে তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন একদিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, যখন হাউসের মূলধন সকলি আমাদের, তখন সাহেবদিগকে হাউসের অংশ দেওয়া কেন হয়? সমুদয় বিষয় আমাদের অধিকারে আসুক না কেন? এ কথা আমার মনে ধরিল না। বলিলাম, 'এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনাদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে, কার্য্য করিতেছে, তাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা একা কিছু এই বৃহৎ কার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাইই চাই।"

শেষপর্য্যন্ত কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের কথায় রাজি হইলেন। পূর্ব্বকার "অংশী সাহেবদিগকে, যাহার যেমন অংশ ছিল সেই অনুসারে, কাহাকেও বা এক হাজার টাকা; কাহাকেও দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নূতন প্রণালী নিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।"

মনে রাখিতে হইবে যে গিরীন্দ্রনাথ জমিদারী ব্যাপারে বিচক্ষণ হইলেও হাউসের কাজ কোনদিন হাতে কলমে শেখেন নাই; দেবেন্দ্রনাথ শিখিয়াছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ তখন সম্পদে বীতস্পৃহ। ছোট ছেলে নগেন্দ্রনাথ তখন বিলাসে মত্ত। সাহেবদের অংশগুলি কিনিয়া লওয়ায় কোম্পানীর লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ কমিয়া গেল। আবার ঐ অংশগুলি কিনিতে ঠাকুরদের

---

(১৩) ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হইতে গিরীন্দ্রনাথ কুঠির অংশীদার হইলেন বলে ইংলিশম্যান পত্রিকায় বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে অংশীদার রূপে গ্রহণ করিবার কোনও বিজ্ঞাপন বা উল্লেখ কোনও সংবাদপত্রে পাওয়া যায় না। যখন কার-ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া যাইতেছে, লিকুইডেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে অংশীদাররূপে নগেন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায় না।

হাতের মজুত টাকাও ঐ পরিমাণে হ্রাস পাইল। ঐ অংশীদের অংশ খরিদ করিয়া লওয়ায় তাঁহারা ব্যবসায়ের লাভ হইতে বঞ্চিত হলেন এবং স্বভাবতই দ্বারকানাথের পুত্রদের উপর ক্ষুব্ধ হলেন। ব্যবসায়ী মহলে ইহাও জ্ঞাত ছিল যে দেবেন্দ্রনাথ পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হয়েছেন এবং ব্যবসায়ের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া "বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর ও চরমগতিরই অনুসন্ধানে" ব্যস্ত। দ্বারকানাথের মৃত্যুর দেড় বৎসরের মধ্যেই ঠাকুর কোম্পানীর ভাগ্য বিপর্যায় ঘটে। এই সময়ের বহু কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া যায়। কার-ঠাকুর কোম্পানীর দাদনী টাকা আদায়ের সম্ভাবনা রহিল না, পাওনাদারদের দাবী মেটানো কঠিন হইয়া পড়িল। (১৪) যখন কার-ঠাকুর কোম্পানীর বিপদ আরম্ভ হয় তখনও দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন না। তিনি লিখছেন, "আমি কাশী হইতে ফিরিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানী টলমল্ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে প্রতিদিন টাকা জোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কতদিন চলে? এই সময়ে একদিন একটা ত্রিশহাজার টাকার হুণ্ডী আসিল; সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সেদিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানীর হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল, আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল।" ১৮৪৮ সালের কলিকাতা গেজেটের ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় যে ১২ই জানুয়ারী তারিখে কার-ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া গেল।

১৮৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারীর ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সাপ্তাহিক সংবাদের সারাংশে দেখি যে "প্রকাশ মেজর হেণ্ডারসনের কার-ঠাকুর কোম্পানীর অংশীদারত্বের মেয়াদ শেষ হওয়ায় এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাণিজ্য ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণেচ্ছু হওয়ায় ঐ কোম্পানীর হিসাব গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে বন্ধ করা হইয়াছে। ঐ দিন পর্যন্ত বাবুদ্বয় সমস্ত পাওনা আদায় করিবেন ও প্রাপ্য সকল চুকাইবেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যে ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছিলেন এইরূপে শেষপর্য্যন্ত তাঁর পরিবারবর্গ সে সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন।"

ইহার অব্যবহিত পরেই পাওনাদারদের একটি সভা হয়। "ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উঁহারা সকলে সমবেত হইলেন। ডি এম গর্ডন্ আমাদের দেনাপাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া ঐ সভাতে উপস্থিত করিলেন।" দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে তৎপর ঐ সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন কিন্তু এই বিবরণে ঘটনার তারিখ ও পারম্পর্য তদানীন্তন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে মিলে না।

এ সম্বন্ধে "আত্মজীবনী"র টীকায় শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখেছেন "ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বহুবৎসর-পূর্ব্বের ঘটনা স্মৃতি হইতে বর্ণনা করিতে গিয়া সকলেরই কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি হইয়া যায়। তদুপরি মনে রাখিতে হইবে যে, ১৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১-৩২ বৎসর পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মন ধর্ম্ম লইয়া একেবারে উন্মত্ত ছিল। * * * মানুষ যে বস্তুকে মন-প্রাণ দিয়া ধরে না, তৎসম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও অস্পষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে বিষয় ঘটিত ব্যাপারের

(১৪) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ণনা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে মহর্ষির ভুল হইয়া গিয়াছে।"

"পিতার ব্যবসায়ের পতনের সময় দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত। বিষয়-সম্পত্তি জঞ্জালস্বরূপ, না থাকিলেই ভালো, যেন কতকটা এইরূপ ভাব তাঁহার মনে রাজত্ব করিতেছিল। পরিবারের আর সকলে যখন এই ভাবিয়া আকুল যে কিসে যতটুকু পারি রক্ষা করি। দেবেন্দ্রনাথের মনে ঠিক সেই সময়েই এই ভাব জাগিতেছে যে কিসে সব যায়। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের কার্য্য-কলাপকে পরিবারস্থ অন্য লোকেরা বাতুলের কাজ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

"ব্যবসায় পতনের পর কার-ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে অনাদায়ী টাকা আদায় হইলে ও সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, কোম্পানীর সব ঋণ শোধ হইয়া যাইতে পারিত। উহার উত্তমর্ণগণ সকলেই ধনবান লোক ছিলেন, তাঁহারা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনীতে দেনা এক কোটি টাকা ও পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা বলিয়া লিখিয়াছেন তাহা যদি এই কোম্পানীর দেনা ও পাওনার অঙ্ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি বলিতে হয়, উত্তমর্ণগণ ভালরূপেই জানিতেন যে কোনও ব্যবসায়ী হাউসের পতন হইলে, তাহার পাওনাদারদিগের প্রাপ্যের দশ অংশের সাত অংশও সচরাচর আদায় হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা নহে। সমসাময়িক সংবাদপত্রেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্" এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছিল। তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে "সমুদয় ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত আমাদের সম্পত্তি আইনতঃ আমাদের হইলেও, ধর্ম্মতঃ তাহা পরস্ব; কিরূপে আমরা তাহা ভোগ করিব?" তিনি এই জন্য "নিজে অগ্রসর হইয়া" ট্রাষ্ট সম্পত্তি উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব করিবামাত্র পরিবারের মধ্যে তুমূল ব্যাপার উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইবার আনন্দেই উচ্ছ্বসিত। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তো তাহা নহেন। তাহারা দৃঢ়তার সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই সর্ব্বনাশকর কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন এবং তদ্বিষয় কৃতকার্য্যও হইলেন।"

কোম্পানী দেউলিয়া হইবার তিনমাস বাদে ১৮৪৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ঠাকুরবাবুরা এক বিজ্ঞপ্তি দেন। (১৬)

মেসার্স কার-ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী—

অবিলম্বে দেয় কয়েকটি দাবী মেটাতে অক্ষম হওয়ায় বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমরা পাওনা শোধ দেওয়া আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছি। অতএব আমাদের অবস্থা এবং কি করা বিধেয় সে বিষয়ে পরামর্শ নিমিত্ত আমরা অবিলম্বে আমাদের উত্তমর্ণদের এক সভা আহ্বান করিতেছি।

বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করি যে গত জানুয়ারী মাসের ব্যবস্থা মত লিকুইডিশন প্রচেষ্টায়

---

(১৬) শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল কর্ত্তৃক ৬ এপ্রিল ১৮৪৮ এবং ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া 'হইতে মহর্ষির আত্মজীবনীর সংযোজনে উদ্ধৃত।

বিফল হওয়া কারণেই এরূপ প্রয়োজন সম্পূর্ণ অভাবনীয়রূপে উপস্থিত হইয়াছে। সে সময়ে অন্তদের নিকট আমাদের যে প্রভূত পাওনা আছে তাহার অনেকাংশ অতি সত্বর উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আশা ছিল। কিন্তু সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছি। ১৮৪৬ এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত আমরাও হিসাব নিকাশের অংশীদাররা আমাদের আদায়ী পাওনা বলে যে অঙ্ক ধরেছিলেন তাহার শতকরা একাংশও আদায় করা যায় নাই। ইহা এতই অপ্রত্যাশিত যে সুচারুরূপে লিকুইডিশন হইবে এবং দাবী মিটাতে না পারার কোন প্রশ্ন উঠিবেনা এই পূর্ণ বিশ্বাসে মাত্র দু'মাস আগে আমাদের ভূতপূর্ব্ব অংশীদার মেজর হেণ্ডারসন্ ভারত ত্যাগ করিয়াছেন।

নিজস্ব নীল, রেশম ও শর্করার ব্যবসায় (আমাদের চালানী সম্পূর্ণরূপে এই দ্রব্যের) চালানো ছাড়া আমরা গত কয়েক বৎসর যদিও কোন স্পেকুলেটিভ ব্যবসায়ে লিপ্ত হই নাই তথাপি গত দুই বৎসরে আমাদের লোকসান ২৩ লক্ষ টাকারও অধিক হইয়াছে। ইহা প্রধানতঃ নীল, রেশম ও সোরার কারখানা, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কোম্পানীর (জয়েণ্টষ্টক) শেয়ার ও সম্পত্তির দাম পড়ে যাওয়ায় এবং যাহারা সম্প্রতি নিজেরাই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন তাঁদের ব্যক্তিগত দেনা এবং কারখানা চালু রাখা কারণে লোকসান।

এইসব লোকসান সত্ত্বেও আমরা বিনা দ্বিধায় জানাচ্ছি যে আমাদের স্থির বিশ্বাস আমরা আমাদের দেনার প্রতি টাকাটি ফেরৎ দিতে সক্ষম। যখন আমাদের স্বর্গত পিতামহাশয় ইউরোপ যাত্রা করেন তখন আমাদের যে ৯৮ লক্ষ টাকা জমা ছিল তাহা কমে প্রায় এক চতুর্থাংশ দাঁড়িয়েছে এবং এর মধ্যেও বেশীর ভাগ যথেষ্ট জামিনে বন্ধকী। অতএব হিসাব আলোচনার মত থাকে ১১ লক্ষ টাকারও কম, আমাদের ও পরিবারের জন্য ট্রাষ্ট করা সম্পত্তি, যাবজ্জীবনস্বত্ব ও কোন আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয়িত হইতে পারে, তাহা ছাড়াও এখনকার দরেও আমাদের পাওনা যথাযথ আদায় হলে দেনা শোধের পক্ষে যথেষ্ট।

আগামী মঙ্গলবার ৪ তারিখ ৪ ঘটিকায় আমরা যে সভা আহ্বান করেছি তথায় পুরা হিসাব উপস্থিতি করা প্রার্থনীয়।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুনঃ কার-ঠাকুর কোম্পানীর দেনায় মিলিতভাবে দায়ী হিসাবে আমরা উপরোক্ত পত্রের সহিত একমত।

ডি, এম, গর্ডন
যাস্ ষ্টুয়ার্ট

পত্রোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী ৪টা এপ্রিল যে সভা হয় তার বর্ণনা ৫ই এপ্রিল তারিখের বেঙ্গল হরকরাতে পাওয়া যায়। "ঐ সভায় কার-ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মোট দেনা ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ছিল; এবং কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ও সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় হইলে যত টাকা হাতে" আসিত, তাহার পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ২ হাজার ৯৫৩ টাকা। (১৬) "সভায় স্থির হইল যে ট্রাষ্ট সম্পত্তির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ

ও গিরীন্দ্রনাথকে জোড়াসাঁকোর বসতবাটি ও তথাকার যাবতীয় সম্পত্তি রাখিতে দেওয়া হইবে। এই সভাতেই রবার্ট ক্যাসেল জেন্কিন্স, এফ, আর, হ্যামুটন, রমানাথ ঠাকুর কোম্পানী ইন লিকুই-ডিশনে'র ইনস্পেক্টার ও ট্রাষ্টি নিযুক্ত হন। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র (১৩ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশিত উক্ত সভার বিবরণ হইতে জানা যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কার-ঠাকুর কোম্পানী ইন লিকুইডিশনে'র কাজকর্ম্ম চালাইতে বিশেষভাবে সাহায্য করিবেন। অতঃপর তাঁহারা নিজ বাটিতে আফিস উঠাইয়া আনিলেন। ১৬ই এপ্রিল ১৮৪৮ হইতে পর্য্যন্ত কার-ঠাকুর কোম্পানী ইন্ লিকুইডিশন' বলে হাউসের কাজ চলে। সাত আট বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ গিরীন্দ্রনাথের আপ্রাণ চেষ্টা ও কৃতিত্বে অধিকাংশ ধার শোধ হইয়া যায়।

"এই সময়ে শীঘ্র ঋণ মুক্ত হইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঋণভার লঘু করিবার জন্য যে-সকল সম্পত্তি ও যে-সকল সামগ্রী বিক্রয় করিবার অধিকার দেবেন্দ্রনাথের ছিল, সে-সকলের উচিত মূল্য পাইবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। শোনা যায়, উচিত মূল্য পাইবার চেষ্টায় গিরীন্দ্রনাথ অনেক ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রম করিতেন; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্যস্ততাহেতু অনেক সামগ্রী জলের দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।" (১৭)

দ্বারকানাথের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়ীর ভোজের রাতের আতসবাজীর মতই বাঙ্গালীর বিলাতির কায়দায় ব্যবসায়ের প্রচেষ্টা সকলকে চমৎকৃত করে দিয়ে দ্বারাকানাথের মৃত্যুর দুই বছরের ভিতর মিলিয়া গেল। কেবল যাঁরা এই উত্থান পতন দেখলেন তাঁদের আলোচনায়, বর্ণনায় কখনো বিকৃত, কখনো অতিরঞ্জিত হয়ে গল্প-কাহিনী হয়ে একটা ক্ষীণ স্মৃতিমাত্র আজ রয়ে গেল।

(১৬-১৭) শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ-মন

অলোক রায়

"বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মতো 'সমাগতো রাজবদুন্নত ধ্বনিঃ'।—১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বাংলা দেশে যে নবজাগরণের অভ্যাস লক্ষিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা ছিল, কিন্তু সৃষ্টিক্ষম প্রতিভার গঠনকর্ম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দেখা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই নবযুগের ইতিহাস মুদ্রিত আছে। এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর মধ্যেই সমাজ-মনের প্রকাশ নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর কতকগুলির 'বিবিধ আলোচনা' (১৮৭৬) ও কতকগুলি 'প্রবন্ধপুস্তক' (১৮৭৯) নামে সঙ্কলিত হয়েছিল। পরে ঐ প্রবন্ধগুলি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের দুই ভাগে সংগৃহীত হয়েছে। (প্রথম ভাগ ১৮৮৮; দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২)।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আমাদের চিত্তক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল, নানা বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছিল; জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা বহুল পরিমাণে বেড়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র মধ্যে চিত্তের সেই নানামুখিতা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সমাজ-জিজ্ঞাসা, সাহিত্য ও দর্শনচিন্তা, ইতিহাস, রাষ্ট্রচেতনা—নানা ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য বিষয়-বিস্তার সর্বদা গভীরতার পরিচায়ক নয় এবং এই অগভীরতা আমাদের নবজাগরণের, এবং বাঙালীর চরিত্র-ধর্মের মধ্যেই এর বীজ নিহিত আছে, একথা বললে অন্যায় হবে না।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র কয়েকটি গ্রন্থ বা গ্রন্থকর্তার পরিচয় মাত্র নয়, এইগুলির মধ্যে দিয়ে সমালোচকের শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কার এবং অনেক সময়েই যুগ-প্রবণতা প্রকাশিত হয়েছে এবং যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার প্রকাশ, তা হোলো সাহিত্যকে অবলম্বন করে সাহিত্যতত্ত্ব ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব নির্দ্ধারণ—সম্ভবত: 'It is the highest criticism, for it criticizies not-merely the indvi-dual work of art, but beauty itself' (অস্কার ওয়াইল্ড) এবং 'Every form of genuine criticism, is directed towards criticism' (এলিঅট)। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা প্রকাশ পেয়েছে—উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব শকুন্তলা-মিরন্দা ও দেসদিমোনা, বাঙ্গালার নব্যলেখকদের প্রতি, বাঙ্গালা ভাষা প্রভৃতি প্রবন্ধে।

বুদ্ধির আলোক-দীপ্ত যে মনস্বিতা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে তা সে-যুগে সাধারণ মানুষের খুব সহজবোধ্য বলে মনে হয়নি। বঙ্কিমের পূর্বেই এদেশে যুক্তিবাদের প্রসার হতে থাকে, এবং ইয়ং বেঙ্গলের মুখে শোনা গেছে: 'He who will not reason is a bigot; he who can not is a fool, and he who dose not is a slave.' বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ ও অর্থনীতি-চিন্তায়

যুক্তিবাদী মন ও মুক্তদৃষ্টির পরিচয় পাই। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) গ্রন্থটির কথা বিশেষভাবে স্মরণ করতে হবে। 'সাম্য' গ্রন্থে বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্টের সমান স্তরে 'সাম্যবতার রুসো'কে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' গ্রন্থটির প্রচার বন্ধ করে দেন ["বঙ্কিমবাবু বলিলেন 'এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিতে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না"—বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, পৃঃ১৯৮] তবে 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামে প্রবন্ধে 'সাম্য' গ্রন্থের কিয়দংশ 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এতে মিলের প্রভাবের কথা স্মরণ রাখতে হবে, এক 'সাম্য' গ্রন্থের প্রচার-রহিতের পেছনে কেবল 'অর্থশাস্ত্র ঘটিত' কতকগুলি ভুল আছে, এমন নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের মানস-পরিণতিই 'সাম্য গ্রন্থকে বিলুপ্ত করিয়েছে।

সত্যানুসন্ধান, জীবনধর্মিতা, ঐতিহ্যচেতনা ও দেশাত্মবোধ,—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রধান পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাই যুগমনের প্রকাশ-চিহ্নিত। 'ভারত-কলঙ্ক,' 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা,' 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি,' 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার', 'বাঙ্গালীর ইতিহাস', 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক', 'বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', 'বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভগ্নাংশ', 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি', 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রচুর পরিশ্রম ও অন্বেষণের সাক্ষ্য আছে। বঙ্কিম যদিও যথোচিত বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন: 'অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বঙ্গদর্শনের দ্বারা সর্বাঙ্গ সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি, মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ।' তথাপি আজকের দিনের ঐতিহাসিক গবেষণা দিয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে "বাঙ্গালীর উৎপত্তি' ও 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধের সিদ্ধান্ত বঙ্কিমের পক্ষে অনুমানসিদ্ধ হলেও, বৈজ্ঞানিক তথ্য বিচারেও অসত্য নয়।

'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে নিজের আত্মজিজ্ঞাসাকে প্রকাশ করছেন: "অতি তরুণ অবস্থা হইতে আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত: 'এ জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী-বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি।' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেছেন: "এই দার্শনিক চিন্তার কয়েকটি প্রাথমিক সুফল বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'প্রকৃত ও অতিপ্রকৃত', 'জ্ঞান', 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র', 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল পাঁচ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ সাংখ্যদর্শন বিষয়ক নিবন্ধ। আমার বিশ্বাস সে যুগে উহাই প্রথম সাংখ্য মতের বিবৃতি।" (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃঃ ৩) বলা বাহুল্য, এই জীবন জিজ্ঞাসা তথা আত্মজিজ্ঞাসা উনবিংশ শতাব্দীরই বিশিষ্ট মানসাভিব্যক্তি।

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির রচনায় যা অস্ফুটভাবে প্রকাশ পেয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাকেই বিস্তারিত করলেন এবং তার সঙ্গে যুক্ত করলেন আত্মোপলব্ধি ও ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত মনন, যার প্রকাশ 'ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন' (১৮৮৮), কৃষ্ণ চরিত্র (১৮৮৬) ও শ্রীমদ্‌ভাগবদগীতা ব্যাখ্যায় (১৯০২) তার উৎস 'বিবিধ প্রবন্ধের' কতকগুলি রচনায়।

ইংরেজ আমাদের দেশে এলো 'য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : য়ুরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক গভীরভাবে আমাদের কাছে এসেছে যে আর কোন বিদেশী জাত কোনদিন এমন করে আসতে পারেনি। য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গম শক্তি আমাদর স্থাবর মনের উপর আঘাত করলো, যেমন দূর আকাশ থেকে করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত হয়ে বিকশিত হতে থাকে।' (কালান্তর, পৃঃ ৫) বাঙালীর চিত্তদেশে য়ুরোপীয় ভাবের বীজ ছড়ানো ব্যর্থ হয়নি—অঙ্কুরিত হোল নবযুগের বাণী। যাকে আমরা আজকাল বলি 'রেনেসাঁস'। য়ুরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে এর সাদৃশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু স্বভাবধর্মে এরা আসলে পৃথক সেকথাও মনে রাখতে হবে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন : It would be worse than uselss, or quite misleading, if ouring to this similarity of names we try to find out to our satisfaction, and such attempts rarely fail, deeper and real similarities between the Great Europeans and the parochial Bengal renaissance in their causes and development.' (Introduction : Studies in the Bengal Renaissance, pp. XI).

ইংরেজ শুধু 'চিত্তদূতরূপেই আসেনি ;—রাজদণ্ড হাতে নিয়ে তার শোষক মূর্তিও অগোচর থাকেনি ভারতীয়ের কাছে। নিজেদের প্রয়োজনেই, ভারতবর্ষকে শাসন করার প্রয়োজনে ইংরেজ ভারতবর্ষীয়দের মধ্য থেকে এক মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি করে নিল—প্রধানতঃ হিন্দু, ইংরাজী শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠাকামী এক সমাজ। মেকলের ভাষায় : 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern ; a class of people, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect.' (H. Woodrow. Macaulay's Miniutes on Education in India. 18?2. pp 115). এরা চাকুরীজীবী—অর্থনৈতিক কারণে ইংরেজের দাসত্ব স্বীকার করেছে। মনের দাসত্ব হয়ত ছিঁড়েছে, কিন্তু পায়ের শিকল নিত্য বেজে ওঠে। ক্ষত বিক্ষত যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়। একদিকে ইংরেজী সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির তীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে পরাধীনতার বেদনা, আত্মগ্লানি। বঙ্কিমচন্দ্র যুগের আত্মসঙ্কটকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে নানাভাবেই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তথা উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের স্ববিরোধিতা ও তিক্ত দ্বিধা প্রকাশ পেয়েছে।

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশের পশ্চাতে একদিকে আত্মপ্রকাশের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে স্ব-ভাষা স্ব-সাহিত্য ও স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা কার্যকরী ছিল। 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র যুগের প্রবণতা বিশ্লেষণ করেছেন : 'ইংরাজী প্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের

পাঠ্যের যোগ্য কিছুই বাঙলা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙলা ভাষায় লেখকমাত্রেই হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য; নয়ত ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত কোন ইংরাজী গ্রন্থের ছায়ামাত্র; ইংরাজীতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ?'......ইংরাজীতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মানমর্যাদা হয় না; ইংরাজের কাছে মানমর্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত।' বলা বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'ইংরাজীয়ানা প্রতিক্রিয়ার ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান' দ্রুততর সহজ হয়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনা'য় সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্য নির্দেশে সচেষ্ট হয়েছেন, —সংস্কৃতি সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা ব্যক্তিগতও বটে, যুগগত বটে। কিন্তু 'শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, তা দেখাবার জন্য 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা' প্রবন্ধটি লেখা হলেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিরন্দা ও দেসদিমোনা চরিত্রই উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠেছে এবং বঙ্কিমচন্দ্র সিদ্ধান্ত করেছেন : 'দেসদিমোনার কাছে শকুন্তলা দাঁড়াইতে পারে না।' আধুনিক সমালোচকেরা একে পক্ষপাতদুষ্ট আলোচনা বলতে পারেন, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও যুগগত প্রবণতা বলতে হবে। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে 'দেশীয় প্রাচীন আলংকারিকদিগে'র প্রতি যে মন্তব্য করেছেন, তার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষপাতের পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশ্লেষণেও তিনি সংস্কৃত সাহিত্য বিচার পদ্ধতি গ্রহণ করেননি,—পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে : "অস্মদ্দেশীয় আলংকারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে 'স্থায়ীভাব' নাম দিয়া এই শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলংকারিকেরা তাহাকে Passions বলেন।" লক্ষ্য করতে হবে, তুলনার প্রয়োজনে য়ুরোপীয় সাহিত্য প্রসঙ্গ এলেও, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যকে তাঁর অলোচনার বিষয়রূপে গ্রহণ করেছেন এবং ব্যাস-বাল্মীকি কিংবা কালিদাস-ভবভূতিকে য়ুরোপীয় কবি-নাট্যকারদের সঙ্গে তুলনায় স্পষ্টতঃ হেয় প্রতিপন্ন করতেও তিনি সম্মত হননি। ভারতীয় সাহিত্য ও য়ুরোপীয় সাহিত্য, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র ও য়ুরোপীয় অলংকার শাস্ত্র—এই দুই কোটিতে দুলেছে বঙ্কিম-মন তথা উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-বিবেক।

ছাত্রবয়স থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠক ছিলেন এবং তিনি যেসব ইতিহাস গ্রন্থ পড়েছিলেন তার লেখক ছিলেন অধিকাংশই ইংরেজ। স্টুয়ার্ট, হাণ্টার, হল, মার্শম্যান প্রভৃতি ইংরেজ-লিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থকে আদর্শ করেই ভারতীয়রা এদেশের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসঙ্গত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা স্মরণ করতে পারি, যাঁর উপর বঙ্কিমচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপের ইতিহাস যে বিশেষ পদ্ধতি ('The conscious effort to avoid partisanship, to attain ditachment and fairmindedness, had since the Greeks been the aim of the best historians .') ঐতিহাসিকেরা অনুসরণ করেন, ভারতবর্ষেও তাকেই

গ্রহণ করা হয়েছে, এবং বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সেই আদর্শের দ্বারা চালিত হয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশপ্রেম, পরাধীনতার জ্বালা এত তীব্রভাবে প্রকাশ পেল, যাতে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ঐতিহাসিকের নিরাসক্ত পক্ষপাতশূন্য তথ্যনিষ্ঠ প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হোলো না। আবেগমথিত, হৃদয়োত্তাপে দীপ্ত, আত্মভাবনার সংযোজনে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি এক বিশিষ্টতা লাভ করেছে ; দৃষ্টান্ত হিসাবে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি বাক্য স্মরণ করিতে পারি : (ক) 'যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রী-স্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।' (বাঙলার কলঙ্ক) ; (খ) 'সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালীতে বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার।' (বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা) য়ুরোপের কাছ থেকে পাওয়া অস্ত্র যেন য়ুরোপের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হোলো। যুগপ্রবণতাকে বঙ্কিমচন্দ্র অস্বীকার করতে পারেননি,—অস্বীকার করতে চানওনি : 'Bankim chandra was not, wholly immune from the influence of the prevailing spirit of the Hidu revival. It was the spirit which inspired him to show the superiority of the Hindu ideals over the western ideals. His satires and gibes against the European civilization were also the outcome of the psychological atmost-phere of the time' (B.R. Majumdar : History of political thought from Rammohun to Dayananda, 1934 p. 40[illegible]). 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে পাশ্চাত্য ভারততত্ত্ববিদ্‌দের প্রতি আক্রমণ কয়েক স্থানে অশোভন হয়ে উঠেছে, যার ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ : 'পাশ্চাত্য মূর্খ, অর্থাৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রতি লেখক অজস্র অবজ্ঞা বর্ষণ করিয়াছেন।···কেবল য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের নহে, সাধারণত য়ুরোপীয় জাতির প্রতিই লেখক স্থানে অস্থানে তীব্র বৈরিতা প্রকাশ করিয়াছেন।' (কৃষ্ণ চরিত্র-আধুনিক সাহিত্য, পৃঃ ৭৪-৮৫)। বলা বাহুল্য, য়ুরোপীয় সাহিত্যে সুপারঙ্গম হয়েও য়ুরোপীয় কোনো কোন পণ্ডিতের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি, কেবলমাত্র ব্যক্তিপ্রবণতা নয়, যুগপ্রবণতাও বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মনের মধ্যে বিরোধ একটা গোড়া থেকেই ছিল, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কার, ইংরেজীয়ানা ও স্বদেশীয়ানার অনুকূল ·প্রতিকূল টালবাহানা। একদিকে যুক্তিমার্গ, অন্যদিকে আবেগধর্মী দেশীয় সংস্কার। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে মত পোষণে, বিদ্যাসাগর ও কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্যকৃতির অস্বীকৃতিতে, রায়তের দুঃখে কাতর হয়েও জমিদারের স্বার্থরক্ষার অনড়তায়, বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের পরিচয় দিয়েছেন এবং এই দ্বিধা উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-মনের। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ-সাহিত্যে এই সমাজ-মনেরই প্রকাশ হয়েছে।

লেখকের সংস্কার

লেখকগণ চিরকালই পাঠকসাধারণের কৌতূহলের বস্তু হয়ে আছেন। লেখক অর্থে কথাসাহিত্যিক বা গল্পকার এই শ্রেণীর প্রধানতম আকর্ষণ।

কথাসাহিত্যিক বা গল্পকারগণ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, বিচ্ছেদ-মিলন আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সর্বজনের সামনে তুলে ধরেন। যেখানে এই ছবি যত প্রাণবন্ত বা সকলের প্রতিকৃতির তুল্য সেখানে তিনি তত প্রিয় লেখক।

এই শ্রেণীর পাঠকরা লেখকের লেখায় নিজেদের প্রতিকৃতি স্পষ্ট করে দেখতে পায়; অধিক কি উপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা বা পার্শ্বচরিত্রের সঙ্গে নিজেদের মিল দেখে পুলকিত হয়।

"দেবদাসের" ব্যর্থ জীবন কারও কাম্য নয়। কিন্তু দেবদাসের চরিত্রে অনেক যুবক এবং পার্বতীর চরিত্রে অনেক যুবতী ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করে।

শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে ঘরের বৌ করে আনতে আমাদের সমাজে অনেক বাধা। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গোপনে সুখদুঃখের কথা অনেক পাঠিকা কয়ে থাকেন।

মোট কথা, নিজের দুঃখের প্রতিচ্ছবি, নিজের মনের চিন্তাধারা যখন নায়ক-নায়িকা মারফৎ পাঠককুলের চোখের সামনে কথাসাহিত্যিক উপস্থিত করেন তখন তাতে আমরা অভিভূত হই। গল্পের আখ্যানভাগে এমনি করে যে সাহিত্যিক সাধারণ মানুষের কথা বলতে পারবেন তিনি তত জনপ্রিয়তা অর্জন করবেন সন্দেহ নাই।

আখ্যানভাগে মানুষের কথা শুনতেই মানুষের ভাল লাগে বলে সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যান্য শাখা থেকে কথাসাহিত্যিকগণ এক বিশেষ ধরণের কৌতূহলের ব্যক্তি হয়ে পাঠকদের মনে বিরাজ করতে থাকেন।

জনপ্রিয় সাহিত্যিক যদি জীবিত থাকেন তবে তাঁকে দেখবার জন্যে পাঠকদের আগ্রহ ভক্তের কাছে কালীঘাটের মা কালী বা কেদারবদরীর ভোলামহেশ্বরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

গুণমুগ্ধ পাঠক যখন চাক্ষুষ সেই সাহিত্যিককে দেখেন তখন সাধারণ মানুষের দুটো হাত ও পা, চোখ, কান, নাক, মাথা প্রভৃতির বাইরে অতিরিক্ত কিছুই নজরে পড়ে না। এই তো তার প্রিয় সাহিত্যিক! তবে?

তবে কি পাঠক ভেবেছিলেন, হয় তো এর চেয়ে বেশী কিছু দেখবো। সাধারণ মানুষের চেয়ে কিছু পার্থক্য থাকবে। নইলে রাম-যদু-মধুর থেকে তাকে বেশী ভাল লাগে কেন? কেমন করেই বা তিনি আমার মনের কথা এমন করে জানলেন। সে জানা শুধুই জানা নয়। নিপুণ হাতে সকলের মনের মত করে পরিবেশন করেছেন। আমার মনের গোপন কথা কেমন করে উনি জানতে পারলেন? নিশ্চয় এ এক আশ্চর্য ক্ষমতা!

হ্যাঁ, তাই মনে হয় সত্যি ! কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষই রক্ত-মাংসের সুখ-দুঃখের কথা বলবে না তো কে বলবে ? একমাত্র তার পক্ষেই তাকে জানা যত সহজ, দেবতাদের অনুভূতিসমূহ শুধুমাত্র সে ফাঁক পূরণ করতে সক্ষম হোত না।

রবীন্দ্রনাথ থেকে বহু কবি, লেখক এই কথাটা বিভিন্নপ্রকারেই বলে গেছেন যে আমি কবি চাষী, মজুর আর খেটে খাওয়া মানুষের। তাদেরই একজন হয়ে তাদের কথা অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেলাম ; প্রতিকারের দাবী করলাম।

আর পৃথিবীর যে কোন মহৎ সাহিত্যই স্বাধীনতার, গণমুক্তির আত্মপ্রকাশ। রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা লোকাচারগত অন্যায় অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও মুক্তির জয়গানে মুখরিত।

সন্দেহ নাই, মানুষই চিরকাল মানুষের প্রেরণা জুগিয়েছে। একদল অত্যাচারিত, দুর্বলের প্রতিভু হয়ে মনের ভাব ভাষায় রূপ দিয়েছেন সাহিত্যিক। মনের ভাব ভাষায় উদ্বোধনের ক্ষমতাই সাহিত্যিককে অন্য পাঁচজন থেকে পার্থক্য করে। শুধু তাই নয়। নিপীড়িতকে আশার বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করাও সাহিত্যের অন্যতম ধর্ম।

কিন্তু সার্থক স্রষ্টা হিসাবে কার্লমাকস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে ; আমাদের দেশে শরৎচন্দ্র নারী জাগরণে ও বহুবিধ সামাজিক দুর্নীতি গল্প, উপন্যাসের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ আঘাত হেনেছিলেন। এমনি করে ধর্মের মানবিক অবদানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি লোকত্তর প্রতিভা।

ভাবতে ভাল লাগে, অগণিত মানবাত্মার বিবিধ নিপীড়নের মুক্তি আন্দোলনে এঁদের অবদান। কিন্তু সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করে এঁরা প্রচলিত রীতিনীতি, সামাজিক পরিবেশ বা ধর্মীয় অনুশাসন মুক্ত হোতে পেরেছিলেন বলেই মানবাত্মার জয়গানে মুখরিত বাণী ও ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

কিন্তু কথা হচ্ছে, "মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছল" মনোভাবের অধিকারী কি সবাই ?

লেখক বা লেখনী চালনার অধিকারীগণ সর্ববিষয়ে সর্বকার্যে মোহমুক্ত, সংস্কারবর্জিত মানসিক গঠনের অধিকারী কি হন ?

আজো সাহিত্যে জাতিভেদ প্রথার অপকার জানা থাকা স্বত্তেও কোথাও কোথাও এমন সংলাপ দেখা যায়—"ব্রাহ্মণশ্চ ব্রাহ্মণ গতি," "কোন বংশের মেয়ে দেখতে হবে তো," "হাভাতে ঘরের ছেলে," "অধর্ম সইবে না—আজও চন্দ্র-সূর্য উঠছে" ইত্যাদি।

সকল অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সাহিত্য যুগে যুগে নির্ভীক প্রহরী। কিন্তু এই সাহিত্যসাধনা যে সকল সাহিত্যরথীগণ করে থাকেন তাঁরা কী পরিমাণে তাঁরই পরিবেশ, সামাজিক রীতির ক্রীতদাস সেটা একবার তলিয়ে দেখতে হবে।

লেখার ক্ষমতা বা কাহিনী সুসংবদ্ধ করা এমন কিছু বিচিত্র নয়। বহুদিনের অভ্যাসে ও চেষ্টায় এই ক্ষমতার শীর্ষে উঠা যায়। কিন্তু যে কাহিনী মূল বক্তব্যের আশ্রয়স্বরূপ তা'তে কতখানি

নিখাদ সোনা আছে সেটাই ভেবে দেখতে হবে।

ভাষ্যকার যখন মানুষের কথা বলবেন তখন তিনি কতখানি আত্মক্ষমতায় গরীয়ান সেটা জানতে হবে। মানুষের ব্যর্থতায় ভাগ্যের প্রতি সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকলে দেখা যাবে একটা অস্বচ্ছ ভাবনা বা আবিল মনোভাব পাঠকদের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। মানুষ জয়ের ভাবনাকে ভগবানের অবদান ভাববে। মানুষের যে প্রধানতম কর্মক্ষমতা তার অবনতি ঘটবে। ভাগ্যবাদীদের জয়ধ্বজা সদর্পে উড্ডীন রইবে। মানুষকে সাহিত্য আশার বাণী শোনায় সত্য। কিন্তু নিরাশার কার্য-কারণ কি কি তারও সযুক্তি ব্যাখ্যা না থাকলে সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য থাকল কোথায়!

সংস্কারের গণ্ডি ছাড়িয়ে লেখক যখন যথার্থ দেখার অধিকারী হন তখন তার বক্তব্যে থাকে যুক্তি। এই যুক্তি ছাড়া যা কিছু বক্তব্য তাতে থাকে পূর্ব ধারণা। ধারণা যে সংস্কার গড়ে তোলে তার ঋজুতা নাই। পাঠককুল সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে পুনরায় ভাগ্যের ক্রীড়নক হয়ে পড়বে।

এইজন্যে জীবনদর্শী সাহিত্যিককে কাহিনী উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ঋজু অনুভূতিশীল ব্যক্তি হওয়া চাই। সত্যকে আবিষ্কার করাটাই সাহিত্যের ধর্ম।

শ্রীমাধব রায়

History of Oriya Literature : Mayadhar Mansinha. Sahitya Akademi, New Delhi. August 1962. pp 9+282+Corrigenda. Rs. 6·00

ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ! বহু যুগ ধরে এদেশের প্রধান ভাষাগুলির ভাণ্ডারে যে অমূল্য সাহিত্যরাজী সঞ্চিত আছে তার সম্যক পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্যকর্মে বিশালতা যে কোনও পাঠকের সমগ্র পাঠজীবনের অধ্যবসায় নস্যাৎ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। দ্বিতীয়তঃ ভাষাগত বাধা সর্ব্বভারতীয় সাহিত্যের প্রতি কৌতূহলী মনের ঔৎসুক্যের মূলে কুঠারাঘাত করার মূলে এক অমোঘ অস্ত্রবিশেষ। যে সকল মহৎ সৃষ্টি বিভিন্ন ভাষার ভাণ্ডারে কুক্ষিগত হয়ে আছে তার মুক্তির একমাত্র পথ হল সেই সৃষ্টির ভাষান্তর। অবশ্যই এ পথ পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের পথ। কিন্তু সর্ব্বভারতীয় প্রচেষ্টায় এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন কিছু অবাস্তব নয়। বর্ত্তমানে দেশের বিদ্বৎ সমাজ উক্ত সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন এবং কিঞ্চিৎ তৎপরতার স্বাক্ষর ইদানীং লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভারতীয় পাঠকসমাজ এখন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয় লাভ করার সুযোগ ক্রমশঃ পাবেন। কেবলমাত্র ভাষান্তরিত কাব্য, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি রচনা বিভিন্ন ভাষার পাঠকের পক্ষে সম্পূর্ণ আনন্দ লাভের সহায়ক কিনা তাও বিবেচ্য। অনূদিত সাহিত্য আমাদের নিয়তই আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু সাহিত্য ভাবনার মূলে একটি মৌলিক প্রশ্ন বারম্বার পাঠকমনকে দ্বিধান্বিত করে তোলে। যে ভাষায় সৃষ্টির রসাস্বাদনে আমরা আনন্দলাভ করতে সক্ষম হই সেই ভাষার উৎপত্তিগত ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং প্রতিভাবান লেখকসমূহের পরিচয় কি, তা জানবার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহী পাঠকমনকে নিয়তই বিহ্বল করে। এই সকল জিজ্ঞাসার সদুত্তর লাভের একমাত্র মাধ্যম হল সাহিত্যের ইতিহাস।

সম্প্রতি সাহিত্য আকাদেমী বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশনে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতিপূর্ব্বে পরমেশ্বরণ নায়ার এবং সুকুমার সেন রচিত মলয়ালম ও বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে। তৃতীয় গ্রন্থ, মায়াধর মানসিংহ কর্তৃক রচিত ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ার ফলে আশা করা যায় এদেশের বিভিন্ন ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতি ভারতীয় পাঠকসমাজকে ক্রমশঃ কৌতূহলী করে তুলবে। সাহিত্য আকাদেমীর এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বঙ্গোপসাগর বিধৌত ওড়িষ্যা প্রদেশ শিল্প এবং সাহিত্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু স্বতন্ত্র। ওড়িষ্যার যে বিপুল সাহিত্য ভাণ্ডার এক অদ্ভুত বর্ণমালার অন্তরালে লুক্কায়িত আছে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় হয়ত আমরা ও'ম্যালী সাহেবের রিপোর্টে পাই কিন্তু রিপোর্ট ইতিহাস নয়, ইতিহাসের উপকরণ মাত্র। যাঁরা ওড়িয়া ভাষা অনুধাবনে তৎপর, বর্ত্তমানে কেবলমাত্র তাঁরাই ওড়িয়া সাহিত্য ভাণ্ডারের দ্বারোদঘাটনের অধিকারী। অবশ্য অপরাপর ভাষা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। বোধগম্য

ভাবায় ওড়িয়া সাহিত্যের পরিচয় ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছে বটে কিন্তু পণ্ডিত বিনায়ক মিশ্র রচিত ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। যদিও একথা ঠিক যে, সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ আর সাহিত্য পাঠের আনন্দ সমগোত্রীয় নয় কিন্তু সাহিত্য কীর্ত্তির পরিচয় লাভ করবার অন্য উপায়ই বা আর কি আছে। সেই কারণেই মায়াধর মানসিংহ রচিত ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থটিকে সর্ব্বভারতীয় সাহিত্যের আঙিনায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সঙ্গত এবং স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবেশী ওড়িষ্যা প্রদেশের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি বাঙালী পাঠক সমাজের কৌতূহলী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাঙলা ভাষার সহোদরা ওড়িয়া ভাষার সাহিত্যকর্ম্মের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য বহু কারণে সীমিত। ওড়িয়া বর্ণমালা অন্যতম অন্তরায় হওয়ায় সাধারণ পাঠকমনে ওড়িয়া সাহিত্যের আকর্ষণ নেই বটে কিন্তু বঙ্গদেশে ওড়িয়া সাহিত্যের চর্চ্চা যে একেবারেই হয়নি একথাও সত্য নয়। কবি রাধানাথ রায়ের মৃত্যু বাংলার সমাজকে শোকাভিভূত করেছিল বটে কিন্তু সাধারণ পাঠক সমাজে সে মহাপ্রয়াণ কোন আলোড়নই তোলেনি। অর্থাৎ বাঙলার জনমানসে ওড়িয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর কৌতূহল সেকালে বিশেষ ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের জনমানসে যে পরিবর্ত্তন ঘটে চলেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে একথাই এখন বলা যায়, সঙ্কীর্ণ এবং অবজ্ঞাসূচক মনোভাব অবলম্বনের দিন গত হয়েছে। পরস্পরের সংযোগ এবং সহযোগিতা ক্রমবর্দ্ধমান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আদান-প্রদানই একমাত্র শ্রেয় মাধ্যম যা পরস্পরকে নিকট করতে সাহায্য করে। সম্ভবতঃ উক্ত সূত্রগুলি সামনে রেখে সাহিত্য আকাদেমী এই প্রকার পুস্তক প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন যা নিঃসন্দেহে গঠনমূলক পদক্ষেপ।

মায়াধর মানসিংহ রচিত 'হিষ্ট্রি অব ওড়িয়া লিটারেচার' গ্রন্থটি মোট বারটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। ওড়িষ্যার নিরাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সমাজ, শিল্প ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে যে ওড়িয়া সাহিত্য শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত তার আলোচনায় গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। ভৌগলিক পরিবেশ ঐতিহাসিক শৌর্য্যবীর্য্য এবং ধর্ম্মকাহিনী সাহিত্যকে কি পরিমাণ অনুপ্রাণিত করে তা আমাদের অজ্ঞাত নয়, ওড়িয়া সাহিত্যও এই সকল উপকরণগুলি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে, যদিও ধর্ম্মকাহিনীই ওড়িয়া সাহিত্যের মুখ্য উপকরণ যা ওড়িষ্যার আপামর পাঠকসমাজ সাগ্রহে পাঠ করেন। অবশ্য সাহিত্যের অন্যান্য শাখা যে অবহেলিত, তা নয়। সমাজ বিবর্ত্তনের ফলে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে বিষয়বস্তুর নির্ব্বাচনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তা ওড়িয়া সাহিত্যে পরিলক্ষিত হয় না। কারণ হিসাবে ডক্টর মানসিংহ যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা বর্তমানে ওড়িয়া সাহিত্যিকগণের পক্ষে বিবেচ্য বিষয়।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহের উন্মেষকালে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করতেন তাঁরা সকলেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ওড়িয়া সাহিত্যিকগণের পক্ষে সেকথা প্রযোজ্য নয়, কারণ ওড়িষ্যার কবিকুল কোন কালেই সংস্কৃত চর্চা করেননি। তাঁরা ছিলেন সাধারণ মানুষ, দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় লব্ধ জ্ঞানের আবেগ, তাঁদের মনের কাব্যস্ফুরণের ইন্ধন জুগিয়েছে। সেকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কবিরা যে রাজসম্মান লাভ করেছেন তা ওড়িয়া কবিদের কাছে অচিন্ত্যনীয়

ছিল কারণ, ওড়িয়া নৃপতিদের বিমাতৃসুলভ মনোভাব। যার ফলে কোনও ওড়িয়া কবি রাজসভার অলঙ্কার হিসাবে বিবেচিত হননি। বস্তুত তাঁরা ছিলেন জনসাধারণের কবি। তাঁরা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেছেন। তাই কাব্য রচনার ক্ষেত্রে তারই প্রতিচ্ছায়া নিবিড়ভাবে ছড়িয়ে গেছে ছত্রে ছত্রে যা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় যে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। ওড়িয়া কবিদের ভাগ্যে রাজসম্মান না জুটলেও সাধারণ মানুষের মনে তাঁরা আজও জীবিত।

পূর্ব ভারতের মুখ্য ভাষাগুলি ইন্দো-জারমানিক গোষ্ঠীভুক্ত। উক্ত গোষ্ঠীর অন্তর্গত বাঙলা এবং আহোমী ভাষার ন্যায় ওড়িয়া ভাষার সমগোত্রীয়। কিন্তু সমগোত্রীয় হলেও ওড়িয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্যণীয়। কথিত আছে, অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কথ্যাংশের চরিত্র প্রতি দশ ক্রোশে পরিবর্তনশীল। কিন্তু ওড়িয়া ভাষা এ বিষয়ে সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম, কারণ সমগ্র ওড়িষ্যা প্রদেশে কথ্যভাষার চরিত্র একই প্রকার। ওড়িয়া বর্ণমালা দেবনাগরী থেকেই উদ্ভূত কিন্তু ওড়িয়ায় কোনও শীর্ষমাত্রা নেই। ওড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে আজও যে ভাগবতঘর অর্থাৎ পাঠাগার আছে, সেখানে তালপত্রের পুঁথিগুলি সুযত্নে রক্ষিত থাকে। এখনও ওড়িয়া জনসাধারণের মনে মুদ্রণশিল্প অথবা কাগজের প্রতি ঔৎসুক্য নামমাত্র। তালপত্রে বিধৃত সাহিত্য সম্ভার তাদের একান্ত আপনার। এবিষয়ে ডক্টর মানসিংহের বিশ্লেষণ অবিশ্বাস্য মনে হলেও আপাতঃ সত্য।

ওড়িয়া ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গে ডক্টর মানসিংহ যে আলোচনা করেছেন তা তথ্যপূর্ণ এবং চিত্তাকর্ষক। বৌদ্ধ গান ও দোহায় যে ওড়িয়া দোহাটি আছে তা ওড়িয়া ভাষার প্রাচীনত্বের নিদর্শন, এই প্রসঙ্গটির বিশদ আলোচনাকালে তিনি শাস্ত্রী মহাশয়কে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন তার সত্যাসত্য নির্ধারণ একান্ত ভাবে গবেষকগণের কর্তব্য, তথাপি এবিষয়ে দুই একটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। ডক্টর মানসিংহ যে অভিযোগ করেছেন তা হল এই: "In the fine introduction to his book Bauddha Gan O Doha, M. M. H. P. Sastri, the discoverer of these songs, says (P. 6) : 'I believe those who wrote in this language (i. e that of these Buddhist songs and psalms) were of Bengal or the neighbouring countries.' He admits again in the same introduction at page 17, that 'One poet's domicile happens to be Orissa and his song also is written in the Oriya language. 1 have taken that to be an Oriya poem.' But strangely enough he forgot to name this supposed Oriya poem or the poet"—P 22 History of Oriya Literature.

এই অভিযোগের উত্তর যিনি দিতে পারতেন তিনি বহুকাল পূর্বে ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন। সুতরাং তিনি (শাস্ত্রীমহাশয়) সেই ওড়িয়া কবির নাম কেন উল্লেখ করেননি তা আর জানা সম্ভব নয়। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় যে পুঁথিগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তা আজও এশিয়াটিক সোসাইটিতে বর্তমান, অতএব গবেষণার সাহায্যে হয়ত সেই অজ্ঞাত ওড়িয়া কবিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হতে পারে। শাস্ত্রীমহাশয় দোহাগুলি পরীক্ষা করে যতদূর সম্ভব কবিপরিচয় ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এখন আলোচ্য ওড়িয়া কবি ভূমিকালিপি থেকে কেন বাদ পড়লেন তা আমাদের বোধগম্য না হলেও একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে এই বিস্মরণ অবজ্ঞা অথবা বিদ্বেষপ্রসূত নয়। ডক্টর মানসিংহের

মন্তব্য আমাদের কাছে প্রচারমূলক বলে মনে হয়েছে। লেখকের কাছে আমাদের অনুরোধ এই যে সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি গুরুগম্ভীর রচনায় এমন কিছু মন্তব্য করা উচিত নয় যা বিতর্কের ঝড় তুলতে পারে।

বৌদ্ধ অপভ্রংশের প্রভাব ওড়িয়া ভাষায় ছিল সেবিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শিশুবেদ সে স্বাক্ষর আজও বহন করছে। শিশুবেদে প্রাচীন ওড়িয়া গদ্যের যে উদাহরণ আছে এবং খৃস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর খরবেল গদ্যাংশ, বৌদ্ধ অপ্রভ্রংশ এবং আধুনিক ওড়িয়া অর্থাৎ সরল দাসের যুগ অবধি একটা সংযোগ রক্ষাকারী গদ্যের নিদর্শন। তবে শিশুবেদের গদ্য প্রাচীনতম নয়, প্রাচীনতম গদ্যের নিদর্শন পাওয়া যায় শ্রীমৎ অবধূত নারায়ণ স্বামী কৃত রুদ্রসুধানিধি গ্রন্থে। প্রাচীন ওড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে এখনও গবেষণা চলছে তরুণ ঐতিহাসিক ডক্টর নবীনকুমার সাহু ওড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং ওড়িয়া ভাষার রূপান্তর নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁর গবেষণার ফলাফল ওড়িয়া ভাষার ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ে নূতন আলো ছড়িয়ে দেবে। ডক্টর মানসিংহের মত আমরাও এই আশাই করব।

প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের উন্মেষ হয় ১৪১৫ খৃস্টাব্দে, মহারাজ কপিলেন্দ্র দেবের রাজত্বকালে। চাষীপরিবার উদ্ভূত, শূদ্রকবি সরল দাস ওড়িয়া মহাভারত রচনা করেন। সরল দাস অতি সাধারণ জনসমাজের একজন ছিলেন। দেবী সরলার আদেশে তিনি মহাভারত রচনায় ব্যাপৃত হন। বেদব্যাসের মহাভারতের সঙ্গে সরল দাসের মহাভারতের তুলনামূলক বিচারকালে ডক্টর মানসিংহ যে সংবাদ পরিবেশন করেছেন তা চমকপ্রদ। তিনি বলেছেন, সরল দাস কৃত মহাভারত এমনই একটি সৃষ্টি যা লোকায়ত সাহিত্যের নিদর্শন। সরল দাস ছিলেন অর্ধশিক্ষিত চাষী সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু তাঁর কাব্যপ্রতিভা উচ্চস্তরের। তাঁর মহাভারত প্রক্ষিপ্ত, মূল মহাভারতের অনুসারী মাত্র, কিন্তু কাব্যগুণে ওড়িয়া সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং জাতীয় মহাকাব্য হিসাবে গণ্য। সমগ্র ওড়িয়া সাহিত্যের ভিত্তি সরল দাসের রচনাশৈলীর উপর ন্যস্ত। সম্ভবতঃ প্রদেশিক ভাষায় রচিত মহাভারতগুলির মধ্যে সরল দাসের মহাভারত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বাঙলা মহাভারত আরও দু'শতাব্দীর পরে এবং তেলেগু মহাভারত আরও পরে রচিত হয়। সরল দাস আজ শূদ্রমুনি হিসাবে পূজিত।

সরল দাসের পরবর্তী কাল পরীক্ষার যুগ। বহু ওড়িয়া সাহিত্যিক নানা বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং তাঁহাদের সক্ষম সৃষ্টির সাহায্যে আজকের ওড়িয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ। কবি জয়দেব ও তাঁর গীতগোবিন্দ কোনও আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এইকালের ওড়িয়া গদ্যের আধুনিক প্রয়োগধারা সূচিত হয়। শ্রীগুরুদাস চৌহনী বর্তমান ওড়িয়া গদ্যের পায়নীয়র। ওড়িষ্যার জাতীয় সাহিত্য রচনায় যে তিনজন কবি পূর্বসূরীর সম্মান লাভ করেছেন তাঁরা হলেন সরল দাস, বলরাম দাস এবং জগন্নাথ দাস। এই ত্রয়ীর রচনাসম্ভার এবং তার উৎপত্তিগত ইতিহাস বিষয়ে ডক্টর মানসিংহের আলোচনা সংক্ষেপিত অথচ তথ্যবাহক।

আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের জনক ফকিরমোহন সেনাপতি নিঃসন্দেহে প্রথম জাতীয়তাবাদী কবি। ফকিরমোহন সম্বন্ধে আলোচনাকালে তৎকালীন বাঙালা ও বাঙালীর যে কঠোর সমালোচনা

লেখক করেছেন তার সত্যাসত্য নির্ধারণ করা গবেষণার বিষয়। হয়ত সে যুগে কিছু অবিচার ওড়িশ্যার প্রতি করা হয়েছে কিন্তু ওড়িয়া ভাষার দমনকল্পে বাঙালী প্রাণপণ চেষ্টা করেছে এমন কথা এখন অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে। ডক্টর মানসিংহের অনুযোগ এই যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় যখন বিশ্ববিদ্যালয় বর্ত্তমান, ওড়িশ্যায় মাত্র দুইটি কি একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের পত্তন হয়েছে, এই অনগ্রসরতার জন্য সে যুগের বাঙালী চক্রান্তই নাকি দায়ী। ডক্টর মানসিংহের এই আলোচনার জন্য বির্তকে প্রবেশ না করে আমরা কেবল একটি মাত্র প্রশ্নই করব। ইংরাজ রাজত্বের যুগে কি ঘটেছে তার রোমন্থন না করে বর্তমানে ওড়িশ্যায় কি ঘটেছে তা দেখা যাক। এখন ওড়িশ্যার নিজস্ব বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিন্তু সবর জাতির কয়জনকে তাঁরা শিক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছেন তা জানতে ইচ্ছা করে।

ফকিরমোহন, রাধানাথ এবং মধুসূদন ওড়িয়া সাহিত্যে যে প্রয়োগধারার প্রবর্তন করেছেন তা সমগ্র ওড়িয়া সাহিত্যের কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করে; নব জাগরণের চেতনায়, ওড়িয়া সাহিত্য-সাধকদের উদ্বুদ্ধ করেছে। ফকিরমোহন এই নব জাগরণের পথপ্রদর্শক, ওড়িয়া ভাষার স্বার্থরক্ষারকল্পে ফকিরমোহনের সংগ্রাম দেশপ্রেমের পরিচায়ক। তার প্রতিভার স্বাক্ষর ওড়িশ্যাবাসী কোনদিনই বিস্মৃত হবে না। তার সাহিত্যভাবনা উত্তর যুগের সাহিত্য সাধকদের প্রেরণা দিয়েছে। আর দিয়েছে পথের দিশা। রাধানাথ রায় ওড়িয়া সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, নবীন সেন এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কবিপ্রশস্তি যা বলে, রাধানাথ সম্বন্ধে যদিও তা শেষ কথা নয় তবে বাংলা দেশের বিদগ্ধ সমাজের প্রিয় ওড়িয়া কবি যে রাধানাথই সে বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। ধার্মিক মধুসূদন, জগন্নাথ দাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অধ্যাত্মবাদী সৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করেন। এই কবিত্রয়ের অবদান সম্বন্ধে ডক্টর মানসিংহের শ্রদ্ধান্বিত আলোচনা সুখপাঠ্য কিন্তু বিস্তৃত নয়। বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যের প্রাণ-পুরুষ ফকিরমোহন, রাধানাথ এবং মধুসূদন সম্বন্ধে আরও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রয়োজন আছে, সম্ভবতঃ স্বল্পপরিসর ডক্টর মানসিংহের লেখনীর প্রতিবন্ধকস্বরূপ হয়েছে।

সত্যবাদী বিদ্যালয়ের আন্দোলন হয়ত ওড়িয়া সাহিত্যে অপর এক নবচেতনার যুগসৃষ্টি করতে পারত কিন্তু নেতৃস্থানীয় সাহিত্যসেবক পণ্ডিত গোপবন্ধু দাসের অকালমৃত্যুতে সত্যবাদী সাহিত্যচক্রে ভাঙন ধরে এবং ওড়িয়া সাহিত্যে আসে বিশৃঙ্খলার যুগ। তারপর বেশ কয়েক বৎসর ওড়িয়া সাহিত্য নিষ্ফলা বন্ধ্যারূপ ধারণ করে এবং এই মরুভূমি সাদৃশ্য শূন্যতা সমগ্র ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাসে একমাত্র সৃষ্টি-দুর্ভিক্ষের নিদর্শন। গোপবন্ধু দাসের অকালমৃত্যু ওড়িশ্যার পক্ষে নক্ষত্র পতন স্বরূপ। কিন্তু তাঁর ক্ষণস্থায়ী নেতৃত্বে যে সাহিত্যের ফসল ফলেছে তা ওড়িয়া সাহিত্যে অমরতা লাভ করবে। সত্যবাদী সাহিত্য চক্রের কণ্ঠ যখন স্তব্ধ তখন র‍্যাভেন্স কলেজের এক প্রতিভা ওড়িয়া সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর ন্যায় উদয় হয়ে কি এক নূতন কথা শোনাবার চেষ্টায় মুখর হয়ে উঠেছে। সবুজসাহিত্যদলের নেতা তরুণ অন্নদাশংকর এবং তাঁর বন্ধুদ্বয় কালিন্দিচরণ পাণিগ্রাহী ও বৈকুণ্ঠনাথ পটনায়েক ওড়িয়া পাঠকসমাজে নূতন গানের ঝড় বইয়ে দেবার আগ্রহে সচেষ্ট কিন্তু তাঁদের এই নব আন্দোললনের ভিত্তি বিশেষ দৃঢ় ছিল না এবং সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিকত্বের অভাব ছিল। সবুজসাহিত্য আন্দোলনের মূল উৎস ছিল বীরবলের সবুজপত্রের নূতন সুর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এবং

প্রমথ চৌধুরীর যে সৃজনী প্রতিভা এবং দুর্ব্বার আবেগ বাঙলা সাহিত্যে নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল তার কিছুমাত্র প্রতিচ্ছায়া ওড়িশার সবুজ সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তরুণ অন্নদাশংকর যে প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তার অর্ধাংশও ওই আন্দোলনের অন্যান্য মুখপাত্রগণের ছিল না। যে যৎসামান্য সৃষ্টি ওড়িয়া সাহিত্যে আজও বর্তমান ডক্টর মানসিংহের মতে তা সবুজ সাহিত্যদলের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়, অবশ্য অন্নদাশংকরের অবদান একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁর কমল বিলাসীর বিদায় কাব্য ওড়িয়া সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটি রত্নবিশেষ। কিন্তু অন্নদাশংকর সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করে যখন মাতৃভাষা চর্চায় মনোনিবেশ করলেন সেই মুহূর্তে ওড়িয়া সাহিত্য হারালো এক প্রতিভাধর শিল্পীর সৃজনীমূলক আদর্শ। সবুজ সাহিত্যদলের সভ্যগণ ছিলেন নিতান্তই তরুণ, তদুপরি তাঁদের প্রেরণার উৎসে জীবনবোধের অভাব ছিল অত্যন্ত প্রকট। সম্ভবতঃ এই কারণেই সবুজ সাহিত্য আন্দোলন ক্ষণস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবন-বোধের পরিচয়লাভে ধন্য হয়েছেন। সবুজ সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কিত আলোচনায় ডক্টর মানসিংহের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির আভাষ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ ত্বরিত। সবুজ সাহিত্যদল আরও সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে।

বর্তমান ওড়িয়া সাহিত্যে যে ঐতিহ্য পরিদৃশ্যমান, তার প্রবর্তক সরলদাস, ফকিরমোহন, রাধানাথ এবং অন্নদাশংকর। এঁদের উত্তর সাধক "আখড়া ঘরের বৈঠক" গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণপ্রসাদ বসু যে উচ্চাঙ্গের গদ্যরীতির নিদর্শন ওড়িয়া সাহিত্যে সংযোজন করেছেন তা ক্লাসিকধর্মী। ওড়িয়া সাহিত্যের একমাত্র দুর্বল অংশ হল সমালোচনা সাহিত্য। অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি যে সমালোচনা সাহিত্যের অন্যতম অন্তরায় তা বর্তমান ওড়িয়া সমালোচকগণের মর্মে এখনও অনুপ্রবেশিত হয়নি। তাঁরা যে সমালোচনা সাহিত্যের ঘূর্ণিপাকে আবদ্ধ আছেন ডক্টর মানসিংহের মতে তা মধ্যমন্তরেরও নয়। কলিঙ্গ ভারতীয় সাহিত্য অধিবেশনে সমলোচনার যে আড়ম্বরপূর্ণ নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় তা উগ্র দেশপ্রেমের পরিচায়ক, প্রগতির পরিপন্থী। অন্ধ নিষ্ঠা ওড়িয়া সমালোচনা সাহিত্যকে দিশেহারাই করেছে, কোনও সুষ্ঠু পথের নির্দেশ দিতে পারেনি। ডক্টর মানসিংহ এই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে যে যুক্তিবাদী সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন, আশা করা যায় ওড়িয়া সমালোচকগণ তা মেনে নিয়ে সমালোচনার ক্ষেত্রে নূতনত্বের স্বাক্ষর বহন করবেন।

সাহিত্যের ইতিহাস একক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। ডক্টর মানসিংহের ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ এমনই এক প্রচেষ্টা যা আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ বলে মনে হতে পারে কিন্তু ওড়িয়া তথা ভারতীয় গবেষকগণের পক্ষে অপরিহার্য। যে পাণ্ডিত্য এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। স্থান বিশেষে উচ্ছ্বাসপ্রবণ হলেও ডক্টর মানসিংহের বাকধারা সাবলীল এবং সেই কারণেই ওড়িয়া সাহিত্যের ইতিহাস রসোত্তীর্ণ। ত্রুটিবিচ্যুতি হয়ত আছে (বৃহৎ ব্যাপারে যা স্বাভাবিক) কিন্তু তা স্বত্বেও এই সুলিখিত এবং তথ্যবাহক আকর গ্রন্থটি এককথায় অপরিহার্য।

অজিত দাস

ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ফুল ॥ সুনীলকুমার নন্দী। মূল্য—২'৫০। কোয়ার্টেট। কলিকাতা-১৯।

চল্লিশের যুগে যারা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন তাদের অনেকেরই আজ স্তব্ধ কণ্ঠ। কেউ স্তব্ধ হয়েছেন ভাব এবং জাগতিক অভাবের মধ্যে শিল্পের মধ্যপথ আবিষ্কার করতে অসমর্থ হয়ে। কারো কারো অবশ্য স্তব্ধ না হয়ে উপায় ছিল না। কেননা সময় এবং তাৎক্ষণিক কাব্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে তারা এতই পেছিয়ে পড়েছিলেন, যে কোনো সৎপাঠকের পক্ষে সেই অনাবশ্যক ব্যর্থ শব্দাবলীর শ্রান্তি সহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া যুদ্ধপরবর্তী বাংলা কবিতায় প্রচলিত মূল্যবোধগুলি একদিকে যখন বহু যোগ্য সন্ধানীর আলোয় পরীক্ষিত হচ্ছিল, অন্যদিকে প্রকরণে শব্দব্যবহারে ছন্দে এক আমূল পরিবর্তনের আভাসও অলক্ষ্যণীয় থাকেনি। যদিও বর্তমান বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে "আধুনিক" বিশেষণটিকে যোগ্য মর্যাদা দিয়েছে মূলত গত দুই দশক। সেই যুগে লেখা আরম্ভ করে যারা এখনো ফুরিয়ে যান নি; এখনো সমকালের সমস্ত সমস্যা ও জিজ্ঞাসার কষ্টিপাথরে ছন্দের বেদনা ও গৌরবকে যাঁরা যাচাই করে নিতে পারছেন, আলোচ্য গ্রন্থের কবি শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার নন্দী তাদের মধ্যে অন্যতম।

বহুদিন ধরেই তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ প্রতীক্ষিত ছিল। মাঝখানে কয়েক বছর তাঁর কোনো লেখা আমাদের চোখে পড়েনি। সুখের কথা আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর লেখা আবার নানা পত্রপত্রিকায় দেখা যাচ্ছে। প্রাঞ্জল চিত্রকল্প, কোমল গীতিপ্রসন্নতার সঙ্গে অমোঘ শব্দ বন্ধন যা তাঁর কবিতার প্রধান গুণ ছিল, অধুনা সঙ্গে গ্রন্থঅন্তর্গত সাম্প্রতিক রচিত কবিতাবলীতে মিলেছে এক নতুন ধরণের আপাত তির্যক সংহত বাচনভঙ্গী। বর্তমান জীবনের সমস্ত ক্লেদ ও দৈন্যের সঙ্গে পরিচিত থেকেও অবিচলিত বিবেকবান এই কবি শব্দের দায়িত্ববোধে তাকে সুস্থ ও সম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছেন।

যেমন :

"বুনো জ্যোৎস্নায় মত্ত অরণ্যের নীল অন্ধকার
চৌরঙ্গী-শিয়রে দীর্ঘ ছায়া ফেলে;
তারইতলে কয়েকটি উদাসচিত্ত তাপসকুমার
সাহিত্য-দর্শন-ধ্যান সাঙ্গ করে,
সাঙ্গ করে উর্বশী কটাক্ষে বুঝি হঠাৎ কখন।
জাগর চৌরঙ্গী হয় মুহূর্তের মুগ্ধ তপোবন!"

অবশেষে :

"কামুক ছোবল-চিহ্ন দেগে নিয়ে সারা মুখে-চোখে, তারপরে
কেউ কি করছে পাঠ তার ওই বিষাক্ত অশুচি চোখে
পবিত্র কান্নার ইতিহাস?
হয় তো তা জানে শুধু বৈশাখী আকাশ,
যে ওড়ালো ঝড়ো হাতে

স্নিগ্ধ পৃথিবীর স্বপ্ন সোনাভানা নীড়—
মঙ্গলশঙ্খের কণ্ঠে সন্ধ্যায় প্রার্থনা ব্যর্থ, ঈশ্বর বধির !" (নীলকণ্ঠী)

কবির "বৃন্তটি হোক শতায়ু", "অমরাবতীর দিকে", "আলোর ভাসান", "প্রতিমা", "তুমি আছো", "অরণ্য" "শরিক" প্রভৃতি সাম্প্রতিক পর্বের কবিতাগুলি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। তা ছাড়া ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৫ মধ্যে রচিত "সম্ভার", "স্বর্ণবীজ", "চোখের বালি", "ফিরে চলো" কবিতাগুলিও প্রসন্ন চিত্রকল্প ছন্দের উদ্যমে আমাদের মুগ্ধ এবং বিস্মিত করে। শহরের রুক্ষ-কুটিল হিংস্র লোলুপ থাবা থেকে তিনি প্রকৃতির নির্জন ব্যপ্তির মধ্যে স্নিগ্ধ প্রশান্তির সমুদ্রে শেষ গানের ভেলাটিকে ভাসাতে চেয়ে শেষ কবিতায় বলেছেন :

"এ-শহরে মন আর নয়, নয় ! মত্ত আশার হু হু সমুদ্র
এ-শহর কাঁপে সারা দিনমান হিংস্রলোলুপ ডুবুরির ভিড়ে—
মুক্তো তোলার কত ছলাকলা। উত্তাল ঢেউ। এখানে ক্ষুদ্র
গানের তরণী ভাসাবো কোথায় ? (ফিরে চলো)

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

অন্ধকারের বেদনা থেকে ॥ রবীন্দ্র অধিকারী। ছ' নম্বর কৈলাশ দাস লেন, কলকাতা ছয় থেকে প্রকাশিত। দাম দু' টাকা।

আহরিত বেদনা অথবা তিল তিল সঞ্চিত যন্ত্রণার আবর্তের মধ্যে যে মানুষ মুক্তির সন্ধানে ফেরে সেই কবি এবং শরবিদ্ধ হৃদয়ের যে পাখা-ঝাপটানো তাই কবিতা। রবীন্দ্র অধিকারীর কবিতাগুলি পড়তে বসে আমার অন্ততঃ তাই মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, এক স্বাধীন বিহঙ্গ হঠাৎ নীলিম শূন্য থেকে শৈবালদামে পতিত হয়েছে। বুকের অন্তস্থলে কোন লক্ষভেদীর (জীবনের অভিজ্ঞতা) তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে রয়েছে। কবিতাগুলো পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন মনে হল আমি সেই আহত বিহঙ্গের নিঃসঙ্গ বিলাপ শুনতে পাচ্ছি। মনে হল এই বিলাপ তো আজকের জীবনযাত্রার নিঃসঙ্গ চিন্তালগ্নে আমি আমার নিজের মধ্যেও প্রায়শই শুনতে পাই ! আজকের কবিতার পাঠক হিসেবে শ্রীযুক্ত অধিকারীকে আমার একান্ত আপন কবি বলে মনে হল। মনে হল 'চৈত্রের প্রান্তরে মরা পাতা'য়, হৃদয়ের আকাশে যখন জ্যোৎস্না নীরব, তখন মখমল ঘাসে মেঘকন্যাদের সাথে দুধ-শাদা নিশীথে আমিও মেঘ কবির সঙ্গে অভিসারে বেরিয়েছি। আবার মনে হয়েছে, না, আমার বিফল অভিসার মন্থনে যা পেয়েছি সেই আমার পরম আত্মীয়, এতদিন পথিবীর পথচেনায় থাক না ব্যর্থতা। কবি বলেছেন, বেদনা আমার, বেদনাকে ফিরে দাও / আর তো কিছুই চাইনে তোমায় কাছে / চৈত্র হাওয়ায় বাঁশিতে কান্না ঝরা / আসন্ন বেলা গোধুলি লগ্নে কাঁপা / বুকের তিমিরে একটি মানিক জ্বলে / অথবা বলেছেন, মাঝে মাঝে ছুটি পেতে চাই / পিছে ফেলে সংসারে দুরন্ত চড়াই / জ্যোৎস্নার নীল স্রোতে মাঝে মাঝে ছুটি পেতে চাই।

কবি সম্পূর্ণরূপে আত্মলীন। ক্বচিৎ কোন কোন কবিকে নিপুণভাবে কাঁদতে দেখি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কান্নায় জলই শুধু থাকে, বেদনা থাকে না। ফলে কবি কাঁদলেও পাঠক কাঁদে না। কিন্তু এ গ্রন্থ অমায় অন্যতর অভিজ্ঞতা। কবির আর্তি এমন তীব্র যে তাকে অস্বীকার করা যায় না। বিস্মিত হই যখন দেখি তোমার বামে যদি কোন নদী থাকতো / তবে সেখানে আমি ঘর বানাতাম। / সেই নদীর ধারে। ছোট একটি ঘর। / সব শেষে একটি কথা না বলে পারছি না, গ্রন্থের অনেকগুলি পৃষ্ঠায় জীবনানন্দের মুখখানা যেন বার বার উঁকি দিয়ে গেছে। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদপটে কাব্যের মর্মবাণীর প্রতিফলন যেন একটি স্বতন্ত্র কবিকল্পনাই। শিল্পীর তুলি বেদনাকে গ্রন্থপাঠের পূর্বেই গাঢ় করে রাখে।

শান্তি লাহিড়ী

বাতাবরণ ॥ অসিত ভট্টাচার্য ॥ সিগনেট প্রেস। দাম ২·৫০

ভাল কবিতা যে কি জিনিষ এর কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা আমার জানা নেই। কোন বিষয়েই ভাল লাগার যেমন স্বচ্ছ স্পষ্টতা থাকা সম্ভব নয় তেমনি কবিতা পড়াতেও। আলংকারিকেরা কাব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছিলেন সে অলংকার নয়, ষ্টাইলও নয়, নারী দেহের লাবণ্যই তার শ্রী, তার সৌন্দর্য। কবিতার রূপও তার ভাষার চাতুর্যে নেই, অলংকারের মুখরতায় নেই, আছে তার লাবণ্যে। কবিতার লাবণ্য কাকে বলে সেকথা কেউ স্পষ্ট ভাষায় কেমন করে বোঝায়, যেমন নারীদেহের লাবণ্য সম্বন্ধে বোধ থাকলেও স্পষ্ট ভাষায় তার স্বরূপ বোঝানো যায় না।

সম্প্রতি একটি কবিতার বই আমাদের হাতে এসে পড়েছে। কবিতাগুলির আশ্চর্য লাবণ্য আছে, স্নিগ্ধতা আছে। খুচরো সমালোচনার প্রবৃত্তি আপনি ফণা গুটিয়ে ভাললাগার অনুভূতিকে পথ ছেড়ে দেয়। কবির ভাষা দুর্বল নয় কিন্তু কঠোর রূক্ষতাকে বীর্য বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা কবির নেই। কবি অসিতকুমার ভট্টাচার্যের বাতাবরণ এমন একটি কাব্যগ্রন্থ যা পড়ে আমরা নিঃসঙ্কোচে বলতে পেরেছি—ভাল লাগলো। বিষয়বস্তু প্রফেট দেরেমায়া থেকে পোড়োবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত। অবাধসঞ্চরণশীল মন নিয়ে কবি তার কখনো মুগ্ধ কখনো ক্ষুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়েছেন। সেই দৃষ্টির উত্তাপ তাঁর কবিতার সরণী বেয়ে আমাদের মনে এসে লাগে। পাঠকের মন গভীরভাবে স্পর্শ করার কারণ বোধ হয় এই যে কবির মন একটি গানের উচ্ছ্বাসে বাঁধা—তাঁর কবি স্বভাব মূলত Lyrical. বিশ্বকে দেখাও প্রধানতঃ তাই কোন তত্ত্বের খাঁচার মধ্য দিয়ে নয় খোলা আকাশের উন্মুক্ত ঔদার্যের মধ্যে। তাই আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না, ভাল-মন্দের জাল-বুনুনিতে কবিতার ভাবনার সুতো বাঁধা উক্তির প্রলোভন সম্বরণের কোন প্রয়োজন নেই।—

রাত্রি আসে নত-নীরব—অসীমাকাশময়
পৃথিবী হল মৌন, শুধু বাতাস কথা কয়।

রাতের বুকে পাতারা কাঁপে। মাটির বুকে ঘাস
আমার বুকে কাঁপে কেবল আমার নিঃশ্বাস।

এর ভাষা বিচার করতে আমি অক্ষম—খুব একটা বাহাদুরী করার মতো বাকবিন্যাসঘটিত মুন্সিয়ানা নেই কিন্তু তবু মনে কঁাপন লাগায় মনকে উদাস করে। নিজের জগত ভুলে কবির জগতে চলে যাই। এভাবের কোন তত্ত্বগত পরিণতি নেই, কোন সমস্যার উত্থাপন বা সমাধান নেই—এ শুধু একটি ব্যক্তিহৃদয় বেদনা অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হলো। তাতেই এর সার্থকতা।

প্রায় বারো বছরের কবিতা পাঁচটি ভাগে ভাগ করে কবি সাজিয়েছেন প্রত্যেকটি ভাগেই কবিমনের নবতর অনুভবের চিহ্ন আছে। কবির মননের জগত বিস্তৃততর হচ্ছে। আধুনিক কালের সমস্যাক্রান্ত আর্ততা ব্যক্তিহৃদয়ের নিবিড় উত্তাপে সংহত কাব্যরূপ ধরেছে—সেখানে সমষ্টিগত সহজ পদ্ধতিতে বেদনা নিরসনের কথা নেই। ভাবনাকে ভাবের লোকে রূপান্তরিত করার সার্থক উদাহরণ শেষ দিকের কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। কোথাও মিশেছে ইতিহাসচেতনা, অতীতের মোহকে টেনে এনেছে বর্তমানের দিগন্তে। প্রথম অংশে যা ছিল আবেগে মুখর শেষে তাই হলো অনুভবে সংহত শুধু তার সঙ্গে এসে মিশেছে মননের দীপ্তি যা উজ্জ্বল কিন্তু তীক্ষ্ণতার খোঁচা যাতে নেই।

রূপকল্প রচনায় কবির কঠিন কল্পনার প্রচেষ্টাচিহ্ন নেই কোথাও তা এসেছে স্বভাবতঃই। রসাক্ষিপ্ত হয়ে যে চিত্রকল্প 'অপৃথগযত্ননির্বর্ত্ত্যো' আসে কাব্যের তাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দু'একটি উল্লেখ করলে কবির নিজস্বতা অনুভব করা যাবে।—

আকাশ নির্জন তবু—সূর্য, তারা, সময়ের নীড়।'
'তুমি যেন এক পুরোনো হলুদ বাড়ি,
আমি যেন এই ঝড়ের ঝাপটা হাওয়া,
ভিজে ভিজে ওঠ দমকা জলের ছাটে'
'আমি এক অভিযাত্রী, তুমি এক মৌন মহাদেশ……
এই পথ'

এমনি আরও বহু চিত্রকল্পের উল্লেখ আছে। উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। কবির কবিতার রস পাঠককে পান করানো সমালোচকের কাজ নয়। পাঠককে শুধু জানাতে চাই গভীর অনুভূতি আর স্থির মননের মিলনে এই কবিতাগুলি ভাব ও ভাষায় উজ্জ্বল—আধুনিক পাঠকদের এই কাব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সোমেন্দ্রনাথ বসু
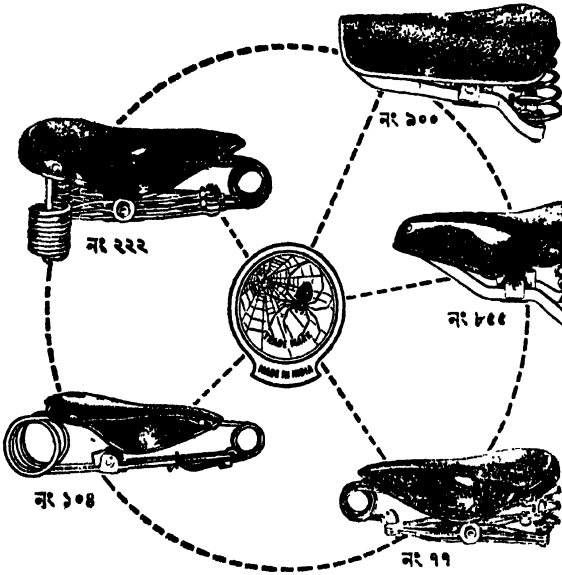
নং ১০০
নং ২২২
নং ৮৫৫
নং ১০৪
নং ৭৭
অত্যন্ত
আরামদায়ক
উইটকপ
সীট
বিভিন্ন টেঁকসই ডিজাইনে পাওয়া যায়
প্রথম শ্রেণীর বাট লেদার
এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাতের স্প্রিং-এ তৈরী

SEN-RALEIGH

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিনামরমনীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 Aug. '63 (0.50) Central Regd. No. R.N.2602/57 SAMAKAL

সমকালীন

একাদশ বর্ষ ॥ ভাদ্র ১৩৭০

অপরূপ
কেশবতী মহিলাটিকেই
জিজ্ঞেস করুন...
উনিই বলে দেবেন টাটার হেয়ার অয়েল মেখেই ওঁর চুলের
গোছা অমন সুন্দর হয়ে উঠেছে! টাটার হেয়ার অয়েল
• মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে
• চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম
টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল—৪টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাষ্টর
হেয়ার অয়েল—গোলাপের সুরভিযুক্ত। ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
THOY-47BEN

একাদশ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ভাদ্র তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ভাদ্র
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
৫ম সংখ্যা

কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়

সতী ঘোষ ও প্রভা রায়

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন গেয়েছেন—

জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
কৃত্তিবাস নাম তোমা! কীর্ত্তির বসতি
সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে;

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এত বড় যশস্বী কবি বোধহয় আর কেউ নেই। সংস্কৃত ভাষায় যে রামায়ণ-কথা পণ্ডিত শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল সাধারণের ভাষায় তাকে প্রথম মুক্তি দিলেন মহাকবি কৃত্তিবাস এবং তার দ্বারা বাঙালী শুধু একখানি কাব্যই পেল না, পেল সমস্ত ভারতের নিগূঢ় মর্মকথা, পেল ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও আদর্শের স্পর্শ, বাংলার গণ্ডী ছেড়ে এক বিস্তৃততর ভাবের ক্ষেত্রে মানসমুক্তি অনুভব করলো। অত্যন্ত ঘরোয়া কথার মধ্যে দেখতে পেল বৃহত্তর মহত্তর ও বলিষ্ঠতর জীবনের রূপ। কবির কাব্যকথা বাঙালীর জীবনকথা হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এত বড় কবির এত বড় কাব্য নিয়েও সংশয় ও সমস্যার শেষ নেই। তাঁর রচিত রামায়ণ কাব্যে নাকি সবই প্রক্ষিপ্ত। আবার তাঁর কাল নিয়েও বাক্-বিতণ্ডার শেষ নেই। কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণী" বিচার করে সাহিত্য-ঐতিহাসিক অনেকেই মনে করেছেন যে কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের দনুজমর্দনের সভাসদ্ ছিলেন এবং কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন রাজা কংস (গণেশ)। সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে বারবক শাহ বলে অনুমান করেছেন। তিনি নানা তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সে সময় নারায়ণ দাস কেদার রায় এবং গন্ধর্ব রায় প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণীতে"।

দেখা যাচ্ছে—সবাই অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন এবং প্রত্যেকেই কৃত্তিবাসের "আত্মবিবরণী" নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন "বেদানুজ" শব্দটির "বে" অক্ষরটি বাদ দিয়ে "দানুজ"-কে দনুজ এবং পরে দনুজ-মর্দন বলে গ্রহণ করেছেন। পাত্র-মিত্রদের মধ্যেও নিজেদের ইচ্ছামত কোন কোন নাম গ্রহণ করেছেন ও কোন কোন নাম বাদ দিয়েছেন।

কতকগুলি তাম্রলিপির ঐতিহাসিক সাক্ষ্য থেকে এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মতামত আলোচনা করে এই কাল সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় বলে আমাদের বিশ্বাস। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত "বেদানুজ" শব্দটির কোন অংশই বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ শব্দটির অর্থ "বেদের অনুগমন করে যে" অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ অথবা পরমধার্মিক ধরা যেতে পারে। তারপর "বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির" এই পংক্তির ব্যাখ্যা তুর্কী আক্রমণের বিপর্যয়কে অনায়াসেই ধরা যেতে পারে। অনেকে যে মনে করেন দনুজমর্দনের সময়ে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহ পূর্ববঙ্গে বিপর্যয় এনেছিল, সেটা আমাদের মনে হয় ভ্রান্ত। কেননা ইতিহাসে দেখা যায় যে তুঘ্রিল খাঁ গিয়াসুদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং গিয়াসুদ্দিন দনুজমর্দনের সাহায্য চেয়েছিলেন যাতে জলপথে তুঘ্রিল খাঁ পালাতে না পারেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে তুঘ্রিল খাঁর বিদ্রোহে দনুজমর্দনের রাজত্বে কোন বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছিল। বরঞ্চ মনে হয় দনুজমর্দন এত পরাক্রান্ত স্বাধীন নৃপতি ছিলেন যে গিয়াসুদ্দিন বলবন তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে নরসিংহ ওঝা যে সভায় পাত্র ছিলেন সেইটি লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা এবং দেশের যে বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা তুর্কী-আক্রমণ। তখন সবাই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন, এ কথা ইতিহাসসিদ্ধ। আর লক্ষ্মণসেন যে শাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ এবং পরমধার্মিক নরপতি ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর সময়কার কতকগুলি তাম্রলিপি থেকেও প্রমাণিত হয়। পাঁচটি তাম্রলিপির সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার মধ্যে চারখানাই ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সংক্রান্ত এবং একখানা চণ্ডী দেবীর বিগ্রহস্থাপন সংক্রান্ত। এই তাম্রলিপি থেকে এবং লক্ষ্মণ সেনের পুত্রদ্বয় মাধব সেন এবং কেশব সেনের তাম্রলিপি থেকে এও প্রমাণিত হয় যে তুর্কী দ্বারা গৌড়-বঙ্গ অধিকৃত হবার পরে ও পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেন এবং তাঁর দুই পুত্র প্রায় ষাট বৎসরকাল (১১৯২—১২৫৯ খৃঃ) রাজত্ব করেছিলেন।

অপর একটি জোরাল তথ্যের সন্ধানও পাওয়া গেছে। কৃত্তিবাস যে রাজসভার বর্ণনা করেছেন তাতে কতকগুলি পাত্র-মিত্রের নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে যিনি গৌড়েশ্বরের ডাহিনে (অর্থাৎ ধরা যেতে পারে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী) বসে ছিলেন তাঁর নাম 'নারায়ণ'—"বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।"

লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের লেখাগুলিতে দেখা যায় যে পাঁচটির মধ্যে চারটিতেই সন্ধিবিগ্রহিকের (অর্থাৎ Minister of war and Peace বা যুদ্ধবিগ্রহ সংক্রান্ত প্রধান অমাত্য) নাম নারায়ণ দত্ত বলে উল্লিখিত আছে। আনুলিয়া কপার প্লেট, গোবিন্দপুর কপার প্লেট, তর্পণদীঘি কপার প্লেট এবং ঢাকা তাম্রলিপি থেকে এই সন্ধিবিগ্রহিকের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কৃত্তিবাস যে রাজসভা দেখেছিলেন সেটা তাঁর প্রপিতামহ নরসিংহ ওঝা যে সভার পাত্র ছিলেন সেই সভাই কিনা। আমাদের মনে হয় যে, কৃত্তিবাসের সে সভায় উপস্থিত হওয়া খুব অসম্ভব নয়। কারণ

তাঁর আত্মবিবরণীতে দেখা যায় যে তিনি এগার বৎসর পূর্ণ হলেই পড়াশুনো করতে উত্তর দেশে যান। তিনি তাঁর মেধার এবং তাঁর অধ্যয়নকাল সমাপ্তির যে রকম বর্ণনা দিয়েছেন তাতে মনে হয় খুব বেশীদিন তাঁকে গুরুগৃহে থাকতে হয়নি। গুরুগৃহ বাসের ন্যূনতম কাল যদি চার বৎসর ধরা' যায় তবে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় তাঁর উপস্থিতির বয়স ১৫।১৬ বৎসর। এই সময় তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহের জীবিত থাকা খুব অসম্ভব নাও হতে পারে। কারণ তখনকার দিনে ব্রাহ্মণের ঘরে বাল্যবিবাহ প্রথা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল, সেখানে পিতাপুত্রের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ২০।২১ বৎসর হওয়া সম্ভব। এই যুক্তিতে কৃত্তিবাসের বয়স যখন ১৫।১৬ বৎসর তখন তাঁর প্রপিতামহের বয়স ৯৫।৯৬ বৎসর হতে পারে। তা ছাড়া তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ জীবিত না থাকলেও নরসিংহ ওঝা থেকে লক্ষণ সেন বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া বিচিত্র নয় এবং তিনি যে সে সময় জীবিত ছিলেন না, এ কথা বলা চলে না। কারণ তিনি অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কৃত্তিবাসের পক্ষে লক্ষণসেনের সভায় সমাদর পাওয়াও খুবই যুক্তিসঙ্গত। আবার দেখা যায় অনেক সমালোচক কৃত্তিবাস-বর্ণিত রাজসভাকে রাজসভা বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন, কেননা ঐ বর্ণনায় জাঁকজমকের অভাব এবং সভাসদদের সংখ্যা অতি অল্প। এ থেকে এবং তাম্রলিপির লেখা থেকে আমাদের মনে হয় এই রাজসভা লক্ষণসেনের শেষ বয়সে যখন তিনি গৌড়বঙ্গ থেকে পালিয়ে পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন সেই সময়কার। এর সমর্থনে ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা গেল। "রাজসভার বর্ণনায় গৌড়দরবারের মুসলমানি আদবকায়দার ইশারামাত্র নাই। সভাসদ্‌গণ সকলেই হিন্দু এবং অধিকাংশ ব্রাহ্মণ।" এই মন্তব্য থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কবি কৃত্তিবাস বৃদ্ধ লক্ষণসেনের রাজসভা দেখে থাকতে পারেন। লক্ষণসেন ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি নিষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং তাঁর সভাসদ্‌দের মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ হওয়া অসম্ভব নয়। তুর্কী আক্রমণে তিনি যখন পূর্ববঙ্গে আসেন তখন তাঁর রাজসভায় বেশী জাঁকজমক না থাকাই স্বাভাবিক। লক্ষণসেনের সন্ধিবিগ্রহিকের নাম ছিল নারায়ণ দত্ত। গৌড়েশ্বরের 'ডাহিনে' তাঁর বর্তমান থাকাও অসম্ভব নয়। তা ছাড়া কৃত্তিবাস যখন গৌড়েশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন, "মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর"। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। অল্প বয়সের যুবক কোন রাজা শীতকালে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছেন এ যেন ভাবা যায় না। এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের মনে হয় কবি কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর লক্ষণসেনের সভা দেখেছিলেন এবং তারই বর্ণনা দিয়েছেন। যদি তা নাও হয় তবে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে কৃত্তিবাস সেন-বংশের অন্তিম অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। লক্ষণসেনের রাজসভায় যে সন্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত বর্তমান ছিলেন তাঁর পক্ষে লক্ষণসেনের পুত্র কেশবসেন বা মাধবসেনের সভায় বর্তমান থাকা একেবারেই অসম্ভব নয়।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ১২০৫ থেকে ১২৫৯ খৃঃ মধ্যে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভা দেখেছিলেন এবং রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ যে বাল্মীকির রচিত সংস্কৃত মূল রামায়ণের অনুবাদ নয়, অনেকেই এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। হনুমান রচিত "মহানাটকম্" নামক একটি ক্ষুদ্র সংস্কৃত রামায়ণ (অপভ্রংশ সাহিত্য থেকে এর ছাঁচটি নেওয়া হয়েছে বলে ডক্টর সুশীলকুমার দে অভিমত

প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর মতানুসারে এই রামায়ণটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের সমসাময়িক) পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস যে তাঁর রামায়ণ রচনার অনুপ্রেরণা এই "মহানাটকম্" থেকে পেয়েছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দুইটি রচনার স্থানে স্থানে ভাব এবং ভাষার অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আদিকাণ্ডের প্রথমেই আছে—

রামং লক্ষ্মণপূর্বজং রঘুবরম্ সীতাপতি সুন্দরম্
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্॥ ইত্যাদি

এই শ্লোকটি মহানাটকমে 'নান্দীর' রামবন্দনার পঞ্চম শ্লোক। বলা বাহুল্য, বাল্মীকির রামায়ণ রাম বন্দনা দিয়ে আরম্ভ হয়নি।

আর একটি জায়গায় দেখা যায় মহর্ষি জনকের রাজসভায় শ্রীরামচন্দ্র যখন হরধনুভঙ্গে উদ্যত সে সময় সীতার মনোভাব সম্বন্ধে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে নীরব। কিন্তু 'মহানাটকম্'-এ সীতার মনোভাব সম্বন্ধে আছে—

"কমঠপৃষ্ঠকঠোরমিদংধনুঃ, মাধুরমূর্ত্তিরসৌরঘুনন্দনঃ।
কথমাধিজ্যমনেন বিধীয়তাম্, অহহ! তত! পণস্তব দারুণ: ॥"

এই শ্লোকেরই হুবহু অনুবাদ পাওয়া যাচ্ছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে—

কমঠ কঠোর ধনু শ্রীরামকোমলতনু
কেমনে তুলিবে শরাসন।
কত শত বীরগণে না পারিল উত্তোলনে
দারুণ পিতার এই পণ ॥

উপরিউদ্ধৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং সাহিত্যিক প্রমাণ থেকে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর রচনা।

বিদেশীদের চোখে সতীদাহ

চণ্ডী লাহিড়ী

সতীদাহকে কেউ দ্রষ্টব্য হিসেবে দেখেননি, যে আকর্ষণে কেউ নাচ বা দুর্গা পূজা দেখতে যায়। দেখতে হয়েছে, কারণ নদীপথই প্রধান যাতয়াতী পথ এবং সতীদাহ নামক ঘটনাগুলি ঘটত নদীতীরেই। সদ্য-বিধবা রমণী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আরোহণ করে, না, তার উপর বলপ্রয়োগ করা হয় সেটা নিঃসন্দেহে জানার কৌতূহল হয়তো ছিল কোন কোন বিদেশীর মনে, কিন্তু এৎসহ ছিল ক্রিশ্চান এথিকস্। জ্যান্ত মানুষকে হত্যা অথবা আত্মহত্যা যাই হোক না কেন, .হুষ্ঠানটি বর্বরতার পরিচয়বাহী, কোন শুদ্ধবিবেকী মানুষ তা সমর্থন করতে পারেনা। বিদেশীদের চোখে তাই এই প্রথা অবিমিশ্র বর্বরতা, কোন যুক্তির দ্বারাই সমর্থনীয় নয়।

উইলিয়ম কেরীর বর্ণনায় একটি সামগ্রিক ছবি পাওয়া যায়। কলকাতার ত্রিশ মাইল দূরে এক গ্রামে একটি সতীদাহের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী (১৭৯৯)। "দেখলাম বহুলোক নদীতীরে সমবেত হয়েছে। তাদের এই সমাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানাল যে, একটি শবদাহ করতে তারা সেখানে এসেছে। শুধালাম, মৃতব্যক্তির স্ত্রী সহমরণে যোগ দেবে কিনা। তারা বলল—হ্যাঁ। মৃতের স্ত্রীকেও দেখাল। স্তূপীকৃত জ্বালানী কাঠের একপাশে মহিলাটি বসেছিলেন। সেই কাঠের স্তূপের মাথায় তার স্বামীর মৃতদেহটি রাখা ছিল। মহিলাটির পাশে বসেছিলেন তাঁর নিকট আত্মীয়রা, একপাশে একটি ঝুড়িতে কিছু মিষ্টান্ন।

আমি জানতে চাইলাম, তিনি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতে চলেছেন কিনা। অথবা কোন অন্যায় প্রভাবে বাধ্য হয়ে জীবন বিসর্জনের পথ বেছে নিচ্ছেন। তারা জবাব দিল—সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়। আমি যতক্ষণ পারলাম যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। তারপর ব্যর্থ হয়ে আমার সকল শক্তি দিয়ে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। বললাম, তোমরা যে কাজ করতে চলেছ সেটা আসলে নৃশংস নরহত্যা। কিন্তু তারা বলল, এ হল পুণ্যকর্ম এবং প্রেবত্তরে জানাল, আমার যদি দেখতে ভাল না লাগে তবে আমি যেন স্থানত্যাগ করি।

বললাম, না, আমি যাবনা। এই নরহত্যা আমি নিজে দেখব। ঈশ্বরের দরবারে বিচারের সময় আমি সাক্ষী দেব। বিধবার কাছে অতঃপর অনুরোধ করলাম জীবন নষ্ট না করতে। বললাম, ভয়ের কিছু নেই। যদি তুমি নিজেকে আগুনে পোড়াতে অস্বীকার কর, তোমার কোন ক্ষতি হবেনা। কিন্তু মহিলাটি বেশ শান্তচিত্তে চিতায় আরোহণ করল এবং হৃদয়ের প্রশান্তি প্রকাশের জন্যই যোৱাত দু'হাত বাড়িয়ে নাচল। লক্ষ্য করলাম, চিতায় আরোহণের আগে তার আত্মীয়রা তাকে চিতায় [illegible] দু'বার প্রদক্ষিণ করায়। প্রদক্ষিণকালে বিধবাটি সন্দেশগুলি উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে [illegible] জনমণ্ডলীও এই সন্দেশ পবিত্র প্রসাদের মত ভক্ষণ করে। তারপর সে চিতায় উঠে মৃত স্বামীর পাশে শয়ন করে একটি হাত তার কাঁধের নিচে, অপর হাত কাঁধের

উপরে স্থাপন করে। এই দুই দেহের উপর শুকনো নারিকেল পাতা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি স্থাপন করা হয়, সর্বোপরি ঢেলে দেওয়া হয় ঘি। তারপর বাঁশ দিয়ে বেশ শক্ত করে চেপে রাখা হয়। তারপর অগ্নি সংযোগ। শুকনো দাহ্যবস্তু সাজানো ছিল কাজেই দ্রুত দাউ দাউ করে জলে উঠল আগুন। সেই লেলিহান অগ্নিকে কেন্দ্র করে জনতা সমস্বরে শিবের নাম নিয়ে চিৎকার করতে লাগল। অগ্নির মধ্যে দৃঢ়নিবদ্ধ মহিলাটির কণ্ঠস্বর শোনার উপায় ছিলনা। সে আর্তস্বরে চিৎকার করেছিল কিনা কোলাহলের জন্য শোনা গেলনা। তার পক্ষে ঠেলে উঠে আসা বা তার জন্য সামান্যতম চেষ্টা করার পথও বন্ধ। কারণ বাঁশ দিয়ে তাকে ঠেসে বেঁধে রাখা হয়েছে। ছাপাখানায় কাগজকে যেমন দু'পাশ থেকে চেপে দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি।

আমরা প্রবল প্রতিবাদের স্বরে বললাম, এভাবে জোর করা অন্যায়। আগুনের যন্ত্রণায় পালিয়ে আসার পথ রুদ্ধ করা কেন? তারা বলল, আগুন যাতে নিচে পড়ে না যায় সেজন্যই বাঁশ বাঁধার ব্যবস্থা।

এদৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা যায় না। জোর করে তাদের বললাম, সহমরণ নয়, এ হল নৃশংস হত্যাকাণ্ড এটুকু বলেই স্থানত্যাগ করলাম।"

এশিয়াটিক জার্ণালে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী একই স্বামীর চিতায় দুই সতীনকে একযোগে আত্মাহুতি দিতে দেখেছেন। কাউকে বাঁশ দিয়ে বাঁধা হয়নি।

"বড় বৌয়ের বয়স পঞ্চাশ, ছোটর প্রায় চল্লিশ। চারিদিকে প্রবল হরিবোল ধ্বনি, তার মধ্যে দু'জনে চিতায় উঠে স্বামীর শবের দু'পাশে শয়ন করল। দেখতে দেখতে চিতার আগুনের অন্তরালে তারা হল অদৃশ্য। কোনপ্রকার বলপ্রয়োগ করা হয়নি, ঔষধ খাইয়ে নেশাগ্রস্ত করা হয়নি, এমনকি বাঁশ দিয়েও বেঁধে রাখা হয়নি। বিনা প্রতিবাদে তারা মৃত্যুবরণ করল। এরপর হরিবোল-ধ্বনি হল প্রবলতর। তাদের নিকট আত্মীয়জনের মুখ দেখে মনে হল যে খুশী হয়েছে খুব। আমি ভীত সন্ত্রস্ত চিত্তে ঘটনাস্থল ত্যাগ করলাম (১৮২৪)।"

শ্রীরামপুর মিশনের প্রখ্যাত পণ্ডিত মার্শম্যানের সঙ্গে বিশপ হেবারের আলোচনা হয়েছিল সতীদাহ সম্পর্কে।

"ডাঃ মার্শম্যান বললেন, তিনি যখন প্রথম বাঙলা দেশে আসেন তখনকার তুলনায় আজকাল এই বীভৎস অনুষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গেছে। এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হিসাবে তিনি মনে করেন—ধনী ও মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবারের জীবনযাত্রায় পশ্চিমী প্রভাবের ফলে ব্যয়বৃদ্ধি, তার ফলে অভাব, সেই অভাবের ফলে বিধবা মা বা অন্যান্য স্ত্রীলোকের ভারবহনে অনিচ্ছা। পরিণতিতে সহমরণ। আর এক সম্ভাব্য কারণ, বয়স্ক পুরুষদের ঈর্ষা। তারা ইহজীবনে একাধিক দার-পরিগ্রহ করেই খুশি নয়, মৃত্যুর পরেও স্ত্রীদের উপর অধিকার যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য জীবদ্দশায় তাদের দিয়ে অথবা আত্মীয়দের দিয়ে সহমরণ অনুষ্ঠানের শপথ করিয়ে নেয়।

তাঁর (মার্শম্যানের) দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, বাংলাদেশে এই ঘটনা প্রায়ই ঘটে বটে, কিন্তু এই বাংলাদেশেই এই প্রথা রহিত করা সম্ভব। বড় জোর মৃদু প্রতিবাদ উঠবে। সতীদাহ রহিত করার

উদ্যোগকে কেবল যে এদেশের রমণীরাই উচ্চকণ্ঠে অভিনন্দিত করবে তা নয়, পুরুষরাও করবে। কারণ যারা সহমরণের সময় সমবেত হয় তাদের মধ্যে অতি সামান্য কয়েকজনের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে। আর মা, ভগ্নি, বা পরিবারের অন্যান্য রমণীর স্নেহচ্ছায়ায় যে মানুষ লালিত হয়েছে, যে রমণীর জন্য পুত্র পৃথিবীর আলোক দর্শনে ধন্য হয়েছে, সেই মা-ভগিনীকে আগুনে ঠেলে হত্যা করতে কেউ সহজে চাইবেনা।

মার্শম্যান বললেন, তিনি যখন প্রথমে ভারতে আসেন তখনকার মত ব্রাহ্মণদের আর সে ক্ষমতা নেই। প্রতিপত্তিও অন্তর্হিত। সাধাবণ মানুষের মধ্যেও আজ বহু ধনী প্রভাবশালী ব্যক্তি রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে এক যোগে এই প্রথা উচ্ছেদের জন্য প্রকাশ্যেই অভিমত প্রকাশ করছেন একথাও আজ সবাই জেনে ফেলেছেন যে, কোন হিন্দুধর্মগ্রন্থে এরকম বিধান নেই। অবশ্য কেউ কেউ এই রীতির গুণগান যে না করেন এমন নয়। ডাঃ মার্শম্যান যে কথা বললেন, অনুরূপ অভিমত আমি শুনছি সদর দেওয়ানি আদালতের এক প্রবীণ বিচারকের মুখে। অবশ্য গভর্নমেণ্টের অভিমত এই যে, জোর করে আইনের দ্বারা যদি এই প্রথা রহিত করার চেষ্টা হয় তবে জেদের ফলে এই প্রথা আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। এই অন্যায প্রথা হযে উঠবে গর্বের বস্তু। এখন তো তবু অবস্থা মন্দের ভাল। এখন চিতায় আরোহণের আগে বিধবা মহিলাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জানাতে হয় যে সে স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতে চায়। তবেই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন মঞ্জুর করেন। এই প্রথা যদি আইনের সাহায্যে রহিত করা হয় তবে লাইসেন্সের জন্য কেউ আর আবেদন করবেনা। সমাজের নিন্দা ও ঘৃণার ভয়ে আগেভাগেই বিধবারা চিতায় আবোহণ করে বসবে।

এ দেশের হিন্দুদের যদি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে হয় তবে সর্বাগ্রে গভর্নমেণ্টকে দূরে থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার, এদেশের আচার-অনুষ্ঠান আমাদের দৃষ্টিতে যত হিংস্র বর্বরতাই হোক না কেন, এদের নিজেদের কাছে সেসব পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান।"

সতীদাহ বোধের ব্যাপারে গভর্নমেণ্টের আপোষমুখী মনোভাবে হেবার আংশিক সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও, হাচিসন গভর্নমেণ্টকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। কঠোর ভাষায় তিনি সরকারের সমালোচনা করেছেন—"ভাবলে কষ্ট হয় যে, বৃটিশ সিংহ গভর্নমেণ্ট হাউসের চূড়ায় বসে দীর্ঘদিন অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে দেখছেন এবং টাকার ঝল্‌কানি বা ঝন্‌ঝনির দ্বারা সেই সিংহের রাগ শান্ত করা যায়।.........পুত্র তার জীবন্ত মাকে চিতায় তুলে দিচ্ছে এমন দৃশ্য ভাবতে পারো! কিন্তু এই ঘৃণ্য কুৎসিৎ অনুষ্ঠান চলতে দেওয়া হয এবং সারাদেশে ইওরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট প্রদত্ত লাইসেন্সের দ্বারা এই প্রথাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়।" (১৯ অক্টোবর ১৮২৬)

ক্যালকাটা জার্নালে সতীদাহের অনেক বর্ণনা প্রকাশিত হয়েছে। সতীদাহের নিন্দা করে এবং সরকারী অকর্মণ্যতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এতে যেমন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রগতিশীল সংস্কৃতিকামী হিন্দুদের পত্রও ইওরোপীয় সম্পাদক সানন্দে প্রকাশ করেছেন। "নটিকাস" ছদ্মনামে জনৈক ইওরোপীয় পাঠক একটি পত্রে লিখেছেন :

"নরম লোকহিতকর আইন বা ধর্মের দ্বারা বাঙ্গালির কোন সুফল হয়নি। কারণ এই দুটোকেই তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগিয়েছে, হতভাগ্য রমণীর অনুকূলে একটিকেও তারা

ব্যবহার করেনি। আমাদের দোষগুলি তারা চমৎকার আত্মসাৎ করে, কিন্তু আমাদের একটি গুণও কি তারা গ্রহণ করেছে? আমাদের আগেরটি যেমন আছে, ভারসাম্য রক্ষার জন্য পরেরটিও আছে। কিন্তু বাংলা দেশের ঠাণ্ডা নির্দোষ অধিবাসীদের সম্পর্কে একথা বলা যায় কি?

ইওরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে ও ভাবের আদান-প্রদানের পরিমাণ বাঙ্গালিদের মধ্যে বেড়েই চলেছে। ইওরোপীয় প্রভাব বাঙ্গালিদের মধ্যে বড় কম নয়। অথচ দেখা যায়, আমরা এই প্রথার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালিরা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে এই প্রথাকে সমর্থন জানায়।

গত দশমাসে আমি একই স্থানে তিনটি নারী হত্যা (সতীদাহ) ঘটতে দেখলাম। প্রতিবারই এই ঘটনার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছি, এই আশায় যে আইনসভা তথা বৃহত্তর সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। আজও সেই আশা ত্যাগ করিনি কারণ ভারতের অন্যান্য 'বিদেশী' উপনিবেশগুলিতে এই হত্যাকাণ্ড রোধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। আমি একথা বিশ্বাস করি না যে, ফরাসি, পর্তুগীজ এমন কি ডাচরাও যে মানবতার বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে এই প্রথা রহিত করেছে সেই মানবতাবোধ ইংরেজদের নেই।"

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্র চর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির মধ্যে অগ্রণী হল কর্ণাটক ও আন্ধ্রপ্রদেশ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কেরল ও তামিলনাডের সংযোগ মুখ্যত সাহিত্যিক, আন্ধ্র ও কর্ণাটকের যোগ আরও নিবিড় ও প্রত্যক্ষ। বর্তমান তেলেগু ও কন্নড সাহিত্যের বেশ কয়েকজন পরিচিত লেখক এই শতকের তৃতীয় দশকে শান্তিনিকেতনে আসেন বিদ্যার্থীরূপে এবং রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যলাভে ধন্য হন। স্বভাবতই কন্নড ও তেলেগু সাহিত্যে রবীন্দ্র-ভাবধারার যেটুকু প্রসার হয়েছে তার মূলে আছে এঁদের প্রয়াস।

কন্নড গীতাঞ্জলি ॥ কন্নড ভাষায় গীতাঞ্জলির চারখানি অনুবাদ হয়েছে বলেই আমরা জানতুম। সে চারজন অনুবাদক হলেন—শ্রীগিরিজাম্মা বসবপ্রভু ইচ্ছাঙ্গীমঠ (প্রকাশকাল ১৯৪৪), শ্রীশ্রীনরেগল্ল প্রহ্লাদ রাও (প্রকাশকাল ১৯৫২), শ্রীবি, এ, শেনয় (প্রকাশকাল ১৯৫৯) এবং শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসবরায় বুধিহালমঠ (প্রথম প্রকাশকাল জানা যায়নি)। এঁদের মধ্যে ইচ্ছাঙ্গীমঠকে প্রথম অনুবাদক মনে করে কন্নড ভাষায় গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশকাল ১৯৪৪ বলে ধরে নিয়েছিলুম। সম্প্রতি জানা গেল গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদক এন, বি, কুরডি। ইনি ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে মাত্র কয়েকটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তার প্রকাশকাল ইত্যাদি কিছুই জানা যায়নি।

জাতীয় গ্রন্থাগারে কন্নড গীতাঞ্জলি পাওয়া গেল মাত্র একখানি—শ্রীপ্রহ্লাদ রাও বা রায়ের অনুবাদ। ইনি শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। বাংলা গীতাঞ্জলি অবলম্বনে এঁর অনুবাদ দুটি ভাগে প্রকাশিত। প্রথম ভাগে (প্রকাশকাল ১৯৫২) ৭৫টি এবং দ্বিতীয় ভাগে (প্রকাশকাল ১৯৫৪) ৮২টি, মোট ১৫৭টি কবিতা। দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা লিখেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন কন্নডিগ আশ্রমিক নারায়ণ সঙ্গম (বা সঙ্গম নারায়ণ রায়)। প্রথম ভাগে এ জাতীয় কোনো ভূমিকা নেই, তবে অনুবাদকের একটি 'মোদল মাতু' অর্থাৎ মুখবন্ধ আছে। তার থেকে এই তথ্যটুকু পাওয়া যায় যে, প্রহ্লাদবাবুর গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে তাঁর বন্ধু শ্রীবুধিহালমঠ ইংরেজী গীতাঞ্জলিকে কন্নড ছন্দে রূপান্তরিত করেন এবং ১৯৫২ সালের পূর্বে তার দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়। সুতরাং ললিতকলা আকাদেমির 'রবীন্দ্রগ্রন্থ পঞ্জী'তে বুধিহালমঠের গীতাঞ্জলি অনুবাদের প্রথম প্রকাশকাল যে ১৯৫৬ বলে দেখানো হয়েছে তা সত্য বলে মনে হয় না।

প্রহ্লাদবাবু শান্তিনিকেতনের মনোরম পরিবেশে গুরুদেবের চরণতলে বসে যে 'চার অক্ষর' শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন মুখবন্ধে সে-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। আর উল্লেখ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেনের কথা, যিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাভবনে অনুবাদকের সহপাঠী ছিলেন। অনুবাদের সময়ে দেওগিরিকরের মরাঠী গীতাঞ্জলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে অনুবাদক আমাদের জানিয়েছেন।

গ্রন্থে প্রহ্লাদ রায়ের কিছু নিজস্ব সম্পাদনার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, প্রথম ভাগের ৭৩টি কবিতাকে সাজানো হয়েছে ছয়টি অংশে—ভগবৎ প্রার্থনা, অন্তর্মুখিতা, জীবদেব-সহযোগ, নিসর্গ নিষ্ঠা, প্রবৃত্তিমার্গ এবং গান-ধ্যান। এছাড়া প্রত্যেকটী কবিতার এক একটি স্বতন্ত্র শীর্ষক দেওয়া হয়েছে। যেমন—

বাংলা গীতাঞ্জলির প্রথম কয়েকটি শব্দ	কবিতার শীর্ষক	বিভাগ
বিপদে মোরে রক্ষা কর	পৌরুষের প্রার্থনা	ভগবৎ প্রার্থনা
ভজনপূজন সাধন আরাধনা	কর্মযোগ	প্রবৃত্তিমার্গ
জগতে আনন্দ যজ্ঞে	নিমন্ত্রণ	প্রবৃত্তিমার্গ
তোরা শুনিস্ নি কি	তাঁর নিত্য আগমন	গানধ্যান

এছাড়া অনুবাদক এমন একটি কাজ করেছেন যা দেখে বর্তমান প্রবন্ধকার মর্মাহত না হয়ে পারে নি। তা হল অনুবাদকের রবীন্দ্রভক্তি প্রদর্শন। প্রহ্লাদবাবু চূড়ান্ত রবীন্দ্রভক্তির পরিচয় দিয়েছেন 'জয় গুরুদেব' নামক একটি দীর্ঘ বন্দনামূলক কবিতা লিখে—যার আরম্ভ ও শেষের পঙক্তি দুটি এই :

জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব
জয় জয় জয় জয় জয় গুরুদেব।

অনুবাদের কাজে প্রহ্লাদ রায় কখনো বাংলার অনুসরণে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন, কখনো দিয়েছেন দ্রাবিড় শব্দ-সম্ভার, আবার কখনো বা আর্য-দ্রাবিড়ের মণি-প্রবাল সংযোগ ঘটিয়েছেন। পর্যায়ক্রমে আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি।

(ক) তৎসম শব্দের প্রাচুর্য। 'রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করি' ইত্যাদি অংশের অনুবাদে আছে :

রূপসাগর দোলগে মুলুগি **অরূপরতন** বনেলসিহে, **দ্বীপদ্বীপকে জীর্ণ নৌকে**য়োললেয়েনো অলবলিসিহে। অথবা, 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' গানখানির অনুবাদে প্রারম্ভিক অংশ এইরূপ : **শ্রাবণঘনগল গহনছায়ে**য়লি ইত্যাদি।

(খ) দ্রাবিড় শব্দের সমারোহ। 'ক' অংশে উল্লিখিত অনুবাদ থেকে মূল গানগুলি ধরা বাঙালির পক্ষে কঠিন নয়, কারণ বেশ কিছু শব্দ, হয় রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতা থেকে অথবা আর্য ভাষা থেকে, গৃহীত। কিন্তু যদি বলা হয়—

নীনে কেলিরুতিহেয়া কেলিরুতিহেয়া
　　　　আতন অডিদনিয়া ?
ওহো বরুতিহ বরুতিহ বরুতিহনু।

তবে কন্নড-নাজানা বাঙালীর পক্ষে ধরা শক্ত যে ওর মূল হচ্ছে 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি, ঐ যে আসে, আসে, আসে।' অনুরূপ অসুবিধা হয় নিম্নলিখিত পঙক্তি থেকে বুঝে

নেওয়া যে ওর মূলে আছে 'জননী গো, গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার'। কন্নড অনুবাদ হচ্ছে :

নিম্ন কোরলিগে, তায়ে, মুত্তিন
চেন্ন সর ঈ বারিয়ু।

(গ) আর্য-দ্রাবিড়ের মণিপ্রবাল সংযোগ। যেখানে এই সংযোগ ঘটেছে সেখানে কন্নড অনুবাদ 'ক' অংশের মতো সরল না হতে পারে, কিন্তু 'খ' অংশের মতো দুর্বোধ্যও নয়। ধরা যাক নিম্নলিখিত চরণ দুটি :

ইকো নন্ন ঈ **শিরব** বাগিসিকো **চরণধুলিতল**দি !
সকল ঈ অহংকার মুলুগিসৈ নন্ন **নয়নজল**দি !

প্রথম চরণ থেকে যদি বুঝতে কিছুটা দ্বিধা ঘটেও বা, দ্বিতীয় চরণে এসে আর সংশয় থাকে না যে, এটির মূল হল 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।'

ছন্দের দিক থেকে বিচার করলে প্রহ্লাদ রায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশ্চর্য সফলতা লাভ করেছেন। আমার মনে হয়, আমাদের বাঙালী কানেও সেই সাফল্যের সুর ধরা পড়বে। যেমন, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' এই কবিতাটির অনুবাদে কবি যে ছন্দ প্রয়োগ করেছেন তাকে বাঙালী পাঠক সাত মাত্রার ধ্বনিপ্রধান ছন্দের লয়ে (তুলনীয়—পুরানো সেই সুরে | কে যেন ডাকে দূরে |) পড়তে পারেন। অবশ্য আধুনিক বাংলা উচ্চারণে নয়, বৈষ্ণব ব্রজবুলি পদের অনুসরণে—

মোড মোডকে | জোডি জোডিঁবে | কত্তলেয়ুবলু | কবিদিদে !
কুডি সিহেয়া | বাগিলদবলি | হোত্তু তিলিয়দ | সবেদিদে !

'প্রেমে প্রাণে গানে' এই গানখানির 'দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ' এই অংশের অনুবাদকে আমরা অনায়াসেই বৈষ্ণব পদাবলীর মতো আটমাত্রায় পর্ব করে ভেঙে নিতে পারি—

ইংদিগে কলচুত | বন্ধবনেল্লব | দিক্কু দিক্কিনোল | গে
এন্দিদে নলিবে | শুদ্ধ সুধেয় সবি | সুরিয়ে বালিনোল | গে

মোটকথা, কন্নড যাঁদের মাতৃভাষা তাঁরা মূল গীতাঞ্জলির স্বাদ, পূর্ণত না হলেও অংশত, পাবেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন বিদ্যার্থী প্রহ্লাদ রায়ের অনুবাদে।

কাব্যচিন্তা ও নৈর্ব্যক্তিক শিল্পচেতনা

দেবব্রত চক্রবর্তী

কল্পরম্য (১) দৃষ্টিতে মানুষ অসংখ্য সম্ভাবনার অনাদ্যনন্ত আধার, চিরায়ত (২) দৃষ্টিপ্রদীপে সে উদ্ভাসিত হয়েছে অন্তর্নিষ্ঠভাবে সীমায়িতরূপে, ঐতিহ্য ও ক্রমের দ্বারা উজ্জ্বল রমণীয়তায় শোধিতরূপে। যাঁরা স্বাভাবিকধর্মীয় ভাবের সঙ্গে ঐক হ'তে চান তাঁরাই সমর্থন করবেন চিরায়ত দৃষ্টিকে। তবে যথার্থ মৌখিক শিল্পকৃতির সঙ্গে এরকম নৈষ্ঠিকতার সম্পর্ক কোনো অদীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা প্রথম প্রত্যয়েই লক্ষ্যভিত্ত হ'তে পারে না। সাহিত্যের নীতিগর্ভ তত্ত্বের কাঠামোরূপে নৈতিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিকে যথাবিধানে স্থাপিত করা উচিত নয়। বরং চিরন্তনতাকে বস্তুতন্ত্রতার রূপ হিসেবে গ্রহণ করা যায়,—যে বস্তুতন্ত্রতা গ'ড়ে ওঠে নৈতিক বা ধর্মীয় মত ও কাব্যিক সংস্থিতির স্পষ্ট অসাদৃশ্যে। সীমাবন্ধনকে স্বীকার করা কবিতার অন্যতম কৃত্য। ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতার অভিপ্রায়ে কবিতা অসীমের মাঝে নিজেকে অসম্বন্ধভাবে উপস্থাপনে সচেষ্ট। এবং কাব্যরূপে অসীম হ'তে পারে রসনিষ্পত্তির দিক থেকে আংশিক। অসীম শব্দটির পরিসীমায় অধিশায়িত আবেগের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রবেশ করি কল্পরম্য আর্দ্রতায়। যদি নীতি ও ধর্ম সংসক্ত হয়, তবে শিল্পও উপভোগ করবে তার নীরস কাঠিন্য নীতি বা ধর্মের বাহন হিসেবে নয়, বিবৃতি হিসেবে নয়, বরং নীতি ও ধর্ম যেখানে তত্ত্বকে পরিরক্ষিত করে সেই জগতে মানবিক কারুকৃতি হিসেবে। এই মৌল দৃষ্টির কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত গ'ড়ে তোলে অসংখ্য মত যাদের আমরা দেখতে পাই নব্য-চিরায়ত (৩) সমালোচনার যুক্তিবিদ্যায় নিবিড়ভাবে অন্তর্ক্রিয়াশীলরূপে।

নৈতিকায়নের যথার্থ বিকল্প হচ্ছে চিত্তপ্রতোবাদ (৪)—এ কথা স্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিক রসচেতনায় সম্পাদ্যমান শিল্পকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির চিত্তবোধকে (৫) প্রগ্রাস করবার চেষ্টা সাফল্য থেকে অপসারী। কারণ সমালোচকের পক্ষে সেখানে অবস্থান করা অসম্ভব। মুহূর্তের জন্যে শব্দাবলীর মাঝে চিত্তবোধকে স্থাপন করা যেতে পারে; সুরু হ'তে পারে বিশ্লেষণ ও সংগঠন, কিংবা সর্জন। প্রকৃত সমালোচক তাঁর চিন্তাবোধকে বিধানরূপে গড়ে তুলবার জন্য উদ্যোগী হবে। তাঁর চিত্তবোধ হবে মন্ময়াত্মক ও ব্যক্তিক; তবে তিনি তাঁকে মৌলতত্ত্বে সংসৃষ্ট করবার চেষ্টা করবেন ব'লেই নিজে অপগত হবেন নিছক চিত্তপ্রোতবাদ থেকে বস্তুকতার অভিমুখে।

কাব্যিক বিষয়বস্তুর তুলনীয় কিছু নেই। আত্যন্তিক গুরুতা এবং অবকল্পনা ও অধিকল্পনার (৭) মাঝে কল্পরম্য প্রভেদ নির্ণয় কাব্যের সুকুমারতায় পরিত্যাজ্য। সঞ্জাত আবেগ গৌরবিত অস্পষ্টতার অভিসারী নয়, বরং তা নন্দিত বোধের অভিলাসী। স্থিরতা ও নির্দিষ্টতার দ্বারাই কাব্যিক কল্পনা স্পষ্টভাবে পরিশীলিত হওয়া উচিত। কারণ প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অভ্রান্ত নিশ্চিত ও স্পষ্ট বর্ণনা। কবির কাজ ব্যক্তিগত দ্যোতনা নয়, শিল্পনিপুণ সৌকর্য। কাব্যে আর্দ্রতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত হয়েছে, কারণ এর ফলে কোনো কিছু সম্বন্ধে সন্তাপ বা করুণ সুরে বিলাপ না

থাকলে কবিতাকে কবিতা বলেই বিবেচনা করা হয় না। কবির সঙ্গত লক্ষ্য হচ্ছে তাঁর দৃষ্ট জিনিসের প্রকৃত স্বরূপটিকে লাভ করা, তা কোনো বস্তু হ'তে পারে বা মনোলীন ভাব হ'তে পারে। কবিতা চিত্রকল্প ও উপমার বিষয়। দার্শন অর্থাবলী শুধুমাত্র স্থানান্তরিত হ'তে পারে উপমার নোতুন আস্পদের দ্বারা, বিপরীতে গদ্য একটি প্রাচীন আধার যার মধ্যে দিয়ে তা প্রবিত হ'য়ে যায়। কবিতায় চিত্রকল্প শুধু অঙ্গরাগ নয়, স্বাঙ্গিক ভাষার যথার্থ নির্যাস। অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যের মাঝে প্রভেদের অবতারণা করলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, গদ্য হচ্ছে ব্যাপক, পদ্য গাঢ়। গদ্য প্রাঙ্গিক উদ্ঘাটনের রীতি, গদ্য এমন অসংখ্য চিত্র আঁকে যাদের প্রতিটি অবয়ব বিস্রস্ত। প্রজ্ঞাবান শিল্পকার সব সময়েই বিশ্লেষণ করেন, সংশ্লেষণকে বিপর্যস্ত করাই তাঁর নেশা ও উদ্দেশ্য। কিন্তু কবিতার কাজ প্রগাঢ় বৈচিত্র্য নিয়ে, নিবিড় স্বজ্ঞা নিয়ে, অর্থাৎ স্বাঙ্গিক ভাষার যথার্থ নির্যাস চিত্রকল্প নিয়ে। কবিতার জটিলতা শিল্পকলাগত নয়, গঠনগত। এর প্রতিটি অংশ পরস্পরের উপস্থিতির দ্বারা রূপান্তরিত, এবং একটি বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত প্রতিটি অংশই সমগ্রতার প্রতিভূ।

কবিতা অবশ্যই লিখিত হবে গদ্যের মতো। কোনো কাব্যিক শব্দ থাকবে না, অতিশয়োক্তি থাকবে না, থাকবে না কোনো বিলোমক্রিয়া। প্রাঞ্জল হবে, অথচ হবে দৃঢ়পিনদ্ধ। ছন্দোস্পন্দ নিশ্চয়ই হবে অর্থবহ। শব্দাবলী ও বোধের বিধৃতিকে বাদ দিয়ে এটি অযত্নশীলতায় দ্রুতসম্পাদিত হতে পারে না। অপরিবর্তনীয় পদসমষ্টি, বিশেষ আদর্শতাড়িত অপভাষা কবিতার রসোত্তীর্ণ হবার পথে বাধা দেয়। এর থেকে পলায়নের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে শুদ্ধতা, সূক্ষ্মতা, অর্থাৎ রচনার বিষয়ের প্রতি একাগ্রীভূত মনঃসন্নিবেশ, নিবিড় তন্ময়তা ও দ্যোতনা—উল্লঙ্ঘিত অগ্রবর্তিতা নয়, দ্বিভাব বিশেষণ নয়।

রচনার বিষয় ও দ্যোতনা একসীমাবচ্ছিন্ন। একটি উৎকৃষ্ট কবিতায়—যেখানে প্রতিটি শব্দ আপন কর্মে ব্যাপৃত—সেখানে গতি অবরোধী অলংকারের অথবা অনিশ্চিত দ্যোতনার অথবা জড়ভিত্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক ছন্দোস্পন্দের কোনো স্থান নেই। রচনারূপ অর্থদ্যোতক। মহৎ সাহিত্য চূড়ান্ত সম্ভাব্য মাত্রায় অর্থের সঙ্গে জড়িত ভাষা। রচনাশৈলী-নির্মাণের প্রত্যাশা না ক'রে নোতুন লেখক আবিষ্কারে সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। তাঁর যথাযোগ্য বাকরীতি-গঠনে সাহায্য করা, তাঁর সাহিত্য বিবেকের (৮) রূপায়ণকে নিয়ন্ত্রিত করা, বিশেষ বিশেষ কবিতার চূড়ান্ত সংশোধনে সহায়তা করা অন্যতমভাবে বিবেচ্য।

অভিজ্ঞতা সংবেদিতাকে উন্নতরূপে অন্তরিত করে। কবিমন যখন শিল্পকৃতির জন্যে যথার্থভাবে উদ্যুক্ত তখন তা নিরবগ্রহভাবে অসম অভিজ্ঞতার সম্মিলনে তৎপর। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বিস্রস্ত অক্রমিত খণ্ডিত। এই সব অভিজ্ঞতাই কবিমনে সব সময় গ'ড়ে তুলছে নোতুন নোতুন সমগ্রকে। অসম অভিজ্ঞতার সম্মিলনের এই শক্তির অত্যয় পরিণমিত হয় চিন্তা ও অনুভূতির, কাব্যিক ও অকাব্যিকের, রচনার রূপ ও বিষয়ের বিচ্ছেদে। আলংকারিক ভাষায় প্রযুক্ত হ'লে এটি সৃষ্টি করে অঙ্গবিন্যাসরহিত উপমা, চিন্তার প্রতিধ্বনি অর্থাৎ সদৃষ্টান্ত বিস্তৃতি, কিংবা আবেগজাত বিভাবাতিরেক অর্থাৎ অলংকৃতি।

মূল্যায়নকে অধিকতর নিশ্চিত করতে সক্ষম এমন একটি কলানৈপুণ্যের মাধ্যমে মানবিক

অভিজ্ঞতার নৈতিক মূল্যায়নই হচ্ছে শিল্পপদ্ধতি। কবি চেষ্টা করেন তাঁর অভিজ্ঞতাকে প্রাঞ্জিক সংদ্রবে উপলব্ধি করতে, তাঁর উপলব্ধিকে বিবৃত করতে এবং শব্দের মাঝে সংসক্ত অনুভূতির মাধ্যমে এই উপলব্ধির দ্বারা প্রেষণীয় আবেগের প্রকার ও মাত্রাকে যুগপৎ উন্মুক্ত করতে। কবি যেহেতু মূল্যায়ন করেন সেজন্য তিনি অবশ্যই থাকবেন তাঁর কবিতার পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে অবগতির বিস্তীর্ণতায়। মন ও অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থার বাচনিক অনুকল্পের সন্ধানই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়, ঐ সব অবস্থা বিচারিত ও মূল্যায়িত হওয়া উচিত।

কবি তাঁর আবেগকে শুধু আবিষ্কার করেন শব্দের মাঝে তাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ করবার প্রয়াসের মধ্যে দিয়ে। কবি যা প্রকৃতই অনুভব করেন তা নিশ্চিতভাবে দ্যোতিত হয় কবিতায়,—যাকে বলা যায়, কবি তাকে আবিষ্কার করেছেন নির্মাণক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। কবি যে-আবেগ নিয়ে রচনা করেন পাঠকের পক্ষে সেই একই আবেগকে চিরন্তনভাবে অনুভব করা অসম্ভব এবং তার অনুভবের ঔচিত্যের পেছনে কোন যুক্তি নেই। কবিতা কবির আবেগের তুলনায় স্বল্পতর কিছু বা অধিকতর কিছু দ্যোতিত করে এবং অভিব্যক্ত করে কবিতার মাঝে কবির বস্তুকভাবে উপস্থাপিত বিষয়কে। কাব্যবস্তুর গঠনকারী উপকরণের মধ্যে কয়েকটিকে আবেগ-প্রকাশের উপযোগী শব্দাবলীর মাধ্যমে সূচিত করা সহজতর। আমাদের মাঝে আবেগকে শুধু উদ্রিক্ত করবার জন্যে বা তার বস্তুক বিশেষার্থ সংঘটিত করবার জন্যে কবিতায় সব কিছুর সংস্থান—এরকম একটি কল্পিত প্রতীতি সম্পূর্ণ যুক্তিহীন। রচনার বহিরঙ্গ আকার, রূপগত ও ভাবদ্দীপনগত উপাদান স্বকীয় অন্তর্নিষ্ঠ অনুরাগনিহিত। আবেগ দ্যোতিত হয় এই অনুরাগ থেকে,—পাঠকের প্রতি প্রধান বা বহির্মুখী অনুরাগ থেকে নয়।

কবিতা আপন সমগ্রতায় একটি পূর্ণাঙ্গক্রিয়া। এই ক্রিয়া মাধ্যমের দিক থেকে বা পরিণামের দিক থেকে চিরব্যবহারসিদ্ধ নয়। কাব্যের উপসংহারে সিদ্ধান্তে উপনীত হবার দায়িত্ব পাঠকের ওপর ন্যস্ত। কবিতা সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টি যৌক্তিক উপপত্তির ক্ষেত্রে সংবেদনীয় নয়। কবিতায় কোনো বহিরঙ্গ যাথার্থ প্রতিপাদন হ'তে পারে না, পাঠক তাকে উপলব্ধি করে অধিকল্পনা দ্বারা। কবিতা প্রামাণ্য বিবরণ না হ'লেও অব্যবস্থিত চিত্তের ফসল নয়, মন্ময়াত্মক প্রক্ষেপণ নয়। যে-সব রূপ-উপমা বাইরে থেকে কবিতার বিষয়ের ওপর আরোপিত হয়, তারা কাব্যিকতায় অপাংক্তেয়; কবিতার বিষয় থেকে যারা উদ্ভূত হয়, তারাই প্রকৃত কাব্যালঙ্কার। কবি তাঁর ভাবকে পূর্বনির্ধারিত বিধিতে নির্মাণ করেন না; তিনি তাঁর বিধিতে অভিজ্ঞতার ওপর স্থাপন করেন না, বরং অভিজ্ঞতায় নিহিত প্রকরণকে ব্যক্ত করেন। অধ্যাত্মবাদী কবিদের সক্রিয় ও বলিষ্ঠ আলংকারিক ভাষায় দেখা যায় চিন্তার প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়লভ্য প্রত্যয় অথবা অনুভূতির মাঝে চিন্তার পুনঃসর্জন সম্পাদনের নিয়ত পদ্ধতি। গ্রহণযোগ্য উপমার সমস্যা কাব্যিক ঐক্যের সাধারণ সমস্যার সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন।

যুগের বিশৃঙ্খলা ও অসম্বদ্ধতাকে শুধু প্রতিফলিত করলেই কবির কাজ সমাপ্ত হয় না, অভিজ্ঞতার দ্বারা তার সমালোচনা করাও কবিকৃত্য। নতুবা অনুকরণাত্মক রূপগত হেত্বাভাসের এমন একটি পদ্ধতিকে বরণ করতে হয় যেখানে সাহিত্যের রূপ কবিতার অসংস্কৃত উপাদানে নিহিত থাকে। আধুনিক কবি যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁর কবিতার রূপহীনতার কারণ বিশৃঙ্খল ও অবিন্যস্ত

যুগ তাঁর কবিতার বিষয়। তবে একথা সত্যি, বিশ্রম্ভকে বিশ্রবণের দ্বারা সম্পন্ন করা যায় না, নেতিকে নাস্তির উপস্থাপনের দ্বারা নয়। এখানে প্রশ্ন জেগেছে, স্বল্পতম পরিমাণে কতটা সুসঙ্গতি কবিতার পক্ষে কাম্য এবং কোন গঠনগত পদ্ধতি দ্বারা সেই সুসঙ্গতি লভ্য। কবিতার প্রাক্তিক গঠন থাকা উচিত, কারণ প্রাক্তিক গঠনই আবেগকে সংযত করে এবং কবিতার প্রাক্তিক বিবৃতি উৎপাদন করে আবেগের বেগ। কবিতায় স্পষ্টভাবিতভাবে যৌক্তিক প্রন্যাস না থাকতে পারে, বিশ্রদ্ধভাবে প্রাক্তিক হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট। কবিতার প্রাক্তিক বিবৃতি কবিতার নিষ্কর্ষ নয়। এমন কবিতাও লিখিত হয়েছে যার প্রাক্তিক বিষয় সামগ্রিক বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। কবিতার নৈতিক প্রবণতা ব্যাখ্যাত হয় যৌক্তিক বিষয়ের দ্বারা নয়, অনুভূতির দ্বারা এবং অনুভূতি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও অর্থবিবৃতিবিধায়ক। তবু প্রাক্তিক গঠনের প্রভাব অপ্রত্যক্ষ, আবেগই প্রধান আসনে অধিরূঢ়।

কোনো কোনো গঠনগত পদ্ধতি এমন সব কবিতা সৃষ্টি করে যারা অর্থবিবৃতিবিধায়ক হ'তে পারে না। পুনর্বৃত্তি, যৌক্তিক প্রক্রিয়া ও বিবরণের মতো কবিতা রচনার সর্বকালিক পদ্ধতিকে ত্যাগ ক'রে সাম্প্রতিক কবিরা প্রয়োগ করেছেন ছন্দ-বৈদগ্ধ্য ও আঙ্গিক প্রবর্ধন। ছন্দ-বৈদগ্ধ্য প্রাক্তিক সংসক্তির দাবী জানায় পদান্বয়ঘটিত রূপ ও প্রাক্তিক সংসক্তির ব্যবহৃত শব্দাবলীকে ধারণ ক'রে, কিন্তু ঐ ছন্দ-বৈদগ্ধ্য প্রকৃতপক্ষে সংসক্ত নয়। আঙ্গিক প্রবর্ধন অধিকতর প্রাগ্রসর এবং তা বর্জন করে প্রাক্তিক প্রবর্ধনের দাবীকে। এটি শুধুই ভাষার ভাবপ্রকাশী অর্থাৎ অভিভাবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে কবিতা-রচনার উদ্যম এবং এর পরিণাম নিহিত রয়েছে অসংলগ্ন চিন্তার অস্পষ্টতায়। আঙ্গিক প্রবর্ধনে চিত্রকল্পথেকে চিত্রকল্পে অবস্থান্তর-প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয় মনোভাবের দ্বারা; সংশক্তির তত্ত্ব হচ্ছে অনুভবের তত্ত্ব। আঙ্গিক প্রবর্ধন সংগঠিত হয় প্রথাগত কবিতায় প্রবর্ধনের মৌল পদ্ধতির আনুষঙ্গিক রূপে।

আবেগের দ্বারা সৃষ্ট ঘটনাবলীর পরিবেশনের দ্বারা আবেগকে বেগবান ক'রে কবি তাঁর নায়কের আবেগের জন্যে যুক্তি স্থাপন করতে পারেন, কিংবা তিনি আবেগের ব্যাখ্যা করতে পারেন একটি প্রতীক বা উপমিতি ধারার মধ্যে দিয়ে। এই দুটি পদ্ধতির একটি অপরটিকে পরিহার করে-না। সাম্প্রতিক কবিরা দ্বিতীয়টির ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন, তাঁরা লক্ষ্যহীন ও অবিচারিত অসংলগ্ন চিন্তায় এক ধরণের চেতনা-স্রোতের সংযোগ নিয়ে চিত্রকল্প থেকে চিত্রকল্পে সঞ্চরমান। পরিণামে রয়েছে অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা। ফরাসী প্রতীকীবাদীদের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হচ্ছে অর্থবিধায়ক কথাবস্তুর অপ্রাসঙ্গিকতা এবং সেকারণে তার বিলুপ্তির সম্ভাবনা।

একটি তৃতীয় গঠনগত পদ্ধতি ব্যাখ্যাত হয়েছে। এটি হচ্ছে দ্বিধা মনোভাবের দ্বারা প্রবর্ধন। এই শ্রেণীর প্রবর্ধনের কবি অসংখ্য মনোভাবকে পর্যায়ক্রমিত করেন। তিনি শব্দাড়ম্বরভূয়িষ্ঠ পরিণাম গ'ড়ে তোলেন উপহাসের দ্বারা উচ্ছিন্ন করবার জন্যে। এরকম একটি পদ্ধতি বলিষ্ঠ অনধ্যাসের নির্দিষ্ট সূত্র, মূল্যহীন অনুভূতিকে হারাবার দোষৈকদর্শী প্রতিক্রিয়া। অন্ত্যর্থক মনোভাবের অবসার কল্পরম্য বাক্‌রীতিকার নৈতিকভাবে নির্বিঘ্ন নন এবং তাঁর বাক্‌রীতি তাঁর অপ্রতিভতার বা নৈতিক শৈথিল্যের অথবা তাঁর কবিতার আলোক অধিশ্রয়ণের অক্ষমতার প্রতিফলন। এর ফলে আসে

বস্তুহীন অনুভূতি, তার থেকে অযত্নসম্পাদিত রচনা। কবি কখনো দ্বিধিসজ্ঞতভাবে বলতে পারেন না যে, তাঁর অপ্রতিভ ও অনিশ্চিত কবিতা শুধু প্রতিফলিত করে বিষয়বস্তুরূপে গৃহীত অবস্থার *বিধ্বংসকে।*

বাক্চাতুর্য হচ্ছে গীতিকবিতার মাধুরীর অধোবর্তী দৃঢ়যুক্তিসিদ্ধতা। এটি সূচিত করে অভিজ্ঞতার স্থির পরিদর্শন ও সমালোচন। কোনো কোনো কবিতার মাঝে এটি এনে দেয় আন্তর সুস্থিতি। অনেকের মতে, অপ্রত্যক্ষ বাক্রীতিগত প্রসারণ ছাড়া কবিতার বাক্স্ফূর্তভাবে অকপট হওয়া উচিত। অনন্তকাল ধ'রে কবিরা অশ্রান্তভাবে চেষ্টা ক'রে চলেছেন যাকে সূচিত করতে চান তাকে বলবার জন্যে; শুধু বলবার জন্যেই নয়, চেষ্টিত রয়েছেন তাকে প্রমাণ করবার জন্যেও। সন্তপুরুষ তাঁর দৃষ্টিকে প্রমাণ করেন অগ্নিশিখায় সানন্দে প্রবেশ করে। কবি তাঁর দৃষ্টিকে প্রমাণ করেন শোধিত করবার আশায় অপ্রত্যক্ষ বাক্রীতির আগুনে তাকে নিবেদন ক'রে। কবি জ্ঞাপন করতে চান যে, তাঁর দৃষ্টি অর্জিত হয়েছে এবং এই দৃষ্টি অভিজ্ঞতার জটিলতা ও বিসংবাদের বৈদগ্ধ্যে সুস্থিত। অপ্রত্যক্ষ বাক্রীতি হচ্ছে এরকম বৈদগ্ধেরই একটি অভিজ্ঞান।

যৌক্তিক, নির্দিষ্ট ও অদ্ব্যর্থকের প্রতি পক্ষপাত একটি সংশোধক মূল্য দান করে। আবছায়া ও অস্পষ্ট অর্থের দ্বারা প্রতারিত হবার প্রবণতা পাঠকের থাকে না। সেজন্যে তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে অসংলগ্নতার দিকে। কবি জানেন বা তাঁর জানা বিধেয় কীভাবে অনুভূতিকে কবিতার প্রাজ্ঞিক গঠনে প্রস্তুত করতে হয়; এই কাজে তাঁর অসাফল্য এক ধরণের নৈতিক ব্যর্থতা। কবি প্রায়ই কথনের সময়ে তাঁর কথনীয়কে আবিষ্কার করেন। কবি গ্রহণ করেন শুধু অভিজ্ঞতার জটিলতাই নয়, ভাষার বিরোধী গুণাবলীও। তিনি দূরতর অর্থ ও অপ্রত্যক্ষের ওপর নিয়ত নির্ভরশীল।

একসময় কবিতার নাটকীয় বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে, অপ্রত্যক্ষ বাক্রীতির বিভিন্ন প্রতীতিকে আমরা বরণ ক'রে নিয়েছি। অপ্রত্যক্ষ বাক্রীতি হচ্ছে অসংলগ্নতার প্রত্যভিজ্ঞা, একে নিয়েই কবিতার কারবার। এটি স্বীকার করে স্বতন্ত্র শব্দ বা চিত্রকল্পের ওপর সমগ্র প্রসঙ্গের গুরুত্বারোপ, আপন প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট অর্থে শব্দকে ব্যবহিত করবার অনুসারে কবির অনবচ্ছিন্নভাবে সৃষ্ট তাৎপর্যের মৃদু প্রতিসরণ। এটি কবিতার অসম উপাদানের সংস্থাপিত কঠিন ভাবাবলীকে অনুবদ্ধিত করে। এই গঠনগত অপ্রত্যক্ষ ব্যক্রীতিতে কবির মনোভাবের সূচক অবশ্যম্ভাবীরূপে যত্নহীনতা বা দোষৈক-দর্শিতা বা নৈতিক অপরিচ্ছন্নতার বৈশিষ্ট্যবহ নয়। বাক্রীতি নির্দেশ করে তাঁর শিষ্টতার প্রতি, অভিজ্ঞতার জটিলতা ও মানবমনের সীমাবন্ধন সম্পর্কে তাঁর বোধের প্রতি। এরকম একজন কবি তাঁর বহুব্যাপক সামান্যীকরণকে গুণান্বিত করতে এবং তাঁর ব্যগ্র হৃদয়োচ্ছ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে আকাঙ্ক্ষী। তবে কবিতার প্রকৃতির দ্বারা কবি কিছু পরিমাণ অপ্রত্যক্ষতার অনুগত।

নাটকীয় উপস্থাপন সম্বন্ধে অপ্রত্যয়িতার মূলে রয়েছে দূরতর অর্থ ও কবির নিয়মনের অবশ্যম্ভূত পরিহার। প্রাজ্ঞিক বিবৃত হচ্ছে মনোভাব থেকে আবেগের দিকে অভিগমন। প্রকৃতপক্ষে মনোভাব নির্দেশ করে নাটকের রীতির প্রতি। আবেগ যদি মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়, তবে আবেগ শুধু অনুমিত হ'তে পারে পরিবেশ ও গতির প্রসঙ্গ থেকে। এটি প্রত্যক্ষভাবে স্থিরীকৃত

হ'তে পারে না, এবং যে অর্থবিধায়ক বিষয় একে মনোভাবের দ্বারা চালিত করে তা নাটকীয় পরিবেশ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বা কথাবস্তুর মতো বিবৃতি নয়। কথাবস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ কথনরূপে এটি ব্যাখ্যেয়। কল্পরম্য বিশৃঙ্খল বহুগুণিতত্ব ও দ্যোতনার বাহুল্যের বিরুদ্ধে চিরায়ত প্রতিবাদের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। কিন্তু উপমা ও প্রতীকের প্রতি সমর্থনের ফলে উপস্থাপিত হয় একটি চিরায়ত প্রতিক্রিয়া। কারণ এরা নাটকীয় উপস্থাপনের নানা দিক, তাই কবির ব্যক্তিক দ্যোতনা থেকে ভিন্ন। এই প্রভেদ প্রামাণিক; এক সময় আমরা গীতিকবিতার কথককে বিযুক্ত করেছি কবির ব্যক্তিকতা থেকে; এমন কি ক্ষুদ্রতম গীতিকবিতাও নিজেকে ব্যক্ত করে নাটকরূপে। কবিতা কোনো কিছুর বিবরণী নয়, বরং গতিশীল ক্রিয়া। এই অর্থে উপমাও একটি ক্রিয়া। এটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বাবলীর উপস্থাপন এবং তাদের সম্পর্ক ব্যাখানের ভূমিকা শ্রোতার বা পাঠকের মনে তীব্রভাবে আরোপিত হয়। উপমার দ্বারা নিশ্চিত একীকরণ যেহেতু আক্ষরিকভাবে অর্থহীন ব্যাপার, সেজন্যে দূরতর অর্থের দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যান মনোযোগকে অবস্থা, কথকের বৈশিষ্ট্য ও উপলক্ষের অভিমুখী ক'রে তোলে।

ক্ষুদ্রতম গীতিকবিতা যদি নাটকরূপে আদৃত হ'তে পারে, তবে দুঃসহতম বিষাদান্তক নাটকও সম্মানিত হ'তে পারে প্রতীকরূপে। কোনো নাটক আমাদের কাছে স্থায়ীভাবে হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে ওঠে ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে নয়, সর্বজনীন হিসাবে। নাটকে উপস্থাপিত ঘটনার দ্বারা অভিপ্রায়িত আবেগ আমাদেরই নিজস্ব আবেগেরি অর্থবহ প্রতীক। যদি তা না হয় তবে এ কথাই উপলব্ধ হবে যে, নাটকটির সকল আবেগ প্রকৃতপক্ষে অনভিপ্রায়িত।

অভিপ্রায় ও বস্তুক অনুবন্ধের মধ্যে, অর্থাৎ আবেগের অব্যবহিত যুক্তি ও আবেগের প্রতীকের মধ্যে যে প্রভেদের অবতারণা করা হয়েছে তা প্রতিবাদের ঊর্ধ্বে। এর দ্বারা আরও সূচিত হয় যে, অভিপ্রায় নিজেই এক ধরণের বস্তুক অনুবন্ধ। কবিকে যদি আবেগের দ্বারা আবেগকে সংযত করতে হয়, তবে তিনি বস্তুগুচ্ছ, পরিবেশ বা ঘটনাবলীর প্রয়োগে বাধ্য। যেহেতু আবেগ উৎসারিত হয় এইসব বস্তু ও ক্রিয়ার দ্বারা এবং তা নিয়ন্ত্রিত হয় এইসব বিষয়ীকৃত উপাদানের দ্বারা সেজন্য বস্তুগুচ্ছ-পরিবেশ-ঘটনাবলীকে বলা যেতে পারে আবেগের অনুবন্ধ। কারণ আবেগের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক হচ্ছে উদ্দেশ্যের সম্পর্ক বা প্রতীকায়িত অনুকল্পের সম্পর্ক।

অভিযোগ উঠেছে, কবিদের নির্জিত করা হয়েছে স্বতশ্চল যন্ত্রে, তাঁরা কবিতাকে প্রচ্ছন্ন করেছেন অসংজ্ঞাত ও অবুদ্ধিগত উপায়ে। কবিতার নিষ্কর্ষ হচ্ছে উপমা, এই উপমা এসেছে চৈনিক চিত্রলিখন থেকে নয়, উনিশ শতকের ফরাসী প্রতীকীবাদী কবিদের এবং সতেরো শতকের ইংরেজি অধ্যাত্মবাদী কবিদের থেকে। কবিরা প্রচণ্ডতা ও সর্বাপেক্ষা অসমসত্ত্ব ভাবাবলীর দ্বারা সম্পৃক্ত, কবিমনের ক্রিয়ার দ্বারা ঐক্যে বিবৃত উপকরণের অসমসত্ত্বতার ক্রম কবিতায় সর্বব্যাপী। উপাদানে অসংলগ্নতা অনতিক্রম্যরূপে স্বীকার্য; একীকরণবিরোধীকে সংযুক্ত করাই কবির স্থায়ী সমস্যা; আপন উপকরণের দ্বারা সংস্থাপিত প্রতিরোধকে যিনি অন্বর্থক কর্মে নিয়োজিত করতে পারেন তিনিই নিপুণ কবি।

সেই কবিতাকেই বলা যায় অনবদ্য, যার মাঝে রয়েছে কল্পরম্য কবিতার বৈশিষ্ট্য হিসেবে

পরিচিত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট অনুভূতি নয়, বরং উৎকৃষ্ট গদ্যের প্রাঞ্জলতা ও দার্ঢ্য। তবে কবিতার অতিরিক্ত স্বকীয় চারিত্রিক উপায় রয়েছে অর্থকে সম্পন্ন করবার। এইসব উপায়ের মধ্যে চৈনিক রচনারীতির অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে বস্তুক স্বতন্ত্রতা। চৈনিক ভাবলেখ এমন একটি রূপালি পর্দা যার ওপর উজ্জ্বলভাবে প্রক্ষেপিত হয় কবির আদর্শ কাব্যভাষা। এরকম ভাষায় বস্তুক স্বতন্ত্রতা অকম্পিত। এই ভাষা প্রতিরোধ করে জটিল নির্বস্তুকতায় স্খলিত হবার অথবা নির্বাকতাকে কবিতার বিষয়রূপে গ্রহণ করবার প্রবণতাকে। পরস্পর সন্নিহিত চিত্রনিপুণ উপাদানের ভাবলেখ পদ্ধতি অগভীর ও অতিপ্রাঞ্জল শুধু নিবারণই করে না, কলাকুশল শিল্পীকে সুযোগ দেয়, তাঁর বক্তব্য বিষয় সূক্ষ্মতা ও শুদ্ধতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করবার। ভাবলেখ পদ্ধতি হচ্ছে উপমা, অমূর্ত অনুষঙ্গকে অভিব্যক্ত করবার জন্যে মূর্ত চিত্রকল্পের প্রয়োগ। এটি বস্তুক স্বতন্ত্রতার ক্রমিক বিন্যাস; এখানে রয়েছে এইসব স্বতন্ত্রতার প্রত্যাবস্থান। স্বীকৃত হয়েছে স্বরূপ পর্যন্ত নির্বস্তুকতা নয়, নির্দিষ্ট বস্তুক অভিজ্ঞতা। আপন ভাবলেখ-গঠনে কবি বিজ্ঞানীর মতো নৈর্ব্যক্তিক।

কবির প্রধান কাজ যে পাঠকের কাছে কোনো সুনিশ্চিত আবেগ বা ভাব সমর্পণ করা কিংবা কবির ক্রিয়াশীলতা যে এই কাজের সাফল্যের দ্বারা পরিমিত হয়—এরকম ধারণা গভীরভাবে স্বীকৃত হয় নি। পক্ষান্তরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সম্পূর্ণ বিরোধিত প্রত্যয়ের ওপর, কল্পরম্যবিরোধী নৈর্ব্যক্তিক শিল্পের ওপর, যেখানে শিল্পবস্তুর সকল দাবী তাদের জটিলতা ও অনির্দিষ্টতাসহ অগ্রে বিবেচ্য। অধ্যাত্মবাদী কবিরা মন ও অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থার জন্যে বাচনিক অনুকল্পের সন্ধানে নিরত ছিলেন। মন ও অনুভূতির বিভিন্ন অবস্থার ক্ষমতা রয়েছে কবির ব্যক্তিক আবেগকে হ্রস্ব করবার যার দ্বারা পাঠক প্রভাবিত হয় প্রত্যক্ষভাবে।

নৈর্ব্যক্তিক শিল্প সম্বন্ধে বলা যায়, শিল্পরূপে আবেগের দ্যোতনার একমাত্র পথ হচ্ছে বস্তুক অনুবন্ধের আবিষ্কার; অন্যভাবে বলা যায়, বস্তুগুচ্ছ-পরিবেশ-ঘটনাধারার আবিষ্কার। এটি হবে ঐ বিশেষ আবেগের নির্দিষ্ট নিয়ম। যখন সংবেদ-অভিজ্ঞায় সসীম বহিরঙ্গ কৃত তথ্য প্রদত্ত হয় তখন আবেগ উদ্গত হয় অব্যবহিতভাবে। বস্তুক অনুবন্ধের ধারণা দৃঢ়ভাবে শিল্পকৃতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে অঙ্গবিন্যাস হিসেবে। যেহেতু কবি তাঁর আবেগ বা ভাবকে আপন মানস থেকে প্রত্যক্ষভাবে পাঠকমনে স্থানান্তরিত করতে পারেন না, সেজন্যে মাধ্যমের প্রয়োজন; বস্তুগুচ্ছ-পরিবেশ ঘটনাধারা এই মাধ্যমেরই মর্যাদায় ভূষিত। এদের মধ্যে দিয়েই লেখক ও পাঠকের সংযোগ বিদ্যমান এখানেই লেখকের বক্তব্য বিষয় আকার ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অধ্যাসিত হয়। কারণ এই বিষয়ে হচ্ছে পাঠকের প্রতিবেদনের প্রাথমিক উৎস।

তবু বস্তুক অনুবন্ধের মত ফরাসী প্রতীকীবাদীদের তত্ত্ব ও প্রক্রিয়া থেকে ব্যাখ্যাত বিষয়াবলীর সমাহার বিশেষ। প্রতীকীবাদীরা যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত করেছেন এই সিদ্ধান্ত যে, কবিতা প্রত্যক্ষভাবে আবেগকে দ্যোতিত করতে পারে না, আবেগ শুধুমাত্র উদ্গত হ'তে পারে। বর্ণ-ধ্বনি-গন্ধ-প্রত্যয়িত আবেগ ও প্রতিটি দার্শন চিত্রকল্প পরস্পরের ক্ষেত্রে অনুষঙ্গজড়িত। আকারেঙ্গিতরূপে অথবা আবেগাত্মক সঙ্কেতরূপে উপলব্ধ শব্দাবলীর অস্ফুটতা ও সাংগীতিক শৃঙ্খলার মতো তাদের আন্তর ক্রিয়া অনুসন্ধেয়। বস্তুক অনুবন্ধের মত শিল্পকুশলতার ওপর আরোপ করে কল্পরম্যবিরোধীর

গুরুত্ব। তবু দ্যোতনাবাদের ভাষায় কবি নিজেকে আবৃত করেন।

কোন কিছু দ্যোতনা করবার ব্যক্তিকতা কবির নেই, তাঁর আছে একটি স্বতন্ত্র মাধ্যম যেখানে চিত্তবোধ ও অভিজ্ঞতা অসাধারণ ও অভাবিত উপায়ে সংযুক্ত হয়। মানবিক অন্তর-অপেক্ষা চিত্তবোধ ও অভিজ্ঞতা কবিতায় ভূমিকা গ্রহণ না করতে পারে এবং কবিতা-অপেক্ষ বিষয় সম্পূর্ণ তুচ্ছ একটি অংশ গ্রহণ করতে পারে মানবিক অন্তরে, তার ব্যক্তিকতায়। শিল্পের এরকম এক নৈর্ব্যক্তিক প্রতীতি প্রায় বিবদমানভাবে কল্পরম্য বিরোধী কবিতার বিভিন্ন অঙ্গের অনুষঙ্গ অনিবার্য জটিলতার একটি নিজস্ব আত্মা রয়েছে ; সে কারণে এর সকল অবয়ব নিখুঁতভাবে সুক্রমিত জৈবনিক উপাত্তের কায়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক কিছু গ'ড়ে তোলে। কাব্যনিঃসৃত অনুভূতি-আবেগ-দৃষ্টি থেকে কিছু পরিমাণে ভিন্ন। শিল্পের আবেগ নৈর্ব্যক্তিক। সর্জনকৃতির কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ ছাড়া কবি এই নৈর্ব্যক্তিকতায় উপনীত হ'তে পারেন না। কবিতা আবেগের প্রতিসরণ নয় অতিসরণ-ব্যক্তিকতার অভিব্যক্তি নয়, অব্যাহতি।

১। রোম্যাণ্টিক্। ২। ক্ল্যাসিক্। ৩। নিও-ক্ল্যাসিক। ৪। ইম্প্রেসনিজ্‌ম্। ৫। ইম্প্রেসন্। ৬। ফ্যান্সি। ৭। ইম্যাজিনেশন্। ৮। লিটারারি টেস্ট্। ৯। ইডিওগ্র্যাম্।

সত্যব্রত সামশ্রমী

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈদিক পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মে পাটনা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সত্যব্রতের পিতা রামদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পাটনায় সেরিস্তাদার পদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে ইনি এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার পদে উন্নীত হন। রামদাসের পিতা পাটনা সুপ্রীম কোর্টের জজপদে নিযুক্ত থাকিয়া বিহার রাজ্যে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি অর্জন করেন। এই পরিবারের আদি বাস ছিল বর্ধমান জেলার কানলা মহকুমার অন্তর্গত ধাত্রী গ্রাম। জন্মের পর সত্যব্রতের নাম রাখা হয় কালিদাস। কালিদাসের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন তিনি তাঁহার পিতার প্রিয় পুষ্পোদ্যান হইতে কয়েকটি গোলাপফুল চয়ন করেন। রামদাস পুত্রের হস্তে বৃহৎ গোলাপ পুষ্প দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়া গৃহভৃত্যকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন; তিনি মনে করিয়াছিলেন যে গৃহভৃত্য ঐ পুষ্প চয়ন করিয়া বালকের হস্তে দিয়াছে। নিরপরাধ ভৃত্যের লাঞ্ছনা দেখিয়া শিশু কালিদাস পিতাকে বলেন যে সে নিজেই এ পুষ্প চয়ন করিয়াছে, গৃহভৃত্য এগুলি গাছ হইতে ছিঁড়িয়া তাহাকে দেয় নাই, শাস্তি তাহারই প্রাপ্য, নির্দোষ গৃহ-ভৃত্যের নহে। রামদাস পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর সত্যপরায়ণতা দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন এবং তাহার কালিদাস নাম পরিবর্তন করিয়া সত্যব্রত নাম রাখেন।

সত্যব্রতের পিতা সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বঙ্গদেশে বেদের চর্চা নাই, বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরও অভাব, এইজন্য তিনি সত্যব্রতকে বেদ বিষয়ে সুশিক্ষিত করিতে মনস্থ করেন। উত্তর ভারতে বেদচর্চা কেন্দ্র কাশী। কাশীর পণ্ডিতেরা বাঙ্গালী ছাত্রদের বেদশিক্ষা দিতে উৎসাহী ছিলেন না। এইজন্য বাঙ্গালী ছাত্রেরা কাশীতে বেদাধ্যয়ন করিতে আসিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইত। ইতিপূর্বে বর্ধমানাধিপতি ও কলিকাতার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সব বাঙ্গালী ছাত্রদের বেদ শিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই উত্তমরূপে বেদশিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বয়ং কাশীবাসী হইয়া পুত্রদের বেদশিক্ষার সুব্যবস্থার নিমিত্ত রামদাস অবসর গ্রহণান্তর সপরিবারে কাশীধামে বসবাস আরম্ভ করেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে উপনয়ন সংস্কারান্তে সত্যব্রতকে কাশীর সরস্বতী মঠে প্রেরণ করা হয়। প্রাচীন কালের আদর্শে গুরু গৌড়স্বামীর অধীনে সত্যব্রত সরস্বতী মঠে বাস করিয়া শিক্ষা গ্রহণ করিতে থাকেন। ধনীপুত্র সত্যব্রতকে মঠে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হইত, গৌড়স্বামীর সহিত তাঁহাকেও সন্ন্যাসীর আদর্শে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষায় বাহির হইতে হইত। গুরুগৃহে তিনি প্রথমে বিশ্বরূপ স্বামীর নিকট পাণিনি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য অধ্যয়ন করেন।

অসাধারণ মেধা ও বিশ্বরূপ স্বামীর অধ্যাপনা গুণে অল্প কালের মধ্যেই সত্যব্রত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য অতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। অতঃপর সত্যব্রত গুজরাট দেশীয় সামবেদী ব্রাহ্মণ নন্দরাম ত্রিবেদীর নিকট চতুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। দ্বাদশ বর্ষকাল গুরুগৃহে বাস

করিয়া সত্যব্রত সর্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ব্যাকরণ ও বেদবিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি লাভ করেন। গুরুগৃহে অবস্থিতিকালে গুরুর আদেশে তিনি অন্যান্য ছাত্রদেরও পাঠ শিক্ষা দিতেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বিংশতি বর্ষ বয়সে সত্যব্রতের পাঠ সাঙ্গ হয়। অতঃপর তিনি কতিপয় ছাত্র সঙ্গে লইয়া কাশ্মীর সহ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন, যেস্থানেই তিনি যাইতেন সেই স্থানেরই পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত তিনি আলাপ আলোচনা করিতেন। স্থানীয় পণ্ডিতেরা তরুণ সত্যব্রতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ভারত ভ্রমণকালে সত্যব্রত বুন্দী রাজসভায় উপস্থিত হইয়া রাজসভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সমুখে বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন। সত্যব্রতের বেদ পারঙ্গমতায় চমৎকৃত হইয়া সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদন লইয়া বুন্দীরাজ সত্যব্রতকে "সামশ্রমী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তদবধি সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় সত্যব্রত সামশ্রমী নামেই পরিচিত হন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

কাশী প্রত্যাবর্তন করিয়া সত্যব্রত পিতৃগৃহেই বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে প্রত্যহ তাঁহার গৃহে বহু শিক্ষার্থির সমাগম হইত। সত্যব্রত বিনা পারিশ্রমিকে এই সব ছাত্রদের পড়াইতেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে সত্যব্রত নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের পৌত্রী ও মথুরানাথ পদরত্নের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। সত্যব্রতের বিবাহের ইতিহাস কৌতুকজনক।

কথিত আছে যে তরুণ সত্যব্রত বৃদ্ধ পণ্ডিত ব্রজনাথকে তর্কে পরাজিত করিলে ব্রজনাথ সত্যব্রতের পিতার নিকট এই অপমানের প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সত্যব্রতের পিতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অভিযোগ শুনিয়া বড়ই বিব্রত বোধ করেন এবং এই অপমানের প্রতিকার কি ভাবে তিনি করিতে পারেন এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের পরামর্শ চান। চতুর ব্রাহ্মণ প্রস্তাব করেন যে তাঁহার পৌত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে সত্যব্রতকে তিনি ক্ষমা করিবেন, নচেৎ নহে। সত্যব্রতের পিতা এই সুখকর নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়া লইলে ব্রজনাথের পৌত্রীর সহিত সত্যব্রতের উদ্বাহ ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর সত্যব্রত কাশী হইতে "প্রত্নকম্রনন্দিনী" নামে সংস্কৃতে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। বৈদিক সাহিত্যের প্রচারই এই অভিনব পত্রটির উদ্দেশ্য ছিল। আট বৎসর কাল ১৮৬৭—১৮৭৪ এই পত্র সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কাজ সত্যব্রত একাই নিষ্পন্ন করিতেন। আর্থিক দিক হইতে সাফল্য না আসিলেও প্রত্নকম্রনন্দিনীর প্রসাদাৎ সমগ্র ভারতে এবং বহির্ভারতের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট সত্যব্রতের বেদ-বিৎরূপে প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পায়।

প্রত্নকম্রনন্দিনী প্রকাশ কালে ৺রাজা রাজেন্দ্রলালের অধ্যক্ষতায় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটী "বিব্লিও থেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সামবেদ সংহিতা প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে সামবেদ ভারতবর্ষ হইতে প্রকাশিত হয় নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জার্মানীর অধ্যাপক বেনফি লাইপজিগ হইতে সামবেদ সংহিতা মূল ও জার্মান অনুবাদ সহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ম্যাক্সমূল্যর সম্পাদিত ঋগ্বেদের ন্যায় সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্বও একজন

জার্মান সংস্কৃতজ্ঞের প্রাপ্য। যাহা হউক ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সামবেদ সম্পাদনেরর কার্যে সত্যব্রত সামশ্রমীকে উপযুক্ততম মনে করিয়া তাঁহাকে এই কার্যের দায়িত্ব লইতে অনুরোধ করেন। সত্যব্রত আনন্দিত চিত্তে এই কার্যভার গ্রহণ করেন। যতদিন বৃদ্ধ পিতা জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত সত্যব্রত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করেন নাই, মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সত্যব্রত সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ইতিপূর্বে কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহাকে এই কলেজে একটি অধ্যাপকপদ দিতে চাহিয়াছিলেন, সত্যব্রত এই পদ গ্রহণ করেন নাই, কারণ বঙ্গদেশে থাকিয়া বেদের অধ্যাপনা ও বেদপ্রচার শুধু তাঁহার নিজেরই অভীষ্ট ছিল না, তাঁহার পিতারও ইহা পরম অভিপ্রেত ছিল। কলিকাতায় আসিয়া বেদ প্রচারোদ্দেশ্যে সত্যব্রত একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। অতঃপর "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সম্পাদিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তাঁহার সম্পাদিত ও অনূদিত সকল গ্রন্থই এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই মুদ্রিত ও প্রচারিত হইতে থাকে। গ্রন্থ প্রচার ব্যতীত স্বগৃহে অন্নদান করিয়া তিনি বহু ছাত্রকে বেদশিক্ষা দিতেন। জীবদ্দশাতেই সত্যব্রত অসাধারণ বেদজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ভারতের এবং বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী বেদসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্য সর্বদাই সত্যব্রতের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি সত্যব্রতকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্যরূপে পরিগণিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর বেদের অধ্যাপক (লেকচারার) ও পরীক্ষক নিযুক্ত করা করা হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা হইতে সত্যব্রত প্রত্নকম্রনন্দিনীর ন্যায় "উষা" নামে একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন, এই এই অভিনব পত্রটিতে তাঁহার বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়, এই সব গ্রন্থের সহিত অধিকাংশ স্থানে মূলের সহিত বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ও সন্নিবিষ্ট থাকিত। "উষা"র প্রবন্ধগুলির মধ্যে বৈদিকযুগ সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হইত। একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত ইহাই প্রতিপাদিত করেন যে বৈদিক আর্যেরা মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও পৃথিবী কর্তৃক সূর্য প্রদক্ষিণ তথ্যটি সবিশেষ অবগত ছিলেন। অন্য একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে বৈদিক মতে বাল্য বিবাহ গর্হিত, কন্যা রজঃস্বলা হওয়ার পরই তাহার বিবাহ বিধেয়। একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত প্রমাণ করেন যে সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, অভক্ষ্য ভক্ষণই শাস্ত্র বিরুদ্ধ। সত্যব্রতের সমসাময়িক মহিলাদের জুতা ব্যবহার নিন্দিত ছিল, মহিলাদের জুতা পড়িতে দেখিলে রক্ষণশীল হিন্দুরা "ব্রাহ্মিকা" বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ভ্রূকুটি করিতেন। উষার একটি প্রবন্ধে সত্যব্রত দেখাইয়াছিলেন যে আর্যনারীগণ ছাতা ও জুতা দুই-ই ব্যবহার করিতেন বরং ইহা ব্যবহার না করাই দোষণীয় ছিল। স্ত্রীজাতির বেদপাঠের আবিষ্কারও তিনি একটি প্রবন্ধে সমর্থন করেন। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সামশ্রমী সম্পাদিত সায়ণভাষ্যসহ সামবেদ ৫টি সুবৃহৎ খণ্ডে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সামবেদ প্রথম প্রকাশের কৃতিত্ব সর্বতোভাবে সত্যব্রতেরই প্রাপ্য। এই গ্রন্থ-মালার, তৈত্তিরীয় সংহিতার ছয়টি খণ্ডের শেষ খণ্ডটি তাঁহারই দ্বারা সম্পাদিত হয়, অপর খণ্ডগুলি ই. রোয়ার, ই. বি. কাউয়েল ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সম্পাদন করেন (১৮৫৪-৯৯)।

এতদ্ব্যতীত "বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালায় সায়ণভাষ্যসহ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (চারখণ্ড,

১৮৯৪-৯৬), সায়ণভাষ্যসহ শত পথ ব্রাহ্মণ (দুই খণ্ড, ১৮৯৯-১৯১২), ও যাস্কের নিরুক্ত (চারিখণ্ড, ১৮৯০-৯১) সম্পাদন করিয়া সামশ্রমী সমগ্র বেদানুরাগি সমাজের অশেষ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতাভাজন হন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সম্পাদনায় দুইখণ্ডে হিন্দুশাস্ত্র নামে যে সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯৯৫-৯৭) তাহার প্রথম খণ্ডের সঙ্কলন কার্যে সত্যব্রত সবিশেষ সহায়তা দান করেন রমেশচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করেন। এই খণ্ডে বেদসংহিতা (১ম ভাগ), ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ (২য় ভাগ) শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্ম সূত্র (৩য় ভাগ) মূল ও অনুবাদ সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল, অনুবাদের অধিকাংশ অংশই ছিল সামশ্রমী কৃত, রমেশচন্দ্র অনূদিত অংশগুলিও সত্যব্রত সংশোধিত করিয়া দেন গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সত্যব্রত নিজস্ব মুদ্রাযন্ত্র হইতে বঙ্গাক্ষরে সভাষ্য সামবেদ, যজুর্বেদ, ব্রাহ্মণ ও অঙ্গগ্রন্থাদি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। বৈদিক গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত কয়েকটী গ্রন্থও তিনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। "কারণ্ডব্যূহ" নামে সংস্কৃত ভাষায় রচিত একটি বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থও তিনি বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৮৭৩)। স্ব-উদ্যোগে প্রকাশিত পুস্তকগুলির অধিকাংশই বঙ্গাক্ষরে ও বহুস্থলে বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ আশৈশব বাঙ্গলার বাহিরে বাসকারী সত্যব্রতের অকৃত্রিম বঙ্গভাষানুরাগের নিদর্শন। সত্যব্রতের স্বীয় উদ্যোগে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশিত হয়। ইহার অনেকগুলি গ্রন্থ উষার অঙ্গীভূত ছিল—ন্যায়াবলি (সংস্কৃত সদুক্তি সংগ্রহ, কলিকাতা ১৮৭১), ত্রয়ী ভাষা (বৈদিক মন্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা সহ বঙ্গানুবাদ, কলিকাতা ১৮৯৭), ত্রয়ী চতুষ্টয় (বেদ পাঠের ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা সহ মন্ত্রও ব্রাহ্মণের সার সংগ্রহ, কলিকাতা ১৮৯২) ত্রয়ী টিকা (ঋক্, যজু ও সামবেদ সংগ্রহ, কলিকাতা, ১৮৯৭), অক্ষর তন্ত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৮৯), আপস্তম্বীয় যজ্ঞপরিভাষা সূত্রম (বঙ্গানুবাদ সহ, কলিকাতা, ১৮৯১), আর্ষেয় ব্রাহ্মণ (কলিকাতা, ১৮৭৪), মন্ত্রব্রাহ্মণম্ (ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত, বঙ্গানুবাদ ও টিকা সহ, কলিকাতা (১৮৭৩), সামবিধান ব্রাহ্মণম্ (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৯৫), শতপথ ব্রাহ্মণ (কলিকাতা, ১৯০৩), বংশ ব্রাহ্মণম্ (বঙ্গানুবাদসহ, কলিকাতা, ১৮৯২), শুক্ল যজুর্বেদ : বাজসনেয়ি সংহিতা, মাধ্যন্দিন শাখা (কলিকাতা, ১৮৭৪ শক), কৃষ্ণ যজুর্বেদ সংহিতা(কলিকাতা ১৮৯৯), যজুর্বেদ সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা (কলিকাতা ১৯৭৭) সামপ্রতিশাখ্যম্ (সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভূমিকাসহ, কলিকাতা, ১৮৯০) সামবেদ সংহিতা (সংস্কৃত টিকা ও বঙ্গানুবাদ সহ, কলিকাতা ১৮৭৯), গোভিল গৃহ্যসূত্র (বঙ্গানুবাদ সহ, কলিকাতা, ১৮৮৬) নিরুক্তালোচনম্ (যাস্কের নিরুক্ত ব্যাখ্যা, ১৯০৭ কলিকাতা) চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য রচিত মাধব চম্পূ কাব্যম্ ও বিদ্যোন্মাদ তরঙ্গিণী (কলিকাতা, ১৮৭১), জয়ন্তস্বামী রচিত খরাঙ্কুশঃ (কলিকাতা, ১৮৯৪) জিনদত্ত সূরী রচিত বিবেক বিলাসঃ (কলিকাতা, ১৮৭৬), মধুসূদন সরস্বতী রচিত অষ্ট বিকৃতি বিবৃতি (কলিকাতা, ১৮৮৯), নারদীয় শিক্ষা (কলিকাতা, ১৮৯০), নিদান সূত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৯৬), সাম প্রকাশনম্ (কলিকাতা, ১৮৯১), রাজশেখর কৃত বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা টিকা সহ, (কলিকাতা, ১৮৭৩). চন্দ্রশেখর চম্পূ : (কলিকাতা, ১৮৭১) উভট পার্ষদ সূত্রবৃত্তি (কলিকাতা, ১৮৯৫), (শাকল্য) পদ গাঢ়ঃ (কলিকাতা, ১৮৮৯), (শৌনক) পার্ষদ সূত্রম্ (কলিকাতা, ১৮৯৬), উপলেখ সূত্রম্ (কলিকাতা ১৮৯৫) ষড়বিংশতি ব্রাহ্মণম্ (কলিকাতা, ১৮৭৪),

উপগ্রন্থ সূত্রম্—(কলিকাতা, ১৮৯৭), উপনিষদ : (কলিকাতা ১৮৯৫), পার্ষদ সূত্রবৃত্তিঃ (কলিকাতা), সামপদ সংহিতা (কলিকাতা, ১৮৯১), অগ্নিষ্টোম সামানি (কলিকাতা, ১৮৯২) সপ্তদশ মহাসামানি (কলিকাতা, ১৮৯১), দেবতাতত্ত্ব : বাঙ্গলায় বেদোল্লিখিত দেবতাগণের আলোচনা (মাহেশ ১৮৭৩) ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পুস্তক তালিকায় সত্যব্রত সামশ্রমী সম্পাদিত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির উল্লেখ আছে, এগুলির রচনাকাল তালিকাতে সন্নিবিষ্ট হয় নাই—বহু বিবাহ বিচার সমালোচনা, পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী-ভাষ্যসার, ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ ভাষ্য, গোভিলগৃহ্যসূত্র ব্যাখ্যান মীমাংসা সূত্র ভাষ্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্রাহ্মধর্মের টিকা।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন বেদপ্রচারক সত্যব্রত গুরুপরিশ্রম জনিত সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার তিনপুত্র ও একভ্রাতা জীবিত ছিলেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ও অক্লান্ত বেদপ্রচারক পণ্ডিতরূপে সত্যব্রত সামশ্রমীর নাম চিরস্মরণীয়।

আধুনিক অভিনয় শিল্প এবং প্রসঙ্গকথা

একবার একটি সৌখীন নাট্য সংঘের অভিনয় দেখতে দেখতে হঠাৎ এক সময় আমার পাশের ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন, 'একেবারে যাত্রা করছে।' ভদ্রলোক এমন মন্তব্য কেন করলেন তা ভেবে দেখবার মত। নিশ্চয়ই যাত্রা থিয়েটারের একটা মোটামুটি পার্থক্যবোধ তাঁর আছে। সাধারণত থিয়েটার দেখতে গিয়ে অতি অভিনয় দেখলে আমরা ব'লে থাকি লোকটা যাত্রা করছে। অর্থাৎ যাত্রার অভিনয়ের সঙ্গে মঞ্চের অভিনয়ের একরকম প্রভেদ আমরা ধরে নিই। আমার পাশের ভদ্রলোকও অতি অভিনয় দেখেই বোধহয় বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অতি অভিনয় মানেই যে সব সময়ই যাত্রা, তা ঠিক নয়। অবস্থা অনুযায়ী যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতি আলাদা। যাত্রার বদলে নূতন অবস্থায় আমরা যখন মঞ্চের আশ্রয় নিলাম, থিয়েটার ভালবাসলাম, তেমনি নাটকের প্রয়োজনে যাত্রায় প্রচলিত অভিনয় ছেড়ে নূতন অভিনয় শিক্ষা করতে হ'ল। মোটামুটি ভাবে দেখা যাক যাত্রা ও থিয়েটারের অভিনয়ের এইপার্থক্যটা কি।

যাত্রা বোঝাতে অনেক সময় 'অপেরা' কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইংরাজী অপেরার সঙ্গে যাত্রার অমিল প্রভূত। 'অপেরা' সংগীত ও নৃত্য সংমিশ্রণে তিন দিক ঘেরা মঞ্চে পরিবেশিত হয়ে থাকে যদিও অভিনয়ের দিক থেকে যাত্রার সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের যাত্রা প্রধানত ভঙ্গি এবং বাচন প্রধান। সংলাপের কারিগরি না থাকলে যাত্রায় অভিনেতাদের দর্শকবৃন্দকে আকৃষ্ট করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যা সৃষ্টি করা হয় তা কেবল সঙ্গীত মাধ্যমেই তাও সব সময়ে রস অনুযায়ী সাফল্য লাভ করে বলে মনে হয় না। অভিনেতাদের চরিত্র ও ঘটনা অনুযায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে হয়। একটি দৃশ্য যাত্রাতে দেখাতে হ'লে, অভিনেতার সম্পূর্ণ স্বকীয়তার উপর নির্ভর করে, অভিনয়ের উপর জোর দিয়ে 'এফেক্ট' তৈরী করে নিতে হয়। সেজন্য যাত্রাকে সংকেতধর্মীও বলা যেতে পারে। কিন্তু থিয়েটারে আলো দৃশ্যসজ্জা ইত্যাদির দ্বারা পরিবেশ আগে থেকেই তৈরী হয়ে থাকে এবং অভিনেতাকে অভিনয়ের সাহায্যে তা বজায় রাখতে হয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে থিয়েটারের চেয়ে যাত্রার অভিনয় শক্ত। পরিস্থিতির সংগে পরিবেশ পাওয়া যায় না বলেই থিয়েরের বিচারে যে আর্ট বা কলা 'ওভার এফেক্ট', 'ওভার এ্যাম্ফেসিস' বা 'ওভার-এ্যাকটিং'-এর জন্য স্থূল, যাত্রার বিচারে বেশীর ভাগ সময়েই তা স্বাভাবিক। সুতরাং সাধারণ ভাবে যাত্রা শিল্পীর গতি মেলোড্রামাটিক। যাত্রা শিল্পীর কয়েকটি বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়া দরকার। যেমন গলার ভল্যুম অর্থাৎ ভিতর থেকে বার করে আনা গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বরগ্রাম ও অনেকক্ষণ শ্বাস ধরে রাখবার ক্ষমতা। সঙ্গে থাকা চাই সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যা দিয়ে চারিদিকের কোলাহলকে শান্ত করতে পারা যাবে। যাত্রার সংলাপের

বৈশিষ্ট্য যে, প্রত্যেকটি সংলাপের "রেশ" রেখে সংলাপ বলা। সাধারণ জীবনের কাটা কাটা সংলাপ দিয়ে অনেক সময় যাত্রার রস ব্যাহত হতে দেখা গিয়েছে।

আজকাল যাত্রাকে অনেক সময় থিয়েটারধর্মী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেটা যদি হয়েই থাকে তবে বোধ হয় "যাত্রা নাটকে" হয়েছে। আগে মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বোঝাতে হ'লে বিবেকের শুধু গানের আশ্রয় নেওয়া হোত কিন্তু আজকাল বিবেক বা ঐ ধরনেব একটি অনৈসর্গিক চরিত্র সৃষ্টি করে সংগে সংলাপ জুড়ে দেওয়া হয়। তবে অভিনয়ের সুর স্থান এবং কাল হিসাবে হয়তো বা কিছু পাল্টেছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দেখতে গেলে অভিনয় শিল্পের ধারা প্রায় একই রয়ে গেছে। যাত্রা বা থিয়েটারের উভয়েরই অভিনেতাদের কাজ হচ্ছে মূলতঃ একই অর্থাৎ চরিত্রকে প্রাণবন্ত রূপে সৃষ্টি করা—তবে এই সৃষ্টি করার পক্ষে যাত্রার অভিনেতাদের কাজ কিছুটা জটিল এবং সমস্যাপূর্ণ। আজকাল একটু সহজ করবার জন্য যাত্রা মঞ্চ তিনদিক খোলা রেখে অভিনয় করবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। বাঁধাধরা নিয়মে কোন শিল্পই চলে না, যুগোপযোগী প্রত্যেকটিরই একটা গতি আছে, টেক্‌নিক আছে, অভিনয় শিল্প, সেটা যাত্রাই হোক বা থিয়েটারই হোক এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলা দেশে নবনাট্য আন্দোলনের প্রসারের সংগে সংগে শিক্ষিত ও প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে নাটক নির্বাচন ও পরিবেশনের মধ্যে সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত একটা মহৎউদ্দেশ্য ও স্পষ্ট বক্তব্য আছে এবং প্রত্যেক আদর্শবাদী নাটকগোষ্ঠিই তার ধারক। যারা পেটের দায়ে রক্ষণশীল মালিকের টাকার বিনিময়ে অভিনয় করেন তাদের কথা বাদ দিলে, সৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ সময়েই দেখা যায় যে, নাটক পরিবেশনই এদের কাছে মুখ্য, আর অভিনয় শিল্প বা নাটক নির্বাচন হয়ে দাঁড়ায় গৌণ। অভিনয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধনও এঁদের উদ্দেশ্য নয়। নাটক পরিবেশনের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করার যে উত্তেজনা থাকে তাতে এরা আনন্দ বা মজা পান। কোন কোন সময় নিজের অবহেলিত মানসিক সত্বাকে তুলে ধরার লোভও সামলাতে পারেন না, বা বাস্তব জীবন থেকে নিজেকে আলাদা করে, সম্পূর্ণ নূতনরূপে কল্পনালোকের মায়ার খেলায় আত্মবিস্মৃত হয়ে নিজেকে প্রকাশ করে দর্শক সাধারণের সস্তা বাহবা নেওয়াও এদের পক্ষে কম উদ্দীপক নয়। আর আত্মপ্রচারের ঝোঁকটাও এদের প্রবল। একটি সৌখিন নাটক সম্প্রদায়ের অভিনয়ের পরের দিন সকালে চায়ের দোকানে এদের ফাঁপা আলোচনা আর 'আমির' বহর থেকেই বোঝা যাবে যে সত্যকার গঠনমূলক সমালোচনা এদের অনেকেই বোধহয় পছন্দ করেন না বা চান না—কারণ নিজেদের মধ্যেই এরা সন্তুষ্ট থাকেন। আর সমালোচনা বা আলোচনার 'আমিত্বে'র হানি হবার আশংকাও থাকে।

অভিনয়কে শিল্পের দিক দিয়ে বিচার করলে প্রত্যেকেরই অভিনয় শিল্পসম্মত হওয়া চাই। অভিনয় শিল্পের লিখিত ব্যাকরণ নেই কিন্তু অলিখিত কতকগুলো সূত্র ধরে চলে এবং তা জানা থাকলে সার্থক অভিনয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায় এবং নাটক পরিবেশন সম্বন্ধেও মোটামুটি ধারণা করা যায়।

এক: প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে নাটক নির্বাচন ও তার পরিবেশনার রূপ সম্বন্ধে। নাটক নির্বাচনের সময় মনে রাখতে হবে যে নাটক কেবল কয়েকটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের

প্রতিফলন নয় বা বিশেষ কোন গোষ্ঠির জন্যও নয়—এটা দেশের সমস্ত মানব সমাজের এবং এই হিসাবে নাটকটি মানবধর্মী ও বলিষ্ঠ বক্তব্য দিয়ে উপস্থাপিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অভিনয়ে জমিয়ে কয়েক জনের সস্তা হাততালি বা পিঠ চাপড়ানো পেলেই সুস্থ নাটক হয় না যদি না সেই নাটকের কোন বক্তব্য থাকে। নাটকটি মহলার সুরুতেই কম্পোজ করে নিতে হবে এবং অভিনেতাদের সব রকম কায়দা মহলার সময়েই দিয়ে নিতে হবে, যাতে একই দৃশ্যে অবতরণকারী প্রত্যেক অভিনেতাই একই পর্দায় ও ছন্দে একের সঙ্গে অপরের সমতা রক্ষা করে যেতে পারে। Conmposition-এর দায়িত্ব পরিচালকের এবং সেই কম্পোজিশন অনুযায়ী প্রয়োগ ইত্যাদি করা অভিনেতার দায়িত্ব এবং এ অনুযায়ী অগ্রসর না হলে বক্তব্যের হানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দুই : ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে সামগ্রিক অভিনয় ইত্যাদির প্রতি প্রাধান্য দিতে হবে তা না হলে নাটকে এমন একটা আলগা আলগা ভাব এসে পড়ে, যেন মনে হয় অভিনেতারা কেউ কারো নয়—ফলে নাটক কিছুতেই জমে ওঠে না। "It is a harmonius whole, like the fine performances of Orchestra" প্রত্যেক অভিনেতাই অভিনয়ে যেন সম-পর্দায় লয়ে ও ছন্দে অভিনয় করেন সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

তিন : যে মঞ্চে সিন টাঙ্গিয়ে অভিনয় করা হয়ে থাকে, সেই মঞ্চের সাধারণভাবে ডানদিকের পর্দাকে "বাহির দিক" ও বাঁ দিকের পর্দাকে ভিতর দিক বলে ধরা হয়ে থাকে; তবে 'বক্স স্ক্রীন' বা কাটা সিনে অভিনয় করলে দৃশ্য রচনা অনুযায়ী ভিতর ও বাহির হয়ে থাকে।

চার : অনেক সময় দেখা যায় যে একজন অভিনেতা দর্শকদের পিছনে ফেলে সহঅভিনেতার সঙ্গে সংলাপ বলছেন বা দর্শকদের পিছনে রেখে মঞ্চের মধ্যে ঘুরছেন। অভিনয় শিল্পের ব্যাপারে এটা দোষনীয় বলে ধরা হ'য়ে থাকে। সহ অভিনেতা পিছনে থাকলে এমন জায়গায় এসে এমনভাবে সংলাপ বলতে হবে যাতে সহ অভিনেতাকেও পাওয়া যায় আবার দর্শক সাধারণও পিছনে না পড়েন বা ঘুরবার সময় মঞ্চকে পিছনে রেখে দর্শকদের দিকে মুখ রেখে ঘুরতে হবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য নয়। অনেক সময় একজন অভিনেতা অন্য অভিনেতাকে আড়ালে রেখে দাঁড়ান। অভিনেতাদের প্রত্যেকেরই উচিত কেউ কাউকেই আড়াল না করা বা কেউ কারো আড়ালে না থাকা।

পাঁচ : আলোর ব্যবস্থা থাকলে একজনকে আড়াল দিয়ে অপরে আলো নেওয়ার মত দৃষ্টিকটু আর কিছুই নেই—সুতরাং কোন্ দৃশ্যে কোন্ কোন্ অভিনেতা আলো নেবেন সে বিষয়ে নিশ্চয়ই 'কম্পোজিশন' অনুযায়ী অবহিত থাকতে হবে। Dramatic Emphasis যখন ঘুরে ঘুরে এক-চরিত্র থেকে অপর চরিত্রে যেতে থাকবে, তখন সেই অনুসারেই চরিত্রগুলিকে স্থান বদলে বদলে নিজেদের উপর ঠিক সময়ে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। ব্যবস্থার ও দৃশ্যের কল্পনা অনুযায়ী এটার হের-ফের হতে পারে কিন্তু তাতে স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা চাই।

নূতন নাটকের অভিনয় : Notes of Soviet Actor গ্রন্থে Chezkasav বিখ্যাত প্রযোজক-নট Stanislavasky-র নজির দেখিয়ে বলেছেন, 'Stanislavosky-র অভিনয় পদ্ধতি আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে চরিত্র রূপায়নে অভিনেতাকে প্রথমেই ভালভাবে বুঝতে হবে, যে

চরিত্রে তিনি অভিনয় করছেন তা প্রধানতঃ কোন ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, অভিনয় কালে সেই ভাবধারাকে বজায় রেখে অভিনয় করতে হবে এবং তা করতে হ'লে 'টেকনিকই' হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি যার সাহায্যে নিতে হবে। অবশ্য ধীশক্তিসম্পন্ন ও সৃজনশীল অভিনেতার পক্ষে চরিত্র রূপায়ন অনেক সোজা এবং সাবলীল হ'য়ে যায়। 'টাইপ' চরিত্রের বেলায়ও চরিত্র অনুযায়ী খেয়াল-খুসির বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে হ'লে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে অভিনয় করতে হবে। এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে প্রত্যেক নটেরই অন্ধভাবে পূর্বসূরীদের ধারা ও রীতি অনুযায়ী কোন চরিত্রকে রূপায়িত না করাই উচিত। অভ্যাসের দ্বারা সংলাপের নিহিত অর্থ খুঁজে বার করে সংলাপের সময় প্রতিটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে হবে, তাতে অভিনেতার স্বকীয়তাও বজায় থাকবে। 'এফেক্ট' সৃষ্টি করবার জন্য শব্দ উচ্চারণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে হিতে বিপরীত হয়। যে সব অভিনেতারা নিজেদের 'টাইপ' অভিনয়ের ছাঁচে বাঁধা নট হিসাবে আটক রাখেন, তাঁদের অভিনয়ে কোন উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়—কারণ কিছুদিনের মধ্যেই দর্শকদের কাছে তাঁরা এক ঘেয়েমির দোষে ধরা পড়েন। নটকে প্রথমে সমস্ত নাটকটি পড়ে নাটকটির মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। নাটকের চরিত্রগুলি জীবনীমূলক ঐতিহাসিক বা তথ্যমূলক হলে, সমসাময়িক তথ্য জোগাড় করে চরিত্র রূপায়নে অগ্রসর না হ'লে চরিত্রগুলি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত হ'য়ে পড়ে। কাব্য নাটক অভিনয়ের সময় মনে রাখতে হবে যে "কাব্যকারে নাটকের পরিবেশন—নাট্যকারে কাব্যের পরিবেশন নয়।" এই প্রসঙ্গে নাট্যাচার্য শিশিরবাবু বলেছেন "নট নাট্যকারের হাতের খেলার পুতুল নয়"—অর্থাৎ নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে ঠিক রেখে ঘটনার প্রবাহকে তুলে ধরবার জন্য নটের নিজের চিন্তাশক্তির ব্যবহার করতে হবে। বিখ্যাত অভিনেত্রী এলেন টেরীও নাটকের চরিত্রের নিখুঁত প্রতিফলনের জন্য ইমাজিনেশন বা কল্পনাকে অভিনয়ের কাজে লাগাতে বলেছেন।

হাত ও পা : অনেক সময় মঞ্চে নেবে হাত নিয়ে বা "অলস দাঁড়ান" নিয়ে অনেক অভিনেতা অভিনেত্রী বিব্রত হ'য়ে পড়েন এবং হাত পা কিভাবে রাখবেন তা বুঝে উঠতে পারেন না। হাত সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে দৃশ্যের ধারা বা 'সিচুয়েশন' অনুযায়ী হাতের ভঙ্গীর প্রকাশ করাই উচিত বা স্বাভাবিক ভাবে By Play করা যেতেও পারে। নূতন অভিনেতার পক্ষে দৃশ্যের ভাব ব্যঞ্জনা অব্যাহত রেখে, বই বা কাগজ পড়া, সিগারেট খাওয়া বা চেয়ারের পিছনে হাত রেখে দাঁড়ান বা কিছু একটা নাড়াচাড়া ইত্যাদি করাই শ্রেয়। সংলাপ বিহীন অলসভাবে দাঁড়ানর ব্যাপারে একটি পা সোজা করে অন্য পায়ের পাতাটি একটু সামনে বা পাশাপাশি একটু অসমান্তরালভাবে রেখে সেই পায়ের হাঁটু ভেঙ্গে দাঁড়াবার রীতিকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করা যেতে পারে।

অঙ্গভঙ্গিমা : জেস্‌চার সম্বন্ধে সেক্সপীয়র বলেছেন—Suit the action to the word, the word to the action, with this special observarance that you over-step not the modesty of Nature" জেস্‌চার প্রধানতঃ অভিনেতার ভাব উপলব্ধির উপর নির্ভর করে এবং প্রত্যক্ষভাবে (কাঁধ থেকে হাতের আঙুল পর্যন্ত) বাহুর সাহায্যেই করা হ'য়ে থাকে। তবে

ক্লেসচার যাতে কার্যকরী হয় তার জন্ত পরোক্ষভাবে সমস্ত অঙ্গ মুখ ও বিশেষ ভাবে চোখের সাহায্য নিতে হয়।

কৌশল : ইংরাজী action-কে বলে বোঝাতে চাইছি। অর্থাৎ নট-নটীর অভিনয়ের সময় কোন কোন জায়গায় কোন কোন বিশেষ রীতির কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। ইংরাজ অভিনেতা গর্ডন ক্রেগ 'এ্যাকশন' বলতে ভঙ্গী ও ছন্দ, গতির গন্থ ও কাব্য রীতিকেই বুঝিয়েছেন।

দৃশ্য : 'সীন' বলতে গর্ডন ক্রেগ দৃশ্যানুযায়ী ও চরিত্রানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদ, রং-রেখা মঞ্চের দৃশ্য সজ্জা এবং আঙ্গিক ও তবলা ইত্যাদির সবগুলির প্রয়োগ রীতিকেই বুঁঝিয়েছেন।

স্বর : যে পর্দায় গলা উঠিয়ে কথা বললে প্রেক্ষাগারের শেষের দিকের দর্শকবৃন্দ শুনতে পারেন অথচ সামনের সারির দর্শকদের ও ঐ কণ্ঠস্বরকে অস্বাভাবিক মনে হবে না সেই পর্দায় অভিনয় করতে শিখতে হবে। উচ্চগ্রামে অভিনয় শুরু করলে দেখা যাবে যে গলার উপর দিয়ে স্বরনালী বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসছে, তা দেখতেও যেমন খারাপ লাগে আবার স্বরনালীতে অযথা চাপ পড়ে, কণ্ঠস্বর বিকৃত হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে প্রত্যেক অভিনেতার স্বরগ্রাম একই স্তরে বাঁধা থাকবে এবং এটা অভিনয়ের একটা বিশেষ অঙ্গ।

প্রেরণা বা 'ইন্সটিংক্ট' : চরিত্র অনুযায়ী অভিনয় করার প্রেরণা না থাকলে সার্থক অভিনয় হ'তে পারে না এবং তা অভিনেতার অভিনীত চরিত্রের সাথে নিজেকে কতকটা খাপ খাওয়াতে পেরেছেন, তার উপর নির্ভর করে। যে চরিত্রে অভিনয় করেছেন সে চরিত্রের অভিনয়ের উপযোগী প্রেরণা পেলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক অভিনয়কৌশলও আয়ত্বে আনার সম্ভাবনা আছে। সৃজনশীল মনোবৃত্তি থেকে প্রেরণার উৎপত্তি।

অভিনেতা যে চরিত্রে অভিনয় করছেন, সে চরিত্রের সব অনুভূতি ও ভাবাবেগ মনে রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কিভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় সে বিষয়ে সচেতন হতে হবে। নাট্যাচার্য শিশিরবাবুর কথায় "প্রত্যেক সুঅভিনেতা প্রত্যেক আর্টিস্ট, শিল্পী নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুটি মানুষকে বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন বিচারক আর একজন কর্মী, এই দুয়ের সমন্বয়ে সত্যিকারের আর্টিস্টের জন্ম।

সংলাপ প্রসঙ্গ : সংলাপের অর্থ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা নিজেই বুঝে নিতে পারবেন, কিভাবে কোথার একটু জোর দিয়ে বা কোথাও একটু থেমে বা কোমল পর্দায় সংলাপ বলা দরকার। একই সংলাপে বিভিন্ন রসের সমাবেশ থাকলে, বিভিন্নভাবে, ঠিক মাত্রা রেখে বিভিন্ন ভঙ্গি পরিবর্তন করে সংলাপের রসের পরিবর্তন করতে হবে।

সহ-অভিনয় : এটা অভিনয় শিল্পের একটা প্রধান অঙ্গ। Oxford Dictionary-তে সহ-অভিনয়কে বলা হয়েছে—'Events apart from main current of affairs, dumb show of minor character on Stage ? কিন্তু সহ-অভিনয় এমন হওয়া উচিত নয় যাতে দর্শকদের দৃষ্টি আসল অভিনয় ছেড়ে এদিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। সহ-অভিনয় অসঙ্গত হলে নাটক যেমন নষ্ট হ'য়ে যায় তেমনই এর সঙ্গত ব্যবহারে সার্থক নাটক সৃষ্টি হয়।

অন্যান্য : যে রকমই হাঁসি কান্না বা হতাশা সংলাপে প্রকাশ পাক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে চোখ ও ভ্রূর সেই রকম অভিব্যক্তির প্রকাশ না থাকলে অভিনয় অনেকটা ব্যহত হয়। অভিনয়ের ভাব প্রকাশ করার জন্য চোখ ও ভ্রূ একটি বড় রকমের যন্ত্র বিশেষ এবং এর দ্বারা অভিনয়কে অনেকটা এগিয়ে দেয় ও প্রাণবন্ত করে তোলে। চোখের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ভ্রূ আপনা থেকে অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির নিয়মে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে।

ভাষা : গ্রীক সমালোচক Ci ero ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন "ভাব প্রকাশের সঙ্গে সংগতি রেখে শব্দ উচ্চারণের তারতম্যের প্রয়োজন হতে পারে। শব্দের বৈচিত্রের জন্য আবশ্যক মত ভেঙ্গে বা কেটে কথা বলতে হতে পারে। উচ্চারণেও বৈচিত্র প্রয়োজন হ'তে পারে। অভিনেতা তার অভিনয়, রংয়ে, রসে ভরপুর করে তোলেন শব্দের উচ্চারণ বৈচিত্র্যে। ভাব এবং চিন্তাধারা প্রকাশের জন্যই শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু উচ্চারণের কঠিন অনুশাসনে সেই উদ্দেশ্যই যদি ব্যহত হয় তবে তাকে অগ্রাহ্য করা ছাড়া উপায় কি? অভিব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে বোঝাতে গিয়ে, দরকার মত স্বাভাবিকতা বজায় রেখে শব্দ উচ্চারণ করতে হবে এবং সেইজন্য অভিধান-গ্রাহ্য উচ্চারণের নিয়মকেও অগ্রাহ্য করা চলবে। The word should be the echo of the scene." হেনরী আরভিং, গর্ডন ক্রেগ, কঁস্তা কঁকেলা, শিশির ভাদুড়ী, ব্রেখট প্রভৃতি নাট্যজগতের অনেক মনীষীরা কতকগুলি জিনিস সম্বন্ধে অভিনয় শিল্পের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বলেছেন :

স্বাভাবিক অভিনয় : বাস্তব জীবনে যেভাবে আমরা মুখ নাক বা কান চুলকাই চুল ঠিক করি, বিকৃত ভঙ্গীতে শ্বাস নিই বা গলা খাঁকারি দিই, মঞ্চের উপর তার হুবহু অনুকরণ করলে অনেক সময় দর্শকদের বিরক্তির কারণ হ'তে পারে, অভিনয়ের সুরও কেটে যেতে পারে। এমিলি জোলা অবশ্য নাটকে স্বাভাবিকবাদ বা আরও একটু এগিয়েও দেখিয়েছেন কিন্তু তাতে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলোও মঞ্চে প্রভাব বিস্তার করছিল, ফলে অভিনয় অনেক ব্যহত হতে লাগল, সেইজন্য পরের দিকে স্বাভাবিকবাদ বিশেষ দানা বাঁধতে পারে নি। আসলে স্বাভাবিকতার মায়াজাল সৃষ্টি করে জীবনকে বিচারকের দৃষ্টিতে দেখে টেকনিকের সাহায্যে পরিশোধিত করে অভিনয় ও আঙ্গিকের মাধ্যমে, বুদ্ধি এবং কৌশলের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মঞ্চে রূপায়ন করার রীতি অনুসারেই অতি অভিনয়কে বাদ দিয়ে স্বাভাবিক অভিনয় করতে হবে।

স্বর বিন্যাস সংলাপের স্বাভাবিকতা, সুকণ্ঠ, স্বরের উচ্চগ্রাম, স্বর বিস্তার ও স্বরের রূপ সাধন : কর্কশ, বাজখাই, গদগদ ইত্যাদি বহুজাতের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু অভিনেতাকে চরিত্র অনুযায়ী কণ্ঠস্বর ব্যবহার করতে হবে এবং তা করতে হ'লে অভিনেতাকে আয়ত্বকণ্ঠ হতে হবে। সংলাপ বলার সময় অভিনেতাকে গলার স্বর এমন পর্দায় এনে অভিনয় করতে হবে কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা ধরা না পড়ে। সুকণ্ঠ অভিনেতার সংলাপ সাধারণতঃ প্রাণস্পর্শী হয় কিন্তু তাতে আবার বিপদ কম নয়। সংলাপ বলার সময় সুকণ্ঠ অভিনেতা নাটক থেকে আলাদা হয়ে দর্শকদের নিজের সুকণ্ঠের আবৃত্তি শোনাতে আরম্ভ করলে, মূল নাটকটির বাঁধন ছিঁড়ে যায়। কারণ স্বভাবতই দর্শকেরা আবৃত্তিতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন ফলে অন্য চরিত্রের গতিও শ্লথ হয়ে যায়। অভিনেতার গলা অন্ততঃ পক্ষে স্বরগমের 'সা' থেকে 'নি' পর্য্যন্ত প্রত্যেকটি পর্দায়

খেলান চাই, তা'হলেই স্বরের বিন্যাস ও রূপ-সাধন সম্ভব। ঐ বিদ্যা রীতিমত অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ব করতে হবে। স্বর বিস্তার, স্বরের রূপসাধন ও বিন্যাস একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সুতরাং একটি আয়ত্বে এলে অপরগুলিও সহজেই আয়ত্বে আসবে। কণ্ঠস্বরের উচ্চতম গ্রামকে জলদ পর্যন্ত সংলাপের রস অনুযায়ী উঠা-নামা করাতে পারলে সংলাপের অভিব্যক্তির পূর্ণ প্রকাশ পায় ও সার্থক অভিনয় হয়।

নিশ্বাস প্রশ্বাস ও স্পষ্ট উচ্চারণঃ যে হাওয়া আমরা গ্রহণ করি তাকে প্রশ্বাস ও যেটা আমরা বার করে দিই তাকে নিশ্বাস বলে। ফুসফুসে পরিমিত শ্বাস না থাকলে অভিনেতার দু'এক লাইন সংলাপের পর শেষের লাইনগুলো বড় ম্লান ও অস্ফুট হ'য়ে যায় ফলে শেষের দিকে সংলাপ জড়িয়ে যায় বা সংলাপ Accent বা Pause অনুযায়ী হয় না—শ্বাস ফুরিয়ে যাবার ফলে অনেক অভিনেতা তাড়াতাড়ি সংলাপ বলতে চেষ্টা করেন, তাতে সংলাপ আরও অস্পষ্ট হয়ে যায়। তার স্বরের কোন রূপসাধন বা বিস্তার সম্ভব হয় না। তা ছাড়া ঠোঁটের ঠিকমত ব্যবহার না হলে সংলাপে অস্পষ্টতা আসে। আধবোঝা মুখ, জিবের অসারতা, সাধারণ ভাবে তাড়াতাড়ি কথা বলা এই সব নানা কারণেও সংলাপ অস্পষ্ট হয়। এ সবকে নিয়ন্ত্রণ করা অভিনয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। Breathing Excersise করে প্রশ্বাস ও নিশ্বাসকে আয়ত্বে আনতে হবে, আর তার জন্যে চাই শারীরিক সুস্থতা।

কণ্ঠস্বরের মাত্রাঃ স্বরগম সাধতে হ'লে যেমন স্বরের রূপসাধন হয় তেমনি আবার খানিকটা সময়ও ব্যয় হয়—এই সময় ব্যয়ের মাপকাঠি হচ্ছে মাত্রা বা মাপ। গানের মত সংলাপের মাত্রাগুলি দ্রুত হ'লে অভিনয়ের গতি দ্রুত হয়, আবার মাত্রা মাঝারি বা বিলম্বিত হ'লে অভিনয়ের গতিও সেই রকম হয়।

ছন্দঃ একঘেয়ে শব্দতরঙ্গের বদলে বৈচিত্র পূর্ণ স্বরগ্রাম, স্বরমাধুর্য, স্বরবিন্যাস, স্বরবিস্তার ও মাত্রায় বাঁধা গতিকেই ছন্দ বলে। সংলাপের এই ছন্দের জন্যই অভিনেতার অভিনয় প্রাণবন্ত হয়।

নিজের নিজের অভিনয়ের সুস্থমনে সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সুস্থ ও শিক্ষিত রুচির পরিচায়ক; এবং সেই হিসাবে দোষ ত্রুটিগুলি আলোচনা করে নিজেকে প্রস্তুত করা প্রত্যেক অভিনেতারই কর্তব্য। নিজের বা নিজেদের অকৃতকার্য্যের জন্য সমালোচনার উত্তরে বিরক্তি প্রকাশ নাট্যামোদীদের পক্ষে অশোভন। নিজেদের অভিনীত কোন নাটক সম্বন্ধে আত্মতৃপ্ত হওয়ার থেকে অভিনেতৃ বা পরিচালকের নিশ্চয়ই সতর্ক থাকা উচিত।

অনিলবরণ রায়

সাহিত্য সংবাদ

গভীর অরণ্যের মাঝে এক শ্বেতাঙ্গ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব এককালে কৃষ্ণকায়দের সমাজে কি আলোড়ন তুলেছিল তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও হয়ত লেখা হয়নি, কিন্তু তাঁর মহান আদর্শের কথা আজ আমাদের অজানা নয়। যতই তাঁর কথা মনে আসে ততই বিস্মিত হই। পাশ্চাত্য ভোগবিলাসের মোহবন্ধন ছিন্ন করে অবহেলিত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োজনের প্রেরণা সেই সন্ন্যাসীর মনে কে জুগিয়েছিল, তা আজ জানতে ইচ্ছা করে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের কোনও সূত্র কি তাঁকে কোনও কালে প্রভাবান্বিত করেছিল? না ভিখারী লাজারাসের ক্রন্দনধ্বনি তাঁর মনকে কোনকালে উদ্বেলিত করেছিল। ত্যাগের আনন্দে উল্লসিত হওয়ার মত মানসিকতা, গাঙ্গেয় উপত্যকার অবদান বলেই আমাদের ধারণা ছিল, কিন্তু না, সব নিয়মের যেমন ব্যতিক্রম আছে তেমনই বিলাসিতার হাতছানি অবহেলা করার মত বিশুদ্ধ আত্মা পাশ্চাত্য দেশেও যে মানবদেহ ধারণ করে তার নিদর্শন সেই মানবদরদী শ্বেতকায় সন্ন্যাসী। যিনি সবকিছু ত্যাগ করে আর্ত মানবের সেবায় আজও আফ্রিকার আদিম অরণ্যে অশীতিপর শিথিল দেহ নিয়ে কর্মতৎপর।

১৮৭৫ সালের কথা, আপার আলশাসের এক প্রান্তে কাইজারবার্গ অন্তর্গত গয়েনস্‌বাখ একটি গণ্ডগ্রাম। গ্রাম্য গীর্জার যাজক লুই সোয়াইৎসার এবং তাঁর স্ত্রী এ্যাডেলি শিলিঙ্গার তাঁদের ছোট্ট সংসার নিয়ে বসবাস করেন। এ্যাডেলি স্ট্রাস্‌বার্গের স্বনামধন্য অধ্যাপক হ্যারি ব্রেসলর কন্যা। যাজক লুই জানুয়ারীর প্রচণ্ড শীতে বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন, চিকিৎসকের সন্ধানে—এ্যাডেলি সন্তানসম্ভবা। ১৪ই জানুয়ারী এ্যাডেলি এক ক্ষীণকায় পুত্রসন্তানের মাতৃত্ব লাভ করলেন। কিন্তু নবজাতকের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির পথে লক্ষ্য করে পিতামাতা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। পড়শীদের সহানুভূতির আক্ষেপ সহ্য করতে না পেরে এ্যাডেলি শিশুটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করতেন। কিন্তু শোকাবহ তেমন কিছু ঘটল না, বরং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ক্রমশঃ শিশুটির স্বাস্থ্যোন্নতি হতে থাকল। তারপর একদিন গীর্জার মঙ্গলধ্বনির মাধ্যমে, নবজাতককে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করা হল। যাজক লুই সোয়াইৎসারের শিশুপুত্রটির নাম রাখা হল এ্যালবার্ট।

তৎকালীন কাইজারবার্গের অধিকাংশ জনসমষ্টি ছিল দরিদ্র কৃষককুল। বালক সোয়াইৎসারের খেলার সাথী ছিল সেই দরিদ্র কৃষকদের সন্তান-সন্ততি। তাদের ছিন্ন বেশবাসের মাঝে দামী পোষাক পরিহিত যাজকপুত্রকে কেমন বেমানান লাগত এবং বালক সোয়াইৎসার বিব্রত বোধ করতেন। খেলার সঙ্গীরা তাঁকে মাঝে মাঝে বেশ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। তার ফলে সোয়াইৎসার দামী পোষাক পরা ত্যাগ করেন। একবার বড়দিনের উপহার স্বরূপ তাঁকে একটি দামী কোট দেওয়া হয় কিন্তু তিনি সে পোষাক কোনদিনই পরেননি; তীক্ষ্ণ শীতের দংশন সত্ত্বেও। কারণ

পোষাকটির দিকে তাকালেই তাঁর চোখের সামনে একের পর এক উপবাসক্লিষ্ট, ছিন্নবাস পরিহিত খেলার সাথীদের বিষণ্ণ মুখগুলো ভেসে উঠত।

সোয়াইৎসার তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে প্রথম স্কুলে যাওয়ার যে চিত্রটি এঁকেছেন তা অপূর্ব। তিনি বলেছেন—একদিন সকালে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। বাবা বললেন যে, আজ আমাকে স্কুলে ভর্তি করা হবে। আমি তো ভয়েই সারা। মাকে কেঁদে বললাম যে স্কুলে আমি যাবনা কিন্তু মা আমার পিঠেহাত বুলিয়ে স্কুলে যাওয়ারজন্য উৎসাহই দিলেন—আমার শেষ ভরসাস্থল থেকেও কোন সাহায্য পেলাম না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। বাবা একটা শ্লেট হাতে দিয়ে যখন বললেন—চল, তখন কান্না চেপে তাঁর পিছু নিলাম। মুয়েনস্টারের রিয়াল স্কুলে আমাকে ভর্তি করা হল।

কিন্তু সেই স্কুলভীরু বালক ছিল ক্লাসের সেরা ছাত্র। ক্রমে স্কুলের দরজা পেরিয়ে সোয়াইৎসার স্ট্রাস্‌বার্গের বিশ্ব বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ১৮৯৯ সালে তাঁর প্রথম থিসিস—"ডি, রিলিজিয়নস্‌ফিলসফি কাণ্টস্‌" বিদগ্ধ সমাজে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। এবং মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে দর্শনতত্ত্বের ডক্টরেট লাভ করেন। খৃস্টের জীবন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম এবং সিনপ্‌টিক গসপেল বিচার করে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা খণ্ডন করারমত যুক্তিবাদী পণ্ডিত তৎকালে বিরল ছিল। ১৯০১ সালে তাঁর ধর্মতত্ত্ববিষয়ক যে রচনাটি প্রকাশিত হয় তা অপর একটি বৃহৎ রচনার মুখবন্ধ মাত্র কিন্তু মুখবন্ধটি নিজগুণে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক রচনার দাবী রাখে। রচনাটি খৃস্টের জীবনকথার ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতার ক্রোড়পত্র।

সম্পূর্ণ রচনা "দি কোয়েস্ট অব দি হিস্টোরিকাল যিশাস্‌" ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুটির ইংরাজি তর্জমার সাল-তারিখে সামান্য গোলমাল আছে। মুখবন্ধটি ১৯০১ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয় কিন্তু ইংরাজি তর্জমা "দি মিস্ট্রি অব দি কিংডম অব গড" ১৯১৫ সালের পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়নি অথচ মুখ্য রচনা জার্মান ভাষায় ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হলেও তার ইংরাজি তর্জমা ১৯১০ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ইংরাজি ভাষার পাঠক সমাজ প্রথমে মুখ্য রচনার আস্বাদ গ্রহণে সুযোগ লাভ করেন এবং পরে মুখবন্ধের পরিচয় পান। অতএব একথা আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে, তৎকালীন উন্নাসিক ইংরাজ সমাজ জার্মান সাহিত্য সৃষ্টিকে বেশ কৃপার চক্ষে দেখতেন। কিংবা কোনও রাজনৈতিক কারণও হতে পারে যার জন্য সে কালের জার্মান ভাবধারার স্পর্শ থেকে গোঁড়াইংরাজকে রক্ষা ব্যবস্থার গোলক ধাঁধার অন্ধকার পথে হয়ত তখন ইংরাজি অনুবাদ সাহিত্য মাথা কুটে মরছে। যাইহোক হিস্টোরিকাল যিশাস্‌ রচনাটি সোয়াইৎসারকে খ্যাতির উচ্চশিখরে পৌছে দেয় এবং একথা স্বীকৃত হয় যে ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে সেয়াইৎসার সারা পৃথিবীতে দশজনের একজন।

অর্গান বাদ্যযন্ত্রটি তৎকালে সোয়াইৎসারের জীবনে একটি মুখ্য ভূমিকা অর্জন করেছিল; সঙ্গীত পিপাসা তাঁর ছিল অপরিসীম। বাখ রচিত সঙ্গীত বাদনে সোয়াইৎসার বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাঁর "জে, এস, বাখ" গ্রন্থটি আজও জীবনানুসন্ধানের অপূর্ব্ব আলেখ্য।

সোয়াইৎসার ১৯০৫ সালে স্ট্রাস্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়োলজিকাল ফ্যাকাল্টির অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন কিন্তু ধর্মতত্ত্বের প্রতি তাঁর গাঢ় আকর্ষণ থাকা সত্বেও তিনি পদত্যাগ করলেন এবং

মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। উদ্দেশ্য ; মিশনারী চিকিৎসক হিসাবে ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটারিয়াল আফ্রিকার আদিম অরণ্যে কৃষ্ণকায়দের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। ১৯১২ সালে স্টাস্‌বার্গের অধ্যাপক ব্রেসলর কন্যা হেলেনকে বিবাহ করেন। হেলেন বিদুষী হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার অনুগামিনী হওয়া স্থির করলেন, তিনি সেবাকার্য্যের বিশেষ বিদ্যা 'গ্রহণে মনোযোগ দিলেন ঠিক একবৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১৩ সালে সোয়াইৎসার দম্পতি আফ্রিকার উদ্দেশে পাড়ি দিলেন, সঙ্গে রইল প্যারিস মিশনারী কমিটির শুভেচ্ছা ও অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

ফ্রেঞ্চ ইকোয়েটারিয়াল আফ্রিকার গাবোন প্রদেশে সোয়াইৎসার হাসপাতাল স্থাপন করতে মনস্থির করলেন। গভীর অরণ্য বেষ্টিত অগোই নদীর তীর ঘেঁষে সোয়াইৎসার ক্যানো ভাসিয়ে দিলেন উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে। অবশেষে লামব্রেল গ্রামের ধারে তাবু ফেললেন। কিছুদিন হাসপাতালের কাজ চলার পর প্যারিস মিশনারী কমিটি সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। কমিটির এই হঠকারিতায় সোয়াইৎসার বেশ বিপদে পড়লেন, কিন্তু দমে যাবার পাত্র তিনি নন। ক্রমে নিজেই তিনি হাসপাতালটি চালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলেন তারজন্য মাঝে মাঝে ইউরোপে গিয়ে অর্গান বাজিয়ে কিংবা আফ্রিকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তাঁকে অর্থ সংগ্রহ করতে হত। তারপর সারা বিশ্বে যখন এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা ছড়িয়ে পড়ল তখন অনেকে সাহায্য করেছেন বটে কিন্তু আরম্ভের সেইকষ্টার্জিত দিনগুলির কথা যখন "অন দি এজ সব দি প্রাইমিভিয়াল ফরেস্ট" (১৯২২ মূল জার্মান ১৯২১) নামক গ্রন্থে পড়ি তখন সেই সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপের প্রতি একটা স্বাভাবিক বিরূপতা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

হাসপাতালের সুষ্ঠু পরিচালনায় অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হলেও সোয়াইৎসার এক বৃহৎ রচনার খসড়া প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। তারপর ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল ফরাসী সরকার সোয়াইৎসার দম্পতীকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে লামব্রেনেই অন্তরীণ করে রাখলেন। হাতে অফুরন্ত সময় পাওয়ায় সোয়াইৎসার তাঁর বন্দীদশাকে শাপে বর বলে মনে করলেন এবং সুরু হল সেই বৃহৎ রচনার প্রস্তুতিপর্ব। পরে ফরাসী সরকার সোয়াইৎসার দম্পতিকে ফ্রান্সে, প্রভেন্স প্রদেশের এক বন্দীশিবিরে নজরবন্দী করে রাখলেন। সোয়াইৎসার নির্বিবাদে লিখে চললেন যুগের বৃহৎ সংহিতা, বিষয়বস্তু আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ও সংকট।

১৯২৩ সালে "কুলটুরফিলসফি" গ্রন্থের প্রথম দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সালেই যে ইংরাজি তর্জমার খণ্ডটি প্রকাশিত হয় তা একটি ক্ষুদ্র পরিচিতি পুস্তকমাত্র। প্রথম খণ্ডটি "দি ডিকে এণ্ড রেস্টারেশন অব সিভিলাইজেশন" নামে অভিহিত। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড "সিভিলাইজেশন এণ্ড এথিকস্" (১৯২৩) গ্রন্থটি নীতিতত্ত্বের একটি শাস্ত্র এবং সোয়াইৎসারের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম।

১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে তিনি আফ্রিকায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর অনুপস্থিতির ফলে লামব্রেনের হাসপাতালটির দৈন্যদশা, বহু চেষ্টা করেও হাসপাতালটি রক্ষা করা গেল না। সোয়াইৎসার অগোই নদীর উজান ঠেলে লামব্রেনের দুমাইল ওপরে একটি নূতন হাসপাতাল স্থাপন করলেন। ক্রমে নূতন হাসপাতালটি বৃহদাকার ধারণ করল এবং নূতন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হওয়ায় কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি শাখাও স্থাপন করা হয়।

নিরঙ্কুশ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সোয়াইৎসারের নিরলস সাহিত্যসাধনা অব্যাহত ছিল। ১৯৩১ সালে "দি মিস্টিসিজম অব পল দি অ্যাপস্টল" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। নিউ টেস্টামেন্টের উপর তাঁর যে সকল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে "দি এ্যাপস্টল" গ্রন্থটি সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ এবং রচনাৎকর্ষে অদ্বিতীয়।

সোয়াইৎসারের "কুলটুরফিলসাফি" গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার যে পরিচিতি আছে তা তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর মনে হওয়ায় তিনি "ইণ্ডিয়ান থট এণ্ড ইটস্ ডেভেলপমণ্ট" নামে এক গ্রন্থ ১৯৩৬ সালে প্রকাশ করেন।

হাসপাতালের উন্নতির জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে ইউরোপের নগরে নগরে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধরতে হয়েছে কখনও অর্গান বাজিয়ে অথবা বক্তৃতা করে। জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে তিনি বারংবার আবেদন জানিয়েছেন মানবসেবার কাজে সাড়া দেবার জন্য কোথাও হয়ত সাড়া মিলেছে কোথাও হয়ত মেলেনি কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ সোয়াইৎসার আজও নিরলস। মানব সেবা তার ধর্ম।

১৯৪৯ সালে গ্যেটের দ্বিশতবার্ষিক মহোৎসব উদযাপিত হয় কলোনের আসপেন্ সহরে। এখানে যোগদান করে বাথ্এর সঙ্গীতলহরীর যে নূতন ব্যাখ্যা অর্গানবাদনের সাহায্যে করেন তা এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এরপর কুলটুরফিলসাফির তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। সোয়াইৎসার এই খণ্ডটির জন্য মনে মনে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষত তখনও বিদ্যমান, এমত অবস্থায় তাঁর চিন্তাধারা জনমানসে কি প্রতিক্রিয়া ঘটাবে তার কোনও স্থিরতা ছিল না।

অদম্য প্রাণশক্তির উৎস সোয়াইৎসার ১৯৫২ সালে নোবেল কমিটির শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। সুখের কথা, কিন্তু তার সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি কি নোবেল কমিটির পূর্বাহ্ণেই দেওয়া উচিৎ ছিল না?

বয়সের ভারে সৌম্যদর্শন সোয়াইৎসার আজ অবনত, সেবাব্রতে নিষ্ঠ আত্মভোলা সন্ন্যাসী আজও মুমূর্ষুর চোখে আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। আমরা সেই বহুমুখী প্রতিভার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

নূতন গ্রন্থ :

হোয়াট হ্যাপেণ্ড অন দি বাউন্টি : ড্যানিয়েলসন।

কনটিকির কথা পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। ড্যানিয়েলসন সেই মহাসমুদ্র যাত্রার একজন অন্যতম দুঃসাহসী নায়ক। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশ করে ব্যারোর বিখ্যাত মিউটিনি অন দি গ্রন্থের কহিনীর সারবত্তার প্রতি ড্যানিয়েলসন কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত করেছেন। ব্যারো সেই বিখ্যাত নৌবিদ্রোহের যে ছবি একেছেন, কোথায় তার ঐতিহাসিক বিকৃতি ঘটেছে সেই কথাই ড্যানিয়েলসন হোয়াট হ্যাপেণ্ড অন দি বাউন্টি গ্রন্থে বলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তির পক্ষে তিনি যে সব মালমশলা যোগাড় করেছেন তা এক কথায় অকাট্য। অপরদিকে কনটিকি যাত্রার ফলে, দক্ষিণ

সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান গভীর সুতরাং ব্যারোর কাহিনীর দুর্বল অংশগুলির প্রতি তাঁর আক্রমণ যুক্তিসঙ্গত হয়েছে বলেই মনে হয়।

বাউন্টি বিদ্রোহের যে ইতিহাসানুগ কাহিনী ড্যানিয়েলসন বলেছেন তা তাঁর অনুসন্ধানী মনের পরিচায়ক এবং ইংরাজ নাবিকদের যে মনোবিশ্লেষণ করেছেন তা কৌতূহলোদ্দীপক। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ক্যাপ্টেন ব্লাই ড্যানিয়েলসনের বিবৃতিতে একান্ত নিষ্প্রভ। গ্রন্থটি বাউন্টি বিদ্রোহ কাহিনীর অপর একটি দলিল।

What happened on the Bounty : Bengt Danielson. George Allen & wnwin.

উপনিসদস্ গীতা এণ্ড দি বাইবেল : পারিণ্ডার।

তুলনামূলক ধর্মালোচনার জন্য যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন তা লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডণ জিওফ্রে পারিণ্ডার মহাশয়ের আছে। গ্রন্থটির নামেই বিষয়সূচীর পরিচয় নিহিত।

হিন্দু এবং খৃষ্ট ধর্মের তুলনামূলক বিচার বৃহৎ ব্যাপার, এবিষয়ে কোনও অমোঘ সিদ্ধান্তে পৌছানও অসম্ভব বলেই মনে হয়। তবু পারিণ্ডার সাহেবকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব, কারার ভারতীয় চিন্তাধারা ও খৃষ্টধর্মের শিক্ষা কোথায় একমত এবং কোথায় তা মেলে না তারই পরিচয় তিনি দেবার চেষ্টা করেছেন। সে প্রচেষ্টার মধ্যে কোনও ধর্মান্ধতার গন্ধ নেই, আছে এক জ্ঞানপিপাসু মনের পরিচয়।

Upanishads Gita and Bible. By Geoffrey Pariuder. 21s. Faber & Faber.

অজিতকুমার দাস

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী (প্রথম খণ্ড)॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়॥ বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৬ ॥ পাঁচ টাকা ॥

'পৃথিবীর কোনো কবি কোনো কালে বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজের অর্থ; সময়, সামর্থ্য ঢেলে দেননি। রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাহিত্যিক, সেখানে তিনি একক, নিঃসঙ্গ। কিন্তু যেখানে তিনি কর্ম সৃষ্টি করেছেন, সেখানে বহু মানবের অভ্যুদয় হয়েছে।"

রুক্ষ বীরভূমের প্রান্তরে অবস্থিত এক পল্লীর উপকণ্ঠে একদা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রম যে কোনো কালে বিশ্ববিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে পুষ্পিত হয়ে উঠবে, সেদিন সেকথা সম্ভবত কারো মনে উদিত হতে ভরসা পায়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিজকর্মে বিশ্বাসী; পরন্তু শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অন্যতর অভিজ্ঞান, স্বাধীন চিন্তাপ্রবাহকে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা পর্বের সাধকশিক্ষকগণ বহুমুখী প্রতিকূলতার মধ্যেও যেভাবে প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সদা তৎপর ছিলেন তার তুলনা বিরল। সৎ আকাঙ্ক্ষা, তৎসহ বিপুল সংগ্রাম সেদিনকার বৃক্ষ-শিশুকে আজ মহীরুহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে; রবীন্দ্রনাথের সত্যের সঙ্গে পরীক্ষার, সেদিনকার সংগ্রামের ফলশ্রুতি শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রজীবনীর দীর্ঘ চার খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের 'বাণীবিকাশের ইতিহাস' রচনা করেও মনে মনে স্থির নিশ্চিত ছিলেন যে তৎসত্ত্বেও কবিগুরুর শ্রেষ্ঠ রচনা বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের ইতিহাস যেন তেমন করে বলা হয়নি, সেক্ষেত্রে বিশেষ করে কবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ধ্যানস্থ নিঃসঙ্গতার সৃষ্টি কর্মের চিত্ররূপময় পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু 'যেখানে তিনি প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, সেখানে শত শত লোকের সহায়তা তাঁহাকে নিত্য যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে। জীবনের শেষপর্যন্ত পরমশ্রদ্ধাশীল আদর্শবাদী পুরুষের পাশাপাশি উদাসীন, শ্রদ্ধাহীন, এমনকি বিদ্রূপকারীদের প্রতিকূলতাকে স্বানুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সেই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের ইতিহাস কবিজীবনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই ইতিহাস রচিত হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে; কারণ বিশ্বভারতী তাঁহার ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ'।'

সেই 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যার মহাশয়ের 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী'।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর ইতিহাসকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় একদা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সম্পদ রবীন্দ্রজীবনীর পরিশিষ্টরূপে প্রকাশের ইচ্ছা লালন করেছিলেন; যেহেতু তিনি 'রবীন্দ্রনাথের সত্যের সহিত পরীক্ষার ইতিহাস'কে কবিগুরুর ব্যক্তি স্বরূপের বহুবিচিত্র পাশাপাশি কর্মসৃষ্টির বিপুল দিককেও একসূত্রে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। অবশ্য বর্তমান গ্রন্থটি স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হলেও, বলা বাহুল্য, বর্তমান গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে প্রভাতকুমারের সেই একদা লালিত ইচ্ছা অর্থাৎ রবীন্দ্র-

জীবনীরই পরিপূরক পূর্ণাঙ্গ পরিণতি। বর্তমান গ্রন্থে প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মহৎ ব্যক্তিসত্তার বহু অপ্রকাশিত, অনালোকিত জীবন ও কর্ম পরিচ্ছেদ, অর্থাৎ 'রবীন্দ্রনাথের সত্যের সহিত পরীক্ষার ইতিহাস'কে যথেষ্ট পরিশ্রম সহকারে প্রণয়ন করেছেন, 'প্রকৃত মূর্তি'প্রকাশ করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সুদীর্ঘকাল বর্তমান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন; শান্তিনিকেতনের রক্ত-মাংস প্রাণের সঙ্গে আছে তাঁর আত্মিক সম্পর্ক। অবশ্য তৎসত্বেও বিশ্বভারতীর 'প্রকৃত মূর্তি' সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধারণা একটু পৃথক। ভূমিকায় প্রভাতকুমার নিবেদন করেছেন: 'আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যেমন শুক্লপক্ষ তেমনি কৃষ্ণপক্ষ আছে। আমি এই গ্রন্থে সেই কথাই বলেছি যা' রবীন্দ্রনাথের সত্যের সহিত পরীক্ষার ইতিহাস। দেখা যাচ্ছে, স্কুল স্থাপন বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ ছক্‌কাটা ঘর ভরতি করলেই হয়। একটা কাগজের আঁচড়ে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান সেভাবে সরকারী অনুগ্রহে পুষ্টিলাভ করেনি বহু বৎসর। কবির নিজের অর্থ, বন্ধুদের অর্থ, ভিক্ষালব্ধ অর্থ, নৃত্যগীত, অভিনয় করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিশ্বভারতী চলে ত্রিশ বৎসর (১৯২১-১৯৫১)। এই অর্থ সব সময়ে ঠিকভাবে হয়তো ব্যয়িত হয়নি, সেটা অভিজ্ঞতার অভাব থেকেও বটে, পরীক্ষা করে দেখবার উৎসাহ থেকেও খানিকটা ঘটে।'

প্রভাতকুমার অবশ্য সেই সঙ্গে একটি সৎ প্রশ্নও তুলেছেন, 'ভারত স্বাধীনতা লাভের পর যে টাকা জলের মতো ব্যয়িত হচ্ছে, তার সবটাই কি ন্যায্য ব্যয়? মানুষের অভিজ্ঞতার অভাব তার একটা বড় কারণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানেও তাই ঘটেছে। আঙুল পুড়িয়ে শিখতে হয়েছে। আগুনে জ্বালা ধরেছে তবুও বারে বারে পরীক্ষা করতে হয়েছে। অপব্যয় করে জানতে হয়েছে ব্যয় সংকোচ করার প্রয়োজন। অযোগ্য মানুষের উপর ভার দিয়ে শিখতে হয়েছে যোগ্য লোকের প্রয়োজন কতটা। সবটাই যে শুভবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হয়েছে, তাও বলতে পারিনে।'

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বর্তমান গ্রন্থে (প্রথম খণ্ডে) শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর সূচনা এবং ইতিহাসকে তথ্যের বিন্যাসে উজ্জ্বল করে তুলেছেন। শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্যায়ের স্বর্ণময় দিনগুলি, সংগ্রামমুখর মুহূর্তগুলি; শিক্ষার প্রচলিত তৎকালীন প্রথাসিদ্ধ আদর্শবাদ ও প্রয়োগের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নিরন্তর সংগ্রাম, বিদ্রোহ তৎসহ ভারত জনমানসে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনাও প্রাণপ্রতিষ্ঠা বর্তমান গ্রন্থে শুধু মাত্র ইতিহাসের শরীর হয়ে দাঁড়ায়নি, নানা বিচিত্র সংগ্রামের স্মৃতিচিত্রণের মাধ্যমে জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে। প্রভাতকুমারের রচনার প্রাণ, কৃতিত্ব এইখানেই। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রাক্কালের শান্তিনিকেতন পর্যন্ত বর্তমান খণ্ডের সীমা। শান্তি-নিকেতনের পরবর্তী পর্যায় দ্বিতীয়খণ্ডে সম্ভবত লিপিবদ্ধ করা হবে। বর্তমান খণ্ডের উৎসুক পাঠক অবশ্যই পরবর্তী পর্যায়ের কাহিনীর জন্য অপেক্ষা করবেন। অবশ্য প্রথম পর্যায়ের তাৎপর্য যে নানাবিধ কারণে হিরণ্ময় ও উল্লেখ্য, জানিনা পরবর্তী কালের সরকার অপারদাক্ষিণ্য ও রীতি প্রয়োগ উৎসাহী মনকে কতখানি গভীরে টানতে সহায়ক হবে, যেহেতু হৃদয়ের উত্তাপ ও শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ এক বৃক্ষের অভিন্ন ফল নয়।

প্রভাতকুমারের চোখের আলোয় শান্তিনিকেতনের বাল্যকাল, কৈশোর এবং বিশ্বভারতীর

সূচনাপূর্ব, ঘটনা, বিচিত্র অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের প্রকাশ; মহাশিল্পীর মহাভাবনা, মহাজীবনের মহাকীর্তির প্রথম প্রথম প্রহরের কথা ও কাহিনী সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বর্তমান গ্রন্থে।

গ্রন্থটি পাঠে শান্তিনিকেতন এবং সেই বিশ্বভারতী সংক্রান্ত অনেক তত্ব ও তথ্য অনুসন্ধিৎসু পাঠক জানতে পারবেন। গ্রন্থটি পাঠে আমরাও তৃপ্ত হয়েছি। গ্রন্থটি শুধুমাত্র স্মৃতি নয়, এবং শুধুমাত্র তথ্যাকীর্ণ ইতিহাসও নয়, পরন্তু প্রভাতকুমারের একান্ত আপন তথ্যবিন্যাস প্রক্রিয়ায় এটি রবীন্দ্রশিক্ষা চিন্তার বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত হবে।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

শিশির সান্নিধ্যে ॥ রবি মিত্র ও দেবকুমার বসু। গ্রন্থজগৎ ৬, বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ ॥ ছয় টাকা ॥

ছোটবেলায় বাবার কাছে অভিনয়ের গল্প শুনতাম—'সীতা' নাটকের অভিনয়ের নিখুঁত বর্ণনা রসময় অভিব্যক্তিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতো। উৎসাহের প্রাবল্যে বাবা গেয়ে উঠতেন—

কোথায় সীতা কোথায় সীতা
জ্বলছে প্রাণে স্মৃতির চিতা
অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রুবাদল ঝরে…

আর তারপর রামচন্দ্র বেশী শিশিরকুমারের গল্প বলতেন। নট শিশিরকুমার, রসজ্ঞ পণ্ডিত শিশিরকুমার আমার মনের কৌতূহল ধর্মিতার সঙ্গে এমনি করে মিশে গিয়েছিলেন। এরপরে কলকাতায় এসেছি, শ্রীরঙ্গমে সধবার একাদশী দেখেছি—নিমে দত্ত যেন ১৯ শতকের বিষামৃত পান করে পক্ষহীন মৈনাকের মত চোখের সামনে একটি যুগ স্পন্দনকে মূর্ত করে দিয়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে প্রফুল্ল দেখেছি, উত্তর কলকাতার এক রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে চিরকুমার সভা দেখেছি। শেষ পর্যন্ত মনে হয়েছে, নাটক সত্যিই স্বরলিপি, উপযুক্ত গায়ক যেমন স্বরলিপির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, সুঅভিনেতাও তেমনি নাটকের প্রাণধর্মকে প্রকটিত করেন।

দেশকালের ধারায় নিজের চিন্তাও চেতনার সংযোগ রাখতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে বাংলা দেশের নবযুগে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের দান অসামান্য, মনে হয়েছে অধুনা প্রবাহিত বঙ্গসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ শিশিরকুমার। বাংলাদেশ তার এমন এক সন্তানের জন্য গর্ব বোধ করতে পারে। অবশ্য বিভিন্ন সংস্কৃতিবান ব্যক্তির কাছে আমার ধারণার আনুকূল্য পেয়েছি। এই সঙ্গেই মনে হয়েছে শিশিরকুমার কোন স্থায়ী কীর্তি রেখে যাচ্ছেন না, আমাদের দেশে রঙ্গমঞ্চের প্রাত্যহিক ইতিহাস নেই এবং আমরা কোন কিছুকে বিস্মৃতির অন্তরালে পাঠাতে বিশেষ কুণ্ঠিত নই—নই কেন না দেশ ও জাতিকে কেন্দ্র করে আমাদের গর্ববোধ চেতনার গভীরে শেকড় গাড়ে নি। বিশেষতঃ আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চ 'হাজার রজনী'র

আলোক প্লাবনে অতীত ইতিহাসের সলিল সমাধি রচনা করার যথেষ্ট উপযোগী। এক্ষেত্রে শ্রীরবি মিত্র ও শ্রীদেবকুমার বসুর উদ্যম ও প্রয়াস নব ইতিহাস রচনা করেছে। বিস্মৃতির কাল গর্ভে একটি প্রচণ্ড প্রাণশক্তি যাতে অবহেলে মিলিয়ে না যায় তার মধ্যে 'শিশির সান্নিধ্য' যেন ভিত্তিস্থাপর কাজ শুরু করেছে। গ্রন্থখানির পরিচয় ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকায় সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। পড়তে পড়তে মনে হয়েছে বইখানি যেন শিশিরকুমারের শেষ জীবনের প্রতিটি নিশ্বাসে স্পন্দিত—স্মৃতিচারণা, নতুনের প্রতি আগ্রহাতিশয্য, বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে সমৃদ্ধ করার বলিষ্ঠ স্বপ্ন—সমস্ত কিছুই শিশিরকুমারের নিজস্ব ভঙ্গিতে রূপ লাভ করেছে। বাংলা নাটক এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র উৎসাহ আছে এবং যাঁরা বাংলাদেশকে জানতে চান তাঁদের কাছে বইখানি অপরিহার্য।

গ্রন্থখানির মধ্যে নাটকাভিনয় সম্পর্কে শিশিরকুমারের ধ্যান ধারণা আলোক রশ্মির মত বিচ্ছুরিত হয়েছে। এগুলি একত্রিত করে প্রয়োগগত দিক থেকে এদের মূল্য নিরূপণ করার দায়িত্ব শিশিরকুমারের উত্তর সাধকদের নিতে হবে। বাংলাদেশে অপেশাদারী বিভিন্ন সম্প্রদায় অভিনয় সম্পর্কে নিত্য নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন—সম্প্রদায়গুলিকে সংহত প্রচেষ্টায় কার্যকরী করলে বাংলাদেশের অভিনয় কলা এবং নাট্যসাহিত্য যুগপৎ আশাতীত ফললাভ করবে বলেই মনে হয়। এক্ষেত্রে শিশিরকুমারের স্বপ্নকে রূপ দেওয়ার কথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে উঠতে পারে। তাঁর স্বপ্ন ছিল 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চের' প্রতিষ্ঠা। এ স্বপ্ন সার্থক করার দায়িত্ব সমকালকেই দিতে হবে। আর, এ সমস্ত তথ্য ও ধারণা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে।

এই সূত্রে আর একটি কথা না বলে পারছি না; নব্য বাংলা নাট্য পরিষদ তার সিদ্ধির দ্বারপ্রান্তে উপনীত না হলে শিশিরকুমারের কাজ অনারব্ধ থাকবে। আমার মনে হয় 'শিশির সান্নিধ্যে' শিশির স্মরণের সে ভূমিকা রচনা করেছে তার ধারা অব্যাহত রাখতে হলে পরিষদকে আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। অভিনয়, নাটক প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা, রঙ্গ জগতের পরিচায়িকা স্বরূপ পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতির দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে শিশির-অনুসন্ধানের ব্রত গ্রহণ পরিষদের আবশ্যিক কর্তব্য হওয়া প্রয়োজন। শেষোক্ত কাজের জন্য বিশেষ তৎপর হওয়া দরকার। শিশিরকুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে জানেন এমন ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্যাদি সত্বর সংগ্রহ করতে না পারলে ভরাডুবির সম্ভাবনাই বেশি।

আগেই বলেছি, বইখানি যেন শিশির পরিচয়ের প্রারম্ভিক ভূমিকা মাত্র—এ কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব যদি লেখকদ্বয় গ্রহণ করেন তবে বিলুপ্তির হাত থেকে অনেক কিছু তাঁরা রক্ষা করতে পারবেন। এই বই সম্পর্কেও একটি কথা বলা দরকার, এখানে এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে যেগুলি অনেকেরই অজানা, সেগুলি সম্বন্ধে পরিচায়িকা সংযুক্ত করলে ভালো হয়। শিশিরকুমারের অভিনয়ের তালিকায় শ্রীরঙ্গম পরবর্তী যুগটি বিশেষভাবে সংযুক্ত হওয়া প্রয়োজন—এই তালিকা প্রস্তুত যত সত্বর সম্ভব করা দরকার।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
SADHANA
DASAN
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

একাদশ বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৭০
সমকালীন

কলিঙ্গ টিউব্‌স
জল ও গ্যাসের জন্য
কলিঙ্গ টিউব্‌স লিমিটেড্
৩৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
কারখানা :
চৌদুয়ার, কটক, উড়িষ্যা।
KALPANA
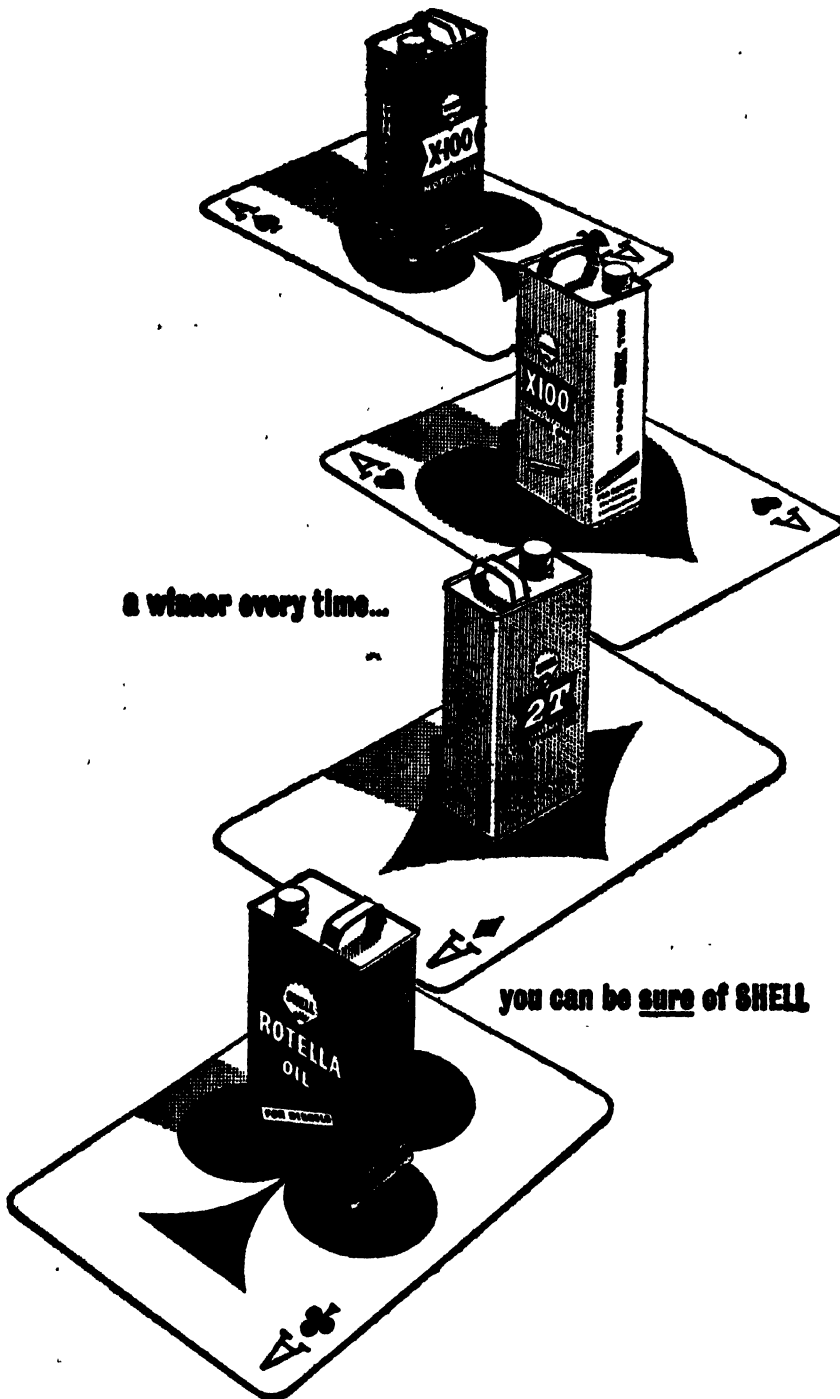
X100
X100
2T
ROTELLA
OIL
a winner every time...
you can be sure of SHELL

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হ'লে
আপনিও শুনবেন
"বাঃ সত্যই সুদর্শন"
রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সংযত সুন্দর ও মসৃণ করে এবং
কেশমূল সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে
কেয়ো- কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে
ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।
কেয়ো-কার্পিন
মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল
দেজ মেডিকেল স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী · কটক

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার
কামড়ে আশুফলপ্রদ,
কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায়
কার্যকরী। ঘর, মেঝে
ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত
রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

৫৫, ১১০, ৪৫০ মিলি বোতলে ও ৪.৫ লিটার টিনে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

LEX
LEX
LEX
লেক্স
আপনার
মনে ধরবে!
২০টি ৭০ ন.প.
দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো
কোম্পানি অব ইণ্ডিয়া লিঃ

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

শারদীয় সম্ভাষণ...
PHILIPS

চুল সম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত?

লক্ষ্মীবিলাস আপনার
সকল সমস্যার
সমাধান করবে।
লক্ষ্মীবিলাস
তেল
এম. এল. বসু এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লি
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা—

ভারতীয় মুদ্রনশিল্পে

একটি পরিচিত নাম

৬/এ এস্‌. এন্‌. ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা-১৩

রবিন
ব্লু
Robin Ultramarine
সাদাকে
ধবধবে
ARBC-22A BEN

লিপটন
LAOJEE
লাওজী
চা
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
LIPTON'S
LAOJEE
THE DUST TEA
FOR THE HOTEL
লাওজী
চা
LAOJEE
কম দামে
সেরা চা

He is relaxing at ease unmindful about the condition of his suit. He knows well that the cloth is Crease-Resistant.

Gwalior Rayon

SUITINGS

are indeed a boon for fashion-loving gentlemen. Fast colour, light weight and last but not the least 'Easy-to-care' are some of the qualities that count to make them the most distinguished suitings of the day.

কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।

একাদশ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আশ্বিন তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আশ্বিন
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভারতের জনসমস্যা

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

আয়তনে ভারত। জনহীন দ্বীপ ও বসতিহীন মেরু অঞ্চল বাদে পৃথিবীতে ভূমির মোট পরিমাণ সওয়া পাঁচ কোটি বর্গমাইল। অন্তর্দেশীয় খাল বিল নদী হ্রদ সাগর এই হিসাবের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সমগ্র ভূভাগের অর্ধেক আছে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও অষ্ট্রেলিয়া—এই ছয় রাষ্ট্রের অধিকারে। অপরার্ধ প্রায় দেড়শ রাষ্ট্র ও অঞ্চলে বিভক্ত। এদের মধ্যে ভারত আকারে সবার চেয়ে বড়ো। পৃথিবীর ভূমির ১৬·৫ শতাংশ সোভিয়েট ইউনিয়নে, ৭·৩ শতাংশ কানাডায়, ৭·২ শতাংশ চীনে, ৬·৯ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ৬·৩ শতাংশ ব্রেজিলে এবং ৫·১ শতাংশ আছে অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতের ভাগে পড়েছে মাত্র ২·৪ শতাংশ ভূমি, চীনের ঠিক এক তৃতীয়। জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের আয়তন ১১,৭৮,৯৯৫ বর্গমাইল। আকারে ভারতের স্থান পৃথিবীতে সপ্তম।

জনসংখ্যায় ভারত। পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা কমবেশী তিনশ কোটি। জনসংখ্যায় চীনের স্থান প্রথম, ভারতের স্থান দ্বিতীয়। চীনে লোক প্রায় ৭০ কোটি, ভারতে ৪৪ কোটি। ভারতের তিন গুণ বড়ো দেশে বাস করে ভারতের দেড়গুণের কিছু বেশী লোক। মোটামুটি হিসাবে পৃথিবীর ২৩ শতাংশ লোক চীনে, ১৫ শতাংশ ভারতে, ৭·৩ শতাংশ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, ৬·১ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২·২ শতাংশ ব্রেজিলে, ০·৬ শতাংশ কানাডায় এবং ০·৩৭ শতাংশ অস্ট্রেলিয়ায় বাস করে।

অস্ট্রেলিয়া ভারতের দ্বিগুণের চেয়ে বড়ো। সেখানকার অধিবাসীর সংখ্যা চব্বিশ পরগণা নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার মোট জনসংখ্যা থেকে দু'লক্ষ কম। কানাডা ভারতের তিন গুণের চেয়ে বড়ো। সেখানে চব্বিশ পরগণা মেদিনীপুর বর্ধমান বীরভূম ও হুগলী জেলার সমান সংখ্যক লোক বাস করে।

ভারতের আড়াই গুণের বেশী ব্রেজিলের আয়তন। সেখানকার লোক সংখ্যা বিহার উড়িষ্যার সংখ্যার সমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আয়তনে প্রায় তিনটি ভারতের সমান। সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকার চার রাজ্য, পাঞ্জাব উত্তর-প্রদেশ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে যত লোক বাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী সংখ্যা তার চেয়ে বেশী নয়। সাতটি ভারতের সমান সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে মাত্র ভারতের অর্ধেক লোক। কমিউনিষ্ট চীনের আয়তন ভারতের তিন গুণ। সেখানে লোক ভারতের জনসংখ্যার দেড়গুণের চেয়ে কিছু বেশী।

বসতির ঘনতায় ভারত। হিসাবে দেখা যায় ভারতের সমপরিমাণ ভূমিতে অধিবাসীর সংখ্যা চীনে ২৩ কোটি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ, সোভিয়েট ইউনিয়নে ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৪০ হাজার, ব্রেজিলে ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৭৫ হাজার। কানাডায় ৬৭ লক্ষ ও অস্ট্রেলিয়ায় ৪৭ লক্ষ ৯৫ হাজার।

মোটামুটি হিসাবে প্রতি বর্গমাইলে অস্ট্রেলিয়ায় বাস করে গড়ে ৩'৫ জন, কানাডায় ৪'২, ব্রেজিলে ২০, সোভিয়েট ইউনিয়নে ২৩, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮, চীনে ১৭২ আর ভারতে ৩৭৩।

আকারে সব চেয়ে বড়ো পৃথিবীর সাত রাষ্ট্রের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেল ভারত আয়তনে সবার ছোট, লোক সংখ্যায় তার স্থান দ্বিতীয় আর বসতির ঘনতায় অন্য ছয় রাষ্ট্রকে বহু পিছনে ফেলে রেখে ভারত অবাঞ্ছনীয় প্রথম স্থান লাভ করেছে। ভারতের ভূমির উপর জনতার এই অতি চাপ রয়েছে দেশের বহুবিধ সংকটের মূলে।

হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, পূর্ব জার্মানি, জাপান, যুক্তরাজ্য, পশ্চিম জার্মানি ও ইতালীর ঘনতা ভারতের ঘনতা অপেক্ষা বেশী। কিন্তু এই সাত রাষ্ট্রের উপনিবেশ আছে বা ছিল। উপনিবেশের ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ এসব দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে আসছে বহুকাল ধরে। সব কয়টি দেশই শিল্প ও বাণিজ্যে উন্নত। শিল্প ও বাণিজ্যের সুদূর প্রসারী হস্ত সারা পৃথিবী থেকে এদের জন্য সম্পদ আহরণ করে থাকে। শিল্পায়নের পথে যাত্রা সুরু হলেও কৃষিই এখনো ভারতবাসীর প্রধান অবলম্বন। কৃষিক্ষেত্রের আয়তন সীমায়িত, উৎপাদন অপ্রচুর, অথচ দ্রুত বিরামহীন গতিতে দেশে লোক বেড়েই চলেছে।

লোক বৃদ্ধি। ১৯৬১ সনে যে দশক শেষ হয়েছে সেই দশকে ভারতে লোক বেড়েছে ৭ কোটি ৮১ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশে যত লোক তার চেয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ বেশী। এই বৃদ্ধি ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে-এর মোট জনসংখ্যার দেড়গুণ। দশকের প্রতি বছরে গড় বৃদ্ধির পরিমাণ ৭৮ লক্ষের বেশী। বেলজিয়ামে যত লোক ভারতে প্রতি বৎসর তত লোক বাড়ে। এদেশে প্রতিদিন লোক বাড়ে ২১,৪০০।

লোকবৃদ্ধির বার্ষিক শতকরা হার ১৯২১-৩১ দশকে ছিল ১'১, ১৯৩১-৪১ দশকে ১'৪২, ১৯৪১-৫১ দশকে ১'৩৩ এবং ১৯৫১-১৯৬১ দশকে তা অকস্মাৎ উঠে গেছে ২'১৫ শতাংশে। এই অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরই বৃদ্ধি। উপরের হিসাবে দেখা যায় ভারতের বৃদ্ধি গত দশক ছাড়া আর কখনো ১'৪ শতাংশের বেশি হয়নি। হঠাৎ ১৯৫১-৬১ দশকে বৃদ্ধির হার ০'৮২ বাড়ে কি করে? জন্ম বেড়ে গেছে এমন কথা বিজ্ঞান সমর্থন করবে না। প্রকৃতির রাজ্যে খেয়ালের ঠাঁই নেই। নিয়ম ভংগ করে জন্ম বাড়তে পারে না। স্বাধীনতা

লাভের ফলে মৃত্যু কমেছে এ কথা ঠিক। দুর্ভিক্ষে বা অনাহারে মৃত্যু এখন সেকেলে কথায় পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির ফলে শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতাল, শ্রমিক বীমা প্রভৃতি স্বল্পবিত্তদের রোগের চিকিৎসা সহজসাধ্য করেছে। কলেরা বসন্ত ও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়ে উঠেছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির সংগে সংগে আয়ু বেড়ে চলেছে। তিন কুড়ি দশ বৎসর পর যাদের পরলোক-গমন করা উচিত ছিল তারা এখন দণ্ডপাণি হয়ে ঘুরে বেড়ায় অথবা রকে লেকে পার্কে ও গাছ তলায় বসে স্মৃতি মন্থন করে সমবয়সীদের সঙ্গে ভাববিনিময় করে থাকে। সংসার থেকে অবসরপ্রাপ্ত এদের দল ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। যাদের বিদায় নেবার কথা তারাও যদি থেকে যায় তবে লোকের ভিড় বাড়বে বই কি। জন্মের হার স্থির থেকে যদি মৃত্যু হ্রাস পায় তবে লোক বৃদ্ধি হয়।

স্বাধীনতা অর্জনের সাড়ে তিন বৎসর পরে ১৯৫১ সনে জনগণনা হয়েছিল। এ কয়বৎসর কেটে গেছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অশান্তি উদ্বেগের মধ্য দিয়ে। উদ্বাস্তু সামলানো ছিল তখনকার অন্যতম প্রধান সমস্যা। দেশের প্রকৃত উন্নতির কাজ অগ্রসর হয়েছে ১৯৫১-৬১ দশকে। এ দশকেই মৃত্যু কমেছে বেশি। মৃত্যু হ্রাস ছাড়া আরো কয়েকটি কারণ ১৯৬১ সনে জনসংখ্যা স্ফীত করতে সাহায্য করেছে।

আঞ্চলিক সীমা সুনির্দিষ্ট হওয়া, যাতায়াতের পথ সুগম হওয়া এবং গণনার সুষ্ঠু ব্যবস্থার জন্য ১৯৫১ সনে বাদ-পড়া অঞ্চলগুলি ১৯৬১ সনের গণনায় ধরা পড়েছে। পর্তুগীজদের কবল থেকে মুক্ত অঞ্চল এবং পণ্ডিচেরি মোট সংখ্যার সংগে যোগ করেছে ১০,৫৪,০২০। ১৯৫১ সনে পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ৬৬,৫০,৬৬৪। তখন পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে লোকবিনিময় হয়েছিল বলা যেতে পারে। তাই উদ্বাস্তুর প্রভাব পাঞ্জাবের জনসংখ্যায় পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৪১ সনের সংখ্যা থেকে ১৯৫১ সনে পাঞ্জাবের লোকসংখ্যা কম দেখা গেছে। বহু উদ্বাস্তু পাঞ্জাবে না গিয়ে দিল্লি ও অন্যান্য অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল। তবে এ কথা ঠিক যে পাঞ্জাবে যেমন লোক এসেছিল তেমন সেখান থেকে পাকিস্তানে সরেও গিয়েছিল। পূর্বাঞ্চলের অবস্থা তা নয়। এখানে এসেছে বেশি, পাকিস্তানে গেছে খুব কম। পাকিস্তানে যাওয়া পরে বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু পাকিস্তান থেকে আসা এখনো অব্যাহত রয়েছে। আসাম ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২৫,০০,০০০। এ দশকে সে সংখ্যা হয়ত হবে ২০ লক্ষ। এ দেশ ত্যাগ করে যারা পাকিস্তানে চলে গেছে তাদের সংখ্যা নগণ্য। সুতরাং পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুগণ ভারতে লোক বৃদ্ধি করেছে বিপুল পরিমাণে। ভারত যেন নেপালি ও তিব্বতিদের এক শরণার্থী শিবির হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মদেশ সিংহল, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকার বহু ভারতীয় দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এরা সবাই ভারতের মোট জনসংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নেপালি ও সিকিমিদের অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র ভারত। তারা কাজের সন্ধানে এসে এদেশকেই স্থায়ী বাসভূমি করে থাকে। হিন্দুদের পাকিস্তান ত্যাগের ফলে মুসলমান শ্রমজীবী, কারিগর ও ছোট ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছে। তাই তারা নানা ঝুঁকি নিয়ে গোপন পথে ভারতে অনুপ্রবেশ করে থাকে। আসাম ত্রিপুরা ও

পশ্চিম বঙ্গে এই অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা নাকি এখন সাত লক্ষ। ১৯৫১ সনে পাকিস্তানী নাগরিকের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গেই ছিল পাঁচ লক্ষ কুড়ি হাজার। সে বৎসর নেপাল ও সিকিমের নাগরিক পশ্চিমবঙ্গে ছিল প্রায় একলক্ষ।

উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্ত অসংগত হবে না যে ১৯৫১-৬১ দশকের বৃদ্ধির মধ্যে অন্ততঃ ৫০ লক্ষ লোক স্বাভাবিক বৃদ্ধির আওতার বাইরে পড়ে। এ বৃদ্ধি আকস্মিক এবং বহুলাংশে নিবার্য।

সমস্যা। জনসমস্যা দুইরূপ, স্বল্পজনতা ও অতিজনতা। শত্রুর আক্রমণ আশঙ্কা করে কোনো কোনো জাতি তার জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজন বোধ করে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়পূরণের উদ্দেশ্যে ইউরোপের কয়েক দেশে সন্তানের জননীদের প্রত্যেক নতুন সন্তানের জন্য বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ জনবিরল অষ্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক নারীর কাছ থেকে দশটি সন্তানের জননী হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করবে বলে এদল সংকল্প গ্রহণ করেছে।

ভারতীয় আর্যরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যদের মুখোমুখি হয়েছিল তখন তারা নতুন উপায়ে তাদের সংখ্যাল্পতা দূর করবার চেষ্টা করে। পুৎ নামে এক নূতন নরক সৃষ্টি হলো। পুত্রহীন ব্যক্তিরা পিণ্ড না পেয়ে এ নরকে গমন করবে বলে জানিয়ে দেওয়া হল। তাই পিণ্ডের জন্য পুত্র, পুত্রের জন্য ভার্যা গ্রহণ হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য। স্বল্পজনতার আমলে রচিত বিধি বর্তমান অতিজনতার যুগেও হিন্দুসমাজে বিবাহের প্রেরণা যোগায়।

আধুনিক ভারতের সংকট সৃষ্টি করেছে তার অতিজনতা। ১৯৬১ সনে ভারতে লোক ছিল ৪৪ কোটি। ১৯৫১ সনের সংখ্যা দশ বৎসরে প্রায় ৮ কোটি বেড়ে গেছে। এই হারে বাড়তে থাকলে ১৯৭১ সনে ৫২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। তারপর আরও বেশী, আরও বেশী। এত লোকের অন্ন বস্ত্র বাসগৃহ আসবে কোথা থেকে। ভারতের বাইরে কোন দেশে ভারতবাসীদের ঠাঁই নেই। যেখানে যারা ছিল তারা ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতের বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন কাজ সুরু হয়েছে। কিন্তু লোক বৃদ্ধির সমান তালে উৎপাদন বৃদ্ধি কোন সময় সম্ভব হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ গভীর। যেমন চলছে তাতে দারিদ্র্য ও অনাহার নিবারণ করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয়।

সমস্যা সমাধানের উপায়। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ভারতের সমস্যা পৃথিবীর ভাবী জনসমস্যার এক সংক্ষিপ্ত রূপ। অন্য দেশে যে সমস্যা দেখা দেবে কিছু দিন বাদে, ভারতে এখনই তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। যে হারে দেশে দেশে, বিশেষত এশিয়া আফ্রিকায়, লোক বাড়ছে, তাতে কিছু মানুষ অনাহারে মরবে তা একরূপ সুনিশ্চিত। একথা জেনে আমাদের কোন লাভ নেই।

এক দল বলেন, সমস্যা মোটেই জনসমস্যার নয়, এ শুধু নিম্ন উৎপাদন ও অসম ভূমি বণ্টনের সমস্যা। কথা সত্য হলেই বা কি। কোন্ বিনোবাজী পদযাত্রায় বেরিয়ে পৃথিবীর অর্ধাংশের ভূস্বামী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়াকে ভূমিহীন ভারতীয়দের অনুকূলে ভূদানে রাজী করাবে? বিরাট দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক।

তৃতীয় দল বলেন, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার সাহায্যে মরুভূমি সমুদ্র থেকে মানুষের আহার্য সংগ্রহ করা সম্ভব। ইস্রায়েলের মতো আমাদের থর মরুভূমি কোন্ কালে ধন ধান্য পুষ্পে ভরে উঠবে আর কবেই বা আরবসাগর ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর আমাদের খাদ্যভাণ্ডারে পরিণত হবে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকা চলে না। ভারতের সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন।

জনবিজ্ঞানী ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেন, তিন সন্তানের জনকদের অস্ত্রোপচারের সাহায্যে বন্ধ্য করে দিলে পনেরো বৎসরের মধ্যে ভারতের জনসমস্যার সমাধান হতে পারে। তিনি বিশেষজ্ঞ, তাঁর হিসাবে ভুল থাকার কথা নয়। কিন্তু ৫,৬৭,০০০ হাজার গ্রাম ৪২,০০০ শহরে ছড়িয়ে থাকা কমপক্ষে ১০ কোটি পিতার সম্মতি নিয়ে তাদের উপর অস্ত্র চালাতে কত বৎসর কেটে যাবে আর কত অর্থব্যয় হবে তার হিসাব তিনি দেন নি। সে হিসাবে হাত দেওয়া আনাড়ির পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে কয়েকটি কার্যকরী ব্যবস্থার প্রস্তাব করা বোধ হয় অন্যায় হবে না।

(১) ভারতে ৩২ কোটি লোক নিরক্ষর। সাক্ষরদের অনেকে পুস্তক পুস্তিকা বা পত্রিকা থেকে ভাব সংগ্রহে অক্ষম। রেডিওর মাধ্যমে প্রচার যত দ্রুত চলে অশিক্ষিত মন কোনো নতুন বিষয় তত দ্রুত গ্রহণ করতে পারে না। তা ছাড়া রেডিওর বক্তাকে প্রশ্ন করা যায় না। এতে রেডিওর প্রচারের উপকারিতা খানিকটা হ্রাস পায়। নিরক্ষররা নির্বোধ নয়। সমস্যাটি তাদের বোধ-গম্য ভাষায় তাদের কাছে উপস্থিত করা হলে তারা তা বুঝতে পারবে। বিয়ে করলে খরচ বাড়ে। সন্তান যত বেশি জন্মে খরচ তত বেশি বেড়ে যায়। আয় থাকে সমান। কাজেই প্রথম অর্থাভাব পরে অন্ন-বস্ত্রের অভাব ঘটে। সন্তান যত বেশি, পিতার বিত্ত ও জমির বণ্টন হয় তত বেশি। সন্তান কম জন্মালে দুঃখ ও দুর্ভাবনা অনেক কম হবে। এসব কথা বললে সবাই বুঝবে। এদের সহযোগিতা ছাড়া জন্মের হার হ্রাস করা যাবে না। গ্রামে গ্রামে নিরক্ষরদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানো হওয়া উচিত জন্মশাসনের প্রথম ও প্রধান কাজ।

(২) শর্দা আইন সংশোধন করে মেয়েদের বিবাহের নিম্নতম বয়স ১৪-র বদলে ১৮ করা উচিত। এতে চার বৎসর সন্তান জন্ম বন্ধ থাকবে।

গ্রামাঞ্চলে শর্দা আইন না মেনে ভংগ করাই হয় বেশি। বিবাহের বয়স ১৮ হলে তাও না মানার সম্ভাবনা থাকবে। যদি আইন করা যায় যে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রত্যেক বিবাহ রেজেস্ট্রী করতে হবে তা'হলে আইন ফাঁকি দেওয়া চলবে না।

(৩) সন্তানবান বিপত্নীক ও সন্তানবতী বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হলে শুধু জন্ম হ্রাস পাবে তাই নয়, বহু পারিবারিক অশান্তিতে বাধা পড়বে।

(৪) অল্পধী, রুগ্ন, পরিবার প্রতিপালনে অক্ষম ব্যক্তিদের বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এসব ব্যবস্থা অবলম্বন করে জন্ম হ্রাস করা সম্ভব।

দুর্বহ জীবনের অবসান ঘটাবার ব্যর্থ প্রয়াস এখন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য। দণ্ডের এই ধারাটি রহিত করা উচিত। বয়স যাদের সত্তর পার হয়ে যায় তাদের ইচ্ছামৃত্যু'র অধিকার দেওয়া ভালো। জরাজীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সংজ্ঞালুপ্ত অচল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের সুখমৃত্যুর ব্যবস্থা করে তাদের ও দেশের হিতসাধন করা যায়।

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

তেলুগু গীতাঞ্জলি ॥ আগে বলেছিলুম তেলুগু ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলির সংখ্যা চার। এই প্রস্তাবে তার সংশোধন প্রয়োজন। ললিতকলা অকাদেমীর রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে যে চারজন অনুবাদকের উল্লেখ আছে তাঁরা হলেন—কনকমেডল (প্রকাশকাল ১৯৫৪), সীতারাময্য শর্মা (প্রকাশকাল ১৯৫৫), বোম্মকন্টি বেঙ্কটসিংগারাচার্য (প্রকাশকাল ১৯৬১) এবং চলম্ (প্রকাশকাল দেওয়া নেই)। এই তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা তেলুগু গীতাঞ্জলির প্রথম প্রকাশকাল ধরেছিলুম ১৯৫৪। কিন্তু সিংগারাচার্যের গীতাঞ্জলির ভূমিকা থেকে অনেক নতুন কথা জানা গেল। ভূমিকাটি লিখেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন তেলুগু ছাত্র "রবীন্দ্রসঙ্গাগ্রগণ্য রম্যকবি শ্রীঅব্বূরি রামকৃষ্ণ রাও"।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই আদিপুডি সোমনাথ রাও অনূদিত তেলুগু গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়। এটি তাহলে কেবল তেলুগু ভাষার নয় বোধ করি ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে প্রথম অনূদিত গীতাঞ্জলি। সুতরাং তেলুগুর গৌরব বেড়ে গেল সন্দেহ নেই। সংখ্যার দিক থেকেও অন্য দক্ষিণী ভাষার তুলনায় তেলুগু গীতাঞ্জলির সংখ্যা সর্বোচ্চ—ছয়। খুব সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে (১৯৬২ সালে) ইলিন্দ্র রঙ্গনায়কুলু-কৃত অনুবাদ। আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে মাত্র তিনখানি—কনকমেডল, সিংগারাচার্য ও রঙ্গনায়কের অনুবাদ। প্রথম দুজনের রচনা পদ্যছন্দে, তৃতীয় ব্যক্তি লিখেছেন কাব্যধর্মী গদ্যে।

শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন তেলুগু ছাত্রদের মধ্যে অন্তত ছ'সাতজন ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। অব্বূরি রামকৃষ্ণের কথা পূর্বেই বলেছি। আর একজন হলেন ডক্টর গোপাল রেড্‌ডী, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রীরূপে যিনি আন্ধ্রপ্রদেশের বাইরেও সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু মজা এই যে, এঁদের মধ্যে কেউ গীতাঞ্জলি অনুবাদে অগ্রসর হন নি। তেলুগু গীতাঞ্জলির সব কটি অনুবাদ হয়েছে ইংরেজী থেকে। অথচ দক্ষিণ ভারতে বাংলা জানা কবি পণ্ডিতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তেলুগু ভূমিতে। আর, চারিটি রাজ্যের মধ্যে বাংলার নিকটতম প্রতিবেশী হল আন্ধ্রপ্রদেশ।

যাঁরা মনে করেন অনুবাদের অনুবাদ কখনো ভালো হয় না আমরা সে দলে নই। গীতাঞ্জলির ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি অধ্যক্ষ শ্রীনিবাস রাঘবন্ বাংলা না জেনেও ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে কয়েকটি কবিতার সুন্দর তামিল অনুবাদ করেছেন। আসল কথা, অনুবাদকের খানিকটা সৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি থাকা চাই। ভাষান্তর করতে গিয়ে মূলের যে সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে তার ক্ষতিপূরণ করা চাই মাতৃভাষার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য দিয়ে। তা যদি সম্ভব না হয় তবে অনুবাদকের নিরস্ত থাকাই সমীচীন। অন্যথায় মূল লেখকের প্রতি ভারি অবিচার করা হয়। তেমনি অবিচার হয়েছে কোনো কোনো তেলুগু গীতাঞ্জলিতে, যার ফলে এককালে বাংলা-অনভিজ্ঞ তেলুগু

কাব্যরসিক তেলুগু গীতাঞ্জলি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে মহৎ কবি বলে ভাবতে পারেন নি। সেই দুর্মর সংস্কার এখনও পুরোপুরি দূর হয়েছে বলে মনে হয় না। কথাপ্রসঙ্গে এক তেলুগু বন্ধু একদিন অকপট চিত্তে বলেছিলেন যে, সিংগারাচার্যের অনুবাদ (প্রকাশকাল ১৯৬১) পড়েই তাঁরা গীতাঞ্জলির মাহাত্ম্য প্রথম বুঝতে পারেন। তার আগে নয়। বিশুদ্ধ তেলুগুভাষীর পক্ষে গীতাঞ্জলি তথা রবীন্দ্রকাব্যের রসাস্বাদনে একটি ঐতিহাসিক অন্তরায়ও আছে। যিনি অনুপ্রাস-কণ্টকিত দাশু রায়ের রচনায় মশ্‌গুল, গীতাঞ্জলি তাঁর ভালো না লাগারই কথা। তেলুগু সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রিয় বস্তু হল 'অবধানম্'। এই সংস্কৃত শব্দটির মানে হল মনঃসংযোগ। অসাধারণ স্মৃতি-শক্তি নিয়ে একই সময়ে নানা বিষয়ে উপস্থিত বুদ্ধি-বলে পদ্যরচনা—এই হল 'অবধানম্'-এর মূল কথা। যাঁরা এই কাজ পারেন তাঁরা হলেন 'অবধানী'। শক্তিভেদে কবিরা অষ্টাবধানী, শতাবধানী ইত্যাদি নামে পরিচিত। ব্যাপারটা এইরূপ: অষ্টাবধানী কবি বসে আছেন, তাঁর চারদিকে আটজন 'পৃচ্ছক' বা প্রশ্নকর্তা। একে একে সকলেই প্রশ্ন করে যান। অতঃপর কবি পদ্য ছন্দে একে একে সকলের উত্তর-দানে উদ্যোগী হন। কিন্তু এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া চলে না। প্রথম পৃচ্ছকের প্রথম পঙ্‌ক্তি, অতঃপর দ্বিতীয় পৃচ্ছকের প্রথম পঙ্‌ক্তি, অতঃপর তৃতীয় ইত্যাদি করে চলতে থাকে। দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রেও এই পর্যায়। এইরূপে চার পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ হলে কবি তখন স্বতন্ত্রভাবে স্তবকগুলি আবার আবৃত্তি করে শোনান। আরও অনেক জটিল ব্যাপার আছে এর মধ্যে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পাঠক বুঝতে পেরেছেন যে, 'অবধানম্' হল সাংঘাতিক রকমের এক মানসিক কসরৎ, আর অবধানী কবি হলেন সার্কাস্ দলের সিংহ-ব্যাঘ্র-বেষ্টিত সুদক্ষ খেলোয়াড়। প্রত্যেক তেলুগু কাব্যরসিক অল্পবয়স থেকেই 'অবধানম্' কাব্যশৈলীতে আগ্রহশীল হয়ে ওঠেন। বর্তমান যুগে এই ধারা ক্ষীয়মাণ হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নি। ওস্‌মানীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তেলুগু অধ্যাপক ডক্টর দিবাকরল বেঙ্কটাবধানীই তাঁর সাক্ষী। এঁর পিতা ছিলেন তেলুগু সাহিত্যের এক প্রখ্যাত অবধানী। নাম, দিবাকরল তিরুপতি শাস্ত্রী।

এই তিরুপতি শাস্ত্রীর হাতে পড়ে আদিপুডি সোমনাথ রাও-র গীতাঞ্জলি। ইতিপূর্বে এই 'অবধানী' কবির কর্ণে রবি ঠাকুরের কবি-কীর্তির কথা পৌঁছেছে। শান্তিনিকেতন-ফেরৎ ছোক্‌রা গুলোও খুব 'ঠাকুর ঠাকুর' করে। কিন্তু তেলুগু গীতাঞ্জলি পড়ে নিরাশ হলেন তিরুপতি শাস্ত্রী। রবীন্দ্রভক্ত তেলুগু যুবকদের বললেন (ওঁদের মধ্যে আব্বুরি রামকৃষ্ণও ছিলেন)—"তোমরা বলে বেড়াও রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি, কিন্তু তাঁর গীতাঞ্জলির তেলুগু অনুবাদ পড়ে তো বোঝা গেল না তিনি কিসে বড়ো।" রামকৃষ্ণ রাও তখন মূল বাংলা, তার ইংরেজী অনুবাদ এবং তার দুর্বল তেলুগু অনুবাদকে পাশাপাশি রেখে রবীন্দ্র কাব্যের মহিমা বোঝাবার চেষ্টা করেন। 'অবধানী' কবি বুঝেছিলেন কিনা বলা কঠিন।

গীতাঞ্জলির তেলুগু পদ্যানুবাদে একটা বড় অসুবিধা হল তার ছন্দোগত ঐতিহ্য। প্রাচীন ছন্দের আধারে গীতাঞ্জলিকে ভরা যাবে না এ সত্যটুকু কনকমেডল, সিংগারাচার্য এবং রঙ্গনায়ক তিনজনেই বুঝেছিলেন। আধুনিক তেলুগু ক্যব্যরসিকেরা অবশ্য সিংগারাচার্যের অনুবাদকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। বস্তুত তেলুগু সাহিত্যে সিংগারাচার্যের খ্যাতি আজ অনেকটা

গীতাঞ্জলির উপরেই নির্ভরশীল, যদিও তাঁর অনুবাদ বাংলা থেকে নয়, ইংরেজী থেকে।

কন্নড অনুবাদক প্রহ্লাদ রায়ের মতো সিংগারাচার্যের গ্রন্থেও প্রতিটি কবিতার শীর্ষক দেওয়া আছে। 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' কবিতাটির শীর্ষক 'শ্রাবণনিশীথি', 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—'অভিসরণমু', 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য'—'না (=আমার) জন্মভূমি' ইত্যাদি। এ ছাড়া কতকগুলি কবিতা আবার সচিত্র, অনেকটা ওমর খৈয়ামী ধরণে। 'সে যে পাশে এসে বসেছিল, তবু জাগিনি' এই কবিতাটির সামনের পাতায় এক হতভাগিনী ঘুমন্ত রমণীর ছবি আঁকা হয়েছে; 'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' এই কবিতার অপর পৃষ্ঠায় আছে—নদীর জলে একটি রমণী প্রদীপ ভাসিয়ে দিচ্ছে, নিচে লেখা—'অঞ্জল দীপম্'। এমনি আরও কয়েকটি। তেলুগু পাঠকের সুবিধার জন্য প্রতিটি কবিতার নিচে মূল বাংলা গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে—নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি। মোট কথা গীতাঞ্জলির বহু অনুবাদের মধ্যে এটি একটি সুপরিকল্পিত গ্রন্থ।

কন্নড-র মতো তেলুগু কাব্যও সংস্কৃত তৎসম শব্দের বাহুল্যে কখনো কখনো গুরুগম্ভীর হয়ে ওঠে। গাম্ভীর্যের মাত্রাটা বোধ করি তেলুগুতেই বেশি। 'আজি শ্রাবণ-ঘন-গহন-মোহে' ইত্যাদি অংশের অনুবাদে কনকমেডল লিখেছেন—নিশ্‌শব্দমুগ শ্রাবণমেঘচ্ছায়লো…

সিংগারাচার্য লিখেছেন—

শ্রাবণাম্বুদ সান্দ্রনীলচ্ছায়বডি গনবডনি য়ডুগুল
নীরবাম্ব নিশীথি কৈবডি বারে দেদেসকো প্রভূ !

এ ছাড়া তেলুগু অনুবাদ থেকে টুকরো টুকরো ভাবে কতগুলি শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি আহরণ করা হচ্ছে বাংলার পাশাপাশি রেখে ওদের সংস্কৃতময়তা বোঝার জন্য। 'সোনার বরণ' = স্বর্ণকান্তি (কনকমেডল), কণককান্তি (সিংগারাচার্য)। 'রূপসাগর' = রূপসাগরমু (সিংগারাচার্য), রূপরত্ন-ভরিত সাগরাগাধমু (কনকমেডল)। 'জীর্ণ তরী' = শিথিল নৌক (কনকমেডল), বয়োবিকল নৌক (সিংগারাচার্য) ইত্যাদি।

যে সিংগারাচার্যের অনুবাদ পড়ে তেলুগু ভাষীরা গীতাঞ্জলির রসাস্বাদন করেন, আমরা বাঙালিরাও তা থেকে কিঞ্চিৎ রস-গ্রহণের চেষ্টা করিনা কেন ! সিংগারাচার্যের উৎকর্ষ বোঝার জন্য অন্য অনুবাদের নমুনাও কিছু কিছু দেখা দরকার। 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী, এই কবিতাটির প্রথমাংশের তেলুগু রূপ :

(১) নী আলাপন পদ্ধতিয়ে নাকর্থমগুট
লেদু প্রভু ; মৌনমু পুনিয়ে ত্রাগেদ
ননবরতমু নীদু দিব্যগাণ সুধারসমুনু (রঙ্গনায়ক)

(২) এন্ত মধুরমো এরুগলেনু নী পাট প্রভু
এন্তো মুগ্ধুডনৈ মৌনমুগ নাকর্নিংতু (কনকমেডল)

(৩) এনেরুংগ নাথ নীয় নুন গান শিল্পরীতি
মৌনমুদ্র নিলচি সম্ভ্রামানন্দাবশত বিন্দু (সিংগারাচার্য)

'তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি' ইত্যাদি অংশের তেলুগু রূপান্তর :

(১) অতনি মুদুপদমুল সন্নতি বিনলেদা
অরুদেঙ্কুচুণ্ডু নাতভতি নিশশবমুগ
যুগযুগমুনু প্রতিক্ষণমুনু রেববল্ল
নরুদেঙ্কুনাতভবন্তু মরুদেঙ্কু চুণ্ডু

(কনকমেডল)

(২) আলকিম্পু মালকিম্পু মদে স্বামি অডুগুল সডি
অরুদেঙ্কুডু নরুদেঙ্কুডু নরুদেঙ্কুডু সততমতডু।
পগলু লেদু রেয়ি লেদু
যুগযুগম্মু দিনদিনম্মু
নরুদেঙ্কুডু নরুদেঙ্কুডু নরুদেঙ্কুডু সততমতডু।

(সিংগারাচার্য)

সিংগারাচার্যের অনুবাদ থেকে এইটুকু বোঝা যায় (অর্থবোধ না হলেও ক্ষতি নেই) যে, অনুবাদক ইংরেজী গীতাঞ্জলির আশ্রয় গ্রহণ করলেও তার মূলরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আবশ্যক মনে করেছিলেন। তাই তাঁর অনুবাদের কোথাও কোথাও 'আক্ষরিকতা' ক্ষুণ্ণ হলেও মূলানুযায়ী ছন্দ হিল্লোল ও ধ্বনি-সম্পদের কিছু অভাব ঘটেনি।

সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গবীর কথা

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

নেহাৎ অজ্ঞাতকুলশীল না হলেও অনস্বীকার্য, ভারত-ইতিহাসের উপাদান সম্পূর্ণ নয়। সভ্যতার স্বর্ণালী সকালে ভাবসাধনা এবং কর্মসাধনার দ্বৈত সংযোজনে যে ভারতজন ছিল সম্যক্ সচেতন, ভাবতে অবাক লাগলেও এ বচন অনৃত নয়, কাব্যগাথার বঙ্কিমপথ ব্যতীত ব্যক্তি-অনুভূতি অনেক, অনেককাল অবধি সে ভারতজনে অব্যক্তই রয়ে গেছে। হ্যাঁ, রোজনামচা কিম্বা আত্মচরিত সত্যিই প্রাচীন ভারতে দুর্লভ সামগ্রী। এর মানে এই নয়, চরিতকথা ভারত-বিদ্যায় অনুপস্থিত। এ সিদ্ধান্তও আমার প্রতিপাদ্য নয়, চরিত চিত্রণে পূর্বজরা পরাঙ্মুখ। বরং মানতে প্রস্তুত, ইতিহাস প্রাচীন ভারতে অধীতব্য ছিল এবং পুরাণও অবহেলিত ছিল না। জানি মহাভাষ্যের ব্যাখ্যাতা কৈয়ট ইতিহাসকে বলেছেন 'পূর্বানচরিতম্' এবং পুরাণকে 'বংশান্বনুকীর্তনম্'। তবুও বলব, আমাদের ইতিহাসের উপাদান অসম্পূর্ণ। সাম্প্রতিক যুগমানসের আলোয় আত্মকথার অনাস্বাদন ইতিকথারই দৈন্য। স্বীকার করে নেওয়াই ভাল, ভারত-ইতিহাসে এ দৈন্য দুর্মর। হয়তো ইহলোকবিমুখ ভারতীয় দর্শনের প্রভাবই আত্মচরিতলিখনে অন্তরায় [কুলছাড়া চার্বাকপন্থীদের কাছে রোজনামচা প্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল। সন্দেহ হয়, পরমত অসহিষ্ণুদের দাপটে সে প্রত্যাশার মুখে ছাই পড়েছে] লক্ষণীয়, প্রাচীন কালেও সাগর পারে আত্মপ্রসঙ্গের স্বীকৃতি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বহির্ঘটনায় ভরপুর এবং রক্তরঙিল হলেও সযত্নসংরক্ষণহেতু ইতিকথার প্রথম পাতাটি অবধি সেখানে অবিকৃত ও অমলিন। তাই, সক্রেতিস-আরিস্ততল-প্লেটো য়ুরোপে অদ্যাপি গবেষণার বিষয় নয় বরং স্বয়ংপ্রকাশ। বস্তুমুখী জীবন দর্শনের বৈশিষ্ট্যই আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনোগত প্রভেদের কারণ।

• বঙ্গবীরকথা যেহেতু ভারত-ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত তাই অভিপ্রেত হলেও আত্মকথা বা রোজ-নামচার শরণ নেওয়া সম্ভব নয়। এবং লিখনলিপি বা মুদ্রা-সংকেত উদ্ধার অথবা প্রত্নদ্রব্যদর্শনের ব্যাখ্যা যেহেতু আমার অধিকারের বহির্ভূত অতএব নিছক মাধুকরীবৃত্তিযোগে দেবসাহিত্যের অমৃতশালা থেকে বঙ্গবীরপ্রসঙ্গ চয়ন করাই শ্রেয়। কেন না, উদ্ধার্য প্রসঙ্গ প্রায়শই সত্যের বিম্বন। আসলে সাহিত্য তো কিছু ভুঁইফোড় নয়, সমাজেরই দর্পণ। প্রারম্ভেই বলে রাখা ভাল, প্রসঙ্গটি প্রস্তাবনা মাত্র সুতরাং সম্পূর্ণ নয়। আরো একটি কথা এবং এখানেই, রাজশক্তির উদয়-বিলয়ের সঙ্গেসঙ্গে অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলারও মানচিত্রে রদবদল হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে গৌড়ীমূর্তিতে এই পরিবর্তনের প্রভাব প্রকট নয়। এখানেই বঙ্গজনের বৈশিষ্ট্য, তার অখণ্ডতাও এখানেই। তাই অঙ্গ-বঙ্গ কলিঙ্গ, পুণ্ড্র-সুহ্ম-তাম্রলিপ্ত এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের মধ্যে প্রভেদের প্রাকার তোলা অনাবশ্যক। অখণ্ড গৌড়বীর গাথাই তো বঙ্গবীর কথা।

ঐতরেয় আরণ্যকেই যাত্রা সুরু। কিন্তু শুভ নয়। আরণ্যকের ঋষি বললেন 'দুর্বলত্ব আহারত্ব' বঙ্গজন 'কাকচটকপারাবতাদি সদৃশ'। ঋষির এই অশোভন উক্তি স্বতঃস্বীকৃত নয়। আর্যকুলের রণদুন্দভি শস্যশ্যামলা বাংলার নদী সৈকতে ঠিক কবে নিনাদিত হয়েছিল কিম্বা আদৌ হয়েছিল কিনা,

না জেনেও বলা চলে ঐতরেয় আরণ্যক-উক্ত বঙ্গদেশ অনার্য-অধ্যুষিত ছিল। বাঙালীর আর্যমন্ত্রে দীক্ষা সম্ভবত কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের সৌজন্যে অষ্টম শতকেই সংঘটিত। আর্যদের অপরিহার্য চারিত্র্য সাহিত্যচর্চা বাংলায় অষ্টম শতকের এ পারে। জয়দেব, গোবর্ধনাচার্য, উমাপতি হলায়ুধ কিম্বা কুল্লুক ভট্ট কেউ-ই প্রাক্ অষ্টম শতকের নন। তাই অষ্টম শতকের অনার্যাবাস বাংলা দেশ এবং বাঙালীভীতি বেদে কিছু লুকোন ব্যাপার ছিল না। 'অন্যবাচ' 'অন্যদেবাঃ' ইত্যাকার শব্দপ্রয়োগ আসলে আর্যেতরদের সঙ্গে বৈদিকদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা। ঋগবেদে 'পণি' জাতির উল্লেখ দেখা যায়। বেদপন্থীদের সঙ্গে এদের ছিল অহি-নকুল সম্পর্ক। আচার-আচরণে বেদপন্থীদের সঙ্গে এদের কোন মিল ছিল না। এদের উপাস্য দেবতাও ছিল পৃথক্। পাখীকে টোটেম রূপে এরা পূজা করত। এটি অনার্যদের উপাসনার একটি চালু রীতি। সন্দেহ হয়, আরণ্যক-নিন্দিত কাকচটক পারাবতাদি সদৃশ বাঙালী এবং ঋগ্ বেদ-কথিত 'পণি' জাতির সম্পর্ক সুগভীর। আর একটু এগিয়ে বলতে ইচ্ছে করে, উপাস্যদেবতার সঙ্গে পূজকের অভেদ কল্পনা করা হয়েছে আরণ্যকে। এবং সেটি বিকারার্থেই। ঋগ্ বেদে যার আভাস তারই প্রকাশ আরণ্যকে। লক্ষণীয়, শুধু বেদেই নয় বোধায়নের ধর্মসূত্রে, সাংখ্যায়নের শ্রৌতসূত্রে, বিভিন্ন অলংকার শাস্ত্রে উপর্যুক্ত মনোভাব কার্যকর। স্মার্তেরা বলছেন তীর্থ ছাড়া বঙ্গকলিঙ্গে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আর গৌড়ী রীতির নিন্দায় ভামহ, দণ্ডী, বামন, রাজশেখর সকলেই হরিহর আত্মা। মনে হয়, বাণভট্টের হর্ষচরিত কিম্বা কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয়ে-ও উল্লিখিত প্রভাব সক্রিয়।

মহাভারত এবং তার পরিশিষ্ট বা 'খিল' স্বরূপ হরিবংশ কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল ব্যতিক্রম। মহাভারত হয়তো বেদব্যাসের ঐকিক কীর্তি নয়। হয় তো কোন এক যুগেও এটি রচিত নয়। তবু একটি ব্যাপারে ঐক্য লক্ষ্যণীয়—আমি বঙ্গবীরকথায় মহাভারতী বর্ণনাই উল্লেখ করতে চাই। গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে গৌড়বর্ণনায় আসা যাক। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব! অশ্ব বিচরণ করছে অবলীলায়। অপ্রতিহত তার গতি। অশ্ব উপস্থিত হল বঙ্গ ও পুণ্ড্রে। বঙ্গবাসী তাকে ছেড়ে দিল না বিনা বাধায়। বঙ্গবীরের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করতে হল বীরকেশরী অর্জুনকে। অতিকষ্টে উদ্ধার করলেন তিনি তাঁর বড় সাধের অশ্বটিকে।

আর একবার। বাংলার সাগরবেলায় এসেছেন দিগ্ বিজয়াকাঙ্ক্ষী ভীমসেন। হতে পারেন তিনি পরাক্রান্ত পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম। তবু বাংলা তাকে বাধা দিতে দ্বিধা করেনি। সুহ্মপতি (বর্তমান মেদিনীপুর) মোদাগিরির বলবত্তর রাজা (বর্তমান মালদহ), কৌশিকীচ্ছপতি (বর্তমান হুগলী) প্রভৃতি সমরনায়কগণ সসৈন্যে প্রতিপক্ষকে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন—বলদর্পিতের রণহুংকারে পিছু হটেন নি। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেও বঙ্গবীরগণ হাতগুটিয়ে বসেছিলেন না। প্রাগজ্যোতিষপতি ভগদত্ত দুর্যোধনকে সাহায্য করেছিলেন। পৌণ্ড্র, মৎস্য এবং তাম্রলিপ্তের রাজারাও সে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ভীষ্মবধ পর্বাধ্যায়ের একটি অংশ। ভীমপুত্র ঘটোৎকচ রণ-রণ রবে এগিয়ে আসছেন দুর্যোধনের দিকে। গজারূঢ় বঙ্গাধিপ তখন কার্মুকে শরসংযোগ করে ঘটোৎকচের পিছনে পিছনে ছুটেছেন তাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার জন্য। তিনি দুর্যোধনের দোসর। বন্ধুর অবশ্যম্ভাবী বিপদ স্মরণ করে নিজের কথা ভুলে গিয়ে মদমত্ত হাতিটি দিয়ে সযত্নে দুর্যোধনকে আগলে রাখলেন।

পরিণামে হাতটি মরল, কিন্তু দুর্যোধন রক্ষা পেলেন।

ভারত-কথার আর একটি অংশ। বীরচূড়ামণি কালগুণির বিক্রমে আর্যাবর্তের নৃপতিকুল থরহরিকম্প। সন্ত্রস্ত তারা ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের চরণতলে আনত। প্রার্থনা তাদের অন্য কিছু নয়, নিরাপদ আশ্রয়। প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য সমারোহে সুরু হল যজ্ঞ। রাজসূয় যজ্ঞ। হোতা স্বয়ং যুধিষ্ঠির। নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ আসন গ্রহণ করলেন। বাদ গেলেন না বঙ্গাধিপ, ডাক পড়ল কলিঙ্গেশ্বরের, আমন্ত্রণ পেলেন পৌণ্ড্রক বাসুদেবও।

ইচ্ছে হয় যাই চলে সেই স্বয়ম্বর সভায়। দেখি, সলাজ অথচ স্মিতাননা দ্রুপদ-দুহিতাকে, দ্রৌপদীকে। একে একে বীরাগ্রগণ্যগণ আসছেন লক্ষ্যভেদের জন্য, দ্রৌপদীকে লাভ করার জন্য। বলে না পারলেও ছলে পাবার, দ্রৌপদীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার তাঁদের কত না চেষ্টা! ব্যর্থকামীদের নম্র অথচ স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান জানাচ্ছেন পাঞ্চালী, করজোড়ে নমস্কার জানাচ্ছেন ব্যর্থমনোরথদের। খুঁজে ফিরছি পৌণ্ড্রক বাসুদেব, প্রাগজ্যোতিষপতি ভগদত্ত এবং কলিঙ্গাধিপকে। ওঁরা কি প্রথম রাউণ্ডে হেরে গিয়েছেন নাকি 'রাজা তো আমাদের মনে রেখেছেন'—এই ভেবেই আত্মতুষ্টি পাচ্ছেন?

হরিবংশের পৌণ্ড্র-নারদ সংবাদের বিরানব্বই অধ্যায়। দ্বারকা-অভিযাত্রী পৌণ্ড্রপতি। এক হাজার উট, এক হাজার ঘোড়া, আট হাজার রথ, অযুত হস্তী এবং অর্বুদপত্তি সংঘ নিয়ে এগিয়ে চলেছেন পৌণ্ড্রপতি। সঙ্গে চলেছেন একলব্য প্রভৃতি সমরনায়কগণ। বেজে চলেছে রণভেরী, মৃদঙ্গ, শংখ আর বেণু। ওদের মিলিত আওয়াজে আকাশ-বাতাস উদ্বেলিত। চতুর্দিকে ভয় লাগিয়ে যেন ধেয়ে আসছে ঊর্মিমালা। আলোয় আলোয় ভরে গেছে সাগরের তিমিরতীর। হরিবংশে পৌণ্ড্রপতি বাসুদেবের পুত্রকে বলা হয়েছে পৃথগক্ষৌহিনীপতি। সেকালে যার ২১৮৭০ হাতি, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ ঘোড়া এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক থাকত কেবল তাকেই অক্ষৌহিণীপতি বলা হত। সহজেই অনুমেয়, প্রাচীন পৌণ্ড্র কী অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। হরিবংশের ভবিষ্যপর্বে পৌণ্ড্রপতিকে পৃথিবীপতি বলা হয়েছে (গৌরবে সীমানা বৃদ্ধি নাকি!)

রুক্মিণীহরণপালা। নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হরণ করছেন লোকললামভূতা রুক্মিণীকে। শিশুপাল এবং জরাসন্ধ জনার্দন-হননে কৃতসংকল্প হয়েছেন। তাঁদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ এবং পৌণ্ড্রপতিগণ। তারাও, শুধু প্রতিবাদ নয়, এ অন্যায়ের প্রতিকার চান। দুর্ভাগ্যত, সম্মুখ সমরে বঙ্গরাজ বলরামের কাছে নিহত হলেন। জৈমিনী ভারতের ৪১—৪৬ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে তাম্রলিপ্তের রাজকুমার তাম্রধ্বজের বীরত্বের মহিমা। সম্মুখ সমরে কৃষ্ণার্জুন অবধি তাঁর প্রচণ্ড আঘাতে চৈতন্যহারা হন।

বঙ্গবীরকথা রামায়ণে সবিশদ না হলেও কালিদাসের রঘুবংশম্ এ প্রসঙ্গে উচ্চকিত। রঘুরাজ বেড়িয়েছেন দিগ্‌বিজয়ে। পথে পড়ল সুহ্মদেশ, তালীবনশ্যামল সাগরিকা সুহ্ম। রঘু আক্রমণ করলেন সুহ্ম এবং জয় করলেন। তা বলে সহজেই হার স্বীকার করলেন না সুহ্মপতি। সাধ্যমত রঘুরাজের বিপুল বাহিনীকে তিনি বাধা দিয়েছিলেন। সুহ্মজয়ের পর রঘুর লক্ষ্য বঙ্গদেশ। বঙ্গের নৌনায়কগণ নদীতে নৌকা সাজিয়ে রঘুকে প্রতিহত করল। কিন্তু অজেয় রঘু সর্ববিঘ্নবিনাশ করে

জয়ী হলেন। মহাকবি যিনি রঘু-বন্দনায় পঞ্চমুখ, স্বীকার করলেন বঙ্গবীরগণের নৌপটুত্ব: বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্। নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ পরবর্তী অভিযান কলিঙ্গ। সামনে রয়েছে কপিলা নদী। পার হতে হবে। পর পর হাতি দাঁড় করিয়েই একটি সেতু তৈরী করলেন রঘু। উৎকলরাজের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করে ধেয়ে গেলেন কলিঙ্গে। কলিঙ্গপতি সৈন্যশক্তিতে প্রতিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ কিন্তু বীর্যবত্তায় হীন নন। নারাচ নামক সাংঘাতিক অস্ত্রে রঘুকে তিনি ঘায়েল করতে চাইলেন—দ্বিষাং বিষহ্য কাকুৎ স্থস্তত্র নারাচ দুর্দিনম। অবশ্য পরিণামে রঘুই জিতলেন, কলিঙ্গও তাঁর বশ্যতা মেনে নিল। উপর্যুক্ত চিত্রত্রয়ে বাঙালী চরিত্রের যে দিক্‌টি লক্ষণীয় তা হল কাপুরুষতার সঙ্গে আত্মসমর্পণ নয়, বীর্যবত্তার সঙ্গে পরাজয় গ্রহণ। রঘুবংশের আড়ালে গুপ্তবংশের ছায়া পড়ুক বা নাই পড়ুক [দিলীপ-রঘু-অজ-দশরথ- রামে গুপ্তবংশের চন্দ্রগুপ্ত ১—সমুদ্রগুপ্ত—চন্দ্রগুপ্ত ২—কুমারগুপ্তের কথা বলা হয়েছে, বিদগ্ধজনের এই ধারণা] তবু এরও একটি বাস্তবভূমি আছে। মনে হয়, কবি-কল্পনা নিছক স্বকপোল ভাবিত নয়।

কহেন কবি কহ্লণ তাঁর রাজতরঙ্গিণীর একটি তরঙ্গে: কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের আমন্ত্রণে ভূস্বর্গে এসেছেন বঙ্গাধিপ। এখানে, ত্রিগামীর কাছে বিশ্বাসঘাতক ললিতাদিত্যের শঠতায় আততায়ীর হাতে মৃত্যু হল তাঁর। কয়েকজন অনুচর ছিল তাঁর সঙ্গে। প্রভু হত্যার ক্ষোভে ফেটে পড়ল তারা। তাদের ক্রুদ্ধ পদাঘাতে জনপদ কেঁপে উঠল, তাদের বজ্রগর্জনে কাশ্মীর জেগে উঠল। ধেয়ে গেল তারা ললিতাদিত্যের প্রাসাদে। না, সেখানে শয়তান নেই। চলল তারা মন্দিরের প্রাঙ্গণে। এখানেও নেই। অতএব ললিতাদিত্যের নিপাতনিঃস্বন উচ্চতর হল, চূর্ণবিচূর্ণ করা হল দেববিগ্রহ। খবর গেল রাজসমীপে, গৌড়জনের প্রচণ্ড বিক্ষোভের খবর। সজ্জিত সৈন্য এল রাজদ্রোহীর শাস্তিদানে। নির্বাণোন্মুখ দীপ যেন শেষবারের মতো জ্বলে উঠল। শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও বিশ্বাসহন্তার বিনাশ করতে হবে—অংগুলিমেয় বঙ্গতনয় অঙ্গীকার করল। প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হল তাদের মুষ্টি, অতৃপ্ত প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল তাদের দৃষ্টি। জীবনমৃত্যুকে তারা পায়ের ভৃত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল শত্রুসেনার মধ্যে। শ্যামগৌড়জনের পূতরক্তপাতে সিক্ত হল মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণ। রাজতরঙ্গিণী মুখর হল গৌড়বীরগানে: দীর্ঘকাল লঙ্ঘ্যোধ্যা শাস্তে ভক্তি রুচ প্রভৌ। বিধাতুরপ্য সাধ্যঃ তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥ বিধাতারও যা অসাধ্য তাকে সম্ভব করে মরণ নৃত্যে নেচে উঠল বঙ্গবীরবর্গ। অথবা নিবে যাবার আগে শেষবারের মতো জ্বলে উঠল উজ্জ্বল দীপশিখা। তারপর? অন্ধকার। অন্ধকারেই কি হারিয়ে গেল ঐ প্রবাসগত প্রভুভক্তরা?

দেওয়ান দ্বারকানাথ

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

লর্ড কর্নোয়ালিসের ১৭৯৩ সালের জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা ১৭৯৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেকটাররা অনুমোদন করার পর সাহেব কালেক্টারদের অধীনে সারা বাংলাদেশের জরীপ ও খাজনা নির্ণয় আরম্ভ হয়। রংপুরের কালেক্টার ডিগ্‌বি সাহেবের উপর ভার ছিল রংপুর, দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া এই তিন জেলার। এই কাজের জন্য তাঁর একটি পাকা সেরস্তাদার বা দেওয়ানের দরকার ছিল—যে জমিদারী হিসাব, জরীপ, আমলাদের কপটতা ও মিথ্যা হিসাব দাখিল ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হবে অথচ নিজে হবে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও সৎ। ১৮০৩ সালে রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ঠিক ঐ সব গুণের সুপারিশ নিয়ে ঐ পদে প্রার্থী হলেন। তিনি বাংলা, পার্শী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরাজী ছাড়া আইনও বেশ খানিকটা জানতেন। তিনি স্পষ্টই বলেন যে সংসার প্রতিপালনের জন্য তিনি ঐ পদের প্রার্থী নহেন। তাঁর ইচ্ছা ইংরাজদের শাসনপ্রণালী কিভাবে চলে তা' হাতেকলমে শেখা এবং পরে স্বাধীন ভাবে নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারেন এমন অর্থ সঞ্চয় করা। তাঁর চাকুরিতে ঢোকার একটি মাত্র সর্ত্ত হিসাবে ডিগ্‌বি সাহেবকে লিখে দিতে হয়েছিল যে, "সাহেবের সামনে রামমোহন রায়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না অথবা সাধারণ আমলাদের মত হুজুরের কাছ থেকে হুকুম নিতে হবে না।"১ দশবৎসর কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করার পর চল্লিশবৎসর বয়সে রংপুরের চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি কলিকাতার মানিকতলায় এক বাগানবাড়ী বিলাতীকায়দায় সাজিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলেন এবং দেশবাসীর উন্নতির জন্য নিত্য নূতন প্রচেষ্টায় মগ্ন হলেন। সেই সময়েই তাঁর সংগে দ্বারকানাথের পরিচয় ও বন্ধুত্ব। তখন দ্বারকানাথের বয়স বছর কুড়ি। এই সময় থেকে দ্বারকানাথের সমস্ত কার্য ও আদর্শের উপর রামমোহন রায় তাঁর জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও সত্যদৃষ্টির দ্বারা এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করলেন। এমনকি দ্বারকানাথের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা পর্যন্ত তাঁর প্রভাবে বদলে যায়। ঘোর বৈষ্ণব দ্বারকানাথ ও তাঁর ভাই রমানাথ মাংসাহারী হলেন। রমানাথ ঠাকুরের স্ত্রীর কথায় জানা যায়, প্রথমবার মাংস মুখে দিয়ে দুই ভাই-ই বমি করে ফেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর বার বার চেষ্টা করে প্রাথমিক ঘৃণা কেটে যায়। ক্রমশঃ রামমোহনের পছন্দ মত মুসলমান বাবুর্চি বহাল হল। দ্বারকানাথ সতীদাহ, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে রামমোহনের সহকারিতা করতে থাকলেন। "এ সমস্তই তার মনকে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছিল। এভাবে উদার ও সুশৃঙ্খল চিত্তে দ্বারকানাথ পরে প্রমাণ করেছিলেন যে জাত্যাভিমান নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের বাধাস্বরূপ হয় না।"২

পিতার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে রাধানাথ যখন তাঁর ভাই দ্বারকানাথকে সম্পত্তি বুঝিয়ে দেন (দ্বারকানাথের ১৮ বৎসর বয়সে) তখন থেকেই জমিদারীর কাজে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া দ্বারকানাথের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ঐ জমিদারী চালাতে গিয়ে জমা, জমা ওয়াশীল-বাকি,

জরীপ, জমানেশিত্ত, পাইকস্ত ও খুদকস্ত ইত্যাদি জোতজমার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেন। এখন রামমোহনের দৃষ্টান্তে ও বোধহয় তাঁর পরামর্শ অনুসারেই তিনি আইন পাঠের দিকে মন দিলেন। এই বিষয় তিনি তদানিন্তন বিখ্যাত ব্যারিষ্টার কাটলার ফার্গুসন সাহেবের প্রভূত সাহায্য পান। কিশোরীচাঁদ মিত্র একজায়গায় বলেছেন যে দ্বারকানাথের কর্মজীবনের প্রথমাংশের উপর দুইজন লোক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন—মনন বিষয়ে রামমোহন ও কানুন বিষয়ে ফার্গুসন।

ফার্গুসন সাহেবের কাছে আইন বিষয়ের প্রধান অংশগুলি আয়ত্ত করে এবং রেগুলশন আইন সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে জেনেই তিনি নিশ্চিন্ত হন নাই। সুপ্রীম কোর্ট, সদর ও জেলা আদালতের আইন প্রয়োগ রীতিও তিনি ভালো ভাবে আয়ত্ত করেন। এইরূপে আইনশাস্ত্রে পারদর্শী হয়ে তিনি 'ল-এজেন্ট'এর কাজ আরম্ভ করেন এবং বোগরী পরগণার সত্বাধিকারী বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, যশোরের রাজা বরদাকান্ত রায় ও কাশিমবাজারের কুমার হরিনাথ রায়ের মামলা সফলভাবে পরিচালনা করেন। এইভাবে দ্বারকানাথ কয়েকজন রাজা ও বড় বড় জমিদারের আইন পরামর্শদাতা হন। আরোও কয়েকজন জমিদারকে তিনি সর্বস্বান্ত হওয়া থেকে রক্ষা করায় তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ তিনি রাণী কাত্যায়নী, রাজা বরদাকান্ত রায় ও বাংলা এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আরো কয়েকজন জমিদারের বিশ্বস্ত 'ল-এজেন্ট' ও পরামর্শদাতা হ'ন। "এ কাজের জন্য সে-যুগে নিঃসন্দেহে প্রতিভার প্রয়োজন ছিল। সে সময়ে এক শ্রেণীর লোকের সহিত অন্য শ্রেণীর ছিল পরম বিবাদ, ন্যায় বিচার ছিল দুর্লভ এবং দেশ শাসন হইত সাধারণের অভাব ও ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করিয়া।" (৩)

এই আইনসংক্রান্ত কাজের সংগে সংগেই তিনি ব্যবসায়ে দালালি আরম্ভ করেন। কিছুদিন বাদে সাহেবদের ফরমাইস মত তিনি নীল ও রেশম বিদেশে চালান দিতে আরম্ভ করেন।

"দ্বারকানাথের প্রথম জীবনের ইতিবৃত্ত দেশবাসীর সামনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। কারণ সুধুমাত্র রাজস্ব আদায়, রাজস্বের হিসেব রাজস্বের হিসেব রাখা এবং মূল্যহীন লক্ষ্যহীন জীবন যাপন না করে একজন তরুণ জমিদার যে সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন দ্বারকানাথ নিজের জীবন দিয়ে তা প্রমাণ করেছিলেন। প্রভূত শক্তি, দুর্লভ কৌশল এবং অক্লান্ত কর্মক্ষমতার সাহায্যে অনতিবিলম্বে দ্বারকানাথ কেবলমাত্র তাঁর স্বদেশবাসীর মধ্যে নয়, সরকারী এবং বে-সরকারী য়ুরোপীয় মহলেও একটা মর্য্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।"

১৮২৩ সাল নাগাদ যখন ২৪ পরগণার কলেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদারের পদ খালি হয়, তখন রামমোহন রায়ের দৃষ্টান্তে ও বোধহয় তাঁর পরামর্শ অনুসারেই দ্বারকানাথ ঐ চাকুরীর জন্য চেষ্টা করেন। ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহেব-সুবার সংগে তাঁর চেনা পরিচিতি ছিল। তা'ছাড়া পূর্বে লাড্‌লি মোহন ঠাকুর নিমক মহলের সেরেস্তাদার ছিলেন। পরে তিনি দ্বারকানাথের বড়ভাই রাধানাথকে সহকারী করে নেন। সেইসূত্রে চাকুরীটি পেতে দ্বারকানাথকে বেগ পেতে হয় নাই।

এ সম্বন্ধে অন্য একটি আখ্যানও পাওয়া যায়। তাঁদের মতে রাধানাথ কয়েক বৎসর চাকুরীর পর অবসর নিতে চাইলে সাহেব তাঁর জায়গায় কাজ করবার মত যোগ্য ছেলে আছে কি না জিজ্ঞাসা

করেন। উত্তরে রাধানাথ বলেন যে পুত্র নাবালক তবে একটি উপযুক্ত ভাই আছে। তখন রাধানাথের ভাই বলিয়া দ্বারকানাথকে সাহেব বহাল করেন।

প্রথম যখন সেরেস্তাদারীতে বহাল হয়েছেন সেই সময়ে ভবানীপুরে গদাধর আচার্য বলে একজন কাপড়ের আড়তদার ছিলেন। তাঁর আবার একটি "কাপ্তেন অফিস" (সম্ভবতঃ স্টিভেডোরের ব্যবসায়) ছিল। গদাধর দুইদিক সামলাতে না পেরে দুইদিকেই লোকসান দেন। শেষপর্যন্ত ঐ কাপ্তানি আফিসের মোকদ্দমায় তার সব সম্পত্তি বাঁধা পড়ে। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা দেনার দায়ে সব সম্পত্তি এমনকি বসত বাড়ী পর্যন্ত দ্বারকানাথকে বেচে দেন। দ্বারকানাথ দখল নিতে গিয়ে দেখলেন বিধবার দুরবস্থার অভাব নেই। ছোট ছেলেটি কান্নাকাটি করছে, কারণ কে তাকে বলেছে দ্বারকানাথ তাকে ধরে নিয়ে যাবেন এবং সে এ বাড়ীতে আর ঢুকতে পাবে না। ছেলেটির কান্না দেখে দ্বারকানাথ বিধবাকে ডেকে বসতবাড়ীর দলিলটি ফেরত দিয়ে বলে আসেন যে ঐ ছেলে ও মাকে থাকবার জন্য তিনি ঐ বাড়ী দিচ্ছেন এবং ছেলে যতদিন না বড় হয় ততদিন ভরণ-পোষণের ভারও তিনি নিলেন।

যখন দ্বারকানাথ সেরেস্তাদার নিযুক্ত হন তখন নিমক মহলের অধ্যক্ষ ও ২৪ পরগণার কলেক্টার ছিলেন প্লাওডেন সাহেব। এই সূত্রে তাঁর সঙ্গে দ্বারকানাথের যে পরিচয় হয় তা' আজীবন স্থায়ী বন্ধুত্বে দাঁড়ায়। দ্বারকানাথের জীবনে বার বার দেখি যাঁর সংগেই তাঁর সখ্যতা হয়েছে—রামমোহন ফার্গুসন, প্লাওডেন, কার—তাঁকেই তিনি আজীবন বন্ধুত্বসূত্রে বেঁধে ফেলেছেন। প্লাওডেন পরিবারের সঙ্গে ত, তাঁর রীতিমত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল। দ্বারকানাথ যখন চাকুরী ছেড়ে কার-ঠাকুর কোম্পানী খোলেন তখন প্লাওডেন সাহেব ঐ কোম্পানীর এক অংশীদার হ'ল। মিসেস প্লাওডেনেরও বোধহয় দ্বারকানাথের কারবারের কিছু অংশ ছিল কারণ ১৮৩৫ এর ১৭ই নভেম্বর দেখি দ্বারকানাথ তাঁকে হিসাব পাঠাচ্ছেন। (৪) এই প্লাওডেন মেমসাহেবের ভারতীয় সাজ পড়া একটি তৈলচিত্র দ্বারকানাথ স্যার উয়িলিয়াম বাক্‌লিকে দিয়ে আঁকিয়ে ছিলেন। সেটির সম্বন্ধে দেখা যায় মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার, গগনেন্দ্রনাথের কাছে ১১ই জুলাই ১৯২৫ চিঠি লিখে খোঁজ করছেন।

প্লাওডেন সাহেবের সঙ্গে দ্বারকানাথের মধ্যে দেখা যায় যে দ্বারকানাথের সুপারিশে সাহেব ২৪ পরগণার কালেক্টারীতে কতকগুলি আমলা রাখেন। তার মধ্যে একজন সে যুগের শিথিল তত্ত্বাবধানের সুযোগ নিয়ে স্ট্যাম্প বিভাগের কিছু টাকা তছরূপ করে। এ বিষয়ে সরকারের নজর পড়লে সরকার প্লাওডেন সাহেবকে ক্ষতিপূরণ করতে আদেশ দেন। দ্বারকানাথ এ খবর শুনে সাহেবকে লিখে জানান যে ন্যায়তঃ এ ক্ষতির জন্য দ্বারকানাথই দায়ী যেহেতু তাঁর সুপারিশেই ঐ লোককে নেওয়া হয়েছিল এবং এই ক্ষতিপূরণ তাঁকে দেবার জন্য অনুমতি দিতে প্লাউডেন সাহেব না করতে পারেন না।

প্লাওডেন সাহেব বিলাত যাবার সময় দ্বারকানাথকে যে চিঠি লেখেন সেটা পড়ে মনে হয় না যে এঁদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য বা সাদা চামড়া-কালো চামড়া সম্পর্ক ছিল। তিনি লিখছেন—

"প্রিয় দ্বারকানাথ,—প্রিয়তম বন্ধু, আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে আমি যে বেদনা অনুভব করছি, তেমন আর কারও জন্য করছি না। আমার জন্য আপনি বহুপ্রকারে যতকিছু করেছেন তা'

আমি সদাই স্মরণে রাখবো। এ কথা আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না।

মিষ্টার পার্কার আজ রাত্রে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবেন। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন এবং সত্বর আপনার সংবাদ জানাবেন।"

প্রাওডেন সাহেবের জায়গায় এই হেনরি মেরেডিথ পার্কার হলেন আবগারী, লবণ ও অহিফেন বোর্ডের সেক্রেটারী।

কিছুদিন বাদে আবগারী বিভাগের বেশ কিছু টাকা ঐ বিভাগের দেওয়ান ও একজন কেরাণী মিলে ঠকিয়ে নেওয়ায় দ্বারকানাথকে ছয় বৎসর সেরেস্তাদারী করবার পর ১৮২৯ সালে দেওয়ান করে দেওয়া হয়। তখন নিমকি বিভাগে তহবিল তছরূপ আর ঘুষ লেগেই থাকত। অনেক বড় কর্তারা অনেক চেষ্টা করেও বিশেষ কিছু করতে পারছিলেন না। লোকজনদের মাহিনা খুব কম ছিল। বড়কর্তাদের মাহিনা বেশী ছিল কিন্তু উপযুক্ত ঠাটও বজায় রাখতে হত। ফলে সকলেই প্রলোভনের মুখে পড়তেন। পঁয়ত্রিশ টাকা মাহিনার এক কর্মচারী তার উপরিওয়ালাকে মাসে পাঁচশত টাকা চুপ করে থাকার জন্য (হাস মানি) দিত এরকমও হয়েছে।

দ্বারকানাথ দেওয়ান হয়ে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঠাকুরদাদা রাধানাথ মিত্রকে সেরেস্তাদার করে দেন। ঘুষ চুরি বন্ধ করে সমস্ত বিভাগটাকে নতুন ভাবে ভালো করে চালাবার জন্য যা দরকার রদবদলের ক্ষমতা দ্বারকানাথকে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে দ্বারকানাথ কয়েকটা কারণে বিশেষ উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি অবস্থাপন্ন জমিদার, আইনজ্ঞ, কর্মদক্ষ, স্বাধীনচেতা ও ধর্মভীরু। তা' ছাড়া ঐ বিভাগের একটা অংশে কয়েক বৎসর কাজ করার হিসাবপত্র রাখার ব্যবস্থা ও কোথায় কোন পথে চুরির সম্ভাবনা সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন।

দ্বারকানাথ দেওয়ান হয়ে সমস্ত বিভাগটাকে এমন পাকা ভাবে ও সুষ্ঠুরূপে চালু করলেন যে সদর বোর্ডের সেক্রেটারী পার্কার সাহেব অশেষ প্রশংসা তো করলেনই—তিনি দ্বারকানাথের চিরন্তন বন্ধু হয়ে দাঁড়ালেন।

এই সময়ের একটা গল্প পাই যে তখন একজন নতুন কলেক্টার কিছুদিনের জন্য এসেছেন। তাঁর আফিসও ঐ বাড়ীতেই। দ্বারকানাথের অংশের আফিসে তখন নুনের দাদন দেওয়া হচ্ছে। দ্বারকানাথ দেওয়ান; তাঁর তত্ত্বাবধানে টাকা দিচ্ছেন মদন চাটুয্যে। নুনের দাদন নিতে অনেক চাষাভূষা গোছের লোক এসেছে এবং চেঁচিয়ে কথাবার্তা বলছে। কলেক্টর সাহেবের ঘরে সোরগোলের আওয়াজ পৌঁছাতে তিনি মদন চাটুয্যেকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন "এখানে গোলমাল অসহ্য। বল বাইরে গাছতলায় বসে দাদন দিতে"। দ্বারকানাথ বলে পাঠালেন "এ সব টাকাকড়ির ব্যাপার। বোকা ছাড়া টাকা হাতে থাকতে গাছতলায় কেউ বসে না। তোমার যদি গোলমাল সহ্য না হয় তো তুমি গিয়ে গাছতলায় কাছারী করতে পার।"

কিন্তু দ্বারকানাথের এই নতুন বন্দোবস্তের ফলে যারা প্রত্যক্ষ তহবিল তছরূপে বা ঘুষ নিতে ধরা পড়ল তাদের চাকুরী গেল, বাকীদের ঐ রকম চোরা আয় বন্ধ হ'ল। তারা দ্বারকানাথের নামে নানা অপবাদ রটাতে লাগল। অনেকে, নিজে যে অপরাধে অপরাধী, সেই অপরাধ দ্বারকানাথের ঘাড়ে চাপিয়ে বলে বেড়াতে লাগল। এরা নিমৃকি বিভাগের অভিসন্ধি জানত বলে

অনেকে এদের কথায় বিশ্বাসও করেছিল। অবশ্য এতে দ্বারকানাথের বিশেষ কোন ক্ষতির প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং সাধারণের মধ্যে তাঁর প্রশংসাই ছড়িয়ে পড়ে।

আরেকদল লোক এই সময়ই তাঁকে তাঁর প্রগতিশীলতার জন্য দুর্নাম দিত। রামমোহনের চেলা বলে এরা তাঁকে 'নাস্তিক' 'বিধর্মী'—এই সব আখ্যা দিতে থাকলেন।

তৃতীয় দল এইসব লোককে বরখাস্ত করার জন্য দ্বারকানাথকে নিষ্ঠুর, কোপন স্বভাব ইত্যাদি বলে গালি দিল। এইসব গালি সম্ভবতঃ দ্বারকানাথের মনে আঘাত দিয়েছিল কারণ বৈষয়িক ও ব্যবসার ব্যাপারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি হলেও কেহ ব্যক্তিগত দুঃখ নিবেদন করতে এলে তাঁকে দাক্ষিণ্যের সময় ঐ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার ব্যবহার করতেন না।

(১) হিষ্টরি অফ্ ব্রাহ্মসমাজ—জি, এস্ লিওনার্ড প্রণীত

(২) কিশোরীচাঁদ মিত্র

(৩) কিশোরী চাঁদ মিত্রের দ্বারকানাথ ঠাকুর (দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের অনুবাদ)

(৪) প্রিয় মহাশয়—

এতদ্‌সহ হিসাবে দেখিবেন এতাবৎ সুদবাবদ আপনি ১২১১৬৲ সিক্কা টাকা লইয়াছেন। ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সমুদয় সুদ প্রায় ১৫,৬০০৲ টাকায় দাঁড়াইবে কাজেই আপনার এখনও ৩৫০০৲ টাকার মত পাওনা রহিল।

বিদেশীদের রুচি বিবর্তন

চণ্ডী লাহিড়ী

আপরুচি খানা, পররুচি পরনা নয়। পরের রুচি ও পরের পোষাক দুটিই অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ভারত সম্পর্কে তাঁদের সকৌতুক আগ্রহ ছিল এবং দূর বিদেশে পরকে আপন করে নিতে না পারলে টিকে থাকা যাবে না এ তত্ব অনুধাবন করেছিলো বলেই হয়তো ভারতীয়দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাঁরা মিশতে পেরেছিলেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজদের মনে বা আচরণে কোন আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রকাশ পায়নি। বাণিজ্য করতে তাঁরা এসেছিলেন এবং বণিকের বিনয় ও সৌজন্যবোধ দিয়ে তাঁরা দেশীয় নরনারীদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। পিটার মাণ্ডি (১৬৩৩) সুরাটের ইংরেজ কুঠির অবস্থা বর্ণনাকালে লিখেছেন "সাধারণতঃ আমরা ভাত, খিঁচুরি, দোপেঁয়াজি ও আমের চাটনি খাই। আমরা যখন বাইরে যাই, মাথায় দিই পাগড়ি। কাঁধে থাকে সাদা লিনেনের কোট। কোমরে ব্রিচেস, পায়ে জুতো, আর দুই পাশে ছোরা ও তলোয়ার।"

ভারতীয় খানা খাওয়া ও পোষাক পরার রেওয়াজ তার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত চলেছিল। র‍্যালফ ফিচ প্রথম ইংরেজ যিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। একমাত্র ভারতীয় পোষাকের জন্যই তিনি পর্তুগীজদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে উত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রামে পালাতে পেরেছিলেন। শুধু খানা বা পোষাক নয়; ভারতীয় আমোদপ্রমোদেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে তাঁরা পরমাত্মীয় হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। নেটিভদের মত হুকো টানতে, তাড়ি খেয়ে নেশা করতে বা বাইজিদের নাচের আসরে বসে আহ্লাদে বিগলিত হতে তাদের "প্রেষ্টিজে" বাধতো না।

ইংরাজেরা যে নাচ ভালবাসতো তার প্রমাণ, সাহেবদের সম্মানার্থে ভারতীয়রা অপরিহার্যভাবে নাচের আসর বসাতেন। আবার হোম থেকে আগত নতুন সাহেবকে আপ্যায়নের জন্য সাহেব নবাব নিজের খরচে দেশী নর্তকী ভাড়া করে বাড়িতে আনতেন। পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পরের যুগ হল সাহেব-নবাবদের যুগ। তার পর এল সোসাইটির যুগ। ইংরেজ ললনারা যখন অধিক সংখ্যায় এদেশে এসে তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে বসবাস করতে লাগলেন তখন গড়ে উঠল সমাজ। দেশী নাচ কতকটা ব্যালে নাচের মত। নৃত্য-শিল্পীরা ছাড়া সবাই সেখানে দর্শক। কিন্তু ইওরোপের আর সব নাচ হল স্ত্রী-পুরুষের সম্মিলিত নাচ। তাতে দর্শক বলে কিছু নেই। ইংরেজ নারীরা ভারতে আসায় ডান্সিং হয়ে উঠল ফ্যাসান। ১৭৭৫ সালের পর দেখা যায় একমাত্র সেনাবাহিনীই দেশী নাচের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক।

পলাশীর যুদ্ধে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটলেও ইংরেজদের স্বভাবের পরিবর্তন তৎক্ষণাৎ ঘটেনি। কারণ পলাশী যুদ্ধের পর সাহেবরাই "নাবুব" হয়ে যখন জমিয়ে বসলেন, তখন দেশী নবাবদের অনুসরণেই তাঁরা বিলাস ব্যসনে হলেন মত্ত। নবাবরা জেনানা না রাখলে তাঁদের মান থাকতো না। সাহেব-নবাবরাও দেশী জেনানাদের উপপত্নীরূপে গ্রহণ করতে সুরু করলেন।

নাচের আসর বসানো তাঁদের বিলাসিতার অঙ্গ হয়ে ওঠে। হুঁকা আগেও খেতেন, এখন নবাব হওয়ার পর সেটা ফ্যাসানে দাঁড়ালো।

গ্র্যাণ্ডপ্রি আঠারো শতকের ৬ষ্ঠ দশকের অবস্থা বর্ণনা করেছেন—"হুকো টানার রেওয়াজ মেমসাহেবদের মধ্যেও চালু আছে। কাউকে হুঁকো টাকার জন্ম এগিয়ে দেওয়া হল সবচেয়ে বড় সম্মান প্রদর্শন। কোন মহিলা এলে তাঁর জন্ম হুকোর নলের মুখটি খুলে নতুন মুখ বসিয়ে তাঁর হাতে হুকোটি এগিয়ে দেওয়াই হল ভদ্রতা। মহিলাও দু একবার টেনে হুকো ফিরিয়ে দেবেন।"

ষ্ট্যাভোরিনাস (১৭৬৯) লিখেছেন, জনৈক ডাচ ডিরেক্টরের বাড়িতে এক ডিনারে আহুত প্রত্যেক ব্যক্তির হাতেই হুকো দেওয়া হয়। হিকি (১৭৭৮) এসে শুনলেন সাহেবরা হুকো খায়। দুএকজন অবশ্য পছন্দ করে না। তিনিও স্পর্শ করলেন না। হুকার বিরুদ্ধে সেই প্রথম বিদ্বেষ। ১৮০২ সালে মেজর ব্ল্যাকিস্টন লিখেছেন, হুকো এখন বড় একটা কেউ ব্যবহার করে না। কারণ ব্যয় সাপেক্ষ। তামাকও হুকার খরচ ছাড়াও একজন চাকর নিয়োগ করতে হয়। অনেক খরচ। কোন কোন নবাব লণ্ডনে ফিরে গিয়ে সেখানেও মাথায় পাগড়ি পরতেন এবং মেমকে ওয়াইফ না বলে "বিবি" বলতেন। ইংলণ্ডের সেরা নাবুবদের একজন এডোয়ার্ডবাবু বলে নিজেকে উল্লেখ করেছেন। ১৭৭২ সালে কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করে। ফলে সাহেব কালেক্টরগণ জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের গ্রামের লোকজন, নবাব, জমিদারদের সংস্পর্শে আসতে হত। রাইটাররা আসতেন সাধারণতঃ পনর বছর বয়সে। সেই কাঁচা বয়সে তাঁদের পক্ষে দেশী পরিবেশকে মনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া শক্ত হত না। ফলে নিজেদের ইওরোপিয় প্রভাব অপরের উপর বিস্তারের পরিবর্তে তাঁরা ভারতীয় প্রভাব গ্রহণ করেছিলেন। নরম কাদাকে যথেচ্ছ পরিবর্তিত করা চলে, পাথরকে নয়।

কোম্পানির উচ্চ পদগুলিতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের আমীর—ওমরাহ বা নবাব জমিদারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হত। নবাবদের অভিজাত রুচি ও উচ্চাঙ্গের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল। পক্ষান্তরে ফ্যাক্টর বা সাধারণ কেরাণীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘটত বেনিয়ান-গোমস্তা-মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে। আর্থিক লেনদেন ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ সেখানে ছিল না। আর বেনিয়ানরা পয়সা ছাড়া অন্য কথা আলোচনা করত না।

ইংরেজ শাসক সমাজের শীর্ষস্থানীয় অনেকেই ফার্সি সাহিত্যে অনুরাগ দেখিয়েছেন। হেষ্টিংস স্বয়ং ভারতীয় পুরাণ ও বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। ফার্সিতে কবিতা রচনাতেও তিনি ছিলেন দক্ষ। ভারত সম্পর্কে উইলিয়ম জোন্স, উইলকিন্স, কানিংহাম, টড, কোলব্রুকের অনুসন্ধিৎসা ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সত্য মূল্য নির্ধারণে যেরূপ বিপুলভাবে সাহায্য করেছে তা শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতীয় পণ্ডিতরা আজও স্বীকার করেন। দেশী প্রবাদ প্রবচন, বাক্‌ভঙ্গী, অভিধান প্রণয়ন এমন কি বাউলদের গান সংগ্রহ ও অনুবাদ করেও তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

মুসলিম ভকীল, নবাব, আমীর ও হিন্দুরাজাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতাই তাঁদের উত্তরোত্তর ভারতবাসীর দিকে, ভারতের শাশ্বত সাধনার দিকে আকৃষ্ট করেছিল। সিন্ধিয়ার ভকিল

বেনিরাম পণ্ডিত (ক) ছিল হেষ্টিংস, পামার ও চ্যাপমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। চাকরি শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার পরও বহুদিন পর্যন্ত হেষ্টিংস তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের কুশল সংবাদ চেয়ে পত্র দিয়েছেন। তফজ্জল খাঁর পণ্ডিত্য তাঁদের মুগ্ধ করেছিল। চ্যাপমান তফজ্জল সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন my friend and fellow traveller. সেই তফজ্জল যখন মারা গেল, পামার চোখের জল সামলাতে পারলেন না। হেষ্টিংসকে (১৮০১) লিখলেন সেই মৃত্যু সংবাদ—That excellent man Taffazal Hussain Khan and all that was wise and good among the Musalmans. ফয়জুল্লা খাঁন সম্পর্কে টার্ণার ১৭৯৯ সালে লিখছেন, সে গ্রীক শিখতে সুরু করেছে আর্মেনিয়ান পাদ্রী পার্থেনিওর কাছে। টার্ণার জানতেন হেষ্টিংস এ সংবাদে খুসি হবেন। হেষ্টিংসের বন্ধুত্বকে ভারতবাসীরা আন্তরিকভাবেই গ্রহণ করেছিল। শেষ জীবনে স্বদেশে যখন তিনি নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে কালাতিপাত করেন তখন নবাব ওয়াজির খান পামারের মারফৎ তাঁকে মাসোহারার টাকা পাঠাতেন। হেষ্টিংসের কাল ছিল অবাধ মেলামেশার কাল। শাসক সমাজে তখনও উচ্চমন্ত-অহঙ্কার প্রকট হয়নি। বন্ধুর মত সমপর্যায়ে তাঁরা মিশতেন। সেই অন্তরঙ্গতার পরিচয় আছে ইওরোপীয়দের ব্যক্তিগত চিঠিতে। তখনও শাসক-সমাজ এমন গোঁ ধরেনি যে, ভারতীয়রা ইংরেজি না শিখলে তাদের সঙ্গে কথাই বলা হবে না। অত ধৈর্য বা সময় ছিল না। ভারতবাসীর ইংরেজি শেখা পর্যন্ত অপেক্ষা না করে তাঁরা নিজেরাই ফার্সি ও হিন্দুস্থানী শিখতে সুরু করে দিলেন।

ইংরেজি না শিখলে সারা ভারত যে রসাতলে যাবে এ আজগুবি ধারণা জন্মেছিল মেকলের মাথায়। তিনিই নব্য ইংরেজি শিক্ষিত দেশী কেরাণীকুলের স্রষ্টা। তার আগে পর্যন্ত সাহেব-রাইটারদের ফার্সি শেখা বাধ্যতামূলক ছিল। এখন দেশী কেরাণীদের ইংরেজি শিখতে বাধ্য করা হল। মেকলে এসেছিলেন আইন সংশোধনার্থ নিযুক্ত এক কমিশনের সভাপতি হয়ে। আইন সম্বন্ধে তাঁর নিজের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। এদেশে অবস্থান কালে ক্লাইভ ও হেষ্টিংসের জীবনী লিখতে সুরু করেন। বস্তুতঃ হেষ্টিংস ছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু এবং এই গ্রন্থে তিনি কেবল বিষোদ্গার করেছেন। ষ্টকলার মেকলের কথা তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে লিখেছেন,

"তিনি আমায় বললেন যে তার নিজের আইন জ্ঞান অতি সামান্য। জীবনে মাত্র একবার তিনি এক জনের উকীল নিযুক্ত হয়েছিলেন। এক মহিলা মুরগী চুরির দায়ে ধরা পড়ে ও মেকলেকে উকীল নিযুক্ত করেন। মেকলের ওকালতির ফলে মহিলার জেল হয়।"(খ) কাজেই আর কেউ তাঁকে কখনো উকীল নিয়োগ করেনি। তিনি ভারতে ছিলেন মাত্র তিনবৎসর। ষ্টকলার লিখেছেন His departure was not lamented, for he had done little for India, nothing for the press, and nothing for the society.

আঠারো শতক শেষ হল। উঠল প্রাচীর। উনিশ শতক ইংরেজ সমাজে নিয়ে এল পরিবর্তন। নাচে যাওয়া বন্ধ হল, হুকো খাওয়া বন্ধ হল, দেশী মদে দেখা দিল অরুচি। ইংরেজ হল বিজয়ীর জাত, অতএব মনে এল অহঙ্কার। নিজেদের উচ্চমন্ত মনে করার সর্ত এই যে তাতে অপরকেও হীন মনে করতে হয়। শুধু হীন মনে করলেই চলেনা, তাকে ঘৃণার অযোগ্যরূপে মনে না করলে স্বস্তি হয়না। যে ঘৃণা একদা জার্মানিতে ইহুদিদের সম্পর্কে বা এখনও দক্ষিণ আফ্রিকায়

কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে শাসক সম্প্রদায় পোষণ করেন, সেই ঘৃণার উদ্ভব হয়েছিল উচ্চম্মন্যতা থেকেই।

ভারতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সহজ মেলামেশার পথ রুদ্ধ হওয়ার জন্য একদিকে দায়ী ঊর্দ্ধতন শাসক সম্প্রদায় আর ইংরেজ মেয়েরা। ক্লাইভ ও হেষ্টিংস যতদূর সম্ভব শাসনকার্যে ভারতীয় নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। সেজন্য প্রতি জেলার সদরে কালেক্টর সাহেব হলেও আসল কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এক জন ভারতীয় দেওয়ানের উপর। কর্নওয়ালিসের আমলে ছেদ পড়ল এই প্রথায়। তিনি ইঙ্গ-ভারতীয় সম্পর্কের ক্ষতিসাধনই করলেন দুটি উপায়ে। প্রথমত শাসনকার্য থেকে ভারতীয়দের নির্বাসন, দ্বিতীয়ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা নূতন এক অভিজাত পদলেহী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। ভারতীয়দের শাসনকার্যে নিয়োগ করা চলেনা কারণ কর্নওয়ালিসের মত আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রত্যেক ভারতীয় দুর্নীতি পরায়ণ।" (গ)

কর্নওয়ালিস ও মুষ্টিমেয় কিছু উন্নাসিক ইংরেজের সক্রিয় চেষ্টায় দুই তরফের মধ্যে যে প্রাচীর উঠল তার পরিণতি দাঁড়াল এই যে পরবর্তীকালে শুদ্ধ মানবিক দৃষ্টি নিয়ে যে সব ইংরেজ ভ্রমণকারী বা কর্মচারী এদেশে এসেছেন তাঁরা চেষ্টা করেও ভারতীয়দের সঙ্গে মিশতে পারেননি। দাসদাসী ও বেনিয়ান গোমস্তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে তাদেরকেই ভারতীয় চরিত্রের প্রতিভূ মনে করে অসন্তুষ্ট চিত্তে দেশে ফিরেছেন। মারিয়া গ্রাহাম (১৮৯০) আক্ষেপ করেছেন,

"গভীর দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ও ইওরোপিয়দের মধ্যে যে ব্যবধান এখানে (কলকাতা) ও মাদ্রাজে বজায় রাখা হয়েছে তার ফলে আমি কোন দেশী পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হতে পারিনি।" (ঘ)

ওয়েলেসলির সময়ে ভারতীয় ও ইওরোপিয় কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য দেখে পামার ক্ষুব্ধচিত্তে হেষ্টিংসকে এক পত্রে লেখেন—

"দেশী অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের কোন সামাজিক যোগাযোগ নেই। ম্যাজিষ্ট্রেট ও জজের কাজ করেন ইওরোপিয়ানরা। তাঁরা যেমন আইন বোঝেননা, দেশী ভাষাতেও তেমন অজ্ঞ। অথচ তাদের রাখতে কোম্পানির ব্যয় হয় বিপুল। পক্ষান্তরে আদালতের যিনি হেড মৌলভী যাঁর তথ্য ও ব্যাখার উপর ভিত্তি করে জজ বিচার করেন তিনি পান মাত্র ৫০ টাকা দক্ষিণা।" পামার আরও অভিযোগ করেছেন—

"দেশীয় রাজন্যবর্গের ভকীলদের (প্রতিনিধি) ওয়েলেসলি মোটেই খাতির করেন না। তাদের বৎসরে মাত্র দু-তিনবার সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয়। ব্যাপারটি যেমন অসৌজন্যমূলক তেমনই হীনবুদ্ধিজাত।" (ঙ)

অথচ ভারতীয়দের তরফে বিনয়ের অভাব ঘটেনি। ইংরেজদের শক্তি ও ন্যায় পরায়ণতায় তারা মুগ্ধ। তাদের যথোচিত শ্রদ্ধা দেখাতেও ভারতীয়রা আগ্রহী। কিন্তু ভারতীয়দের ভালবাসাকে গ্রহণ করার মত মনোবৃত্তি ইংরেজদের নেই। ভিক্টর জেকমণ্ট (ফরাসী) এদেশে ইংরেজদের উন্নাসিক মনোবৃত্তিতে দুঃখবোধ করেন। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন—

"ইওরোপিয়ানদের মধ্যে ইংরেজরা একমাত্র জাতি যারা ভারতীয়দের এবম্বিধ শ্রদ্ধাতে খুসি হয়না। তারা নিজেদের অতি উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করে। কালা-আদমীদের তারা উপেক্ষা

করে। তাদের প্রশস্তিতে ইংরেজদের খুসি হওয়া দুরাশা"

কিন্তু জেকমণ্ট লিখেছেন উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের অবস্থা, প্রকৃতপক্ষে ব্যবধান সুরু হয়েছে আঠারো শতকের শেষ থেকেই। উইলিয়মসন তাঁর গ্রন্থে ১৮১০ এর আগের বিশবছরের কথা লিখতে গিয়ে স্বীকার করেছেন The Europeans have little connexion with natives of either religion. মারিয়া গ্রাহাম ১৮১০ সালে লিখছেন Every Briton appears to pride himself on being outrageously a John Bull. আর ভিকটর জেকমণ্ট লিখছেন ১৮৩৩ সালে সেই দাম্ভিকদের কথা The English have no conversation, they sit at table for hours after dinner in Company with quantities of bottles."

আগেই বলেছি, ইংরেজ পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা উন্নাসিক ছিল বেশি, কারণ স্বামীর উপার্জিত পয়সায় বিলাসিতার জন্যই বিলেত থেকে তারা আসতো। দেশী অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হতনা। আর বিয়ে করে স্ত্রী ঘরে আনলেই নূতন দম্পতি সোসাইটিতে মিশবার সুযোগ পায়। দেশী সমাজকে তখন ঘৃণা করলে সোসাইটিতে বেশি খাতির পাওয়া যায়না।

"বৌ প্রতিপালনের ক্ষমতা হলেই ইংরেজরা বিয়ে করে। নববিবাহিত দম্পতি যাবতীয় ইংরেজি কুসংস্কারের বোঝা হয়ে পড়ে। তারা তখন ভারতকে ঘৃণা করে। ভারতবাসীকে ঘৃণা করে। তৎসহ যাকিছু ভারতীয় তাকেই ঘৃণা করে তাদের মুখে তখন কথায় কথায় শোনা যায় The odious black, The nasty heathen wretches, "Fillthy creatures, Black brute ইত্যাদি বুলি। ইংরেজ শিশুরাও বাপ-মাকে অনুসরণ করে। আমি একটি পাঁচ বছরের শিশুকে বলতে শুনেছি তার সেবক ভৃত্য সম্পর্কে—Black brute"। (চ) এই স্পষ্ট অথচ দুঃসাহসিক মন্তব্য করেছেন একজন পরিচয় গোপনকারী ইংরেজ।

মিসেস ফেন্টন ১৮২৬ সালে এসে রূপরাম মল্লিকের বাড়িতে দুর্গাপূজা দেখতে গিয়েছিলেন। ভারতীয়ের ঐশ্বর্য তাঁর সহ্য হয়নি। যেন বিলাসিতায় অর্থব্যয় করার একমাত্র অধিকার ইংরেজদের। তিনি লিখেছেন "The poor animal who exists on rice and ghee all the year, contended with a mat for his bed, here may be seen playing the liberal entertainer." ভদ্রমহিলা খবর রাখেন না যে, উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত পরিবারেও বিশ পদ রান্না হত এবং এত অধিক রন্ধনবৈচিত্র্য সেকালের ইওরোপের কোন দেশেও চালু ছিলনা। দূর থেকে নাকে ঘিয়ের গন্ধ পেয়েছিলেন, আর শুনেছেন ভারতীয়রা ভাত খায়, অতএব exists on rice and ghee all the year লিখে বসলেন।

বহু ইংরেজ গ্রন্থকার এজন্য ভারতীয় রক্ষণশীলতাকে দায়ী করেছেন। ভারতীয়রা ইংরেজদের সঙ্গে একত্রে বসে আহার করেনা এটা তাদের অপরাধ। কিন্তু আঠারো শতকেও তো তারা একত্রে খানাপিনা করেনি, কিন্তু তখনতো সামাজিকতায় বাধেনি? তাছাড়া মুসলমান নবাবরা ছিলেন মেলামেশার ব্যাপারে উদার। বহু ইংরেজ বন্ধুকে তাঁরা সাদরে অন্দরমহলে নিয়ে গিয়েছেন। সমান তালে খানাপিনা করেছেন তাঁরা। গোঁড়ামীর পরিচয় খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁরা দিয়েছেন। ভারতীয়দের আতিথেয়তাকে, বন্ধুবৎসলতাকে তাঁরা ভুল বুঝেছেন দুর্বলতা মনে করে। উইলিয়মসন

উনিশ শতকের স্বরুতে লিখছেন—

"এখনও হিন্দু ও মুসলমানরা নাচের আসরে, শিকার যাত্রায় বা অন্যান্য উৎসবে ইওরোপিয়ানদের আগের মতই আমন্ত্রণ করে।" রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থে লিখেছেন

"তখন বিলাতে যাতায়াতের এমন স্থবিধা ছিল না। যাহারা এখানে আসিতেন, তাঁহাদের সর্ব্বদাই বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। আর এক কারণ এই, তাঁহারা অতি অল্পলোকই এখানে থাকিতেন, স্থতরাং এখানকার লোকদিগের সহিত তাঁহারা আত্মীয়তা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহারা অনেক পরিমাণে এদেশীয়দের আচার ব্যবহার পালন করিতেন। তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকালে সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্নকালে কলিকাতা দ্বিপ্রহরা রজনীর ন্যায় নিস্তব্ধ হইত। তখনকার সাহেবরা পান খেতেন আলবোলা ফুঁকতেন। বাইনাচ দিতেন ও হুলি খেলতেন। ষ্টুয়ার্ট নামে একজন প্রধান সৈনিক সাহেব ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা ছিল। তজ্জন্য অন্যান্য সাহেবরা তাঁহাকে হিন্দু ষ্টুয়ার্ট বলিয়া ডাকিত। তাঁহার বাটীতে শালগ্রামশিলা ছিল। প্রত্যহ পূজারী ব্রাহ্মণের দ্বারা তাহার পূজা করাইতেন। বাল্যকালে শুনিতাম, কালীঘাটের কালীর মন্দিরে প্রথমে কোম্পানীর পূজা হইয়া তৎপরে অন্যান্য লোকের পূজা হইত। ইহা সত্য না হইতে পারে কিন্তু ইহার দ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, তৎকালের সাহেবরা বাঙ্গালীদের সহিত এতদূর ঘনিষ্ঠতা করিতেন যে, তাহাদের ধর্ম্মের পর্য্যন্ত অনুমোদন করিতেন। একালেও গভর্ণর জেনারেল লর্ড এলেনবরা সাহেব বাহাদুর আফগানিস্তানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসার সময় বৃন্দাবন, মথুরা, প্রভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান দেবালয়ে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। সেকালের সাহেবেরা আমলাদের উপর এমন সদয় ছিলেন যে, শুনা গিয়াছে, তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন। তাঁহারা অন্যান্য আমলাদের বাসায়ও যাইয়া কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। এখনকার সাহেবদের দেখিলে তাঁহাদিগকে সেই সকল সাহেবদের হইতে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের আর এ দেশীয়দের সহিত সেরূপ ব্যথার ব্যথিত্ব নাই। তাহাদের প্রতি তাঁহাদিগের সেরূপ স্নেহ নাই. সেরূপ মমতা নাই।"

(ক) S. C. Grier—Letters of Wanren Hastings to his wife.

(খ) He told me that his practical experience of law was very slight. He never was engaged (he said) in more than one case. He was employed to defend a women who was tried for stealing Chikens, and his eloquence procured for her— a convi tion.—J. H. Stocqueler, Memoirs.

(গ) "Every native of Hindusthan I verily believe is corrupt." Cornwallis Correspondence. Part 1 P. 282

(ঘ) I grieve that the distance kept up between the Europeans and the natives, both here and at Madras is such that I have not been able to get acquainted with any native family.—Maria Graham. Journal of a residence in India 1809

(ঙ) But little or no attention is paid to the vakils of the Native Courts by Lord Wellesly. They are not permitted to pay their respects to him oftener than two or three times a year, which I think is as impolitie as ungracious:—Pallmer to Hasting letter 10 oct 1802.

(চ) Every youth, who is able to maintain a wife, marries. The conjugal pair be ome a bundle of English prejudices and hate the Country, the natives and everythings belonging to them etc···" (observation on India) anon P-179. Memoirs of Mrs. Fenton P. 242

সাহিত্য সংবাদ

সোভিয়েত রাশিয়ায় পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে কোন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসরণ করা হয় তার সত্যানুসন্ধান সম্প্রতি সংঘটিত হয়েছে। এই ধরণের সমীক্ষা যে দুরূহ ব্যাপার তা বলাই বাহুল্য। পক্ষপাত শূন্য উদার মনের অধিকারী যিনি, কেবলমাত্র তাঁর পক্ষেই এই দায়িত্বপূর্ণ অনুসন্ধানপর্ব্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। বর্ত্তমান সোভিয়েত প্রকাশনের পশ্চাতে যে আদর্শগত নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে তার বিশ্লেষণ উপলক্ষে হাণ্টার কলেজের রুশ ভাষার অধ্যাপক ডক্টর মরিস ফ্রিডবার্গ বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ নিযুক্ত আছেন। সম্প্রতি তাঁর সেই জ্ঞানলব্ধ তথ্য এবং তত্ত্ব পাঠক-সমাজের দরবারে পেশ করেছেন। ডক্টর ফ্রিডবার্গ সংকলিত তথ্যের প্রাথমিক পর্যায় একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যা গুরুত্বপূর্ণ এবং কালানুগ।

ডক্টর ফ্রেডবার্গের গবেষণামূলক রচনাটি পাঠ করে বহু নূতন কথা জানা গেল বটে, কিন্তু আরো এমন অনেক প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আছে যে, যার সদুত্তর লাভ করা আপাততঃ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়, কারণ সোভিয়েত কার্য্যক্রমের কোন সংবাদই পূর্ব্বাহ্নে পাওয়া অসম্ভব বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং কালের দিনপঞ্জীর ছেঁড়াপাতায় যে আঁচড় পড়বে তাই-ই হবে আমাদের সত্যানুসন্ধানের একমাত্র উপকরণ।

গত বৎসরে সোভিয়েত প্রকাশন সংস্থা প্রায় এক বিলিয়ন পুস্তক পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশ করেছে। যদিও এই বিপুল প্রকাশনের তিন-চতুর্থাংশ সোভিয়েত সরকারের প্রচার কার্যে এবং সোভিয়েত সাহিত্যের আত্মপ্রকাশে ব্যয়িত হয়েছে কিন্তু আশার কথা এই যে বাকী এক-চতুর্থাংশ পুস্তক, পুস্তিকা উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান ক্লাসিকের আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছে।

শোনা যায় সোভিয়েত সরকার জার আমলের সব কিছুই, এমন কি সেকালের ঢাল-তরোয়াল পর্য্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক নিদর্শন হিসাবে যাদুঘরে সাজিয়ে রেখেছেন, কিন্তু জার আমলের সাহিত্যকে এখনও ফসিলে পরিণত করেননি।

এর কারণ কি? জার আমলের সাহিত্যে কি সামন্ততন্ত্রের গন্ধ নেই? কিম্বা সে যুগের সাহিত্যেকরা কি কম্যুনিজমের মাপকাঠিতে বুর্জ্জোয়া খেতাব লাভ করার অধিকারী ছিলেন না? ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের মহৎ সৃষ্টি এখনও যাদুঘরের দ্রষ্টব্য বস্তুতে পরিণত হয়নি, এবং পৃথিবীর পাঠকসমাজের নির্ম্মল আনন্দের অফুরন্ত আকর হয়েই জীবিত আছে। আর ভাগ্যের এমনই পরিহাস এই যে সেই সুন্দর সৃষ্টিগুলির রক্ষক বর্ত্তমান সোভিয়েত সরকার, যাঁদের ম্যানিফেস্টো জার আমলের সব কিছুকেই সামন্ততন্ত্রের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করে ইজমের সফলতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়েছে।

কিন্তু জার আমলের সাহিত্যের প্রতি এত কৃপাদৃষ্টি কেন ?

এ প্রশ্নের উপর যাঁরা আলোকসম্পাত করতে পারেন তাঁরা নীরবতাই পছন্দ করেন। সুতরাং কয়েকটি প্রতিপ্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। যেমন সোভিয়েত আমলে সাহিত্যের যে ফসল ফলেছে তার মধ্যে কটিই বা বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্থান পাবার মত গুণ সম্পন্ন ? সোভিয়েত নিয়মানুবর্ত্তীতায় বৈষয়িক উন্নতির যে অতুলনীয় নিদর্শন পাওয়া গেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব্ব কিন্তু অপরপক্ষে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। (এখানে স্বভাবতঃই অন্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকেও তো তেমন উচ্চস্তরের সৃষ্টির নিদর্শন ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে না। সত্যই উচ্চস্তরের সাহিত্য সৃষ্টির অভাব নিয়তই অনুভব করা যাচ্ছে। কারণ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট, প্রতিভার অভাব।) কিন্তু সোভিয়েত প্রচার যন্ত্রের কল্যাণে এতদিন রাশিয়ার সর্ব্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির কথাই আমরা শুনে আসছি অথচ চারুশিল্পের ক্ষেত্রে সোভিয়েতের তেমন সমৃদ্ধি ঘটেনি। সুতরাং ফলতঃ দেখা যাচ্ছে যে ইজমের কঠোর শাসনে হয়ত জঠর দাবানলের প্রশমন হতে পারে কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সে শাসনের কোনও মূল্য আছে কি ? সেখানে ইজমের শাসন ফলপ্রসূ নয়, মনের ক্ষুধা মেটাতে সে অক্ষম। সোভিয়েত শাসনের পঁয়তাল্লিশ বৎসরে ইজম লাঞ্ছিত বলয়ের সংঘর্ষণে যে দু একটি স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়েছে তাঁদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আজ আর সাহিত্য পাঠকের অজানা নেই।

এই দৈন্যতা ঢাকতেই কি সোভিয়েত সরকার জার আমলের স্রষ্টাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন ? কিম্বা রুশ জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য সোভিয়েত সরকারকে জার আমলের কাছে হাত পাততে হয়েছে ? কারণ গত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সাল তামামি একটি বাস্তব ধারণার ছায়াই আমাদের মনের মধ্যে ফেলে, তা হল—সোভিয়েত আমলে যাইই ঘটুক সাহিত্যের ফসল ভাল ফলেনি। যা ফলেছে তা পূর্ব্বসূরীদের ঐতিহ্যবাহী তো নয়ই বরং ফরমায়েসি সাহিত্যের নিদর্শন মাত্র ! সুতরাং ঐতিহ্যের পরিচয়ে কৌলিন্য বজায় রাখতে সোভিয়েত সরকারকে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ভাণ্ডারের জমার খাতার পাশে ঋণের অঙ্কটি স্পষ্ট করে লিখে রাখতে হয়েছে।

এদেশের মুনি ঋষিরা ঋণ করে ঘি নামক বস্তু সেবনের সৎপরামর্শ দিয়ে গেছেন, সেইজন্য ঋণকে আমরা শাস্ত্র সম্মত সামাজিক আচার হিসাবে আজও পালন করে যাচ্ছি। সুতরাং সোভিয়েতের এই ঋণ আমাদের সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কিছু অশাস্ত্রীয় বলে মনে হয় না বরং আমাদের পক্ষে শাপে বর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা না হলে উনবিংশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যরথীদের অপূর্ব্ব সৃষ্টির পরিচয় এত সহজে আমরা পেতাম না। সোভিয়েত প্রকাশনের কৃপায় আজ আমরা পুশকিন, দস্তয়েফস্ক, তলস্তয়, তুর্গেনিফ, শেকফ্, মায়াকোফ্স্কি প্রমুখ প্রতিভাধরগণের রচনা সুলভমূল্যে সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। অবশ্য এই প্রকাশন ব্যবস্থার পিছনে সোভিয়েত প্রচার যন্ত্রের একটি সফল কার্য্যক্রম লক্ষ্য করা যায়।

ডক্টর ক্রিডবার্গ বলেছেন, জার আমলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে বলশেভিক বিদ্রোহের পূর্ব্বে তার পরিচয় ইয়োরোপের জনসাধারণের কাছে পৌছাত না, উচ্চ শিক্ষিত এবং প্রগতিবাদী কয়েকজন কিঞ্চিৎ সংবাদ রাখতেন মাত্র। কিন্তু সোভিয়েত সরকার স্থাপন হওয়ার পর রুশীয়

সাহিত্যিকদের রচনার পরিচয়, সোভিয়েত প্রকাশন ইয়োরোপের তাবৎ জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, যার জন্য তাঁরা সকলের প্রশংসাভাজন হয়েছেন। আজ পৃথিবীর এমন কোনও দেশ নেই যেখানে সোভিয়েত প্রচার সাহিত্যের পাশে দু-একটি রাশিয়ান ক্লাসিক বিক্রিত হয়নি।

সোভিয়েত প্রকাশনের এই উদ্যোগ যে কেবল দেশে দেশে সুলভ মূল্যে সৎসাহিত্য পরিবেশন করেছেন তা নয়, সোভিয়েত জনসাধারণের পাঠস্পৃহাকেও একটা সুষ্ঠু পথে চালিত করছে ক্লাসিক সাহিত্য পাঠের সুযোগ দান করে। সোভিয়েতের এই কার্যক্রমের প্রশংসা করে ডক্টর ফ্রিডবার্গ যে তথ্য প্রকাশ করেছেন তা আপাততঃ অসম্পূর্ণ হলেও অনেক নূতন তথ্য আমাদের চমকিত করেছে। তাঁর পরবর্তী অনুসন্ধানের ফলাফল জানবার জন্য সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রইলাম।

নূতন গ্রন্থ

সমারসেট মম—এ গাইড : নরেন্দ্র ব্রাণ্ডার

মমের সাহিত্যে মানব মনের যে বন্ধুর এবং তীর্যক প্রতিচ্ছবি দেখে আমরা আতঙ্কিত এবং চিন্তান্বিত হই তার সবটুকুই কি সাহিত্য-কল্পনা মাত্র? তাঁর কাহিনীর মধ্যে সত্যের অংশ কতটুকু? মমের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আমরা বলব যে তাঁর কাহিনীতে কল্পনার স্পর্শ কিঞ্চিৎমাত্র, অবশ্য অলঙ্কারের সজ্জা আছে; যা প্রকৃত শিল্পীর হাতে যথার্থ হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। যুদ্ধপূর্ব কাল থেকে যে অপূর্ব বাকধারার মোহে তাবৎ পাঠক মন আকৃষ্ট হয়ে আছে তা মমের একান্ত নিজস্ব এবং অদ্বিতীয়, কারণ গল্পের অমন জমাট বুনন বিশ্বসাহিত্যে প্রায় বিরল বলা চলে। কিন্তু ইদানীং মমের যে বিরূপ সমালোচনা হচ্ছে তার মূল্য কতটুকু তার বিচার পাঠক সমাজ করবেন। তবে তাঁকে ছিদ্রান্বেষী সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্নিত করার যে চেষ্টা চলেছে তার বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করা রইল।

মমের প্রভাব এদেশের বর্তমান সাহিত্যে কিরূপ প্রকট তার উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব না কিন্তু একটি কথা না বলে পারছি না। বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে মমের ভাণ্ডার লুঠ করে সাহিত্যক নামধেয় কয়েকজন বেশ মনোমত আসর জমিয়ে বসেছেন কিন্তু স্বীকৃতির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। কি দরকার? গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক—অতএব ভাবের ঘরে চুরি কর, কিম্বা অত পরিশ্রমেরই বা কি দরকার? ধুতি-শাড়ী, পরিয়ে হুবহু মমের ভাবানুবাদ কর তা'হলেই মোক্ষপ্রাপ্তি। সুতরাং স্বীকৃতির কোনও প্রয়োজন নেই। হত্যা করার আগে বদনাম দিয়ে হত্যা করাই তো শাস্ত্রীয় নীতি। এ প্রসঙ্গান্তরটুকুর প্রয়োজন ছিল কারণ, মমের প্রভাব কেমন তার কিঞ্চিৎ পরিচয় ব্যক্ত করা হল মাত্র।

যে প্রশ্নের উপর আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। মম কি সত্যই

ছিদ্রান্বেষী সাহিত্যিক? চরিত্রের অনুসন্ধানে যাঁকে সপ্তসাগর পারি দিতে হয়েছে তাঁকে ছিদ্রান্বেষী হিসাবে চিহ্নিত করার প্রয়াসটা সমাজবিরোধী বলেই মনে হয়। সুতরাং কতিপয় সমালোচকের প্রচেষ্টা যে অচিরেই ধূলিসাৎ হবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কেবল চরিত্রের অনুসন্ধানই নয়, চরিত্র চিত্রণে মমের যে দক্ষতা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি তা কি অপূর্ব শিল্পোৎকর্ষের নিদর্শন নয়? মনে করুন, এ্যাশেনডেনের সেই ভারতীয় বিপ্লবীর কথা, সুইৎজারল্যাণ্ডে যার মৃত্যু হয়েছিল তাঁর নাম কি আজও জানতে ইচ্ছা করে না? করে। হয় তো উক্ত চরিত্রটি তাঁর কল্পিত, কিন্তু তা কষ্ট কল্পনা প্রসূত নয়, বরং সার্থক চরিত্র চিত্রণের এক অপূর্ব আলেখ্য। এবং এইখানেই মমের যথার্থ মুন্সীয়ানা। কৌতূহলের কুহক সৃষ্টি করা উচ্চস্তরের শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব; এবং এই ব্যাপারে মম অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললে কিছু অত্যুক্তি করা হয় না।

ইংরাজ লেখকদের কুলপঞ্জীতে মমের স্থান এখন সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি কারণ তাঁর সৃষ্টির আয়ুর উপর তা নির্ভর করছে। তবে তাঁর উপন্যাস এবং নাটকের পাঠক সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে কিন্তু গল্প এবং বিবিধ প্রবন্ধের পাঠক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

সোমারসেট মম—এ গাইড গ্রন্থের রচয়িতা সমালোচক লরেন্স ব্রাণ্ডার মমের সাহিত্য এবং জীবনকথা সংকলনে ব্রতী হয়ে যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা অনুধাবনযোগ্য। ব্রাণ্ডার যে দৃষ্টিকোণ থেকে মম কে বিচার করেছেন তার অনুসৃত আঙ্গিক এক কথায় অভিনব, কারণ মমের ব্যক্তিসত্বার পরিচয় সেখানে নেই। আছে, প্রয়োজনবোধে মমের নাটকীয় আবির্ভাব। গ্রন্থটিতে মমের সৃষ্টির যথাযথ বিশ্লেষণকেই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ব্রাণ্ডার মম সৃষ্ট সাহিত্যের আলোচনাকালে, কাহিনীর পটভূমিকায় মমকে যেখানে প্রয়োজন অনুভব করেছেন সেখানে তাঁকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থিত করেছেন। সুতরাং এ গ্রন্থকে মমের জীবনী গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা চলবে না, এটি একটি যথার্থ পরিচয় পুস্তক মাত্র।

মানব মনের অনুসন্ধানে মম যেমন পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেরিয়েছেন এবং লব্ধ অভিজ্ঞতাকে এক অপূর্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন, তেমনি মম সৃষ্ট সেই সব বিচিত্র চরিত্রের মাঝে মমকেই আবিষ্কার করার আশায় ব্রাণ্ডার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। সুলিখিত এবং কৌতূহলদ্দীপক এই গ্রন্থটি সহজেই পাঠককে আকৃষ্ট করবে, মমের সৃষ্টির মাঝে মমকে অনুসন্ধান করার মধ্যে একটা কৌতূহল মিশ্রিত আনন্দ আছে বৈকি!

Somerset Maugham : *A Guide.* By Lawrence Brander. Oliver & Boyd, London.

রেলস্ থ্রু ক্লে: জ্যাকসন ও ক্রুম।

টেমস্ নদীর তলদেশে যখন টিউব রেল চলাচল সুরু হয় তখন সেই ব্যবস্থার সফলতা সম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ ছিল। কিন্তু প্রায় সত্তর বৎসর পার হয়ে গেছে, লণ্ডনের টিউব রেল একটি দিনের

অন্তও বন্ধ হয় নি বরং শাখা প্রশাখায় বর্ধিত হয়ে মানব কল্যাণে নিয়োজিত রয়েছে।

কয়েকটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রথমে টিউব রেল স্থাপনে ব্রতী হন এবং তৎকালীন জনবহুল লণ্ডনের তলদেশে, সুরঙ্গপথে রেল চলাচলের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু অহেতুক রেষারেষির ফলে যান চলাচল সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হত না। তারপর ক্রমে ইয়ের্কস্, পার্কস, ফ্রাঙ্ক পার্ক এবং এ্যালবার্ট স্টানলি (লর্ড এ্যাশফিল্ড) প্রমুখ কোটিপতিগণের হস্তক্ষেপের ফলে কিঞ্চিৎ নিয়মানুবর্তীতার প্রবর্তন হয়। এঁদের সামগ্রিক প্রচেষ্টার ফলে সব প্রতিষ্ঠানগুলি একীভূত হয়ে লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট এক্সিকিউটিভ নাম গ্রহণ করে টিউবরেল পরিচালনা করতে থাকেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে, ইংরেজ সরকার লণ্ডনের টিউবরেল প্রতিষ্ঠানটিকে জাতীয়করণ করে। জনসাধারণের সেবায় টিউবরেল কি অংশ গ্রহণ করেছে তার ইতিবৃত্ত আজ আর কাউকে ভাবিত করেনা বটে, কিন্তু আধুনিক স্থাপত্য এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের অন্যতম নিদর্শনের পরিচালনার ইতিহাস সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ এখনও আছে বলেই আমাদের ধারণা।

এ্যালান এ. জ্যাকসন এবং ডেসমণ্ড এফ, ক্রুম লণ্ডনের টিউবরেল সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক এবং তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। টিউবরেলের আদ্যান্ত ইতিহাস রেলস্ থ্রু দি ক্লে গ্রন্থটি সুসংবদ্ধ এবং সুখপাঠ্য।

Rails through the clay: By Alan A. Jackson & Desmond F, Croome 400pp. George Allen & Unwin.

অজিত দাস

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য

বিজ্ঞান আজ জ্ঞানকে নানাদিকে সম্প্রসারিত ক'রছে। আজকের চলচ্চিত্র সেই বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ অঙ্গ। যতদিন চলচ্চিত্রের স্ফুরণ হয়নি, ততদিন পর্যন্ত জনসাধারণকে একমাত্র মঞ্চাভিনয়ের রস গ্রহণ ক'রেই খুসী থাকতে হ'তো। মঞ্চাভিনয়ে যে জ্ঞান বা আনন্দের ভাগ কিছু কম তা নয়। আসল বিষয় হচ্ছে নাটক। সেই নাটক যত জ্ঞানগর্ভ, বিষয়বিচিত্র এবং জীবন ও সমাজের সঙ্গে অঙ্গসম্বদ্ধ যুক্ত হবে, ততই দর্শকের মানসিক বুৎপত্তি ও সম্প্রসারণ ঘটবে। একথার অর্থ এই নয় যে নাটকে কেবল জ্ঞানের কথাই থাকবে, রসের কথা থাকবে না। বিষয়টা আসলে তা নয়। যাকিছু পাচ্য, তার সঙ্গে জলের সংযোগ না ঘটলে যেমন কঠিন বস্তু দ্রবীভূত হয় না, তেমনি যাকিছু প্রজ্ঞাশীল বিষয় তার সঙ্গে রসের সংমিশ্রণ না ঘটলে জ্ঞান ললিতধর্মী হয় না। তাই কি নাটক, কি সাহিত্য—সর্বাগ্রে তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হয়, ললিতধর্মী হ'তে হয়। নইলে সে সমাজ ও জীবনের যতবড় আবেদন নিয়েই উপস্থিত হোক না কেন, দর্শক বা শ্রোতা বা অভিনেতা কারুর মনকেই তা স্পর্শ করে না। এই কারণেই বোধ করি নাট্যমঞ্চকে রঙ্গমঞ্চ বলা হয়েছে। রঙ্গ অর্থে ব্যঙ্গ বা প্রহসন নয়, রঙ্গ অর্থে রস। এই রসকে যখন আমরা চিরায়ত দর্শন বা পেরিনিয়াল ফিলজফি'তে রূপান্তরিত করি, তখন আর সে রসের সংজ্ঞায় আবদ্ধ থাকে না, সে হয় জীবনের একটি মহত্তর আনন্দ। শিল্পের জগৎ তাই আনন্দের জগৎ; নাটক সেই আনন্দের একটি বৃহৎ বস্তু।

ইদানিং মঞ্চক্ষেত্রেও অবশ্য বিজ্ঞানের ছায়াপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই। তাতে যত বেশী পরিমাণে ইলেক্‌ট্রিকাল ড্রামা হচ্ছে, ঠিক ততবেশী পরিমাণেই ড্রামেটিক ড্রামা ক'মে আসচে। এ বিষয় নিয়ে আজ নানা মত দেখা দিয়েছে। তা নিয়ে কোনো মন্তব্য করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবু ব'লবো—চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে স্থবিধে রয়েছে, মঞ্চে তা নেই। যেমন ধরুন, কোনো ভৌগোলিক পরিবেশ, মঞ্চে তাকে কৃত্রিম ক'রে নিতে হয়, ছোট ক'রে আনতে হয় সেই পরিবেশকে। অনেক ক্ষেত্রে তার প্রবর্তন আদৌ সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। তার ফলে মানব-জীবনে অরণ্য, সমুদ্র, পর্বত বা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জনপদগুলির আবেদন অসম্পূর্ণ এবং অগ্রাহ্যই থেকে যায়। এই কারণেই নাট্যকারেরা মঞ্চাভিনয়ের স্থবিধের জন্য তাঁদের নাটকে স্থান প্রভৃতির আংশিক ইংগিত রাখেন মাত্র। এখানে দর্শকের জ্ঞান নাটকের সাধারণ বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যায়; নাট্যবস্তুর উপরে যে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব অনেকখানি, তা হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ থাকে না।

কিন্তু চিত্রাভিনয়ে তা নয়। তার স্থান বহু ব্যাপক এবং আবেদন বৃহত্তর। এর কারণ হচ্ছে চলচ্চিত্রক্ষেত্রে আজকের বিজ্ঞানের সহজ প্রবেশ। শুধুমাত্র ক্যামেরা, সাউণ্ড-রেকর্ড আর সেলুলয়েডের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন কালের বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলিকে যথাযথরূপে ধরে রাখা যায়।

এখানে নাটক গড়ে ওঠে বৃহত্তর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে—রঙ্গমঞ্চে যে সুবিধে একেবারেই নেই। ধরুন, নাটকের কাহিনীর একটি যায়গায় বর্ণিত আছে—নায়ক সীমাচলম তখন লছমনঝোলার দুর্গম পথ পেরিয়ে চলেছে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে, নায়িকা মীনাক্ষীরাণী শিলংয়ে তার নিজের ঘরের জানালায় ব'সে বিরহে কাল গণনা করছে নায়কের প্রত্যাগমনের। ধীরে ধীরে ধীরে ঋতুর পরিবর্তন ঘটচে, বর্ষার ঝটিকার মেঘ এসে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে তার ধারাবর্ষণে, শরৎ এসে ফিরে যাচ্ছে তার বোধনের বাদ্য শুনিয়ে, শীত এলো তার মরা ডালের কান্না নিয়ে, তারপর বসন্ত এলো তার রূপের পসরা সাজিয়ে। এমনি করেই বছর কেটে গেল।

মঞ্চে কি এ চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? অথচ ছায়াচিত্রে উল্লেখিত এই দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখতে দেখতে দর্শকেরা একদিকে যেমন ঋতু পরিবর্তনের মাধুর্যে মুগ্ধ হন, তেমনি বিরহিনী মীনাক্ষীরাণীর জন্য অনুতপ্ত হন এবং তীর্থলীলা লছমনঝোলাকে কেন্দ্র ক'রে নায়ক সীমাচলমের দুর্গম যাত্রার ক্লান্তিতে ক্লান্ত হন। এখানে রস আছে, এবং সেই সঙ্গে আছে বহির্জগতের প্রাকৃতিক জ্ঞান; সুতরাং রস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের মননক্ষেত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটচে। রসের সঙ্গে এই জ্ঞান থেকে দর্শক বঞ্চিত হতেন—যদি প্রযোজকের অর্থ সংকোচনের ফলে পরিচালক নাটক থেকে প্রাকৃতিক এই দৃশ্যাবলীকে বাদ দিতেন বা এই দৃশ্যের পরিবর্তে একটি সহজ হাল্কা দৃশ্যের প্রবর্তন করতেন।

কেন একথার অবতারণা ক'রলাম' ক্রমে সেই প্রসঙ্গে আসি।—কাহিনীকার অর্থে আমরা যে সাহিত্যিক সমাজকে বুঝি, প্রধনতঃ তাঁদের রচিত কাহিনীগুলি সাহিত্যের একএকটি প্রাণময় অঙ্গ ও শিল্পধর্মী হয়ে থাকে। কিন্তু এই শিল্পধর্মী সাহিত্যিক সমাজ বাদেও চলচ্চিত্রের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অপর এক সাহিত্যিক সমাজের পরিচয়ও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই সাহিত্যিক সমাজ বা কাহিনীকারদের ভিত্তি প্রধানতঃ চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজকশ্রেণীর উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় পরিচালকেরাও প্রয়োজনের তাগিদে অথবা অর্থানুকূল্যের খাতিরে সাহিত্যকর্ম ক'রে থাকেন। জনৈক প্রযোজকের ইচ্ছে—বাজারের গতি বা ট্রেণ্ড্ অনুসারে কম টাকার মধ্যে একখানি ছবি তুলতে হবে। ভার পড়লো পরিচালকের উপর। কিন্তু এজন্য তিনি-জাতশিল্পী বা যুগসাহিত্যিকদের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার কোনো প্রয়োজনবোধ ক'রলেন না। নিজেই তিনি জোড়াতালি দিয়ে একটি কাহিনী খাড়া ক'রে তার চিত্রনাট্য ও সংলাপ নিজেই রচনা করে নিলেন, সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সঙ্গীতাংশও তাঁর নিজের রচিত হ'লে ভালো হ'তো, অন্যথায় কোনো গীতিকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ক'রতে হ'লো। সব মিলিয়ে তিনি যখন প্রযোজককে প্রভাবিত ক'রতে সমর্থ হ'লেন, তখন সুরু হ'লো শুটিংয়ের কাজ। তারপর সম্পাদনা ও সেন্সারবোর্ড পেরিয়ে ছবি এলো সহর ও মফঃস্বলের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে; দিন-কয়েক দর্শকের কম-বেশী বেশ ভিড় হ'লো, তারপর কিছু প্রশংসা ও ততোধিক নিন্দা কুড়িয়ে কোথায় যে সে-ছবি আত্মগোপন ক'রলো, তার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। একাজে প্রযোজকের ব্যয় অল্পই হলো সন্দেহ নেই; পরিচালক তাঁর একমাত্র পরিচালনার জন্য যে অর্থ পেতেন, একাধারে কাহিনী—চিত্রনাট্য ও সংলাপ তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তার চাইতে আরও কিছু অধিক অর্থ পেলেন। কিন্তু মূল যে ছবিখানির উপর শুধু একটা ব্যবসামাত্রই নয়, জাতীয়শিল্প এবং সেই সঙ্গে বিরাট একটা ঐতিহ্য দাঁড়িয়ে আছে, তা নষ্ট

হ'লো। এদেশে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি গ'ড়ে ওঠার পর থেকে এমন বিনষ্টি আমরা বহুবার বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য ক'রেছি। এর সঙ্গে আরও যে যে টেক্‌নিক্যাল বিষয়গুলি জড়িত আছে, সেগুলোর উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক।

এখানে একথা ব'লবো না যে, কাহিনী রচনা সম্পর্কে উক্ত পরিচালকের ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাহিনী রচনা এক জিনিষ, আর তা শিল্প বা সাহিত্যপদবাচ্য হওয়া আর-এক জিনিষ। সেকাজের জন্য প্রয়োজন হয় সাহিত্যিককে। একটি বিশেষ গুণ ও সৃজনশীল শক্তির দ্বারা সাহিত্যকর্ম সংসাধিত হ'য়ে থাকে। সুতরাং যিনি সাধক শিল্পী তার সঙ্গে সাধারণ ব্যবসা বুদ্ধিজাত লিপিকারের পার্থক্য আকাশপাতাল। গল্প তো সাধারণ রাজমিস্ত্রী আর কিষাণ থেকে সুরু ক'রে যে কোনো মানুষই বানাতে পারে। তার সঙ্গে সাহিত্যিক গল্পের সম্পর্কটা যে নিকটের নয়, তা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি ক'রবেন। যতক্ষণ না সেই উপলব্ধি চিত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক ও পরিচালকবর্গ করতে সক্ষম হন, ততক্ষণ ছবির কৃতিত্ব অর্জন করা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—'যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে।' সাহিত্য সম্পর্কেও সেই একই কথা। প্রকৃত সাহিত্য কখনও প্রকৃত সাহিত্যিক ভিন্ন হয় না। কথা সাহিত্য, গীতিসাহিত্য—সব সাহিত্য সম্পর্কে এই একই কথা। যেহেতু সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নিবিড়তম যোগ র'য়েছে, সেই হেতু এই কথা গুলো এমন ক'রে বলতে হলো। যে কাহিনীকে চিত্রে গ্রহণ করা হবে, তার কতকগুলো বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। হয় তাতে সামাজিক সমস্যা তথা সমাজ সংস্কারের নানা বিষয়ক বস্তু থাকবে, না হয় তাতে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ বিজড়িত গভীর রহস্য থাকবে, অথবা তাতে প্রহসনের আবরণে সমাজ ও জীবনের বিশেষ কোনো তত্ত্ব রূপ পাবে। সাহিত্যেও এই বিষয়গুলিরই প্রাধান্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—সাহিত্যের যা উপজীব্য, চিত্রেরও তাই উপজীব্য। অন্য ভাবে বলা যায়, সাহিত্যে যা আক্ষরিক চিত্রে ও মঞ্চে তাই জীবন্ত সজীব। চিত্রে ও মঞ্চে যে কথা, যে কাহিনী ও যে সঙ্গীত রূপ পাচ্ছে, তা সাহিত্যেরই নায়ক-নায়িকার কথা সাহিত্যেরই কাহিনী ও সঙ্গীত। সুতরাং যে সাহিত্য যত সার্থক কাহিনীসমন্বিত হবে, তার চিত্র রূপায়ণও ততই সার্থক হ'য়ে উঠবে। অনেকে এই ব'লে তর্ক ক'রে থাকেন যে, সার্থক সাহিত্য মানেই সার্থক চিত্র নয়। কিন্তু কেন নয় একথা আমার উপলব্ধিতে আসে না। পাশ্চাত্য দেশগুলির শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও তার চিত্ররূপারোপের প্রতি লক্ষ্য ক'রলেই এ বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের মেধা এবং আর্থিক সামর্থ্য সম্ভবতঃ ততদূর অবধি গিয়ে পৌঁছাবার উপযোগি নয় ব'লেই আমরা দু'য়ের মধ্যে একটা গোলযোগ খাড়া ক'রে আমাদের অযোগ্যতার উপর একটা কৃত্রিম সান্ত্বনার মুখোস এঁটে আশ্বস্ত হ'তে ভালোবাসি। তার ফলে যা হবার তাই হ'চ্ছে। এদেশের শ্রেষ্ঠ কথা সাহিত্যগুলির চিত্রাভিনয় দেখতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা হতাশ হ'য়ে ফিরে আসি। তার একটা কারণের ইঙ্গিত আমি গোড়ায় দিতে চেষ্টা ক'রেছি। আমাদের দেশের কোনো চিত্রপ্রতিষ্ঠানই এ পর্যন্ত তাঁদের চিত্রনির্মাণের আভ্যন্তরীণ কাজে সাহিত্যিককে সংযুক্ত রাখেননি। গ্রন্থকারের সঙ্গে সাধারণতঃ তাঁদের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষণকালের। অর্থকরী সম্পর্কিত একটা কিছু চুক্তি হ'য়ে গেলেই লেখক

পরিত্যাজ্য। তারপর তাঁর কাহিনীর উপর যথেচ্ছ কাঁচি ও রোলার চালনা ক'রে চিত্রে যে বস্তুটি দাঁড়ালো, দেখে লেখক নিজেই স্তম্ভিত হ'য়ে যান—একাহিনী যথার্থই তাঁর নিজের রচিত কিনা!

ইদানিং চিত্রপ্রযোজকদের মধ্যে আরও একটি নতুন সুর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তা হ'চ্ছে ট্রাজেডিকে বর্জন ক'রে চিত্রকে মিলনাত্মক কাহিনীসম্বলিত করা। অর্থাৎ কোনো মহৎ উপন্যাসের পরিণতি যদি ট্রাজিক হয়, তবে যে প্রকারেই হোক তাকে কমেডি ক'রে তুলতে হবে। দর্শক মাত্রেই নাকি কমেডি চায়। সুতরাং দর্শকের যখন দাবী, তখন আর কথা নেই। ফলে গ্রন্থকারের কাহিনী মার খায়। এরকম স্থলে দুটো বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ পাঠকের বহুপঠিত গ্রন্থসম্পর্কে যে ধারণা, ছবি দেখতে গিয়ে সেই ধারণা নষ্ট হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ যে পাঠক বই পড়েনি, সে ছবি দেখে মূল বই সম্পর্কে যে মানসিকতা তৈরী করে, তা লেখকের অনুকূলে না গিয়ে বিরুদ্ধেই যায়। অথচ প্রযোজককে একাজ করতে হয় ব্যবসার খাতিরে। বলতে বাধা নেই যে, ইদানিংকালের কোনো কোনো সার্থক লেখক প্রযোজকের সঙ্গেই তাল দিয়ে নিজের কাহিনীকে নিজেই চিত্ররূপের মাধ্যমে হত্যা করেন। না করলে তাঁর নাকি আর্থিক স্বাচ্ছল্য ঘটে না।

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে চিত্রের মাধ্যমে সাহিত্য দাঁড়াবে কিসের জোরে? অথচ উভয়তঃ এই জাতীয় একটা বৈমাত্রেয় সম্পর্ক দীর্ঘকাল ধরে এদেশে চ'লে আসচে।

কিন্তু কি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, কি শিল্পক্ষেত্রে কোনো দেশেই কোনো স্বেচ্ছাচার বা যুক্তিহীনতা দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব পায়নি। এদেশেও আজ তার কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটতে সুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রক্ষেত্রে কিছুসংখ্যক সাহিত্যসচেতন ব্যক্তির শুভাগমনের ফলে আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটতে সুরু হয়েছে। তাঁরা বুঝেছেন—শিল্পের প্রথম আশ্রয় সাহিত্যে, তারপর নাটকীয় ঘাত সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার চরম সার্থকতা ঘটে অভিনয়ে। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা এমন কয়েকখানি ছবির পরিচয় পেয়েছি—যা সাহিত্যের পূর্ণ মূল্য দিয়েও শিল্পোৎকর্ষে উন্নীত হ'য়ে উঠতে কোথাও বাধা পায়নি। এর জন্য এই নবতম সাহিত্য-সচেতন চিত্রগোষ্ঠীর উদ্যম প্রশংসনীয়। আশা করা যায়, তাঁদের প্রয়োজিত এই পথ ধ'রে আগামী দিনে আরও বহু উদ্যোগী পুরুষ একাজে এগিয়ে আসবেন। সেদিন এদেশে শুধু চলচ্চিত্রেরই জয়জয়কার নয়, সাহিত্যেরও জয়জয়কার।

রণজিৎকুমার সেন

ভারতীয় নাটকে সঙ্গীত

নাট্যশাস্ত্রে ভরতমুনি সঙ্গীত ও নাটককে একই সঙ্গে স্থাপনা করেছেন। পরবর্তী যুগে অবশ্য প্রাচীন কাল থেকেই নাট্যনিরপেক্ষ সঙ্গীত প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু নাট্যপ্রয়োগকালে সঙ্গীত ব্যবস্থাও অব্যাহত ছিল। আমাদের সংস্কৃত নাটক বা পশ্চিমের গ্রীক নাট্যপ্রয়োগকালে সঙ্গীতের ব্যবহার যথেষ্ট ছিল এবং পরবর্তী যুগেও রয়েছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে ও পরবর্তীকালীন প্রাচীন সঙ্গীত

শাস্ত্র রচয়িতারা নাটকে গানের ব্যবহার সম্পর্কে কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু নাটকে ব্যাক গ্রাউণ্ড মিউজিক বা আবহ সঙ্গীতের কোনও উল্লেখ করেননি। সুতরাং ভারতীয় নাট্যব্যবস্থায় আবহ সঙ্গীতের ঐতিহ্য নেই একথা ভাবা স্বাভাবিক।

ভারতীয় সঙ্গীত বলতে নৃত্য গীত ও বাদ্য এই তিনটি বস্তুকে বোঝায় যদিও এই তিনটি শব্দ অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে নৃত্য ও বাদ্য শব্দ দুটির অন্তস্থ 'য' ফলা accompanimentএর ইঙ্গিত করেছে যেমন "গেয়" শব্দটি, গীত শব্দটি নয়। অর্থাৎ নৃত্য ও বাদ্য একক ভাবে বা সমন্বয়ে গীতের অনুগামী হবে এই রকম মনে করা যেতে পারে। এই ধারণার সমর্থনে শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরে "বাদ্যের" পরিচয় দেওয়ার ভণিতাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। শার্ঙ্গদেব বাদ্যের পরিচয় দিয়েছেন চাররকম ভাবে ; যথা—শুষ্ক, গীতানুগ, নৃত্যানুগ ও নৃত্যগীতানুগ। পরে বলেছেন যে বাদ্য প্রয়োগে এই চারটি রীতি উত্তরোত্তর রক্তিপ্রদ। শুষ্ক বলতে এখানে গীত বা নৃত্যের অনুগামী না হয়েও যে বাদ্য তাই বোঝানো হয়েছে এবং শুষ্ক এই শব্দটির মধ্যে নিরস বা নিস্ফলতার ইঙ্গিতও রয়েছে। অন্যত্র তিনি বলেছেন "বাদ্যং গীতানুবর্ত্তীচ"—অর্থাৎ বাদ্য সম্ভারের আয়োজন যতই বিচিত্র হোক বা শিল্পী যতবড় কলাবতই হোন বাদ্যের উৎকর্ষ গীতানুবর্ত্তীতায়।

কিন্তু নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীত রত্নাকর এই দুটি পুস্তকেই বিশিষ্ট স্বর সমাবেশে রসোৎপত্তির রীতি মেনে নেওয়া হয়েছে। গ্রামরাগ জাতিরাগ বা রাগ্র পরিকল্পনার পেছন রসোৎপত্তির ঐতিহ্য রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলছি যে বঙ্গাল রাগাঙ্গটিকে বাড়ব গ্রামরাগ থেকে উদ্ভূত এবং সহ-ও ন্যাস স্বর মধ্যম বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে এটি হর্ষে বিনিযুক্ত হবে। সম্পূর্ণ জাতীয় বসন্ত রাগাঙ্গটিকে শৃঙ্গারের সম্ভোগে বিনিয়োগ করা হয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রামরাগ 'গান্ধার-পঞ্চমে'র পরিচয় প্রসঙ্গে শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে এর গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর গান্ধার এবং কাকলীনিষাদ প্রযুক্ত হয়। এর রস, অদ্ভুত, হাস্য, বিস্ময় করুণ।

এই সমস্ত উক্তি থেকে রাগরূপ ও রস সৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু এই গুলির প্রয়োগ পদ নিরপেক্ষ অর্থাৎ শুষ্ক প্রয়োগের সূত্র কিনা একথা কোনও জায়গায় উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি শার্ঙ্গদেব যেখানে গানের স্বরলিপি করে দেখিয়েছেন সেখানেও কোন নাটকে তার প্রয়োগ সে কথাও উল্লেখ করেননি। জাতিরাগের সাতটি শুদ্ধ জাতির পরিচয় প্রসঙ্গে তাদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন শার্ঙ্গদেব। যেমন,—"ষড়জমধ্যমা," নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে, "গান্ধারোদীচ্যবা," চতুর্থ অঙ্কে বা "কর্ম্মারবী"র বিনিয়োগ পঞ্চম অঙ্কে ইত্যাদি। সেই সঙ্গে গ্রহ, অংশ ন্যাস স্বরের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য দেখানোর ফলে নাট্যব্যাপারে জাতিরাগের ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই কিন্তু এই উদাহরণগুলি সবই গীত প্রয়োগ সম্পর্কে।

সুপ্রাচীন কালে ভারতে বাদ্য যন্ত্রের একক প্রয়োগ সম্পর্কে একটা ঔদাসীন্য ছিল বটে কিন্তু অধুনা এর ব্যতিক্রম দেখতে পাই। মোগল আমল থেকেই কণ্ঠ সঙ্গীতে যেমন কলাবতদের নাম পাই তেমনি পাই ওস্তাদ বীণকার, স্বরোদী ও সেতারীদের নাম। এখন ভারতীয় সঙ্গীতে একক বাজিয়েদের খ্যাতি জগত জুড়ে এবং তাও এই রাগসঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। পুরাকালে

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র বেণু ও বীণা কণ্ঠসঙ্গীতের সহযোগিতায় বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হত এবং নাট্যপ্রয়োগ কালে ধ্রুবা গীতির সহযোগিতায় বীণার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং রঞ্জক স্বর সমাবেশে গ্রামরাগ বা জাতিরাগ সৃষ্টি হলেও তার প্রয়োগ ছিল কেবল কণ্ঠ সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং যাঁরা এই রাগ পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরা বাক্য নিরপেক্ষ রাগ সঙ্গীতের কথা বোধকরি মনেও স্থান দেননি। তাই একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে বীন, সেতার বা সরোদে রাগসঙ্গীতের একক প্রয়োগ কি ভাবে ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় রাগসঙ্গীতের স্বাভাবিক পরিণতিতে দাঁড়ালো।

এখন ভারতীয় রাগ সঙ্গীত পরিবেশনে কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীত উভয়ই বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাণী অবলম্বনে সঙ্গীত পরিবেশনের প্রধান সুবিধা এই যে সুরের রূপ পরিস্ফুট করবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষার সাহায্যে রসসৃষ্টি করা সম্ভব। অন্য দিকে যন্ত্রসঙ্গীত প্রধানতঃ রূপ প্রকাশের সহায়তা করে। গানের কাব্যাংশ যে ভাব ব্যক্ত করছে তার প্রয়োজন মত সুর ও ছন্দ সংযোজন করলে কায়াহীন সুরকে ব্যক্ত করবার একটা সুযোগ হয়। সেই সুযোগ যন্ত্রসঙ্গীতে অনুপস্থিত। এমনকি তান, আলাপ বা তেলেনা ও চতুরঙ্গ ধরণের গানগুলিও দারা, দ্রিম, ওঁ, হরি, তানানানা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে যে ভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম যন্ত্রসঙ্গীতে সেই সুবিধাও নেই। সুতরাং কণ্ঠসঙ্গীত, প্রচলিত রাগ রাগিণী তো দূরের কথা, কখনও বা ভারতীয় রঞ্জক স্বর সমাবেশের পদ্ধতি পরিত্যাগ করেও নূতন পথে নূতন গানের স্তূপ বাড়িয়ে চলেছে অথচ যন্ত্র সঙ্গীতের পরিবেশন পদ্ধতি সেই পুরাকাল থেকে এখনও একই রয়ে গেলো। বড় জোর কয়েকটা স্বরের মিশ্রণে নূতন ছন্দে, বা পরিবেশন পদ্ধতির ঈষৎ হের ফেরের মধ্যে দিয়ে যন্ত্রসঙ্গীতশিল্পীর কিছুটা স্বাধীনতা। তবু যখনই সে কিছু বাজাতে বসে তখন রাগের নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীত চেতনা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। রাগালাপের যেটুকু বাকী থাকে তা হোলো যন্ত্রের মাধ্যমে রাগলক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলা। শ্রোতার কাজ হল সেই যাথার্থটুকু মিলিয়ে নেওয়া। সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের প্রগতি লক্ষ্য করে এই উক্তি করা যেতে পারে যে যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠ সঙ্গীত অপেক্ষা অনেক বেশী সঙ্গীতপাণ্ডিত্য ঘেঁসা (sophisticated) সুতরাং অনেক বেশী classical এবং সেই দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে কণ্ঠ সঙ্গীত উপযুক্ত রচয়িতার সমন্বয়ে অনেক বেশী romantic হতে পারে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের গান।

নাটকের মাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশন ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন রীতি সন্দেহ নেই কিন্তু সেই সঙ্গীত ছিল কণ্ঠ সঙ্গীত। এখন দেখা যাচ্ছে যে সেই সঙ্গীতই ভারতীয় একক যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনের ভিত্তি। এবং একথাও বলা চলে যে যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ক্ষমতা নিতান্তই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। সুতরাং এই পর্য্যায়ে এসে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীত কি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করবে না নূতন পথে অগ্রসর হবে সেকথা ভাববার এখন সময় এসেছে।

নাটকে আবহ সঙ্গীত রচনাকালে বিশেষ করে সিনেমার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন বা ডকুমেণ্টারী ফিল্ম পরিবেশন কালে ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে রাগসঙ্গীতের কনসার্ট অর্থহীনতার নামান্তর বলেই উল্লেখ করা চলে। চলতি নাট্য পরিবেশনায়, এবং রেডিও নাটকে আবহ সঙ্গীত

যে নাটকের পরিপ্রেক্ষিত রচনায় একান্ত অসমর্থ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তার আর সন্দেহ নেই। তবু ইউরোপীয় নাট্যপরিবেশনে আবহ সঙ্গীতের উদার ব্যবহারে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যে নাটকে আবহ সঙ্গীতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি এটাও আশার কথা। আমরা নৃত্যের সঙ্গে যে যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবহার করি তার মধ্যে রাগ সঙ্গীত অপেক্ষা তাল ও ছন্দই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। অথচ ইউরোপীয় নৃত্য পরিকল্পনায় বিশেষ করে "ব্যালে" নাচ পরিবেশনের সময় যন্ত্র সঙ্গীতকে উপেক্ষা করা হয় না। এই সমস্ত উদাহরণ লক্ষ্য করলে মনে হয় যে যন্ত্র সঙ্গীত পরিবেশনে নব পরিকল্পনার স্থান আছে। ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীতের মুক্তির উপায় বোধ করি এই পথে।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

শারদ সাহিত্য প্রসঙ্গে

বর্ষায় নয়, হেমন্তে নয় একেবারে শরতে। চতুর্দিকের দরোজা খুলে সাহিত্যের মেলা বসে যায় এ সময়। এই তো মরশুম। আসুন এই মেলায়, কে কতো সাহিত্য পাঠ করবেন, আসুন। কি চাই কি পাবেন না! বর্ষার মেঘের বিদায়, এবং পাশাপাশি শরতের আকাশে নির্ভার মেঘের আগমন এই মাহেন্দ্রক্ষণেই সাহিত্যের আসরে জোয়ারের পদধ্বনি। কি চাই, কি পাবেন না?

পূজো, অথচ পূজো সংখ্যা নেই আর যাই হোক, এ অনুচিন্তা, আর যেখানেই হোক, অন্তত বাংলা দেশের হৃদয়ে অনুপস্থিত থাকতে পারে না। পারে না। অতএব বাতাসে কাশগুচ্ছের মৃদু হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যিক লেখকদের ঘুম ছুট্; টাইমপিসে এর্লাম লাগিয়ে পরীক্ষার্থীর বিনিদ্র রজনী যাপনের মতো লেখকদের নিদারুণ ব্যস্ততা! উপায় কি সিজিনে ফসল তো অনাবাদী রাখা যায় না! অতএব।

অতএব সাহিত্যিক মহলে ব্যস্ততা, সম্পাদক প্রকাশক মহলে ব্যস্ততা। শ্রীযুক্ত 'ক' বাবুর উপন্যাস চাই-ই চাই। 'অ' পত্রিকায় গতবার চারখানা উপন্যাস আর বিশখানা ছোটগল্প বের হয়েছিল অতএব 'আ' পত্রিকায় এবারে দশখানা উপন্যাস, চল্লিশখানা গল্প থাকা আবশ্যক। যেমন কথা তেমন কাজ। কে বলেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত অমুকবাবুর কলমে ইদানীং কালি সরছে না? সারা বছর তাঁর কলমে কালি সরছে না সরছে না করেও পূজোর মাহেন্দ্রমুহূর্তে দেখবেন কি এক যাদুবলে তাঁর কলম অত্যন্ত সহজভাবে ডবল ডিমাই সাইজে ছাপা অক্ষরে দিব্যি প্রায় দুই হাজার পাতা গড়িয়ে গেছে। শ্রীযুক্ত অমুকবাবুরা বাংলা সাহিত্যের যেহেতু একদা অক্লান্ত সেবক সেহেতু শারদ সাহিত্যে তাঁদের আঁচড় না পড়লে কি চলে! যাই লিখুন তাঁরা, সাপ কি ব্যাঙ,— সেটা বড় কথা নয়, সব চাইতে বড় কথা হলো বিজ্ঞাপনের ব্যানার লাইনে তাঁদের নাম নিদেন পক্ষে ছত্রিশ পয়েন্ট ল্যাডলতে না ছাপা হলে শারদসাহিত্যের বিস্তারিত আয়োজনই যে বৃথা! তদুপরি, একশ্রেণীর সম্পাদক-প্রকাশকের মতে, তাঁদের অনুপস্থিতি মানে সূর্যহীন দিবসযাপন। বিশেষত মরশুমটা যখন শারদসাহিত্যের। অতএব।

আর, বিবেচনা করে দেখতে গেলে এ ক্ষেত্রে পাঠকের যেন কোনো ভূমিকাই থাকতে পারে না। শারদ সাহিত্যের ডালি যে ভাবেই সাজানো হোক, পরিবেশিত হোক, পরিবেশিত বস্তুসম্ভার সম্ভাব্য পাচ্য অথবা অপাচ্য যাই হোক না, সুবোধ বালকের মতো পাঠককে যেন তা হজম করতেই হবে বিজ্ঞাপিত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে তিন টাকায় তিরিশ টাকার উপন্যাসপ্রাপ্তির তৃপ্তিতে সাধারণ পাঠক সাহিত্যের কি পেলাম আর কি পাইনি'র যে হিসেব মেলাতে পারেন না।

অথচ কিছুকাল আগেও এমন অবস্থা ছিল যখন শারদসংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই

সাহিত্যপাঠকের মনকে বিপুল ভাবে নাড়া দিয়ে যেতো। কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো নতুন লেখার পৃষ্ঠাগুলিকে ঘিরে, লেখাগুলিকে ঘিরে। রীতিমত আলোচনা শুরু হতো উৎসাহী মহলে : রীতিমত তুলনামূলক বিচারের আসর সরগরম হয়ে উঠতো : শারদ সাহিত্যকে ঘিরে কী বিপুল উৎসাহ !

আর আজ ? শারদ সাহিত্য আজ যেন বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ ! বিজ্ঞাপন বলতে শারদসাহিত্যগুলির নিজস্ব বিজ্ঞাপনের কথাই বলছি ! কে কতোগুলি উপন্যাস, গল্প পরিবেশন করে বাঙলা সাহিত্যকে ধন্য করছেন, আর তা কতো পৃষ্ঠা জুড়ে বড়াই করে সে জয়ঢাক বাজানই যেন শারদসাহিত্য প্রকাশকমহলের একণের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলত, শারদীয় সাহিত্য বহিরঙ্গের প্রসাধন কলার নিদারুণ ঘনঘটায় অন্তরঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি প্রচেষ্টা যেন অ-স্বতঃস্ফূর্ত। অর্থাৎ যেন নাকের বদলে নরুণ।

বস্তুত, শারদসাহিত্য বলতে যে উৎসাহমূলক ফসল আমরা পেয়ে আসছিলাম তা থেকে ক্রমশই যেন বঞ্চিত হচ্ছি। নাকের বদলে নরুণ নিয়েই যেন পাঠক হিসেবে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। শারদসাহিত্য বলতে যেন এক বস্তা শ্রেণীহীন রচনাসম্ভার প্রসব করে তথাকথিত সাহিত্যিক মহল দায়িত্ব এড়াতে ব্যস্ত ! আর, আশ্চর্য এই যে প্রকাশকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তির প্রতিধ্বনি তুলে তারাও গল্পের মোটামুটি দৈর্ঘ্য কোনক্রমে অতিক্রম করলো কি অমনি উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে দ্বিধা বোধ করেন না। সাহিত্যের পাঠক জানেন, গল্প আর প্রায় গল্প আর তার পাশাপাশি উপন্যাসের মধ্যে কি দুস্তর ফারাক ! বিষয়গত সংজ্ঞা নিয়ে তর্কের অবতারণা এ-ক্ষেত্রে অবান্তর বোধে উক্ত প্রসঙ্গ থেকে বিরত থাকা সমীচীন ; এ প্রসঙ্গে সাহিত্য পাঠকের নিজস্ব ধারণাই যথেষ্ট বলে মনে করি।

কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা আর কতো ঠকবো ? শারদসাহিত্যের সমস্ত বিভাগ সম্পর্কেই পাঠকের আজ এ-জিজ্ঞাসা বিস্তৃত হবার কারণ সঙ্গত এবং প্রসঙ্গত বলেই বর্তমান প্রশ্নের অবতারণা।

জনৈক সাহিত্যপাঠক সেদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলেন যে, তাহলে সাহিত্যও দেখছি একেবারে সিজিন্যাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুজোর গোড়াতেই যেন সাহিত্যরচনার কারখানার দরোজা খুলে যায়। মেশিন খুলে তৈরী হতে থাকে পাইকারী হারে উপন্যাস, গল্প এবং প্রায় গল্প ! এবং তার মূলকেন্দ্রে রয়েছেন সাহিত্যের তথাকথিত মহানায়কগণ ! উক্ত সাহিত্য পাঠকের কথার শ্লেষ এবং রসিকতা প্রসঙ্গত অনুধাবন যোগ্য। শারদসাহিত্যের প্রচলিত আবহাওয়া যেন অনুরূপ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। এখনও পুজো সংখ্যাগুলির সম্পর্কে আমাদের বিপুল আগ্রহ রয়েছে, রয়েছে অন্যতর আকর্ষণ। হয়তো থাকবেও। কিন্তু সাহিত্যের পাঠক হিসেবে যে বিশেষ আগ্রহ ও অধীর ব্যগ্রতা নিয়ে শারদসাহিত্যের উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হই, সন্দেহ হয়, সে উৎসাহ আর কতো কাল জীবিত থাকবে। আশঙ্কা করি সেদিনের, কিন্তু কামনা করি না সেদিনের, যেদিন পুজোয় প্রকাশিত সাহিত্য বলে পত্রিকা হয়তো কাছে টেনে নেওয়া হবে, পৃষ্ঠা ওল্টানো হবে, কিন্তু বিষয়বস্তুর মুদ্রিত অক্ষর গুলির প্রতি হয়তো সে মমতা আর থাকবে না। শারদসাহিত্য ঐ পর্যন্ত ; কাছে টেনে নেওয়া হবে কিন্তু বুকে টেনে নেওয়া নয় ! সাহিত্য জগতে সে-দিন 'বিলম্বিত হউক ; কামনা করি।

কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? অধিকাংশ শারদ সাহিত্য পাঠে কেন ইদানীং সাহিত্য পাঠককে অজীর্ণ নামক অস্বোয়াস্তি উপসর্গের কবলে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে? নাকি সাহিত্য পাঠকেরই গ্রহণ করার একান্ত শক্তিই ক্রমে ক্রমে বিলীয়মান হতে চলেছে? নাকি শিল্পী হিসেবে আমাদের দেবার পালা ফুরিয়ে এসেছে, জমি অনুর্বর, জীবন জিজ্ঞাসা স্তিমিত প্রায়, নাকি…? কি? শারদ অবকাশে শারদ সাহিত্যের কল্যাণে সাধারণ পাঠক যে নিদ্রা বিসর্জন দেন তার বিনিময়ে কেন কেবলি অতৃপ্তির নিঃশ্বাস? অথচ কম পক্ষে বিগত দু' অথবা এক দশক জুড়ে সাহিত্যের অযোধ্যায় যে রামচন্দ্রগণ সিংহাসন অধিকার করে রাজত্ব চালিয়ে চলেছেন সাহিত্য পাঠকের আগ্রহাতিশয্যে বর্ত্তমানেও তাঁরা যথাস্থানে, কিন্তু তারই পাশাপাশি লাবণ্যময়ী সে-অযোধ্যা আজ বহু পরিমাণে শ্রীভ্রষ্ট। অথচ ভ্রষ্টশ্রীকে সৃষ্টির মাধুরী দিয়ে, নতুন জীবনদর্শন, জিজ্ঞাসার আলোকে আরো রূপবতী করে তুলতে তাঁরা যে অপারক, ক্লান্ত তা নয়। আমার বিশ্বাস তা তাঁরা অনায়াসে করতে পারতেন, পারবেনও।

কিন্তু তা পারলে আমরা এই অবসরে এতো অপুষ্ট, পরিণতিহীন, বিকার, অঙ্গীকাররহিত খণ্ড জীবনপ্রবাহের ধূসর ছবি দেখতে পেতাম না। লেখক তাঁর স্বধর্মেই লিখবেন, এবং যেহেতু লেখক সেহেতু লিখবেনই, বেশি লিখবেন ক্ষতি নেই কিন্তু অবশ্যই ভালো লিখবেন এইতো পাঠক হিসাবে আমাদের একান্ত প্রত্যাশা! কিন্তু শুধু লিখে কলেবরই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভালো লেখা কোথায়? জাতির সম্পদ কোথায়? পাঠক হিসেবে আমরা পড়ি আর পড়ি এবং যত বেশি পড়ি যেন ততো তাড়াতাড়ি ভুলে যাচ্ছি। কেন? পাঠক প্রত্যাশা করেন লেখার, ভালো লেখার। জনৈক উৎসাহী পাঠক বলছিলেন, যাঁরা লিখে লিখে ক্লান্ত এবং ক্লান্তিজনিত কারণে আর তেমন লিখতে পারছেন না; এবং পাঠকের জিজ্ঞাসা প্রসারিত হলে তাঁরা সেই দোহাইও পেরে থাকেন, তাঁরা এই অবসরে ক্লান্তি তারণের জন্য শরীরের জন্য মনের জন্য একটু অবকাশ যাপন না হয় করলেনই! তাঁদের সিংহাসন তো রইলই, শ্রান্তি অপনোদনের পর আবার এসে বসবেন; পাঠক আগ্রহভরে সে আগমন লক্ষ্য করবে। এবং সেই এতটুকু অবসরে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিবান সাহিত্যিক শারদমহলে অচিহ্নিত হয়ে থাকছেন তাঁদের দুদণ্ডের জন্যে মহারথীদের সিংহাসন পাহারা দেবার সুযোগ না হয় দেওয়া হলো। সাহিত্য জগতে সে শুভ মুহূর্ত্তের সূত্রপাত হোক।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

দুর্গেশনন্দিনী

'As for poetry: in the last analysis great poetry reflects an unknown in the interpretation and understanding of which all knowldge is refunded into ignorance—Lawreuce Durrell.

লক্ষ্য সেই দুর্জ্ঞেয়া, রহস্যগুণ্ঠিতা দুর্গেশনন্দিনী। প্রজ্ঞা এবং শ্রদ্ধা, কল্পনা এবং অবচেতনা

বিভিন্ন উপায়ে শব্দের সিঁড়ি বেয়ে, তোরণের পর তোরণ পেরিয়ে সেখানে গন্তব্য, কিন্তু সেই গুহ কক্ষে প্রবেশাধিকার কোটিকে গুটিকের, এবং তীরে পা রাখলে অবশ্যই তরী পরিত্যক্ত! বুদ্ধিতে কি হৃদয়াবেগে, গভীর নিষ্ঠায় কিংবা চপল স্ফূর্তিতে যে ভাবেই অভিযাত্রী দুর্গতোরণে প্রবেশেচ্ছু হোন না কেন, সেই সিঁড়িগুলি ব্যবহার করতে হবে; ব্যবহৃত, ব্যবহৃত শব্দের সিঁড়িগুলি। সিঁড়ি ভাঙাটাও যেন অভিযাত্রার আনন্দ। শুধু শব্দ নয়, শব্দমালার বিন্যাসে প্রাচীন ফটকগুলি, রহস্যময় অলিন্দগুলি পার হতে হবে—অনেক তোরণ, অনেক চত্বর; ব্যবহৃত প্রতীক, উপমা ও রূপকমালা। সুতরাং বক্তব্য, দুর্গেশনন্দিনী যদিও দূরান্তরালবর্তিনী, এবং আমরা গমনেচ্ছু, প্রত্যয়ী প্রণয়ী—এই যাত্রায় কি ক্লান্তি বা একঘেয়েমির সুর বাজছে? আধুনিক কবিকে এ বিষয়ে যত্নশীল ও সতর্ক হতে হবে কিনা?

বস্তুলোকে ও চৈতন্যলোকে অধুনাকালের বিপ্লবগুলির ফলাফল কতকগুলি মৌল পরিবর্তন—যা ভঙ্গিতে ও ভাবে এমন প্রভাবী এবং সমালোচকগণ কর্তৃক আধুনিকতার অভিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত। আমরা যুদ্ধোত্তরকালে সেই সামন্তকালীন দুর্গের অনেকগুলি স্তম্ভকে চূর্ণ হতে দেখলাম, এবং নোতুন স্তম্ভ সৃষ্টি হচ্ছে, তাও দেখছি। মূল্যের এই পরিবর্তন স্বভাবতই রীতিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করবে। কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে হবে, যতোই দুর্গ প্রাকার ভাঙছে, দুর্গেশনন্দিনী ততোই অন্তরালবর্তিনী; এই অন্তপুরকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ কবির বহির্জগৎ থেকে অন্তর্লোকের নিতল কোণের দিকে ক্রমশ পদক্ষেপ অধুনাতন কবিদের মধ্যে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। আমি আলোচনায় আধুনিক বাঙালী কবিদের কথাই বলছি। আমার হাতের কাছে দু'খানা অভিজাত কবিতা পত্রিকা আছে, এর শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশী কবিতা 'আমি অথবা তুমি' প্রধান। একথা স্বীকার্য যে কবির আত্মচিন্তা এবং আত্মসমীক্ষার মধ্যে নৈসর্গিক এবং বাস্তবিক সৌন্দর্য ও রহস্যের আবিষ্কার ঘটে, তথাপি আধুনিক কবিদের এই গণতান্ত্রিকতা ও নভকামিতার যুগে আপন অঙ্গন ছায়ায় নিমগ্ন হবার দৃষ্টান্ট দ্যোতনাপূর্ণ। এর কারণ কি? বহির্জাগতিক আলোড়নে অন্তপুরবিলাস বা বহির্লোক ও অন্তর্লোকের সংঘর্ষ? সমাজ ও ব্যক্তির অভিঘাত কিম্বা জড়বিজ্ঞান ও মানস-চৈতন্যের গোপনদ্বন্দ্ব? কারণ নিয়ে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাবেন, আমি শুধু এক আধুনিক কবিতা পাঠকের ভাবনা পেশ করলাম।

যখন বহির্বিশ্বের বৃত্তবলয় পরিবর্ধমান; বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষে ও কলা কৌশলের সর্বাঙ্গীন আধিপত্যে যতোই আমরা দুর্গের প্রাচীন প্রাকারগুলি ধূলিসাৎ হতে দেখছি, ততোই ব্যক্তিগত চিন্তার প্রশ্রয়ে দুর্গেশনন্দিনীর অনুধ্যানে রত হচ্ছি। হিমশৈলটি অর্থাৎ কবির মানস জগৎ ক্রমশই তরঙ্গাঘাতে আপনাকে সলিলাচ্ছন্ন করে রাখছে। অতএব উন্মুক্ত আকাশ, বিদ্যুৎ, রকেট, আণবিক বিস্ফোরণ, গ্রহান্তরের তরঙ্গের জন্য নভাগের একভাগও অবারিত থাকে না। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে, যখন চতুর্দিকে প্রলয় ও আন্দোলন, অপরিচ্ছন্ন ধোঁয়াশা এবং অন্ধ মেঘ, তখন বিশ্বামিত্রের মতোন অন্য এক স্বর্গ সৃষ্টিতে প্রয়াসী তরুণ কবিদল। দুর্গেশনন্দিনী পাতালদেশের কোন এক কক্ষে নির্বাসিতা। অনেকটা যুদ্ধকালীন আশ্রয়ের মতো!

সুতরাং শব্দ, প্রতীক, উপমা, রূপকমালার পৌনঃপৌনিকতা আশু-পরিত্যাজ্য হবে বলে মনে হয় না।

●

মহাকাব্য অনাব্য। গীতিকাব্য নীরব। সুতরাং আধুনিক কবিতা নোতুন প্রণালীতে কল্লোলিত। সে প্রণালী আধুনিক, বঙ্কিম, এবং পরিবর্তনশীল। পদার্থবিদ্যা, নভোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বৈপ্লবিক ভাবনা এবং অন্তর্জগৎ সম্পর্কিত গভীর এষণা আধুনিক কবিতার শৈলীতে অবশ্যই প্রতিবিম্বিত হবে এবং কবি কোন্ বিষয়ে মনোযোগ দেবেন তা একান্তই দেশগত ও ও ব্যক্তিগত। প্রসঙ্গক্রমে প্রশ্ন উঠতে পারে, রামায়ণ ও মহাভারতে তদানীন্তন কালের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ছবি পাই, সামন্ততান্ত্রিক সময়ের রাজসভার বর্ণনা ও সমাজ বিন্যাসের ছবি সেক্সপীয়রে, সাধারণ মানুষের জীবনধারণের প্রতিচ্ছবি মঙ্গলকাব্যে ; কিন্তু অধুনাতম জগতের বিস্ময়কর আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লবগুলির কোন ছবি কি ধরবে না আজকার আধুনিক কবিতার অস্থির দর্পণ? সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন আজকালকার কবিদের কবিতায় কদাচিৎ বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের উল্লেখ। বিদ্যুতের উল্লেখ নেহাৎই কটাক্ষের সঙ্গে উপমার খাতিরে। দু একজায়গায় মোটর, সিনেমা, রেডিও পরিবেশ, অনুষঙ্গের চিহ্ন। সময়ের যন্ত্রণার ও অস্থিরতাব কিনাক্ষ হয়তো আধুনিক কাব্যে পর্যাপ্ত, তবুও মনে হবে এ-কালীন সময় ও দেশের চরিত্র আধুনিক কাব্যে অ-প্রকট। সাগর পারের কবিরা কি করছেন, শুধু তাই কি আমাদের পথ রেখার নির্দেশক হবে! লরবার ক্যাণ্টাসী, অডেনের দার্ঢ্য ও এলিয়টের তীক্ষ্ণতার সমান্তরাল উদাহরণ হয়তো এ দেশের সম্ভব, কিন্তু চন্দ্রলোক আবিষ্কার, গ্রহান্তরে জয়যাত্রা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ এবং জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের স্বাক্ষর কেন আধুনিক কাব্যে বিরল হবে? আধুনিক কবিরা এই অনাবিষ্কৃত মঞ্চ ব্যবহার করতে গেলেই সম্ভবত নোতুন রূপক, উপমা, প্রতীক ও শৈলীর সৃষ্টি হতে পাবে। তবে আগেই বলেছি, কবিতার বিকাশ একান্তই ব্যক্তিগত মেজাজ ও অনুশীলন সাপেক্ষ।

আজকের শিল্পী অনেক তীক্ষ্ণ ও নোতুন সমস্যার সম্মুখীন। শিল্পীর ভূমিকা ক্রমশই দার্শনিকের উচ্চতায় উন্নীত হতে চায়। আত্মজ তন্তুজালের কঠিন বর্ম বহির্জগতের অভিঘাত থেকে বাঁচবার জন্য এবং যথেষ্ট শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হলে সেই বর্ম নিজে ছিন্ন করে শিল্পী তখন বহির্বিশ্বের বিচিত্র সব উদ্যানে বিহরণ করবে, একটি প্রজাপতির মতো—এই আশা আজকের তরুণ কবিদের জন্য অবশ্যই পোষণ করা চলে। দুর্গেশনন্দিনীর আসন অবারিত নক্ষত্রখচিত নভোনীলিমার কেন্দ্রে স্থাপিত হোক। আমরা স্বর্গ-মর্ত এবং পাতাল এই ত্রিলোকেই তার বিজয় পতাকা প্রোথিত করবো॥

বাসুদেব দেব

আমাদের আতিথেয়তা

আজকে ভারতবর্ষের দিকে দিকে পরিবর্তনের একটা ঢেউ লেগেছে। যোজনার পর যোজনায় দেশের চেহারায় একটা আমূল পরিবর্তন আনবার সক্রিয় প্রচেষ্টা চলেছে। (অবশ্য সাফল্য অসাফল্য

বিচারের স্থান এটা নয় কাজেই সে বিচারকে আলোচনার আওতায় আনছি না।) দেশে বিদেশে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল ভারতের খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু লোকলোচনের অন্তরালে ভারতীয় সমাজ জীবনের স্তরে স্তরে নানা ধরণের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তার খবর আমরা ক'জন রাখি বা রাখবার চেষ্টা করি ?

কথাটা মনে হ'ল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী এক ভদ্রলোকের কথা শুনে। ভদ্রলোক দুঃখ করে বলছিলেন যে, আজকাল তাঁদের অঞ্চলে ভর দুপুরে আগন্তুক দেখলে আগের মত কেউ জানতে চায় না, তার গন্তব্য কোথায় ; দূরের যাত্রী হলে মধ্যাহ্ন ভোজনের কি ব্যবস্থা আছে এবং কোন ব্যবস্থা না থাকলে একরকম জোর করে নিজের বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা (আমন্ত্রণ কর্তা ও আমন্ত্রিতের বর্ণনানুক্রমানুযায়ী রাঁধা ভাত ডাল বা রন্ধনোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা হ'ত, তাই ব্যবস্থা) করে না, এমন কি তৃষ্ণার্ত রাহীকে আজকের দিনে শুধু জল দেওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভদ্রলোকের কথায় প্রাচীন রীতি-নীতি তথা সংস্কারের পরিবর্তনে প্রথাগত ক্ষোভ ছিল সুতরাং আধুনিক বলে যাঁরা গর্ব বোধ করেন, তাঁরা একটি তথাকথিত কুসংস্কারের প্রমাণে আনন্দিত হয়ে 'আপদ গেছে বলে' নিশ্চিন্ত হতে পারেন কিন্তু যাঁরা সামাজিক বিবর্তনের ভাল-মন্দ বিচারে প্রস্তুত, তাঁদের এ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ অবশ্য কর্তব্য।

প্রথমেই ভারতীয়দের আতিথেয়তার মূল কোথায়, অন্য দেশের আতিথেয়তার মধ্যে এ ধরণের রীতি তথা প্রথার প্রচলন দেখা যায় কি না সে কথাই ধরা যাক।

আমাদের দ্বিধাবিভক্ত মানসের জন্য আজো বিদেশী উদাহরণই আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে সর্বজনমান্য ও গ্রহণযোগ্য বলে বিচার করা হয়, কাজেই সেখানকার প্রমাণই আগে উদ্ধৃত করতে হয়। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় ডঃ মুজতবা আলি, মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বিদেশ ভ্রমণকারী স্বদেশীয়দের লেখায় অনেক জায়গাতেই বিদেশীদের আতিথেয়তার ভূরি ভূরি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সে-সব প্রাসংগিক তথ্য এখানে প্রকাশ করা রসিক পাঠকের প্রতি কটাক্ষপাত বলে সে চেষ্টা থেকে বিরত থাকছি, তবে তাতে এই তথ্যটুকু সুস্পষ্ট হয় যে, নাগর সভ্যতা যেসব অঞ্চলে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়নি সেখানে অধিবাসীরা স্বাভাবিকভাবেই অতিথি সেবাপরায়ণ, অবশ্য পাশ্চাত্যের মত বস্তুতান্ত্রিক দেশসমূহে অতিথিসেবা ধর্ম বলে গণ্য না হয়ে সাধারণ ভদ্রতার অংগ বলে মনে করা হয়ে থাকে।

ভারতীয়দের মধ্যে অতিথিসেবা কিন্তু ধর্ম বলেই গণ্য হ'ত। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তো দূরের কথা প্রয়োজনবোধে অতিথিসেবায় আত্মদান করাটাও স্বাভাবিক বলেই গণ্য করা হ'ত। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এ সম্বন্ধে অসংখ্যবার উল্লেখ আছে। প্রসঙ্গতঃ একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সবেমাত্র শেষ হয়েছে, সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এমন মহৎ কীর্তি আগে আর কখনো হয়নি। প্রশংসা বাক্য যখন প্রায় চাটুকারিতায় রূপান্তরিত সেই সময় রঙ্গমঞ্চে অদ্ভুত দর্শন এক প্রাণীর আবির্ভাব হ'ল। একদিক তার সাধারণ এক নকুলের আর অন্যদিক সম্পূর্ণ সুবর্ণমণ্ডিত। নকুলটি যজ্ঞস্থলে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়ে গাঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার মানুষী কণ্ঠে বললে, হায় হায়, সব বৃথা! সভাস্থ

সকলে হতবাক হয়ে নকুলটির কাণ্ডকারখানা দেখছিল, এবার তার মানুষী ভাষা শুনে প্রশ্নের ঝড় বওয়ালে, কে সে? কি বৃথা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

নকুল উত্তরে এক মহৎ দানের কাহিনী শোনালে—কুরুক্ষেত্রে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র পুত্রবধূ নিয়ে মহাদুঃখে দিন কাটাতেন। একবার তিন দিন অনাহারে থাকার পর কিছু ছাতু ভিক্ষা পেয়েছিলেন, সকলে সেই সামান্য ভোজ্য ভাগ করে খেতে বসবেন এমন সময় এক অতিথি এসে উপস্থিত। অতিথি নারায়ণের সেবায় একে একে প্রত্যেকের ভাগই দিতে হ'ল। অতিথি পরিতৃপ্ত হলেও গৃহবাসীদের প্রাণ বাঁচল না। সর্ব দেবতার প্রশংসিত এই মহান আত্মদান-ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিয়ে অতিথির ভুক্তাবশিষ্ট কয়েক বিন্দু ছাতু স্পর্শে তার অর্ধ দেহ হিরণ্য আভা পেয়েছে। বাকী অর্ধ দেহকে হিরণ্যাভ করতে সে বহু যজ্ঞক্ষেত্র, বহু মহৎদাতার দানক্ষেত্রে গিয়ে একই ভাবে গড়াগড়ি দিয়েছে কিন্তু কোথাও সফল হয়নি। আজ এখানেও বিফল হ'ল। হতমান রাজসভা মাথা নীচু করে রইল।

কাহিনীর গূঢ়ার্থে প্রকৃত মহত্বের পরিমাপ থাকলেও ভারতীয় অতিথিসৎকার সম্বন্ধীয় ধারণার সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে এ কাহিনীটিতে। এবং এ কাহিনী যে কাহিনী মাত্র ছিল না, এর ঘটনাবলী যে, ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার অংগই ছিল তা বারবার একই ধরণের কাহিনীর পুনরাবির্ভাবে বুঝতে কষ্ট হয় না।

এ ধরণের আতিথেয়তার রেওয়াজ চালু হওয়ার পেছনে যে সামাজিক চিন্তা কাজ করত তা বুঝতে খুব কষ্ট হয় না। তখনকার দিনে আজকের মত দেশের প্রায় সর্বত্র অর্থ ব্যয় করলেই আহার বা আশ্রয় মিলত না। রাহীদের তখন স্থানীয় অধিবাসীদের দয়া ও ইচ্ছার ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। যাতে এই নির্ভরশীলতাকে নীতিতে রূপান্তরিত করা যায় তাই অতিথি সেবা যে পরম ধর্ম তার সোচ্চার ঘোষণা করা হয়েছে বার বার নানাভাবে, নানাশাস্ত্রে, মহাজনদের কথায়, সামাজিক রীতিনীতিতে।

আজকের দিনে অর্থাবিনিময়ে আহার ও আশ্রয় সংগ্রহ অত্যন্ত সহজ হয়ে পড়েছে, অতি দুর্গম স্থান ছাড়া হোটেল নামধেয় বস্তুটি নিতান্ত দুর্লভ নয়। তার ওপর আমাদের শিক্ষিত সমাজের দ্বিধা বিভক্ত মানসের জন্য পূর্বতন সামাজিক রীতিনীতির অনেকটাই আজ আর জীবনের সংগে অংগাংগীভাবে জড়িত নয়। নাগর সভ্যতায় ব্যক্তিস্বার্থসাধক নয় এমন আতিথেয়তা অপ্রোজনীয়, অবান্তর ও চরম বুদ্ধিহীনতার দ্যোতকরূপে গণ্য হয়ে থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও স্বাধীনোত্তর বিশাল পরিবর্তনে, এ ধরণের চিন্তাধারা আজ পল্লীসমাজেও দ্রুত অনুপ্রবেশ করেছে। তার ফলে পূর্বকালীন আতিথেয়তার স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

অধিকন্তু বর্তমানে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোয় যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে পল্লীসমাজের চেয়ে নাগর সমাজের মধ্যেই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দেখা যাচ্ছে বেশী, নাগর সভ্যতার বিলাস উপকরণও পল্লী অঞ্চলে সহজলভ্য হয়ে ওঠায় সেদিক দিয়েও অর্থের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে অধিকতর অনুভূত হচ্ছে।

সব মিলিয়ে তাই অতিথি সেবায় অর্থব্যয় অপব্যয় সমতুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ নিয়ে দুঃখ করে

লাভ নেই, বরং পরিবর্তনশীল সমাজ ও সমাজমানসের পটভূমিকায় পুরাতন রীতিনীতির যে অংশটুকু আজও ব্যবহারযোগ্য মনে হয় সেটুকুর পুনরুদ্ধার ও ব্যবহারই সমীচীন।

রবি মিত্র

শিল্পে রুচি

রুচির ভেতর মহলের কথাটা হোলো নজর, নজর থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে শিল্পের যাচাই; রুচি বলতে হাল্‌কাভাবে বুঝি কোনো কিছুকে বাছাই করবার, পছন্দ করবার সর্ত। স্পটলাইটের মতন আমাদের ধারণাকে যদি গুটিয়ে নির্দিষ্ট ক'রে নিই তবে বলব, শিল্পের মাঝখানে সুন্দরকে চিনতে পারা আর তার দাম বুঝতে পারাই হচ্ছে রুচি।

পছন্দ ব্যাপারটার পেছনে কোন যুক্তি নেই, 'ভালো লাগে' বলেই খালাস, যিনি পছন্দ করেছেন এটুকু জানিয়েই তাঁর সব দায় চুকে গেল। তবু এঁদের রসিক নামের খেতাব দেব। আর সে সঙ্গে যাঁরা শিল্প-সেঁচা সুন্দরের যাচনদার তাঁদের শিরে পরাব রসিকরাজের শিরোপা। কারণ এই রসিকরাজের দল একই মুহূর্তে হৃদয় দিয়ে পছন্দ করেন, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেন—সত্য-মিথ্যে ভালো-মন্দের রায় রেখে যান। এদিক থেকে রুচির গভীর যোগ রয়েছে সমালোচনার সাথে। সব নজরের শেষ কথাটি তো এই সমালোচনাই খোলা গলায় জানিয়ে দেয়, তা ছাড়া শিল্পকে ব্যাখ্যা ক'রে রুচির শোধনও চলে এরই হাতে।

রুচির ব্যাপারে যদি সেরা কিছু থাকে তবে তার দাম বুঝতে পারা নিয়ে আবার নানান সমস্যা চাড়িয়ে ওঠে। আমার বিশ্বাস, দুনিয়াজোড়া মাপকাঠিতে পরখ করলেও প্রতিটি মনই নিজের ভালো-মন্দের খেয়ালে রুচিকে গ'ড়ে তোলে, মনের জমিদারীতে আল গেঁথে তফাৎ হয়ে যাওয়া হরেক রকম মানুষের হাজার রকম ভালো-মন্দের খেয়ালকে চোলাই ক'রে যে রুচি বেরিয়ে আসে তাকে বুদ্ধির চাল-চিত্রে মূর্তির হিসাবে বসাতে পারলেই শিল্পের দেউলে তার দেব-পদ অক্ষয় হ'য়ে থাকবে।

বিচার সদাই জড়িয়ে রয়েছে রুচির সাথে, রুচির আপন-প্রিয় খেলার সাথে। কারণ নিজের যখনই কোনো কিছুকে ভালো কি মন্দ বললুম, বুঝতে হবে তখনই আমাদের রুচি বিচারের আওতায় ধরা পড়েছে। নিছক রূপরস ভোগ করবার পেছনে আছে যুক্তি ছাড়া চিন্তার এলোমেলো উৎসাহ। ফলে সেখানে রুচির বিচার মানে জ্ঞানের বিচার নয়; আর সহজেই বুঝতে পারা যায়, বিশেষ মনের খেয়াল ছাড়া অন্য কোথাও এর ভিত দাঁড়াতেই পারে না। আবার রুচিকে যদি শুধুই বিচারপটুতা বলি তবে তা শুকনো বুদ্ধির মহাজন হ'য়ে ওঠে, রূপরসভোগের সংগে তার কারবার একেবারে বন্ধ হয়। কাজেই, খেয়ালী সমালোচনাই শিল্পের বিচার হয়ে উঠুক, রূপরসে যুক্তি মিলিয়ে তৈরী হোক রুচি। জোরদার যুক্তি দিয়ে ভালো-মন্দের তফাৎ দেখানোই বিচার আর সুরুচি হচ্ছে বিচারের

অনুভূতার অন্য নাম। এদিক থেকে বিচার আর রুচি কিছুটা পরিমাণে জ্ঞানের ব্যাপার, বুদ্ধির ব্যাপার ; এরাই সমালোচনার পঞ্চায়েত সভায় শিল্পের মান ঠিক ক'রে দেয়।

রুচি আর বিচার যতই গাঁটছড়া বাঁধুক, মুহূর্তে গ'ড়ে ওঠা রূপরসাল পছন্দ আর চিন্তা দিয়ে গড়ে তোলা রূপরসাল তৃপ্তির মাঝেকার তফাৎটি কিন্তু এরা দেখিয়ে দিতে পারে না। কারণ রুচি হচ্ছে হঠাৎ আলোর ঝলকানি, আর বিচার হচ্ছে চোরা আলোর তল্লাশি। কোনো শিল্পের সামনে দাঁড়িয়ে রুচি যখন ব'লে ওঠে—একেই তো চেয়েছিলুম, তখন বিচার বলে—একে চাওয়া যেতে পারে ; শিল্পকে হাতে পেয়ে 'খুশি হ'লেই রুচি দেয় হাততালি, বিচার তারই পাশে হাততালি না দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দেয়—হ্যাঁ হাততালি দেবার মতো বিষয় বটে।

রুচি আর বিচারের এই তফাৎ দিয়ে চিনতে পারা যায় নানা রকমের সমালোচনাকে। আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে, নানা রকমের সমালোচনা দিয়েও রুচি আর বিচারকে চিনে নিতে সুবিধে হয়। শিল্প আমাদের কিভাবে কতখানি দোলা দিতে পেরেছে—এই কথাটুকু গুছিয়ে বলাই যদি সমালোচনার নিশানা হয়, তবে রুচি আর বিচার দুটোকেই খেয়ালি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে মন চায় না। এখানে বিচারকে জ্ঞানের ব্যাপার, বুদ্ধির ব্যাপার বলব কোন মুখে! ধরা যাক, কেউ শুধোলেন—শিল্পী তাঁর রচনায় কী ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, আর কেমন ক'রেই বা তা ফুটিয়ে তুলেছেন। তখন শিল্পীর নিশানাকে নতুন করে বোঝাতে গিয়ে এই রুচি আর বিচারই সমালোচনার সরঞ্জাম হ'য়ে ওঠে। এরাই তখন মিলে মিশে নাম নেয় প্রতিভা। বিচার তখন সমালোচকের সব কাজের ঠিক শেষের কলকাঠি।

মন্দ থেকে ভালো, ভালো থেকে ভালোর দিকে ধাপে ধাপে উঠতে গিয়ে বেশিরভাগ শিল্প যেখানে প্রথম হাঁপ ছাড়ে, সেই পৈঠাকেই বলা যাক রুচির মান। ফলে, মান হচ্ছে বিচারের নিক্তি। রুচির মান কখনো বেঁধে দেওয়া যায় না। যুগে যুগে এর চাল বদলায়, বাঁক ফেরে এর চলনও। তাই সেকালের সঙ্গে একালের ভাব নেই, আবার একাল হয়তো আসছে-কালের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। এমনও দেখা গিয়েছে, কোনো সময়ে রকমারি রুচির একই রকম বাজার দর। তবে কাল থেকে কালান্তরে গিয়েও রুচির মান সমান রইলো, এ নজিরেরও অভাব নেই।

এখন দেখা যাক, কীভাবে এই মান ঠিক করা হয়। সব কালের সব মানুষকে যে-রুচি খুশি করতে পারে তাকে মান বলে মেনে নিই। কেবল শিক্ষিতজন কিংবা সমালোচক যে-রুচিকে পছন্দ করেন তাও ক্রমে উঁচু ভাবনার শিল্পজগতে মান হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় কোনো নামজাদা রচনাও রুচির মান তৈরী করে ; তখন নোতুন শিল্পীরা চর্চা করেন ঐ রচনার আদলে, আমরাও ঐ রচনার পাশে রেখে অন্য রচনার ভালো মন্দ যাচাই করি। সার কথাটুক হচ্ছে এই, রুচির মান গ'ড়ে ওঠে রসিকমনের টানাপোড়েন থেকে, শিল্পের রূপকলা থেকে জীবন সম্বন্ধে শিল্পীর ভাবনা আর নজর থেকে।

রুচির মানের আবার দুটো দিক আছে—বাইরের মান, ভেতরের মান। শিল্পের বাস্তব জগত কিংবা আদর্শ জগৎকে ঘিরে মাথা তোলে রুচির বাইরের মান। ভেতরের মনের ভিত রয়েছে রসিক জনের রূপরসাল অভিজ্ঞতার ওপর। বাইরের মানের বিষয় হোলো চোখে-দেখা

দুনিয়ার অনুকরণ। তাই পুরোনো দিনের গ্রীক শিল্পে মূর্তিগুলোকে এত বেশি বাস্তব করে তোলা হয়েছে, মনে হয়, ওরা এক্ষুণি বেঁচে উঠবে ; স্থান কাল মিলিয়ে কথাশিল্পের চরিত্রগুলোকে এমন একটা গতি দেওয়া হয় যার ফলে ওদের আমরা সত্যিকারের জীবন্ত মানুষ বলে ধ'রে নিই, ওদের সুখে দুখে হেসে কেঁদে আকুল হই। রুচির ভেতরের মানের বিষয় হোলো মনের নজর দিয়ে চিন্তা দিয়ে অথবা ভাবকে ফুটিয়ে তোলা। শিল্প আমাদের কীভাবে কতখানি দোলা দিতে পারে, আর এই দোলা-দেওয়া শিল্পের জন্যেই জীবন—এটাই ভেতরের মানের সবচেয়ে বড় কথা।

হৃদয়-নিঙরোনো যে-রঙের তুলির আঁচড়ে শিল্প হয় তিলোত্তমা, তাকেই বলি রুচির দাম। এটি শিল্পের গুণ। রসিকমন যা চায় তার সাথে এর একটা লেনদেনের সওদাগরি চলে। এদিক থেকে মানের সাথে এর একই ঘরানার কুটুম্বিতে। রুচির এই দামকে বনেদ ক'রে সমালোচনার যা কিছু জাঁকালো আসর। যে-শিল্পে রুচির দাম নেই, নিখুঁত শিল্পের গৌরবও তার পাওনা নয়। কারণ শিল্পের সাথে দামের একটা বোঝাপড়া না ঘটলে রসিক মন সেখানে ঘা খেয়ে ফিরে আসে। শিল্পের চর্চাকে কখনো কোতোয়ালী ভঙ্গিতে চোখ রাঙিয়ে চালানো যায় না। তবে সবকিছুকে ধাক্কা মেরে চলবার ইচ্ছে যখন তাকে এমন ক'রে পেয়ে বসে যে নিজের ধাক্কা খাবার পরোয়া থাকে না, রুচির দামই তার খবরদারি করে। আবার রুচির দামের দিকে বেশি নজর দিলে গোঁড়ামি রাজা হবার সুযোগ পায়। এরকম ঝুঁকির ব্যাপারে পাল্লা ঠিক রাখতে পারে একমাত্র রুচির মান। যেহেতু এই মান গ'ড়ে ওঠে শিল্পের চর্চা আর সাধারণের বদলে যাওয়া রুচির মাঝখান থেকে, সেজন্যে সাবেককালের রুচির দাম দিয়ে হাল আমলের রুচির দামকে অনেক সময় শুধরে নেওয়া হয়। অবশ্য এই শোধন চলে নোতুন অভিজ্ঞতার, নোতুন রূপকলার খাতিরে।

রুচির দাম যদি শুধু বাইরের ব্যাপার হয়, তবে শিল্প তার হাজিরা নিয়ে সন্দেহ জাগে। কারণ তা সহজেই বদলে যেতে পারে। অন্যদিকে, তা যদি ভেতরের ব্যাপার হয়, তবে কেউ যখন কোনো শিল্পের অনুরাগী হ'য়ে ওঠেন তখন তিনি অজান্তে নিজের মনের গুণগুলিকে সেই শিল্পের ওপর রেখে রুচির দামের তারিফ করেন। এ কথা মানতেই হবে, রুচির আর বিচারের শিক্ষা না থাকলে কারও সাথে তুলনা ক'রে রুচির দাম বুঝতে পারা অসম্ভব। আমাদের মন টানে ব'লেই রুচির দাম আছে ; আর উল্টো দিক থেকে দেখলে, রুচির দাম আছে ব'লেই তা আমাদের মন টানে। এমনি ক'রে রুচির দাম আর আমাদের মন হাতে হাত মিলিয়েছে।

তবু একটা জায়গায় খটকা থেকে যায় আমরা কি সত্যিই নিজের মনের গুণগুলোকে শিল্পের ওপর রাখি? এর সবটুকু বোধ হয় সত্যি নয়। যেমন, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট দেখলে যিনি নিন্দেয় ফেটে পড়েন তাঁকেও কোনো এক এক মুহূর্তে বাহবা দিতে দেখেছি। না, কোনো সমঝদারের কাছ থেকে পিঠ-চাপড়ানি পাবার লোভে এই বাহবা-দেওয়া নয়, হৃদয়ের আবেগেই এই সাধুবাদ। এখন, অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট সম্বন্ধে কোনো গুণ তৈরী হবার সুযোগ তো তিনি ক'রে দেননি নিজের অন্তরে। তবে কিসের জোরে এই বাহবা! তখনই বলতে হয়, শুধু নিজের মনের গুণগুলোকে শিল্পের ওপর রেখে আমরা রুচির দাম বুঝি না, রুচির দামের তাড়া খেয়ে আমাদের মনের আধমরা গুণগুলোও চাঙা হ'য়ে উঠে শিল্পকে আঁকড়ে ধরে। কাজেই রুচির দাম নিছক বাইরের ব্যাপার নয়,

খাটি ভেতরের ব্যাপারও নয়। এটি সদর অন্দরের মাঝখানকার-গলিপথটুকু, দুদিকেই চলে সমান আনাগোনা।

বাইব্‌লের গল্প আছে, অসীম শক্তিধর স্যামসনকে কয়েদ ক'রে রাখা হয়েছিল। শেষকালে দুটি বাহুর প্রচণ্ডতায় সে বাঁধন ভাঙলো, আর বাঁধন-ভাঙবার হুলুস্থুলে নিজেকে ভেঙে চুরমার করলো। এই গল্পের যে-মানে করা হয়েছে, তা বাইব্‌লেই থাক। শুধু গল্পটিকে যদি রূপক হিসেবে ধ'রে নিই শিল্পের আওতায়, তবে এরই নাম রুচিবিকার। বাঁধা গলিকে টপ্‌কে যাওয়া সব শিল্পেরই খুশিভরা খেয়াল। শিল্পীও চান তাঁর রচনায় নোতুন রুচি এনে রসিককে নোতুন স্বাদ দিতে, যুগের একঘেয়েমির মাঝখানে হাওয়া বদল করতে। নিয়মকে সহজ গতিতে পেরিয়ে গেলে কিছু এসে যায় না, বরং এমনি ক'রে পেরিয়ে গিয়েই যুগের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো নিয়ম পাওয়া যায়। কিন্তু নোতুন রুচির আমদানির জন্যে রসিকে অরসিকে মিলে যখন দল প'ড়ে কোমর বেঁধে মাতামাতি সুরু ক'রে দেন, আর সেই হুল্লোড়ে শিল্প একঝোঁকা হ'য়ে প'ড়ে, তখনই রুচি ওঠে পাঁজিয়ে।

শ্লীল অশ্লীলের প্রশ্ন নয়। আমি বলতে চাই শ্লীলতা-শালীনতার কথা। সেকালে যাকে শ্লীল ব'লে ছেলে বুড়ো একসাথে মিলে উপভোগ করেছে, একালে তাকে দেখলে আমরা চোখে হাত চাপা দিই; আবার একালে অনেক কিছুই হয়তো আসছে-কালের কাছে ন্যাকামি ব'লে মনে হবে। কিন্তু ডাকের সাজ-পরানো মূর্তির মাথার মুকুট চালচিত্র ছাড়িয়ে গেলেও দেখতে খারাপ হয় না ব'লে কোনো কুমোর যদি চালচিত্রের চেয়ে বাইশ হাত উঁচু মুকুট পড়িয়ে দেয় দেবীর মাথায় তবে দেবীর দিকে নজর পড়বে না, দেবীই তখন মুকুটের অলংকার হয়ে দাঁড়াবেন, আর নিশ্চয়ই তা সেকাল একাল আসছে-কাল—সব কালের কাছেই রসাভাসের কারণ হবে। তাই বলছিলুম, শিল্পের পটে জোর খাটবে না। খাটাতে গেলে স্যামসনের পরিণামকেই এগিয়ে আনা হবে।

দেবব্রত চক্রবর্তী

ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সঙ্গীত। শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : শ্রীমাণিক মুখোপাধ্যায়। শিশুভারতী ॥ সোদপুর। মূল্য আটটাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

সঙ্গীত শাস্ত্রের উপর যে সমস্ত প্রাচীন বাংলা বই আছে তাদের গ্রন্থকার হিসাবে রাধামোহন সেন, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের নাম করা যেতে পারে। এঁদের অনুসরণে আরও অনেকে বাংলা ভাষায় সঙ্গীত পুস্তকাদি রচনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত লেখকের উদ্দেশ্য ছিল গুরুশিষ্য পদ্ধতির মাধ্যমে আহরিত সঙ্গীত জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে সঙ্গীত শিক্ষা ব্যবস্থা কিছুটা সরল করা। মৌলিক গবেষণার চেয়েও প্রাচীন মতামতকে সুদৃঢ় করার দিকেই তাঁদের নজর ছিল বেশী। পরবর্তীকালের কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থকারের অনুসরণে কিছু বাংলা বই প্রকাশিত হয়। এই ধরণের বইগুলির মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত মতামত ভরত, মতঙ্গাদি মুনিদের নামে প্রচারিত হয়। অনেকক্ষেত্রে আবার সঙ্গীতকে ভারতীয় অলৌকিকবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার আশায় নানান উদ্ভট শব্দ ও রীতির নাম যোজনা করে ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রকে জগতের কাছে অকারণ ভারী ও দুর্বোধ্য করে তোলবার প্রচেষ্টা হয়। এমনি করে ভারতীয় সঙ্গীতের অনেক মূল্যবান তথ্য গেছে হারিয়ে, কিছুবা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্রমান্বয় ওলোট পালটে বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে।

আলোচ্য বইখানিতে সুধাংশুবাবু প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের খেই ধরে বর্তমান ও অতীত, ইতিহাস ও কিংবদন্তী এবং কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে একটা আপোষের প্রচেষ্টা করেছেন। বিবাদ যেখানে ধ্বংসের অনিবার্যতাকে এগিয়ে আনে, আধুনিক নীতির আনুগত্যে সেখানে আপোষকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই একথা সত্যি কিন্তু আমাদের মতে তার আগে যুক্তিতর্কের সাহায্যে সত্যানুসন্ধানই বিধেয়। সুধাংশুবাবু যখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করেছেন তখন আর প্রাচীন মুনিদের বেদবাক্য উদ্ধৃত না করলেই চলতো। কারণটা বলি।

"ত্রয়ীস্বরে ভারতীয় সঙ্গীত" মূলতঃ একটি সঙ্গীত বিজ্ঞানের বই। ভারতবর্ষের সঙ্গীত চিন্তায় স, গ আর প এই তিনটি স্বরের ব্যবহার বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন মাতৃকার সৃষ্টি ও তাহার সাহায্যে রাগরাগিণীর বিচার করাই বইখানির মূল বক্তব্য। সেখানে অলংকার ও সঙ্গীতের উপর লেখা সংস্কৃত বইয়ের উদ্ধৃতি একটু খাপছাড়া লাগে বিশেষ করে যখন তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান আধুনিক সঙ্গীত গুরুদের নাগালের বাইরে। কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া যাক।

বইখানির পাঁচটি অধ্যায়,—স্বরাধ্যায়, অলংকারাধ্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত, আলোচনাধ্যায় ও পরিশিষ্টাধ্যায়। স্বরাধ্যায় অংশে লেখক বেদ, পুরাণ ও প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থ সম্মত স্বরস্থানের উৎপত্তির কথা বলেছেন। যেমন,—"যে ধ্বনি, নাসা, কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা, মূর্দ্ধা, দন্ত এই

হয় স্থান হইতে উৎপন্ন তাহাকে আমরা সঙ্গীতের আদ্যক্ষর 'স' বলিব। লেখক যেখানে science of acoustics সম্মত কম্পন সংখ্যা বা frequeney of the number of vibration এর প্রসঙ্গে তাঁর মূল বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেখানে এ ধরণের আলোচনার সার্থকতা কোথায়? আবার সেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'কম্পন সংখ্যা'র তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে লেখক বলছেন, "যে পরমাণু যথেষ্ট আকাশ উৎপত্তির কারণ তাহার প্রকম্পনেই নাদের উৎপত্তি। আকাশ হইতে নাদ এবং নাদই ব্রহ্মা অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ। প্রণব পূর্ণনাদ, কেবল সৃষ্টির পূর্বে ছিল এইরূপ আমরা জানিতে পারিয়াছি।" এখানে 'আমরা' বলতে যদি প্রাচীন ঋষিদের বোঝায় তো আলাদা কথা ব্যাপারটা কিন্তু আমরা বুঝিনি। ব্যাপারটা অবশ্য বই পড়ে অনেকদিন বুঝতে চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রাচীন ঋষিদের অনুশীলন পদ্ধতি হয়ত আমাদের আয়ত্তাধীন নয় বলেই হবে, সব চেষ্টাই নিষ্ফল হয়েছে। মোট কথা এটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে ঋষিদের প্রত্যয়ের মধ্যে আমাদের যুক্তির দৌরাত্ম্য চলবে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক আলোচনার মধ্যে এ ধরণের প্রাচীন তত্ত্বোক্তি না করাই যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করি।

অলঙ্কারাধ্যায়টিতেও যথারীতি প্রাচীন অলঙ্কারগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গ্রহ, ন্যাস, অপন্যাস, সন্ন্যাস, গ্রীব ইত্যাদি শব্দগুলির অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস বা প্রাচীন পদ্ধতি বিচার প্রসঙ্গে শব্দগুলির যেটুকু প্রয়োজন তা' বহু বাংলা বইয়ে অনেকদিন আগেই লেখা হয়ে গিয়েছে। আধুনিক সঙ্গীত শিক্ষা বা প্রয়োগকালে এই সমস্ত শব্দের কদিচ ব্যবহার পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে ধ্রুপদ খেয়াল ও ঠুংরী গায়ন পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস যোজনা করা হয়েছে।

পরবর্তী অধ্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত। অলঙ্কারাধ্যায়ের শেষ পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে, "ইহার পরের অধ্যায়ে যে বিষয়টি আলোচিত হইবে তাহা বিশেষ জটিল কিন্তু মৌলিক।" কিন্তু অধ্যায়টি পড়ে 'মৌলিক' শব্দটির তাৎপর্য বোঝা গেল না। কম্পন সংখ্যার সাহায্যে স্বর নির্ণয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ৪ : ৫ : ৬ অনুপাতের স্বরগুলিকে বলেছেন মাতৃকা। এই ধরণের দুটি মাতৃকার জোড়ে (একটি পুরুষ ও অপরটি স্ত্রী) রাগরাগিণীর গঠন প্রণালী বর্ণনার পর মাতৃকার সাহায্যে রাগরাগিণীর শ্রেণী বিভাগের নির্দেশ দিয়েছেন লেখক। লেখক শ্রীকেশব গণেশন ঢেকণে মহাশয়ের একটি আশীর্ব্বাণী তুলে দিয়েছেন এবং শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী মহাশয় বইখানির ভূমিকায় লেখককে "স্রষ্টা" এই আখ্যা দিয়েছেন।

মনে আছে ১৯৩৯ সালে জনৈক সঙ্গীত অনুশীলকের কাছে সর্ব্বপ্রথম মাতৃকার সাহায্যে রাগ রাগিণী বিচার পদ্ধতির বিষয় অবগত হই। তাঁহার কাছেই সর্ব্বপ্রথম ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের লেখা এই বিচার পদ্ধতি সম্বলিত বইখানির কথা জানিতে পারি। বাংলায় লেখা বইখানি দুএকজায়গা থেকে প্রকাশনার ভার নিয়েও তখন ফেরৎ পাঠিয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ ২০ বৎসর পরে ইংরাজীতে সংক্ষিপ্ত আকারে রূপান্তরিত হয়ে বাংলা গভর্মেন্টের অর্থ সাহায্যে বইখানি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। ওরিয়েন্ট লংম্যানস্ প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত Ragas & Raginis বইখানি মাত্র পাঁচটাকা মূল্যে সব বইয়ের দোকানেই পাওয়া যায়।

বইখানি আমরা আদ্যোপান্ত অনেক আগেই পড়েছি। এবং প্রায় তিনবছর আগে সমকালীন পত্রিকায় সমালোচিত হয়েছে। মেরু খণ্ডমেরু ও মাতৃকার সাহায্যে সঙ্গীত বিচারই বইখানির মূল উদ্দেশ্য যদিও লেখক নিজেকে এই রীতির "স্রষ্টা" বলে মনে করেন নি। বস্তুতঃ কোনও বই প্রকাশিত হবার পর সেই একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা নূতন প্রকাশিত কোনও বইকে মৌলিক আখ্যা দেওয়া কি করে সম্ভব হল বুঝি না। বিশেষ করে মাতৃকা সংগঠনের প্রণালী যখন মেজর্ বা মাইনর কর্ডের নামান্তর ছাড়া আর কিছুই না তখন সেই "মাতৃকা"ই বা কতখানি মৌলিক। অমিয়বাবু স্বীকার করেছেন যে মাতৃকার ব্যবহার জ্ঞান গুরু শিষ্য পদ্ধতিতেই তিনি লাভ করেছিলেন এবং এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সঙ্গীতের সঙ্গে ভারতীয় সঙ্গীতের গোষ্ঠীগত অভিন্নতা দেখিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতচিন্তার ঔদার্য্য বিবৃত করেছেন। ত্রয়ীস্বরের ব্যবহার যে শুধু ভারতীয় সঙ্গীতেই নয় সারা জগতেই সেই কথাটা বোঝাবার জন্য মাতৃকাকে ইংরাজীতে "ইউনিভার্সাল" আখ্যা দিয়েছেন।

মাতৃকা ও মেরু সম্বন্ধে অমিয়বাবু বলেছেন, "Shyamlalji said that those technical things, the Meru, the khandameru and the Matrika contained the key to the mystry of Raga & Ragini traditions. When I asked him why he thought so, he straightaway told me that his Guru himself told him such things......Here I must add that this Meru & khandameru are not the things going by the same names in the treatise "Samgit Ratnakara writen by Sarangadeva."

এ সম্বন্ধে সুধাংশুবাবু বলছেন "সগপ এই তিনটি স্বরের একত্রে নামকরণ করা হইল মাতৃকা। ...শ্রেণী বিচারে (মাতৃকার সাহায্যে) যাহা করা হইতেছে তাহা বৈদিক তথা প্রাচীন যুগেরও কোন পুস্তক প্রণেতারা করিয়াছেন কিনা জানি না...মাতৃকার সমষ্টি হইতে আমরা প্রাচীন যুগে কথিত মেরু যাহাকে আমরা আরোহী অবরোহী বলি তাহাই পাইব।...রাগরাগিণীর আরোহী অবরোহীকেই প্রাচীনকালে খণ্ডমেরু বলা হইয়াছে।" লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে এখানে মেরু ও খণ্ডমেরু এই দুইটি শব্দকেই আরোহী অবরোহী আখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে প্রাচীনকালের কথাও বলা হয়েছে। সঙ্গীত রত্নাকরে মেরু ও খণ্ডমেরু সম্বন্ধে আমরা যতটুকু পাই তার মধ্যে আরোহী অবরোহীর কোনও সম্পর্ক আমরা পাইনি। বস্তুতঃ সঙ্গীত রত্নাকরে নষ্টোদ্দিষ্ট তান পরিজ্ঞান সম্পর্কে খণ্ডমেরু গঠন পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। বর্ত্তমান সঙ্গীতের পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যবহারের কোনও নজির পাওয়া যায় না। আসলে উদ্দিষ্ট কূটতান প্রয়োগের প্রস্তার সংখ্যার হিসাব করা হত এই খণ্ডমেরু গঠনের সাহায্যে। অমিয়বাবু এই কথাটারই বোধকরি প্রতিধ্বনি করেছেন। আর একটা কথা,—সুধাংশুবাবু "মাতৃকা" কথাটির ব্যবহার কোনও প্রাচীন পুস্তক থেকে সংগ্রহ করেছেন কিনা জানানান। লেখার ভাব দেখে মনে হল এই নামকরণ বোধহয় তিনি নিজেই করেছেন।

যাই হোক যদি ধরে নেওয়া যায় যে আলোচ্য পুস্তকখানি প্রকাশিত হবার আগে তারাপদবাবু বা সুধাংশুবাবু কাহারও হাতে অমিয়বাবুর বইখানি আসেনি তাহলে তাঁদের মন্তব্যগুলিকে স্বীকার

করে নিতে হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সঙ্গীত এই অধ্যায়ের অনেক মন্তব্য আমাদের কাছে বিচারসহ বলে মনে হয়নি। কয়েকটির প্রসঙ্গে আসা যাক।

১। স্বরসংখ্যার গাণিতিক হিসাবে যে কোনও সঙ্গীতের স্থায়ী অংশকে সুধাংশুবাবু বিচার করেছেন। বিচার পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হল মাতৃকা বিশেষের ব্যবহার গুরুত্ব স্থায়ী অংশের মধ্যে থেকে বের করা এবং কোন কোন মাতৃকা সেই গানের কতখানি অংশ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে তারই ওপরে সেই গানখানি সম্বন্ধে বিভিন্ন সাঙ্গীতিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। কোনও স্বরের প্রয়োগ বহুলত্ব সেই স্বরের স্থায়িত্ব কালের উপর নির্ভর করে এ কথা সকলেই জানেন। মাত্রাই সঙ্গীতে স্থায়িত্বকাল নিরূপণ করে। অথচ গ্রন্থকার স্থায়ীর স্বরসংখ্যার হিসাব করেছেন মাত্রার উপর কোনও গুরুত্ব না দিয়ে। শুধু তাই নয়, ক্রমিক পুস্তক মালিকা থেকে সংগৃহীত স্বরসংখ্যার হিসাবের জন্য আহরিত "মালশ্রী"র উদাহরণ প্রসঙ্গে অনেক যোগে ভুল চোখে পড়ল। ১০টি উদাহরণের মধ্যে প্রায় সবকটির মধ্যেই কিছু কিছু ভুল চোখে পড়ল এবং এইগুলির সঠিক হিসাব করলে সুধাংশুবাবুর অনেক সিদ্ধান্তই পাল্টাতে হবে।

২। বইখানিতে ২৪টি মাতৃকার জোড় সৃষ্টির উদাহরণে ২৪ খণ্ড মেরু বা তথাকথিত আরোহী অবরোহীর সাহায্যে রাগ-রাগিণীর নিরূপণ সমস্যা মেটানো হয়েছে। বস্তুতঃ মূল মাতৃকা জোড় মাত্র ১৬টি ২৪টি নয়। আলোচ্য পুস্তকের মাতৃকা গঠনের উদাহরণে ৭,৯,১০,১৪,১৮,১৯ ও ২২ সংখ্যক জোড়গুলিতে স স্বরের আগমন হলেই একটি তৃতীয় মাতৃকা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি হবে।

৩। আমরা সজ্ঞপকে পুরুষ ও সগপকে স্ত্রী মাতৃকা আখ্যা দেওয়া উচিত মনে করি। কারণ ভারতবর্ষে ভৈরোঁ আদি রাগ বলে পরিগণিত। মালকোষও রাগ নামেই খ্যাত। ভৈরবীকে রাগিণী বলাতে এখনও কোনও লোক আপত্তি করবেন না। ভোরোঁ, মালকোষ ও ভৈরবী নামে চিহ্নিত বেশ কয়েকটি গান ও বাজনার স্থায়ী অংশ নিয়ে দেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভৈরোঁ ও মালকোষে মদস ও ভৈরবীতে দসজ্ঞ মাতৃকা প্রবল। যেহেতু মদস ও দসজ্ঞ যথাক্রমে সজ্ঞপ সগপ শ্রেণীভুক্ত সেহেতু আমাদের নামকরণকেই আমরা উচিত বলে মনে করি।

৪। সুধাংশুবাবুর বিচার পদ্ধতি হচ্ছে ব্যাকরণের সাহায্যে শিল্পের যাচাই করা। তিনি হিন্দোল, শিবরঞ্জনী বা চন্দ্রকৌশ ইত্যাদি রাগ রাগিণীকে অশুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন যেহেতু তাদের মধ্যে মাতৃকার জোড়ের নিদর্শন নেই। এই রাগরাগিণীর স্রষ্টাদের প্রতি সুধাংশুবাবু অবজ্ঞা জানিয়েছেন তাঁদের ভারতীয় সঙ্গীতে অজ্ঞ বলে। আমাদের মতে অনুভূতির প্রতীতিই আর্টের যথার্থ যাচাই। নিপুণ কলাবত কি রীতিতে মাতৃকা গঠনের নিদর্শনকে অন্তরালে রেখে এই সমস্ত রাগরাগিণী পরিবেশন করে থাকেন সে কথা অমিয় সান্যাল মহাশয় Ragas & Raginis গ্রন্থে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এধরণের আরও অনেক মতামত সম্বন্ধে মন্তব্য করা যেতে পারত কিন্তু বাহুল্য ভয়ে নিরস্ত থাকলুম। সুধাংশু বাবু যে অনেক অধ্যবসায়ে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই তবে প্রয়োগ পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বাধীনতার কথাটা স্মরণ রেখে যদি বিশ্লেষণ করতেন তাহলে এধরণের

যুক্তিতর্কের কোনও অবকাশ থাকতো না। বাংলা ভাষায় এই ধরণের বইয়ের এইটিই যে সর্বপ্রথম প্রকাশ সে সম্বন্ধে সন্দেহ আমাদের নেই। অমিয়বাবুর বইখানি পড়ে যদি বইখানি লেখা হত বা সে সম্বন্ধে কোনও উক্তি যদি বইখানির মধ্যে করা হত তাহলে সুধাংশুবাবুর মতামতগুলিকে আমরা হয়ত নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে সমর্থ হতুম।

অমিয়বাবু ও সুধাংশুবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী একদিক থেকে সম্পূর্ণ এক। সেটি হল এই যে দুজনেই প্রচলিত ভ্রান্তিমূলক মতামতগুলিকে খণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছেন। সেদিক থেকে বইখানি পড়ে দেখবার মতন। বইখানির স্বরাধ্যায় ও অলংকারাধ্যায় বাদ দিয়ে বাকি অংশটুকু প্রকাশ করা উচিত। অল্পমূল্য হলেই কিছু কাটতির আশা করা যায়।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

Rain in Indian life and lore : Edited by Sankar Sen Gupta, Indian Publi ations, 3 British Indian street, Cal utta—1. Pri e Rs, 12'00, 8 Pages art Plate Consisting II Photos.

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিপ্রধান দেশের জনজীবনে বর্ষার একটা বিশেষ স্থান আছে। বর্ষা একদিকে জমি উর্বরা করে অপরদিকে তাপদগ্ধ ধরণীকে শীতল করে, নানা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগেও বর্ষাকে অদ্যাবধি মানুষ বশে আনতে সক্ষম হয়নি। ফলে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পেতে যুগে যুগে মানুষ নানাবিধয়সব প্রক্রিয়া, আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে যাচ্ছে। কেননা অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি মানুষের অশেষ দুঃখের কারণ। বর্ষার বন্দনা ও তুষ্টিবিধানের নিমিত্ত মানুষ গান গায়—

"মেঘা. মেঘা মুই তোর ভাই,
এক ফুটা পানি দেরে আউসের ভাত খাই।
কালা মেঘা ধলা মেঘা মুই তোর ভাই।
এক ফুটা পানি দেস তে সাইলর ভাত খাই।
কালা মেঘা ধলা মেঘা তুই মোর ভাই,
এক ফুটা পানি দেস তে আমনের ভাত খাই।"

(কাছাড়)

এইভাবে আত্মীয়তা পাতাবার চেষ্টা করা হয়। ভাই যেমন ভায়ের দুঃখ-দুর্দশায় এগিয়ে আসে বৃষ্টিকেও তেমনি ভ্রাতৃভাবে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানান হচ্ছে—অনাবৃষ্টির হাত থেকে ভাইকে রক্ষা করতে—ফসল রক্ষা করতে। এই কাকুতি-মিনতিতেই যে সর্বদা কাজ হয় এমন নয়। পরে সুরু হয় নানাধরণের সব যাদু ও লৌকিক অনুষ্ঠান। বৃষ্টির কামনায় মেয়েরা ব্যাঙের বিয়ে দেয়

ও অন্তবিধ আচরণ অনুষ্ঠান করে। ব্যাঙের বিয়ের সময় নানাবিধ ছড়া আবৃত্তি করে, যেমন—

"শিক্‌ক্যা ভরা দই,
মটকা ভরা খই
যম রাজার মা মরেছে
পানি পাইথাম কই
কালা মেঘা ধলা মেঘা বাস্‌ল্যা মেঘার ভাই
এক ফোঁডা পানি দেবে মেখে ভিজ্‌জা যাই।
আবের খেলে বেতের বান
ঝরঝরাইয়া মেঘ আন
এক চিরা হলদি
মেঘ নাম জলদি।" (ত্রিপুরা)

যাঁরা এই ধরণের ছড়া আবৃত্তি ও আচার অনুষ্ঠান করেন তাঁদের ধারণা, এভাবে প্রাকৃতিক জগতকে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। অনেক সময়ই এই ধারণা নিয়ে থেকে ওঁরা অনেক সুফল পেয়েছেন বলেই তাঁদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। এ ধরণের বিশ্বাস শুধু ভারতবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সারা পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্য বা অসভ্য মানুষ নির্বিশেষে এ ধরণের বিশ্বাস ও সংস্কার অল্পবিস্তর দেখা যায়। একটু অনুধাবন করলে আরও দেখা যায় যে সারা পৃথিবীর লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মূলত একটা ঐক্যবোধ বিদ্যমান। যার দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব যে কোন এক সময় সারা পৃথিবীর মানুষ একই সংস্কৃতি ও আচার বিচার দ্বারা চালিত হত।

বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য নানা দেশে নানা প্রকার অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। অনুষ্ঠানের স্থানীয় মাহাত্ম্যহেতু পরিবর্তন বাদে মূল সুর প্রায় সর্বত্রই এক যা পূর্বেই বলা হয়েছে। অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পেতে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মেয়েরা এখনও একজন যুবতী মহিলাকে বৃদ্ধা সাজিয়ে তার মাথায় চালচিত্র সমন্বিত কুলো এবং কুলোর উপর কচুরীপানা, মঙ্গলঘট ইত্যাদি স্থাপন করে বর্ষা বন্দনার নানা সঙ্গীত গানে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে। এই দলে অন্য যেসব মেয়েরা থাকেন তাঁরা পায়ে ঘুঙুর দিয়ে নাচেন আর গান করেন—

"ঠাকুরদার ভরা ঘর
বৃষ্টি নামে আড়াই কর
ঠাকুরদারে ভাই দিটি দিটি জল দে জাপ্পরী খেলাই।
চিনা খ্যাতে চিন্‌চিনানি, ধান খ্যাতে হাটু পানি
ঠাকুরদারে ভাই দিটি দিটি জল দে জাপ্পরী খেলাই।" (ঢাকা)

এইভাবে গান গাইতে গাইতে এই দল যে গৃহের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন সেই ঘরের এঁয়োরা বালতি বালতি জল ওদের মাথায় গায়ে ছিঁটিয়ে দিবেন—এসব করলে নাকি বৃষ্টি নামে। তাছাড়া বৃষ্টির দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য উত্তরবঙ্গে এখনও দিগবসনা অঙ্গনাদের নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এই নৃত্যের কারণ স্বরূপ বলা হয়—বৃষ্টির দেবতা ক্রুদ্ধ হওয়াতেই অনাবৃষ্টি এবং বিপর্যয়। যে-কোন

পুরুষের যে-কোন প্রকার ক্রোধ দমন করতে ললনা হাসির উন্মাদনা ও স্ত্রী-সান্নিধ্যে আসার উত্তেজনা যে যাদুমন্ত্রবৎ কাজ করে তা সকলেরই জানা। তাই মধ্যরাত্রে রাজবংশী সম্প্রদায়ের যুবতী কুলবধূ বাদক সহ মাঠের একপ্রান্তে নগ্নাবস্থায় চীৎকার করে নৃত্য করে বরুণ দেবতাকে ডাকেন তাঁর সঙ্গে সহবাসে মিলিত হতে। দেবতা সুখী হলে বৃষ্টিরূপে প্রকৃতির (পৃথিবী) সঙ্গে এসে মিলিত হবেন। সেই বর্ষার গুণে পৃথিবী সম্পদশালিনী হবে। বর্ষাকে এখানে বীর্যরূপে দেখা হয় এবং প্রকৃতির সঙ্গে এই বীর্যের মিলন অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে বরুণদেবের সংসর্গহেতু পৃথিবী গর্ভধারণ করবেন, অর্থাৎ ধনে ধান্যে পুষ্পে সুশোভিত হয়ে উঠে পৃথিবীকে সম্পদশালী সমৃদ্ধশালী করে তুলবেন। অত্যন্ত চমৎকার ভাবে এদিকটি আলোচ্য গ্রন্থে তুলে ধরা হয়েছে।

যে কোন লৌকিক অনুষ্ঠানের মতই বর্ষা অনুষ্ঠানে ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত হানাহানির সুযোগ নেই। এবং এক্ষেত্রে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ই একমত। কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা কোন প্রকারের স্বার্থপরতা লৌকিক সমাজ বরদাস্ত করে না। বর্ষা আহ্বান বা নিমন্ত্রণের পদ্ধতি পৃথিবীর সমস্ত দেশেই বিশ্বাস, সংস্কার ও যাদুবিদ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা অত্যন্ত সততার সঙ্গে গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের সম্পাদনা করে সম্পাদক দেশের একটি অভাব পূর্ণ করলেন যার জন্য তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেতে পারেন। এই সাহসিকতাপূর্ণ ও বলিষ্ঠ মত প্রকাশের সৎ প্রবৃত্তিকে আশীর্বাদ না করে পারছি না।

সত্য বটে, ভারতবর্ষের লোক সংস্কৃতিকেই শুধু সমুন্নত করেনি। ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্যকেও সমপরিমাণে উন্নত করেছে। আলোচ্য গ্রন্থেও তার ছোঁয়াচ বিদ্যমান। ভারতীয় কাব্য ও সাহিত্যে বর্ষার স্থানের সুবিস্তৃত আলোচনা আলোচ্য গ্রন্থে না থাকলেও যা আছে তাও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ঋগবেদ থেকে রবীন্দ্রনাথ অবধি বর্ষার কবিদের কবিতার আলোচনা ছাড়া শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও বর্ষা শীর্ষক আলোচনা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়াতে গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে বলেই মনে করি।

আলোচ্য গ্রন্থে সম্পাদকীয় ব্যতীত ১৯টি প্রবন্ধ, খনার বচন নানাবিধ বিশ্বাস ও আচরণাদিও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তা ছাড়া যে ১১খানা ছবি তার মুদ্রণ চোখকে পীড়া দেয় এবং শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার বসুর দায়সারা গোছের Foreword এই ধরণের উচ্চ মান সমন্বিত গ্রন্থের সুনামকে অনিবার্যরূপে হেয় করেছে।

আলোচ্য গ্রন্থের নাম Rain in Indian life and lore হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা আরও কিছু কিছু স্থানের উপর রচনা লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত যা গ্রন্থখানাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর করতে পারে নি বলে মনে করি। অবশ্য ইতিপূর্বে এ ধরণের কোন প্রচেষ্টা বা গ্রন্থ প্রকাশের কোন ধারণা দেখা দেয়নি। তাই হয়ত সম্পাদক চেষ্টা করেও এ সব স্থানের লেখা সংগ্রহ করতে পারেন নি। যদি তাই-ই সত্য হয় তবে দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তত যাতে অন্যান্য সব রাজ্যের আচরণাদির কথাও আমরা জানতে পারি সম্পাদক যদি তার দিকে একটু দৃষ্টি দেন তবে আমরা তৃপ্তি পাবো। বর্ষা সম্পর্কে ইতঃস্তত অনেক বিক্ষিপ্ত রচনা দেখা যায়। কিন্তু একটা সঠিক মানদণ্ডে ফেলে সেই সব রচনা সমষ্টি সংগ্রহ করে একখানা গ্রন্থ রচনার মধ্যে যে মালীসুলভ

চরিত্র দরকার সম্পাদকের মনটা সেই মালির কাজে বোধহয় এখনও পাকাপোক্ত হয়নি। হলে তিনি আরও কিছু কিছু ভাল ভাল লেখা—তা এ পুষ্পমালায় গ্রথিত করতে হয়ত পারতেন। পরবর্তী সংস্করণের জন্ম আমরা তাই কয়েকটি বক্তব্য রাখছি :—

১। Forwardটি এভাবে রাখার কোন যুক্তি নেই।

২। সম্পাদকীয় মোটামুটি সুলিখিত তবে আরও কিছু ব্যাখ্যা ও নতুন কথা থাকা উচিত বলে মনে করি।

৩। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বহু উৎকৃষ্ট রচনা সংগ্রহ করে গ্রন্থখানার কলেবর বৃদ্ধি ও উপকরণ বৃদ্ধি করা উচিত। সেই সঙ্গে সঙ্গে হয় নিম্নের রচনাগুলি একেবারে বাদ নয় নতুন করে লিখিয়ে তবেই ছাপান উচিত—Rain and the Primitive mind. When the rains came. The relation of rain in marriage. Mechanism in rainfall, Rain making through the ages. Rain compeling ceremonies in W. B. শঙ্কর সেন গুপ্তের Rain brings love প্রচুর তথ্যে পূর্ণ কিন্তু সুলিখিত নয়। এই প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বেশী কথা আবার প্রয়োজনীয় স্থানে কম কথা বলা হয়েছে, যা মোটেই রসোত্তীর্ণ হয় নি। এই প্রবন্ধটিকে অত্যন্ত মনমুগ্ধকর করে লেখার সুযোগ আছে, লেখা উচিতও, বিশেষ করে এই প্রবন্ধের লেখক নিজেই যখন গ্রন্থের সম্পাদক।

অন্যান্ত রচনা সুতথ্য পূর্ণ। বেশ কিছু মুদ্রা প্রমাদ আছে। যদিও মুদ্রা প্রমাদের জন্ম আমি চিন্তিত নই, কারণ এ গ্রন্থ যাঁরা পাঠ করবেন তাঁরা কেউই নিশ্চয় এই গ্রন্থ পাঠ করে ইংরেজী শিখবেন না, কারণ এ গ্রন্থ ইংরেজী সাহিত্যগ্রন্থ নয়। ইংরেজী ভাষা শেখার গ্রন্থ আলাদা। কিন্তু তথাপি বলব আরও একটু যোগ্যতার সঙ্গে এ ধরণের গ্রন্থ সম্পাদনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বৃষ্টির কথা। বিভিন্ন লেখকেরা সেই বৃষ্টির কথা ঠিক মত বলতে পেরেছে কিনা তাই এ গ্রন্থ বিচারে মানদণ্ড বলে আমি মনে করি।

এই গ্রন্থের বিভিন্ন লেখক পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের লোক-উৎসবের কথা বর্ণনা করেছেন। লোক-সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ও লোক-সংস্কৃতির সমুন্নতিতে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠ করে উপকৃত হবেন এবং লোক-সংস্কৃতির উপর যারা গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে চান তাদের কাছে এই গ্রন্থখানা উপাদানের খনির কাজ করবে।

বিমানবিহারী মজুমদার

বিউলাক্স
জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ। প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে এবং পরিবারের সকলকে সাধ্যমত সাজাতে সচেতন হন। আজকের দিনে ত্বকের শ্রীবৃদ্ধি করতে বিউলাক্স বিউটি ক্রীমের জুড়ি নেই।
প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের (ডি, ফিল ও ডি, এস, সি) সুদীর্ঘ গবেষণার ফল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিউলাক্স বিউটি ক্রীম
নিয়মিত ব্যবহারে দেহবর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোরম হয়
বিউলাক্স বিউটি ক্রীমের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য মৃদু গন্ধযুক্ত করা হ'য়েছে
উৎসবের দিনে
boulux
শংকর ইণ্ডাস্ট্রিজ, কলিকাতা

ঝক্ ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
SADHANA
DASAN
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
সাধনা
দশন

শরতের ঝিলমিলভরা সকাল।
আকাশের সাদা মেঘে
হালকা হাসির ঢেউ, শিউলিফুলের
গন্ধে খুশির আমেজ।
সোনারঙ দিনের
হাসিখুশির মেলায়
উৎসবের আনন্দ সার্থক হোক।
পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

একাদশ বর্ষ ॥ কার্তিক ১৩৭০

একজাতি
একপ্রাণ
একতা
দেশের প্রগতি ও প্রতিরক্ষার সংগ্রামে
আমরা প্রত্যেকে এক একটি সৈনিক
এক বছর আগে আমাদের স্বাধীনতা হয়েছিল বিপন্ন। প্রধান মন্ত্রীর উদাত্ত আহ্বানের প্রেরণায় ঐক্যের পথে আমাদের নবজন্ম দেখা দিল। আমরা সবাই এক, সকলেই ভারতবাসী, এই পুণ্য চেতনার পুনরুদয় হ'ল।
এই একতা, এই নবজাগরণের ধারাকে সঞ্জীবিত রেখে দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রাণপণ কর্মপ্রচেষ্টাই আজ আমাদের মহত্তম ব্রত। সদাজাগ্রত সাধনায় আমাদের সংহতি ও স্বাধীনতা সুরক্ষিত ক'রেই আমরা অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে পারি সেই সব বীর জওয়ানদের, যাঁরা আমাদের স্বাধীনতার জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন।
PRO/WBG-131
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অপরূপ
কেশবতী মহিলাটিকেই
জিজ্ঞেস করুন...
উনিই বলে দেবেন টাটার হেয়ার অয়েল মেখেই ওঁর চুলের
গোছা অমন সুন্দর হয়ে উঠেছে! টাটার হেয়ার অয়েল
• মাথার ত্বক শীতল ও পুষ্ট রাখে • চুল সুস্থ ও সবল রাখে
• চুলের রাশ সুবিন্যস্ত রাখে • চুল বাড়তে সাহায্য করে
• এর গন্ধও অতি মনোরম
টাটার কোকোনাট হেয়ার অয়েল—২টি বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত। টাটার ক্যাস্টর
হেয়ার অয়েল—গোলাপের সুরভিযুক্ত। ৩ রকমের সাইজে পাওয়া যায়।
টাটার হেয়ার অয়েল
THOY-47BEN

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হলে,
আপনিও শুনবেন
"বাঃ সত্যই সুদর্শন"
রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সংযত সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূল সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো- কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যার এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।
HERBAL HAIR OIL
কেয়ো-কার্পিন
মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী · কটক

একাদশ বর্ষ ৭ম সংখ্যা

কার্তিক তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূ চী প ত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

Selling Agents:

Ashoka Marketing
Limited.

Manufactured by

ROHTAS INDUSTRIES LTD.

DALMIANAGAR, BIHAR.

Available through a network of stockists.

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১২৪৩ বঙ্গাব্দের ১৯শে কার্তিক অবিভক্ত বাঙ্গলার মৈমনসিংহ জেলার নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত সেরপুর নামক স্থানে চন্দ্রকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত বাগীশ। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইঁহাদের কৌলিক উপাধি ছিল চক্রবর্তী। শৈশবে সুপণ্ডিত পিতার নিকট বাঙ্গলা শিখিয়া চন্দ্রকান্ত তাঁহারই নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও নব্যস্মৃতি পাঠ আরম্ভ করেন। পিতার অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষা সমাপনের উদ্দেশ্যে তিনি নবদ্বীপে আসেন। এখানে তিনি ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্ন বিদ্যারত্নের নিকট ন্যায় ও কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের ধুরন্ধর পণ্ডিতদের নিকট দীর্ঘকাল নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চন্দ্রকান্ত—"তর্কালঙ্কার" উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে কিছুকাল তিনি তাঁহার জন্মস্থানে থাকিয়া দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকটও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নবদ্বীপ হইতে সেরপুরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন ও নিজে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ছাত্রদের শিক্ষাদান আরম্ভ করেন। চন্দ্রকান্ত কোন অধ্যাপকের নিকট সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েন নাই, এইসব বিষয় তিনি স্বাধীনভাবেই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যে চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার পণ্ডিত্যের খ্যাতি ব্যাপ্ত হইয়া যাওয়ায় তাঁহার চতুষ্পাঠিতে বহু বিদ্যার্থির সমাগম হইতে থাকে, তর্কালঙ্কার সমান ভাবে ছাত্রদিগকে সাহিত্য, ব্যাকরণ স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে থাকেন। অগণিত ছাত্রদের অন্নসংস্থানও তাঁহাকে করিতে হইত।

সেরপুরে চতুষ্পাঠি পরিচালন কালে চন্দ্রকান্ত প্রবোধ প্রকাশ (ঢাকা, বাং ১২৭১) ও সতী পরিণয়ম (ঢাকা, বাং ১২৭১) নামে দুইখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। সতী পরিণয়ম্ কাব্যটি কবি কালিদাস রচিত কুমার সম্ভবম্ এর আদর্শে ১৬টি সর্গে লিখিত হয়।

পূর্ববঙ্গের সুদূর পল্লীতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনারত চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দীর্ঘকাল বিশেষ একটি অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই, ধীরে ধীরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তার লাভ করে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজে কলেজ বহির্ভূত ছাত্রদের সংস্কৃত পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহেশচন্দ্র সুদূর পূর্ব-বঙ্গবাসী পণ্ডিত চন্দ্রকান্তকে স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ নামে কলকাতার একজন বিশিষ্ট নাগরিক চন্দ্রকান্তকে সংক্রান্তি সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন করিয়া পাঠান। চন্দ্রকান্ত এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিলে তিনি চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যে সাতিশয়মুগ্ধ হইয়া যান। প্রতাপচন্দ্র এই সময়ে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সামবেদীয় গোভিল গৃহ্য সূত্র গ্রন্থ এ যাবৎ কুত্রাপি প্রকাশিত হয় নাই, এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কোন ভাষ্যও পাওয়া যায় নাই। প্রতাপচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত পূর্ববঙ্গে গোভিল গৃহ্যসূত্রের পুঁথি অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন। ভাষ্যের প্রথম অধ্যায় রচিত হইলে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় উহা পঠিত ও আলোচিত হয়। এই সময় সুবিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল ও সোসাইটির অন্যান্য পণ্ডিতগণ চন্দ্রকান্তের ভাষ্যটির রচনা সৌকর্যে বিশেষ প্রীত হন এবং সভাষ্য গোভিল গৃহ্য সূত্র মুদ্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত ভাষ্য সম্পূর্ণ করেন। অতঃপর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকান্তের সম্পাদিত গোভিল গৃহ্যসূত্রম্ তাঁহার রচিত ভাষ্যসহ "বিব্লিও থেকা ইণ্ডিকা" গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে সভাষ্য গোভিল গৃহ্য প্রকাশিত হওয়ার দীর্ঘকাল পর জার্মানী হইতে উহার একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (Ed by F. knauer. dorpat, 1884)। ইহার পর জার্মান পণ্ডিত হারমান ওল্ডেনবুর্গ এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ম্যাক্সমুল্যর্ সম্পাদিত Sacred Books of the East Series এ প্রকাশ করেন (no 30, 18 6)। চন্দ্রকান্ত সম্পাদিত সভাষ্য গোভিল গৃহ্যসূত্রের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৭-৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গোভিল গৃহসূত্র প্রকাশের পর চন্দ্র-কান্তের খ্যাতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যেও প্রচারিত হয়।

চন্দ্রকান্তের গুণগ্রাহি বন্ধুদের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে তিনি কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা বৃত্তি গ্রহণ করেন। দুইবার তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, দেশহিতৈষী বাগ্মীবর কৃষ্ণদাস পাল, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি হিতৈষিগণের নির্বন্ধাতিশয্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকান্ত সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য, অলঙ্কার ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অবসর গ্রহণে এই পদ শূন্য হয়। এই সময় হইতেই চন্দ্রকান্ত স্থায়ীভাবে কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। চন্দ্রকান্তের কলিকাতায় অবস্থানে এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভূত উপকৃত হয়। সোসাইটির বিব্লিওথেকা গ্রন্থ মালায় চন্দ্রকান্তের সম্পাদনায় এই গ্রন্থগুলি সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল—পরাশর স্মৃতি

(পরাশর-মাধবঃ)—৩ খণ্ড (১৮৮৩-৯৯); উদয়নাচার্য রচিত কুসুমাঞ্জলি প্রকরণম্ (ন্যায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থ)-২খণ্ড, ১৮৮৮-৯৫ ; খণ্ডদেব প্রণীত ভাট্ট দীপিকা (পূর্বমীমাংসা দর্শন বিষয়ক)-১৯০০ ; ত্রিকাণ্ড মণ্ডল : (আপস্তম্বসূত্রার্থ কারিকা—আপস্তম্বীয় যজ্ঞ বিধি, ভাস্কর মিশ্র সোমযাজী কৃত)-১৮৯৮-১৯০৩ ; কাত্যায়ন কর্ম প্রদীপ : (১ম), স্বকৃত টিকাসহ, ১৯০৯ ; গোভিল পরিশিষ্ট -১৯০৯ ; গোভিল পুত্র গৃহ্য সংগ্রহ-১৯১০ ; সায়নাচার্য কৃত—কাল নির্ণয় টিকা-১৮৮৭ ।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি চন্দ্রকান্তকে সোসাইটির সম্মানিত সদস্য (Honorary Member) শ্রেণীভুক্ত করেন। ইতিপূর্বে একান্ত ভাবে সংস্কৃত চর্চাকারী আর কোনও দেশীয় পণ্ডিত এই সম্মানে ভূষিত হন নাই। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ণ হইলে জুবিলী উপলক্ষ্যে গভর্নমেণ্ট প্রাচ্যবিদ্যায় (Oriental learning) কৃতিত্বের জন্য, প্রমুখ পণ্ডিতদের মহামহোপাধ্যায় উপাধি দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দরবারে তাঁহাদের স্থান রাজা উপাধি ধারিদের পরেই নির্দিষ্ট হয়। এই বৎসরই চন্দ্রকান্ত সহ ৮ জন ধুরন্ধর পণ্ডিতকে প্রথম এই উপাধি দেওয়া হয়। চন্দ্রকান্ত ব্যতীত অপর সাতজন উপাধি প্রাপ্তদের নাম—ভুবন-মোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), প্রসন্নচন্দ্র ন্যায়রত্ন (অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ), দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন, শ্রীরাম শিরোমণি, রাখালদাস ন্যায়রত্ন ও তারিণীচরণ শিরোমণি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্যের প্রতি অতিমাত্রায় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহেশচন্দ্র পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে নানা দেশীয় জ্যোতির্বিদদের মত সংগ্রহ করেন। পঞ্জিকা সংস্কার সম্বন্ধে প্রশ্নাবলী রচনা করিয়া উহা তিনি নানাদেশের পণ্ডিতদের নিকট প্রেরণ করেন। মহেশচন্দ্রের অনুরোধে চন্দ্রকান্ত এই প্রশ্নপত্রটি সঙ্কলন করেন। (দ্রঃ—আমি তর্কালঙ্কার (চন্দ্রকান্ত) মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে তাঁহার লিখিত কয়েকটি বিষয়েই তথ্যানুসন্ধান করিয়াছি'—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড,-ডাঃ গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য, পৃঃ ৫৮)। মহেশ চন্দ্র স্মৃতিবিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে মহেশচন্দ্র রচিত প্রশ্নপত্রের উত্তরে প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিত হিসাবে চন্দ্রকান্তের মতামতও সংগৃহীত হয়। মহেশচন্দ্র কৃত এই পুস্তক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (দ্রঃ— তদেব)।

স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধে স্বীয় উদ্যোগে চন্দ্রকান্ত উদ্বাহ চন্দ্রালোক (কলিকাতা, ১৮৯৭), শুদ্ধি চন্দ্রালোক (প্রায়শ্চিতবিধি কলিকাতা, ১৯০৩) ও ঔর্ধ্ব দেহিক চন্দ্রালোক (শ্রাদ্ধ বিধি, কলিকাতা ১৯০৬) নামে তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। স্মৃতি শাস্ত্রের আলোচনায় চন্দ্রকান্ত সবিশেষ স্বাধীন চিন্তা প্রদর্শন করেন। তিনি স্মৃতিশাস্ত্রকে যুগোপযোগী রূপে ব্যাখা করিবার চেষ্টা করেন (দ্রঃ "তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি শাস্ত্রের গতানুগতিক ব্যাখ্যা করেন নাই। স্থানে স্থানে তিনি রঘুনন্দনের ব্যাখ্যাকে স্বীয় যুক্তি দ্বারা অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন"-সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পৃঃ-১৫২)।

চন্দ্রকান্ত রচিত 'প্রবোধ প্রকাশ' ও 'সতী পরিণয়' কাব্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর তিনি রঘুবংশের অনুকরণে ২৪ সর্গে ভারত বংশ সম্বন্ধে 'চন্দ্রবংশ' নামে একটি কাব্য রচনা করেন (কলিকাতা-১৮৯২)। 'কৌমুদী সুধাকর' নামে একটি নাটিকাও চন্দ্রকান্ত

কর্তৃক রচিত হয় (কলিকাতা-১৮৮৭)। চন্দ্রকান্তের অলঙ্কার শাস্ত্র সম্বন্ধীয়পুস্তক 'অলঙ্কার সূত্রম্' ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। বৈদিক ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাতন্ত্র মতানুযায়ী চন্দ্রকান্ত 'কাতন্ত্রচ্ছন্দঃ প্রক্রিয়া' (কলিকাতা, ১৮৯৬) নামে একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ রচনা করেন—উহা পণ্ডিতমণ্ডলী বিশেষতঃ 'ভট্ট মোক্ষমূলর' (ফ্রেড্রীথ্ ম্যাক্সমুলার) কর্তৃক উচ্চ প্রশংশিত হয়।

বৈশেষিক দর্শনে চন্দ্রকান্তের প্রভূত বুৎপত্তি ছিল। তিনি কণাদের বৈশেষিক দর্শনের একটি টিকা—(বৈশেষিক সূত্র, কলিকাতা-১৮৮৭) রচনা করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে যোগদানের বহু পূর্বেই তিনি বৈশেষিক দর্শনের সূত্রগুলিকে কাব্যাকারে গ্রথিত করিয়া তত্ত্বাবলিঃ নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন (কলিকাতা, ১৮৬৯)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রকান্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা দানের দ্বারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদর্শন বিশেষতঃ বেদান্ত বিষয়ে বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দানের জন্য 'শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোসিপ' লেকচার প্রবর্তিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দক্ষিণায় পাঁচ বৎসরের জন্য চন্দ্রকান্তকে সর্ব প্রথম ফেলোসিপ লেকচারার নিযুক্ত করেন। ইতিপূর্বেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া চন্দ্রকান্তকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। শ্রীগোপাল বসু মল্লিক ফেলোশিপ লেকচারার রূপে ১৮৯৮—১৯০২, এই পাঁচ বৎসরে লেকচারাররূপে চন্দ্রকান্ত ৪২টি বক্তৃতা দেন। তাঁহার সর্বসমেত ৩০টি 'লেকচার' দিবার চুক্তি ছিল। প্রথম বৎসরে বক্তৃতায় তিনি সাধারণ ভাবে দর্শন সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা দেন। বাকী ছয়টি বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বৈশেষিক (দুইটি), ন্যায় (একটি) সাংখ্য (একটি) ও পাতঞ্জল (যোগ) দর্শন (একটি)। সাধারণ ভাবে অপরাপর হিন্দু দর্শনের আলোচনা শেষ করিয়া পরবর্তী ভাষণগুলির বিষয়বস্তু বেদান্ত দর্শনের উপর নিবদ্ধ করা হয়। তাবৎ হিন্দুদর্শনের দুরূহ তত্ত্বগুলির বিচার ও মীমাংসা অতি প্রাঞ্জলভাবে সাধারণের বোধগম্য বঙ্গ-ভাষায় পরিবেশন রূপ সুকঠিন কার্য চন্দ্রকান্ত অতি নিপুণতার সহিত সম্পন্ন করেন। এই কার্যে তিনি দর্শন শাস্ত্রের পরিভাষাগুলিকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত ও বোধগম্য করাইতে যে অধ্যবসায় সহিষ্ণুতা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন—তাহা বিস্ময়জনক। চন্দ্রকান্তের পাঁচ বৎসরের লেকচারগুলি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকগুলি বঙ্গভাষার বিশিষ্ট সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় (Lectures on Hindu Philosophy—হিন্দুদর্শন বেদান্ত, ৫ খণ্ড, ১৮৯৮—১৯০২) প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষায় দর্শনশাস্ত্র আলোচনায় পথিকৃতের সম্মান চন্দ্রকান্তের প্রাপ্য। চন্দ্রকান্তের পাণ্ডিত্য ও বঙ্গভাষা প্রীতি সংস্কৃতজ্ঞ নহেন এমন বঙ্গভাষীর নিকট তাবৎ হিন্দুদর্শনের রত্নভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় অলঙ্কার, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, দর্শন, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ৪০ খানি গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মাতৃভাষারও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সাময়িক পত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষায় তিনি কতকগুলি নিবন্ধ রচনা করেন—এইগুলি একত্রভাবে তাঁহার 'শিক্ষা' নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় (সেরপুর, ১৮৮২)। 'ছাত্রমণ্ডলীকে ভারতীয়

শিক্ষাবিষয়িনী নীতির আভাস প্রদান' ছিল এই পুস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধগুলিতে দেখা যায় যে চন্দ্রকান্ত স্ত্রী শিক্ষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষারও তিনি সমর্থক ছিলেন, যদিও আচার-বিচারে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণকে নিন্দা করিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। 'শিক্ষা'গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেন যে প্রাচীন হিন্দুজাতি পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও বিদ্যাদান কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষা সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া তিনি ছাত্রদের চরিত্র গঠন, ব্যায়াম চর্চা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির অপরিহার্যতার উল্লেখ করিয়াছেন। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া যাহা লিখিয়াছেন—তাহা এখনও শিক্ষক সমাজের প্রণিধান যোগ্য বলা যাইতে পারে—'ছাত্রদের বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার জন্য আমরা কেবল তাহাদিগকে দোষী করিতে পারি না শিক্ষকগণও উহার কিয়দংশ দোষ ভাগী। শিক্ষক যেমন ছাত্রের নিকট ভক্তিশ্রদ্ধা পাইবার উপযুক্ত, ছাত্রও সেইরূপ শিক্ষকের নিকট স্নেহ মমতা পাইবার অধিকারী। বর্তমান শিক্ষকদের মধ্যে এমত অনেক আছেন, যাঁহারা ছাত্রের প্রতি সমুচিত ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ।······যে ছাত্রগণ দেশের অবলম্বন, তাহাদিগকে মানুষ করিবার গুরুভার তাঁহাদেরই হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে ইহা তাঁহারা স্মরণ করিলে আর ক্ষোভের কারণ থাকে না (শিক্ষা—পৃঃ ৮২)।' দেশীয় প্রথায় শিক্ষিত হইলেও, চন্দ্রকান্ত জ্ঞান সাধনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুলভ বিচার বুদ্ধির ধারা (Critical method) অনুসরণ করিতেন। কোনরূপ বাঁধাধরা সংস্কার তাঁহার রচনাগুলিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে নাই।

ব্যক্তিগত জীবনে চন্দ্রকান্ত নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার বিনয় শিশুসুলভ সারল্য ও মার্জিত ভদ্রভাষণ পরিচিত মাত্রকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত। দেশের বহু গণ্যমান্য মনীষী তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। এবং ম্যাক্সমূল্যর, ই, বি কাওয়েল, আর রোষ্ট, সি বেনডাল প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতেরা চন্দ্রকান্তের বিশেষ গুনমুগ্ধ বন্ধু ছিলেন।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ চন্দ্রকান্ত কাশীধামে পরিণত বয়সে পরলোকগমন করেন।

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

"মানুষের মনে মানুষের প্রভাব চারি দিক থেকেই এসে থাকে। যদি অযোগ্য প্রভাব না হয় তবে তাকে স্বীকার করবার ও গ্রহণ করবার ক্ষমতা না থাকাই লজ্জার বিষয়—তাতে চিত্তের নির্জীবতা প্রমাণ হয়। নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু, যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি।"—উল্লিখিত কথাগুলি বলা হয়েছে এক সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের প্রভাব প্রসঙ্গে। মনের ময়ূর যদি জীবন্ত থাকে তবে দূরবর্তী সাহিত্যও তাকে চঞ্চল করে তোলে। আর যদি না থাকে তবে কাছের সাহিত্যের কল্লোলেও তার সাড়া জাগে না। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, গীতাঞ্জলির অনুবাদে ও অনুধ্যানে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাগুলি কতটা উৎসাহ দেখিয়েছে। উত্তর ভারতে বাংলার সমজাতীয় আর্যগোষ্ঠির ভাষাগুলির মধ্যে সর্বদা সে তৎপরতা দেখা যায়নি। তার কারণ অবশ্য সব ক্ষেত্রে সমান নয়।

অসমীয়া, ওড়িআ, পঞ্জাবী ও উর্দু—এই ভাষা-চতুষ্টয়ের প্রথম দুটি বাংলার সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে আবদ্ধ। অসমীয়া ভাষায় গীতাঞ্জলির কোনো অনুবাদ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সম্ভবত হয়নি আসলে বাংলা থেকে অহমীয়ায় অনুবাদের আবশ্যকতাও নেই। কোনোরূপ প্রাদেশিক মনোভাবের বশবর্তী না হয়েই বলছি, ঢাকা-বরিশাল-চট্টগ্রামের বাংলায় যদি গীতাঞ্জলি অনুবাদের প্রয়োজন না থাকে তবে অহমের বাংলাতেই বা কেন থাকবে? বস্তুত কেবল গীতাঞ্জলি নয় রবীন্দ্রনাথের প্রায় কোনো গ্রন্থই অসমীয়ার অনূদিত হয়নি। মাত্র তিন খানি অনুবাদ-গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি—গল্পগুচ্ছ, নটীর পূজা ও রাজর্ষি। ১৯৫০ সালে গল্পগুচ্ছ, ১৯৫২ সালে রাজর্ষি এবং ১৯৬১ সালে নটীর পূজা। এই তিন খানি গ্রন্থও যে কেন 'অনূদিত' হল বোঝা কঠিন।

পূর্বাঞ্চলের অসমীয়া থেকে পশ্চিমাঞ্চলের ওড়িআ যে বাংলা থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছে তার প্রধান কারণ উৎকলের নিজস্ব হরফ। হরফ আলাদা না হলে ওড়িআতে রবীন্দ্র সাহিত্য রূপান্তরের কোনো প্রয়োজন হত কি না সন্দেহ। অসমীয়ার মতো ওড়িআ ভাষাতেও ১৯৫০ সালের পূর্বে কোনো রবীন্দ্র গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। কবির জন্মশতবার্ষিকীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে চার অধ্যায়, চিত্রাঙ্গদা, রক্তকরবী, রাশিয়ার চিঠি প্রভৃতি গ্রন্থের সঙ্গে গীতাঞ্জলিরও একটি ওড়িআ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গোপালচন্দ্র মিশ্র অনূদিত এই ওড়িআ গীতাঞ্জলির প্রকাশকাল ১৯৬১।

অসমীয়া ও ওড়িআ-তে রবীন্দ্র-অনুবাদের অত্যল্পতার মূল কারণ নিশ্চয়ই বাংলার সঙ্গে ঐ ভাষা দুটির অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র ভাবধারা গ্রহণের শক্তি সামর্থ্যের প্রশ্নও একেবারে অবান্তর নয়। অনুবাদের স্বল্পতা ছেড়ে দিলেও একথা মনে না এসে পারেনা যে দুটি ভাষায়

আজ পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক এমন কোনো আলোচনা গ্রন্থ পাওয়া যায়নি যাকে বলা যায় উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে আলোচনা এখানে নয়।

ওড়িআ গীতাঞ্জলি

ওড়িআ গীতাঞ্জলি হাতে নিলে প্রথমেই চোখে পড়ে এর কবিতা-গ্রন্থন ও গ্রন্থ-সম্পাদনের ত্রুটি। এতে মোট কবিতা আছে ১০১ টি, ইংরেজী গীতাঞ্জলির কবিতা সংখ্যা থেকে দু'টি কম। অনুবাদক অনায়াসে বাংলা গীতাঞ্জলির অনুসরণ করতে পারতেন, সময়ের স্বল্পতার জন্য হয়তো সম্ভব হয়নি। যে ১০১টি কবিতার অনুবাদ করা হয়েছে তার সবগুলিই যে ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকে নেওয়া—এমনও নয়। প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী উভয় গীতাঞ্জলি থেকে কবিতা বাছাই করা হয়েছে। হিসাব করে দেখেছি, ইংরেজী সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে ৮৩টি এবং বাংলা সংস্করণ থেকে ১৮টি (যেগুলির ইংরেজী অনুবাদ নেই)। কবিতা সাজানোর দিক দিয়ে গোড়ার দিকে মোটামুটি ইংরেজী গীতাঞ্জলির অনুসরণ দেখা যায়। বর্জিত কবিতাগুলির শূন্য স্থানে বসানো হয়েছে বাংলা গীতাঞ্জলির অনূদিত কবিতা। কিন্তু এই নিয়মও সর্বত্র অনুসৃত হয়নি। শেষের দিকের ৮।১০টি কবিতা দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত এলোমেলোভাবে।

অনুবাদক তাঁর রুচি অনুযায়ী সাজাতে পারেন, তা নিয়ে তর্ক করা অশোভন। বর্তমান গ্রন্থে সেই রুচির বৈশিষ্ট্য কিছু পাওয়া গেল না; ভূমিকা ইত্যাদিতেও এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এই অসংবদ্ধ অনুবাদ-গ্রন্থের শেষে যে বিষয়টি ছিল একান্ত প্রত্যাশিত তা হল সহায়ক সূচী বা index। অনুবাদক নিশ্চয়ই বাংলা গীতাঞ্জলিতে এই পদ্ধতি লক্ষ্য করেছেন। অন্যান্য ভাষার অনুবাদ গ্রন্থেও তার কিছু কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি।

অনুবাদক ও প্রকাশক এই জরুরী বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অনাবশ্যক ব্যাপারে কতগুলি পৃষ্ঠা ও প্রচুর সময় নষ্ট করেছেন—যার মূল কথা সাহিত্যানুরাগ নয়, আড়ম্বর প্রীতি। গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে দেখা যায় তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের নাম। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের নামও বাদ যায়নি। কী প্রয়োজনে জানিনা রাষ্ট্রপতির ইংরেজীতে লেখা কয়েক ছত্র মামুলী 'বাণী' এবং তার ওডিআ অনুবাদ সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে। প্রকাশক হয়তো জানেন না যে, প্রকৃত রবীন্দ্র-রসিক পাঠক রাষ্ট্রপতির নির্বিশেষ ভূমিকা অপেক্ষা রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ কোনো ওডিআ পণ্ডিতের ভূমিকা পেলে খুশী হতেন। প্রকাশক মহোদয় ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী যে "শতবার্ষিকীরে শত প্রণাম" লিখেছেন তার মধ্যে এ তথ্যও পাওয়া গেল কী ভাবে "কলিকাতারে বোমাবর্ষণ হেবাবেলে মুঁ কটককু পলাই আসিলি…"

ওডিআ গীতাঞ্জলি শুরু হয়েছে বাংলা গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতা দিয়ে :

> মস্তক মোর অবনত কর তুমরি চরণ ধূলির তলে,
>
> সকল অহঙ্কার হে মোহর বুডাঅ নয়ন জলে।

অনুবাদক অনেক ক্ষেত্রে, মনে হয়, শুধু লিপ্যন্তর করে গেছেন। এতে অনুবাদের অমর্যাদা হয়েছে বলছিনা, শুধু বলছি বাংলা-ওড়িআর পদ্যচ্ছন্দের মিলও কত গভীর হতে পারে। যেমন ধরুন এই অংশটি—

ভঙ্গা দেউলর দেবতা,

তব বন্দনা রচনে ছিন্ন বীণার তন্ত্রী বিরতা।

সন্ধ্যা গগনে ঘোষেনা শঙ্খ তুমরি আরতি বারতা।

তব মন্দির স্থির গম্ভীর ভঙ্গা দেউলর দেবতা।

এ জাতীয় রচনা বাঙালী ও ওড়িআ বন্ধুরা পাশাপাশি বসে উপভোগ করতে পারেন। মূল কবিতা যেখানে ছন্দে রচিত, সেখানে ওড়িআ বাংলার তফাৎ নগণ্য—

সর্ব কর্মে তব শক্তি এহি সত্য সার

করিব সকল কর্মে তুমরি প্রচার।

অন্যত্র শব্দ-গঠনে ওড়িআ ভাষার নিজস্ব ভঙ্গি কিছুটা দেখা দিলেও অন্ত্যানুপ্রাসে দেখতে পাই বাংলারই হুবহু রূপ ঃ

(১) মেঘ উপরে মেঘ পইঁরে অন্ধার ঘোটি আসে

রাখিছু কাহিঁ বসাই মোতে একা দ্বারর পাশে।

(২) সে যে পাশে আসি বসিথিলা তথাপি জাগিনি

কি নিবিড় নিদ ঘোটিথিলা হতভাগিনী।

বলাই বাহুল্য, ইংরেজী গীতাঞ্জলির ক্রম অনুসরণের চেষ্টা করলেও অনুবাদকের অবলম্বন ছিল যে বাংলা কবিতা উল্লিখিত পদ্যাংশগুলিই তার বড় প্রমাণ। তবু মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়, অনুবাদক মূল বাংলা থেকে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছেন। "জীবন যখন শুকায়ে যায়" কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে আছে ঃ 'কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার, হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শান্ত চরণে এসো।' অনুবাদে বলা হয়েছে—

সঘন ঘোটিলে ঘন জঞ্জাল

এ মোর জীবন করি চঞ্চল

প্রাণর প্রান্তে হে জীবনসখা

নীরব ছন্দে আস।

এ ছাড়া কোথাও কোথাও ইংরেজী গীতাঞ্জলি থেকেও দু'চারটি শব্দ নিয়েছেন। যেমন, 'তোমায় আমার প্রভু করে রাখি' এই চরণের অনুবাদে 'তুমরে হে মোর সর্বস্ব করি রাখি' হয়েছে ইংরেজী 'my all' এর অনুসরণে। বাংলা গীতাঞ্জলির ১০ নং কবিতার 'চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে, অনুবাদে হয়েছে 'চরণ প্রান্তে তারকা তপন' ইংরেজীর প্রভাবে। ১১৪ নং কবিতায় আছে 'শূন্য বিদায় করব না তো উহারে', ইংরেজীতে পাই 'I will never let him go with empty hands,' ওড়িআ অনুবাদে বলা হয়েছে 'শূন্য হাতে ন দেবি ছাড়ি মুঁ উহারে।' 'কাশের বনে শূন্য নদীর তীরে' ওড়িআ-তে হয়েছে 'ঘসের বনে শূন্য তটিনী তীরে', ওড়িশা অঞ্চলে কাশবন সুপরিচিত। তবু যে অনুবাদে 'ঘসে' হয়েছে তার কারণ ইংরেজীতে আছে 'among tall grasses'.

মাঝে মাঝে অনুবাদে কিছু গোলযোগ পেয়েছি। মুদ্রণ-প্রমাদের কথা বলছি না। "হেথা যে গান গাইতে আসা আমার" এই অংশের অনুবাদে বলা হয়েছে "যে গীত গাইবা পহিঁ আশা

মোর'। উচ্চারণ সাদৃশ্যে কিছু ভুলচুক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু 'পথ চেয়ে তো কটল নিশি, ওড়িআ-তে হয়েছে 'পথ চাহিঁ ত কাটলি দিন।' সন্দেহ হওয়াতে ইংরেজী গীতাঞ্জলি খোলা হল। সেখানকার অনুবাদ বাংলার অনুগামী। ওড়িআ গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলির সংশোধন বাঞ্ছনীয়।

গোপালচন্দ্র মিশ্রের অনুবাদ থেকে বোঝা গেল বাংলার ধ্বনিপ্রধান ছন্দে ওড়িআ পদ্য বেশ সুখ পাঠ্য হয়। এই কারণে শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের অনেক কবিতা ওড়িআ অনুবাদে ধ্বনিপ্রধান ছন্দের রূপ পেয়েছে। ১১৬ নং কবিতার অনুবাদ দেখুন—

হে মোর দেবতা জীবনর শেষ পরিপূর্ণতা তথা
মরণ হে মোর মরণ হে মোর কহ কহ মোতে কথা।

এর তুলনায় 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি' কবিতার অনুবাদ নেমে গেছে—

তমে কি শুনি নাহিঁ তাহার পদধ্বনি
এই যে সে আসে এহি সে আসে, আসে
সতত যুগে যুগে প্রতি দিবা রজনী
এই সে আসে, এই সে আসে, আসে।

গ্রন্থ শেষে "দি' পদ" নামে আধ পৃষ্ঠার একটি মন্তব্য অনুবাদক লিখেছেন: "গীতাঞ্জলি কাব্য নিহিত গভীর অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নয়। এ অবস্থায় ওড়িআ ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ করা দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা।" আমরা পাঠক অনুবাদকের এই মন্তব্যটি মেনে নিতে পারলুম না বলে দুঃখিত। কারণ দক্ষিণী ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রচেষ্টা দুঃসাহসিক হতে পারে, কিন্তু ওড়িআ অনুবাদ সম্পর্কে ঐরূপ মন্তব্য করলে 'দুঃসাহসিক' কথাটার মানে দাঁড়ায় 'সহজ'।

প্রাচীন বাংলার সমরতরী

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

দিনগুলি আর সোনার খাঁচায় রইল না। অচিন দেশে ভেলা ভাসানোর খেলা শেষ হল। ঘরের ছেলে এবার ঘরে ফিরল। সাঙ্গ হল দূরদ্বীপে বসতি বাঁধার পালা। পাততাড়ি গোটালেন লক্ষ্মণসেন-বিশ্বরূপ সেনেরা। বাংলা দেশ থেকে হিন্দু রাজাদের বিদায়ের বাঁশী বাজল। রূপকথার মায়া-কাগজ কাটিয়ে সপ্তডিঙ্গা-ময়ূরপংখী ভাসিয়ে আবার ইতিহাসের পাটাতনে দেখা দিল নতুন নায়ক—মুসলমান। অসির ঝনঝনা আর ধনুর টংকার নয়, বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ। সচকিত হল সমরাঙ্গন। কামারের হাতুড়ির রবে কান পাতা দায় হল ঢাকা-চট্টগ্রাম-চিড়াইবাড়ি-সন্দীপে। এমন কি, লা-ঘাটার শান্ত জনপদও মেতে উঠল নৌনির্মাণের মত্ততায়। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতায়, মধ্য যুগের কাব্যকথায় নিঃশেষিত সেই সব নৌকৃৎ আর নৌনায়করা—ঢাকার কুশাই কামিলা, ভালুকির অলংকার কুণ্ড, বর্ধমানের ধ্রুসা দত্ত, ইছানির লক্ষপতি আর গৌড়ের গর্ভেশ্বর দত্তরা—আবার মাতাল হল দূরদ্বীপবালার অদৃশ্য ইঙ্গিতে। নৌকা-নদী-সাগরের চিন্তাই তাদের ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল। গঙ্গাপ্রসাদ, সাগর দত্তরা তাই নিছক নামই নয়, এক বিশেষকালের একটি বিশেষ মানসিকতার প্রকট প্রতিবিম্ব—নৌকাপ্রিয় বাঙালীর মনোমুকুর। মঙ্গল কাব্যাবলীতে কিম্বা বাউল-গম্ভীরায় নৌকাকথার বাহুল্য, অতএব আকস্মিক নয় বরং স্বাভাবিক। তাই দেখি কখনো খুল্লনা কাঁদে: বহুত মিনতি মাঙ্গি অর্ণবে না লও ডিঙ্গি পাটা যার শতেক যোজন (কবিকঙ্কন, চণ্ডীমঙ্গল)। কোথাও কেউ হিসেব করতে থাকে: চুয়ার বদলে চন্দন পাব ধুতির বদলে গড়া (বিজয় গুপ্ত, মনসা মঙ্গল)। নৌকার গজগামিতায় কেউ বিস্ময় বিমুগ্ধ: আনল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত। শিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ (মাণিক গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল)। কেউ বা নৌযাত্রার বহির্বর্ণনায় যত না ব্যাকুল নৌনির্মাণের উৎস সন্ধানে তদুপরি: শাল পিয়াল কাটে খয়ি তেতলি। কাটিল নিম্বের গাছ গম্ভারী পারুলি। আম্র কাঁঠাল কাটে কাটিল বকুল। চম্পা খিরণি কাটি করিল নির্মূল (জগজ্জীবন, মনসামঙ্গল)। কেউ বা গম্ভীরার সুরঝঙ্কারে তন্ময়: জাহাজ সে ছানিয়া হায় ধনপতি……। নৌকা সিংহলে পৌঁছাল, কবিকণ্ঠ মুখর হল: বদল আশে নানাধন এনেছি সিংহলে। যা দিয়ে যা বদল হবে শুনহ কুতুহলে (কবিকঙ্কন, চণ্ডীমঙ্গল)। শুধু দেশী কবির স্তুতি-সম্ভাষণীতেই নয়, বিদেশী বণিকের অকপট জবানীতেও প্রাচীন বাংলার নৌনৈপুণ্য স্বীকৃত। ভেনিশ বণিক সিজার ফ্রেডারিক যিনি সলেমনের সময়ে নেহাৎই ঝটিকাযোগে ঢুকে পড়েছিলেন সন্দীপে, চট্টগ্রামের জাহাজঘাঁটি দেখে তিনিও বিস্ময়ে হতবাক। এবং এক নৃপতি, কন্সটান্টিনোপলের সুলতান বলেছেন, আলেকজান্দ্রিয়ান নৌকাকে টেক্কা মারে চট্টগ্রাম।

রাজসিংহাসনটিতে নীরবে বসে আছেন নবনায়ক। গুহসন্ধির বোঝ্‌সাজগে ভৌমিকরা তখন স্বরাজ্যে সম্রাট। মুঘলশক্তি, সারা ভারত যার পদানত, রীতিমত ডরায় বঙ্গীয় ভৌমিকদের।

ভৌমিকদের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ধারাসঙ্গতি প্রত্যন্ত প্রদেশ আসামের অনুরূপ। দামুদের মৃত্যুর পর আসামের অনুকরণেই ভৌমিকদের নাম হল ভুইঞা। সংখ্যা অনুস্থতিও আসামের মতো। তবে রাজাকে বারজন সহনৃপ সাহায্য করবেন এমন কথা অন্যত্রও দেখা যায় (মনু ৭।১৫৫-৫৬)। এবং রাজাকে ঘিরে বসে আছেন বারজন পার্ষদ, প্রাচীন বাংলার সাহিত্যচিত্রেও এ নজির অনুপস্থিত নয় (মাণিক গাঙ্গুলী, ধর্মমঙ্গল, পরিষদ্ সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ)। বাংলার বারভুইঞার দোর্দণ্ড দাপটে একদিকে মুঘল অন্যদিকে মগ-পর্তুগীজ ব্যস্ত ও সন্ত্রস্ত। ভৌমিকদের ভীমবিক্রমে রাজ্যেশ্বর বিচলিত। কেদার রায়ের শ্রীপুর, প্রতাপাদিত্যের যশোহর কিম্বা ঈশা খাঁর খিজিরপুর মুঘলদের রাতের দুঃস্বপ্ন। কোথায় যে কে বিদ্রোহ করে বলা মুস্কিল। মগ-মুঘলের এই বিচলনের মূলে বাংলার সমরতরীর ভূমিকা সমধিক

১৬০২ খৃষ্টাব্দ। কেদার মুঘলদের হাত থেকে সন্দীপ কেড়ে নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সদ্যঃজিত সন্দীপ উপহার দিয়েছেন নতুন দোস্ত পর্তুগীজদের। এই উপহার-উপঢৌকনে মুঘলেরা অগ্নিশর্মা। মগেরা, যারা আগেই কেদারের প্রতি ক্ষুব্ধ, দেখল এই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এ সুযোগ হারালে চলবে না। মগেরা ১৫০খানা রণতরী নিয়ে ধেয়ে এল। ওরা শ্রীপুর, কেদারের রাজধানী আক্রমণ করল। কেদার আর নিষ্ক্রিয় নন। একশো রণতরী নিয়ে তিনিও ছুটে এলেন—আনল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত। চারিদিকে কামানের গুড়ুম গুড়ুম রব। ধোঁয়া। অন্ধকার। মগেদের ১৪৯খানা তরীই ধরা পড়ে গেল। মগরাজ সেলিম শা সম্পূর্ণ হেরে গেলেন। হারলেন কিন্তু দমলেন না। দেশে গিয়ে আবার হাজারখানা নৌবাটক পাঠালেন! আবার যুদ্ধ বাধল। আবার দামাল হয়ে উঠল বঙ্গোপসাগরের সুনীল উর্মিমালা। তার প্রবল ভ্রূকুটিভঙ্গ উপেক্ষা করে কেদার প্রতিহত করলেন শত্রু-আক্রমণ। ফিরে গেল মগেরা। কিন্তু ছুটে এল মুঘলেরা। কেদারের আস্ফালনে মুঘল সেনাপতি মানসিংহ ক্ষুব্ধ। হয় তো বিচলিতও। কিলম্যাককে সেনাপতি করে তিনি ১০০ খানা কোষাতরী পাঠালেন কেদারকে শায়েস্তা করার জন্য। কেদার কিলম্যাককে প্রতিহতই করলেন না, সমরাঙ্গনেই প্রাণে মারলেন। চৈতন্য হল মানসিংহের। তিনি খবর পাঠালেন: ত্রিপুর-মগ-বাঙ্গালী-কাককুলী-চাকলী সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পলায়ী। হয়-গজ-নর নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমিঃ, বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি॥ কেদারও নীরব নন: ভিনত্তি নিতং করিরাজকুম্ভং বিভর্তিবেগং পবনাতিরেকম্। করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে তথাপি সিংহঃ পশুরপি নান্যঃ। ফলত, যুদ্ধ অনিবার্য হল। আবার রণদামামা বেজে উঠল শ্রীপুরের বুকে। আবার ৫০০ খানা কোষাতরী সেজে উঠল রণসাজে। অথবা, নেচে উঠলেন কেদার রায় মরণ নাচে। কেননা, সর্বশক্তিসহ শত্রুপ্রতিহত করতে গিয়েও হার হল শ্রীপুর-সূর্যের। রণাহত হয়ে মৃত্যু হল তাঁর।

প্রতাপ প্রস্তুত হচ্ছেন রণসাজে। যশোহরের প্রতাপাদিত্য। প্রতিজ্ঞা তাঁর, সম্যক প্রস্তুতি ছাড়া যুদ্ধ আর করবেন না। অনেক শিক্ষা দিয়াছেন মুঘল-নায়ক আজিম খাঁ। স্বাধীনতা ঘোষণার অসার আড়ম্বরতা আর নয়। সকল আমোদ বিনা প্রতাপ তাই শক্তি বৃদ্ধিতে তন্ময়। যশোহরের আকাশ-বাতাস এক অপূর্ব চাঞ্চল্যে উষ্ণ। প্রতাপ জানেন তাঁর শক্তির প্রাণবাহিনী

নৌবাহিনী। তাই যুধলীর জলে চলল নৌশিক্ষা, কুশলীর মাঠে কুচকাওয়াজ। পর্তুগীজবাহিনীর সাহায্য নিলেন তিনি। গোলন্দাজ আর নৌবাহিনীর যুগ্ম অধিনায়ক হলেন পর্তুগীজ নায়ক রডা। আয়োজন শেষ হল প্রতাপ নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন মুদ্রা-লিখনে : শ্রীশ্রীকালীপ্রসাদেন ভবতী শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়স্য, অন্য পৃষ্ঠে বদৎছিক্রাবছিমো বাঙ্গালা মহারাজা প্রতাপাদিত্য জদাল।

দিল্লীশ্বরের বুঝি টনক নড়ল। পরবর্তী প্রতিক্রিয়া মানসিংহের বাংলা অভিযান। লক্ষ্য কেদার নন, প্রতাপ। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দ। প্রতাপ প্রস্তুত। যমুনা আর ইছামতীর ঘাটে ঘাটে কামান দাগানো রণতরী। তারা দাঁড়িয়ে আছে তীরে। তারা অপেক্ষা করছে অরি-সন্নিধানের—মানসিংহকে বাধা দিতে, মান রাখতে বাংলার। কিন্তু পরিহাসিনী প্রকৃতির খেলার ফল হল বিপরীত। সহসা দারুণ ঝড়ে অধিকাংশেরই সলিলসমাধি ঘটল। রইল যারা তারাও ভাঙ্গাচোরা। তবু ভেঙ্গে পড়ল না প্রতাপ। মানসিংহ পাঠিয়েছেন শেকল আর অসি, দূত মারফৎ জানতে চান—তুমি বশ্যতার শেকল পড়তে চাও না বীরের মতো অসি ধরতে চাও। বলাই বাহুল্য, বীরের মত অসি ধরলেন প্রতাপ। যুদ্ধ অনিবার্য হল।

মৌতালার মাটী মুখর হল বাঙালী-মুঘল মরণ-নৃত্যে। যুধলীর জল দুলে উঠল নৌবাহিনীর নৃত্যদোলায়। পর্তুগীজ রডার নেতৃত্বে বাঙ্গালী যেন মদমত্ত গজ। অশ্বক্ষুর সংঘাতে অকাল গোধূলি। নদীর বুকে মুহুর্মুহ গুড়ুম গুড়ুম—ধুধুধুধু নৌবত বাজে। ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্দম্ ঝনর ঝম্ঝম্ ঝাঁজে (ভারতচন্দ্র, অন্নদামঙ্গল)।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। মান সিংহ শিবিরে জেগে। সামনে ভবানন্দ, কচু রায়। ওরাও অধোমুখ, চিন্তিত। ক্ষণপরেই, ভবানন্দ যেন চাঁদ পেয়েছে হাতে, বললে—দেবীমাহাত্ম্যই প্রতাপাদিত্যের প্রতাপ-রহস্য। ইতিহাসের একি রসিকতা, বিশ্রুত কীর্তি সেনানায়ক সমগ্র উত্তর ভারত যাঁর পদানত, কাবুল যাঁর করতলগত, তাঁকেও বিশ্বাস করতে হবে অবিশ্বাস্য দেবী মাহ্যাত্ম্য, আশ্রয় করতে হবে কূটকলার চতুরালী নগণ্য এক বঙ্গভূইঞাকে নত করতে? মাতা যশোরেশ্বরীর পূজার ছলে প্রতাপকে হীনবল করা হল। নিরুপায় নায়ক নতি স্বীকার করলেন। চুক্তি হল মানসিংহের সঙ্গে। মানসিংহ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারী ছেড়ে দিলেন। নতুন সুবাদার এলেন ইসলাম খাঁ। প্রতাপ বশ্যতা মানলেন বটে, নত হলেন না। পনেরো লক্ষ টাকার আয়, বিশ হাজার পদাতিক আর অস্ত্রপূর্ণ সাতশো রণতরী যাঁর অধিকারে [সমসাময়িক আলাউদ্দীন ইসফাহাস শিতাব খাঁর পুঁথি বহার স্তান-ই-ঘাইবী অবলম্বনে] তাঁর পক্ষে নত হওয়া সম্ভবও নয়। অতএব প্রথমে প্রতিবাদ, পরে প্রতিযোগিতা। প্রতাপ ইসলাম খাঁর অন্যায় আদেশ পালনে অক্ষম অথচ ইসলাম খাঁ স্বীয় সংকল্পে অটল। সুতরাং সমর-সম্ভাষণই যোগ্য জবাব। এনায়েৎ খাঁ আর মির্জা সহনের নেতৃত্বে মুঘলেরা ধেয়ে এল। চতুরঙ্গ সমাবৃত প্রতাপ আগলে রাখলেন ধূমঘাট। অসংখ্য রণতরী এবং চতুরঙ্গসহ কমল খোজা, কুমার উদয়াদিত্য, আজমল খাঁ এবং আরও অনেকে জমায়েৎ হল ইছামতী শালখীর সঙ্গমে। যুদ্ধ শুরু হল। তরুণ উদয়াদিত্যের অতুলনায় বীরত্ব, নিপুণ কমল খোজার বিপুল বিক্রম আর ঝানু আজমল খার অসীম দৃঢ়তায় মুঘল সৈন্য খান্ খান্ হয়ে গেল। রুধির ধারায় রণক্ষেত্র স্নান করে উঠল। নায়ক এনায়েৎ খাঁ জয়ের আশা ছেড়ে দিলেন। জলপথে

নৌবাহিনীর মুহুর্মুহু আসা-যাওয়া, স্থলপথে সৈন্যবাহিনীর উদ্দাম চঞ্চলতা সবই ছিল প্রতাপের অনুকূলে। তবু প্রতাপ পেরে উঠলেন না। বীর কমল খোজা রণক্ষেত্রে নিহত হলেন। ধূমঘাটে সংবাদ এল। প্রতাপ যেন মণিহারা ফণি। তবু, শেষ ছোবল মারার জন্য, রাজধানী রক্ষার জন্য তিনি রুখে দাঁড়ালেন। উৎসাহিত বঙ্গবীরেরা মেতে উঠল মরণনৃত্যে, নদীতে নৌকাগুলি দাঁড়িয়ে রইল শত্রু সংহারের জন্য। নির্বাণ-উন্মুখ প্রদীপের মতো শেষবার জলে উঠলেন প্রতাপ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সহচরদের শঠতায় সৈন্যমধ্যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হল। প্রতাপ দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। কিন্তু স্বভাবকে বশ করা গেল না। যশোরেশ্বরীর চরণ স্মরণ করে ক্ষিপ্ত শত্রুসাগরে ঝাঁপ দিলেন মৃত্যুমাতোয়ারা প্রতাপ, অন্নদা মঙ্গল মুখর হল: ডালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া গুলিতে মরিছে কেহ। গোলায় উড়িছে আগুনে পুড়িছে তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥ পাতশাহি ঠাটে কেবা কবে আঁটে, বিস্তর লস্কর মারে। বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া প্রতাপ আদিত্য হারে॥

১৬১২ খৃষ্টাব্দ। রাজায় রাজায় যুদ্ধ। একদিকে কোচ অন্যদিকে আহোমরাজ। কোচপতি লক্ষ্মীনারায়ণ ছুটে এসেছেন ঢাকায়, নবাবের সাহায্যের আশায়। প্রার্থনা তাঁর অপূর্ণ রইল না। তখন মুঘল-আহোম সংঘর্ষ বেঁধে গেল। পরে, ১৬৩৮-এ এসে ওদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হল। অন্তর্বর্তী এই ছাব্বিশ বছরে বাংলাদেশ থেকে ১৩৩৫টি সমরতরী ও ৪৯৫০০ জন সৈনিক আসামে প্রেরিত হয়। রাজেন্দ্রলাল আচার্যের এতদ্‌সংক্রান্ত তালিকাটি প্রণিধানযোগ্য:

কাল	পদাতিক ও অশ্বারহী	সমরতরী
১৬১২ খৃঃ	১৮০০০	৫০০
১৬১৫ খৃঃ	১০০০০	৪০০
১৬১৬ খৃঃ	১২০০০	++
১৬১৭ খৃঃ	২০০০	২০৫
১৬৩৫ খৃঃ	৭৫০০	২৩৫
	৪৯৫০০	১৩৩৫

কাশেম খাঁ তখন বাংলার সুবাদার। তাঁর কালে এবং পরেও বেশ কিছুকাল, মগ-পর্তুগীজ দ্বৈত অত্যাচারে বাংলা দেশ, বিশেষত, দক্ষিণ বাংলা অরণ্যে পরিণত হল। * ওদিকে রাজতনয় শাজাহান বিদ্রোহী। মগেরা হাতে স্বর্গ পেলেন। দেখতে দেখতে মগরণতরীতে পূর্ববাংলার নদীগুলি ভরে উঠল। এদিকে পর্তুগীজেরা পরিখা প্রাকার রচনা করে অজেয় হয়ে উঠল। বঙ্গের এই দুঃসহ দুর্দিনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাস মূর্ত হল কবিকঙ্কনের কলমে: ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধারে। রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে॥ তখন বাঙালী নাবিকের মানসিক বল এই, ৪খানা মগরণতরী একত্রে দেখলে ১০০খানা বঙ্গরণতরী পালাবার পথ খুঁজে পায় না। এতই হীনবল তারা যে কী মাঝি, কী সেপাই, সকলেই তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীতে ঝাঁপ দিত তবু মগ-পর্তুগীজদের সঙ্গে লড়তে চাইত না। ভাবখানা এই, নদীর জলে ডুবতে রাজি, তবু হার্মাদের

হাতে নয়। মগেরা আরাকান আর বাংলার মধ্যস্থল চট্টগ্রামকে আশ্রয়স্থল করে নিয়েছিল। সুযোগ পেলেই ওরা লুটতরাজ চালাত। আরাকান রাজারা ওদের লুটের অংশ নিতেন। নিজেদের স্বার্থেই ওদের তোষণ করতেন তাঁরা। চট্টগ্রামকে সুরক্ষিত রাখতে তাই ওদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রতিবছর ১০০ সৈন্য নিয়ে মগরণতরী আরাকান থেকে চট্টগ্রামে হাজির হত। ফিরত যখন, আগের বছরের ১০০ সৈন্যকে স্বদেশে নিয়ে যেত। এইভাবেই আসা-যাওয়া চলত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল ১৬৬৫তে। নবনিযুক্ত সুবাদার শায়েস্তা খাঁ এসেই ঘোষণা করলেন : নৌবাহিনীর উন্নতি করতে হবে। নৌশক্তিই বঙ্গবাহিনীর প্রাণশক্তি এ সত্য গোপন রইল না। নানাস্থান থেকে পাইক দিয়ে কাঠ যোগাড় করা সুরু হল, নৌনির্মাণের কাঠ। হুগলী, বালেশ্বর, চিলমারি, যশোহর, কড়িবাড়ি এবং আরও অনেক জায়গা থেকে নৌকা তৈরী হয়ে ঢাকায় আসতে লাগল। আবার সুরু হল নওয়ারার রণভেরী, শোনা গেল কামানের হাতুড়ির রব।

মগের সঙ্গে প্রথম দিনের যুদ্ধ। ১০ খানা ঘুরব্ আর ৪৫ খানা নৌকা নিয়ে মগেরা মত্ত। দূরে, কিছুটা ব্যবধানে ওদের রণতরীগুলি দাঁড়িয়ে। ক্ষণপরেই মুঘলতরীর প্রচণ্ড আঘাতে মগেরা ছিন্নভিন্ন। ওরা প্রাণভয়ে জলে ঝাঁপাল। দূরস্থ তরীগুলি স্থির কিন্তু স্থাণু নয়। নিস্ফল কামান গর্জনে ওরা রাতের স্তব্ধতা ভাঙ্গিল।

দ্বিতীয় দিন। মুঘলদের অবিরাম কামানগর্জনে কর্ণফুলীর শান্ত সলিল উত্তাল। গগন পবন কেঁপে উঠছে মুঘল সেনার রণহুংকারে। ঢাউস তরীগুলিকে সামনে সাজিয়ে ক্ষুদ্র অথচ ক্ষিপ্র তরীগুলিকে তলায় বেঁধে মুঘলেরা শত্রু আক্রমণের জন্য অপেক্ষমান। প্রস্তুতিপর্ব সন্দর্শনেই মগেরা ভয় পেল, সকালে ওরা পালাল। বিকেলে সূর্য যখন পাটে যাবে তার বিদায়ী আলোয় রক্তবর্ণ হয়ে ওরা আবার ছুটে এল। ফিরিঙ্গি বন্দরে কামান আর গোলা রাখল ওরা। আঁধার নামতে না নামতেই কর্ণফুলীর কূলে শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ। মুঘলদের তাক করে অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে লাগল মগেরা। পাল্টা আক্রমণে মাতাল হল মুঘলসৈন্য। বাইরে তখন প্রবল ঝড়। সেই ঝড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল মগতরী, সলিল-সমাধি ঘটল বেশ কিছুর প্রকৃতির অনুকূলতায় মুঘলশক্তির জয় হল। শত্রুর ১০৩৫ খানা রণতরী তারা ধরে ফেলল। জয়গর্বিত মুঘলসৈন্য পরদিন চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ করল। সারাদিন ধরে মগ-মুগল যুদ্ধ চলল। অন্তে মুঘলেরই জয়। ১২১৬ খানা লোহা এবং পিতলের কামান, বহু বন্দুক এবং বারুদ ওদের হস্তগত হল। ২০০০ মগদস্যু বন্দী হল। অনেকে রাতের আঁধারে গা ভাসাল। বিজয়স্মৃতি স্মরণে চট্টগ্রামের নতুন নাম হল ইসলামাবাদ।

বোম্বেটে মগদের অত্যাচারের বহির্বর্ণনা ব্যক্ত হয়েছে বার্ণিয়েরের বিবরণে। তাঁর ভাষায় : সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় জনবসতিশূন্য হয়ে গেছে। প্রধানতঃ আরাকানের জলদস্যু বা বোম্বেটেদের অত্যাচারে এইসব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়েছে। এখন এই দ্বীপগুলি দেখলে মনেই হয় না যে এককালে এখানে লোকালয় ছিল (বিনয় ঘোষের অনুবাদ থেকে)। করুণ অন্তরঙ্গ দিকটা ফুটে উঠেছে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত কুলগ্রন্থে। মগ অত্যাচারের ফলে সপ্তদশ শতকের রাঢ় ব্রাহ্মণ সমাজে যে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয় তার নাম 'মগদোষ'।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নদী

অজয়কুমার ঘোষ

"নদী আমি ভারি ভালোবাসি, আর ভালোবাসি আকাশ।" (ভানুসিংহের পদাবলী। পত্রসংখ্যা ৪৯) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সভ্যতা নদীকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রসাহিত্যও তেমনি নদীমাতৃক। কথাটা ব্যাখ্যাত হ'বার অপেক্ষা রাখে। নইলে অস্পষ্টতা থেকে যাবে। সভ্যতার ক্ষেত্রে যা' ভৌগোলিক, রবীন্দ্রনাথের বেলায় তা ভৌগোলিক ও আত্মিক দুইই। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের পটভূমিকায় নদী। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, নদী রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রবাহের সঙ্গে যেন একাত্মক। কারণ নদীর চলমানতায় আছে গতি, আকাশের উদারতায় আছে মুক্তি। এই গতি ও মুক্তিই ত' যথাক্রমে রবীন্দ্রপ্রতিভার ধর্ম ও লক্ষ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকমাত্রই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ পাহাড়পর্বত তেমন ভালোবাসতেন না। পর্বতের ধ্যানগম্ভীর মহিমা তাঁর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছে ঠিকই, কিন্তু তাঁর সত্তায় লীন হ'তে পারেনি, যেমনটি হয়েছে নদী। কবি নিজেই ব'লেছেন,—"পাহাড় আমার কেন ভালো লাগে না বলি,—সেখানে গেলে মনে হয়, আকাশটাকে যেন আড়কোলা ক'রে ধ'রে একদল পাহারাওয়ালার হাতে জিম্মা ক'রে দেওয়া হয়েছে, সে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। আমরা মর্ত্যবাসী মানুষ—সীমাহীন আকাশে আমরা মুক্তির রূপটি দেখতে পাই—সেই আকাশটাকে যদি তোমার হিমালয় পাহাড় এক পাল মহিষের মতো গুঁতিয়ে মারতে আসে, তাহ'লে সেটা আমি সইতে পারিনে। আমি খোলা আকাশের ভক্ত, সেইজন্যে বাঙ্লা দেশের বড়ো দিল্-দরাজ নদীর ধারে অবারিত আকাশকে ওস্তাদ মেনে তা'র কাছে আমার গানের গলা সেধে এসেছি; এই কারণেই দূর হ'তে তোমাদের সোলন পর্বতকে নমস্কার?" (ভানুসিংহের পত্রাবলী পত্রসংখ্যা ৩৫)।

অপর একটি পত্রে বলেছেন,—"তুমি জান—আমি নদী ভালোবাসি। কেন, বলব। আমরা যে ডাঙার উপরে বাস করি, সে ডাঙা তো নড়ে না, স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু নদীর জল দিনরাত্রি চলে, তার একটা বাণী আছে। তার ছন্দের সঙ্গে আমাদের রক্তচলাচলের ছন্দ মেলে; আমাদের মনে নিরন্তর যে চিন্তাস্রোত বয়ে যাচ্ছে, সেই স্রোতের সঙ্গে তা'র সাদৃশ্য আছে—এইজন্যে নদীর সঙ্গে আমার এত ভাব। (ঐ—পত্রসংখ্যা ৪৫)

অন্যত্র একটি সুন্দর চিঠিতে বলেছেন,—"আমি এই জলের দিক চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তাহ'লে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ-পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা, খানিকটা না-চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে। সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা করে; অঙ্গচালনা করে আমাদের মনটা আগাগোড়াই চলছে। সেইজন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল

মানসশক্তির মতো বোধ হয়—সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙ্ছে, চুরছে এবং চলেছে।" (ছিন্নপত্র। ১১৮নং)

রবীন্দ্রনাথ অসীমের যাত্রী। নদীতে আছে সীমা থেকে শুধু যাওয়া আর যাওয়া, আর আকাশের নীলিমায় আছে অশেষ অপার উদার মুক্তি। নদী ও আকাশ তাই রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বাধর্মের প্রতীক।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতায়। জন্মসূত্রে নদীর প্রতি তাঁর একটা দুর্বার আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অনেকটা দুর্জ্ঞেয়—বলা যেতে পারে "জননান্তর সৌহৃদ—"। কবির কথায় "এই প্রথম বাহিরে গেলাম।......গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল।"—(জীবনস্মৃতি। বাহিরে যাত্রা।) ......কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে...... কথাটুকু লক্ষণীয়।

রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত কাব্যরাজ্যের আদ্যন্ত জু'ড়ে একই নদী প্রবাহ। সেই প্রবাহের দুই তীরে কাব্যের ফসল ফলেছে। বাল্যে যা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' (প্রভাত সংগীত), প্রথম যৌবনে তাই পদ্মা, (সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, গল্পগুচ্ছ, ছিন্নপত্র), দ্বিতীয় যৌবনে তাই শিপ্রা (কল্পনা), পরিণত জীবনে তাই আকাশগঙ্গা বা চঞ্চলা (বলাকা) এবং গোধূলি পর্য্যায়ে তাই রবীন্দ্রনাথের 'রূপনারায়ণ' (শেষ লেখা)। একই মূল প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এর মধ্যে পদ্মা, শিপ্রার ভৌগোলিক অস্তিত্ব আছে। বাকীগুলো মানসিক নদী। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে পদ্মা ও শিপ্রাও এদের সঙ্গে এক অখণ্ড মানসিক ঐক্যসূত্রে বিধৃত। বাস্তব নদী ভাবাত্মক নদীতে পরিণত।

তাহ'লে দেখা গেল যে নদীই রবীন্দ্রপ্রতিভার বাহন। কবির ভাষায়, 'ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত, আমার তেমনি পদ্মা' (ছিন্নপত্র ৯৩)। 'পদ্মা' কথাটাকে বদলে অনায়াসে 'নদী' কথাটা বসিয়ে নেওয়া যায়। অর্থাৎ এখানে পদ্মা মানে বিশেষ কোন নদী নয়,—পদ্মা মানে রবীন্দ্রমনের অখণ্ড নদীচেতনা অর্থাৎ গতিচেতনা—যা' রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল ধর্ম। কিংবা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতীক। আলোচনার সুবিধার জন্য রবীন্দ্রসাহিত্যের আরেকটি বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে সেরে নেওয়া যেতে পারে। তা' হল সীমা ও অসীমের প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে বলেছেন, 'আমি সত্যিই বুঝতে পারিনে আমার মধ্যে সুখদুঃখমিলনবিরহপূর্ণ ভালোবাসার টানই প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষাই প্রবল। আবার জীবনস্মৃতিতে ব'লেছেন, "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যসাধনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" (প্রকৃতির প্রতিশোধ—জীবনস্মৃতি)

কবির পদ্মাতীরবর্তী জীবন একদিকে ছোট গল্প ও অপর দিকে গীতিকাব্যের জনক। ছোট গল্পে পল্লী বাঙলার ছোটখাটো সুখদুঃখমিলনবিরহপূর্ণ ভালোবাসার কথা, গীতিকাব্যে নির্বিশেষ মানুষের ও নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যলোকের কথা। ছোট গল্পে সীমার জগৎ, গীতিকাব্যে অসীমের ব্যঞ্জনা। ছোট গল্পে পদ্মাতীরবর্তী ভূভাগের কথা, গীতিকাব্যে পদ্মার কথা। এই কথাগুলোকে আরও সংহত ক'রে নিয়ে বলা যায় যে নদী হ'ল গতি অর্থাৎ অসীমের বা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ লোকে যাত্রা আর ভূমি হ'ল স্থিতি অর্থাৎ সীমা বা সুখদুঃখ মিলনবিরহপূর্ণ জীবন। তাহলে রবীন্দ্রকাব্য

সাধনায় কবিকথিত 'একটিমাত্র পালা' নদীর কলধ্বনিতেই যেন বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। তাই রবীন্দ্রসাহিত্যপ্রবাহ ও নদী যেন সমার্থক ভাবব্যঞ্জনায় অপূর্ব মহিমান্বিত।

প্রভাতসঙ্গীতের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রবীন্দ্রকবিপ্রতিভারই স্বপ্নভঙ্গ। অবরুদ্ধ কবিপ্রতিভা নির্ঝরের মতো মুক্তি পেল, নদীর মতো গতি পেল। কবির কথায়, "সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।" (প্রভাতসংগীত। জীবনস্মৃতি)।

"তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া— হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া গাহিয়া গাহিয়া গান,—"

অথবা, আমি ঢালিব করুণা ধারা আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আকুল পাগল পারা।"

অথবা, "কী জানি কি হ'ল আজি জাগিয়া উঠিল প্রাণ
দূর হ'তে শুনি যেন মহাসাগরের গান।"

প্রথম উদ্ধৃতাংশে কবিপ্রতিভার বন্ধনমুক্তি ও অগ্রযাত্রা তটিনীর বহতা শক্তির মধ্যে উপলব্ধি করেছেন কবি। এ মুক্তি অন্ধ-বিষাদ থেকে বৃহৎ জগতে মুক্তি। সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে প্রভাতসঙ্গীতে উত্তরণ।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে সৃষ্টিবাসনা ও হৃদয়োদ্বেলতার কথা। নদীর ধর্ম—দুই তীরভূমিকে সৃষ্টিশালী ক'রে তোলা। প্রতিভাও তেমনি নবনবোন্মেষশালিনী।

তৃতীয়াংশে, মহাজীবনের মধ্যে—সুদূরের মধ্যে এক কথায়,—অসীমের মধ্যে মুক্তির আভাস।

রবীন্দ্রপ্রতিভার মূল কথা যেন এই কবিতার মধ্যে বীজাকারে রয়েছে।

প্রথম যৌবনে কবিকে জমিদারী তদারকের কাজে পদ্মা নদীতে বোটে ক'রে ঘুরতে হয়েছে। তখন পদ্মার নিয়ত সান্নিধ্য যেমন একদিকে তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে প্রাচুর্য এনেছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর প্রতিভার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। পদ্মার মতো দুকূলপ্লাবী প্রতিভা একদিকে ছোট গল্প ও অপরদিকে গীতিকাব্যের ফসল ফলিয়েছে। পদ্মাতীরবর্তী এই যুগ শ্রেষ্ঠ ও ভূয়িষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির যুগ।

নদীর দু'টি কাজ। (এক) প্রবহমানতা। (দুই) তীরভূমির উর্বরতা সাধন। রবীন্দ্র-প্রতিভাও নদীর মতো চলিষ্ণু এবং রবীন্দ্রসাহিত্য নদীতীরবর্তী ভূভাগের মতো বর্ধিষ্ণু।

একটা চিঠিতে কবি ব'লেছেন, "সেই সময়ে আমি অনুভব ক'রেছিলুম যে বাঙ্‌লা দেশের নদীই বাঙ্‌লা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে।" (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড—প্রভাত মুখোপাধ্যায় পৃঃ ১০৩) এ'কথা ঘুরিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও বলা যায় যে রবীন্দ্রপ্রতিভার মর্মবাণীও নদীর মধ্যেই স্বাধর্ম্য খুঁজে পেয়েছে।

যৌবনেই রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কালিদাসের কাব্যের মাধ্যমে এবং গৌণতঃ ভারতীয় ইতিহাস-পুরাণ-শাস্ত্র-পঠনের সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্যময় রাজ্যে মানস ভ্রমণ ক'রেছিলেন। 'কল্পনা' কাব্য রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্যের সৌন্দর্যাস্বাদন ও প্রাচীন ভারতের মানসচারণার কাব্য। কবি কল্পনায় পদ্মাতীর থেকে শিপ্রাতীরে চ'লে গেছেন; বর্তমান থেকে অতীতে—বাস্তব লোক থেকে কল্পলোকে—দূরে বহু দূরে উজ্জয়িনীপুরে শিপ্রা নদী পারে—তাঁর পূর্ব জনমের প্রথমা

প্রিয়ার কাছে। "পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়া" আর কেউ নয়, সে হ'ল রবীন্দ্রনাথের 'জনমান্তর সৌহৃদ' রোমান্টিক সৌন্দর্য-চেতনা। শিপ্রানদী ভৌগোলিক বটে, কিন্তু এখানে মানসিক নদী।

বলাকার যুগে কবি যে নদীর তীরে এসে পৌঁছালেন তা'র ভৌগোলিক অবস্থান নির্দেশ করতে যাওয়া অবান্তর, এ' নদী মানসিক চৈতন্যের নদী—এ' নদী 'আকাশগঙ্গা' বা 'চঞ্চলা'। পরিত্যক্ত পূর্বনাম অবশ্য 'নদী'ই। দেশদেশান্তর—যুগযুগান্তরব্যাপী, বিশ্বচৈতন্যস্রোতো প্রবাহের এক নদীকল্প অনুভূতি এ' যুগের বৈশিষ্ট্য। সোনার তরী চিত্রাযুগের পদ্মাই যেন এখানে এক মানসিক চৈতন্যের নদীতে পরিণত হয়েছে সেই ধারারই পূর্বসূত্র ধরে। তাই বলাকার 'চঞ্চলা' ও অন্যান্য কবিতায় অনেকে তত্ত্বের আরোপ ক'রে থাকেন, কিন্তু কবির কথায়, "এই কবিতাটি একটি তত্ত্বমাত্র নয়, এ আমার আনন্দ রূপ।" এবং আরো বলেছেন, "আমি বহুকাল ছিলাম নদীর উপরে, তাই এই বিশ্ববেগ সেদিন আমার কাছে কালোরাত্রির পদ্মানদীর মতোই বোধ হ'ল।" (দ্রঃ বলাকা কাব্যপরিক্রমা। ১ সং—ক্ষিতিমোহন সেন পৃঃ ৭৫)।

বলাকার মূল সুর যে এক অখণ্ড, অনন্ত গতিপ্রবাহের উপলব্ধি তার মর্মবাণী চঞ্চলা কবিতায় নিহিত। আর রয়েছে ৩৬ সংখ্যক গ্রন্থনামাঙ্কিত কবিতাটিতে। 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'—এ'কথা রবীন্দ্রপ্রতিভার চলিষ্ণুতারই দ্যোতক। কিংবা সীমা থেকে অসীমে যাত্রার ইঙ্গিত। "হেথা" হ'ল নামান্তরে 'সীমা' আর "অন্য কোথা" হ'ল 'অসীম'।

'চঞ্চলা' কবিতায়ও কবি বলেছেন, "চ'লেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী।" আরও বলেছেন,—

"ওরে কবি তোরে আজ ক'রেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন মেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অকারণ চলা ;
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি
কথা তোর উঠে রণরণি
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা……।"

'সমুদ্রের ঢেউ' হ'ল অসীমের হাতছানি, 'অরণ্যের ব্যাকুলতা' হ'ল সীমা থেকে বন্ধনমুক্তির পিপাসা। 'তীরের সঞ্চয়' বলতে সীমা এবং 'অতল আঁধার ও অকূল আলো' হ'ল, অসীমের রাজ্য।

রবীন্দ্রপ্রতিভার অপর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে অসীমের রাজ্যে তিনি বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না। সীমার টানে তিনি আবার ফিরে আসেন মাটির পৃথিবীর বুকে। সীমা ও অসীমের এই দ্বন্দ্ব চিরদিন তাঁর জীবনে ছিল। তাঁর কথাতেই বলা যায়, "আমি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মধ্যে সুখ-দুঃখ মিলন বিরহপূর্ণ ভালোবাসার টানই প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্খাই প্রবল।"

'বলাকার' পরে পূরবীর যুগে তিনি আবার সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহপূর্ণ ভালোবাসার টানে মাটীর বুকে ফিরে এসেছেন, কবির কথায়, "যাই চ'লে যাই মাটীর বুকে, যাই চ'লে যাই মুক্তি সুখে। তখন তিনি যে নদী তীরে এসেছেন তা' হ'ল "কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনা"

"এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি নিয়েছি বিদায়।"

'পূরবীর পর থেকে মাটীর পৃথিবীর প্রতি কবির আকর্ষণ নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে। নতুন প্রেমে

নতুন বেদনায় পুরাতন পরিচিত পৃথিবীর প্রতি তিনি আসন্ন মৃত্যুর গোধূলি আলোকে যে অপরিসীম মমতাস্নিগ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন তার তুলনা নেই।

এরপর মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে কবি যখন 'পুনশ্চ' কাব্যে এসে পৌঁছলেন তখন কবিপ্রতিভার নদীটি একেবারে সাধারণ মানুষের গৃহস্থপাড়ার পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তখন আর বিশ্বচৈতন্য গতিবাদ বা অন্য কোন দার্শনিক-সত্য-প্রতীতি নয়, তা নিতান্তই সাধারণ কথা। এখানে পাচ্ছি সাধারণ মেয়ের কথা, যে ইংরেজি ফরাসী জানে না—কাঁদতে জানে, এখানে পেলাম সেই দুরন্ত দুর্বার ছেলেটার কথা আর সেই সঙ্গে নেড়ী কুকুরের কাহিনী, কানে ফুল গোঁজা সাঁওতাল মেয়ে, সাড়ে তিন টাকা মাইনের ইস্কুল মাস্টার, আর সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণীর কথা। এদের ভাষা 'গৃহস্থপাড়ার ভাষা'। 'পুনশ্চ' কাব্যের ভাষাও তাই। কোপাই নদীর ক্ষীণ স্রোতে কবি গদ্যচ্ছন্দের রূপটি দেখেছেন।

"কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথী ক'রে নিলে,
সেই ছন্দের আপোষ হয়ে গেল ভাষার জলে স্থলে,
সেখানে ভাষার গান আর ভাষার গৃহস্থালি।" (কোপাই। পুনশ্চ)

এর পরবর্তী কাব্য বীথিকা, পত্রপুট, শ্যামলী, সেঁজুতি ইত্যাদি কাব্যে অপরিসীম মর্ত্য-মমতার কথা। রবীন্দ্রপ্রতিভার নদীটি এখানে মাটির কোন ঘেঁষে, মানুষের দুঃখ-সুখের লোকালয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। মাঝে একবার কঠিন রোগাক্রান্ত হত চৈতন্য কবি কিছুকাল জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন কোন এক প্রান্তে অন্ধকার অস্পষ্ট মৃত্যুলোকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সে জগতের কথা 'প্রান্তিক'। রোগমুক্তির পর সেঁজুতিতে এসে আবার তিনি ঘোষণা করলেন 'খেয়াতরী হারা এ পারের ভালোবাসার কথা,' স্বীকার করলেন, 'আমি সে মাটির কাছে ঋণী, জানায়েছি বারংবার।' তারপর, নবজাতক, সানাই, রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে ইত্যাদি কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি 'শেষ লেখা'য় এসে যেখানে পৌঁছলেন, সেটি কোন ভৌগোলিক নদীতীর নয়। তা কবির অতুলন ভালোবাসার ধন, রূপে-রসে-ভরা মর্ত্যজীবন-নদীর তীর—কবির অপূর্ব ব্যঞ্জনাময় ঋকৃবদ্ধ ভাষায়—

'রূপনারাণের কূলে দেখিলাম এ জগৎ
জেগে উঠিলাম, স্বপ্ন নয়।' (১১ সংখ্যক কবিতা। শেষ লেখা)

'রূপনারাণ' কথার অর্থ এই রূপবতী পৃথিবী। সেই বিশ্বরূপের নদী-তীরবর্তী কবির কি অপরিসীম মর্ত্যমমতা! জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি কি অসীম শ্রদ্ধা! আসন্ন মৃত্যুপথযাত্রী কবির কণ্ঠে কি মৃত্যুঞ্জয়ী বলিষ্ঠ ঘোষণা—"দেখিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়"।

তা'হলে রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ একদিকে যেমন অসীমের অভিযাত্রী, অন্যদিকে তেমনি মাটির মায়ার মর্ত্যশায়ী। একদিকে, সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ স্বর্গলোকবিহারী, অপরদিকে ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির প্রতি কি বন্ধনে বাঁধা। স্বর্গ ও মর্ত্য, সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের পালাই তো তাঁর কাব্য সাধনার একমাত্র পালা। সে পালার মূল সূত্রধার নদী।

বিদেশীদের দেখা টুকিটাকি

চণ্ডী লাহিড়ী

মশা

বাংলা দেশের মশা, যার নামডাক বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছিল তার কথা সভয়ে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রান্ট (১৮৪০) লিখেছেন—

"বাইরের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যই গায়ে চামড়ার ব্যবস্থ'। কিন্তু জঙ্গলে যেসব প্রাণীর গায়ের চামড়া অত্যধিক পুরু তারাও শরীরের চারিদিকে আচ্ছাদন দেয়। এমনকি, অমন যে বৃহদায়তন হাতি তাকেও দেখা যায় মাথা ও পিঠ অশ্বত্থ গাছের পাতা দিয়ে ঢাকতে হয়েছে। অবশ্য কেবল মশার জন্যই তাদের শরীর ঢাকতে হয় এমন কথা বলছি না। বাংলা দেশের নিম্ন জলাভূমিতে যেসব বিচিত্র কীটপতঙ্গ প্রতিবেশীদের উপর আক্রমণ চালায় মশা তাদের মধ্যে অন্যতম। অবশ্যই প্রধানতম। এদের মধ্যে একদল কেবল সংখ্যাধিক্যের জোরেই মারাত্মক, প্রায়ই তাদের বিভিন্ন পাত্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট দেখা যায়। আর একদল আরও সাংঘাতিক। বিপদ সৃষ্টির জন্যই যেন তাদের জন্ম, এরা কেবল কামড়ায় না, দংশানস্থলে ক্ষতের সৃষ্টি করে। এদের দংশনে ঘোড়ার পা থেকেও রক্ত পড়তে আমি দেখেছি। দেখে মনে হয় যেন ছোট ছুরি তার পায়ে ফুটিয়ে দিয়েছে। সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় ঘোড়ার পায়ে ষ্টাকিং দিয়ে বা খড় দিয়ে বাঁধা।

ব্যাঙের ডাক

ক্যালকাটা জার্নালে (১৯১৯, ২৪ নভেম্বর) জনৈক পাঠক ব্যাঙের ডাক সম্পর্কে নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন—

"আমরা, ভাগ্য যাদের এই ভারতে পাঠিয়েছে, প্রায়ই এক ব্যথাভরা অভাব অনুভব করি। এদেশে কোন শোভন সান্ধ্য আনন্দানুষ্ঠান নেই। এখানে কোন সুকণ্ঠী পাখী নেই। এখানে আছে নানা শব্দ পারঙ্গম কীট পতঙ্গ ও গম্ভীরনাদী ব্যাঙ।

সম্পাদক মহাশয়, বর্ষারাতের সন্ধ্যায় আমার ঘরের আশেপাশে যে লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ ডাকে আমি আন্তরিকভাবে চেয়েছিলাম সেগুলি সঙ্গীত হোক। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায়ই তাদের "সুমিষ্ট গান" আমায় শুনতে হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিন্তু সেই একঘেঁয়ে কণ্ঠনিনাদের মধ্যে সুন্দর কিছু পাইনি। তারা যেন একটানা বলে যায় Pay me what you owe me. I'll go to low, I'll go to low."

অনেক সময় সেই হুমকী এমন অপ্রীতিকর মনে হয় যে, ইচ্ছা করে তাদের নাম দিই Jail bird.

তাড়ি

মদ্যপানের ব্যাপারে ইওয়োপীয়ানরা চিরদিনই ভারতীয়দের উপরে টেক্কা দিয়েছে। আকবরের বাহিনীতে যে সব ইওরোপীয় 'গানার' ছিল তাদের ঢালাও মদ সরবরাহের হুকুম দেওয়া হয়।

"আকবর নাকি বলতেন পৃথিবীতে মদ ও ইওরোপীয়দের সৃষ্টি হয়েছে যুগপৎ। এ দুটির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মাছকে জল থেকে তুলে আনলে যেমন বাঁচে না, ইওরোপীয়ানদের মদ না দিলে তারা তেমনই মারা যাবে। নেশা না হলে চোখে তারা দেখতেই পায় না। (Manucci, Storia do Mogor ")

ভারতে কোথায় কোন নেশার দ্রব্য বিখ্যাত সেটা সেনাবাহিনীর লোকেরা পরখ করে দেখতে ভোলেনি। জনৈক ক্যাপ্টেন সিম্পসন ভারতীয় নেশার দ্রব্য সম্পর্কে প্রায় দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। আঠারো শতক পর্যন্ত ভারতের প্রধান মদ আরক। ক্যাপ্টেন সিম্পসনের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, আরক তৈরি হত চাল বা তাড়ি থেকে, কখনও বা চিনির রস থেকে। এর সঙ্গে মেশানো হত বাবুল গাছের রস। তখন একে বলা হত "জাগর আরক" সেটা হত Hot as brandy and drunk in drums by Europeans"

তাড়ি সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন" "It effects the head as much as English Beer. In the morning it is laxative and in the evening astringent.

আরও বলেছেন—"অপরিমিতভাবে সেবনের ফলে বহু ইওরোপীয়ান মৃত্যু বরণ করেছে। কারণ নেশার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পেত। তারা এত অধৈর্য হয়ে পড়ত যে কোন স্থানে তাদের শরীর ঠাণ্ডা হত না। বাধ্য হয়ে সারারাত খোলা মাঠে তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকত। এই অবস্থায় সহজেই তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেওয়া হত।"

আরকের পর পাঞ্চ ইওরোপীয় মহলে জনপ্রিয় পানীয়রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। পাঞ্চ কথাটি পঞ্চরঙ থেকে। আরক গোলাপ জল…চিনি ও জল মিশিয়ে তৈরী হত পাঞ্চ।

ক্যাপ্টেন মাণ্ডি তাড়ি খেয়ে প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে—"তাড়ি এদেশে খুব সস্তা। ভোরবেলা খেলে 'নির্দোষ পানীয়। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তালরস গেঁজে যায়। তখন একে বলে তাড়ি। এই তাড়ির সঙ্গে লঙ্কা মিশিয়ে তাকে আরও উত্তেজক করা হয়। ইওরোপীয়রা অধিক পরিমাণে এই জিনিস পান করে। সাহেবরা লিভারের দোষে এদেশে যে কষ্ট পায় তার মূলে এই তাড়ি সেবন। দাম সস্তা। মাত্র এক পেনি ব্যয় করলে একেবারে ব্যোম হয়ে (Dead drunk) পড়ে থাকা যায়।"

ষ্ট্যাথামও স্বীকার করেছেন তাড়ির দাম সস্তা এবং ইওরোপীয় সৈন্যদের খুব প্রিয়।

"আমি দেখেছি তিন চারজনের একটি দল গোল হয়ে বসে, তাদের মাঝখানে দু তিন গ্যালন পানীয় বোঝাই একটি পাত্র। এই পাত্র সারারাত্রে একাধিকবার বদল হয়েছে। একটি খালি হতে আর একটি সেই স্থান দখল করেছে। নির্জন সেনা ছাউনির কাছে যেখানেই বাজার সেখানেই তাড়ির দোকান আছে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না যে কিছু আছে। যে সব সৈন্য দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ তারা এসবের কোন খবর রাখে না, অথচ যারা নেশা করে তাদের সময় ও অর্থের অধিকাংশই অপব্যয়িত হয় তাড়ি ও আরক খেয়েই। যেখানে দোকান নেই, সেখানে নেশাখোরেরা সরাসরি তালগাছের কাছে চলে যায় ও সেখানে বসেই ভাঁড় নামিয়ে খায়।"

ষাঁড়

এদেশের ষাঁড় বহুবার বহু বিদেশীকে আকর্ষণ করেছে সম্ভবতঃ এদের বৃহৎ কুকুদ ও বেপরোয়া চাল চলন তাঁদের মুগ্ধ করে থাকবে। হেবার লিখেছেন তাঁর ডায়েরীতে—

"নদীর তীরে জাম গাছের তলায় প্রথম দেখলাম এক নধরকান্তি ষাঁড়। তার কুকুদের উপর শিবের প্রতীক অঙ্কিত। তখন সে সবুজ ধান ক্ষেতে বিচরণরত। আমাদের রাস্তার উপর এল বেশ খোস মেজাজেই। ষ্টোর (জনৈক সহযাত্রী) হাতে ছিল কচি ঘাস, তাই দেখে ঠাণ্ডা মাথায় এগিয়ে এল ওঁকে দেখতে। শিবের কাছে উৎসর্গ করার জন্ম অল্পবয়সী বাছুরদের ষাঁড়ে পরিণত করা হয় বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে, এদের প্রহার করা বা আহত করা মহাপাপ। তারা যখন যেখানে খুসি খায় আর ধর্মপ্রাণ ব্যাক্তিরা এদের পরিতোষ সহকারে খাইয়ে তৃপ্তি লাভ করে। কলকাতার আশেপাশের গ্রামগুলিতে এরা সংখ্যায় পোকামাকড়দের ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কখনও কারো বাগানে কখনো কারও ফলের দোকানে, কখনো খাবারের দোকানে অবলীলাক্রমে মুখ লাগায় একেবারে নিঃশব্দে। অন্ত পোষ্য প্রাণীর মত এরাও মাঝে মাঝে মেজাজ খারাপ করে বসে। ইচ্ছা পূরণে দেরী হলে শিঙের গুঁতো দিতে দেরী করে না।"

হেবার যাই বলুন, ষ্ট্যাথাম সাহেব বাঙ্গালী ষাঁড়ের প্রসংসা করেছেন অকুণ্ঠিত মনে। ষাঁড়ের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। সেকথা তিনি লিখেছেন স্মৃতিকথায়—বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেশী ধনীরা বাছুর-ষাঁড়ের গায়ে শিবের প্রতীক এঁকে ছেড়ে দেয়। এর অর্থ শিবের নামে উৎসর্গীকৃত, শিবের সম্পত্তি। তখন থেকে সে আর সাধাধণ ষাঁড় নয়, বৃষ। লোকে বলে ধর্মের ষাঁড়। যেখানেই সে বিচরণ করুক কেউ তার গায়ে হাত তুলবে না, এদের কারও গায়ে আঘাত করা গুরুতর পাপ বলে বিবেচিত হয় এবং এই নিয়ম ভঙ্গের জন্ম যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে সেই গুরুদণ্ডকে হিন্দুমাত্রেই ভয় করে। কারণ তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে এবং শস্তাদি যা কিছু বিক্রয়ার্থ দোকানে খোলা পড়ে থাকে তাতেই মুখ লাগায়। শেষ পর্যন্ত তাদের দেহ হয় স্থূল, গতি হয় ধীর। কয়েক বৎসর তাদের সংখ্যা কলকাতায় এত বৃদ্ধি পায় যে, সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কর্তৃপক্ষ হুকুম দিলেন, তাদের গঙ্গার ওপারে হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক। তাই করা হল। নৌকায় চাপিয়ে তাদের ওপারে হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল। কলকাতার অধিবাসীরা যথোচিত প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে তাদের বিদায় দিল।

কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই দেখা গেল, সবাই খাস কলকাতায় ফিরে এসেছে। নিজ নিজ এলাকায় বিচরণ করছে পূর্ববৎ। কে এই জঘন্ত অপকর্ম করল অনুসন্ধানের জন্ম তদন্ত হল। নগর কর্তৃপক্ষ ভুলে গেলেন যে, এদেশের গবাদি পশু সবচেয়ে চওড়া ও সর্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল নদীও সাঁতারে পার হতে পারে অনায়াসে।

একটি ভদ্র ষাঁড় আমার বাড়ীর আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। ছোট ছেলে ও ভৃত্যদের সে ছিল প্রিয়পাত্র। ছোটরা প্রায়ই তার পিঠে চড়ে বসত। একদিন রাত্রে আমি নদীর ওপারে গিয়েছি। সহসা প্রবল ঝড় উঠল। ফলে যথাসময়ে ফিরতে পারলাম না। সহিসকে ঘোড়ার গাড়ী যে সময় ঘাটে আনতে বলেছিলাম, তার পরেও তিন চারি ঘণ্টা দেরী হল। ফলে এপারে

ঘাটে নেমে দেখি সহিস ও গাড়ী নেই। রাত তখন প্রায় বারোটা তখনকার দিনে এমন পাকা রাস্তা ছিলনা। বৃষ্টির জল পড়ে রাস্তাটা বড়ই নোংরা হয়েছিল। এপারে ফিরে এসে ভাবছি কি করে বাড়ি ফেরা যায়। দেখি সেই ষাঁড়টি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। চেপে বসলাম তার পিঠে। যদিও তার গতি ছিল অত্যন্ত ধীর তবু কাদার মধ্য দিয়ে আমায় পিঠে নিয়ে একেবারে বাড়ি পৌছে দিল। সারারাত রাস্তায় কোথাও কোন লোক নেই। কিন্তু একজন চৌকিদার দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে গেল। সে বোধহয় ভেবেছিল, নিশ্চয়ই শিব স্বয়ং আসছেন তার বাহনের পিঠে চড়ে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতেই সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে হেসে উঠল। পরে বাড়ীর দরজায় এসে ষাঁড়ের পিঠ থেকে নেমে সেই পবিত্র ষাঁড়ের গলায় একটু হাত বুলিয়ে বিদায় করলাম। যদিও আমার সাদা ট্রাউজার তার গায়ের কাদা মাটির স্পর্শে নোংরা হয়ে গিয়েছিল তবু তো সে আমায় কাদার রাস্তা পার করেছে। অন্যথায় সেই কাদার মধ্য দিয়েই তো আমায় আসতে হত।"

কেরী তাঁর 'গুড ওল্ড ডেজ অব জন কোম্পানী, গ্রন্থে কলকাতার ষাঁড়ের উল্লেখ করছেন। সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নগরবাসীর জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। ফলে ১৮১৫ সালের আগষ্ট মাসে সহর থেকে তাদের বিতাড়নের হুকুম হয়, নদীর ওপারে হাওড়ার দিকে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তার পরেও বহু বৎসর, যতদিন পর্যন্ত দেশীয় অধিবাসীদের ধর্মীয় সংস্কারের গুরুত্ব দেওয়া হত না, ততদিন পর্যন্ত এই সব ষাঁড়কে মিউনিসিপ্যালিটির আবর্জনা বহনের কাজে নিয়োগ করা হত।"

চৌকিদার

যাঁরা এখনও পল্লীগ্রামে থাকেন, মধ্যরাত্রে নিশ্চয়ই চৌকিদারের হাঁক শুনছেন। না শুনে উপায় নেই। 'কানের ভিতর দিয়া' একবার মরমে প্রবেশ করলে খুব সহজে মালুম পাওয়া যায় "সাইলেন্স ইজ গোল্ডেন" কথাটির উৎপত্তি কেন হয়েছিল। সারিগানের সব ক'টি আওয়াজ একটিমাত্র কণ্ঠ থেকে কি রকম প্রাণান্তকরভাবে উচ্চারিত হতে পারে সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ জানে না। সেকালে কলকাতাতেও চৌকিদারেরা রাত্রে হাঁক দিত। যে সাহেব সহরে নবাগত, তাঁদের কানে এই ডাক একবার গেলে সারারাত্রি আতঙ্কে ঘুম হত না। একজন সাহেব মন্তব্য করেছেন—

"আমরা এই আওয়াজ শুনে আতঙ্কে রাত কাটাই, অথচ এই আওয়াজ কানে না গেলে বাবুরা নাকি প্রাণে সাহস পান না।" এই বিচিত্র প্রাণঘাতী আওয়াজের বর্ণনা দিতে গিয়ে আর একজন বলেছেন—A sort of compound of the belloing of a mad bull, the screech of a strangled crow, and the yell of a scalded hound. Again and again the super-human, super-brutal powling and yelling is renewed; sometimes near, sometimes more remote but always horrible. (Englishman, 15th June, 1840)

ছ্যাগাবন্ধক

এদেশের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের (সেকালে বলা হত হাফ-কাষ্ট বা বর্ণসঙ্কর) প্রধান বন্ধু ছিল

ইওরোপীয়ান ভ্যাগাবণ্ডরা। এদের অনেকেই পূর্বে হয়ত কোম্পানীর সেনাবাহিনীতে ছিল। চাকুরী যাওয়ার পরও দেশে ফিরে যায়নি। এখানেই মদের ভাঁটী খুলছে। কেউ দোকান চালায়, কেউ অন্য সাহেব বাড়ীতে নফরবৃত্তি করে। পরবর্তীকালে এদেরই অনেকে গ্রামাঞ্চলে নীলের চাষ করেছে এবং সেই সূত্রে দরিদ্র চাষীদের উপর চালিয়েছে নির্যাতন। মদ খেয়ে মাতলামী করতে, দিনের বেলায় মানুষ খুন করতে, সর্ববিধ চুরি-জুয়াচুরিতে এককথায় সর্বতোভাবে পল্লীর শান্তি ভঙ্গ করতে এরা ছিল অগ্রণী। ইংরেজদের সুনাম হানির জন্য এদের দায়িত্ব কম নয়। এদের ভ্রষ্ট চরিত্র দেখে ভারতীয়রা খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠে। খৃষ্টধর্ম ও মাতলামী এদের জন্যেই সাধারণ ভারতবাসীর কাছে সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

"Christian religion! delili religion! Christan much drink, much do wrong, much beat, much abuse others" এ অভিযোগ শুনতে হয়েছে একজন পাদ্রীকে। হয়তো অন্যান্যরাও এই অভিযোগ শুনে থাকবেন।

দক্ষিণ ভারতে সোয়ার্থস্ (Swrtz) গিয়েছিলেন ধর্মপ্রচার করতে। জনৈক হিন্দু নৃত্য-শিল্পীকে তিনি বোঝাচ্ছিলেন কোন অসাধু, দুর্বৃত্তের পক্ষে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব নয়। পবিত্রচিত্ত ব্যক্তিরাই সেখানে যেতে পারে।

"তাই নাকি।" নৃত্যশিল্পী হেসে উঠেছিলেন—"তবে তো কোন ইওরোপীয়ানই সেখানে যেতে পারবে না।"

এই ভ্যাগাবণ্ডের কথাতেই ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ডের পাঁচটি ভলুম বোঝাই হয়ে আছে। তাদের মাতলামী, ঝগড়া, টাকা ধার করা, আইন না-মানা, নারী হরণ, নরহত্যা কোন কিছুই বাদ নেই। সেইসব কাহিনী ইণ্ডিয়া অফিসের রেকর্ডে আছে।

কোম্পানী ছিল অসহায়। তার নিজের কর্মচারীদের শাস্তি দেবার অধিকার ছিলনা, অন্যকে শাস্তি দেবে কি করে। মানুষ খুন অনেকেই করেছে। কিন্তু তজ্জন্য শাস্তি পেয়েছে সর্ব-প্রথম উইলিয়ম স্মিথ ১৭৯৯ সালে। জনৈক সিপাইকে হত্যা করেছিল। স্মিথ একটি মদের দোকান চালাত। তাকে জোর করে দেশে পাঠাবার সময় সে এক সিপাহীকে গুলি করে। কলকাতাকে ভ্যাগাবণ্ড মুক্ত করতে কোম্পানী চেষ্টা করেছিল অনেক। ১৭৬৭ সালে ক্লাইভ তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য লণ্ডনে লেখেন। ১৭৮৯ সালে মেরিণ পে-মাষ্টার প্রাইস গভর্নর জেনারেলের সেক্রেটারীর কাছে অভিযোগ করেন যে, বিদেশী জাহাজযোগে যে সব ইংরেজ ভারতে আসে তাদের কোন কাজে লাগে না। তারা এদেশে অত্যধিক মদ্যপান করে এবং সেজন্য অকালে হাসপাতালে মারা যায়। হুগলী নদীতে এসে এরা যাতে কলকাতায় নামতে না পারে তজ্জন্য হুগলী নদীতে গার্ড দেবার জন্য অনুরোধ জানান। কর্ণওয়ালিস হুকুম করেছিলেন, তাদের ফোর্টের মধ্যে আটকে রাখা হোক।

ক্লাইভ ১৭৬৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী লণ্ডনে সিলেক্ট কমিটির কাছে যে চিঠি লেখেন তাতে ভ্যাগাবণ্ডদের কলকাতা থেকে অবিলম্বে অপসারণের দাবী করেছেন

"Another growing evil which requires a speedy remedy in the number

of vagabonds that infest the Presidency, all these must be apprehended and embarked on board ships for Europe without delay. In their native country they may become useful to the public, but in Calcutta they are worse than idlers. Our police is not perfect enough to prevent their being guilty of many outrages, of which I need only mention the oppressing the poor inhabitants and the retaining of spirituous liquors, which destroy the constitution and lives of many of our soldiers.

সাহিত্য সংবাদ

যে বাঁশীর সুর আমাদের মনকে অফুরন্ত আনন্দের অনুভূতিতে নিয়তই উদ্বেল করে তোলে, সে সুর সাগর পারে; সুদূর পশ্চিমের দুটি তরুণ প্রাণকে একই সূত্রে বেঁধেছিল একদিন। সেই প্রণয়মধুর কাহিনীর সুরকার হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মর্মবাণী সেই দুটি তরুণ আকুলিত হৃদয়ের অর্গলবদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত করে তাদের জানিয়ে দিয়েছিল—"পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে ক'রেছো এ কী, সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছো তা'রে ছড়ায়ে।"

১৯১৩ সালের কথা, বিশ্ববাসী জানল সে বছরের সাহিত্যের পুরস্কারটি নোবেল কমিটি, ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করেছে। সারা পৃথিবীতে সবুজ বাংলার মেঠো বাঁশীর প্রাণমাতানো সুর ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল এবং সে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হলেন স্পেনদেশের এক কিশোরী, নাম—সিনোরিটা জেনোবিয়া কাঁপ্রুবি। কাব্যচর্চায় উন্মুখ রজনীগন্ধার উদ্ভিন্ন একটি কলি কিন্তু ভ্রমরলাঞ্ছিত। সে ভ্রমরও একজন উদীয়মান কবি। হুয়ান রামোন হাইমেনেৎস্ তখন রেসিদেন্সিয়া দ্য এস্তুদিয়েন্তসের মধ্যমণি, জনপ্রিয় কবি আন্তোনিও মাশাদোর প্রিয় বন্ধু।

সিনোরিটা কাঁপ্রুবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করে মুগ্ধ হলেন এবং স্প্যানিশে তর্জমা করে প্রিয়তম হাইমেনেৎসকে উপহার দিলেন। কবিগুরুর সঙ্গীত তাঁদের প্রাণে আনল এক স্বর্গীয় অনুভূতির বিচিত্র স্বাদ। হাইমেনেৎস্ সে কবিতা পাঠ করে হলেন বিমোহিত, যে সুর এতদিন পথ খুঁজে পাবার জন্য তাঁর মনের দেয়ালে মাথা কুটে মরছিল সে সুরের রামধনু ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যাকাশে তখন আপন গরিমায় দিগন্ত বিস্তৃত। তাঁর প্রাণপুরুষ গেয়ে উঠল—এই-তো, এই সে সুর। কবিগুরুর কবিতা পাঠের জন্য হাইমেনেৎসের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু তিনি ইংরাজী জানতেন না, সুতরাং কিশোরী জেনোবিয়ার শরণাপন্ন হলেন। প্রণয়োন্মুখ জেনোবিয়া, কবিগুরুর আরও কয়েকটি কবিতা স্প্যানিশে অনুবাদ করে প্রিয়সঙ্গীর হাতে তুলে দিলেন। তারপর সেই মেঠো বাঁশীর সুর দুটি কাব্যবিভোর প্রাণকে ক্রমশঃ নিকটতর করে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলল। অজান্তে কবিগুরু তাঁদের প্রাণে রঙের অরুণাভা ছড়িয়ে প্রজাপতির ভূমিকা গ্রহণ করলেন—"Unwittingly the Hindu poet played the role of Cupid in their courtship—Graciela P. Nemes.

জেনোবিয়ার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হাইমেনেৎসের শ্রদ্ধাজনিত স্পর্শে কবিগুরুর কবিতা স্প্যানিশে ভাস্বর হয়ে উঠল, কাব্যরসিক স্পেনবাসীদের এক নূতন সুরে মাতিয়ে তুলল। এইভাবে তাবৎ স্পেনের বিদগ্ধ সমাজ রবীন্দ্রনাথ পড়বার সুযোগ লাভ করলেন সিনোরিটা জেনোবিয়া কাঁপ্রুবি ও হুয়ান রামোন হাইমেনেৎসের যুগল প্রচেষ্টায়, যার মূলে ছিল দুটী ভাব্রু হৃদয়ের প্রণয়াকাঙ্খা।

হাইমেনেৎসের কবিমন যখন পথের দিশায় আত্মহারা ঠিক তখনই তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার সান্নিধ্যলাভ করেন এবং তাঁর মনে কবিগুরুর প্রভাব আমৃত্যুকাল পর্যন্ত বর্তমান ছিল। প্রভাব থাকলেও হাইমেনেৎস্ ছিলেন প্রতিভাধর কবি, তাই তাঁর কবিতা পাঠের সুযোগ যখন ঘটে তখন মনে হয় স্প্যানিশ শব্দতরঙ্গের পশ্চাদপটে যেন সবুজ বাংলার মেঠো বাঁশীর সুরে ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে কিন্তু হাইমেনেৎসের কবিতায় অনুকরণের কালিমাস্পর্শ কোথাও নেই।

১৮৮১ সালে, উয়েলভায় মগুয়ে নামক স্থানে হাইমেনেৎস্ জন্মলাভ করেন, দিনটি ছিল শীতার্ত ডিসেম্বরের ২৪ তারিখ। তারপর জেসুইট ফাদারগণের কাছে হাতে খড়ি হয় এবং সেভিল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি অতিবাহিত হয় মাদ্রিদের কবিপল্লীতে। ১৯১২ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত রেসিদেন্সিয়া দ্য এস্তুদিয়েন্তসে বাস করেন। ১৯১৬ সালে সিনোরিটা জেনোবিয়া হন সেনোরা জেনোবিয়া কাঁপ্রুবি দ্য ইমেনেৎস্।

বর্তমান শতাব্দীর গত অর্ধ শতকের স্পেনে আধুনিক কাব্য আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ছিলেন রুবেন দারিও; হাইমেনেৎস্ ছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য। অবশ্য ফরাসী কবি আলবেয়ার সমঁ্যার প্রভাবও তিনি প্রথম জীবন এড়াতে পারেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় জগতের সন্ধান হাইমেনেৎস্ যখন পেলেন, তখন তাঁর লেখনী খুঁজে পেল আরব্ধ পথ। দারিওর মৃত্যুর পর হাইমেনেৎস্ স্পেনের সমগ্র কাব্য আন্দোলনকে একটা সর্বাধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং নির্বিবাদে স্পেনের শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করেন।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ কবিকে দেশান্তরী করে; যাযাবর হাইমেনেৎস্ কিউবা, আমেরিকার ফ্লোরিডা এবং পুয়ের্তো রিকোয় শেষের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। ১৯৫৬ সালে হাইমেনেৎস্ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, কিন্তু সেই আনন্দের দিনগুলি অকস্মাৎ বিষাদের ঘন কালিমায় ছেয়ে যায়। সেনোরা জেনোবিয়া পরলোকগমন করেন। হাইমেনেৎসের বাকী দিনগুলি নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় আর জেনোবিয়ার স্মৃতিচারণে নিঃশেষিত হয়। সান হুয়ানের একটি নিরাড়ম্বর কক্ষে কবিগুরুর মানসপুত্র হাইমেনেৎস্ ১৯৫৮ সালের ২৯শে মে তারিখে এ পৃথিবীর সব সৌন্দর্য শেষবারের মতো উপভোগ করে অন্য এক স্বপ্নময় জগতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন,—শেষ হয় এক শান্ত, সুন্দর এবং সঙ্গীতময় জীবনের পরিসমাপ্তি।

[হাইমেসনেৎসের সাহিত্য কীর্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁদের প্রতি আমাদের একান্ত অনুরোধ, কবির একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী এবং তাঁর সৃষ্টির সার্থক অনুবাদ যেন পাঠক সমাজের হাতে তুলে দেন, পালেত্র এণ্ড আই গ্রন্থের অনুবাদই যেন শেষ প্রচেষ্টা না হয়।]

নূতন গ্রন্থ

জে, এম, সিনজ্ : গ্রীন এণ্ড ষ্টিফেনস্।

আইরিশ সাহিত্যের পুনরুত্থানের মূলে যে কয়েকজন সাহিত্যিকের অবদান আজও অমর হয়ে আছে, তাঁদের স্মরণ করতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ছে জন মিলিংটন সিনজের কথা। সিনজ্

বিশ্ব-নাট্য সাহিত্যের একজন স্তম্ভস্বরূপ।

ট্রিনিটি কলেজের সদ্য গ্রাজুয়েট সিনজ্ তখন প্যারিসে তরুণ কবি ইয়েটস্ সিনজের কানে দিলেন বীজমন্ত্র। বললেন—দেশে ফিরে যাও বন্ধু, কলম যদি ধরতেই হয়তো, দেশের মাটিতে ধর। সিনজ ইয়েটসের অনুরোধ অবহেলা করতে পারেননি। দেশে ফিরে সুদূর পশ্চিম প্রান্তের বন্ধুর এবং রুক্ষ আবাসে এসে নিজেকে মিশিয়ে দিলেন স্থানীয় ধীবর সম্প্রদায়ের মাঝে—সমুদ্র ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যারা বাঁচে, সরলতা যাদের পাথেয় তাদের জীবনযাত্রায় বাস্তব কঠিন ছবি সিনজের মনে গভীর দাগ কেটে বসে যায়, জন্ম নেয় একটি সার্থক নাটক,—রাইডার্স টু, দি, সি। জীবননাট্যের এমন বাস্তব-করুণ নাট্যরূপ কদাচিৎ নজরে পড়ে।

সিনজ্ সম্ভবতঃ আইরিস সাহিত্যিক, যিনি কঠিন বাস্তবের পটভূমিকায় কেল্টিক রোমান্টিসিজমের এক অতীন্দ্রিয় বাস্তবময় জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই জীবনের সবটুকু রস ঢেলে সিনজ কয়েকটি সার্থক নাটক রচনা করে আইরিশ নাট্যমঞ্চকে একটি বিশিষ্টতা দান করেন। কিন্তু যে জগতের আবিষ্কারে সিনজ্ লেখনী ধারণ করেছিলেন তার পরিচয় সম্পূর্ণ করার আগেই ১৯০৯ সালে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে তিনি পরলোকের যাত্রী হন,—একটি সার্থক লেখনী অকালে স্তব্ধ হয়ে যায়।

সিনজের মৃত্যুর বহুদিন পর, সম্প্রতি তাঁর জীবনকথা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর আত্মীয় ডাবলিনের আইনজীবী স্বর্গতঃ এডোয়ার্ড ষ্টিফেনস্ বহুদিন ধরে সিনজের জীবনীর খসড়া অবসর সময়ে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, অধ্যাপক ডেভিড গ্রীন সেই বিরাট পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করে সিনজের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ জ্ঞাপন করেছেন।

সিনজের এই প্রথম জীবনকথা প্রকাশ করে প্রফেসার গ্রীন তাবৎ সাহিত্য পাঠকের একটি বিশেষ উপকার সাধন করলেন, অবশ্য এডোয়ার্ড ষ্টিফেনস্ যদি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত না করতেন তাহলে সিনজের জীবনী প্রকাশিত হতে আরও কত বৎসর লাগত তা বলা যায় না। বিগত শতাব্দীর আয়ার্ল্যাণ্ডে যে রাজনৈতিক হট্টগোল সুরু হয়েছিল তার ফলে আইরিশ নব-নাট্য আন্দোলন এক পরিপূর্ণতার রূপ পরিবহন করে এবং তার একমাত্র রূপকার হলেন সিনজ। তাঁর প্রথম জীবনকথা কেবলমাত্র তাঁর জীবনের কথাই বলেনি, বলেছে এমন বহু কথা যাকে ইতিহাস বললে অত্যুক্তি করা হয় না এবং যা সিনজের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই মূল্যবান জীবনী গ্রন্থটি আকর গ্রন্থরূপেও যে পাঠক সমাজকে আকৃষ্ট করবে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

J. M. Synge (1871-1909) : by david H. Greene & Edward M. Stephens, Mc Millan, New york, 1959, xiii + 32 lpp + 6 plates, 6. 95.

মায়া : গ্যালন ক্যাম্প

কলম্বাস আবিষ্কৃত সমুদ্রপথে, বহু নাবিক স্বর্ণ সংগ্রহের লোভে এককালে জাহাজে পাল তুলে দিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল। তখন কি তারা জানত যে, যেখানে তারা

অবতরণ করল সেটি একটি নূতন মহাদেশ? তারা জানত না, জানবার প্রয়োজন ছিল না কারণ তাদের অধিকাংশ নাবিকই ছিল নিম্নশ্রেণীর লোক। স্বর্ণ সংগ্রহের লোভ তাদের এমন পশু করে তুলেছিল যে, তাদের অত্যাচার এবং নৃশংসতা, সেই নূতন দেশের আদিম সভ্যতাকে সমূলে উৎপাটিত করেছিল। এমনই একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার নাম মায়া। যার ধ্বংসের মূলে ছিল বর্বরদের স্বর্ণলোভ।

মায়া সভ্যতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ আছে, কারণ ইতিহাসের উপকরণ আমাজনের গভীর জঙ্গলে কিম্বা আন্দিজের উচ্চশীর্ষে আজও লুক্কায়িত আছে। দিনের পর দিন, আজকের মানুষ অবলুপ্ত সভ্যতার অনুসন্ধানে দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলেছে, এ একরকম প্রায়শ্চিত্ত বটে!

চার্লস গ্যালন ক্যাম্প মায়া সভ্যতার আবিষ্কার এবং আবিষ্কর্তাদের বিচিত্র কার্য্যকলাপ এবং অনুসন্ধান পদ্ধতির যে ইতিহাস তাঁর মায়া : দি রিডল্ এণ্ড রিডিসকভারী অব এ লষ্ট সিভিলাইজেসন নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন তা চমকপ্রদ এবং ইতিহাসাশ্রয়ী।

১৫১৭ সালে স্পেনের নাবিক হেরনান্দেজ দ্য কোরদোবার ইউকাতানে অবতরণ থেকে এ গ্রন্থের আরম্ভ এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত যে সকল আবিষ্কার হয়েছে, তার সুসংবদ্ধ বিবরণ গ্যালন-ক্যাম্প সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি, কেবলমাত্র স্থপতিবিদের জন্য এ গ্রন্থ রচনা করেননি, আপামর পাঠক সমাজ যাতে মায়া সভ্যতার আবিষ্কার সম্বন্ধে কৌতূহলী হোয়ে ওঠেন সেদিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে একথা অনস্বীকার্য, তবে মায়া সভ্যতার আবিষ্কার এবং আবিষ্কর্তাদের কথাই গ্রন্থটি তিন চতুর্থাংশ অধিকার করে আছে, সুতরাং মায়া সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য নিতান্তই অল্প। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে লেখক এ ত্রুটীর সংশোধন করে মায়া সভ্যতার ইতিহাস বিবৃত করে গ্রন্থটির পূর্ণতা সাধন করবেন।

Maya : The Riddle & Rediscovery of a Lost Civilisation. Mckay, New York 1959, xvi+240pp 5.50 dollars.

অজিত দাস

চলচ্চিত্র-সংকট

বাঙালীর যে কলাসৃষ্টি বর্তমান বিশ্বজনীন প্রসংশাটি অর্জনে সক্ষম হয়েছে তা কিন্তু তার সাহিত্য, চিত্র ভাস্কর্য বা নাট্যসম্ভার নয় : চলচ্চিত্রজগতেই বাঙলা দেশের সৃষ্টি ইদানীং বারবার বিশ্বজয় করতে পেরেছে। বাঙলা দেশের পরিচালক আজ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকারকদের অন্যতম বলে গণ্য হচ্ছেন, বাঙালী কলাকুশলীরা পাচ্ছেন পুরস্কার, বাঙালী অভিনেত্রী বিশ্বের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটা উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য রূপ। এটি কিন্তু প্রদীপের উজ্জ্বলতার দিক, অন্যদিকে অন্ধকারের ঘনঘটা। বাঙালীর সৃষ্টি বাঙলা চলচ্চিত্রের সংখ্যা ক্রম-হ্রাসমান; স্টুডিয়োয় বেকার শিল্পী তথা কলাকুশলীরা কাজের খোঁজে ব্যর্থ অন্বেষণে ব্যস্ত। সরকারীভাবেও এ সংকট আজ স্বীকৃত এবং কিভাবে তার মোকাবিলা করা যায় সরকারী বিশেষজ্ঞরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। সরকারী অর্থানুকূল্যে চলচ্চিত্র নির্মাণের কথাও উঠেছে। কিন্তু সমস্যার মূলের দিকে কারো নজর পড়েছে বলে মনে হয় না।

একথা বলার কারণ আছে। খণ্ডিত বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা চলচ্চিত্রের বাজার সঙ্কুচিত হয়েছে এমন একটা কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু সেখানেও বাঙলা ছবির যে সুযোগটুকু ছিল বা আছে তা কি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা হয়? একটা হিসেব ধরা যাক, উত্তর কলকাতায় (শ্যামবাজারের পাঁচমাথা থেকে মহাত্মা গান্ধী রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চল) ১৯টির মত চলচ্চিত্রাগার আছে, তার মধ্যে ১টি চিরকালই ইংরাজী চলচ্চিত্র দেখিয়ে আসছে, হিন্দি চলচ্চিত্র গোটা ৫ হলে দেখানো হ'ত বাকী ১২টি পুরোপুরি বাঙলা চলচ্চিত্র প্রদর্শনগৃহ। বর্তমানে এই ১২টির মধ্যে ৫টি পুরোপুরি হিন্দী চলচ্চিত্রের প্রদর্শনগৃহে পরিবর্তিত হয়েছে। এগুলিতে কালভদ্রে বাঙলা চলচিত্র প্রদর্শিত হলেও তা পড়ে ব্যতিক্রমের পর্যায়ে। এখন ৭টি চলচ্চিত্রাগারে কতগুলি চলচ্চিত্র বছরে প্রদর্শিত হতে পারে? সফল চলচ্চিত্রগুলিকে একই চলচ্চিত্রাগারে সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলতে দেখা যায় এবং একই প্রদর্শনগৃহে বছরে ৪।৫টির চলচ্চিত্র মুক্তি পাবার সুযোগ পায়না। অর্থাৎ বছরে ২৮।৩৫টির বেশী চলচ্চিত্র মুক্তি পাবে না। গত কয়েক বছরে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সংখ্যার হিসাব নিলে ওপরের অঙ্কটিই পাওয়া যাবে এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এতো গেল সহর কলকাতার একাংশের ছবি; অন্য অংশেও এর ব্যতিক্রম নয়। মফঃস্বলের অবস্থায় কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় না। বাঙালী দর্শক (এমন কি মফঃস্বলের দর্শক) বাঙলা চিত্রে যে সব অবাস্তবতা, লাস্যময়তা দেখলে সে ছবি বয়কট করবে হিন্দী চলচ্চিত্রে তাই বা ততোধিক বস্তুও নির্ভেজাল গলাধঃকরণ করবে। আমাদের পরিচিত কিছু বিদগ্ধজনের মধ্যেও এই প্রবণতা দেখেছি। তাঁদের বক্তব্য হ'ল, বাঙলা চলচ্চিত্রে অবাস্তবতা আমাদের পরিচিত পরিবেশে অত্যন্ত কষ্টকর লাগে কিন্তু হিন্দীতে পরিবেশের কোন বালাই থাকে না। সবটাই

কল্পনা, মায়ার রাজ্য, কাজেই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না, নিছক আনন্দই লাভ করা যায়। কিছু কিছু বাঙলা চলচ্চিত্রাগার এই ধরনের প্রবণতার সুযোগ নিয়ে সফল চলচ্চিত্র যে প্রস্তুত করেন না তা নয় কিন্তু একেবারে পুরোপুরি হিন্দীর অনুসরণ চলে না।

বাঙালী দর্শকের এই মানসিকতা সমগ্রভাবে চলচ্চিত্রের ক্ষতি সাধন করেছে ও করছে। বাঙলা ছবি দেখার প্রবণতা না বাড়লে ছবির মানোন্নয়ন সম্ভব নয় আবার ছবির মানোন্নয়ন না হলে দর্শকের সে ছবি দেখার প্রবণতা বাড়বে না। কাজেই বাঙলা চলচ্চিত্র এক দুষ্টচক্রের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। একদল চিত্রপ্রদর্শক এই দুষ্টচক্রের সুযোগ নিয়ে তাদের মতামত, পছন্দ অপছন্দ চলচ্চিত্রকারেদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করছে। পরীক্ষামূলক সৃষ্টি কোন দেশেই আর্থিক সাফল্য একটা অর্জন করেনা কিন্তু এই পরীক্ষা নিরীক্ষাই সফল চলচ্চিত্র সৃষ্টির কাজে সাহায্য করে চলচ্চিত্রায়ণে নিত্য নব দিগন্ত সৃষ্টি করে থাকে। অবশ্য বিদগ্ধ ও সাধারণ দু'ধরনের দর্শকই এসব পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রের ভালো মন্দ দু'দিকই পরিস্ফুট করতে সাহায্য করে। ফলে পরবর্তী চলচ্চিত্রকারদের সুবিধাই হয়। দেসিকা, আন্তনিওনি, ফেলিনি, রেনে, প্রেমিংগার ইত্যাদিই চলচ্চিত্রকে শিল্পসফল মাধ্যম হিসাবে এক পা এগিয়ে দিতে পারেন। তবে তাঁদের সৃষ্টি জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার সুযোগ কিন্তু তাঁরা সর্বদাই পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশে পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রকারদের এধরনের সুযোগ সহজে দেওয়া হয় না। ফলে বাঙলা চলচ্চিত্রে নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ খুবই কঠিন হয়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্যের শক্তিমত্তা কিছু পরিমাণে একাজে সহায়ক হয় বটে কিন্তু সকল উপন্যাস বা কাহিনীর রূপ পরিবর্তন ছাড়াও চলচ্চিত্রের নিজস্ব লাবণ্য প্রকাশের পথ কিন্তু বন্ধ হয়ে পড়েছে।

এই প্রসংগে একটি চলচ্চিত্রের উল্লেখ করছি, বারীন সাহা কৃত 'তেরো নদীর পারে'। বছর তিনেক আগে এটি সেন্সরী ছাড়পত্র পায় অথচ আজ অবধি তা মুক্তির ছাড়পত্র পায় নি। চলচ্চিত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ থাকতে পারে কিন্তু সে বিচার হবে কেমন্ করে? দর্শকের সামনে যে জিনিস হাজির করা হ'ল না তা ভালো কি মন্দ এ কথা বলা যায় কি করে? ঘরোয়া প্রদর্শনীতে এ ছবি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এর ইচ্ছাকৃত শ্লথ গতি সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং কাহিনীর সামান্যতার সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সংগে সংগেই একথাও স্বীকার করেছেন যে, চলচ্চিত্রটিতে একটি ব্যক্তিমানুষের প্রতিফলন রয়েছে। অথচ প্রদর্শকরা এ চলচ্চিত্রটিকে জনসমক্ষে উপস্থিত করতে রাজী নন। তাঁদের মতামত জানার সুযোগ আমাদের হয়নি, তবে জনরুচির দোহাই যে পাড়া হয়েছে একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

হয়ত অন্যদেশের মত আর্টফিল্ম দেখানোর কেন্দ্র খুললে এই ধরনের ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরীক্ষামূলক চলচ্চিত্র দেখানোর সুযোগ মিলতে পারে এবং তার দায়িত্ব চলচ্চিত্রবিষয়ক বিশেষ বিশেষ সংস্থা, যথা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা নিতে পারেন। কিন্তু বাঙলা চলচ্চিত্রের সংকট তো তাতে ঘুচবে না। বাঙলা চলচ্চিত্রের নিজভূমে পরবাসী থাকার দাগ ঘোচাতে হবে, বাঙালী দর্শকদের বাঙলা চলচ্চিত্র দেখার প্রবণতা আনতে হবে এবং প্রবাসী বাঙালী তথা বাঙলার অবদানের প্রতি সহানুভূতিশীল পৃষ্ঠপোষকদের বাঙলা চলচ্চিত্র দেখবার সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যথায় সরকারী সাহায্য সত্ত্বেও বাঙলা চলচ্চিত্রের সংকট কাটবে না।

রবি মিত্র

স মা লো চ না

Studies in the Upanishads—By Govindagopal Mukhopadhyaya M. A. D. Phil, Sankhyatirtha, Calcutta Sanskrit College Research series—Studies no: 3, Price Rs. 15'00.

নিখিল ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা ও দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের ক্ষেত্রে উপনিষদের মর্যাদা অনন্য সাধারণ। উপনিষদ্ বেদের অংশবিশেষ বলেই সম্মানিত নয়; সমগ্র বেদের চরম তাৎপর্য,—বেদমন্ত্র সমূহের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্য,—উপনিষদের বাণী সমূহের মধ্যে স্পষ্টরূপে প্রকটিত ব'লে ভারতের মনীষীবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। উপনিষদ্ একখানি গ্রন্থ নয়। যে কয়েকখানি স্বল্পায়তন গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক আচার্যগণ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণিক বলে চার সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ মেনে আসছেন, একত্র মুদ্রিত আকারে তারা পঞ্চাশ পৃষ্ঠার বেশী নয়। অথচ এরই মধ্যে বিশ্ব-জগতের চরম তত্ত্ব, মানব আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ, মানব জীবনের চরম লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যসিদ্ধির প্রকৃষ্ট পন্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে এই স্বল্পায়তন গ্রন্থখানিতে যে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে, মানবজাতির ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়।

বিশ্ববিধাতা অশেষ জটিলতাময় বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে তার মধ্যে বিচিত্র স্বভাববিশিষ্ট অসংখ্য প্রাণীর জীবনবিকাশের ও লীলাবিলাশের বিধান করেছেন; সব প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষকেই তিনি স্বতন্ত্র অহংবোধ এবং স্বাধীন বিচারশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অনুভব শক্তি প্রদান ক'রে এই জগতে জীবনের সম্যক্ পরিপূর্ণতা সাধনের সামর্থ্য ও অধিকার দিয়েছেন। এই স্বতন্ত্রতা হেতুই মানুষের অন্তঃকরণে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক,--ধর্মাধর্মবোধ কর্তব্যাকর্তব্য বিচার, হেয়োপাদেয়বিবেক ও তত্ত্বানুসন্ধান স্পৃহা স্বাভাবিকভাবেই তাহার চিত্তে উদিত হয়,—অনিত্যের মধ্যে নিত্যের অনুসন্ধান, বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান। সব কার্যের পশ্চাতে কারণানুসন্ধান, সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির অনুসন্ধান, সীমার মধ্যে থেকেও অসীমের অনুসন্ধান, এসব তাহার আভ্যন্তরীণ স্বভাব থেকেই আপনা আপনি বুদ্ধির বিকাশের সাথে সাথে জেগে ওঠে। মানুষের বুদ্ধি যত বিকশিত হয়, ততই সে অনুভব করে যে তার অভিজ্ঞার ও অনুসন্ধানের সব ক্ষেত্রেই কী যেন কী গভীর সত্য আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। বিষয় জগতের মধ্যেও গোপন রহস্য, নিজের ভিতরেও গোপন রহস্য, নিজের আশা আকাঙ্খার ভিতরেও গোপন রহস্য—সজাগ বুদ্ধি সর্বত্রই একটা গোপন রহস্যের আহ্বান অনুভব করে এবং তার দিকে ছুটে যেতে চেষ্টা করে। এই চেষ্টাতেই বুদ্ধির অদ্ভুত বিকাশ হয়, কত বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, শিল্পকলাদির সৃষ্টি হয়।

সাভিমান বুদ্ধি নিজের বিষয়রূপে যা বিছু গুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করে, যা কিছু বিস্ময়কর ও সুখপ্রদ কিছুতেই তার তৃপ্তি হয় না। স্বতন্ত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য সব বিষয়েরই পেছনে, সব বিষয়েরই

অন্তঃস্বরূপে আরো অনেক রহস্য র'য়ে যায়। সে রহস্য ভেদ করতে না পারলে বুদ্ধির তৃপ্তি নাই। মোহ থেকে মুক্তি নাই, ক্লেশের অবসান নাই। ভারতীয় মহামনীষীগণ নিজেদের বুদ্ধির সীমাক্ষেত্রে উপনীত হ'য়ে অনুভব করছেন যে তাঁরা যে, সব রহস্যের আকর্ষণে ছুটে চলেছেন, উপনিষদের বাণী সমূহে সেই সব রহস্য যেন স্বতঃই নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নিজেদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে। চরম সত্য সমূহ যেন তাঁদের শুদ্ধ বুদ্ধি অথচ অতৃপ্ত বুদ্ধির সম্মুখে বাণীরূপে আত্মপ্রকট করেছে।

বহু সহস্র বৎসর যাবৎ ভারতীয় তত্ত্বানুসন্ধাননিরত মনীষীবৃন্দের স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। তাঁদের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশের ফলে বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে, বহু দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। বিশ্বের চরম তত্ত্ব মানব জীবনে সম্যকরূপে অধিগত করবার প্রচেষ্টায় ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে যুগে যুগে অনেক ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হয়েছে। ভারতের ধর্মসাধনা, জ্ঞানসাধনা, ভাবসাধনা, কর্মসাধনা কোন একটি বিশেষ মতবাদকে আশ্রয় ক'রে, কোন একদল বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তক মহাপুরুষকে অনুবর্তন ক'রে, কোন একটি বিশেষ আলোকসামান্য জীবনকে কেন্দ্র ক'রে, কোন একখানা গ্রন্থকে একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ ব'লে মেনে নিয়ে, অগ্রসর হয় নাই। কোন ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীন পুরুষকারকে ভারতীয় আচার্যগণ অবমাননা করতে রাজী হন নাই। সেই হেতু মানুষের সব সাধনার ক্ষেত্রেই ভারতে বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়েছে, বহু প্রকার মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব ও প্রসার হয়েছে।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তত্ত্বানুসন্ধানশীল সব দার্শনিক সম্প্রদায়, সব বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়, সব ধর্মসম্প্রদায়, সব জ্ঞানী-ভক্ত-যোগী-কর্মী সম্প্রদায়, উপনিষদের বিশেষ প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। ব্যতিক্রম না আছে, তা নয়। তবে সাধারণতঃ কোন সম্প্রদায়ই উপনিষদকে অশ্রদ্ধা করেন নাই। তাঁদের স্বাধীন তত্ত্বানুসন্ধাননিরত শুদ্ধ বুদ্ধিই সম্ভবতঃ বিশ্বের চরম তত্ত্ব এবং জীবনের চরম লক্ষ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে উপনিষদের বাণীসমূহের মধ্যে এমন সত্যালোক লাভ করেছে, যাতে সব চরম সমস্যার সমাধান অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। যে আলোকে বুদ্ধির পরপারের রহস্যসমূহ তাঁদের বুদ্ধির সমীপে সহজে আত্মপ্রকাশ করেছে, যে আলোকের সাহায্যে মানবজীবনে সর্বাধিক সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অসীম অনন্ত নিত্যসত্যচিদানন্দময় স্বরূপে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করতে সমর্থ হয়েছে। উপনিষদ্ যে জীবনাদর্শ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করেছে, তাতে কোন ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, ব্যাহত করে নাই; পরন্তু ব্যবহারিক জীবনে মানুষকে সব ক্ষেত্রে স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের অবসান দিয়ে পূর্ণ জ্ঞানে পূর্ণ প্রেমে পূর্ণ আনন্দে পূর্ণ ঐক্যানুভূতিতে সেই স্বাধীনতার সম্যক্ পরিপূর্ণতা আস্বাদনের পথ নির্দেশ করেছে।

বস্তুতঃ কোন যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদের সহিতই উপনিষদের চরম সিদ্ধান্তসমূহের কোন আত্যন্তিক বিরোধ উপস্থিত হয় না। সব মতবাদীই নিজ নিজ যুক্তিতর্কের সীমাক্ষেত্রে উপনীত হয়ে উপনিষদ্ থেকে নূতন আলোক প্রাপ্ত হন, নিজ নিজ সিদ্ধান্তের পূর্ণতা সাধনের অনুকূল সামগ্রীর সন্ধান পান। সেইহেতু বিভিন্ন মতবাদী দার্শনিকগণ ও সাধকগণ বুদ্ধির ক্ষেত্রে পরস্পরের সহিত যতই বিরোধ করুক না কেন, কেহই পরমতত্ত্ব সম্পর্কে উপনিষদের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন না। এমন কি, যাঁহারা বেদের অন্যান্য অংশের—বিশেষতঃ কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য

অস্বীকার করেন, তাঁহারাও উপনিষদের সিদ্ধান্তসমূহের সত্যতা, গাম্ভীর্য ও মাধুর্য অস্বীকার করতে পারেন না। উপনিষদের বাণীসমূহই শ্রুতি নামে অভিহিত। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি সব লৌকিক প্রমাণের ঊর্ধ্বে শ্রুতি বা আগমকে চরম তত্ত্ব বিষয়ে সব শ্রেণীর ভারতীয় দার্শনিক শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ ব'লে স্বীকার ক'রে আসছেন।

ভারতের সব শ্রেণীর দার্শনিক ও উপাসক উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও, উপনিষদ্ বাণীসমূহের তাৎপর্য সকলের বুদ্ধি ও হৃদয়ে একইভাবে প্রতিভাত হয় নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচারধারা ও সাধনধারার সহিত সামঞ্জস্য ক'রে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সেইহেতু স্মরণাতীত কাল থেকেই শ্রুতিবাক্যসমূহের বিবিধ ব্যাখ্যান প্রচলিত হয়েছে। ঐ সব বাক্য অবলম্বন ক'রেই দার্শনিক সম্বন্ধে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বহুপদার্থবাদ, মায়াবাদ, পরিণামবাদ, আরম্ভবাদ, সৎকার্যবাদ, অসৎকার্যবাদ, লীলাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ প্রসার লাভ ক'রেছে। মুমুক্ষু সাধকগণ জ্ঞানপন্থী, ভক্তিপন্থী, যোগপন্থী, কর্মপন্থী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়েও, উপনিষদের বাক্যসমূহ নিজ নিজ পন্থার অনুকূলে প্রয়োগ করেছেন। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক উপাসকগণ বিভিন্ন নামে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উপাসনামার্গে অগ্রসর হলেও, তাঁরা একই উপনিষৎ-পুরুষকে—পরম ব্রহ্মকে উপাসনা করেন ব'লেই ঘোষণা করেন। অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁরা বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করলেও, তাঁরা যে উপনিষদের জীবনাদর্শই অনুবর্তন করছেন, প্রত্যেকেই তা প্রতিপাদন ক'রে থাকেন।

সুতরাং উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য চরম তত্ত্বের স্বরূপ কি,—আত্মার স্বরূপ কি, ব্রহ্মের স্বরূপ কি, জগতের মূল রহস্য কি,—মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য কি, লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় কি,—এসব সম্পর্কে চিরকালই মত-মতান্তর রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের ন্যায় বর্তমান যুগেও অনেক মনীষী নিরপেক্ষভাবে উপনিষদ্ বাক্যাবলী সবিচারে অধ্যয়ন ক'রে, এ সব বিষয়ে উপনিষদের যথার্থ সিদ্ধান্ত কি, তা নিরূপণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁরাও একমত হ'তে পারেন নাই। উপনিষদের ঋষিগণের সুস্পষ্ট রচনাবলীও ব্যাখ্যাতাগণের ব্যাখ্যানকৌশলে আরো যেন অস্পষ্ট হ'য়ে পড়েছে। রহস্য উদ্ঘাটনের যত প্রচেষ্টা হয়েছে, ততই যেন রহস্য আরো রহস্যাবৃত হয়েছে।

আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীগণ দেশী ভাষায় ও বিদেশী ভাষায় উপনিষদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেছেন ও মূল্যবান পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁরাও অনেকেই পরস্পরের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেছেন। সম্প্রতি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে ইংরেজী ভাষায় Studies in the Upanishads নামে একখানা অতিশয় গভীর গবেষণামূলক মূল্যবান পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকের লেখক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়, সাংখ্যতীর্থ, এম্. এ., ডি. ফিল্, উক্ত সংস্কৃত কলেজেরই অন্যতম খ্যাতনামা সংস্কৃতাধ্যাপক। তিনি একজন বিশিষ্ট তত্ত্বানুসন্ধাননিরত পণ্ডিত ও সাধক। তিনি বিশেষ পরিশ্রম ক'রে, কতিপয় অসাধারণ মনীষীর সাহায্য নিয়ে, নিজস্ব সূক্ষ্ম বিচার ও অনুভূতি বলে, উপনিষৎসমূহের যথার্থ তাৎপর্য নির্ধারণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়ে বিশেষ প্রীতিলাভ করেছি। লেখকের সাধনা যে সার্থক হয়েছে, তা

বলা বাহুল্য। যাঁরা উপনিষদের আলোচনা করেন, তাঁদের অনেক সন্দেহের নিরসন হবে, অনেক জটিল প্রশ্নের সহজ মীমাংসার পথ মিলবে ব'লে আমরা ভরসা করি। তিনি কোন সম্প্রদায়ের অনুগত হয়ে আলোচনা করেন নাই। ঠিক সত্যানুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি নিয়েই গবেষণা করেছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের প্রাক্‌কথন পুস্তকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যচর্চা ॥ বুদ্ধদেব বসু। ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড। মূল্য—৩·৭৫ টাকা।
আমাদের গুরুদেব ॥ সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী। মূল্য—৩·৫০ টাকা।

বুদ্ধদেব বসু সেই জাতের লেখক যাঁর লেখার বিষয়বস্তুর সঙ্গে আমাদের পংক্তিতে পংক্তিতে বিরোধ ঘটে অথচ যাঁর রচনা বার বার না পড়ে পারি না। প্রথমতঃ তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনে অভিনবত্ব আছে, আধুনিক কালে বাংলা গদ্যের তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সমালোচনার ক্ষেত্রেও সেই শিল্পীই কলম ধরেন। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে এ লেখকের সঙ্গে আমার দৃষ্টির বহু পার্থক্য। দ্বিতীয়তঃ যে সব কথা তিনি বলেন তা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। সাহিত্যের জগতে বহু সত্য বহুকাল ধরে চলে আসছে বলেই সত্য। সেগুলি নিয়ে পুনর্বিচার করবার সজীব মন প্রায়ই দেখা যায় না। বুদ্ধদেব বসুর সেই ক্ষমতা আছে যাতে তিনি মনের মধ্যে প্রশ্ন তুলতে পারেন, নিজেকে নাড়াতে পারেন।

'সাহিত্যচর্চা' এমনি একটি বই যাতে বুদ্ধদেব বসু বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে বড় বড় প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এবং এ কথা অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাঁর নিজের কিছু না কিছু বলার আছে। এবং বুদ্ধদেববাবুর সরল অথচ শানানো বাচনভঙ্গী সেই নিজস্ব কথাগুলিকে বেশ ধাক্কা দিয়ে মনে ঢুকিয়ে দেয়।

সবচেয়ে বেশি করে যে প্রবন্ধ দুটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেদুটি হলো 'সংবাদিকতা, ইতিহাস, সাহিত্য' এবং 'শিল্পীর স্বাধীনতা'। সাহিত্যের দু-একটা মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু ভাবগত নতুন আলোকপাত আছে যা সন্ধানী মনের পাঠক মাত্রেই সানন্দে গ্রহণ করবেন। আধুনিককালে শিল্পীর স্বাধীনতা সম্পর্কে যে সব অবান্তর মতলবী তর্কের সূচনা হচ্ছে সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ অভিমত আমাদের নূতন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করবে।

একথা সব সময়েই মনে হয়েছে যে, কোন একটি প্রবন্ধে তিনি সমালোচনায় নতুনত্বের আস্বাদ দেবার আনন্দে এমন অনেক কথা বলেছেন যা তাঁর মত যুক্তিনিষ্ঠ লেখকের কাছ থেকে আমরা আশা করিনি। মধুসূদনের আলোচনায় যে পূর্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তা হলো 'মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম মহিমা'। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রবন্ধের তিনি সাহায্য নিয়েছেন যে প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজে পরবর্তী কালে

সমর্থন করেন নি। তাঁর মাইকেল বিরোধীতা কয়েকটি অস্পষ্ট ভাবাবেগচালিত অতিরঞ্জিত উক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে, যুক্তির উপর নয়।

'সাহিত্যচর্চা' সেই ধরণের সমালোচনা গ্রন্থ, যা নিজস্বতায় উজ্জ্বল সুতরাং পাঠকমাত্রেই—মতামতে মিলুক বা না মিলুক—এ গ্রন্থ পড়ে উপকৃত হবেন, তার চেয়ে বেশী বলবো আনন্দিত হবেন।

বাংলাদেশের জীবন যে গুরুবাদের প্রবল তাড়নায় বিপর্যস্ত হচ্ছে সেকথা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন অথচ নিজের আশ্রমেই তিনি গুরুদেব নামে অভিহিত হতেন। কিন্তু আমাদের ট্রাডিশানাল গুরু আর গুরুদেবের গোত্র সম্পূর্ণই আলাদা। তিনি আমাদের শাস্ত্র আওড়ে মন্ত্র দেননি, মোক্ষের কোন প্রতিশ্রুতি বা মুক্তির কোন সম্ভাব্য সরল পথ তিনি দেখাননি। জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হতে নয়, পূর্ণ আসক্তিতে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সবল সুদৃঢ় ইচ্ছা তিনি সঞ্চার করতে চেয়েছেন। ক্ষণকালের এই মানবজীবন অকারণ অর্থহীন লৌকিক আচারবিচার পালনের জটিল জালে ব্যথিত না হয় তার কথাই রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন। তা ছাড়া গুরুবাক্যকেই বেদ বলে মানতে হবে এ দাবীও তাঁর ছিল না, এ ঐতিহ্যও গড়ে ওঠেনি শান্তিনিকেতনে। তিনি বারবার চেয়েছেন মানুষের বুদ্ধি মুক্তির পথ খুঁজে পাক। সে যেন নিজের চিন্তা ও মননশীলতার জোরেই চলে। বুদ্ধি দলিত করা গুরু তিনি নন।

সেই গুরুদেবের কাহিনী সুধীরঞ্জন দাস তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকে, কাজে কর্মে উৎসবে উপাসনায় যেমন পেয়েছেন কবিকে, সেইভাবেই তাঁকে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ চিত্র যেমন এ গ্রন্থের সম্পদ তেমনি ভাবগত বিশ্লেষণের দিক থেকেও রবীন্দ্রসাধনার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা লেখক করেছেন। অবশ্য বহু বিষয়ই নানা লেখকের লেখায় নানাভাবে পূর্বে আলোচিত হয়েছে এবং সেদিক থেকে বর্তমান লেখক কোন তত্ত্ব বা তথ্য আমাদের শোনাতে পারেন নি।

তবু বিষয়বস্তুর গুণে বারবার পুনরুক্তির পরেও আমরা এই গ্রন্থের সমাদরে অনিচ্ছুক নই। সুধীরঞ্জন দাস মহাশয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা এর চেয়ে ঢের বেশী ছিল। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি রচনার দ্রুত মুদ্রণ না করে আর একটু সুবিচারে প্রবন্ধগুলিকে বিস্তৃততর পরিধিতে ব্যাপ্ত করলে আরও ভাল হতো। তবু যা পেয়েছি তার মূল্য অল্প নয়। সুশোভিত, সুমুদ্রিত এই গ্রন্থটির জন্য লেখক আমাদের ধন্যবাদার্হ।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

KATHAKALI: By K. P. Padmanabhan Tampy, Indian Publication, 3 British Indian St, Calcutta-1. Price : Rs. 3/-

ভারতের নৃত্যশিল্পে কথাকলির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা বিদ্যমান। কথাকলি নৃত্যনাট্য যার উৎপত্তিস্থান

কেরালা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জনসাধারণের অবহেলার দরুণ কথাকলি অবলুপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছিল, সম্প্রতি সরকারের কৃপাধন্য হয়ে কথাকলি আবার তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবার আশা রাখে।

কেরালার বিখ্যাত লেখক কে, পি পদ্মনাভন টাম্পি চমৎকার মুন্সীয়ানার সঙ্গে কথাকলি ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানা রচনা করেছেন। এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় আছে পাণ্ডিত্যের পরিচয় তেমনি আছে দরদ ও শিল্পীমনের স্বাক্ষর। কথাকলির উৎপত্তি বিস্তৃতি ও ভূমিকার কথা এমন দরদ দিয়ে ইতিপূর্বে কেহ লিখেছেন বলে আমাদের জানা নেই। মোট ৩২ পৃষ্ঠার বইয়ে ১৩ পৃষ্ঠা ছবি। প্রখ্যাত কথাকলি নৃত্যকার গুরু গোপীনাথের নবরসের নয়টি মুদ্রা, স্বনামধন্য শিল্পী পাভেলের কয়েকটি স্কেচ গ্রন্থখানাকে অমূল্য করেছে। মৃণালিনী সরাভাই, পালিক্করের বিভিন্ন নৃত্যের বিভিন্ন ছবিও গ্রন্থখানাকে কম সৌষ্ঠবান্বিত করেনি, সম্প্রতি পাঠ্যতালিকায় কথাকলি স্থান পেয়েছে, অথচ কথাকলি নৃত্যনাট্যের উপর সুবিস্তৃত কোন আলোচনা প্রকাশিত হয় নি, বর্তমান গ্রন্থ সেই অভাব দূর করল, এই গ্রন্থে লেখক একদিকে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা জানিয়েছেন অপরদিকে শিল্পকে ভালবাসার মনের ছোঁয়াচ উত্তীর্ণ করতে পেরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানা একদিকে বিদ্যার্থীদের অশেষ উপকারে আসবে অপর দিকে যাঁরা সঙ্গীত-নাটক ও নৃত্যের অধ্যয়নে আগ্রহী বা সমঝদার তাঁদের কাছেও এ গ্রন্থখানা সমপুরিমাণে মূল্যবান হবে বলে বোধ করি। আলোচ্য গ্রন্থে একদিকে আনন্দ অপরদিকে শিক্ষার কথা ঘোষিত হয়েছে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাল রাখার জন্য লেখককে ব্লক ছাপার দিকে আরও নজর দেওয়া উচিত ছিল। প্রচ্ছদও তেমন যুৎসই হয় নি। তথাপি আমরা এই ধরণের গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা না করে পারি না।

বিমানবিহারী মজুমদার

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ ॥ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড— ১, শংকর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য-৬.৫০ টাকা।

বাঙালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। সেই ব্যক্তিত্বের অন্তরালে লক্ষ্য করি এক করুণাঘন মহিমময় মূর্তিকে। অটল পৌরুষ, অকম্পিত চিত্ত ও অক্লান্ত কর্মশক্তির সহায়তায় তিনি সমস্ত বিপদবিঘ্নকে পদদলিত করে বীরবিক্রমে অগ্রসর হয়েছেন। উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সমাজপতিদের কুটিল ভ্রূকুটিকে উপেক্ষার অট্টহাস্যে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, অসংখ্য শত্রুর ব্যূহ অবলীলায় ভেদ করে নিজেকে সকল তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। এই দৃপ্ত পৌরুষশক্তির অন্তরালে লুকিয়ে আছে এক করুণাময় অশ্রুস্নাত মূর্তি। সে মূর্তি ব্যথিতের বেদনায় বেদনার্ত দুঃখীর দুঃখে ম্লান। 'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ' গ্রন্থে বিদ্যাসাগর-অনুজ শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ঈশ্বরচন্দ্রের পুণ্য চরিতের মধ্য দিয়ে এই দুই বিপরীতধর্মী রূপকেই পরিস্ফুট করেছেন।

নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগরের জীবনাদর্শের যে ব্যাপ্তি ও কর্মক্ষেত্রের যে প্রসার ঘটেছে, তা প্রভূত প্রামাণ্য তথ্য ও যুক্তিতর্ক সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে লেখকের সুদীর্ঘকাল অবস্থিতি এক বিরাট সহায়ক। তাছাড়া পিতা, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ও অধ্যাপকদের কাছ থেকে শ্রুত বিবরণও এই গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। বিদ্যাসাগরের বংশবৃত্তান্ত, পাঠ্যজীবন ও পরবর্তীকালে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, কর্মজীবনে একাগ্রনিষ্ঠা, স্ত্রীজাতির প্রতি সমধিক পক্ষপাতিত্ব, দানশীলতা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনাই আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। জীবনী-গ্রন্থখানি পাঠ করে আমরা কর্মযোগী বিদ্যাসাগরের অপরূপ কর্মনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে মুগ্ধ হই।

এই গ্রন্থেরই সমাপ্তি অধ্যায়ে লেখক 'ভ্রমনিরাশ' নামক অংশে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'বিদ্যাসাগর' জীবনী-গ্রন্থের নানা ত্রুটি আলোচনাপূর্বক ভ্রমসংশোধনে প্রয়াসী হয়েছেন। এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করেই বলা চলে আলোচ্য জীবনচরিতের এক বিশিষ্ট অধ্যায়ে উল্লিখিত স্বয়ং বিদ্যাসাগরের উক্তিই (পৃঃ-২৩৪-২৩৫) লেখকের রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। গ্রন্থটির ভাষাসম্পদ প্রাচীনত্বের লক্ষণাক্রান্ত হলেও জীবনীসাহিত্যের ধারায় এক বিশিষ্ট সংযোজনরূপে চিরকালের সম্পদ হয়ে থাকবে।

পুষ্পা দত্ত

সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।

দেশীয় গাছ্গাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড, সাধনা নগর, কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম,এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস(লণ্ডন), এম,সি,এস(আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব [illegible]।

কলিকাতা কেন্দ্র- ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস(কলিঃ) আয়ুর্বেদ

egd. No. C3597 Phone: 23-5155 Nov.'63 (0.50) Central Regd. No.R.N.2602/57 SAMAKALIN

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এতে

প্রত্যেকেই অধিকতর সুযোগ সুবিধে পাবে

আপনি কি চান যে

১। আপনার ছেলেমেয়ে স্বাস্থ্যবান হোক ;

২। উপযুক্ত খাদ্য ও শিক্ষা লাভ করুক ;

৩। প্রতিটি শিশুর যতটুকু সুযোগ সুবিধে পাওয়া উচিত এরাও তাদের জীবনে তা লাভ করুক ;

৪। বিবাহিত জীবন সুখী ও সুসমঞ্জস হোক ;

তাহলে নিকটবর্ত্তী

পরিবার
পরিকল্পনা
কেন্দ্রে

গিয়ে

আপনার পরিবারের আকার সীমিত রাখা সম্পর্কে পরামর্শ নিন

একাদশ বর্ষ ৮ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

দ্বারকানাথের জমিদারী

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

১লা আগষ্ট ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথের বিশেষ সহায়তায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। "গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান বলিয়া দ্বারকানাথ প্রথম প্রথম প্রকাশ্য ভাবে এই ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন নাই, এবং সেই কারণে তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের আফিস হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ব্যাঙ্কের ট্রেসারার নিযুক্ত করা হয়।"৪

রামমোহনের প্রভাব তখন দ্বারকানাথের উপর পূর্ণমাত্রায়। পুত্র দেবেন্দ্রনাথ তখন রামমোহন রায়ের স্কুলে ৫ পড়িতেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।" পরবৎসর রামমোহন বিলাতগমনের উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া আর নিজ বিদ্যালয়ের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই পরামর্শ অনুসরণে এই বৎসর দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। বিলাত যাইবার সময় রামমোহন দ্বারকানাথের নিকট বিদায় লইতে আসেন। দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনায়, "আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া আনিলেন।"৬ ১৮৩০ সালের ১৯ নভেম্বর রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে বৃষ্টলসহরে ১৮৩৩ খৃঃ ২৭ সেপ্টেম্বর অনন্তচতুর্দশীর দিন তাঁর মৃত্যু হয়। যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু

সংবাদ আসিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ পিতার নিকট ছিলেন। তিনি বলেছেন "আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল।" তারপর দ্বারকানাথ বিলাতে গিয়ে যখন দেখলেন যে রামমোহনকে একটী গৃহস্থের বাগানে কবর দেওয়া হয়েছে তখন "যেখানে রামমোহনের অনন্তশয়ন সে গাছতলা অচিহ্নিত হলেও তাঁর ভক্তদের কাছে পীঠস্থানের মতই শ্রদ্ধেয় তথাপি, আগামীকালের জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকিবে এমত জায়গায় তাঁর সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ হওয়া উচিৎ"—এই বলে ব্যবস্থা করলেন যাতে রাজার সমাধি সেখান থেকে সরিয়ে নিকটবর্ত্তী আর্নোস্‌ ভেলে'র সুন্দর সমাধিক্ষেত্রে আনা হয়। ১৮৪৩ সালের ২৩শে মে যথাবিহিত ভাবে তাঁর মৃতদেহ স্থানান্তরিত করে তৎপরবৎসর বসন্তকালে ভারতীয় ধরণের সুন্দর একটী স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে দেন।৭

কিন্তু এসব পরের কথা। দ্বারকানাথ যতদিন ২৪ পরগণার সেরেস্তাদার ছিলেন ততদিন কোন জমিদারী নিজে কেনেন নাই। তবে কোন জমিদারীর কত আয়, লাভ ক্ষতির সম্ভাবনা কিরকম ইত্যাদি খবর পেতেন যথেষ্ট। ইচ্ছা করলে তখনও তিনি নিলামে সুবিধামত জমিদারী কিনিতে পারিতেন। তখনকার কালে কলেক্‌টারের সেরেস্তাদারের নিলামে জমিদারী কেনার কোন বাধা ছিলনা, কিন্তু সেটা নীতিসঙ্গত নয় বলেই বোধহয় খরিদ করেন নাই—কেবল টাকা জমিয়েছেন। এ সময়ে তাঁর পারিবারিক খরচ বিশেষ ছিল না। ৺ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্দাজ করেন "মাসে তিন বা চারিশত টাকার বেশী না"। পৈত্রিক সম্পত্তির বাকী আয় থেকেই লক্ষাধিক টাকা জমে। তা' ছাড়া কয়েকটী জমিদার বাড়ী তাঁর "বাঁধাঘর" ছিল—তাদের তিনি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ দিতেন। সে সময় ব্যারিস্টার উকিল সব সাহেব ছিল এবং সাধারণ কার্য্যের জন্যও ফী নিতেন বড় রকম। তাই অনেকেই দ্বারকানাথের মত "ল-এজেন্ট" বা আইনজ্ঞ বাঙ্গালীদের কাছে আসতেন। আইন সম্বন্ধে পারদর্শী বলে দ্বারকানাথের তখন কলিকাতায় বেশ খ্যাতি ছিল। এসব ছাড়া দ্বারকানাথ আরবী, ফার্সী ও ইংরাজী ভালভাবে জানায় সদর-আদালত ও সুপ্রীমকোর্টের দরখাস্ত ইত্যাদি ইংরাজীতে অনুবাদ করে দিতেন। এই অনুবাদের জন্য তখনকার দিনে লাইন পিছু 'দু গিনি' হার বাঁধা ছিল বলে বাষ্টীক সাহেব লিখেছেন।৮

দেওয়ান হয়ে তাঁর আয় আরও বাড়ল। দেওয়ানীতে সেকালে আইনসঙ্গত উপরিলাভ বড় কম ছিল না। রামমোহন রায় দশবৎসরে দেওয়ানীতে এক লক্ষ টাকা জমাতে ও দশহাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের একটী তালুক কিনতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র রামমোহন রায়ের জীবনীতে এই অর্জ্জনের বৈধতা প্রশ্ন করায় লিওনার্ড সাহেব সমুচিত উত্তর দেন।৯ রাজনারায়ণ বসুও দেখি নগেন চট্টোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন—"সেকালে দেওয়ানদিগের যে যে বিষয়ে উপরি পাওনা ছিল, সেই সেই বিষয়ে নাজীরের মিরণের ন্যায় পাওনার হার নির্দ্ধারিত ছিল এবং সেই হার গভর্ণমেণ্টের জানিত ছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ উপার্জ্জনে আপত্তি করিতেন না।"

দেওয়ান হওয়ার পর ঐ সব টাকা দিয়ে দ্বারকানাথ যেমন যেমন সুবিধা পেলেন জমিদারী কিনতে লাগলেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই বড় একজন জমিদার বলে পরিচিত হলেন। ইংরাজ

আমলের এই প্রথম সময়ে নানা কারণে জমিদারী সব হাত বদলাচ্ছিল। জমিদাররা প্রায়ই যথাসময়ে কোম্পানির কাছে খাজনা পৌঁছে দিতে পারতেন না। তার নানা কারণ ছিল। প্রজারা রাতারাতি তাদের সামান্য জিনিষপত্র নিয়ে খাজনা না দিয়ে পালিয়ে গেল বলে রাজস্ব জমা হল না এরকমও হয়েছে বটে কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষেত্রে দেখা গেছে জমিদারী দেখাশুনার কাজ নায়েব গোমস্তার হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে জমিদাররা নিশ্চিন্ত থাকতেন। কেবল দরকার হলেই টাকা চাই—টাকা না দিতে পারলেই কর্মচারীদের চাকুরী চলে যেত। তাই তাহারা ঐ টাকা যেন তেন প্রকারে মনিবকে দেবার জন্য প্রজাদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করিত। কখনও বা আমলা,নায়েব, গোমস্তা জমিদারের খাজনার টাকা গবর্নমেণ্টকে না দিয়ে নিজেরাই তহবিল ভেঙ্গে আত্মসাৎ করতেন। হঠাৎ জমিদার একদিন শুনতেন তাঁর জমিদারী বাকী খাজনার নিলামে চড়েছে। তখন রক্ষা করবার উপায় বিশেষ থাকিত না। জমিদারদের এই প্রমোদবিলাস ও কর্মচারীদের অপটুতা ও অসাধুতায় যে কি ভাবে তখন জমিদারীর মালিক বদলাইত, তাহার একটী উদাহরণ পাওয়া যায় বর্ধমানের বুড়া রাজা তেজচাঁদ বাহাদুর সম্পর্কে।

"প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোসাহেব ও অন্যান্য কর্মচারীরা অন্দর মহলের দ্বারে আসিয়া তেজচাঁদ বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন; তিনি যথাসময়ে স্বর্ণ-পিঞ্জর হস্তে বহির্গত হইতেন। পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল" নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত। তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোন্দল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। একদিন প্রাতে তিনি পিঞ্জর হস্তে অন্দরমহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময় একজন প্রধান কর্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড়করে নিবেদন করিল, 'মহারাজ, হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পালাইয়াছে'। তেজচাঁদ বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন, 'চুপ! হামরা লাল ঘবরাওয়েগা।[১০]

দ্বারকানাথ যখন এইসব নতুন জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত সেই সময়েই তাঁর পৈত্রিক জমিদারী বিরহিমপুরের রায়তের জমিদারের খাজনা দিতে অস্বীকার করে একজোট হল। খাজনা অনাদায়ের জন্য নালিশ করাতে তারা ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাল্টা দরখাস্ত করল। ম্যাজিষ্ট্রেট সরজমিনে অনুসন্ধান করবার জন্য সেখানে এসে তাঁবু ফেলতেই প্রজারা নায়েব গোমস্তার অত্যাচারের কাহিনী গেয়ে তাঁর কাছে প্রতিবিধান চাইল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কাহিনীর অন্যদিকও থাকতে পারে ভুলে গিয়ে তাদের রক্ষা করবার প্রতিশ্রুতি দেন। এ দিকে এই রকম প্রজা বিদ্রোহের খবর পেয়ে দ্বারকানাথ তৎক্ষণাৎ বিরহিমপুর রওনা হলেন। যাবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেট কি রকম লোক, আগে কোথায় কোথায় কাজ করেছেন, কি বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা সে সব যতটা পারলেন জেনে নিলেন। বিরহিমপুরে পৌঁছে সেই রাত্রেই তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে রায়তরা তাঁর প্রাপ্য খাজনা ফাঁকি দেবার উদ্দেশে একজোট হয়েছে বলে পাল্টা নালিশ করলেন। তিনি বল্লেন যে এই বে-আইনী একজোট ভেঙ্গে না দিলে কেবল তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হবে না; জেলার শান্তিরও বিঘ্ন হবে। ম্যাজিষ্ট্রেট তদুত্তরে আমলাদের অত্যাচার সম্বন্ধে এবং প্রজাদের রক্ষা সম্বন্ধে দ্বারকানাথকে এক দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। তিনি হয়ত জানতেন না যে যে সব জমিদাররা সহরে

বসে বিলাসিতায় মত্ত এবং আমলা-নায়েব ছাড়া জমিদারীর সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগ রাখে না দ্বারকানাথ সে দলের নন।

দ্বারকানাথ শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেটকে বোঝাতে সক্ষম হন যে প্রজাদের বর্ণনা এক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত এবং প্রায় ভিত্তিহীন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বল্লেন যে সাহেবের কথার নড়চড় হয় না; তিনি কথা দিয়েছেন যে প্রজাদের রক্ষা করবেন তখন দ্বারিকানাথ তাঁকে তাঁর অতীত কর্মজীবনে ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং স্বেচ্ছাচারী ও একতরফা বিচারের জন্য তাঁকে সুপারিণ্টেণ্ডের কাছে আর্জি করবেন বলে ভয় দেখান। এই কথা শুনে প্রজার তথাকথিত বন্ধু অবিলম্বে জমিদারের কথার সারবত্তা বুঝে ফেললেন এবং তদনুসারে কাজ করলেন।

এই সময়কার কেনা জমিদারীগুলির মধ্যে প্রধান হ'ল ১৫ই পৌষ ১২৩৭ (১লা জানুয়ারী, ১৮৩০) তারিখে কেনা কালীগ্রাম; ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৪১ তারিখে কেনা সাহাজাদপুর; রংপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাটের তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর, যশোরের মহম্মদ শাহী ও কটকের সরগরা (পাঠান্তরে সাইবির পরগণা)।

, স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাটের তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, জগদীশপুর, যশোরের মহম্মদসাহী, কটকের সরগরা। এর সমস্তই দ্বারকানাথের হাউস ফেল মারার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেচে দেন, শুধু দ্বারকানাথ সাজাদপুর ও কালীগ্রামের জমিদারীকে তাঁর নিজের পৈত্রিক পাওয়া জমিদারীর সঙ্গে মিলিয়ে একটী ট্রাষ্ট করে গিয়েছিলেন বলে ঐ দুটি বেঁচে যায়।

তখনকারকালে এইরকম Trust করা প্রায় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ে অনেকেই জমিদারি ও বাণিজ্য এই দু রকম করতেন বলে অনেক বংশেরই হঠাৎ উত্থান ও পতন দেখা যায়। সেইজন্য অনেকে ব্যবসা থেকে জমিদারী অংশকে আলাদা করে ছেলেদের কেবল জীবনসত্ব দিয়ে পৌত্রদের নির্ব্যূঢ় সত্ব দিয়ে যেতেন। তাতে বিষয়সম্পত্তি অন্তত দু'পুরুষ টিঁকে থাকত। রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, ডাক্তার ভি, গুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই এরূপ করেছিলেন।

যাঁদের দু রকম কারবার ছিল না—কেবল জমিদারী নির্ভর—তাঁদেরও অনেকে হঠাৎ গরীব হয়েছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম যুগে সরকার যেখানে পেয়েছেন বার্ষিক ৩২ লক্ষ টাকা, জমিদাররা পেয়েছে সেখানে ৫ লক্ষ। তার মধ্যে আবার শতকরা পাঁচ টাকা রাজস্ব আদায়ের খরচা বাবদ সরকার কেটে নিলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছয় বৎসরের মধ্যে ঐ বন্দোবস্তের অন্তর্গত জমির অন্তত এক-তৃতীয়াংশ বাকী খাজনার দায়ে বিক্রী হয়ে যায়। একমাত্র বর্ধমানরাজ ছাড়া প্রায় সমস্ত বড় বড় জমিদারের জমির হাত বদল হয়। রাজসাহীর জমিদার তখনকার কালে বাংলার সবচেয়ে বড় জমিদার ছিলেন। তাঁর জমিদারীর এলাকা ছিল ১৩,০০০ বর্গমাইল আর রাজস্ব ২৫ লক্ষ টাকা। বাকী খাজনার নিলামে টুকরো টুকরো হয়ে বিক্রী হয়ে যায়। কিছু লাখেরাজ সম্পত্তি ছিল, তা' নিয়েও পরে গোলমাল ওঠে। দিনাজপুরের জমিদারের ৪১১৯ বর্গমাইল জমিদারী বাকী খাজনার দায়ে বিকিয়ে যায় এবং বাড়ীর মেয়েদের গহনা করে তবে খাবার-পরবার মত কিছু জমি জুটে সদর দেওয়ানী কোর্টের এক মকদ্দমায় এ প্রমাণ হয়। নদীয়ার রাজার ৩১৫৮ বর্গমাইল চাষজমিও ঐভাবে যায় আর লাখেরাজও বাজেয়াপ্ত হয়। তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

পূর্ব আমলে ইংরাজদের যে সাহায্য করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে কোম্পানী ঠিক করেন যে তাঁর বংশধরেরা ত' পথে বসতে পারেন না। সেইজন্য এক সময়ে বার্ষিক ভাতা দেওয়ার কথাও বিবেচনা করেন। পরে কিছু সম্পত্তি ফিরাইয়া দেন। তখনকার কালে যখন হুট্ বলতে জমিদারী নিলামে চড়ত, তখন লাখেরাজ জমি ছিল আশ্রয়। এর জন্য খাজনা দিতে হত না, কাজেই বাকি খাজনার নিলেমের ভয় ছিল না। এটা কিন্তু এদেশের ইংরেজ কর্মচারী থেকে বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টার প্রমুখ কারুরই সহ্য হইতেছিল না। তাঁদের বড়ই গাত্রদাহ হল যে কতকগুলি জমিদার রাজস্ব কাণাকড়িও দিবে না অথচ রাজত্বের সব সুখ ভোগ করিবে—এ কেমনতর। সেইজন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণোয়ালিশ 'রেগুলেশন' দ্বারা আইন করলেন যে 'বে-আইনী প্রমাণিত হলে লাখেরাজ জমির উপরেও কর ধার্য করা হবে। তারপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আইন আরো কড়া করা হল—কলেক্টার বে-আইনী বুঝলেই যে কোন লাখেরাজ দখল করে নিতে পারবেন। জমিদারের অবশ্য ইচ্ছা হইলে উক্ত আদালতে আপীল করিবার ক্ষমতা রহিল। তারপর বেণ্টিংকের যুগে এতটুকুও প্রমাণের অভাব হলেই বা অনেক সময় প্রমাণের অভাব হলেই বা অনেক সময়ে প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই সোজাসুজি লাখেরাজ সব বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা হল। এই বাজেয়াপ্তী মহল থেকে সরকারের প্রায় বার্ষিক ত্রিশ লক্ষ টাকা মুনাফা আসিতে লাগিল। অবশ্য গোড়ায় বন্দোবস্তের কাজে প্রায় আশী লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল।

এই লাখেরাজ পুনর্গ্রহণ বিরুদ্ধে দ্বারকানাথ বিশেষ লড়েছিলেন। তিনি ছাপাখানা সংক্রান্ত আইনের ও কালা আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় সভার ও সংবাদপত্রের মহিমা বেশ বুঝেছিলেন এবং একতা থাকলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকেও যে উপেক্ষা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় তা কালা-আইনের বিরুদ্ধে অসরকারী ইংরাজদের সমবেতশক্তির কার্য্যকারিতা থেকে টের পেয়েছিলেন। তাই তিনি বাংলাদেশের জমিদারদেরও সম্মিলিত করে সমবেতভাবে তাদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন। 'বিত্তবান ভূম্যাধিকারীদের প্রভাবের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ ও দেশের সুশাসনের জন্য তাহাকে নিয়োজিত করার আশায় ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি জমিদারসভা বা ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটী স্থাপন করেন। তাঁর বসতবাড়ীর পার্শ্বেই এক বাড়ীতে ইহার অধিবেশন হইত। ইংলিশম্যান পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক হারি সাহেব ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদক নিযুক্ত হলেও দ্বারকানাথই ছিলেন প্রাণস্বরূপ।……'সমিতি জমিদারদের পক্ষে অতি-জরুরী কতকগুলি সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে সরকার প্রস্তাবিত লাখেরাজ পুনর্গ্রহণ ও খাজনা অনাদায়ের ফলে জমিদারী সত্বের বিক্রয় আইন হল উল্লেখযোগ্য। লাখেরাজ-দারদের পক্ষ নিয়ে সমিতি টাউনহলে এক মহতী সভা আহ্বান করেন। সরকারের পুনর্গ্রহণ নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি পাঠানো এবং লর্ড ব্রুহামের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সহিত সহযোগিতা করা ছিল এ সভার উদ্দেশ্য। এ সভা সম্বন্ধে আগামীবারে বিস্তারিতভাবে লেখবার ইচ্ছা রহিল।

৪। সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

৫। "রামমোহন রায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সমসময়ে কলিকাতা-শুঁড়িপাড়ায় অবৈতনিক

স্কুল স্থাপন করেন। মানিকতলার বাগানবাড়ীতে তিনি ইহার একটী ইংরেজি শ্রেণী খুলিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এখানে ইংরেজি শিক্ষা করেন। হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে ১৮২২ সনে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে স্কুলটি সেখানে উঠিয়া যায়। এই সময় হইতে ইহা এ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে আখ্যাত হইতে থাকে। বিদ্যালয়ের ব্যয় অধিকাংশই রামমোহন রায় নিজে বহন করিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ তাঁহার বন্ধুগণেরও দান ছিল। স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট, সিন্‌ক্লেয়ার, টার্নকুল নামক সে যুগের বিখ্যাত শিক্ষাব্রতীগণ এখানে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাদান কার্যে রত ছিলেন।" —শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল।

৬। নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।"

৭। মেরি কার্পেণ্টারের "লাষ্ট ডেজ ইন্ ইংলণ্ড অফ্ রাজা রামমোন রায়।"

৮। একোস্ অফ ওল্ড ক্যালকাটা।

৯। If Kishory Chand had possessed any knowledge of the duties of a dewan in those early days, and the legal perquisites appertaining to the office recognized by Government, he would no more be entitled to wonder at Rammohan Roy's gains, than he would have occassion to be surprised at the immense profits realized by early traders to India in comparison with the profits of the merchants of the present day—History of the Brahmo Samaj by G.S. Leonard.

১০ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "জাল প্রতাপচাঁদ"

ভারত ও ভারতের জনবল

ভুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

জনগণনা

ভারতের লোক গণনা করা হয়ে থাকে দশ বছরে একবার। বিরাট দেশে বিপুল জনসমষ্টির সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ এক দুরূহ ব্যাপার। এ কাজের জন্য লক্ষ লক্ষ অবৈতনিক ও সবৈতনিক লোকের এক অস্থায়ী সংস্থা প্রতি দশকের শেষের দিকে গড়ে তোলা হয়। প্রায় চারবছর ব্যাপী কাজের এক এক পর্যায়ের শেষে ধাপে ধাপে কর্মিদের ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়। দশকে দশকে নতুন করে চলে এই গড়া ও ভাঙ্গা। এরজন্য অর্থব্যয়ও হয় কয়েক কোটি টাকা।

ভারতের দশম জনগণনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৬১ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৫ই মার্চের মধ্যে। এগণনার ক্ষেত্রের পরিসরই ছিল সবচেয়ে বেশি! পুনরুদ্ধারের পর গোয়া, দমন দিউ দাদরা ও নগরহাবেলীর লোকসংখ্যা এবারই প্রথম সর্বভারতীয় জনসংখ্যার সংগে সংগে যোগ করা হয়েছে। যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার অপর পারে পাকিস্তান ও চীন অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ অবশ্য গণনার বাইরে ছিল। সীমান্তে অশান্তির জন্য নেফার তথ্যাদি সংগ্রহ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। সেখানে গণনার কাজ এখনো চলছে। নেফা সম্বন্ধে প্রকাশিত সংখ্যা একেবারে পাকা নয়, তার রদ-বদল হতে পারে।

আধুনিক জনগণনা শুধু দেশের লোকের সংখ্যা নির্ধারণ নয়, এতে একটি নেশন বা জাতির নিজস্ব রূপটি ফুটে ওঠে। জনগণনা প্রকৃতপক্ষে একটি গণচিত্রের উপাদান সংগ্রহ। এই চিত্র রূপায়িত হয় নীরস সংখ্যায়। দেশের পরিচয় পাওয়া যায় পরিসংখ্যানের মাধ্যমে।

গণনার সময় প্রতি লোকের বিবরণ লেখা হয় একখণ্ড ছোটো কাগজে। এই টুকরো কাগজে সংগৃহীত তথ্য নানাভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে বিভিন্ন সারণি প্রস্তুতের জন্য সমগ্র দেশে নব্বুইটি কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দু'বছরে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত কাজ করেও সমস্ত সারণি প্রস্তুত সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি। প্রায় পঞ্চাশটি সারণি তৈরি হবার পর এদের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সহ রাজ্যের অধ্যক্ষগণ স্থানীয় গণনার বিবরণী প্রকাশ করবেন। জনগণনার সর্বভারতীয় বিবরণ প্রকাশিত হবে ১৯৬৩ সনের শেষের দিকে। কিছুদিন পূর্বে ভারত ও তার বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের আয়তন এবং জনসংখ্যার সঠিক হিসাব প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো।

আয়তন

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুসারে, বসতিহীন মেরু অঞ্চল ও জনহীন দ্বীপ বাদে, পৃথিবীর স্থলভাগের মোট পরিমাণ সাড়ে তের কোটি বর্গ কিলোমিটার অথবা সওয়া পাঁচ কোটি বর্গ মাইল। এই ভূভাগ প্রায় দু'শ অসমান দেশ ও অঞ্চলে বিভক্ত। পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ ভূমি

আয়তনে বৃহত্তম সোভিয়েট ইউনিয়ন অধিকারভুক্ত। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, কম্যুনিষ্ট চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়া,—আয়তনের নিম্নক্রম অনুযায়ী লিখিত এই ছ'টি দেশ, একত্রে দখলে রেখেছে সমগ্র ভূভাগের একার্ধ। প্রায় দেড়শ' দেশ ও অঞ্চলের ভাগে পড়েছে অপরার্ধ। ভারত এদের মধ্যে আকারে সবচেয়ে বড়ো।

জম্মু ও কাশ্মীর বাদে ভারতের আয়তন ১১,৭৮,৯৯৫ বর্গ মাইল। ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও জাপানের মিলিত আয়তন ভারতের আয়তনের প্রায় সমান। ভারত সমস্ত ভূভাগের একচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা ২'৪ শতাংশ। পৃথিবীর দেশসমূহের মধ্যে আয়তনে ভারতের স্থান সপ্তম।

প্রশাসনিক বিভাগ

পনোরোটি স্বশাসিত অঙ্গরাজ্য, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পাঞ্জাব, জম্মু ও কাশ্মীর, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, কেরল,, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ, এবং কেন্দ্রশাসিত দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, নেফা, ত্রিপুরা, দাদরা ও নগর হাভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ পণ্ডিচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ ও নাগাভূমি নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। নাগাভূমি এখনও পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে উন্নীত হয়নি। রাজ্যসমূহ প্রধানত ভাষাভিত্তিক বলে তাদের আয়তনের বৈষম্য বিস্তর। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল। মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ গুণের চেয়ে বড়ো। রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ, এদের প্রত্যেকটি পশ্চিমবঙ্গের তিনগুণ ছাড়িয়ে গেছে। রাজ্যের মধ্যে আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান চতুর্দশ। কেরল পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের কম।

সমস্বার্থ বিষয়ক সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী রাজ্য নিয়ে পাঁচটি অঞ্চল গঠিত হয়েছে। উত্তরাঞ্চলে আছে জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লী ও হিমাচল প্রদেশ। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশ নিয়ে মধ্যাঞ্চল গঠিত। বিহার' উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা আছে পূর্বাঞ্চলে। নেফা ও নাগাভূমি এ অঞ্চলের মধ্যেই আসবে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র পশ্চিমাঞ্চলের অন্তর্গত। অবশিষ্ট চার রাজ্য, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর, কেরল ও মাদ্রাজ দক্ষিণাঞ্চলের সভ্য।

৩২১ জেলা ও ৯টি অঞ্চল নিয়ে মোট ৩৩০টি ভারতের প্রশাসনিক একক। এ সকল একক মহকুমা তালুক ও তহশিলে বিভক্ত। জেলার সংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। উত্তর প্রদেশ ৫৪টি জেলায় বিভক্ত। কেরলে জেলার সংখ্যা মাত্র ৯।

বসতি আছে এমন গ্রামের সংখ্যা ৫,৬৭,১৬৯, বসতিহীন গ্রাম ৫৫,৮৯১।

জনসংখ্যা

১৯৬১ সনে ভারতে ৪৩,৯২,৩৫,০৮২ লোক গণনা করা হয়েছে; এ হলো চীন ও পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ ছাড়া সমগ্র দেশের মোট সংখ্যা। এর মধ্যে ২২,৬২,৯৩,৬২০ জন পুরুষ এবং ২১,২৯,৮১,৪৬২ জন নারী।

এত বড়ো দেশের প্রতিটি লোক গণনায় ধরা পড়েছে এমন দাবী কেউ করে না। ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটিরে, মাঠে ময়দানে, অরণ্যে পর্বতে, সাধু সন্ন্যাসী, শ্রমিক ও ভিখারীর ডেরায়, গাছের তলায়, পথের ধারে, সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর বুকে লোকগণনায় কেউ না কেউ বাদ পড়বে তা একরকম নিশ্চিত। লংজু থেকে দ্বারকা, লে থেকে কুমারিকা গণনার ক্ষেত্রের বিস্তার। গণনার ক্ষেত্রের বহু ব্যাপকতাই বিশুদ্ধতার পরিপন্থী।

নদীস্রোতের মতো জনপ্রবাহে অবিরাম পরিবর্তন ঘটবে। মানুষের আনাগোনার মুহূর্ত বিরাম নেই। প্রতি মিনিটে ভারতের ভূমিতে নেমে আসছে কত নতুন শিশু আবার চির বিদায় নিয়ে যায় যারা তাদের সংখ্যাও বিস্তর। মানুষের এই আগমন ও নির্গমন কোনো স্থির সংখ্যাকেই নির্ভুল থাকতে দেয় না। গণনার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছে সব রকম ভুলের মাত্রা বেশি নয়। প্রতি হাজারে মাত্র সাতজন গণনা থেকে বাদ পড়েছে। ভুলের মোট পরিমাণ ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার যোগ করলে ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মোটামুটি সওয়া চুয়াল্লিশ কোটি।

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০ কোটি। ১৯৫৮ সনে কম্যুনিস্ট চীনের জনসংখ্যা ছিল ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৬১ সনে তা ৭০ কোটির কাছে এসে থাকবে। চীনের লোকসংখ্যা ভারতের দেড় গুণের বেশি। এই দুই দেশে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের বেশি লোকের বাস। জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীতে চীনের স্থান প্রথম, ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ১৪.৬ শতাংশ লোকের বাস ভারতে।

১৯৫৯ সনে প্রধান তিনটি রাষ্ট্রের—সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য—মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৪,০৩,৫৭০০০, সে বছরে ভারতের জনসংখ্যা থেকে দুই কোটি বেশি। কিন্তু তাদের ভূমির পরিমাণ ভারতের আয়তনের দশগুণ।

জনবিন্যাস

চুয়াল্লিশ কোটি লোক দেশের সব জায়গায় সমান সংখ্যায় ছড়িয়ে নেই, একথা বলাই বাহুল্য। কোনো অঞ্চলে লোকের ঠাসাঠাসি, কোথাও বা দেখা যায় জনবিরল অথবা জনহীন মরু প্রান্তর ও বনভূমি। এর কারণ সুস্পষ্ট। আহার জোটে যেখানে, ভিড় জমে সেখানে। শিল্পায়নের পথে ভারতের যাত্রা শুরু হয়েছে সত্য, তবু এখনও কৃষিই দেশের প্রধান অবলম্বন। যে অঞ্চলে কৃষির সুযোগ সুবিধা বেশি সেখানে লোকের বসতি ঘন। এদিক থেকে সিন্ধু-গাংগেয় উপত্যকার স্থান সবার উপরে। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবর্তী পাহাড়ে অঞ্চলে গড়ে উঠেছে কয়লা, লোহা, ইস্পাত, বিবিধ এঞ্জিনিয়ারিং ও মৃৎশিল্প। পশ্চিমবঙ্গের চা, পাট ও বস্ত্রশিল্প, বিবিধ এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ডক ও রেলকেন্দ্র নানাদিক থেকে চুম্বকের মত লোক আকর্ষণ করে থাকে। বিহারের সিন্ধি ও বারুণি, উত্তর প্রদেশের চিনি ও অন্যান্য শিল্পে স্থানীয় লোকের প্রাধান্যই বেশি।

পাঁচটি উপনদী সহ সিন্ধু এবং তাদের জল বিতরণকারী বহু খাল সেচ করে পাঞ্জাবের শুষ্ক ক্ষেত্রগুলি শস্যশালী করে তুলেছে। এ রাজ্যে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রসারও বেশি।

পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে জন সমাবেশের কারণ এই চার রাজ্যের কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি। এদের মোট আয়তন সমগ্র ভারতের আয়তনের ২২.৩৪ শতাংশ কিন্তু

এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ১৭,৫৪,৪৫,১২০। এ হলো ভারতের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ।

পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত মাদ্রাজ রাজ্য কৃষির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই বৃষ্টি হয়। তাছাড়া কাবেরীর নিম্নভাগ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের সুবিধা করে দেয়। নানা প্রকার শিল্পও এ রাজ্যে গড়ে উঠেছে। বসতির ঘনতায় মাদ্রাজের স্থান চতুর্থ। এখানে প্রতি বর্গমাইলে ৬৬৯ জন লোকের বাস।

বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে পরস্পর সংলগ্ন রাজ্য মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশ তুলা চাষের উপযোগী কালো মাটির অঞ্চল। মালভূমির বন্ধুর কঠিন ক্ষেত্র থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার। গভীর নদীখাতের জল চাষের কাজে ব্যবহার করা সহজ নয়। কিন্তু গোদাবরী ও কৃষ্ণার ব-দ্বীপ কৃষির বিশেষ উপযোগী।

এই তিন রাজ্য আয়তনে ভারতের চার ভাগের এক ভাগের চেয়ে কিছু বেশি কিন্তু এদের মোট লোকসংখ্যা মাত্র ৯,৯১,২৩,৯০৭, মোট জনসংখ্যার ২২·৬ শতাংশ।

মৌসুমী বায়ুবাহিত বারিপাত থেকে বঞ্চিত মরুময় রাজস্থান সবচেয়ে জনবিরল রাজ্য। প্রকৃতির কঠোরতার সংগে সংগ্রামে বিমুখ হয়ে বহু লোক রাজস্থান ত্যাগ করে ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে প'ড়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পে কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এদের অনেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

ভারতের বৃহত্তম রাজ্য, মধ্যপ্রদেশও মৌসুমী বায়ুর আওতার বাইরে। গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ও অরণ্যে আবৃত বহু অঞ্চল এবং মরুপ্রায় অঞ্চল এখনো বসতিহীন। এই দুই রাজ্যের মোট আয়তন ভারতের আয়তনের প্রায় ২৬ শতাংশ; মোট লোকসংখ্যা মাত্র ৫,২৪,২৮,০১০, ভারতীয় জনসংখ্যার ১২ শতাংশ।

এই হিসাবে দেখা যায় ভারতের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল সিন্ধু-গাংগেয় উপত্যকা ও মাদ্রাজ রাজ্য, দ্বিতীয় স্থান দাক্ষিণাত্যের তিনটি রাজ্য মহারাষ্ট্র, মহীশূর ও অন্ধ্রপ্রদেশের আয়তনের তুলনায় রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ জনবিরল অঞ্চল।

আসাম ও পাঞ্জাবের আয়তন সমান, ৪৭০০০ বর্গমাইল। এক দশকে সাড়ে ত্রিশ লক্ষ লোক বেড়ে যাবার পরও আসামের মোট লোকসংখ্যা ১,১৮,৭ ,৭৭২, পাঞ্জাবের সংখ্যার চেয়ে ৮৪,৩৪,০৪০ কম। আসাম কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনায় পূর্ণ। বহু কর্মী ও ভাগ্যান্বেষী এখন আসামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। রাজ্যসমূহের মধ্যে ১৯৫১-৬১ দশকে আসামে বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, শতকরা ৩৪·৩৫।

উড়িষ্যার আয়তন ৬০ হাজার বর্গমাইল, মাদ্রাজের আয়তনের চেয়ে দশ হাজার বর্গমাইল বেশি। উড়িষ্যার জনসংখ্যা ১,৫৫,৪৮,৮৪৬, মাদ্রাজের সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে সামান্য বেশি। কৃষিপ্রধান রাজ্য উড়িষ্যা বাঙলা ও বিহারের গাদাবোটের মতো ছিল দীর্ঘকাল। চাষ এখনো মেঘের খামখেয়ালের উপর নির্ভরশীল। আগে অনটন বা দুর্ভিক্ষ মাঝে মাঝেই ঘটতো। এখন উড়িষ্যা উদ্বৃত্ত রাজ্য। পঞ্চবার্ষিকি যোজনার মাধ্যমে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু লোক বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা গড়ে উঠতে এখনো দেরী।

গুজরাট আয়তনে মাদ্রাজের সওয়া গুণ। কিন্তু মাদ্রাজে লোক গুজরাটের দেড়গুণের চেয়ে বেশি। গুজরাট বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। গুজরাটীরা অনেকে বহুকাল থেকে ভারত ও ভারতের বাইরে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত আছে। আফ্রিকা থেকে আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে আসবার আসবায় সময় ভস্কোডাগামার পথ প্রদর্শক ছিল একজন গুজরাটী বণিক। এ রাজ্যে কৃষিজীবীদের অবস্থা ভাল নয়। লোকসংখ্যা ২,০৬,৩৩,৩৫০।

তিনদিকে পর্বত ও সমুদ্রবেষ্টিত কেরল আকারে ক্ষুদ্রতম রাজ্য। এর আয়তন মাত্র ১৫০০০ বর্গমাইল। কিন্তু লোকসংখ্যা ১,৬৯,০৩,৭১৫, উড়িষ্যার জনসংখ্যার প্রায় সমান। কৃষির চেয়ে বাগিচা শিল্পের জন্য এ রাজ্য প্রসিদ্ধ। নারকেল, কাজুবাদাম, শিমুল, আলু, চা, কফি, গোলমরিচ, এলাচ প্রভৃতি মশলার বাগিচার জন্য কেউ কেউ এ রাজ্যকে ভারতের উদ্যান আখ্যা দিয়েছেন। এখানে বসতির ঘনতা সবচেয়ে বেশি।

জম্মু ও কাশ্মীরের লোকসংখ্যা মাত্র ৩৫,৬০,৯৭৬। কেন্দ্রশাসিত ও অন্যান্য অঞ্চলের মোট আয়তন প্রায় ৮০,০০০ বর্গমাইল এবং মোট জনসংখ্যা ৭৭,৭৯,২৩৫। এর মধ্যে দিল্লীর লোকসংখ্যা ২৬,৫৮,৬১২, হিমাচল প্রদেশে ১৩,৫১,১৪৩ জন লোক গণনা করা হয়েছে। ত্রিপুরা ও মণিপুরের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ১১,৪২,০০০ ও ৭,৮০,০০০। গোয়া, দমন ও দিউ-র লোকসংখ্যা একত্রে ৬,২৭,০০০।

বসতির ঘনতা

কোনো রাজ্যে ভূমির পরিমাণ ও জনসংখ্যার মধ্যে যে অনুপাত তা থেকে বসতির ঘনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘনতা রাজ্যের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার সূচক। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে ঘনতা বেশি বলে বেকারও বেশি। জমি ছেড়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে পা বাড়ালেই প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত যোগ্যতার। তা বাড়াবার জন্য স্কুল কলেজে বিদ্যা অর্জন বা কলকারখানায় যান্ত্রিক কুশলতা শিক্ষা করা আবশ্যক। সেজন্য এ দুই রাজ্যে সাক্ষরতা বেশি। বিহারের বাড়তি লোক শিক্ষার পথ না ধরে বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে অকুশলী শ্রমিকরূপে।

ভারতের ভূমি ও জনগণের কত শতাংশ কোন্ রাজ্যে রয়েছে তার হিসাব এবং বসতির পূর্ণ সংখ্যাসহ রাজ্যসমূহের নিম্নক্রমিক স্থান নীচে দেখানো হলো।

আয়তনে—১। মধ্যপ্রদেশ ১৪·৫৪; ২। রাজস্থান ১১·২২; ৩। মহারাষ্ট্র ১০·০৮; ৪। উত্তর প্রদেশ ৯·৬৫; ৫। অন্ধ্র প্রদেশ ৯·০৩; ৬। জম্মু ও কাশ্মীর + ৭। মহীশূর ৬·৩০; ৮। গুজরাট ৬·৪০; ৯। বিহার ৫·৭১; ১০। উড়িষ্যা ৫·১১; ১১। মাদ্রাজ ৪·২৭; ১২। পাঞ্জাব ৪·০১; ১৩। আসাম ৪·০০; ১৪। পশ্চিমবঙ্গ ২·৮৭; ১৫। কেরল ১·২৭।

জনসংখ্যায়—১। উত্তর প্রদেশ ১৬·৮১; ২। বিহার ১০·৫৯; ৩। মহারাষ্ট্র ৯·০২; ৪। অন্ধ্র প্রদেশ ৮·২০; ৫। পশ্চিমবঙ্গ ৭·৯৬, ৬। মাদ্রাজ ৭·৬৮; ৭। মধ্যপ্রদেশ ৭·৩৮; ৮। মহীশূর ৫·৩৮; ৯। গুজরাট ৪·৭০; ১০। পাঞ্জাব ৪·৬৩; ১১। রাজস্থান ৪·৬০; ১২। উড়িষ্যা ৪·০০; ১৩। কেরল ৩·৮৫; ১৪। আসাম ২·৭১; ১৫। জম্মু ও কাশ্মীর ০·৮১।

বসতির ঘনতায়—কেরল ১,১২৭; ২। পশ্চিমবঙ্গ ১,০৩২; ৩। বিহার ৬৯১;

৪। মাদ্রাজ ৬৬৯ ; ৫। উত্তর প্রদেশ ৬৪৯ ; ৬। পাঞ্জাব ৪৩০ ; ৭। অন্ধ্র প্রদেশ ৩৩৯ ; ৮। মহারাষ্ট্র ৩৩৩ ; ৯। মহীশূর ৩১৮ ; ১০। উড়িষ্যা ২৯২ ; ১১। গুজরাট ২৮৬ ; ১২। আসাম ২৫২ ; ১৩। মধ্যপ্রদেশ ১৮৯ ; ১৪। রাজস্থান ১৫৯ ; ১৫। জম্বু ও কাশ্মীর।

পল্লী ও পৌরাঞ্চলে

প্রাচীন গ্রীসে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল নগর। সে যুগে অরণ্যঘেরা ঋষির আশ্রমে উৎসারিত হত ভারতীয় চিন্তাধারা। 'বনভবনে প্রচারিত হত জ্ঞানধর্ম কত পুণ্য কাহিনী।' সভ্যতার রূপ ও প্রকৃতি পরিবর্তনের সংগে তার পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। ঋষির তপোবন স্থান পেয়েছে অতীতের সংগ্রহশালা ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। ছায়াশীতল পল্লী এখন দারিদ্র্য ব্যাধি ও অজ্ঞতার বাসভূমি। আধুনিক সভ্যতার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নগর ও শহর। সেজন্য ভারতে গড়ে উঠেছে ছোটো বড়ো ২,৭০০ পৌরাঞ্চল। গ্রামকে সর্বপ্রকারে রিক্ত করে নগর স্ফীত করার দিকেই এখন ঝোঁক। শহরের সংখ্যাবৃদ্ধি আধুনিকতার অগ্রগতির পরিচায়ক। ভারতে পুরবাসীর সংখ্যা দশ বছরে ১,৬২,৩২,৭৪৮ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬১ সনে ৭,৮৮,৩৫,৯৪৯ দাঁড়িয়েছে। প্রতি একশ ভারতবাসীর ১৮ জনের বাসস্থান নগর বা শহর। জনগণনার অনেক শহর লোকসংখ্যাও সুখ সুবিধার দিক থেকে উন্নত গ্রাম বই আর কিছু নয়। পঞ্চাশ হাজার বা তার বেশী লোক বাস করে ভারতে এমন নগর ও শহর আছে মাত্র ২৫০।

বিভিন্ন রাজ্যে পুরবাসীর সংখ্যা বিভিন্ন। মহারাষ্ট্রে জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২৯ জন শহরবাসী। রাজ্যসমূহের মধ্যে এই হারই সবচেয়ে বেশি। মাদ্রাজ ও গুজরাটের পরে পশ্চিম-বঙ্গের স্থান। এখানে জনসংখ্যার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ কোনো নগর বা শহরের অধিবাসী। শহরবাসীর সংখ্যা সবচেয়ে কম উড়িষ্যায় মাত্র ৬·৩ শতাংশ।

নগরে ও শহরে

কোনো নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রিক বস্তু আশ্রয় করে তরল পদার্থের দানা বেধে ওঠে এবং তা ক্রমশ আকারে বড়ো হয়। রাজধানী, দেবমন্দির, বন্দর ও শিল্পায়তন নগর ও শহরের নিউক্লিয়াস। এদের যে কোনো একটি কেন্দ্র করে লোক জড়ো হয় আর গড়ে ওঠে শহর বা নগর। মধ্যযুগের দিল্লি আগ্রা এবং আধুনিক নয়া দিল্লি রাজধানী কেন্দ্রিক নগরের নিদর্শন। পরকালে সুখের আশায় পুণ্যসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মানুষ ভিড় করে তীর্থস্থানে। বারাণসী, পুরী, মাদুরাই প্রভৃতি এজাতীয় শহর। ইহকালের সুখের জন্য পুণ্য নয়, চাই অর্থসঞ্চয়। বনে বাদাড়ে বা অন্য যেখানেই শিল্প-কেন্দ্র স্থাপিত হয় সেখানেই ভিলাই, জামসেদপুর ও রৌরকেল্লার মতো শহর গড়ে ওঠে। বন্দররূপে বম্বে, মাদ্রাজ ও কলকাতা নগরের সূত্রপাত হয়েছিল। এখন এরা শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যও প্রসিদ্ধ।

যে শহরে এক লক্ষ বা তার বেশি লোকের বাস লোকগণনার সংজ্ঞায় তাকে বলা হয় নগর। ভারতে নগরের সংখ্যা ১১৩। ৫০ হাজার বা তার বেশি লোক বাস করে এমন শহরের সংখ্যা ১৩৭। দেশের সবচেয়ে বড়ো নগর বৃহত্তম বম্বে। ১৮৬ বর্গমাইল জোড়া এই নগরে লোক সাড়ে একচল্লিশ লক্ষের বেশি। ভারতের দ্বিতীয় নগর কলকাতার আয়তন ৪০ বর্গমাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। দিল্লী সহর-গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ২৩,৫৯,৪০৮। এর মধ্যে

দিল্লী কর্পোরেশন এলাকায় আছে ২০,৬১,৭৫৮, নয়া দিল্লীতে ২,৬১,৫৪৫ এবং দিল্লী সেনানিবাসে আছে ৩৬,১০৫। চতুর্থ নগর মাদ্রাজে লোক ১৭,২৯,১৪১।

ভারতীয় ১১৩টি নগরের মধ্যে ১২টি আছে পশ্চিমবঙ্গে। কলকাতা, হাওড়া, বেহালা, গার্ডেনরীচ, আসানসোল সহর-গোষ্ঠী, ভাটপাড়া, খড়্গপুর, বালি, কামারহাটি, দক্ষিণ দম্‌দম্‌, বর্ধমান, বরানগর, এ রাজ্যের নগর। পশ্চিমবঙ্গের ৮৫,৪০,৮১২ জন লোক সহরবাসী। এদের মধ্যে ৪৮,২৮,৮৬৯ জন বাস করে বারটি নগরে। পঞ্চাশ হাজার ও তার বেশি লোকের বাস এমন বাঙলার ১৯টি শহরের লোকসংখ্যা ১০,৯২,০৪৮। দেখা যায় প্রায় সাড়ে ৮৫ লক্ষ শহরবাসীর প্রায় ৬০ লক্ষ বাস করে ৩১টি নগর ও শহরে। পশ্চিমবঙ্গে ১৮৪টি সহরের বাকী ১৫৩টি শহরে বাস করে মোটামুটি ২৫ লক্ষ লোক।

নারী

ভারতে পুরুষের চেয়ে নারী ১,৩৩,৫২,১৫৮ জন কম। অনুরূপে বলা যায় প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৯৪১ জন। নারীর এই অল্পতা সকল রাজ্যে সমভাবে বণ্টিত নয়। বসতির ঘনতায় যেমন কেরলের স্থান প্রথম, নারী পুরুষের হারেও তেমনি কেরল সবার উপরে। এরাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষে নারী ১০২২ জন এবং পল্লীতে ১০২৭ জন। গোয়া, দমন ও দিউতে এক হাজার পুরুষে নারী এক হাজার সত্তর। ভারতে নারীর এ-হারই সর্বোচ্চ। উড়িষ্যার পল্লীতে পুরুষের প্রতি হাজারে ১,০১৫ জন নারী। মণিপুরের হারও ঠিক তাই। বিহারের পল্লী অঞ্চলে প্রতি হাজার পুরুষে নারী ১,০১২। পণ্ডিচারির হার ১,০১৩। প্রতি হাজার পুরুষে মাদ্রাজ রাজ্যের পল্লীতে নারী ১,০০৩, মহারাষ্ট্রে নারী ৯৯৫, অন্ধ্রে ৯৮৮, মহীশূরে ৯৭৫ মধ্যপ্রদেশে ৯৭০।

উপরের আটটি রাজ্য এবং তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নারীর হার সর্বভারতীয় হারের চেয়ে বেশি। ভারতীয় গড় হারের চেয়ে নারীর হার যে সাতটি রাজ্যে কম তাদের নাম নীচে দেওয়া হলো—

পাঞ্জাব ৮৬৪; আসাম ৮৭৬; পশ্চিমবঙ্গ ৮৭৮; জম্মু ও কাশ্মীর ৮৭৮; রাজস্থান ৯০৮; উত্তর প্রদেশ ৯০৯ ও গুজরাট ৯৪০।

নারী পুরুষের এই বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে মেয়ের চেয়ে ছেলে জন্মে বেশি এবং প্রথম্‌ মা হবার বয়সে, ১৫ থেকে ৩৫, নারীর মৃত্যু বেশি ঘটে। সর্বভারতীয় হারে এযুক্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিন্তু যে আটটি রাজ্যে এবং তিনটি অঞ্চলে নারী বেশি সেখানে একথা খাটে না।

ওপরের সংখ্যা থেকে দেখা যায় যে দক্ষিণ ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্য ও অঞ্চলে ভারতীয় গড় হারের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশি। এবিষয়ে দ্রাবিড়ি রাজ্য কয়টির সংগে মহারাষ্ট্রেরও মিল রয়েছে। উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশি। সেখানে স্বাস্থ্যহানিকর অবগুণ্ঠন নেই। কুর্গ মালাবার ও অন্যান্য অঞ্চলে মাতৃতন্ত্র এখনও প্রচলিত। নারী সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং কর্ত্রী। দেশের স্বাধীনতা যেমন জাতিকে সব দিক দিয়ে শক্তিশালী করে তোলে সামাজিক স্বাধীনতাও মানুষকে তেমনি মনে ও দেহে সুদৃঢ় করে তোলে। দক্ষিণ ভারতে

নারীদের অবাধ স্বাধীনতা তাদের দেহে প্রচুর স্বাস্থ্য ও শক্তি বৃদ্ধি করে। জন্ম মৃত্যুর বই থেকে হয়তো প্রমাণিত হবে যে দাক্ষিণাত্যে নারীর মৃত্যুহার কম। এজন্যই সেখানে পুরুষের চেয়ে নারীর আধিক্য দেখা যায়।

উত্তর ভারতের ২টি রাজ্যে উড়িষ্যা ও বিহারে, পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। এর কারণ বের করা কঠিন নয়। এ ২ রাজ্যের লক্ষ লক্ষ পুরুষ অর্থ উপার্জনের জন্য বাইরে চলে যায়। খেত খামার ও বাড়িঘর দেখাশোনার জন্য বৃদ্ধ ও নারীরা দেশেই থাকে। উড়িষ্যার ২টি গ্রামের ১৩২ জন অর্থ উপার্জনের জন্য কলকাতা এসেছে। এদের একজনের সংগেও নারী আসেনি। বেশির ভাগ লোকের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। এ ২ রাজ্যে খাদ্য আছে কিন্তু টাকার অভাব। তাই এখানকার লোক অল্প সল্প উপার্জনের জন্য বাইরে চলে যায়। উড়িষ্যা বিহার উত্তরপ্রদেশ ও অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের এবং পাকিস্তানের পুরুষ পশ্চিমবঙ্গে অর্থোপার্জন করে। এদের বেশির ভাগ লোকের সংগে তাদের নারী আসেনা। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গে নারীর সংখ্যা এত কম।

শহরে ও নগরে নারী

নগর ও বড়ো শহর প্রধানত পুরুষের কর্মক্ষেত্র। যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য নারীর গণ্ডির বাইরে। পৌরাঞ্চলে জীবনযাত্রায় ব্যয় বেশি, বাসগৃহ দুষ্প্রাপ্য। ঘোমটাপরা পাড়াগেঁয়ে রমণী শহরে এসে পুরুষের যত সাহায্য করে তার চেয়ে তার ভার বৃদ্ধি করে বেশি। সেজন্য গ্রামের বাড়ীতে পরিবার রেখে শ্রমিক ও স্বল্পবিত্ত অন্যান্য কর্মী একা চলে আসে শহরে বা নগরে। নারীর এই অনুপস্থিতির জন্য কলকাতার প্রতি হাজার পুরুষে নারী ৬১২। হাওড়ায় এ হার ৬৩০। ভাটপাড়ার ৫৮৫, বালির ৫৫৩ হয়ে পুরুষের হাজারে নারীর সংখ্যা টিটাগড়ে নেমে এসেছে ৪৯৭তে। শিল্পশহর বেশি বলে পশ্চিমবঙ্গের পৌরাঞ্চলে নারীর গড় হার ৭০১, সর্বভারতীয় গড় থেকে ১৪৪ কম।

বৃহত্তর বম্বের এক হাজার পুরুষে নারী ৬৬৩ জন হলেও মহারাষ্ট্রে পৌরাঞ্চলের গড় হার পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে ঠিক ১০০ বেশি। চারটি দ্রাবিড় রাজ্য কেরল, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরের শহরে নারীর গড় হার যথাক্রমে ৯৯১, ৯৬৩, ৯৫৩ ও ৯১৩, পশ্চিমবঙ্গের গড়ের চেয়ে প্রতি রাজ্যে দু'শরও বেশি। কেরলে ৭৯টি শহরের ৫৪ টিতে পুরুষের চেয়ে নারী বেশি। মাদ্রাজ রাজ্যে অর্ধেকের বেশি শহরে নারীর চেয়ে পুরুষ কম। অন্ধ্রপ্রদেশে চার ভাগের এক ভাগ শহরে নারী বেশি। পুরুষ কম এমন শহরের সংখ্যা মহীশূরে ২৫। এসব রাজ্যে নারী পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে ও কাজ করে থাকে। গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে এদের কোনো বাধা নেই। তাই এসব রাজ্যের নারীর আধিক্য প্রতিফলিত হয়েছে পৌরাঞ্চলে। দ্রাবিড়ি রাজ্যের মতো মহারাষ্ট্রের ২৩টি শহরে নারী বেশি।

এই পাঁচটি রাজ্য ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহারে নারীর চেয়ে পুরুষ কম। কিন্তু এরা যে দ্রাবিড়ি রাজ্যের সমগোত্র নয় তা বোঝা যায় শহরবাসী নারীর সংখ্যায়। সদা ভয়, সদা লাজে সঙ্কুচিত এখানকার নারী শহর এড়িয়ে গ্রামে থাকাই পছন্দ করে। মধ্যপ্রদেশের পৌরাঞ্চলে নারীর হার ৮৫৬, বিহারে ৮১১ এবং উড়িষ্যায় ৮০৭। বিহার ও উড়িষ্যায় নারীর আধিক্য স্বাভাবিক নয়। কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে এ দু'রাজ্যের লোক সেখানে পুরুষের হার এবং বিহার ও উড়িষ্যায় নারীর হার বাড়িয়ে তোলে।

লোক বৃদ্ধি

ভারতের লোক এ পর্যন্ত দশবার গণনা করা হয়েছে। ১৮৭১ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত ছয় দশকে গণনার ফল ছিল অনিশ্চিত, তাতে হ্রাস বৃদ্ধির কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। দুর্ভিক্ষ মহামারী ও ম্যালেরিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হতো জনগণনার ফলে ১৯২১ সনের পর থেকে প্রতি দশকে লোক ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ১৯৪১ সনে বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.২২ শতাংশ। পরের দশকে পশ্চিমবঙ্গে '৫০ এর মন্বন্তর, কলকাতার বীভৎস হত্যাকাণ্ড, স্বাধীনতার পরবর্তী দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে ১৯৫১ সনের গণনায় বৃদ্ধির হার খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬১ সনে যে দশক শেষ হয়েছে তার বৃদ্ধি সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলেছে। '৫১ সনের ১৩.৩১ শতাংশ থেকে '৬১ সনে লোক বৃদ্ধি একেবারে ২১.৫০ শতাংশে পৌঁচেছে। এ যেন হনুমানের সাগর ডিঙ্গানো লম্বা লাফ। বৃদ্ধির বার্ষিক গড় ২,২ শতাংশ খুব বেশি নয়। ঐ দশকে পাকিস্তানের বৃদ্ধি হয়েছে ২.৫ শতাংশ। কিন্তু ১৯৫১ সনের ৩৬, ১১, ২৯, ৬২২ এর ২১,৫০ শতাংশ এক বিরাট সংখ্যা। গত জনগণনার হিসাবে দেখা যায় ভারতের লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮১ লক্ষ বেড়ে গেছে। প্রতি বছরে বেড়েছে ৭৮ লক্ষ লোক। ১৯৫১-৬১ দশকের বৃদ্ধি যুক্তরাজ্যের (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্‌স্) ১৯৫৯ সনের মোট লোকসংখ্যার দেড়গুণ। এ দশকে ভারতে প্রতিদিন লোক বেড়েছিল গড়ে ২১,৪০০।

শক্তিবৃদ্ধি না দায় বৃদ্ধি

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যেন এক সুবিশাল যৌথপরিবার। ঘরের কর্তার মতো রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ দেশের বিপুল জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, শিক্ষা, উপার্জনের উপায় প্রভৃতি বহু লোক-হিতকর কাজের ভার নিয়েছেন। ভারতের আয়তন সসীম। লোক যদি অবাধে বেড়ে চলে থাকবার ঠাঁই-র অভাব ঘটতে খুব বেশি দেরি হবে না। কোনো কোনো রাজ্যে বসতির ঘনতা এখনই এক হাজার ছাড়িয়ে গেছে। দেশে দেশে অন্ন বিতরণের ক্ষমতা ভারত হারিয়েছে অনেকদিন আগেই। এখন তার ৪৪ কোটি সন্তানের মুখে অন্ন যোগাবার জন্যে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল ও ব্রহ্মদেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। এই অভাবের দেশে নিত্য এসে উপস্থিত হয় সাড়ে একুশ হাজার নতুন আগন্তুক। অভাব যায় আরো বেড়ে। লোক যেমন বাড়ে অন্ন বস্ত্র যোগাবার দায়ও তেমনি বেড়ে যায়।

দেহ ও মন যাদের সুস্থ ও সবল তারাই জাতীয় শক্তির উৎস। লোক বৃদ্ধির বিপুলতা বহুজনতার দায়কে শক্তিতে পরিণত করার পরিপন্থী।

জনসমস্যা ও সমাধানের উপায়

লোকের স্বল্পতা ও অতিবৃদ্ধি জনসমস্যার দুইরূপ। প্রথমটির সমাধান তুলনায় সহজ। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লোকক্ষয় পূরণের উদ্দেশ্যে ইউরোপের কোনো কোনো দেশে জননীদের প্রত্যেক নতুন সন্তানের জন্য বৃত্তি দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ অস্ট্রেলিয়ায় সম্প্রতি এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। প্রত্যেক রমণীর কাছ থেকে দশটি সন্তানের জননী হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করা এদের অন্যতম লক্ষ্য। ইন্দোনেশিয়ার দিক থেকে ভয় নিবারণের জন্য অস্ট্রেলিয়ার জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে বলে এদের ধারণা।

ভারতীয় আর্যরা যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যদের মুখোমুখী হয়েছিল তখন তারাও জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করে। এ সমস্যা সমাধান তারা করেছিল ভারতীয় পদ্ধতিতে। পুৎ নামে এক নতুন নরক সৃষ্টি হল। অপুত্রকদের মৃত্যুর পর পিণ্ড ও জল না পেয়ে পিতৃপুরুষগণ ঐ নরকে পতিত হয়। যে সন্তান উৎপাদন করে এই ভয়াবহ নরক থেকে পিতৃপিতামহদের ত্রাণ করে সে-ই পুত্র। পুত্রের জন্য ভার্যা গ্রহণ এবং পিণ্ডের জন্য পুত্রের জনক হওয়া সমাজে এক অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হল। বনবাসী মুনি ঋষিরা পর্যন্ত এ কর্তব্যে অবহেলা করে পূর্বপুরুষদের নরকে ঠেলে দিতে পারেন নি। জনবল বৃদ্ধির জন্য রচিত এ বিধি হিন্দুর মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। জনসমস্যার রূপ গেছে বদলে। জনসমস্যা এখন, অতিবৃদ্ধির সমস্যা। সমাজ এখনও সংখ্যাল্পতার যুগের বিধান মেনে চলছে। সন্তানের জনক হয়ে পিতৃপুরুষদের ত্রাণ করতেই হবে। জনগণের মন থেকে এই অকল্যাণকর সংস্কার বিদূরিত করাই সমস্যা সমাধানের প্রথম কাজ হওয়া উচিত।

ভারতের জনসমস্যা পৃথিবীর জনসমস্যারই এক সংক্ষিপ্ত রূপ, এ কথায় আশ্বস্ত হবার কিছু নেই। যে সমস্যা অন্য দেশে দেখা দেবে কয়েক শতাব্দি পরে, ভারতে এখনই তা তীব্র আকার ধারণ করেছে। দেশের সম্পদ জনগণের জীবন ধারণের পক্ষে অপ্রচুর।

কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে লোকবৃদ্ধিতে বাধা না দিলে প্রকৃতির কৃপণতা বহু লোককে যে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিবে তা একরূপ নিশ্চিত। আবার কেউ কেউ বলেন, সমস্যা মোটেই জনসমস্যা নয়, এটা নিম্নউৎপাদন ও অসম ভূমি বণ্টনের সমস্যা। এ কথা সত্য হলেই বা ভারতের লাভ কী। পৃথিবীর ২·৪ শতাংশ ভূমিতে ভারতে হয়েছে পৃথিবীর ১৫ শতাংশ লোক। কোন বিনোবাজী পদযাত্রায় বেরিয়ে পৃথিবীর অর্ধেক স্থান যাদের অধিকারে সেই সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়াকে তাদের বাড়তি ভূমি দানে রাজী করাবে? ভারতের ভূমি পুনর্বণ্টন করে জনসমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। কারণ এত লোকের জন্য দেশে যথেষ্ট ভূমির অভাব। উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অবশ্য শুরু হয়েছে কিন্তু ফললাভে বিলম্ব ঘটবে।

পণ্ডিতদের তৃতীয় দলের মত এই যে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের সাহায্যে সমুদ্র ও মরুভূমি থেকে খাদ্য আদায় করা সম্ভব। ইস্রায়েল যা করেছে ভারতে তা করা সহজ নয়।

ভারত সরকার জোর দিয়েছেন জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর। এ দেশে জন্মের হার যে খুব বেশি তা নয়। জন্ম ও মৃত্যুর অন্তরই বৃদ্ধি। মৃত্যুকে ঠেকাবার চেষ্টায় ভারত সরকার বেশ কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন। আয়ুর গড় ৩৪ থেকে ৪৫-এ উঠেছে। মৃত্যুর হার কমে যাওয়ায় জন্ম-মৃত্যুর অন্তর বা লোকবৃদ্ধির হার বেড়ে গেছে। তাই বৃদ্ধিটা দেখায় খুব বেশি।

ডাঃ চন্দ্রশেখর বলেন, তিনটি সন্তান জন্মের পর অস্ত্রোপচারের সাহায্যে প্রত্যেক পিতাকে বন্ধ্য করে দিলে পনেরো বছরের মধ্যে ভারতে লোকবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাঁর এই প্রস্তাবের সংগে আরো কয়েকটি প্রস্তাব জুড়ে দেওয়া গেল।

যাদের সন্তান আছে এমন বিপত্নীক ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করা উচিত। স্বল্প-ধী হাবাদের বংশবিস্তারে বাধা দেবার জন্য বন্ধ্য করে দিতে হবে। রুগ্ন বৃদ্ধ পরিবার পালনে অসমর্থ

ব্যক্তিদের বিবাহে বাধা দেওয়া উচিত। নিজের জীবননাশের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য না করা উচিত। দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত অথবা বার্দ্ধক্যজনিত সংজ্ঞাহীন লোকদের মৃত্যুর পথ সুগম করে দিলে জাতির অনাবশ্যক ভার লাঘব হতে পারে।

শিক্ষা

নাগরিকদের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বীর্য ও কর্মপটুতার উপর নির্ভর করে জাতির শক্তি, তাদের সংখ্যার উপর নয়। ফ্রান্সের লোকসংখ্যা বিহারের সংখ্যার চেয়ে ১৪ লক্ষ কম। উত্তর প্রদেশের জনসংখ্যা পশ্চিম জার্মানি ও যুক্তরাজ্য থেকে ৩ কোটি বেশি। জাপানে বাস করে ৯ কোটি লোক আর উত্তর প্রদেশে ৭ কোটি। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি ও জাপান আধুনিক জগতে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তা কারো অজানা নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মোট লোকসংখ্যার চেয়ে ভারতে লোক বেশি। একমাত্র শিক্ষাই জনগণের মোহ ও জড়তা দূর করতে সক্ষম। কয়েক বছরের মধ্যে ইস্রায়েলের ইহুদীরা মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করেছে আর তারই পাশে জর্ডান এখনও জড়তা কাটিয়ে মোহমুক্ত হতে পারেনি।

শিক্ষার প্রগতি জাতির অগ্রগতির পরিচায়ক। ১৯৬১ সনের জনগণনায় দেশের শিক্ষার যে হিসাব পাওয়া গেছে তা এখানে দেওয়া হলো।

যারা সরল ভাষায় লেখা চিঠি পড়তে পারে এবং নিজেরা বন্ধুবান্ধবদের কাছে সরল ভাষায় চিঠি লিখতে সক্ষম কিন্তু কোনো লেখা পরীক্ষা পাশ করেনি, তারাই জনগণনার 'লিটারেট' বা সাক্ষর। চার বছর বা তার কম বয়সের শিশু আর যারা পড়তে পারে লিখতে জানে না তাদের সকলকে নিরক্ষর বলে গণ্য করা হয়।

শিক্ষার বিভিন্ন মানের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয়নি। নিচে যে সংখ্যা দেওয়া গেল তার মধ্যে সাক্ষর থেকে উচ্চশিক্ষিত সকলকেই ধরা হয়েছে।

ভারতে লেখাপড়া জানা লোকের মোট সংখ্যা ১০,৫৩,৩৩,২৮১; এর মধ্যে পুরুষ ৭,৭৮,২৮,১৬৩, নারী ২,৭৫,০৬,১১৮। এ হিসাবে গোয়া, দমন ও দিউর অংক বাদ পড়েছে। সংখ্যা দেখতে বেশ বড়ো। পশ্চিম জার্মানীতে ১৯৫৯ সনে যত লোক ছিল এদেশে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা তার ঠিক দ্বিগুণ। তা হলেও গর্ব করার কিছু নেই। সাড়ে দশ কোটির প্রায় সাত কোটির বিদ্যা চিঠি লেখা ও পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নিরক্ষরতা ঘুচলেও এদের মনের দৈন্য ঘোচেনি। মাঝপথে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় দু'কোটি। সাংখ্যিক অগ্রগতির পশ্চাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় উপরের হিসাব থেকে। যে জ্ঞানের সাহায্যে সভ্য জগৎ ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলে তা থেকে 'শিক্ষিত'দের নয় কোটি এখনও বহু দূরে রয়ে গেছে।

ভারতে প্রতি হাজার লোকের ২৪০ জন সাক্ষর ও শিক্ষিত। জনগণের এক চতুর্থের কম লোক লেখাপড়া জানে। পুরুষদের হাজার প্রতি ৩৪৪ জন, মেয়েদের হাজারে ১২৯ জন সাক্ষর। ১৯৫১ সনে এই হার যথাক্রমে ১৬৬, ২৪৯ প ৭৯ ছিল।

কেরলে প্রতি হাজার অধিবাসীর ৪৬৮ জন লেখাপড়া জানে। পুরুষদের হাজারে ৫৫০

এবং মেয়েদের হাজারে ৩৮৯ জন সাক্ষর। ভারতে এটাই সাক্ষরের সর্বোচ্চ হার। পশ্চিমবঙ্গে ঐ হার যথাক্রমে ২৯৩, ৪০৯ ও ১৭০। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রতি হাজার লোকের ১১০ জন, রাজস্থানের ১৫২ জন এবং উত্তর প্রদেশের ১৭৬ জনের অক্ষর জ্ঞান আছে। এই তিন রাজ্যে প্রতি হাজার নারীর যথাক্রমে ৪৩, ৫৮ এবং ৭০ জন মাত্র লেখাপড়া জানে।

সারণিতে সাক্ষরতার কলমে বেশ একটা কৌতূহলের সঞ্চার করে। আসামের মিজো পাহাড়ে নারী পুরুষের চেয়ে হাজারে ৯ জন বেশি, কেরলে বেশি ২২ জন। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা মিজো পাহাড়ে হাজারে ৪৪০, কেরলে ৪৬৮ জন; প্রতি হাজার পুরুষে ৫৩৪ জন মিজো পাহাড়ে এবং কেরলে প্রতি হাজারের ৫৫০ জন পুরুষ লেখাপড়া জানে। নারীদের হাজারে যথাক্রমে ৩৪৭ এবং ৩৮৯ জন শিক্ষিত। অঞ্চল দুটির মধ্যে ব্যবধান হাজার মাইলের বেশি, কিন্তু নারীর ও শিক্ষার হারে কী-ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য! অনগ্রসর মিজো পাহাড় সাক্ষরতায় চৌদ্দটি রাজ্য পিছনে রেখে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেবাব্রতী খ্রীষ্টান পাদ্রীদের নীরব কর্মের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। কেরলের জনগণের এক বৃহৎ অংশ খ্রীষ্টান। সেখানে শিক্ষার অগ্রগতির কারণও সম্ভব তাই।

গত দশকে আন্দামান ও নিকোবরে বৃদ্ধির হার সব চেয়ে বেশি; শতকরা ১০৫। ত্রিপুরার বৃদ্ধি শতকরা ৭৯, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বৃদ্ধি যথাক্রমে ৩৪ ও ৩৩ শতাংশ। উদ্বাস্তুদের আগমনের ছাপ পড়েছে এ সব সংখ্যায়। আন্দামানের সাক্ষরতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতি হাজার পুরুষে ৩২৪ এবং প্রতি হাজার নারীতে ১৯৪ জন সাক্ষর।

নারীর শিক্ষা

নারীর অজ্ঞতা এবং কুসংস্কার পুরুষের এগিয়ে চলার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ব্যাধির মতো মায়ের কুসংস্কার সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য, সমাজসংস্কার, শিশুর স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে নারীর সহায়তা অপরিহার্য। আধুনিক জ্ঞানে বঞ্চিত নারী প্রথা ও সংস্কারের হাত ধরে কলের পুতুলের মতো পথ চলে। এসব নারী জাতির অগ্রগতির অন্তরায়। স্ত্রীশিক্ষার যে চিত্র জনগণনার পরিসংখ্যানে ফুটে উঠেছে তা একান্ত শোচনীয়।

ভারতে নারী ২১ কোটি ২৯ লক্ষ। এদের মাত্র ২ কোটি ৭৫ লক্ষ লেখাপড়া জানে। প্রতি হাজার নারীর ৮৭২ জন নিরক্ষর। নারীদের প্রতি হাজারে জম্মু ও কাশ্মীরে ৫৩, রাজস্থানে ৫৮, মধ্যপ্রদেশে ৬৭, বিহারে ৬৯, উত্তরপ্রদেশে ৭০, উড়িষ্যায় ৮৬ জনের অক্ষর জ্ঞান আছে।

উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান পরস্পর সংলগ্ন এই পাঁচ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ১৯ কোটি ২ লক্ষ; এর মধ্যে ৯ কোটি ২৪ লক্ষ নারী। নারীদের ৬৪ লক্ষ ৮৬ হাজার অথবা ৬.৯ শতাংশ মাত্র লেখাপড়া জানে। প্রতি শ' নারীর ৯৩ জনের বেশি নিরক্ষর। দক্ষিণ ভারতের পাঁচ রাজ্য, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল ও মহারাষ্ট্রে মোট লোকসংখ্যা ১৫ কোটি ৭ লক্ষ, নারী ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ, লেখাপড়া জানা নারী ১ কোটি ৩৩ লক্ষ, সাক্ষরতার হার ১৮ শতাংশের বেশি।

উত্তর ভারতের পাঁচ রাজ্যে পুরুষের শিক্ষার হার ২৮ শতাংশ, দক্ষিণ ভারতের পাঁচ রাজ্যে ঐ হার ৩৯.৪ শতাংশ।

গুজরাটের নারীদের ১১, পশ্চিমবঙ্গে ১৭, পাঞ্জাবে ১৪ এবং আসামের ১০ শতাংশ সাক্ষর।

উপজীবিকা

ভারতে প্রায় ১৩ কোটি পুরুষ ও ৬ কোটি নারী উপার্জনশীল, অবশিষ্ট প্রায় ২৫ কোটি লোক পরনির্ভর। অনুপার্জক লোক অর্ধেকের বেশি। পরনির্ভর নারীর সংখ্যা ১৫ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

জনগণের বৃত্তি নয় ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। কোন ভাগে কত লোক তার সংখ্যা এখানে দেওয়া গেল। কৃষিজীবী, ৯,৯৫,০৯,৯৬৩; কৃষিমজুর, ৩,১৪,৮২,৩০৫। খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস, পশুপালন ও শিকার প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণকারীদের সংখ্যা, ৫১,৯০,২৯৯; গৃহশিল্পে, ১,২০,৩১,০৮৭; অন্য শিল্পে, ৭৯,৫৬,৬১৪; নির্মাণকার্য্যে, ২০,৫৫,৪৪৯; ব্যবসাবাণিজ্যে, ৭৬,৪০,০৪৫; পরিবহণকার্যে, ৩০,০৩,১৯০; অন্যান্য কার্যে, ১,৯৫,৪৮,৪১০।

উপরের সংখ্যায় দেখা যায় মোট ১৮,৮৪,১৭,৩৬২ জন উপার্জকের মধ্যে ৯,৯৫,০৯,৯৬৩ জন কৃষিজীবী। কৃষিমজুরগণও কৃষি আশ্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সুতরাং মোট ১৩,০৯,৯২,২৬৮ জন কৃষিক্ষেত্র থেকে জীবিকা অর্জন করে থাকে। প্রায় ২ কোটি লোক চাকরি এবং ওকালতি, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বন করে অর্থোপার্জন করে। তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পাশ্রয়ীদের সংখ্যা কম।

অন্যান্য সারণি প্রস্তুত হবার পূর্বে এবিষয়ে অধিকতর বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়।

বাংলায় বিদেশী (১৭৫৭—১৮৫৭)

চণ্ডী লাহিড়ী

যে সময়কে আলোচ্যকালরূপে গ্রহণ করা হয়েছে তার সূচনায় কোম্পানি শাসনের ঊষাকাল, অন্তিমদশায় সমাপ্তি। ঊষাকাল প্রভাত নয়। দিগন্তে তখনো কুয়াশা। সারাদিনের আবহাওয়া কেমন যাবে তখনো আঁচ করা সম্ভব নয়। সিরাজের পতন ঘটেছিল (১৭৫৭) ঠিক, কিন্তু ইংরেজের জয় কতখানি এবং পরিণতি কি দাঁড়াবে সে সম্পর্কে কোম্পানি নিঃসন্দিগ্ধ নয়। কারণ, এক নবাব গেলেও, তখনও ক্ষুদে নবাব অনেক। দেশের শাসক কারা হবে সেটা স্থির হয়নি, রাজস্ব কার হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং কতখানি—তার জবাব দেবে কে ?

খাস কলকাতায় অবশ্য ইংরেজরা অনেক আগেই গুছিয়ে বসেছিল। সেখানকার আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পরিচালন করত কোম্পানি জমিদারের মারফৎ। ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের দেশী ধনীরা কলকাতায় উদ্বেগহীন জীবন যাপন করতে সুরু করেছিল। কলকাতার এই সমৃদ্ধিকে মুর্শিদাবাদ ঈর্ষা করত সন্দেহ নেই। ইংরেজ ছাড়াও বাংলা দেশে সে সময় ছিল ফরাসি, ডাচ, ডেনরা, আর ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ছিল পর্তুগীজ ও আর্মেনিয়ান। এদের গতিবিধির দিকেও কোম্পানিকে সতর্ক-সশঙ্ক দৃষ্টি রাখতে হয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারী নথিপত্রে এই সময়কার বিদেশীদের খবর কিছু পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য সবই হল একতরফের চিত্র। অর্থাৎ ইংরেজ কোম্পানির সন্দিগ্ধ চোখে দেখা প্রতিদ্বন্দ্বীদের চিত্র। অপর পক্ষ, অর্থাৎ ফরাসী, ডাচ, বা ডেনরা এই সময় বাংলা দেশকে কেমন দেখেছিল তা জানা যায়নি। ঐসব দেশের মহাফেজখানায় সংরক্ষিত থাকতে পারে।

জব চার্ণক যেমন হুগলি নদীর মধ্য দিয়ে এসে সুতানটিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন, পর্তুগীজরাও এসেছিল বিদ্যাধরী নদীর মধ্য দিয়ে। ঘাঁটি বসিয়েছিল তারদায়—অধুনা লবণ হ্রদের গভীরে অবলুপ্ত। সে প্রায় চারশো বছর আগের কথা। তারদা ছিল পর্তুগীজদের ঘাঁটি এবং আশে পাশে বিশাল এলাকা জুড়ে তাদের প্রতাপ ছিল বলে তারদাকে তাদের রাজধানীও বলা যায়। একশো বছরের পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল তারদা। সপ্তগ্রামেও পর্তুগীজরা ঘাঁটী করেছিল। ব্যাণ্ডেল কথাটি পর্তুগীজ, ইংরেজি অর্থ ল্যাণ্ডিং প্লেস। ব্যাণ্ডেল কথাটি এসেছে ফার্সি বন্দর থেকে। পর্তুগীজরা বলত Bandel De Chatigao, Bandel De Ugolin অর্থাৎ চট্টগ্রাম বন্দর, হুগলি বন্দর ইত্যাদি। শেষোক্ত বন্দরটি পরে কেবল ব্যাণ্ডেল নামেই পরিচিত হয়ে ওঠে। তারদাকে বাদ দিলে সপ্তগ্রামের কাছে ব্যাণ্ডেলই ছিল তাদের প্রধান ঘাঁটী।

সারা সুন্দরবনে ছিল পর্তুগীজদের অবাধ দৌরাত্ম্য। “হার্মাদের ডরে” তখন বৌ-ঝিরা একলা পুকুরঘাটে স্নান করতে নামত না। স্ত্রীপুরুষ বলে কোন ভেদাভেদ নেই। এখান থেকে তাদের চুরি করে বা বলপূর্বক অপহরণ করে গোয়ার দাস-বাজারে তারা বিক্রী করত। আবার অন্য দেশের লোক ধরে এনে বাংলা দেশে দাস হিসেবে বিক্রী করত। দাস-ব্যবসা যে তখন

বাংলা দেশে বেশ ভালভাবেই চলত তার প্রমাণ অনেক আছে। সুন্দরবনের নদীপথে তখন মগ ও পর্তুগীজদের প্রচণ্ড প্রতাপ। জলদস্যুতা তাদের পেশা। ঝড় ও দুর্ভিক্ষে সুন্দরবন জনমানবহীন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে এটা যতখানি সত্য, পর্তুগীজদের বর্বর নির্যাতন ও দস্যুতাও ততোধিক সত্য। তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই দলে দলে লোক গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে। গ্রামকে গ্রাম তারা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়েছে, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে বন্দী করে ক্রীতদাসরূপে দূর দেশে বিক্রী করেছে। রেনেশ সাহেবের মানচিত্রে খুলনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল "ল্যাণ্ড ডিপপুলেটেড বাই দি পর্তুগীজ" বলে চিহ্নিত করা আছে। ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত মানচিত্রে ডারমণ্ডহারবারের কাছে একটি নদীর নাম দেওয়া আছে Rogue's river.

পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে দেখা যায়, পর্তুগীজরা পাদপ্রদীপের সম্মুখে নেই। অন্তরালে। কেউ দেশী জমিদার, কেউ ফরাসী বা ইংরেজ বাহিনীতে টোপাস (তোপ্দাগার কাজ) কেউ বাজনদার, কেউ রন্ধনশিল্পীর চাকরী নিয়ে বসে গেছে। বিদেশীদের মধ্যে দেশী নারীদের বিয়ে করেছে পর্তুগীজরাই সর্বাধিক। এরা ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক, কাজেই ইংরেজদের মনে সর্বদাই ভয় ছিল ফরাসিদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ইংরেজবাহিনীভুক্ত পর্তুগীজরা ক্যাথলিক ফরাসিদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না।

ইংরেজদের সক্রিয় প্রতিবেশী ছিল ডেন, ডাচ ও ফরাসীরা। ডেনদের সদর ঘাঁটী (যাকে বলা হয় আডত) ছিল ফ্রেডরিক নগর, যাকে শ্রীরামপুর বলা হয়। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোন দিকে তাদের লক্ষ্য ছিল না। ডাচরা রাজনৈতিক শক্তি করায়ত্ব করেছিল সিংহলে, পর্তুগীজরা গোয়ায়। বাংলায় বাণিজ্য ছাড়া আর কোন আগ্রহ তাদের ছিল না। হুগলি নদীর আশেপাশে কিছু অঞ্চল ছাড়া দূরবর্তী স্থানে তারা প্রবেশ করতে পারেনি। তাদের কথা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলকাতার নথিপত্রে পাওয়া যায় মাত্র দু-একবার। তাও খুব গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারে নয়। একবার কোম্পানির কয়েকজন সেনাবাহিনীতে ছাউনিতে প্রত্যাবর্তনকালে ভ্রমবশতঃ ফ্রেডরিকনগর এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানকার ডেন জমিদার তাদের প্রহার করে। পরে প্রধান ডাচ কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করায় ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয় (১৭৬৩)। পলাশী যুদ্ধের ঠিক পরেই ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসিদের শত্রুতা চরম অবস্থায় পৌঁছায়। ডেনরা এ সময় গোপনে ফরাসিদের রসদ যুগিয়ে সাহায্য করে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে 'কিং অব ডেনমার্ক' নামক জাহাজটি কোম্পানির সৈন্যরা আটক করে। যাই হোক ডাচরা ইংরেজদের সঙ্গে শত্রুতার পক্ষপাতী ছিল না। তারা শ্রীরামপুর থেকে গভর্ণর ক্র্যাগকে অপসারিত করে। সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-ডাচ বিরোধেরও অবসান ঘটে। অবশ্য ফরাসিদের প্রতি ডেনদের পক্ষপাতিত্বের ঘটনা পরেও ঘটেছে। ১৭৬৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী কোম্পানি জনৈক ইংরেজ কর্মচারীকে লিখছেন—

"ড্যানিশ ফ্যাক্টরীর প্রধান কর্মকর্তা মিঃ ডেমারসেজ ফ্রান্সের নাগরিক এবং সেজন্য ইঙ্গ-ডেন সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি ফ্রান্সের অনুকূলে ডেনদের উপর এক অশুভ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন বলে আপনি যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সেটা যুক্তিসঙ্গত। অতএব আপনাকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, আপনি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ডেনদের চালচলনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবেন। কিন্তু

যতদূর সম্ভব চরম ব্যবস্থা অবলম্বন না করে চলতে চেষ্টা করবেন।"

কোম্পানির কনশালটেসনে (২১শে জুলাই ১৭৬৩) ডেনদের কথা আরও একস্থানে উল্লিখিত হয়েছে। হুগলির নতুন ফৌজদার ডেনদের কাছে তাঁর প্রাপ্য ত্রৈমাসিক নজরাণা দাবী করে বসে। ডেনদের বক্তব্য,—তারা পূর্বেকার ফৌজদারকে এই নজরাণা দিয়েছে। অতএব নতুন ফৌজদারের দাবি অযৌক্তিক। ডেনরা এই ব্যাপারে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে। কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট কলকাতার বোর্ডের বৈঠকে ডেনদের এই চিঠিখানি পেশ করেন এবং বৈঠকে ফৌজদারকে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য নির্দেশও দেন।

ডাচরা বাংলা দেশের মাটিতে নিজেদের অধিকার কায়েম করার জন্য চেষ্টার ক্রটী করেনি। স্বদেশে যে রকম অসমসাহসিকতার সঙ্গে একদা তার দুর্ধর্ষ স্পেনবাহিনীর আঘাত প্রতিহত করেছিল, বাংলা দেশেও তারা ইংরেজ কোম্পানির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল নির্ভয়ে। ১৭৫৯ সালে তারা ইংরেজদের সমূলে বিনাশ করবার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিন্তু কর্ণেল ফোর্ডের তৎপরতার জন্য ইংরেজরা রক্ষা পায়। এর পরেও ক্রমবর্ধমান শক্তি সত্ত্বেও ডাচরা লবণ ও আফিমের ব্যবসায়ে তাদের অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা করে। ইংরেজ কোম্পানির গোমস্তারা ডাচদের বাজার থেকে মাল কেনায় বাধা দেয়। ডাচরা ইংরেজ কোম্পানির লণ্ডনস্থ অফিসে সেজন্য অভিযোগ পেশ করে। কিন্তু তৎসত্বেও দেখা যায় ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজদের যে তিক্ততা ছিল ডাচদের সঙ্গে ততখানি শত্রুতা ছিল না।

১৭৫৫ সালের ৩১শে জানুয়ারী কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্ট কলকাতার বোর্ডকে এক পত্রে জানিয়েছেন যে, মিঃ উগান নামক ব্যক্তির হঠাৎ ধনবৃদ্ধির কারণ স্বরূপ আপনারা যা লিখেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ঐ ব্যক্তি ডাচদের হাতে আমাদের ঢাকার মাল অর্পণ করে। এই মাল থেকে কোম্পানির লাভ হত শতকরা পনেরো টাকা। বেশ কিছুকাল যাবত আমাদের কর্মচারী কর্তৃক শত্রুর হাতে আমাদের মাল তুলে দেওয়ার রীতি চলে আসছে। বর্তমানে কোম্পানির ক্ষতিসাধন করে আমাদের কর্মচারীরাই সে কাজ করছে। যে মালের জন্য আমরা আগাম দাদন ও পত্তনি দিয়েছি সেই মাল। বিশেষতঃ সবচেয়ে সেরা জিনিস তারা ডাচদের হাতে তুলে দিচ্ছে।"

এরপর ডাচদের উল্লেখ আছে ১৭৬২ সালে। ঐ বছর আফিঙের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সঙ্গে ডাচদের বিরোধ প্রবল আকার ধারণ করে, ডাচরা এতে প্রায় কোণঠাসা হয়ে যায়। মরিয়া হয়ে ডাচ ষ্টেটস জেনারেল বিপুল সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করবেন বলে হুমকি দেন। এদিকে ফরাসিদের সঙ্গে ইংরেজরা তখন যুদ্ধরত। কোম্পানির কলকাতার কর্তৃপক্ষ ডাচদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে মোকাবিলা করার পক্ষপাতী হলেও লণ্ডন থেকে এল উল্টো আদেশ। বৃটিশ সরকারের অন্যতম সচিব আর্ল অব বিউট কোম্পানিকে জানালেন—"The King and States General were desirous of having the disputes between the two Companies adjusted by Commissaries." কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্ট কলকাতার বোর্ডকে নির্দেশ দিলেন—ডাচদের প্রতি কোনরূপ শত্রুতামূলক আচরণ করবে না। পরন্তু দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির

জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যাবে। যদি নবাব বাংলায় ডাচদের উপর অত্যাচার করে বা তাদের ব্যবসায় বন্ধ, সুবিধা হরণ বা সম্পত্তি কেড়ে নেবার চেষ্টা করে তবে ডাচদের দুর্দশারোধের জন্য দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করবে। যদি নবাব এতে কর্ণপাত না করে তবে তোমরা সর্বশক্তি দিয়ে ডাচদের আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করবে। আমরা আন্তরিকভাবে চাই, ডাচরা পূর্ণ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ভোগ করুক এবং আমাদের সমান নিরাপত্তা ভোগ করুক।" পরে পাটনায় কোম্পানি বোর্ড প্রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় ইঙ্গ-ডাচ বিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

১৭৫১ সালে জার্মানরা বাংলাদেশে নতুন ঘাঁটি স্থাপনের চেষ্টা করে। তাদের এই উদ্যোগ বন্ধের জন্য কোম্পানি বদ্ধপরিকর হন। ইংরেজ কোম্পানির বোর্ড নির্দেশ জারী করলেন—"এম্বডেন থেকে আগত আলামানদের (জার্মান) কোন জাহাজকে কোন ইংরেজ পাইলট পথ দেখিয়ে আনতে পারবে না। যদি ডাচ বা ফরাসি পাইলটরা জার্মান জাহাজকে পথ প্রদর্শন করতে চেষ্টা করে তবে সেই জাহাজগুলিকে যেন ডুবিয়ে বা ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

১৭৫৭ সালে কোম্পানির লণ্ডনস্থ কোর্টের নির্দেশ এল—জার্মানদের সঙ্গে যেন কোনরকম বাণিজ্যিক লেনদেন না হয়। ১৭৬৩ সালের ৯ই মার্চ তারিখে লণ্ডনস্থ প্রুশিয়ানদের সঙ্গেও বাণিজ্যিক লেনদেন না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বাংলাদেশে প্রুশিয়ানদের একটি ছোট ঘাঁটী পূর্ব থেকেই ছিল। যদিও তার নামডাক তেমন ছিল না। পলাশী যুদ্ধের ত্রিশ বৎসর পর রেনেল হুগলি নদীর যে মানচিত্র অঙ্কন করেন তাতে "প্রুশিয়ান গার্ডেন, এম্‌ডেন কোম্পানি" চিহ্নিত একটি স্থান ফরাসি চন্দননগরের পাশে দেখানো হয়েছে।

রাশিয়ানদের উল্লেখ পাওয়া যায় ১৭৬৩ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখের লণ্ডনস্থ কোর্টের একখানি চিঠিতে। তদানীন্তন রুশ সম্রাজ্ঞী বৃটিশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেন কয়েকজন রুশ নৌ-অফিসারকে বৃটিশ জাহাজ থেকে উচ্চতর জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করার জন্য। (…in order to their prefecting themselves in the science and business of navigation)। তদনুসারে সেক্রেটারী অব ষ্টেট লর্ড হ্যালিফ্যাক্স কোম্পানিকে ঐ রুশ অফিসারদের ভারতে নিয়ে যাবার অনুরোধ করেন। তাঁরা সত্যিই ভারতে এসেছিলেন কিনা এবং ফিরে গিয়ে কোন বিবরণ পেশ করেছিলেন কিনা জানা যায়নি।

ফরাসিদের ভারতে আগমন, সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা, ইংরেজদের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনা সর্বজনবিদিত। ইংরেজদের আগে তারা ভারতে আসে এবং ইংরেজদের পরে তারা ভারত ছেড়ে চলে যায়। বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের মত ফরাসিরা তেমন বেপরোয়া ছিল না এবং তাদের আর্থিক সঙ্গতিও ভাল ছিল না। ডুপ্লে চেষ্টা করেছেন অনেক, শেষ পর্যন্ত দায়ী করেছেন সর্বনাশা দারিদ্রকে। ১৭৫৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডুপ্লে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বেকনকোর্টকে যে চিঠি দেন তাতে অবস্থার ব্যাখ্যা করা হয়েছে সুন্দরভাবে—Private trade could be easily developed here, but so long as the Company sends out beggars as employes and officers who have not a shirt put on their backs, commerce will languish and the colonies will servive only with difficulty. পক্ষান্তরে ইংরেজদের অর্থসাচ্ছল্য, টাকা বিনিয়োগ ক্ষমতার

তিনি প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ইংরেজদের রাজনৈতিক অধিকারলাভ ছিল ফরাসিদের চক্ষুশূল। ভারতে ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে মাত্র একপক্ষ থাকবে দুপক্ষের সহাবস্থান অসম্ভব। "Two swords cannot be in one seath."

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ছাড়াও আর এক ইংরেজ কোম্পানি বাংলাদেশে বাণিজ্য করার চেষ্টা করে। ইম্পিরিয়াল ওস্টেণ্ড কোম্পানি ১৭২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাঁকীপুরে তাদের আড়ৎ ছিল। কিন্তু কলকাতায় তারা প্রবেশ করতে পারেনি। পলাশী যুদ্ধের পরেও বহুদিন পর্যন্ত এই কোম্পানি ও তার ঘাঁটির অস্তিত্ব ছিল। তবে নিছক অস্তিত্ব, আর কিছু নয়। আঠারো শতকে বাংলায় আমেরিকানদের কোন খবর পাওয়া যায় না। ফরেষ্টি অবশ্য তাঁর সম্পাদিত ক্লাইভের জীবনীতে ও তাঁরই জবানীতে বাংলায় সদ্য আগত বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাদের কোন পরিচয় দেন নি। উনিশ শতকে আমেরিকান জাহাজ কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য বন্দরে ব্যাপকভাবে নোঙর করেছে। কর্নওয়ালিস ভারতে আসার আগে আমেরিকায় বৃটিশ স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য লড়াই করেছিলেন। তারই পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে ভারতে গভর্ণর জেনারেলের পদ দেওয়া হয়। ভারতে আমেরিকান জাহাজী ব্যবসায় উনিশ শতকে এত বিস্তারলাভ করে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শঙ্কিত হয়ে পড়েন। বোষ্টনের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক উভয় দেশকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় করে তুলেছিল। কলকাতায় প্রথম কৃত্রিম বরফ আমদানি হয় মার্কিন জাহাজে (ষ্টকলারের স্মৃতিকথা)। বোম্বাইয়ে একটি মার্কিন ক্রিশ্চান মিশন বহুকাল থেকেই ছিল। শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পাদরী উইলিয়াম ওয়ার্ড ঐ মিশনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে আমেরিকা যান এবং ভারতের রীতিনীতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথা ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি আমেরিকানদের বহুল পরিমাণে ওয়াকিবহাল করেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারানাথ ভট্টাচার্য বর্ধমান জেলার অম্বিকাকালনা গ্রামে এক সংস্কৃতজ্ঞ বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তারানাথের পিতার নাম ছিল কালিদাস সার্বভৌম। শৈশবেই তারানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। ৫ বৎসর বয়সের সময় কালনার পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট তারানাথের বিদ্যারম্ভ হয়। পাঠশালার শিক্ষনীয় সমুদয় বিষয় ৮ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্বেই তারানাথ আয়ত্ত করেন। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি পিতা কালিদাস সার্বভৌম ও জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিণীপ্রসাদ ন্যায়রত্নের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অমরকোষ প্রভৃতি পাঠ করেন। বাল্যকাল হইতেই তারানাথ অসাধারণ মেধাশক্তির পরিচয় দান করেন। তদানীন্তন কালের বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু রামকমল সেনের (১৭৮৩—১৮৪৪) সহিত কালনার এই ভট্টাচার্য পরিবারের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। একবার কার্যোপলক্ষে রামকমল কালনায় ভট্টাচার্য বাড়ীতে উপস্থিত হন। এই বাড়ীতে আসিয়া তিনি তরুণ তারানাথকে তাঁহার অপর এক আত্মীয়ের সহিত সংস্কৃত ভাষায় তর্করত দেখিতে পান। অল্পবয়স্ক তারানাথের সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত রামকমল জানিতে পারেন যে সে তাঁহার বন্ধু কালিদাসের পুত্র। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এই বালক যে কালে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে ইহা বুঝিতে পারিয়া রামকমল কালিদাসকে অনুরোধ করেন যেন তারানাথকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। দেওয়ান রামকমল সেন (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পিতামহ) কলিকাতার একজন মান্যগণ্য নাগরিক ছিলেন, তদুপরি তিনি ছিলেন ভট্টাচার্য পরিবারের বিশেষ হিতৈষী। রামকমলের অনুরোধে কালিদাস সার্বভৌম তারানাথকে তাঁহার সহিত সংস্কৃত কলেজে পাঠার্থে কলিকাতা পাঠাইতে সম্মত হন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তারানাথ সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। ইহার মাত্র ছয় বৎসর পূর্বে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

'অলঙ্কার' শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় তারানাথ কলেজে কাব্য, বেদান্ত এবং জ্যোতিষও অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে কাব্য, জ্যোতিষ ও অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন যথাক্রমে নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও যোগধ্যান মিশ্র। তারানাথের অধ্যয়নানুরাগ ও মেধাশক্তি দেখিয়া তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তারানাথ ন্যায় শ্রেণীতে উন্নীত হন, এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ন্যায়ের অধ্যাপক ছিলেন পণ্ডিত নিমচাঁদ শিরোমণি। চারি বৎসর কাল ন্যায় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া তারানাথ শুধু ন্যায় নহে সমগ্র ষড়্দর্শনই বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। তারানাথ যখন ন্যায় শ্রেণীর ছাত্র তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় নিম্নতর অলঙ্কার শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে তারানাথের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ তারানাথ ঈশ্বরচন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও নিজ বিদ্যায়তনের এই কৃতী ছাত্রকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। পাঠে সাহায্য

লাভের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই তারানাথের বাসস্থানে যাইতেন। ছাত্রাবস্থাতেই তারানাথ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তারানাথ সংস্কৃত কলেজের সর্বোচ্চ শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করিলে সরকারী শিক্ষা পরিষদ (Education council) তারানাথকে "তর্কবাচস্পতি" উপাধি দান করেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তারানাথ 'ল কমিটি'র দ্বারা আয়োজিত মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজে ও স্বাধীনভাবে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া হিন্দু আইনে তিনি গভীর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বর্ধমানের সদর আমিন (মুন্সেফ) নিযুক্ত করেন। তারানাথ এই সরকারী পদ গ্রহণ না করিয়া অধ্যয়নার্থ কাশী গমন করেন। কাশীতে কয়েক বৎসর বিভিন্ন পণ্ডিতের নিকট ন্যায়, বেদান্ত, মীমাংসা, সাংখ্য, গণিত, ফলিত জ্যোতিষ ও পাণিনি অধ্যয়ন করিয়া অশেষ শাস্ত্রবিৎ বলিয়া পরিগণিত হন। অতঃপর স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া তারানাথ একটি চতুষ্পাঠি খোলেন। বাঙ্গলাদেশে ধনী ব্যক্তিদের দানে সাধারণতঃ পণ্ডিতেরা চতুষ্পাঠি পরিচালনা করেন। স্বাধীনচিত্ত তারানাথ কাহারও অনুগ্রহদত্ত দানে চতুষ্পাঠি পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, নিজের ও অসংখ্য ছাত্রের গ্রাসাচ্ছদনের ব্যয় নির্বাহার্থে তিনি ব্যবসার আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি স্বগ্রামেই সহস্রাধিক তন্তুবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া বিভিন্ন স্থানে বিক্রয়ার্থ পাঠাইতেন। এই সব বস্ত্র গোযান দ্বারা কাশী, মির্জাপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানসমূহে প্রেরিত ও বিক্রিত হইত। ইহার পর তিনি নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া উহা বাঙ্গলা দেশে বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ঢেঁকিতে চাউল ছাঁটাইয়া উহা বিক্রয়ের ব্যবসাতেও তিনি হাত দেন। এইভাবে ব্যবসায়ে তারানাথ যে আয় করিতেন তাহা হইতেই তাঁহার চতুষ্পাঠির ছাত্রদের ও নিজের ভরণপোষণ হইয়া যাইত। ব্যবসায় পরিচালনের জন্য অক্লান্তকর্মী তারানাথের নিজের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কোন বিঘ্ন হইত না। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যু হইলে এডুকেশন কৌন্সিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালকে এই শূন্যপদের জন্য একজন উপযুক্ত পণ্ডিত নির্বাচন করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মার্শালের অধীনে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। মার্শাল ৯০৲ টাকা বেতনে এই পদটি বিদ্যাসাগরকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। নির্লোভ ও উদারহৃদয় বিদ্যাসাগর এই পদের জন্য তারানাথের নাম প্রস্তাব করেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অম্বিকা কালনায় গমন করিয়া তারনাথকে এই পদ গ্রহণে সম্মত করান। তারানাথের চাকুরী করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অনুজতুল্য বিদ্যাসাগরের এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে সম্মতি দেন। বিদ্যাসাগর প্রমুখাৎ তারানাথের চাকুরী গ্রহণের সম্মতি পাইয়া মার্শাল এডুকেশন কাউন্সিলের নিকট তারানাথের নাম প্রস্তাব করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লেখেন—"In every department he is in my opinion, far above, mediocrity and in several branches of science I doubt if any Pandit of Bengal can compete with him, namely in the Upanishad of vedas, in Vedanta, Sankhya, Memangsa, Jyotisha and Patanjela." (দ্রঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড)।

এডুকেশন কাউন্সিল মার্শালের পরামর্শে মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে তারানাথকে ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তিনি কর্মে যোগদান করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর সংস্কৃত কলেজের দর্শন ও ব্যাকরণের প্রধান অধ্যাপক থাকা কালে ৬২ বৎসর বয়সে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার বেতন ১৫০৲ টাকা। অবসর গ্রহণের পর তিনি আজীবন ৭০৲ টাকা পেন্সন ভোগ করেন।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। সেক্রেটারী রসময় দত্তের সহিত মতদ্বৈধতার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে যখন পদত্যাগ করেন তখন তিনি তাঁহার কর্মভার তারানাথের হস্তে অর্পণ করেন। নূতন এসিষ্ট্যান্ট সেক্রেটারী নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তারানাথ ব্যাকরণ অধ্যাপকের দায়িত্ব সহ প্রায় ছয়মাস কাল এই পদেরও দায়িত্ব বহন করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তারানাথ অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন। প্রত্যহ উপাসনাদির পর তিনি স্বপাক নিরামিষ আহার করিতেন। সামাজিক ব্যাপারে তিনি উদার মতাবলম্বী ছিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (John Drinkwater Bethune 1801—1851) একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলে তারানাথ নিজ কন্যা জ্ঞানদাকে ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন, সমাজের ভয়ে যে সমস্ত অভিভাবক কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সম্মত হইতেন না—তাঁহাদিগকে তিনি বুঝাইয়া দিতেন যে বালিকাদের শিক্ষাদান শাস্ত্রসম্মত। তারানাথের ন্যায় একজন অতি নিষ্ঠাবান মহাপণ্ডিতের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া কলিকাতা সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিও কন্যাদের শিক্ষাদানে অগ্রসর হন। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে তারানাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রভূত সহায়তা দান করেন, বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ তারানাথই ঈশ্বরচন্দ্রকে সংগ্রহ করিয়া দেন। তারানাথের পরামর্শে বহু পণ্ডিত বিধবা বিবাহ বিধির স্বপক্ষে আসেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন প্রেরিত হয় পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য তারানাথ তর্ক বাচস্পতি তাহার অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন। এইজন্য বিদ্যাসাগরের ন্যায় তারানাথকেও অশেষ সামাজিক নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। বাঙ্গলা ১২৬৩ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগর সুহৃৎ রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলিকাতা সুকিয়া ষ্ট্রীটস্থ গৃহে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বালবিধবা কালীমতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই যুগান্তকারী প্রথম বিধবা বিবাহ সভায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যাসাগর-পুত্র নারায়ণচন্দ্র যখন একটি বিধবার পাণিগ্রহণ করেন তখন বিদ্যাসাগর পরিবারের কোন আত্মীয়া লোকাচারসম্মত বধূবরণে সম্মত হন নাই, তারানাথ তর্কবাচস্পতির সহধর্মিণীই এই বধূবরণ কার্য সম্পন্ন করেন। তারানাথ বাল্যবিবাহেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি স্বীয় কন্যাদের বিবাহ দেন নাই। বিদ্যাসাগরের ন্যায় তারানাথও বহুবিবাহ-বিরোধী ছিলেন। তারানাথ দুইবার বিপত্নীক হইয়া তৃতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেন কিন্তু কোন পত্নীর জীবিতাবস্থায় অন্য পত্নী গ্রহণ করেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়া একটি পুস্তক রচনা করিলে তারানাথও 'বহুবিবাহবাদ' নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রমাণ করেন যে বহুবিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে।

পরম সুহৃদ বিদ্যাসাগরের সহিত তারানাথের এই প্রথম বিরোধ উপস্থিত হয়। বিদ্যাসাগরের অনুজ পণ্ডিত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন তারানাথকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তারানাথ তাঁহাকে বলেন যে "বহুবিবাহ অতি কুপ্রথা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ না হইলেও এই প্রথা হইতে জগতের নানা প্রকার অনিষ্ট হইতেছে এবং আমাদের সমাজের এতদূর বল নাই যে সমাজ হইতে এই কুপ্রথা নিবারণ হইতে পারে ; এই কারণে রাজদ্বারে আবেদন সময়ে ঐ আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করি। কিন্তু তা বলিয়া ইহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা আমি বলিতে পারি না।" (বিদ্যাসাগর জীবন চরিত, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পৃঃ ২০৬-৭, বুকল্যাণ্ড সংস্করণ)।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তারানাথ ভাস্করাচার্য রচিত 'লীলাবতী' নামক বীজগণিত পুস্তক সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ভট্টোজী দীক্ষিতের শব্দকৌস্তভের সারাবলম্বনে কৌণ্ড ভট্ট রচিত 'বৈয়াকরণ ভূষণ সূত্রসারঃ' সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত শিক্ষার্থিদের জন্য তারানাথ বাঙ্গলায় 'বাক্যমঞ্জরী' নামে একটি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এই বৎসরই তিনি বিভিন্ন ব্যাকরণ পুস্তকের সার সংগ্রহ করিয়া 'শব্দার্থ রত্ন' নামে সরল সংস্কৃত ভাষায় একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন (১৮৫১)। তারানাথ সম্পাদিত ও রচিত এই পুস্তকগুলি বিশেষরূপে সমাদৃত হইয়াছিল।

কালনা ত্যাগ করিয়া আসিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা কালে তারানাথ পুস্তক রচনা ও স্বগৃহে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদানে ব্রতী থাকিলেও ব্যবসায় ত্যাগ করেন নাই। কালনায় বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কারের দোকান, সিউড়িতে বস্ত্রের দোকান, বীরভূমে ১০,০০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ, ৫০০ গরু রাখিয়া উৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় বিক্রয় প্রভৃতি কাজে তাঁহার বহু অর্থ নিয়োজিত থাকিত। অর্থোপার্জনের নানা উপায় সম্বন্ধে তারানাথের বুদ্ধি প্রখর ছিল কিন্তু তিনি মনুষ্যচরিত্রাভিজ্ঞ ছিলেন না, অসাধু কর্মচারীদের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করার ফলে তাঁহার ব্যবসায়ে প্রচুর ক্ষতি হয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি লক্ষাধিক টাকার ঋণজালে জড়াইয়া পড়েন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল (E. B. Cowell, 1826—1903)। কাউয়েল তারানাথের একান্ত গুণমুগ্ধ ছিলেন। ইনি উদয়নাচার্য রচিত 'ন্যায় কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (সংস্কৃত কলেজের অপর একজন অধ্যাপক) ও তারানাথ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন : "The two most learned Hindus I have met during my residence in India"। কাউয়েল তারানাথকে সংস্কৃতের জীবন্ত বিশ্বকোষ (Encyclopaedia) জ্ঞান করিতেন। লোকের নিকট তিনি বলিতেন যে সংস্কৃতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যাহা তারানাথের কণ্ঠস্থ নহে।

দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি ছাত্র ও জনসাধারণের সুবিধার্থে মুদ্রিত করাইবার জন্য এই সময় কাউয়েল তারানাথকে পরামর্শ দান করেন। ইতিপূর্বে তারানাথ মাঘ রচিত 'শিশুপাল বধ', ভারবি রচিত 'কিরাতার্জুনীয়ম্' (১৮৪৭), ভবভূতি রচিত 'মহাবীর চরিতম্' (১৮৪৭) ও কাঞ্চনাচার্য রচিত 'ধনঞ্জয় বিজয়ম্' (১৮৫৭) স্বকৃত টিকাসহ প্রকাশ করিয়া অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। পরম হিতৈষী সুহৃদ ও উপরিতন কর্মচারী কাউয়েলের পরামর্শ শিরোধার্য

করিয়া তারানাথ অতঃপর সংস্কৃত পুস্তক স্বকৃত টিকাসহ সম্পাদন ও সুষ্ঠু মুদ্রণের কার্যে ব্রতী হন। আমৃত্যু এই কার্যে রত থাকিয়া তিনি প্রচুর বিত্ত অর্জন করেন এবং উত্তমর্ণদের প্রাপ্য সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া যান। সুষ্ঠু সম্পাদন ও নির্ভুল মুদ্রণের জন্য তারানাথ প্রকাশিত পুস্তকগুলি ভারতে ও বিদেশে বিশেষভাবে আদৃত হয়। তারানাথ যে সমস্ত পুস্তক স্বকৃত টিকাসহ সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন তাহাদের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য : বাণভট্ট—কাদম্বরী (১৮৭১), দণ্ডী—দশকুমার চরিতম্, হিতোপদেশঃ (১৮৭৬), ঈশ্বরকৃষ্ণ—সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী (১৮৭১), জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ—ভামিনী বিলাস (১৮৭২), ভট্টনারায়ণ—বেণী সংহার (১৮৬৮), কালিদাস—কুমারসম্ভবম্ (১৮৮৬), কালিদাস—মালবিকাগ্নি মিত্রম্ (১৮৭০), কেদারভট্ট—বৃত্তরত্নাকর ছন্দোমঞ্জরী (১৮৮৭), বিশাখ দত্ত—মুদ্রারাক্ষসম্ (১৮৭০), বোপদেব—কবি কল্পদ্রুম (১৮৭২), সর্বদর্শন সংগ্রহঃ (১৮৭২) ইত্যাদি। মধুসূদন সরস্বতী রচিত সিদ্ধান্তবিন্দু গ্রন্থটি তারানাথ সরল সংস্কৃত ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। উহা 'সিদ্ধান্ত বিন্দুসার' নামে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

কাউয়েলের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে সরকারী শিক্ষা বিভাগ ভট্টোজী দীক্ষিত রচিত সিদ্ধান্ত কৌমুদী ব্যাকরণ প্রকাশের জন্য সম্পাদককে ২,০০০ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে চান, গভর্ণমেণ্ট হইতে দুইশত পুস্তক ক্রয়েরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কাউয়েল গভর্ণমেণ্টকে জানান যে তারানাথই এই কার্যের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ("I question if any one is equal to him in Bengal."—দ্রঃ সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯)। শিক্ষাবিভাগ কাউয়েলের পরামর্শ গ্রহণ করায় তারানাথের উপর এই কর্ম ন্যস্ত হয়। পাণিনীয় সূত্রগুলি ভট্টোজীর 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী'তে সুবিন্যস্তভাবে লিখিত হইলেও তারানাথ উহাকে আরও সুগম করিবার নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় ইহার একটি টিকা রচনা করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবর্তিত Bibliotheca Indica গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' তারানাথ রচিত সরল টিকাসহ ১৮৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাউয়েল এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। দেশে ও বিদেশে এই গ্রন্থটি উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। জার্মান দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই পুস্তকটি পাঠ্য নির্বাচিত হয়। এই সম্বন্ধে কাউয়েল গভর্ণমেণ্টকে লেখেন : "The book is well done and it is a great boon to Sanskrit Learning that we have now a standard edition of such a valuable work." (দ্রঃসংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯)। ১৮৭০-৭১ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তারানাথ সম্পাদিত সিদ্ধান্ত কৌমুদীর ২য় ও ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তারানাথ পাণিনীয় ব্যাকরণের সারাবলম্বনে 'আশুবোধ ব্যাকরণম্' নামে সরল সংস্কৃত ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ রচনা করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডষ্টুকর (Theodore Goldstucker) এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অকারাদি ক্রমে ধাতুরূপ সাধনের জন্য তারানাথ 'ধাতুরূপাদর্শ' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন।

১৮৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে তারানাথ 'শব্দস্তোম মহানিধি' নামে পাঁচ খণ্ডে একটি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই অভিধানটি পুনর্মুদ্রিত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকটির চতুর্থ

সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

তারানাথের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁহার বাচস্পত্য অভিধান (বাচস্পত্যম্)। ১৮৭৩ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে সার্ধ পঞ্চসহস্র পৃষ্ঠার (ডিমাই কোয়ার্টার) ছয় খণ্ড এই অভিধান তারানাথের একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত ও মুদ্রিত হয়। এই অভিধান মুদ্রণে প্রায় ৮০,০০০ টাকা ব্যয় হয়। তারানাথ এই ব্যয়ভার একাই বহন করেন। এই অভিধানে বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত সকল শব্দ প্রয়োগ বিধিসহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন শব্দার্থ প্রামাণ্য উদ্ধৃতিসহ ২৫।৩০ পৃষ্ঠায় এই অভিধানে সন্নিবিষ্ট হয়। বাচস্পত্যের ন্যায় এইরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃত অভিধান ইহার পূর্ব ও পরে আর রচিত হয় নাই। সম্প্রতি কাশীধামস্থ চৌখম্বা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে (১৯৬২)। সংস্কৃতচর্চার ইতিহাসে তারানাথের একক চেষ্টা প্রসূত বাচস্পাত্যাভিধান রচনা একটি অতি উল্লেখনীয় ঘটনা। বাচস্পাত্যাভিধানের উপযোগিতা বর্তমানেও বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। দেশে ও বিদেশে অদ্যাপিও ইহা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

স্মৃতিশাস্ত্রেও তারানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি গয়ামাহাত্ম্য ও গয়াশ্রাদ্ধ পদ্ধতি নামে দুইখানি পুস্তক লিখিয়া উহার ৩,০০০ খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করেন। পরে তিনি সংস্কৃতে গয়াশ্রাদ্ধ পদ্ধতিঃ (১৮৭২), তুলাদানাদি পদ্ধতি (১৮৬৬), গায়ত্রী-ভাষ্যম্ (১৮৭৫) নামে নিত্যপ্রয়োজনীয় তিনটি গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণের পর পুস্তক প্রকাশের কাজে তারানাথ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থে বাটি ক্রয় করিয়া তিনি একটি অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বহু ছাত্রকে আহার ও আশ্রয় দিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বুল্যার (Johann Georg Buller 1831-91) তাঁহার 'ফ্রী সংস্কৃত কলেজ' পরিদর্শন করিয়া তাঁহার কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেন ও বলেন যে সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ উচ্চশিক্ষাদান পদ্ধতি তিনি কোথাও দেখেন নাই। তারানাথ পরের উপকার করিতে সর্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। দরিদ্রকে অন্নদান ও আত্মীয়স্বজনকে স্বয়ং রন্ধন দ্বারা ভূরিভোজনে তৃপ্ত করা তাঁহার অন্যতম ব্যসন ছিল।

মাতৃভাষায় তারানাথের সবিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রথম জীবনে তিনি কবির দল ও হাফ্ আখড়াই-এর জন্য বাঙ্গলা গান বাঁধিয়া দিতেন। একসময়ে তিনি একটি বাঙ্গলা পঞ্জিকা প্রকাশ করেন; ইহার ভূমিকায় তিনি ভাস্করাচার্য, আর্যভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতদের গ্রহগণের আকার ও গতিবিধি সম্পর্কিত মতগুলি বাঙ্গলায় পয়ার ছন্দে প্রকাশ করেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে 'লাঠি থাকলে পড়ে না' নামে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি একটি পুস্তিকা রচনা করেন। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১—১৮৭০) মহাশয় তাঁহার মহাভারত অনুবাদ কার্যে বিশেষতঃ দুরূহ কূটার্থসমূহের মর্মগ্রহণে তারানাথের পরামর্শ লইতেন। কালীপ্রসন্ন মহাভারত অনুবাদের উপসংহারে স্বয়ং লিখিয়াছেন যে 'কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এরূপ না করিলে মহাভারতের দুরবগাহ কূটার্থের

কখনই প্রকৃষ্টানুবাদে সমর্থ হইতাম না।"

তারানাথের প্রথমা পত্নী বিবাহের ছয় মাস পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে তিন পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে। ১ম ও ৩য় পুত্র দীর্ঘজীবী হন নাই। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর তারানাথ তৃতীয়বার বিবাহ করেন, ইঁহার দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত দ্বিতীয় পুত্র জীবানন্দ ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জীবানন্দ সংস্কৃত কলেজ হইতে বি. এ পাশ করেন ও বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন। তারানাথ দেশে ও বিদেশের সমগ্র বিদ্বৎ-মণ্ডলীর পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। বহু দেশীয় রাজন্যগণ তারানাথকে গুরুর ন্যায় মান্য করিতেন। মহাপণ্ডিত পিতার যোগ্যপুত্র জীবানন্দকে কাশ্মীর ও নেপালের মহারাজা অতি উচ্চ বেতনে কোন উপযুক্ত কাজে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন। জীবানন্দ এই প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া পিতার পদাঙ্কানুসরণে সংস্কৃত পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ১০৭খানি সংস্কৃত পুস্তক স্বীয় টিকাসহ ও ১০৮খানি পুস্তক বিনা টিকায় সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। সংস্কৃত পুস্তক প্রচার দ্বারা জীবানন্দ বিদ্যাসাগর অক্ষয়কীর্তি অর্জন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি পৈশাচী প্রাকৃতে রচিত সোমদেবের কথাসরিৎসাগর সংস্কৃত গদ্যে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (১৮৮৩)।

পুত্র কৃতবিদ্য হইয়াছে দেখিয়া তারানাথ সংসার ত্যাগ করিয়া কাশী গমন করেন। কাশী যাত্রার পূর্বে তিনি তাঁহার ব্যবসায় সংক্রান্ত সমস্ত ঋণ এমনকি মফঃস্বলের কর্মচারীদের কৃত ঋণও কড়াক্রান্তিতে শোধ করিয়া যান, বহু উত্তমর্ণের উত্তরাধিকারীদিগকে তিনি বহু আয়াসে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করেন এবং তাঁহাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য অর্থ তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করেন। বহু ঋণ তামাদি হইয়া গিয়াছিল, উত্তরাধিকারীরাও এই পাওনার বিষয় জানিত না। আইনের ফাঁকির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া তারানাথ লোকসমাজে সততার এক অভিনব দৃষ্টান্ত রাখিয়া কাশীযাত্রা করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭ই আষাঢ় কাশীধামে একমাত্র পুত্র জীবানন্দের উপস্থিতিতে তারানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মণিকর্নিকা ঘাটে তাঁহার নশ্বরদেহ ভস্মীভূত করা হয়।

তারানাথের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র দেশ শোকগ্রস্ত হয়। এই সংবাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শ্রুতিগোচর হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় অশ্রুপাত করিতে থাকেন ও বলেন "ভারত পণ্ডিতশূন্য হইল।" (দ্রঃ তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবন চরিত—শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন)।

তারানাথের সমসাময়িক কালের একজন প্রসিদ্ধ মনীষী আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তারানাথ সম্বন্ধে বলিয়াছেন : "তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ" (পুরাতন প্রসঙ্গ—বিপিনবিহারী গুপ্ত, পৃঃ ২০৩)।

সাহিত্য সংবাদ

ইতালীয় রেনেসাঁর উজ্জীবনে যে কয়জন মনীষীর অবদান আমরা সশ্রদ্ধচিত্তে আজও স্মরণ করি, তাঁদের আকাশ-ছোঁয়া প্রতিভার কথা নূতন করে না বললেও চলে। কিন্তু বেনভেনু তো চেল্লিনীর কথা স্বতন্ত্র, তাঁর জীবনের বিচিত্র কাহিনীর আলোচনায়, পুনরাবৃত্তির অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। শিল্পী যোদ্ধা, ভবঘুরে কিম্বা ঘাতক চেল্লিনীকে সামনে রেখে অনেক কথা বলা যেতে পারে কিন্তু আমরা যে চেল্লিনীকে স্মরণ করছি তিনি কবি, সার্থক লেখনী-ধারকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর আত্মজীবনী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য।

একদা মার্ক টোয়েন বলেছিলেন পৃথিবীতে যে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য আত্মজীবনী লিখিত হয়েছে তার মধ্যে সেই সাইমন এবং বেনভেনু তো চেল্লিনীর আত্মজীবনীদ্বয় প্রসাদ-গুণসম্পন্ন উচ্চতর সাহিত্যসৃষ্টির নিদর্শন। চেল্লিনীর অপর এক প্রখ্যাত কীর্তি পার্শিউসের প্রতিমূর্তির মতই তাঁর আত্মজীবনী সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত কিন্তু ইতিহাস ভিত্তিক।

শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড পরিচয় হল তিনি মিশেলাঞ্জেলোর সুযোগ্য শিষ্য এবং অন্যতম কারুশিল্পী কিন্তু সেই অপূর্ব সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কার প্রেরণা তাঁর লেখনীকে মুখর করে তুলেছিল তা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী পাঠে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা তাঁর কারুশিল্প দর্শনের আনন্দ থেকে কিছুমাত্র কম নয়। মহাকবি গ্যেটে, চেল্লিনীর আত্মজীবনী পাঠে রেনেসাঁ কালের প্রতি এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে জার্মান ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ করে সাধারণের সঙ্গে চেল্লিনীর সৃষ্টির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কেবল তাই নয়, সুরসাগর বেরলিওৎস্ চেল্লিনীকে স্মরণ করে একখানি গীতিনাট্যও রচনা করেছিলেন।

এত সম্মান যাঁকে প্রদর্শন করা হয়েছে তিনি কিন্তু উপরতলার কেউ নন। যদিও কারুশিল্পী হিসাবে তৎকালীন ইয়োরোপে তাঁর সমকক্ষ কেউই ছিলেন না এবং উপরতলার মানুষদের সঙ্গেই তাঁর লেনদেন হত কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে চেল্লিনীকে বিচার করলে দেখা যাবে তিনি নিতান্তই মাটিঘেঁষা মানুষ। তাঁর সমসাময়িক কাস্তিলিওন রেনেসাঁর কালকে বিশ্লেষণ করেছিলেন অভিজাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এবং মেকিয়াভেল্লির বিচার ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। কিন্তু চেল্লিনী রেনেসাঁকে বিচার করেছিলেন ধূলির উপর চরণ-রেখা অনুসরণ করে। পোপের ধর্মগৃহে কিম্বা রাজার প্রাসাদে সর্বত্র ছিল তাঁর অবাধ গতি কিন্তু তা সত্বেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উপর কোনও আবরণ পড়েনি। আর পড়েনি বলেই আমরা পেয়েছি একটি সার্থক আত্মজীবনী। রেনেসাঁ কালের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ।

চেল্লিনীর আত্মজীবনী রচিত হয়েছিল ১৫৫৮ থেকে ১৫৭১ সালের মধ্যে। কিন্তু প্রায় দুশো

বছর সেই রচনা পাণ্ডুলিপির কারাগারে বিধৃত ছিল। সম্ভবতঃ ১৭৩০ সালে সর্বপ্রথম জনসাধারণ চেল্লিনীর আত্মজীবনী পাঠের সুযোগ লাভ করেন। ইংরাজী ভাষায় পাঠক চেল্লিনীর পরিচয় লাভ করেন জন এড়িংটন সাইমণ্ডসের অনুবাদের সাহায্যে। এটিই চেল্লিনীর আত্মজীবনীর প্রথম ইংরাজী অনুবাদ। মুখবন্ধে সাইমণ্ডস্, চেল্লিনী সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেছেন সত্যের পূজারী এবং সত্যবাদী শিল্পী। তাঁর আত্মজীবনী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"And metal, under thy hand, O Benvenuto, becomes lace"—বলেছেন সমালোচক পলহুবের। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমরা বলব চেল্লিনী কেবল নিখুঁত কারুশিল্পী ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী সাহিত্যিক। যাঁর রচনায় কেবল অভিজাত মহলের পরিচয়ই আমরা পাই না, সর্বস্তরের সাধারণ মানুষও তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় মূর্ত হয়ে আছে। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার এবং ষোড়শ শতাব্দীর সামন্ততন্ত্রের রঙ্গভূমি ইতালীতে চেল্লিনীর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী বিস্ময়ের উদ্রেক করে বৈকি।

১৫০০ সালে, ফ্লোরেন্স শহরে বেনভেনুতো চেল্লিনী প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। বালক চেল্লিনীর উৎপাতে পড়শীরা উত্যক্ত হয়ে সরকারের কাছে নালিশ করে। সরকারও সুযোগ খুঁজছিল চেল্লিনীকে এবং তাঁর জন্য জাল পাতাই ছিল। তাঁর যখন মাত্র পনের বৎসর বয়স, সরকার তাঁকে ফ্লোরেন্স সহর থেকে নির্বাসিত করল অন্যায় দ্বন্দ্ব যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অজুহাত দেখিয়ে। তারপর সুরু হয় তাঁর ভবঘুরে জীবন। কত দেশ, কত সহর পার হয়ে কখন তিনি মিশেলাঞ্জেলোর স্নেহধন্য হয়েছিলেন তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু সাহিত্য চর্চায় কখন মনোনিবেশ করলেন তার সম্পূর্ণ ইতিহাস আজও অলিখিত।

চেল্লিনীর বিচিত্র চরিত্রের যে পরিচয় তাঁর আত্মজীবনীতে আমরা পাই, তা আমাদের অচিরেই বিস্মিত করে। কারণ যখন দেখি যান্ত্রিক চেল্লিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মনোলোভা সিয়েনা নগরীকে রক্ষা করতে ব্যস্ত তখন মন শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। কিন্তু আবার যখন দেখি মহামান্য পোপের স্বর্ণালঙ্কার অপহরণের দায়ে চেল্লিনী আদালতে অভিযুক্ত কিম্বা কোন সুন্দরী রমণীর কেশদাম আকর্ষণ করে তাঁকে অপমানিত করছেন তখন মন বিরূপ হয়ে ওঠে। আবার যখন মনে পড়ে পার্সিউসের অনিন্দ্য সুন্দর প্রতিমূর্তি তাঁরই রচনা তখন মনে ক্ষোভ থাকে না। যখন কেউ চেল্লিনীর আত্মজীবনী পড়েন ও তাঁর কীর্তিকলাপের সঙ্গে পরিচিত হন তখন এরকম বহু প্রশ্ন মনের মধ্যে আনাগোনা করে। এমন পরস্পর বিরোধী চরিত্রের নিদর্শন রেনেসাঁর কালে বিরল বলেই মনে হয়।

রেনেসাঁর উদ্দাম ভাবপ্রবাহে চেল্লিনী একমাত্র ব্যতিক্রম হয়ত নয়, কিন্তু তাঁর মত রোমান্টিক চরিত্রের পরিচয় আর আমরা পাব না, কারণ সাধারণ মানুষের ইতিবৃত্ত সেকালে লেখা হত না। চেল্লিনীকে অবশ্য সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলা যায় না। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হয়েও উন্নাসিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি সর্বস্তরের মানবমনের অলিগলিতে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করতে পেরেছিলেন এবং তারই প্রতিচ্ছায়া দেখি তাঁর আত্মজীবনীতে। আত্মজীবনী লেখার শ্রেষ্ঠ সময় কখন কিম্বা কাদের আত্মজীবনী লেখার অধিকার আছে সে সম্বন্ধে চেল্লিনীর উক্তি অব্যর্থ এবং স্মরণ রাখার মত। তিনি বলেছেন—"All men of whatsoever quality they be, who have

done anything of excellence, or which may properly resemble excllence, ought, if they are persons of truth and honesty, to describe their life with their own hand, but they ought not to attempt so fiine an enterprise till they have passed the age of forty.

নূতন গ্রন্থ

সাম রিকলেকসন্স্ : এমা হার্ডি।

পুরানো কাগজের স্তূপে যখন চমকিত হবার মত লেখা আবিস্কৃত হয় তখন মনে যে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকে তার তুলনা কোথায়? টমাস হার্ডির জীবনে চমকিত হওয়ার এমন অবসর একবার এসেছিল। নিচের সেলারে পুরানো কাগজপত্রের জঞ্জাল সরাবার সময় যে লেখাগুলি হঠাৎ তাঁর চোখে পড়েছিল তা তাঁর প্রথম জীবনের প্রণয় মধুর দিনগুলির অবিকল প্রতিচ্ছবি, লেখিকা তাঁর প্রথমা স্ত্রী এমা হার্ডি।

১৮৭০ সালে সেই মুহূর্তগুলি আবার যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন। এমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের কথা তারপরের যৌবনোচ্ছল দিনগুলি এবং অবশেষে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সবকিছুই এমা লিখে গেছেন। তিনটি নাতিবৃহৎ পাণ্ডুলিপিতে এমা তাঁর জীবনের কয়েকটি উজ্জ্বল মুহূর্ত এঁকে গিয়েছিলেন মৃত্যুর পূর্বে (১৯১২)। তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় সাম রিকলেকসন্স্ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

Some Recollections by Emma Hardy. Jointley edited by Evelyn Hardy & Robert Gitings, London, Oxford University Press. ppXVI+92, 16s. net.

অজিত দাস

একটি প্রশ্ন

অনেকদিন থেকে একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি মত আলোচনা করে তার জবাব পাইনি। সমবয়সী ও পরিচিত মহলে জানতে চেয়েও এ প্রশ্নের পূর্ণ জবাব পাইনি! আজ তাই পত্রিকার মাধ্যমেই সেই প্রশ্নটি সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করছি, আশা করছি বহু বিদগ্ধজন আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমাকে জ্ঞানবান করবেন।

প্রশ্নটা জটিল কিছু নয় বরং রীতিমত সহজই বলা চলে। তার কোন এক বা একাধিক শব্দের অর্থ বুঝতে অতি সাধারণ বিদ্যাসম্বল মানুষকে অভিধানের পাতা হাঁটকাতে হবে না। সমস্ত কথাগুলো যা দাঁড়াবে তার অর্থও জলবৎতরলম্, অথচ তবু উত্তর পাই না। ভাবতে পারেন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা প্রচণ্ড হেঁয়ালী, কিন্তু বিশ্বাস করুন, মোটেই তা নয়।

আচ্ছা প্রশ্নটাই করে ফেলি এবার।

মানুষ যা নয় তাই হবার জন্য তার এত ব্যাকুলতা কেন আবার যার জন্য এ ব্যাকুলতা তা পেলে আবার তাকে ত্যাগ করবার জন্যই বা পাল্টা আকুলতা জাগে কেন?

যা নই তাই হবার জন্য আকুলতা তো আমরা সর্বদাই দেখছি। যে ব্যবসায়ী অত্যন্ত সহজে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করেছে তার মনের কোণে কিন্তু কবি হবার উৎকট বাসনা থাকা আশ্চর্য নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে লোকটি নিজের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে সমস্ত কিছুর দোষগুণ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, সে-ই নিজের কবিতা ছাপবার জন্য উন্মত্ত হয়ে ওঠে। বিপরীত কোটিস্থ কবিদের মধ্যে অবশ্য ব্যবসায়ী হবার ঝোঁকটা দেখাই যায় না বড় একটা। কারণটা সহজবোধ্য, ব্যবসায়ীর পক্ষে অপব্যয় করা যতটা সহজ কবিদের পক্ষে খেয়ালের বশে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় কোনদিক দিয়েই তা নয়। চাঁদের আলোর জ্যোৎস্নার দিকে তাকিয়ে কবিতা লেখার চেষ্টা বাঙলা দেশের সর্বত্রই প্রতীয়মান। কিন্তু একটা গামছা বেচতে হলেও কিছু রেস্তর দরকার, অর্থাৎ কাঙালের ঘোড়া রোগ হলে চলে না কিন্তু ঘোড়ার কাঙাল রোগ সম্বন্ধে কোন বাধা নেই। অথচ মধু কবি ছাত্রাবস্থায় বন্ধুদের কাছে প্রমাণ করতে গিয়েছিলেন, না গিয়েছিলেন কেন প্রমাণ করেছিলেন যে সেক্সপীয়ার ইচ্ছে করলেই নিউটন হতে পারতেন কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলেও সেক্সপীয়ার হতে পারতেন না। প্রমাণটা নিতান্তই কাকতালীয়বৎ! মধু হঠাৎ একটা অঙ্ক কষে ফেলেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সারা জীবনের অঙ্কে রাশি রাশি গোঁজামিল। নিউটন কবিতা লিখতেন কিনা তা ঠিক জানা যায় না তবে সেক্সপীয়ার যে অঙ্ক কষতেন এমন তথ্যও সুলভ নয়। যে-সব লোক অনেকদিন আগে ফৌৎ হয়েছেন তাঁদের কথা না হয় বাদ দেওয়া যাক; তার চেয়ে ইদানীং কালের দু'চারজন মনীষীর কথা ধরা যাক। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বেহালা বাজাতেন অবকাশ বিনোদনের জন্য, তাঁর

বেহালা বাজনার প্রশংসা করলে তিনি গর্বিতই হতেন কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা করলে তিনি মোটেই কাবত হতেন না। হয়ত তাঁর ধারণা ছিল যে, গাণিতিক হওয়ার চেয়ে বেহালা বাদক হলেই তিনি বোধহয় ভাল করতেন। কিছু লোকের ঘাড়ে অবশ্য দুষ্টা সরস্বতী ভর করে; তাঁরা বলতে পারেন, ওটা একটা ভুল বিশ্লেষণ কারণ আইনস্টাইন জানতেন তাঁর গাণিতিক সূত্রাদি হৃদয়ঙ্গম করবার মত লোক অঙ্গুলিমেয়, কাজেই বিরূপ সমালোচনা অজ্ঞতা-প্রসূত। বেহালা বাজানোর ক্ষেত্রে ভাল মন্দ বোঝবার মত রসিক অনেক পাওয়া সম্ভব কাজেই ভাল বাজানোর প্রশংসায় গর্বিত হবার কারণ আছে।

কথাটা সম্পূর্ণ অসমীচীন নয় কাজেই আইনস্টাইন প্রসংগের এখানেই তামাম শোধ। তবে আমার বক্তব্য জোরদার করার জন্য আর একটি মোক্ষম দৃষ্টান্ত দিই—এক মহাধনী (নামটা মনে পড়ছে না, মাঝে মাঝে আমার স্মৃতিশক্তি আমাকে এরকম বিপদে ফেলে, সহৃদয় পাঠকরা নামটি বসিয়ে নেবেন) ছোটবেলা থেকে কল্পনা করত বড় হয়ে সে ইঞ্জিন ড্রাইভার হবে। কার্যগতিকে সে হয়ে গেল ব্যবসায়ী আর মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করলে। কিন্তু ছোটবেলার আশা মেটাতে না পেরে মনমরা হয়ে থাকত। শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ির প্রকাণ্ড হাতায় একটা খেলনার রেল লাইন পেতে সেখানে ইঞ্জিন চালিয়ে শান্ত হল সে।

পয়সা থাকলে এমন কাণ্ড করা সম্ভব। অবশ্য পয়সা না থাকুক অন্যদিকে জোর থাকলেও করা যায়। যেমন ধরুন, আমার কথা। আমি লিখতে না পারলেও তেমন তেমন খুঁটির জোর থাকলে আমি মস্তবড় লেখক হতে পারি এমনকি নাম করা কাগজের সম্পাদকও বনে যেতে পারি। এক পূর্বসূরী তো লিখেই বসে আছেন, কানা হলেই ভাল সম্পাদক হওয়া যায়। কথাটা পুরোপুরি অবিশ্বাস করা শক্ত, কিন্তু যারা পারে আমার কথা তাদের নিয়ে নয়। কথাটা যারা পারে না তাদের নিয়ে। মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন যে, পাগলদের বেশ একটা বড অংশ নিজেদের মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য বিকৃত মস্তিষ্কের স্বপ্নপ্রাসাদ গড়ে তুলেছে। অবশ্য এজন্য মনস্তাত্ত্বিকের সাক্ষ্য খুব বেশী দরকার আছে বলে মনে হয় না, কারণ এমন দু-চার জনের কথা আমরা প্রত্যেকেই বলতে পারি।

এ তো গেল এক পক্ষের কথা, যারা চায় কিন্তু পায় না। ঢালের আর এক দিকও তো আছে, যারা পায় কিন্তু চায় না। সারা জীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, কি না বুড়ো বয়েসে পায়ের ওপর পা দিয়ে আরাম করবেন। কিন্তু সেই বুড়ো বয়েস যখন এল তখন আর আরাম করার মত অবস্থা নেই, অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, শরীরং ব্যাধি মন্দিরং। মনে হয় এইজন্যে কি 'হা অর্থ হা অর্থ' বলে ছুটে বেড়িয়েছি। আজ আমার অর্থ, সুখস্বাচ্ছন্দ্য কিছু চাই না আমার স্বাস্থ্য ফিরে দাও।

কোন সাহিত্যিক সারা জীবন অর্থাভাবে কষ্ট পেয়েছেন, ভেবেছেন জীবন সংগ্রাম থেকে রেহাই পেলেই তাঁর প্রেরণা আরো ফলবতী হয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত যেদিন অর্থস্বাচ্ছল্য এল তখন দেখা গেল প্রেরণা সম্পূর্ণ অদৃশ্য, রীত রক্ষার্থ তিনি লিখতে বসেছেন হয়ত লিখেছেনও এবং অভ্যস্ত হাতের লেখা সম্বর্ধিতও হচ্ছে; কিন্তু তার মধ্যে প্রেরণা নেই, নিজেকেই তিনি তৃপ্তি দিতে পারছেন না, শুধু দিনগত পাপক্ষয় হচ্ছে। মনে মনে তিনি বলছেন, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই

তাহা চাই না।

কবি-প্রেমিক প্রেমিকার মুখের তিলটির জন্য বোখরা সমরখন্দের স্বত্ব ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু প্রেমিকাকে কাছে পেয়ে তিনি কি ভেবেছেন তা জানান নি। কাছে পেলে কিছুদিন পরে যে একমুঠো তিলের বদলে প্রেমিকাকে বেচে দিতেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলার নথিপত্রে ছড়ানো আছে। প্রেমিকার দাপটে সক্রেটিস দার্শনিক বনে গিয়েছিলেন, এমনকি তাঁর প্রাণদণ্ড হবার পর, তাঁর শিষ্যেরা যখন তাঁর পালানোর সব ব্যবস্থা করে ফেলেছিলেন তখনো তিনি বোধহয় জ্যানথিপ্পির কথা ভেবেই পালাতে রাজী হন নি। অথচ তাঁদের বিয়ে যে জোর করে দেওয়া হয়েছিল এমন কথা কোথাও পাওয়া যায় না বরং সেটি যে প্রেমজ এমন আভাস আছে।

কাজেই ঘুরে ফিরে সেই গোড়ার কথা, সেই প্রশ্ন—মানুষ যা নয় তা হবার জন্য এত ব্যাকুলতা কেন, আবার যা হয় তা না হবার জন্যই বা আকুলতা কিসের? বা একটু ঘুরিয়ে বললে, যা চায় তা পায় না কেন আর যা পায় তা চায় না কেন?

রবি মিত্র

ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ। সঙ্কলক ও অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা॥

'বিশ্বমানবের কবি রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে, বিদেশীরা নতুন করে ভালবাসতে শেখেন শাশ্বত এই ভারতবর্ষকে।...প্রথম যে ফরাসী রসিক রবীন্দ্রনাথ পড়ে মুগ্ধ হন এই শতকের সূচনায়, তাঁর নাম আজ সকলেই জানে : কবি স্যাঁ-জন্ পার্স। তিনি তৎপর হয়েছিলেন বলেই ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করলেন আঁদ্রে জিদ্।'

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ফরাসী দেশের শিক্ষিত জনমানসে কৌতূহল বহুদিনের। ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ফ্রান্সের প্রথম ঐতিহাসিক সংযোগ ঘটে সম্ভবত: উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। ১৮৪৪ সালে ফ্রান্সের লুই-ফিলিপের রাজসভায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বর্ধিত হন। বিখ্যাত ফরাসী লেখক ফেলিক্স কঁশ 'এক অশীতিপরের দিনলিপি' শীর্ষক একটি গ্রন্থের (১৮২২) একটি পরিচ্ছেদে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উক্ত রাজসম্বর্ধনার কথা উল্লেখ করেছেন। 'লেখক কঁশ ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনীতির সহকারী অধ্যক্ষ। দ্বারকানাথের সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব হয়। পারী-র বিভিন্ন সালঁ-তে দ্বারকানাথকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। রূপে গুণে, দানে, দাক্ষিণ্যে তাঁর 'প্রিন্স' নাম ফরাসীদের কাছে সত্যই স্বাভাবিক ঠেকেছিল।...জানা যায় মঁসিয়্য কঁশ-এর বই থেকে। আরো জানা যায় দ্বারকানাথের পারী-প্রবাস এবং ইংল্যাণ্ডে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর বিবরণ।'

ঠাকুর পরিবারের পরিচয় ফ্রান্স পেয়েছে বহুপূর্বে। এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নোবেল পুরস্কার পাবার আগেই। প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুকাল আগেই আলেক্সি-লেজে নামক জনৈক জনপ্রিয় ফরাসী রাষ্ট্রনীতিবিদের সৌভাগ্য হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি পাঠ শোনবার। অবশ্য ঘটনাটি ঘটে, বলা বাহুল্য. ইংলণ্ডে। আলেক্সি-লেজে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এতদূর অভিভূত হন যে (...'পাশ্চাত্যবাসী আমাদের কাছে এসেছিলেন তিনি 'গীতাঞ্জলি' নিয়ে, যার গীতিময় অঞ্জলি আমাদের কাছে এনে দিয়েছিল সর্বপ্রথম অপূর্ব স্নিগ্ধতা আর অপূর্ব আরক, যেন এশিয়ারই বিরাট কোনও বৃক্ষের পত্রনির্যাস। তার সৌরভ তখনো আমোদিত করে রেখেছিল কুশলী অনুবাদকের সূক্ষ্ম এই ইংরেজিতে, যে-অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। অতি পবিত্র এক শিল্পের বিকাশ সেখানে, সেই অব্যক্তের মাঝে, এবং যা সত্তার সর্বোচ্চ লোকে উঠে আত্মারই নানা কথা বলছে : সমগ্র সত্তার অতি মধুর মূর্ছনা, মিস্টিক এক নিশ্বাসের অনুরূপ।'—রবীন্দ্রনাথ স্মরণে : স্যাঁ-জন্ পার্স) অবিলম্বে উৎসাহে অতি তৎপর হয়ে ইংরেজি গীতাঞ্জলির এক কপি তাঁর বন্ধু বিখ্যাত সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদের কাছে, ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেন। আলেক্সি-লেজের তৎপরতায় ১৯১২ সালের ভেতরেই ফরাসী ভাষায় গীতাঞ্জলির প্রথম অনুবাদ করেন কবি আঁদ্রে জিদ্। গীতাঞ্জলির অনুবাদ-কার্যে আঁদ্রে জিদ্ বিপুল যত্ন ও আশ্চর্য রকম পরিশ্রম স্বীকার করেন (...'আমার মনে হয়েছে যে আমাদের

যুগে আর কোনও চিন্তাধারা এতখানি শ্রদ্ধার—বলতে যাচ্ছিলাম ভক্তির—যোগ্য নয়, যতখানি রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং তাঁর মহত্ত্বের সামনে নিজেকে নত করতে পেরে আমি তৃপ্ত হয়েছি, যেমন তিনি তৃপ্তি পেয়েছেন ঈশ্বরের সামনে দীন হয়ে তাঁর গান পাইতে পেরে'—আঁদ্রে জিদ্। ফরাসী গীতাঞ্জলির উৎসর্গপত্র। অনুবাদক—আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলক।) এবং অনুবাদটি আঁদ্রে জিদ্ উৎসর্গ করেন ১৯৬০ সালের নোবল লরিয়েট কবি স্যাঁ-জন্ পার্সকে। কবি স্যাঁ-জন্ পার্স নামের আড়ালে যিনি বিশ্ববিশ্রুত হয়েছেন তাঁর স্বনাম, বলা বাহুল্য, পূর্বে উল্লেখিত বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ্ 'আলেক্সি-লেজে'।

প্রথম মহাযুদ্ধের নানা পালা-বদলের জরুরী মুহূর্তেও ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে ভুলতে পারেন নি। 'বরং রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে ফরাসীরা তাঁর মধ্যে নতুন করে পেল এক নবীন প্রত্যয়, পেল যেন ত্রাণের বার্তা।' মাদ্‌মোয়াজল সুজান্ কার্পেলস্ ছিলেন পারী-তে রবীন্দ্রনাথের সচিব। এঁর জীবনের একটি বিশেষ অংশ অতিবাহিত হয় ভারতে এবং তৎসহ প্রাচ্যের নানা স্থানে। সুজান্ কাপেলস্ একটি নিবন্ধে যা উল্লেখ করেন তা থেকে ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ কি পরিমাণ শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন তার এক আশ্চর্য চিত্র পাওয়া যায়: 'প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল যখন, তখন আমাদের নৈতিক অবস্থা কী? সমগ্র ফ্রান্সের চোখে ভীষণ এক অগ্নি-পরীক্ষা বলেই মনে হয়েছিল এই যুদ্ধকে, কেবল মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার জন্যই নয়, তাঁদের অনেকেরই দৃষ্টির সামনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল তাঁদের আধ্যাত্মিক আদর্শ, ধ্রুব সত্য বলে যা তাঁরা জানতেন, তারই পরাজয় ঘটল। দিশাহারা হয়ে পড়লেন তাঁরা। কোন্ পথে যাবেন, কার কাছে হাত পাতবেন সাহায্যের জন্য?

এমনি এক পরিস্থিতির মাঝে এলেন এক কবি, এলেন এক নবী—অসঙ্কোচে খুলে দিলেন ভারতের স্বর্লোকের দ্বার; অবাধ আমন্ত্রণ জানালেন তিনি বিশ্ববাসীকে। জাতিবর্ণনির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে। দিলেন তিনি শাশ্বত ভারতের আধ্যাত্মিক উৎসমুখের অমৃত-আস্বাদনের অধিকার। এই কবি-ই—আজ আর অবিদিত নয়—ইনিই রবীন্দ্রনাথ। রাতারাতি, কতকটা নোবেল পুরস্কারের কল্যাণেই, তাঁর নবীসুলভ কণ্ঠোচ্চারিত বাণী ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ইউরোপে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে। অগণিত নির্যাতিত প্রাণ অধীর প্রতীক্ষায় ছিল এই স্নেহ স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। যার সাহায্যে তারা ফিরে পেতে পারে তাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক ভারসাম্য। আবার অনেকের কাছে এক বিধিদত্ত প্রত্যাদেশ বলেই পরিগণিত হল এই বাণী। এশিয়া এগিয়ে এসেছে ইউরোপের সাহায্যকল্পে। কেবল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যসম্ভারই নয়, ভারত এগিয়ে এসেছে উদার সতীর্থের মত প্রসারিত হস্তে। তাঁদের চোখে রবীন্দ্রনাথ হলেন ভবিষ্যতের প্রতীক, প্রতিশ্রুতিপূর্ণ, আশাসমৃদ্ধ এক ভবিষ্যৎ।' (পৃ. ৮৫)

ফরাসীরা রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের অতি আপনজন হিসেবে হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। ফরাসী দেশে রবীন্দ্রনাথের বহুবার গতায়াত, অবস্থানে; পরন্তু সাধারণ তৎসহ বহু বিশিষ্ট ফরাসী মনীষীবৃন্দের সঙ্গে তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতার জন্য তা সম্ভব হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র প্রতিভা এবং আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বের নানা দেশে নানাবিধ

রচনা প্রকাশিত হয়েছে, নিত্য নতুন গবেষণা চলেছে, চলছে এবং বলা বাহুল্য, প্রতি নিয়তই নতুন আলোচনার সূত্র ধরে নতুন তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা চলবেও। এই অন্যতর প্রচেষ্টার ফরাসীরাও পিছিয়ে নেই পিছিয়ে থাকেনি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রদর্শন-শিক্ষা সঙ্গীত-ব্যক্তিত্ব এবং পাশাপাশি রবীন্দ্র-প্রতিভার বহু বিচিত্র দিক সম্পর্কে সে দেশে নানা তাৎপর্যপূর্ণ রচনা প্রকাশিত হয়েছে; বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফরাসীমনে বিপুল উৎসাহ সঞ্চারিত, প্রসারিত হয়েছে। এবং আরও, আরও হবেও। ভারতীয় মাত্রেরই উৎসাহিত হবার কথা, ফরাসী ছাত্র মহলে বহুপঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নাকি বর্তমানে অন্যতম।

'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' বিভিন্ন ফরাসী বুদ্ধিজীবী কর্তৃক লিখিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি রচনার সঙ্কলন। স্যাঁ-জন পার্স, আঁদ্রে জিদ্ প্রভৃতি বিশিষ্ট চিন্তাবিদ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককালের অগণ্য ফরাসীগুণী ব্যক্তির মানসে রবীন্দ্রনাথের যে রূপ ধরা পড়েছে, মূল ফরাসী প্রবন্ধ থেকে আলোচ্য সঙ্কলনে সঙ্কলক শ্রীযুক্ত পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তার একটি বিশিষ্ট চরিত্র অনুবাদের মাধ্যমে উদ্ধার করে রবীন্দ্র-উৎসাহী বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। মূলের রচনাশৈলী, প্রবন্ধের আন্তরধর্ম, অনুবাদের সাবলীলতার জন্য সঙ্কলক ও অনুবাদক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ফরাসী দেশে নানা উপলক্ষ্যে এবং বিশেষতঃ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময়ে বহু গ্রন্থ, বহু আলোচনা, কবিতা প্রকাশিত হয়। সঙ্কলক সেই সেই নানা রচনার ভিড়ের মধ্য থেকে বহু অনুসন্ধান এবং গবেষণার পর তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি রচনা, বিশেষত যে রচনাবলীর আলোকে ফরাসীমানসে রবীন্দ্রদর্শন, রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রব্যক্তিত্ব—সামগ্রিক অর্থে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ যে দর্পণে উদ্‌ভাসিত—সেগুলিকেই বর্তমান সঙ্কলনে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মূল ফরাসী থেকেই বর্তমান রচনাবলী অনূদিত হয়েছে। সর্বসমেত আঠারোটি রচনা বর্তমান সঙ্কলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রস্মৃতি, দর্শন, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, মানবিকতা সম্পর্কিত স্যাঁ-জন পর্স; অধ্যাপক জ্যাঁ ফিলিওজা; লুই জিলে; অলিভিয়ে লাকঁব; আঁদ্রে জিদ্; ভারভারা পিতোয়েফ্; ভেলিসিয়েঁ শালে; মার্ক এলমার; ফিলিপ স্যার্ন ও অর্নল্ড বাকে; আনা দ্য নোয়াই; সুজান কার্পেলস্; মাদাম জান রানে; জঁা গেহেনা; আঁদ্রে মোরোয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট ফরাসী চিন্তাজীবীদের রচনা সম্ভারে বর্তমান গ্রন্থ সমৃদ্ধ।

'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটির রচনাবলী, আমাদের বিশ্বাস, উৎসাহী পাঠক, বিশেষত গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যরসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সবচেয়ে বড় কথা, গ্রন্থের সঙ্কলক অনুবাদক তাঁর দায়িত্ব পালনে উৎসাহব্যঞ্জক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—তাঁর চয়িত রচনাবলীর মধ্য দিয়ে ফরাসী মন ও মননে, নানাস্তরে, বিশেষত বুদ্ধিজীবী মহলে রবীন্দ্রচর্চা, রবীন্দ্রভাবনার নিপুণ কারুকাজটি সমুপস্থিত। বলা বাহুল্য, সময়ের স্বধর্মে ঐতিহাসিকের কাছেও এই গ্রন্থের মূল্য নিঃসন্দেহে অকিঞ্চিৎকর বোধ হতে বাধ্য।

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

একটি কম...
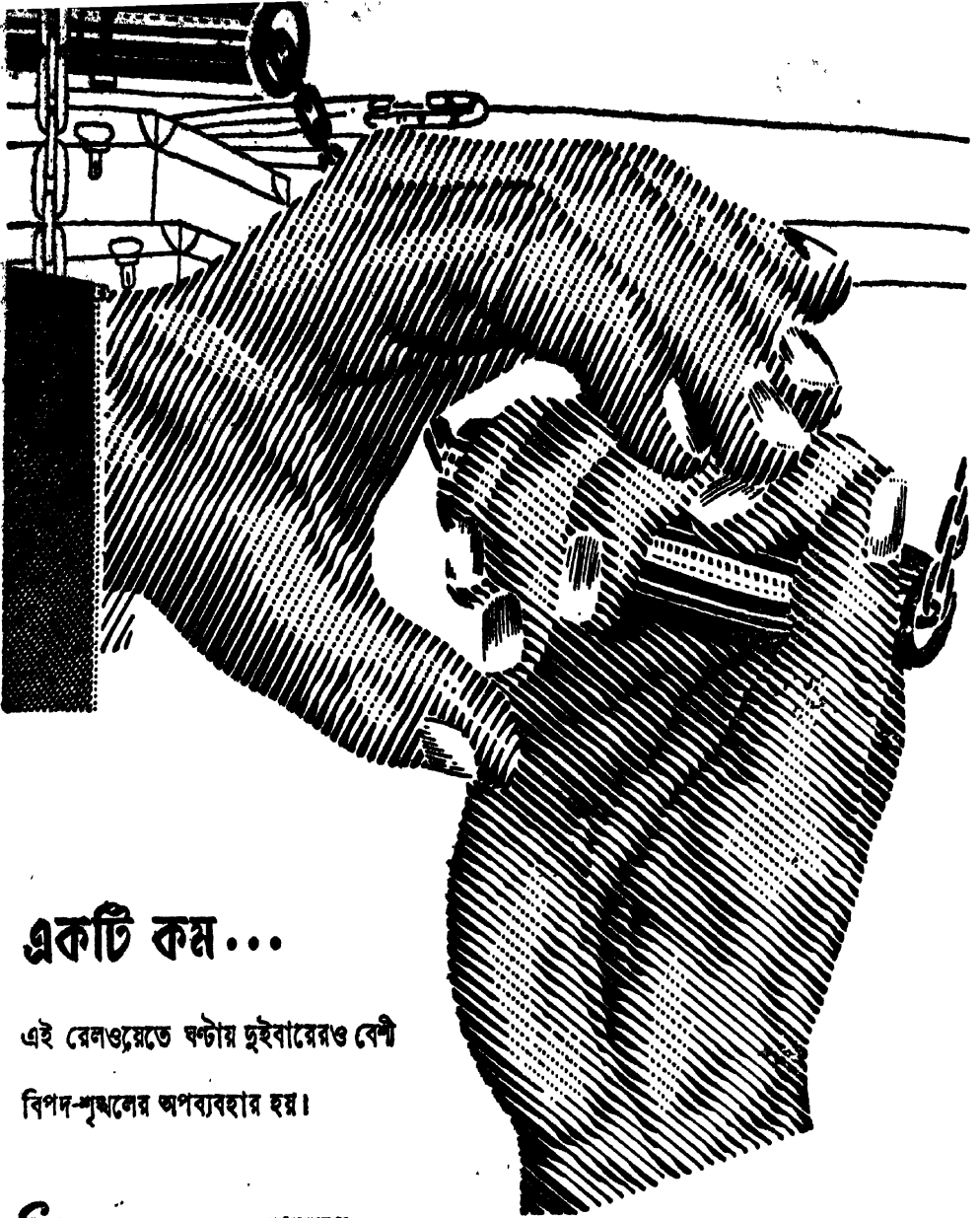
এই রেলওয়েতে ঘণ্টায় দুইবারেরও বেশী বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার হয়।

কিন্তু গুরুত্ব অনেক...

সহযাত্রীদের অসুবিধা কেউ উপলব্ধি করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

প্রবন্ধের মাসিক পত্র

সম্পাদক :

শুভেচ্ছা বা অভিনন্দন…অভিনন্দন টেলিগ্রামে পাঠান।
বিশেষ চিত্রশোভিত ফর্মে এবং তেমনি সুন্দর খামে অভিনন্দন টেলিগ্রাম বিলি করা হয়।
ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সমস্ত রকম আনন্দ উৎসবের উপযোগী অনেকগুলি সংক্ষিপ্ত বার্তা রয়েছে এবং তা থেকে ইচ্ছানুযায়ী বার্তা পছন্দ করা যায়।
সাধারণ অভিনন্দন টেলিগ্রামের জন্য সর্ব্বনিম্ন ব্যয় ৭৫ নঃ পঃ।
অতিরিক্ত প্রতিটি শব্দের জন্য ১০ নঃ পঃ।

ডি ল্যুক্স টেলিগ্রাম

আপনি যদি আপনার বার্তায় আরও আন্তরিকতার স্পর্শ দিতে চান, তাহলে তার জন্য রয়েছে ডি লুক্স টেলিগ্রাম।
আপনার ইচ্ছানুযায়ী টেলিগ্রাম লিখে, বিশেষ নির্দ্দেশের জায়গায় "ডি লুক্স" কথাটি লিখে দিন। তাহলে আপনার টেলিগ্রামটি, বিশেষ অভিনন্দন ফর্মে বিলি করা হবে।

অভিনন্দন

বা

ডি ল্যুক্স

টেলিগ্রামে
আপনার শুভেচ্ছা
জানান

ডাক ও তার বিভাগ

DA 63/436

সমকালীন

প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয় (ইংরেজী মাসের ১লা তারিখ)। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদি নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ও ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়। গল্প ও কবিতা পাঠাবেন না—'সমকালীন' প্রবন্ধের পত্রিকা।

'সমকালীনে'র গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য ॥ ফোন : ২৩-৫১৫৫

একাদশ বর্ষ ৯ম সংখ্যা

পৌষ তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পৌষ
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

বাঙলার নবজাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ

নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ইয়োরোপের অধ্যাত্ম বিশ্বাস ও চিন্তায় জগৎ ও জীবন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ড বরাবরই যথোচিত গুরুত্বে স্বীকৃত। পারমার্থিক বিশুদ্ধ সত্তা এবং ইন্দ্রিয়-জগতের দ্বৈততাকে অস্বীকার করে নির্বিশেষ অদ্বৈতে আধ্যাত্মিকতাকে আবদ্ধ করে প্রাচ্যসুলভ মানসিকতা সেখানে কোনওদিনই প্রবল হয় নি। কখনও কখনও হয়ত বৈরাগ্য ও কৃচ্ছ্রতার দিকে ঝোঁক পড়েছে, যেমন সেন্ট অগাস্টিনে, কখনও বা আদিম পাপবোধসঞ্জাত নৈরাশ্য তীব্র হয়েছে, প্যাস্কাল যার উদাহরণ; কিন্তু তাঁদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিছক মায়ার অধ্যাসরূপে প্রতিভাত হয় নি। আর মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক টমাস একুইনাস ত অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিন্যাসে এই দুই জগতের সমন্বয় সাধনে ধর্মতত্ত্বঘটিত মনীষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ইয়োরোপের রেফর্মেশনে যেমন, তেমনি কাউন্টার রেফর্মেশন আন্দোলনেরও সমাজসচেতনতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতবর্ষের উপনিষদ অদ্বৈতবাদে ব্যক্তির মোক্ষলাভই অন্বিষ্ট, তাতে কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী সামাজিক পুরুষার্থের স্থান নেই। এ দেশের অধ্যাত্মভাবনায় বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্বসংঘাতকে এড়িয়ে গিয়ে বিমূর্তনের প্রতি আসক্তি প্রথমাবধিই নানাভাবে প্রাধান্যলাভ করে এসেছে। অবশ্যই ভারতবর্ষের মনীষীদের সাধনা জগৎ বিষয়ে নিরংকুশভাবে নঞর্থক অদ্বৈতবাদের অনুসরণে পর্যবসিত হয় নি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তৃণতরুলতা পশুপক্ষী থেকে আরম্ভ করে মানুষের মধ্যে সর্বত্রই এক বিরাট নিখিল প্রাণ স্পন্দিত, তাঁদের অদ্বৈত ঈশ্বরের সেই সৃষ্টিগত বিস্তারের ধ্যান ও কল্পনার সৌন্দর্য, তার থেকে উৎসারিত শান্তির প্রেরণা ও সর্বজীবে কারুণ্যের ঐশ্বর্য মানবসভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়। কিন্তু এই বোধ বিমূর্ত চিন্তার বিশুদ্ধতায় যতটা আবদ্ধ থেকেছে, ততটা চলিষ্ণু সামাজিক শক্তিতে পরিণত

হতে পারেনি। স্বধর্মীয় বিকাশের সচল ধারায় ভারতীয় সভ্যতায় ক্রমবিবর্তন ঘটেনি, সমাজচৈতন্য এদেশে চিরকালই দুর্বল থেকে গেছে। বিমূর্ত চিন্তাভাবনায় অত্যধিক প্রবণতার জন্যেই সম্ভবত আত্মপ্রবঞ্চনা সহজেই মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হতে পেরেছে। সামাজিক বিবেকবোধবর্জিত ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানে, আচারসর্বস্বতার মিথ্যাচারে, নির্বিচার প্রথাপালনের মনুষ্যত্বহীন অন্ধতায়, অদৃষ্টের ওপর অসহায় নির্ভরতার ক্লৈব্যে পঙ্গু আবিল বিকাশের শক্তিহীন সমাজ একের পর এক বিদেশী আক্রমণে লাঞ্ছিত হলেও নিজের অস্তিত্বের, চিন্তাভাবনার অসঙ্গতি সম্পর্কে কোনও মৌলিক আত্মানুসন্ধানী জিজ্ঞাসায় পর্যন্ত বিচলিত হয়নি।

বাঙলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে সেই প্রশ্নের পটেই বাঙালীর আত্ম-অন্বেষণের সূত্রপাত হয়। রামমোহনের বেদান্ত-অনুশীলন ও সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টায়, বিদ্যাসাগরের চারিত্র্যে ও দেশজ মানবিকতায়, বংকিমের অনুশীলনতত্ত্বে কিংবা বিবেকানন্দের ধর্মাবেগে, রবীন্দ্রনাথের উপনিষদাশ্রিত অধ্যাত্মচেতনায়ও সামাজিক পুরুষার্থের স্পষ্ট অস্পষ্ট নানা টানই লক্ষণীয়। উনিশ শতকী নবজাগরণের পথিকৃৎ রামমোহনের বেদান্তচর্চার মূলে ছিল সমাজসংস্কারেরই অনিবার্য প্রেরণা, বৈরাগ্যপন্থী আধ্যাত্মিকতা নয় ; বেদান্তের মায়াবাদে তাঁর কোন আস্থাই ছিল না।

আমাদের ঔপনিবেশিক জীবনের অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত জাগরণের দায়ভাগে সমাজচৈতন্যের উদ্বোধন পূর্ণাংগ হতে পারেনি। চরম রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে 'ধর্মকর্মের' লক্ষ্য ও সিদ্ধির ধারণা যে কত স্থূল ব্যক্তিগত বৈষয়িক স্বার্থকেন্দ্রিক ছিল, ১৮৩১ সালের ২রা মের সমাচারচন্দ্রিকায় ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের নাস্তিকতার বিরুদ্ধে এই ক্রোধ প্রকাশে তার চমৎকার উদাহরণ দ্রষ্টব্য : 'হিন্দু হইয়া ইংরাজি বিদ্যায় বিদ্বান হইলে নাস্তিক হয় ইহা পূর্বে জ্ঞাত ছিলাম না কেননা পূর্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম সুসম্পন্নপূর্বক বহু ধনোপার্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরাজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন......এক্ষণে যাহারা ভাল ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছে তাহাদিগের বিদ্যার কি এই ফল হইল কেবল নাস্তিকতা করিবেক ভাল যদি ঐ নাস্তিকের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিদিগের মত কেহ পদপ্রাপ্ত হইতে পারিত তথাচ বুঝিতাম যে নাস্তিকতা করাতে সাহেব লোক তুষ্ট আছেন এই নিমিত্ত করে তাহা কোন মতেই নহে কেননা কর্মকর্তা সাহেব লোক বেলিক নাস্তিককে কখন উচ্চ পদে বা বিশ্বস্ত কর্মে নিযুক্ত করেন না ইহা নিশ্চয় আছে যেহেতু যে ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে তাহা হইতে কোন কুকর্ম না হয় সে অবশ্যই বিশ্বাসের অপাত্র ইহা কি তাঁহারা জানেন না তৎপ্রমাণ যে সকল বালক ভাল ইংরাজি জানে তাহারা কেহ কোন পাঠশালার টিচার কেহবা ১৬ টাকার কেরাণি কেহবা অভিমানী ঘরে বসিয়া আছে...।' অন্যদিকে, অধ্যাত্মচেতনা যে সমাজসংস্কারে তথা সামাজিক দায়িত্বপালনেই যথার্থ ফলপ্রদ হতে পারে এবং নিছক ব্যক্তিগত অধ্যাত্মসাধনায় যে শাস্ত্রের সমস্যার সমাধান মেলে না, সে বিষয়ে নবজাগরণের কোনও কোনও নেতৃবৃন্দ তাঁদের গভীর মনীষা এবং সংকল্পের সততা সত্ত্বেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। ইংরেজশাসনের অত্যাচার শোষণের নগ্নরূপ নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত মধ্যবিত্তজীবনের সমস্যা নানা দুঃস্থতার আবিলতায় জটিলতর হয়েছে, কিন্তু আমাদের ধর্মবিশ্বাসঘটিত ধ্যানধারণার অসঙ্গতির

দিকে তাঁদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিশেষ পড়েনি। তাঁদের দ্বিধাগ্রস্ততা, কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মধ্যেই এবং সংশয়দ্বন্দ্বে বিড়ম্বিত হওয়া সত্বেও অধ্যাত্মবিশ্বাস এবং সমাজজীবনের সাযুজ্যস্থাপনের যে উৎকণ্ঠা প্রাগ্রসর চিন্তানায়কদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, তার মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য।

রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীনে আসার পর সমাজ-সংস্কার এবং গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রশ্নে তরুণদলের সঙ্গে তাঁর এবং অন্যান্য প্রবীণ নায়কদের বিরোধ দেখা দেয়, তাতে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সেই সমস্যারই টানাপোড়েন লক্ষণীয়; তত্ত্ববোধিনী, সমদর্শী, ধর্মতত্ত্ব, ইণ্ডিয়ান মিরার, তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম-আন্দোলনের পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠায় তারই ইতিহাস বিধৃত।

অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যতদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ততদিন সেখানে সমাজবিবর্তনের নতুন মৌলিক চিন্তাই বলিষ্ঠ ঋজুতায় প্রকাশিত হয়েছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৭৬৮ শকের ১লা শ্রাবণ সংখ্যায় উচ্চবিত্তদের ধর্মাচরণের বৈষয়িক স্বার্থতন্ত্রকে যেভাবে উদ্ঘাটিত করা হয় তা সত্যি উল্লেখযোগ্য: এইক্ষণকার প্রাচীন লোক এবং প্রাচীনদিগের সম্পূর্ণ মতানুগামী যাঁহারা, বিষয়োপযোগী হস্তলিপি এবং কিঞ্চিৎ অঙ্কপাতমাত্র যাঁহারদিগের বিদ্যার সীমা, এবং যাঁহারদিগের এই প্রত্যয় যে কেবল অর্থ উপার্জনই সমুদায় বিদ্যার তাৎপর্য ও তাবৎ জীবনের সুখ—স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহারা চিন্তাই করেন না—দেশের উপকার এ বাক্যের অর্থও তাঁহারদিগের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহারা কেবল স্বার্থের প্রতিই দৃষ্টি রাখেন……সৎ বা অসৎ যে উপায় দ্বারা হউক ধন সঞ্চয় করিয়া তাহা পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্তে রক্ষা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতকার্য বোধ করেন।……ইঁহারদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে ধার্মিক বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা বাল্যক্রীড়ার ন্যায় ধর্মের অনুষ্ঠান করেন। বিষয়সম্পত্তি লাভের আশ্বাসের সহিত আমোদসম্ভোগ এবং সুখ্যাতির আকাঙ্ক্ষা তাহাদিগের ধর্মপ্রবৃত্তির প্রধান সূত্র; নতুবা প্রতিমা অর্চনাতে নৃত্য, গীত, গৃহসজ্জা প্রভৃতির জন্যই বিশেষ মনোযোগী হইয়া প্রচুর অর্থব্যয় অনেকে কেন করেন? এই সমুদয় মনুষ্যের ক্রোড়ে রাশীকৃত ধন স্থাপিত হইলেও তদ্দ্বারা স্বদেশের বিন্দুমাত্র উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই।' পরবর্তী এক সংখ্যায় স্পষ্টই বলা হয়, সামাজিক বিপ্লব ছাড়া সামাজিক কুপ্রথা উচ্ছেদের ও ধর্মসংস্কারের কোনও উপায় নেই: 'সমাজের শান্তি ভঙ্গ না করিয়া কোন্ মহৎ কার্য সম্পাদিত হইয়াছে? রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যতীত কোন্ রাজ্যের দোষাবহ শাসনপ্রণালী পরিবর্তিত হইয়াছে? আপাততঃ অনেকগুলি লোকের কষ্ট ব্যতীত কোন্ সামাজিক কুরীতি উন্মূলিত হইয়াছে?……নির্মল জ্ঞান, প্রথমে সর্বসাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইলে পর দল করিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব মনুষ্য এইরূপ কতই ভাবিতে থাকে, ওদিক হইতে ঈশ্বর একটি অগ্নিময় পুরুষ প্রেরণ করেন, যিনি চতুর্দিকে ধর্মাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন এবং শত বৎসরের কার্য এক বৎসরে সম্পাদন করেন। সকল দেশেই এইরূপে ধর্মপরিবর্তন কার্য সম্পাদিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কিছু নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নহে। অন্যান্য দেশে ধর্মসংস্কার কার্য যেরূপে সম্পাদিত হইয়াছে ভারতবর্ষেও তাহা সেইরূপেই সম্পাদিত হইয়াছে ও হইবে।' চিন্তার এই যুক্তিপরায়ণতা ও

সবলতা সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য নেতারা সমাজপরিবর্তনের এই প্রত্যয়ে বিচলিত হয়ে তার কণ্ঠরোধে সচেষ্ট হন। অক্ষয়কুমার দত্তের যুক্তিপরায়ণ, সমাজচৈতন্য ও বিজ্ঞানবুদ্ধির চর্চায় বিরক্ত, বীতশ্রদ্ধ (এবং হয়ত কিছুটা পরিমাণ আতংকিতও) দেবেন্দ্রনাথ ১৭৮১ শকে (১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র তত্ত্ববোধিনী সভা উঠিয়ে দেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন, অতঃপর অক্ষয়কুমার-বিদ্যাসাগরের অগ্রণী সমাজচিন্তার বাহন না হয়ে পত্রিকা ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে, তার ভূমিকা পরিবর্তিত হয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত আদি ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কারের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে একেবারে অস্বীকার না করলেও অধ্যাত্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধি রক্ষার লক্ষ্যের কাছে তাকে গৌণ করে তোলে। সমাজসংস্কারের আগ্রহে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজসংস্কারককে কোনও কোনও ব্রাহ্মের 'একীভূত' করার প্রবণতার বিরুদ্ধে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি সংখ্যায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয় তা খুবই অর্থপূর্ণ: 'চিরসেব্য ধর্ম ও নৈমিত্তিক কার্য একভাবে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ-সংস্কার একাকার হইয়া মহান অনর্থ উপস্থিত করিবে।...সমাজসংস্কার ও সভ্যতাবর্ধনের অন্ত নাই;......কিন্তু ঈশ্বরোপাসনা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়ব্যবহার, আত্মসংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্মের অঙ্গ সমুদায় দেশ কাল ও অবস্থার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিরন্তর প্রতিপালন করিতেই হইবে। ধর্ম সকল কার্যেরই নিয়ামক; সমুদয়ই ধর্মের অধীন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে; কিন্তু ধর্ম সমাজেরও অধীন নহে, রাজনীতিরও দাস নহে এবং কৃষিবাণিজ্যেরও মুখাপেক্ষী নহে।...সমাজসংস্কার প্রভৃতি সাংসারিক কার্য লইয়া ব্রাহ্মেরা যদি আপনার রুচি অনুসারে ধর্মের অবিরোধে সহস্র মতে বিভক্ত হইয়া যান, ব্রাহ্মধর্ম সেই সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইবে।' রাজনারায়ণ বসুর মেয়ের সঙ্গে দীননাথ দত্তের 'ব্রাহ্মবিবাহ' নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হলে পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে এই বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় যে একটি অসবর্ণ বিবাহ হলে কোনও মতেই হিন্দু সমাজে সহনীয় হত না: 'তাঁহার দিকের চির পরম্পরাগত এই ব্যবহারটি রক্ষা করাতে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ ভদ্রসমাজের বক্ষঃস্থলে বাস করিয়া অপৌত্তলিক ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন।' হিন্দুধর্মকে পরিচ্ছন্ন, শুদ্ধ করতে হবে ধীর-গতিতে, ধৈর্যের সঙ্গে কারণ 'ক্ষিপ্রকারী হইয়া যদি সময়কে সঙ্কোচ করিতে চাও, সমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইবে; বিপ্লবের অনেক দোষ' (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৯ শক, চৈত্র)। এই ছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজের ঘোষিত লক্ষ্য! নারীদের সতীত্বরক্ষা এবং ত্রুটি উল্লেখ করা স্বত্বেও জাতিভেদ প্রথাকে হিন্দুসমাজের 'ভিত্তিভূমি' রূপে নির্দেশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তার স্বচ্ছতা পরবর্তী-কালের ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তথা তার নায়কদের মধ্যে দুর্লক্ষ্য। তাঁরা ধর্মজীবনের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ নির্ণয়ের সমস্যার তাৎপর্য অনুধাবনে অপারগ হয়েছেন, এ কথা বোঝেন নি যে ধর্ম সংস্কারও একটি সামাজিক প্রক্রিয়া; সমাজ জীবনের প্রচলিত ছকে ঘা না দিলে কোনও না কোনও ভাবে সামাজিক ভাঙাগড়ার গতিশীলতার শক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে ধর্ম-আন্দোলন নীরক্ত হতে বাধ্য।

কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ তরুণ ব্রাহ্মদল সংস্কারের প্রশ্নে যে ভাবে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে

দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, তার ইতিহাস আমাদের সুপরিচিত : '১৮৬৪ সাল হইতেই তাঁহারা বিভিন্ন জাতীয় নরনারীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্যগণ বেদীতে বসিলে তাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচার্য নিযুক্ত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহারা কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাঁহার রক্ষণশীল প্রকৃতি আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাহ্মদলে বিচ্ছেদ ঘটিল। অগ্রসর ব্রাহ্মদল স্বতন্ত্র কার্যক্ষেত্র করিলেন ; "ধর্মতত্ত্ব" নামে মাসিক পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসে দেবেন্দ্র নাথের সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। তদবধি দেবেন্দ্রনাথের সমাজের নাম আদি ব্রাহ্মসমাজ হইল' (শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ)। দেবেন্দ্রনাথের কাছে ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালীর পরিবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে কেশবচন্দ্র সেন, উমানাথ গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ চক্রবর্তী, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বাক্ষরিত যে পত্রটি প্রেরিত হয় তাতে বাংলার নবজাগরণঘটিত নতুন সামাজিক পুরুষার্থের প্রেরণাই আমরা দেখি : ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির উল্লেখ করে তাঁরা বলেন— 'এই উন্নতির স্রোত হইতেই বর্তমান বিরোধ উৎপন্ন হইয়াছে। অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের পুরাতন কার্য্যপ্রণালীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। এই অসন্তোষই এক্ষণকার বিবাদের মূলীভূত কারণ। এ বিবাদ আক্ষেপের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা কোন মতে বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। পরিবর্তনের সময় এরূপ বিবাদ বিসম্বাদ সর্বত্রই হইয়া থাকে, এ সময়ে পুরাতন ও নূতন ভাবের সংঘর্ষণ হয়, উভয় সমর্থনের চেষ্টা হইতে তর্ক বিতর্ক ও কলহবিবাদ উপস্থিত হয় ; কিন্তু অবশেষে ঈশ্বর-প্রসাদে সত্যের জয় এবং কল্যাণের অভ্যুদয় হয়।···জ্ঞানোন্নতি সহকারে ব্রাহ্মধর্মের স্বাধীনতা, উদারতা ও উন্নতিশীলতা অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং ইহা যে পৌত্তলিক ও সাম্প্রদায়িক মত, এবং কি সামাজিক কি গৃহসম্বন্ধীয়, সকলপ্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী তাহাতে তাঁদের প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে' (তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা ১৭৮৭ শক শ্রাবণ)।

মহর্ষিদেবের ব্যক্তিত্বের সহিষ্ণুতা ও শালীনতাবোধের জন্যই সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নসম্পর্কিত এই মতবিরোধে কখনও অশোভন তিক্ততা সৃষ্ট হতে পারে নি। ব্রাহ্ম সমাজের বিভিন্ন অংশের সদস্যরা মৌলিক মত পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর সহানুভূতি, উৎসাহ থেকে বঞ্চিত হন নি, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আনুকূল্যও লাভ করছেন। কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতবিভেদই অত্যন্ত তিক্ত ও কঠিন হয়েছিল। এই তীব্রতার অন্যতম কারণ নিশ্চয়ই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের প্রগতিশীলতা, তাঁরা তাঁদের সমাজচিন্তায় সত্যি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। অন্য পক্ষে, দেবেন্দ্রনাথের সংযমও কেশবচন্দ্রের ছিল না, মহর্ষিদেবের রক্ষণশীলতাও কেশবচন্দ্র এবং তাঁর অনুবর্তীদের বিচার বিমুখ অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তির চর্চার তুলনায় চরিত্রবান ছিল। তীক্ষ্ণ মনীষা ও বাগ্মিতা-শক্তির অধিকারী কেশবচন্দ্র সমাজসংস্কারে উৎসাহী তরুণ ব্রাহ্মদলের নেতৃত্ব করার পর

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই যে কি ভাবে স্বকীয় অবতারত্ব ও অন্ধভক্তিনির্ভর ব্যক্তিবাদে আচ্ছন্ন হন, ভাবতে অবাক লাগে। কেশবচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ভক্তি বিহ্বলতার প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী চাপা ব্যঙ্গে তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-এ লিখেছেন : 'এই ১৮৬৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। নবভক্তির আবির্ভাবে ব্রাহ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। তাহার ফল স্বরূপ তাঁহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের পদে ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ভ করেন। তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশয্য মাত্র।' সমাজশক্তির সচল সজীব ধারায় পূর্ণতা পায় না বলেই কি আমাদের দেশের ব্যক্তিচৈতন্যের জিজ্ঞাসা সন্ধান শুধু স্ফুলিংগ ঝরিয়েই শেষ হয়ে যায়, চিন্তানায়কেরা অতি সহজেই দেউলিয়া হয়ে পড়েন প্রবল কোনও দ্বন্দ্বের চাপ ছাড়াই? এই ধর্মীয় বিকারের মনোলৌল্যের লক্ষ্যভ্রষ্টতার তুলনায় ইতালীর ষোড়শ শতাব্দীর স্যাভাকোরালাদের মত ধর্মীয় নেতাদের সমস্ত গোঁড়ামি সত্ত্বেও সামাজিক লক্ষ্যবদ্ধ প্রচণ্ড ধর্ম-আন্দোলনের চারিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁর শিষ্যদের ব্যক্তিপূজাকেন্দ্রিক ভক্তির উচ্ছ্বাস বিচারশীল ও সামাজিক অগ্রগতিতে বিশ্বাসী ব্রাহ্মদের কাছে অপ্রীতিকর ঠেকছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত 'কুচবিহার বিবাহ'কে কেন্দ্র করে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বিরোধ বাঁধে এবং তার ফলে তাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ নামে আলাদা সমাজ গঠন করেন। অবশ্যই এই সংঘর্ষ নিছক সাধারণ ধর্মমতের বিরোধ ছিলনা। একদিকে জপতপ দানধ্যান, পূজা ও অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্মের অনুষ্ঠান, ভক্তির উচ্ছ্বাস, গুরুসেবা, অন্যদিকে পারলৌকিক সদ্গতি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে হীন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিতে যদৃচ্ছভাবে সামাজিক নীতিলংঘন ও সমাজের ক্ষতিসাধন, এইভাবে নির্বিবাদে অস্তিত্বকে দ্বিখণ্ডিত করে নিয়ে এবং এই অসঙ্গতি সম্বন্ধে কিছুমাত্র সচেতন না হয়েই প্রশ্নবিহীন, নির্দ্বন্দ্ব আত্মপ্রবঞ্চনার অদ্বৈত স্বর্গে স্থিতিলাভ—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নূতন জীবন-জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত প্রতিটি সৎ চিন্তাশীল ব্যক্তির মত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারাও বিশ্বাস ও জীবনের এই বিচ্ছিন্নতায় যন্ত্রণা বোধ না করে পারেন নি। গণতান্ত্রিক সমাজচেতনার সক্রিয়তায় তাঁদের ধর্মমত দানা বেঁধেছিল বলেই তাঁরা ধর্মবিশ্বাসের সামাজিক দায়ভাগ সম্বন্ধে এত সজাগ ছিলেন। বাল্যবিবাহ জাতিভেদ প্রভৃতি প্রথার উচ্ছেদসাধন, ধর্মীয় আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে স্বাধীন বিবেকের বিদ্রোহ, ধর্মাচরণেও ব্যক্তিবিশেষের বিধানের মত কোনও শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞাকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন, অসবর্ণ ও স্বাধীন প্রেমজ বিবাহ প্রচলন, স্ত্রী স্বাধীনতা ও শিক্ষায় উৎসাহদান প্রভৃতি নীতি ও লক্ষ্যকে তাঁরা অধ্যাত্মজীবনের অপরিহার্য অঙ্গ রূপেই গণ্য করেছেন এবং জীবনাচরণে তাদের বাস্তব রূপায়ণেও অগ্রসর হয়েছেন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা ব্রাহ্মদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে অত্যাবশ্যক গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নিয়মের একটা ছক তৈরির চেষ্টাই করেছিলেন।

কেশবচন্দ্র সেনের অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার সঙ্গে কুচবিহারের যুবরাজের বিবাহ সেই গণতান্ত্রিক

নিয়মাচরণের সমস্ত দায়িত্বকে সুবিধাবাদের স্বেচ্ছাচার ও ব্যক্তিবাদের অহংকারে লংঘন করেছিল বলেই তার রূঢ় আঘাতে শিবনাথ শাস্ত্রীদের সামাজিক বিবেকবোধ অত্যন্ত বিচলিত হয়। ঈশ্বরাদিষ্ট কেশবচন্দ্রের সমস্ত কার্যপ্রণালী সাধারণ বিচারবুদ্ধির নাগালের বাইরে, অলৌকিক রহস্যমণ্ডিত, বাল্যবিবাহ প্রদান ও আনুষ্ঠানিক বিবাহের পৌত্তলিকতার দোষ তাঁকে অর্শায় নি, তাঁর শিষ্যরা এভাবে কুচবিহার বিবাহের সাফাই গাইলে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ' পুস্তিকাটিতে তীক্ষ্ণ কঠিন ভঙ্গিতে এবংবিধ মিথ্যাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন: 'এক ব্যক্তি একবার আহার করিতে বসিয়া বলিয়াছিল—ব্যঞ্জনটা বেশ হইয়াছে, পরে এক এক করিয়া জিজ্ঞাসা করাতে বলিল—লবণ একটু অধিক, হরিদ্রা কম, ঝাল বেশি, জল অধিক, মসলার অভাব। প্রচারকগণও কি সেইরূপ বলিবেন যে বিবাহটি নির্দোষ হইয়াছে তবে কিনা বরের বয়স ১৫ কন্যার বয়স ১৩; তবে কিনা কেশববাবু জাতিভ্রষ্ট বলিয়া সম্প্রদান করিতে পান নাই; তবে কিনা বিবাহের পূর্বে কন্যাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল এবং বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ নান্দিমুখ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত রীতিতে হইয়াছিল; তবে উপাসনাটা একপাশে বসিয়া নম নম করিয়া সারিতে হইয়াছিল এবং উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা উপদেশাদি লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল এবং বাইনাচ প্রভৃতি বন্ধ করিতে পারা যায় নাই। যদি কাহারও ইচ্ছা হয় ইহাকে ব্রাহ্মবিবাহ বলুন। আমি বলিতে পারি না।' শাস্ত্রী মশাই উল্লেখ করেছেন, শুধু ভক্তরাই নয়, কেশবচন্দ্র নিজেও বিশ্বাস করতেন যে 'তিনি সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের সমুদায় কর্ম নিজ বুদ্ধির অধীন হইয়া থাকে, কেশববাবুর দৈনিক আহার পর্যন্ত ঈশ্বরাদেশে হইয়া থাকে। শিবচন্দ্র দেব, দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি নেতাদের স্বাক্ষরিত এবং শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত যে প্রতিবাদপত্র কেশবচন্দ্রের কাছে প্রেরিত হয়, তা পড়ে দেখার প্রয়োজনীয়তাটুকুও তিনি অনুভব করেন নি। এই বিষয়ে 'এই কি ব্রাহ্মবিবাহ'-এ আমরা দেখি: ...'শিবচন্দ্রবাবু, বাবু দুর্গামোহন দাস, বাবু আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ২৩ জন আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম স্বাক্ষর করিয়া যে প্রার্থনাপত্র তাঁহার হস্তে দিলেন, তাহা তিনি পাঠ করিলেন না। আমাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করতে বলিলেন যে, তাহা পাঠ করা তিনি পাপ মনে করেন। কেবল তাহা নহে, তিনি আমাদের কাহার কাহারও নিকট আস্ফালনপূর্বক বলিয়াছেন যে, অন্যের পক্ষে কন্যার অল্প বয়সে বিবাহ দিলে পাপ, তাঁহার পক্ষে এক বৎসরের বালিকার বিবাহ দিলে পাপ হয় না।' নতুন সমাজচৈতন্যের শক্তি উদ্বোধনের সং সঙ্কল্পে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই পুস্তিকাটির লেখক ('সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগত শক্তি ও সামাজিক শক্তি অভিন্ন, এক অপরের সহায়) কেশবচন্দ্রের অবতারসুলভ স্বেচ্ছাচারবাদের বিরুদ্ধে এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে পেরেছিলেন: 'তিনি মহাপুরুষ হন, মহাপুরুষ থাকুন, আমরা তাঁহাকে অপরাপর মনুষ্যের ন্যায় ভ্রান্তজীব মনে করি, ঈশ্বরাদেশকে তাঁহার একচেটিয়া ভাবি না। বর্তমান সময়েই জগতে ধর্মপ্রচারকদিগের মধ্যে তাঁহা অপেক্ষা অন্ততঃ দশগুণ মহৎ লোক দেখিতে পাই; আমরা দিব্যচক্ষে তাঁহার অনেক ত্রুটি ও বিচারশক্তির ভ্রান্তি দেখিতে পাইতেছি; আমরা ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার কিম্বা অপর কোন ব্যক্তির একচ্ছত্র রাজত্ব হইলে তাহাকে শোচনীয় মনে করি; আমরা মত বিষয়ের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা রক্ষাকে ধর্মজগতের প্রাণ রক্ষার উপায় বিবেচনা করি। অতএব

কোন ব্রাহ্ম তুষ্টই হউন আর রুষ্টই হউন, স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি আমরা সত্যের অনুবর্তী কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুবর্তী নহি।'

কুচবিহার বিবাহের পর থেকেই কেশবচন্দ্রের মতবাদ উগ্র হতে থাকে, সাম্প্রদায়িক মতান্ধতায় তিনি তাঁর গোষ্ঠীকে পরিচালিত করতে থাকেন :…'কেশবচন্দ্রের তাঁহার নিজের বিভাগীয় সমাজের 'নববিধান'নাম দিয়া তাহার নূতন বিধি, নূতন সাধন, নূতন লক্ষণ, নূতন প্রণালী প্রভৃতি সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধিগণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া তাহাদের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিধিমতে প্রয়াসী হইলেন' (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ)। কেশবচন্দ্রের অহংবাদী ভাবোন্মত্তায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও যে বিতৃষ্ণা বোধ করেছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনারায়ণ বসুর নিকট লিখিত তাঁর পত্রের এই অংশে তার পরিচয় সুস্পষ্ট : 'যখন তিনি স্বীয় অভিমানে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার আর নাগাল পাই না, তখন আর তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারে মিল হইবে ? যখন তিনি কখন গঙ্গার স্তব করিতেছেন, কখনো রাধাকৃষ্ণের প্রেমগান করিতে রাস্তায় মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কখনো আবার হোম করিতেছেন, কখনো সশিষ্যে বাড়ির পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বলিতেছেন, জোর্ডান নদীতে জ'ন-দি-বেপ্‌টাইস্‌টের দ্বারা বেপটাইস্‌ট হইতেছি, মধ্যে মধ্যে মুশা, ঈশা, সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সশরীরে পরলোকে তীর্থযাত্রা করিতেছেন—তখন এই সকল প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহার সঙ্গে কি প্রকারেই বা মিল হইবে ?'

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ চিন্তাপ্রত্যয় ধর্মীয় ও সামাজিক আচারব্যবহার—জীবনের প্রতিটি অংশেই গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন বলেই নববিধানের সমাজ-নিরপেক্ষ ব্যক্তিবাদের মত্ততার বিরুদ্ধে শুধু ক্ষোভ নয়, দৃঢ় প্রতিবাদই জানিয়েছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে এই ঘোষণাটি তার গণতান্ত্রিক সচেতনতারই অভিজ্ঞান : 'সকল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিকে ইহার অধ্যক্ষসভায় বরণ করা হইবে এবং ইহাতে এক ব্যক্তি বা কয়েক ব্যক্তির কোন প্রভুত্ব থাকিবে না, নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে সাধারণের অভিমত অনুসারে ইহার কার্য সমুদয় সম্পন্ন হইবে, এই সমাজ সাধারণ ব্রাহ্মগণের প্রতিনিধি সমাজ হয় তাহাই এই সকল নিয়ম অবলম্বনের একমাত্র লক্ষ্য।' শিবনাথ শাস্ত্রী এক উপদেশমূলক ভাষণে গভীর সমাজচেতনায় আমাদের অস্তিত্বের সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন : 'দেখা যায়, এই প্রেমভক্তিতেও নরনারীর সম্বন্ধকে উন্নত করে নাই, পবিত্র করে নাই, জনসমাজের পাপ নিবারণ করিতে পারে নাই, বরং এই প্রেমের নামে অন্যান্য পাপাচারসকল প্রশ্রয় পাইয়াছে।……ভারতবর্ষের জ্ঞানসাধক ও প্রেম-সাধক ইহার কেহই সমাজের উন্নতি ও সমাজের উদ্ধারসাধনে সমর্থ হয়েন নাই। আমাদিগের দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের দিকে যদি দৃষ্টিপাত কর, তবে দেখিতে পাইবে যে, সেখানে ধর্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে সমাজসংস্কার এমন কি রাজনীতি সংস্কার পর্যন্ত সংঘটিত হইয়াছে' (২৭ শ্রাবণ, ১৮০০ শক)। পরবর্তী এক বক্তৃতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অপর এক বিশিষ্ট নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র ধর্মচেতনার সামাজিক দায়িত্ব নির্দেশ করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মভাবালুতার নিষ্ফলতাই দেখান : 'কোটি কোটি নরনারী ধর্মসমাজ ও রাজনীতির কঠোর শাসনে অহর্নিশি অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইতেছে,

ব্রাহ্ম পরব্রহ্মের কৃপাসম্ভোগ করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবেন কেন? বিধবা মর্মবেদনায়, নারী সামাজিক অত্যাচারে মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া রহিয়াছে, ব্রাহ্ম পরব্রহ্মের প্রেমসাগরে অবগাহন করিয়াই আপনাকে সুখী মনে করবেন কেন?' (৩রা ভাদ্র, ১৮০০ শক)। সেইজন্যই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন 'ইংলণ্ডের ইনকোয়ারার' সংবাদপত্রে লেখেন যে নিরবচ্ছিন্ন ধর্মসংস্কারই কেশববাবুর জীবনের লক্ষ্য, তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীতে (১লা ভাদ্র, ১৮০০ শক) সে সম্পর্কে বলা হয়: এই উক্তিটি কুচবিহারের বিবাহ অপেক্ষা শতগুণে শোচনীয়! এই উক্তিটির দ্বারা উন্নতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের কার্যের ভিত্তিভূমি কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।' নববিধানের নায়ক ব্রাহ্মসমাজের কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপনের বিরোধী, তিনি কারুর পরামর্শই গ্রহণ করতেন না, সেই স্বেচ্ছাচারিতার মনোভাবের বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতারাই গণতন্ত্রের শক্তিকে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় এভাবে উল্লেখ করতে পেরেছিলেন: 'কি আশ্চর্য! মহাপুরুষের উপদ্রববিহীন হইয়া জগতের রাজশাসন ধর্মপ্রচার প্রভৃতি সকল কার্যই চলিতেছে কেবল ব্রাহ্মগণ একজন মহাপুরুষ, একজন নেতা, একজন পদচিহ্ন অনুসরণ করিবার লোক ভিন্ন চলিতে পারেন না। জগদীশ্বরের কৃপায় আমরা ব্রাহ্মদিগের এই কুসংস্কার অচিরে ভগ্ন করিবার আশা করি। আমরা দেখাইব স্বাধীনপ্রকৃতি ও স্বাধীনচেতা দশজন নিঃস্বার্থভাবে মিলিত হইয়া কার্য করিলে যেরূপ সুন্দর কার্য হয় এরূপ এক ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে কখনই হইতে পারে না' (তত্ত্বকৌমুদী ১৬ই শ্রাবণ' ১৮০০ শক)। নববিধান দল কেশবচন্দ্রকে যেমন ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর ধর্মতত্ত্ব বা 'নবসংহিতা'কে অভ্রান্ত বলে প্রচার করছিলেন, কেশবচন্দ্রও তেমনি তাঁর ধর্মমতের উন্মাদনায় যে সমস্ত সমাজসংস্কার কর্মে পূর্বে তাঁর উৎসাহ ছিল, তাদের প্রবল বিরোধিতা করতে থাকেন: 'নববিধান প্রচারের সময়, নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে তাঁহার পূর্বভাবের কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়াছে। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মিকা-সমাজ স্থাপন করেন; তিনিই বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন করেন; তিনিই বিবিধ প্রকারে নারীগণের চিত্তে উন্নতির আশা উদ্দীপ্ত করেন; তিনিই অবশেষে নারীজাতির শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতাকে লোক-চক্ষে যেরূপ হীন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা শোচনীয়' (মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রদত্ত বক্তৃতা)। বিচারবোধহীন ব্যক্তিপদাশ্রিত ধর্মমত আমাদের দেশে যে কি মর্মান্তিক বিকারে পরিণত হতে পারে, 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় যে উক্তিগুলো ঈশ্বরের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের কথোপকথনরূপে 'ডিভোশনাল' শিরোনামায় প্রকাশিত হত, তাদের মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে, যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে একটি উক্তি: 'তোরা বয়ে গিয়েছিস এবং আমার সমাজের অনেককে গোপনে বয়াইয়া দিতেছিস।'

শুধু সমাজসংস্কারবিরোধিতাই কিংবা গুরুপূজার অন্ধতা নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহিমা কীর্তনের রাজভক্তিতে নিমজ্জিত হতেও নববিধানীদের বিবেক বিন্দুমাত্র পীড়িত হয় নি, তাঁদের মতবাদের এই ছিল অনিবার্য পরিণতি। ধর্ম সম্বন্ধে অভ্রান্ত গুরুবাদের সঙ্গে রাজনীতি বিষয়ে ডিভাইন রাইট অব কিংস্, রাজাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত অধিকারও তাঁরা প্রচার করতে থাকেন। ইণ্ডিয়ান মিরার-এর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বরের সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'ভারতমাতার অনুজ্ঞা'র ঘোষণা করা হয়, ভারতমাতা অর্থাৎ ঈশ্বর বলছেন, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমার গভর্ণমেণ্ট, আমার কন্যা রাণী

ভিক্টোরিয়াকে আমিই নিয়োগ করেছি। এ সম্পর্কে তত্ত্বকৌমুদীতে (১৮০৩ শক ১লা বৈশাখ) তীক্ষ্ণ ভঙ্গিতে যে মন্তব্য করা হয় তা প্রণিধানযোগ্য : 'বর্তমান শতাব্দীতে রাজভক্তিকে ধর্মের মূল সত্য করা কেবল ভারতবর্ষেই শোভা পায়। পতিত দেশকে চিরদিন রসাতলে রাখিবার অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় নাই।……ভিক্টোরিয়া যে দেশের রাণী সে দেশের লোকে রাজাকে ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলিয়া বহুদিন বিশ্বাস করিতে নিবৃত্ত হইয়াছে। যেদিন অত্যাচারী প্রথম চার্লসের মস্তক প্রজা কর্তৃক ছিন্ন হইয়াছে সেদিন হইতে বহু অকল্যাণের জননী এই অনিষ্টকর মত ইংলণ্ড হইতে চিরবিদায় প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ কিনা মিরার প্রকাশ করিতেছেন যে, ঈশ্বর স্বয়ং বলিতেছেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার নিজের গভর্ণমেণ্ট। তবে তো গভর্ণমেণ্টের অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইয়া উঠিল, তবে তো রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলা পাপ হইয়া উঠিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের সমাজচেতনা তাঁদের এদেশের অস্তিত্বের দুর্গতির মূলেই টেনে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁরা মোটামুটিভাবে বুঝেছিলেন যে পরবশ্যতা ভারতবর্ষের জীবনের সামগ্রিক বিকাশের গুরুতর বাধা : 'বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা যাঁহারা অবগত আছেন, পদতলে দলিত হইয়া যাঁহারা দেশের কোটি নির্বাক অধিবাসীর মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা এই হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিশ্চয়ই ক্লিষ্ট হইয়াছেন। রাজপুরুষগণ যদি প্রজার আত্মাকে হীন মনে করিয়া তাহাকে সেইরূপ ব্যবহার প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রজাদের নৈতিক উন্নতির পথে যে সমূহ ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহাতে কি আর সন্দেহ থাকিতে পারে, (তত্ত্বকৌমুদী ১৮০৫ শক ১৬ই পৌষ ?) ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্যের প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের শ্রদ্ধা অবশ্যই ছিল, কিন্তু আদি ব্রাহ্মসমাজের সমাজসংস্কারে উৎসাহহীনতা তথা তাঁর রক্ষণশীলতাকে তাঁরা সমর্থন করতে পারেন নি। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদের অধিকার ও 'নিয়মতন্ত্র প্রণালী' স্থাপনের চেষ্টায় মহর্ষিদেবের প্রবল আপত্তি ছিল, তিনি সমাজের কার্যভার নিজের ও তাঁর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের হাতেই রেখেছিলেন। 'উন্নতিশীল' তরুণ ব্রাহ্মদল খ্রীস্টিয় শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য দর্শনের চর্চায় ধর্ম সম্বন্ধে উদার ভাবাপন্ন হয়েছিলেন, তাও মহর্ষিদেবের মনঃপূত হয় নি। এই উন্নতিশীলদের চিন্তা প্রত্যয় যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে পরিণতি পায়, তখন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ আরও গভীর হয়। এই মূল্যবোধঘটিত পার্থক্যের দু একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১৮০০ শকের ১লা ,বৈশাখ সংখ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সমালোচনায় বলা হয়, এই সমাজে বেদ-বেদান্তের ততটা আদর ও গৌরব দেখা যায় না, 'সাধারণ সমাজ বৈলাতিক অনুকরণে সুপটু ও সুশিক্ষিত,' যেমন সাধারণ সমাজ 'অতিরিক্ত ও পূর্ণ মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন এবং বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কার্যে সেখানে পাশ্চাত্য প্রথার পুংখানুপুংখ অনুসরণ করা হয়। তত্ত্বকৌমুদিতে তার প্রতিবাদ রচিত হয়। গণতান্ত্রিক স্বাধীন চিন্তার যুক্তিবিন্যাসে : স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে প্রত্যেক সভ্য স্ব স্ব রুচি ও বিবেচনা অনুসারে কাজ করবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে সকল প্রকার ব্রাহ্মেরই অধিকার এবং 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে চির-নিপীড়িত পরাধীন অবলাগণের স্বাধীনতার পক্ষপাতী লোক আছেন, উহাও উক্ত সমাজের

গৌরবের কথা।' তাঁদের বেদ-বেদান্তের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে: কিন্তু মনে করুন যদি এমন কোন ব্যক্তি ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, যাঁহার বেদ-বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালবাসা নাই, তাহা হইলে সেরূপ ব্যক্তিকে কি তাড়াইয়া দেওয়া হইবে? ব্রাহ্মসমাজ এ প্রকার সংকীর্ণ অনুদারভাবে কার্য করিতে পারেন না।' হিন্দু শাস্ত্রে যখন কোনওকিছুর অভাব নেই, তখন আমরা কেন অপরের দ্বারস্থ হব, তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত আদি ব্রাহ্মসমাজের এই মতের বিরুদ্ধে তত্ত্বকৌমুদির সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতে সত্য অনন্ত, ধর্ম অনন্ত, মনুষ্যরচিত কোনও গ্রন্থে তা বদ্ধ হতে পারে না; ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে ব্রাহ্মরা অনেক শিখেছেন: 'বিদেশীয় শাস্ত্র হইতে অবশ্য সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। যে সময় অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক ছিলেন, সে সময়ের পত্রিকায় এ প্রকার ভাবের কথা অনেক পাওয়া যায়।'

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন অংশের এই মতবিরোধ বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চিন্তা ও প্রত্যয়ের সমস্যার একটি ইতিহাসই উদ্‌ঘাটিত। ঐ সমাজের অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায়, মাঝে মাঝে সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্বসচেতনতার বিরুদ্ধে কারুর কারুর প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের চিন্তায়ই আমাদের অস্তিত্বের দ্বন্দ্বযন্ত্রণার পটে আত্ম-অন্বেষণের নতুন সচেতনতা উদ্ভাসিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও বিজ্ঞান

অমিয়কুমার মজুমদার

কবিতার কল্পলোক থেকে কবি বারেবারে নেমে এসেছেন জড়জগতের মাঝে। আর যে বিজ্ঞানকে কবি-সাহিত্যিকেরা উপেক্ষা করে এসেছেন, কবি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছেন তাকে। তারই সার্থক ফলশ্রুতি দীর্ঘজীবনব্যাপী অজস্র কবিতাগুচ্ছের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিপুল বিন্যাস।

কাব্যরচনার প্রদোষকাল থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অঙ্কুরিত হয়েছিল। ১২৯২ সালের বৈশাখ মাসে সত্যেন্দ্রনাথ-পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় 'বালক' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূবিদ্যা নিয়ে ছোটদের উপযোগী সুখপাঠ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হতো। ছেলেদের উপযুক্ত ক'রে বিজ্ঞানের প্রবন্ধ লেখার ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের পরে। প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সরস ও সরলভাবে লিখতেন। কবির সরস ভাষার সংগে বৈজ্ঞানিক তথ্য মিলিত হয়ে রসগ্রাহী কাহিনীর সৃষ্টি হ'তো। একটি থেকে উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে—"আহারান্বেষণ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশে ছদ্মবেশ ধারণ কীট পতঙ্গের মধ্যে প্রচলিত আছে তাহা বোধ করি অনেকে জানেন। তাহা ছাড়া, ফুল, পত্র প্রভৃতির সহিত স্বাভাবিক আকার সাদৃশ্য থাকাতেও অনেক পতঙ্গ আত্মরক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুবিধা করিয়া থাকে। একটা নীল প্রজাপতি ফুলে ফুলে মধু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। পুষ্পস্তবকের মধ্যে একটি ঈষৎ শুষ্কপ্রায় ফুল দেখা যাইতেছিল। প্রজাপতি যেমন তাহাতে শুঁড় লাগাইয়াছে অমনি তাহার কাছে ধরা পড়িয়াছে। সে ফুল নহে সে একটি সাদা মাকড়সা। কিন্তু এমন এক রকম করিয়া থাকে যাহাতে তাহাকে সহসা ফুল বলিয়া ভ্রম হয়।"

১২৯৮ সালের (বঙ্গাব্দ) অগ্রহায়ণ মাসে 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাধনার বেশীরভাগ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জীববিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে লেখা। 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ সংগ্রহ' শিরোনামায় বিজ্ঞানের প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই রবীন্দ্রনাথ লিখতেন। জীববিজ্ঞান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির মূল্য যথেষ্ট। ১২৯৮ সালের 'পৌষ' সংখ্যার 'সাধনা'তে রবীন্দ্রনাথের রচিত 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য' শারীরবিদ্যাবিষয়ক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। ঐ সংখ্যাতেই 'গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়' নিবন্ধটি প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞান সাহিত্যে পরিণত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

"আমাদের কর্ণকুহরের এক অংশে তিনটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চোঙের মত আছে তাহার বিশেষ কার্য্য কি এপর্য্যন্ত ভালরূপ স্থির হয় নাই। পূর্বে শরীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে ইহার দ্বারা শব্দের দিক নির্ণয় হইয়া থাকে। কিন্তু সম্প্রতি দুই একজন পণ্ডিত ইহার অন্যরূপ কার্য্য স্থির করিয়াছেন।

তাঁহারা বলেন, আমরা কি করিয়া গতি অনুভব করি এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব

জানা যায় নাই। একটা গাড়ি যদি কোনরূপ ঝাঁকানি না দিয়া সমভাবে সরল পথে চলিয়া যায় তাহা হইলে গাড়ী যে চলিতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না—পালের নৌকা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু গাড়ী যদি ডাহিনে কিম্বা বামে বেঁকে অথবা থামিয়া যায় তবে আমরা তৎক্ষণাৎ জানিতে পারি। পণ্ডিতগণের মতে কর্ণেন্দ্রিয়ের উক্ত অংশই এই গতিপরিবর্তন অনুভব করিবার উপায়। একপ্রকার রোগ আছে যাহাতে রোগী টলমল করিয়া চলে, একপাশে কাৎ হইয়া পড়ে এবং কানে শুনিতে পায় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কর্ণযন্ত্রের বিকৃতিই তাহাদের রোগের কারণ। কোন্ দিকে কতটা হেলিতেছে ঠিক বুঝিতে না পারিলে কাজেই তাহাদের পক্ষে শক্ত হইয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন ভূমির উচ্চনীচতা মাপিবার জন্য কাচের নলের মধ্যে তরল পদার্থ দিয়া একপ্রকার যন্ত্র নির্মিত হয়, আমাদের উক্ত কর্ণপ্রণালীর মধ্যেও সেইপ্রকার তরলদ্রব্য আছে সম্ভবতঃ তাহা আমাদের গতি পরিবর্তন অনুসারে আমাদের স্নায়ুকে সচেতন করিয়া দেয় এবং আমরাও তদনুযায়ী তৎক্ষণাৎ আমাদের শরীরের ভার সামঞ্জস্য করিতে প্রবৃত্ত হই।"১

জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও রবীন্দ্রনাথ দু-একটা প্রবন্ধ লিখেছেন এই পত্রিকাতে। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বরাবরই সজীব ছিল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে পদার্থবিজ্ঞান অপেক্ষা জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান তাঁর চিত্তে বেশী সাড়া জাগিয়েছে তা সামান্য অনুধাবন করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। ক্রমবিবর্তনতত্ত্ব সম্বন্ধে কবি বিভিন্ন বিজ্ঞানীর লেখা গ্রন্থ সযত্নে পড়েছিলেন, কেবল তাই নয় তাকে উপলব্ধিও করতে চেষ্টা করতেন। ১৮৯৩ সালের ১৬ই এপ্রিল তারিখে কুড়ি বছরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে এক পত্রে লেখেন, "এই পৃথিবীর সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে আমাদের যে একটা বহুকালের গভীর আত্মীয়তা আছে, নির্জনে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে অন্তরের মধ্যে অনুভব না করলে সে কি কিছুতেই বোঝা যায়! পৃথিবীতে যখন মাটি ছিল না, সমুদ্র একেবারে একলা ছিল, আমার আজকেকার এই চঞ্চল হৃদয় তখনকার সেই জনশূন্য জলরাশির মধ্যে অব্যক্তভাবে তরঙ্গিত হতে থাকত, সমুদ্রের দিকে চেয়ে তার একতান কলধ্বনি শুনলে তা যেন বোঝা যায়।"২

আর একটি লেখাতেও এইভাব ফুটে উঠেছে। "...পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়ির ভেতরের নারকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানান মূর্তিতে আমায় সঙ্গদান করত।" এই "অর্ধপরিচিত প্রাণীটির" অনুভূতিই বিশ্বজীবনের অখণ্ড অনুভূতির ইঙ্গিত তাতে সন্দেহের তেমন অবকাশ নেই।

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে বাংলায় প্রথম লেখেন রবীন্দ্রনাথ। জড় পদার্থের মধ্যেও প্রাণের অস্তিত্ব বা সজীব পদার্থের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়—জগদীশচন্দ্রের এই গবেষণায় কবি উল্লাসে ভরপুর। বিজ্ঞানীর নতুন গবেষণার উপর কবি প্রবন্ধ রচনা করলেন "জড় কি সজীব?" কবি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্ব আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে বুঝিয়েছিলেন দেখে জগদীশচন্দ্রও কম বিস্মিত হন নি।

১৮৯৫ সালে এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে। নইলে কখনই নির্জীবের প্রতি জীবেরা, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারেনা। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোনো জাতিভেদ নেই, সেইজন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি। নইলে আমাদের উভয়ের জন্য দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত।"৩

জগদীশ-প্রশস্তির সময় তিনি জানালেন, "আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর কয়েকটি বাধা পাইয়াছে। তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হাক্‌সলি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। আচার্য জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের ঐক্য সেতু বিদ্যুতের আলোক আবিষ্কার করিয়াছেন।" জড়ের সাড়া সম্বন্ধে জটিল পরীক্ষাসমূহের ফলাফল কবি অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। এ কেবলমাত্র বিজ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। একটু নমুনা তুলে ধরার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না।

"সজীব মাংসপেশীকে যদি চিমটি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায় তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া উঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থানপতন রেখা আঁকিয়া নেওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গ রেখা (curve) করাতের মত দন্তুর হইয়া অংকিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সংকুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে; দেহবিদ্‌গণ বলেন, দেহ ও পদার্থের মধ্যে এই সাড়াই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।......ধাতু পদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গ রেখা পাওয়া যায় তাহা দন্তুর। সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গ-রেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্য বিশেষের অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্য বিষের কাজ করে।"৪

এই উদ্ধৃতি থেকে আমরা বুঝতে পারি, কবি বিজ্ঞান নিয়ে কিরূপ অনুশীলন করেছিলেন। বিজ্ঞানের প্রতি কবির আকর্ষণ সহজাত ছিল বলে আমাদের দেশের শিক্ষার মধ্যে বিজ্ঞানকে মুখ্য আসন দেবার জন্যে তিনি আগ্রহী ছিলেন। এক ইংরেজী প্রবন্ধে তিনি তাঁর এই মত ব্যক্ত করেন......modern science is Europe's great gift to humanity for all times to come. We, in India, must claim it from her hands, and gratefully accept it in order to be saved from the curse of futility by lagging behind. We shall fail to reap the harvest of the present age if we delay."৫

এর পরেও কবি যখন দেখতে পান যে দেশে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানচর্চা হচ্ছে না তখন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ ক'রে রাখছে।"৬

'বৌঠাকুরাণীর হাট' লেখার সময়েই তিনি বিজ্ঞানের অনেক বই পড়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কবির জীবনীকার শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সদর ষ্ট্রীটের বাসায় থাকাকালীন তিনি হক্সলি, নিউকোম্বস্, লক্‌ইয়ার প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ পাঠ করেন।

প্রভাতকুমার তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিজ্ঞানের পড়া বই—বিশেষ করে জ্যোতির্বিদ্যা বা Astronomy পড়ায় তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) যে কী আনন্দ ছিল। রবার্ট বল্-এর বইগুলি পড়েছিলেন—আমাদেরও পড়তে উৎসাহিত করেন। শেষ জীবনে 'বিশ্ব পরিচয়' লিখতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ছাড়াও আধুনিক পদার্থবিদ্যার বই পড়তে হয়; যেখানে বুঝতে পারতেন না—প্রমথ সেন প্রভৃতিকে ধরে বুঝে নিতেন। অ্যাসট্রনমী ছাড়া জীবতত্ত্বের বইও পড়তেন—তার প্রমাণও প্রচুর। জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখবার জন্য তাঁকে বেশ পড়াশুনা করতে হয়—তবেই না বঙ্গদর্শনে সে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে পেরেছিলেন; জগদীশচন্দ্র কবির প্রবন্ধ পড়ে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।"৭

ইংরেজীতে যা পড়েন, বাংলায় তা লিখতে চান,—কিন্তু পরিভাষার অভাবে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার ক'রে বলতে পদে পদে বাধা পান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা ও আলোচনা হয়। দু'জনেই দেখেন যে, কোন একজনকে দিয়ে বিজ্ঞানের পরিভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, আর তা সম্ভব হলেও সবাই মেনে নেবেন কেন! অতএব কোন সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই সব কাজ সংকলিত, সম্পাদিত ও প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তখন বাংলাদেশে এ ধরণের কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাঁরা এক সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব করেন। নাম দেওয়া হয় "কলিকাতা সারস্বত সম্মিলন"। সভাপতি হন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

কবির এ আশা তখন পূর্ণ হয় নি, একথা বলাই বাহুল্য। ১৩০৫ সালে কবি 'প্রসঙ্গ কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের দেশের বিজ্ঞান চর্চার প্রণালী নিয়ে আলোচনা ও অভিমত প্রকাশ করেন। তখন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানকার গবেষণার কাজ সম্পন্ন হতো ইংরেজীর মাধ্যমে। এতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানচর্চা প্রসারলাভ করতো না। বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত উদ্দেশ্য দেশের সকলকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকিত জগতে নিয়ে আসা। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করবার কাজেই লিপ্ত ছিলেন। উল্লিখিত প্রবন্ধে কবি বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও ও উপকারীতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন, "বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা জিজ্ঞাসা বৃত্তির উদ্রেক, পরীক্ষণ শক্তির সূক্ষ্মতা এবং চিন্তনক্রিয়ার যথাযাথ্য জন্মে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রকার ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত ও

অন্ধ সংস্কার সূর্যোদয়ের মতো দেখিতে দেখিতে দূর হইয়া যায়। বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপায় অবলম্বন করতে হলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।......বাংলায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রচার, সাময়িক পত্র প্রকাশ, স্থানে স্থানে যথানিয়মে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।"

ছেলেবেলাতে কবির পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে বিজ্ঞানের যে বীজ বপন করে, ড্যালহৌসী পাহাড়ে ৺মহর্ষির প্রাকৃতিক শিক্ষার বারিসিঞ্চনে সেই বীজ ক্রমে অংকুরিত হয়ে ওঠে। পিতৃদত্ত শিক্ষার আশ্রয় ক'রে তিনি যে ধারাবাহিক রচনা শৈলাবাসে বসে রচনা করেন তা বিজ্ঞানবিষয়ক। একথা হয়তো অনেকের কাছেই অজ্ঞাত যে তাঁর কাঁচা কলমে সেই রচনাটিই তাঁর জীবনের প্রথম লেখা। জীবনের প্রারম্ভে যে বীজ অঙ্কুরিত হলো, তা লালিত হতে লাগলো সারাজীবন ধরে। জীবনের সায়াহ্নে সেই চারাগাছ 'বিশ্বপরিচয়'রূপ মহীরূপে পরিণত হলো।

তথ্যপঞ্জী :—

১। সাধনা, ১২৯৮, পৌষ সংখ্যা
২। ছিন্নপত্র
৩। কাব্যগ্রন্থ—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত, ১ম খণ্ড, ভূমিকা
৪। 'জড় কি সজীব'—বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ, ১৩০৮
৫। Creative Unity, 1922, p. 193
৬। বিশ্বপরিচয় (৫ম সং, ১৩৪৬) পৃঃ ভূমিকা ৩
৭। "পড়ুয়া কবি"—গ্রন্থজগৎ, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬

ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্র চর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

উর্দু গীতাঞ্জলি :

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে ভারতীয় ভাষায় Gitanjali-র প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় তেলুগু ভাষায়। আদিপুডি সোমনাথ রাও-কৃত এই তেলুগু অনুবাদ কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে নেই, ভারতের অন্য কোনো বিশিষ্ট গ্রন্থাগারে আছে বলেও মনে হয় না। থাকলে 'রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জী'তে এর উল্লেখ পাওয়া যেত। গীতাঞ্জলির এই প্রথম তেলুগু অনুবাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি আধুনিক তেলুগু কবি বেঙ্কট সিঙ্গারাচার্যের অনূদিত "গীতাঞ্জলি"র (প্রকাশকাল ১৯৬১) ভূমিকা থেকে।

তেলুগুর কথা ছেড়ে দিলে ভারতীয় ভাষায় Gitaniali-র প্রথম অনুবাদ প্রচারের গৌরব দাবি করতে পারে উর্দু। নিয়াজ ফতেহপুরী-অনূদিত উর্দু গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। প্রসিদ্ধ উর্দু কবি "হজরৎ অকবর ইলাহাবাদী"কে উৎসর্গীকৃত এই গ্রন্থখানির একটি নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে ১৯৬২ সালে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ব্যবধানে প্রকাশিত এই দুটি সংস্করণই দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে।

নিয়াজ আজ অশীতিপর বৃদ্ধ—'নিগার'-সম্পাদক ও মননশীল লেখকরূপে উর্দুজগতে সুপরিচিত এবং ভারতসরকার কর্তৃক পদ্মবিভূষণে সম্মানিত। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগে উর্দু সাহিত্যে তরুণ নিয়াজের প্রথম আবির্ভাব হয় গীতাঞ্জলির অনুবাদ হাতে নিয়ে। কেবল আবির্ভাব নয়, অনতিবিলম্বে লেখকরূপে প্রতিষ্ঠালাভও ঘটে। বেঙ্কট সিঙ্গারাচার্য গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ করে সাম্প্রতিক তেলুগু সাহিত্যে যে সম্মান অর্জন করেছেন, উর্দুসাহিত্যে নিয়াজ সেই সম্মানের অধিকারী হন পঞ্চাশ বছর আগে।

নিয়াজের গদ্যে অনূদিত "অর্জ্‌-এ-নগমা" (গীতের নিবেদন Song-Offering বা গীতাঞ্জলি) আরও একটি কারণে স্মরণীয়। সেটি হল তাঁর "মুকদ্দমা" অর্থাৎ ভূমিকা। ২২ মে, ১৯১৪— এই তারিখ-চিহ্নিত সুদীর্ঘ ভূমিকাটি নানা কারণে মূল্যবান। প্রথমত, বাংলা ছাড়া অন্য ভারতীয় ভাষায় রবীন্দ্রকাব্যালোচনার এই বোধ করি সূত্রপাত। দ্বিতীয়ত, ভূমিকাটি কেবল মামুলী স্তুতিবাক্য নয়, একটি বিদগ্ধ চিত্তের রসগ্রাহী বিশ্লেষণ। নিয়াজ গীতাঞ্জলি থেকে নানা অংশ উদ্ধৃত করে সেগুলির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের কথা বলেছেন এবং তৎসহ উর্দু-ফরাসী থেকে বিস্তর 'বয়েৎ' আহরণ করে সুফীকাব্যের সঙ্গে গীতাঞ্জলির ভাব-সাম্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন—

> তুমি একটু কেবল বসতে দিও কাছে
> আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
> আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে
> আমি সাঙ্গ করব পরে।

Gitanjali গ্রন্থের এই পঞ্চম কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে উর্দু কবি মুসহফী-র একটি অনুরূপ 'শের' তুলে দেওয়া হয়েছে—

তেরে হোতে জো মুঝে য়াদ ভী আয়া কোঈ কাম
মৈঁনে মৌকুফ উসে ওয়কৃত-এ-দিগর পর রখা।

কিন্তু নিয়াজের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য এখানে নয়, আলোচনাপর্বের জন্য তোলা রইল।

আমরা এবারে অনুবাদের প্রতি নজর দেবো। তার আগে নিয়াজ-গীতাঞ্জলির নব সংস্করণের সংক্ষিপ্ত সূচনা থেকে (সূচনাটির নাম 'গীত-অঞ্জলি') কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি:

"........আজ প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে সেই গ্রন্থ দেখে মনে হচ্ছে যে নতুন করে প্রকাশের আগে এতে অনেক রদবদল করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেমন ছিল প্রায় তেমনিই রেখে দিলুম। "গীতা-নজলি'কে (প্রথম সংস্করণে 'অর্জ্-এ নগমা'র সঙ্গে এই নামটিও ছিল) বর্তমান সংস্করণে যে 'গীত-অনজলি' করা হয়েছে তার কারণ 'গীত' ও 'অনজলি'র মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই কারণে 'গীতা-নজলি' লেখা অসঙ্গত।'

উর্দু লেখকের কাছে 'নজ্‌ম্' ও নগ্‌মা'র মতো 'গীত' শব্দটি পরিচিত হলেও 'অঞ্জলি' ছিল বোধ করি সম্পূর্ণ অজানা। আবার হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা'র নামটিও তিনি শুনে থাকবেন। এই সমস্ত কারণেই হয়ত প্রথম সংস্করণের নামকরণে কিছু বানানবিভ্রাট দেখা দিয়েছিল।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের নামকরণে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, অনুবাদের ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু কিছু রদ-বদল করা হয়েছে। তবে তা সামান্য। আমরা অনুবাদের নমুনা উদ্ধার করছি দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে নিয়াজের অনুবাদ গদ্যে; এবং বলা যায়, তা প্রায় আক্ষরিক। তবে অনুবাদের স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে ব্যাখ্যাত্মক ভঙ্গিতে দু'চারটে অতিরিক্ত শব্দ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক Gitanjali-র দ্বিতীয় কবিতাটি: When thou Commandest me to sing it seems that my heart would break with pride···পাঠকের জিজ্ঞাসা হতে পারে, গান গাইতে বলায় কবির হৃদয় কেন অহঙ্কারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। অনুবাদক সেই সম্ভাবিত জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন বন্ধনীর মধ্যে খুঁজে না পেয়ে।'

রবীন্দ্রগ্রন্থপঞ্জীতে মুদ্রিত তালিকা থেকে মনে হয়—উর্দু গীতাঞ্জলির মোট সংখ্যা ছয়। এই ৬ খানির মধ্যে আমাদের দেখার সুযোগ হয়েছে মাত্র চারখানি। এ ছাড়া গ্রন্থপঞ্জীতে অনুল্লিখিত আরও একখানি আমরা দেখেছি:

১। গীত-অঞ্জলি (অর্জ্-এ নগ্‌মা)—নিয়াজ ফতেহপুরী—১৯১৪

২। গীতাঞ্জলি—নির্মলচন্দর—১৯৫৩

৩। গীতাঞ্জলি—বালকরাম—১৯৪৪

৪। টেগোর কে গীত—অনুবাদকের নাম নেই—পঞ্জাব লিটারেচার কোম্পানী প্রকাশিত—প্রকাশকাল দেওয়া নেই।

৫। গীতাঞ্জলি—আশা পকেট বুক সিরিজ—অনুবাদকের নাম ও প্রকাশকাল দেওয়া নেই।

উল্লিখিত বইগুলির মধ্যে প্রথমখানি সম্পর্কে দু'এক কথা আগেই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়

বইখানি ১৯৫৪ সালে ৭ম সংস্করণ বলে প্রচারিত। চতুর্থখানির উপর 'তৃতীয় সংস্করণ' মুদ্রিত। এই সমস্ত 'সংস্করণ' থেকে রবীন্দ্রগ্রন্থের ব্যাপক প্রচার সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে না আসাই নিরাপদ। কারণ 'শিক্ষা-সংস্কৃতির শীর্ষবিন্দু' বাংলা দেশেই যখন সংস্করণের হিসাবে বেপরোয়া 'কারচোবী' চলে তখন অনগ্রসর এলাকায় চলতে বাধা কী?

আমাদের দেখা সবকটি অনুবাদই গদ্যে করা হয়েছে, এবং এগুলির তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করে দেখেছি কোনো অনুবাদই নিয়াজ ফতেহপুরীর রচনাকে অতিক্রম করতে পারে নি। সবগুলিই মনে হয় নিয়াজ-সংস্করণের আদর্শে লিখিত; মাঝে মাঝে কেবল শব্দের হেরফের ঘটানো হয়েছে। Gitanjali-র দ্বিতীয় কবিতাটিই দেখুন:

১। জব তূ মুঝে গানে কা হুক্‌ম্ দেতা হৈ তো ঐসা মালূম হোতা হৈ কি মেরা কলব্ (ইস লুৎফ্ ও পরস্তিশ কী সমাঈ অপনে মেঁ ন পাকর) ফখ্‌র্ ও গরূর্ সে টুকড়ে হো জায়েগা।

২। জব তূ মুঝে গানেকা হুক্‌ম্ দেতা হৈ মুঝে ঐসা মালূম হোতা হৈ কি মেরা দিল্ ফখ্‌র্ সে চুর চুর হো জায়েগা।

৩। জব তূ মুঝে গানে কা হুক্‌ম দেতা হৈ তো ঐসা মহসূস হোতা হৈ কি মেরা দিল কর্তে-ইম্বিসাত সে তেরে লুৎফ্ ও করম কী গুঞ্জাইশ ন রখতা হুআ কিব্‌র্ ও অজব্ সে পারহ্ পারহ্ হো জায়েগা।

৪। জব তূ মুঝে গানে কা হুক্‌ম দে-তা হৈ মৈঁ ঐসা মহসূস করতা হুঁ কি মেরা দিল্ ফখ্‌র্ সে চুর চুর হো জায়েগা।

৫। জব তূ মুঝে গানে কা হুক্‌ম্ দেতা হৈ তো ঐসা মালূম হোতা হৈ কি দিল্ ফখ্‌র্ ও ইম্বিসাত সে মগ্‌লূব্ হুআ চাহ্‌তা হৈ।

তৃতীয় কবিতা I know not how thou singest my master. My master এই পদগুচ্ছের মূল বাংলায় রয়েছে 'গুণী'। বিভিন্ন উর্দু অনুবাদে এর রূপান্তর হয়েছে এই ভাবে: (১) ঐ (=অ্যায়্) মেরে আকা (২) ঐ মেরে মালিক (৩) পরমাত্মন্ (৪) মেরে মালিক। (৫) ঐ মেরে মালিক। ৪র্থ কবিতার Life of my life এর বাংলা ছিল 'প্রাণেশ্বর'। উর্দু অনুবাদে হয়েছে (১) ঐ জানেজাঁ (২) মেরী জানেজাঁ (৩) মেরী জান কী জান (৪) মেরে প্রাণোঁকে প্রাণ (৫) মেরী জান কী জান। ৯ নং কবিতায় আছে O fool...O beggar (বাংলায় এ জাতীয় শব্দ কিছু ছিল না)। উর্দু অনুবাদে পাই (১) ঐ-বেওকূফ... ঐ গদা (২) ঐ মূর্খ...ঐ ভিকারী (৩) ঐ অহমক...ঐ গদা (৪) ঐ পাগল...ঐ ফকীর (৫) ঐ নাদান...ঐ ভিকারী।

গীতাঞ্জলির কোনো কোনো অনুবাদে দেখা যায়, অনুবাদক পাঠকদের অসুবিধার কথা ভেবে অনূদিত কবিতার সঙ্গে কিছু কিছু টীকাটিপ্পনী ও মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। তামিল গীতাঞ্জলির আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীনিবাস রাঘবনের 'কবিয়রচর্ কণ্ডকবিতৈ' গ্রন্থে এই পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখেছি। নির্মলচন্দ্রের উর্দু অনুবাদেও দেখা যায়। যেমন 'তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী'

এই কবিতাপ্রসঙ্গে অনুবাদকের মন্তব্য : 'সমস্ত জীবনের উৎস যিনি, তাঁর বিপুল সৃষ্টি আমরা শুধু দেখতে পারি, কিন্তু এর গভীর রহস্য আমাদের জ্ঞানের বাইরে। নিখিল বিশ্ব সেই আনন্দময় জীবনের প্রতিবিম্ব। জীবনে আনন্দ আছে বলেই আকাশভরা প্রাণ-চঞ্চল গীতোচ্ছ্বাস। যে মানুষ এই বিশ্বব্যাপী জীবন-সঙ্গীত শুনতে পায়, নিঃশেষে মগ্ন হয়ে যায় সে।'

নির্মলচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এক জায়গায় লিখছেন : 'বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গীতাঞ্জলির উচ্চ সমাদর, তখন গীতাঞ্জলির জন্মভূমিতে এর প্রতি সামান্য আগ্রহেরও সৃষ্টি হয় নি। উর্দু ভাষায় গীতাঞ্জলির যে অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা ভুলে ভরপুর। এবং তাতে গীতাঞ্জলির আসল তাৎপর্য প্রকাশিত না হয়ে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, দীর্ঘকাল যাবৎ একখানি উর্দু অনুবাদের নাম চলে আসছে—'গীতাঞ্জলি,' এবং এই ভুলের প্রতি আজ পর্যন্ত কারও নজর পড়েনি।…গীতাঞ্জলি অনুবাদের সময়ে আমি কেবল ইংরেজী এডিশন সামনে রাখি নি, বাংলা এডিশনের সঙ্গে তুলনা করে অনুবাদের শুদ্ধি পরখ করার চেষ্টা করেছি।'

যে উর্দু অনুবাদের কথা মনে রেখে নির্মলচন্দ্র এই মন্তব্য করেছেন, স্পষ্ট উল্লেখ না হলেও বুঝতে কষ্ট হয় না যে নিয়াজ ফতেহপুরীকে লক্ষ্য করেই ওটা বলা। নিয়াজের অনুবাদে কিছু গোলযোগ থাকতে পারে, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধকারের চোখে এমন কিছু ভ্রষ্টতা পড়েনি যার জন্য উল্লিখিত কঠোর মন্তব্য করা চলে। মনে রাখা প্রয়োজন, দুজনের মধ্যে নিয়াজের অনুবাদ প্রকাশিত হয় তিরিশ বছর আগে। পূর্বসূরির প্রতি নির্মলচন্দ্রের অশ্রদ্ধা সত্যই বেদনাদায়ক।

নির্মলচন্দ্র বাংলা গীতাঞ্জলির সঙ্গে মিলিয়ে অনুবাদের শুদ্ধি পরখ করেছেন বলে জানিয়েছেন। ফতেহপুরীর সে সুযোগ ছিল না। কিন্তু কেবল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করলেই অপকৃষ্ট হবে এবং বাংলার সংঙ্গে মিলিয়ে নিলেই উৎকৃষ্ট হবে এমন কোনো কথা নেই। এ সম্পর্কে তামিল অনুবাদক শ্রীনিবাস রাঘবনের মন্তব্য স্মরণীয় : 'যে কবিতাগুলির প্রথম প্রস্ফুটন বাংলা ভাষার মধ্য দিয়ে তাদের ইংরেজী রূপ-কে ভিত্তি করে তামিলে অনুবাদ করা সঙ্গত কিনা এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতার অধিকাংশই তাঁর নিজের অনুবাদ। কবি-কৃত অনুবাদকে মূলের মতো ধরে নিয়ে যদি তামিলে রূপান্তরিত করা যায়, নিশ্চয়ই সেটা দোষের বলে গণ্য হবে না।… ফতেহপুরীর অনুবাদের পক্ষে অবশ্যই এই যুক্তি দাঁড় করানো চলে। তা ছাড়া নির্মলচন্দ্রের অনুবাদে কোনো লক্ষণীয় উৎকর্ষের পরিচয় পাই নি। ইতিপূর্বে উদ্ধৃত অংশ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, পরবর্তী সমস্ত অনুবাদ ফতেহপুরীর আদর্শে ও অনুসরণে রচিত। নির্মলচন্দ্রও বাদ যান না।

তিনি মূল বাংলা কবিতার দোহাই পেড়েছেন। কিন্তু মেলাতে গিয়ে দেখা গেল এ সম্পর্কে তাঁর দাবি কিছুটা অতিরঞ্জিত। একটি উদাহরণ দিচ্ছি। গীতাঞ্জলির ১০৫ নং কবিতা ও Gitanjali-র ৯ নং কবিতা ভাবে এক হলেও রূপে ও ভঙ্গিতে অনেক পৃথক। বাংলায় আছে—

আর আমায় আমি নিজের শিরে বইব না।

আর নিজের দ্বারে কাঙাল হয়ে রইব না।……ইংরেজীতে আছে :

O fool, to try to carry thyself upon thy own shoulders! O beggar: to come to beg at thy own door! নির্মলচন্দ্রের উর্দু অনুবাদে হয়েছে :

ঐ মুর্খ! তু অপনে তেঁই অপনে হী কন্ধোঁ পর উঠানা চাহতা হৈ। ঐ ভিখারী! তু অপনে হী দুআর পর ভীখ মাঁগ রহা হৈ?

উদ্ধৃত অংশগুলি তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায়, নির্মলচন্দ্রের দাবি কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে একটি আক্ষেপের কথা জানাই। উর্দু ভাষায় গীতাঞ্জলির অনেকগুলি অনুবাদ হয়েছে বটে, কিন্তু তার একখানিও পদ্যছন্দে নয়। গদ্যের উর্দু যেন হিন্দীরই সগোত্র! মীর, সৌদা, দর্দ, সোজ, গালিব, জৌক যে ভাষায় লিখেছেন তার রঙ-রূপ-গন্ধ আলাদা। আমাদের আফসোস, গালিবের ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ হয় নি। হয়ত হবে না। হয়ত সম্ভব নয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গবীর কথা

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

শুনতে অবাক লাগলেও এ সত্য লুকিয়ে লাভ নেই, আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের তৈরী নয়। জেমস মিল-ওয়র্ড-মার্শম্যান, জোন্স-প্রিন্সেপ-কানিংহাম প্রমুখ পশ্চিমার যৌথ-প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। পাশাপাশি বসালেও উপর্যুক্ত নামগুলি একত্র উচ্চার্য কিনা সন্দেহ। একদল অহংদৃপ্ত ও আত্মতুষ্ট অপরদল বিনত ও ন্যায়নিষ্ঠ। একদিকে মার্শম্যান সাহেবের 'হিসটরি অব বেঙ্গলের' উচ্চমন্যতা অন্যদিকে জোন্স-কানিংহামদের বিস্ময়বিমুগ্ধতা। তদুপরি, বঙ্কিমের দৃঢ় ভর্ৎসনায় বাঙালীর ইতিহাসচেতনতা। কিন্তু সে সচেতনতা মোটামুটি অনতিঅতীতের মুসলমান আমলেই সীমিত। দূরান্তের হিন্দুকীর্তিসম্বল সুবিশাল সংস্কৃত সাহিত্য ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে অদ্যাপি অবহেলিত। অথচ, মুসলমান আমলের বহুকাল আগে থেকেই লোকায়ত সাহিত্যের সমান্তরাল একটি সংস্কৃত সাহিত্য এই বাংলাতেই সৃষ্টি এবং পুষ্টি লাভ করেছিল। পূর্বসূরীর ঔদাসীন্যে এবং শৈথিল্যে সে সম্পদের সঙ্গে সুযোগ আজ প্রায় অসেতুসম্ভব। ইন্দ্রদত্তের বুদ্ধপুরাণ সন্ধ্যাকরের রামচরিতে, চর্যাপদের পদাবলীতে শুধু নামই হয়ে রইল। রাজসাহীর পদ্মাকূলে চন্দ্রগোমী আচার্যের 'পরসৈন্যধ্বংসন' কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে দেশে রীতিমত সমরসাহিত্য গড়ে না উঠলে এ ধরণের গ্রন্থরচনা অসম্ভব ? অতএব নিবেদন, দুর্নীরিক্ষ্য দূর অতীতে অতিরঞ্জন থাকলেও 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল' এই প্রবচনটি সহায় করে কবিকুলের দোরগোড়ায় ভিক্ষা চাওয়াই শ্রেয়। বলার কথা এই, অতীতের অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লেও, সকলে নন কেউ কেউ, যেমন কহ্লণ, সমকালের সামীপ্যে শোভনভাবেই সংযত, মিতবাক্ এবং নৃতবাক্। এবং সেখানেই ইতিহাস আর ইতিহাস নয় মনোহর সাহিত্য। উদাহরণত, রাজতরঙ্গিণীর সেই তেজোজ্জ্বল তরঙ্গটি, বঙ্গবীর প্রসঙ্গটি উদ্ধার্য :

কান্যকুব্জে জয়কেতন উড়িয়ে এসেছেন কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য। প্রবল তাঁর পরাক্রম, বিপুল তাঁর বৈরীবিনাশনী শক্তি। গৌড়পতিও নিবীর্য নন। তথাপি, সম্মুখ সমরে তিনি চিন্তিত। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবতার্ণ হওয়ার অর্থ সহস্র সহস্র নিরপরাধ স্বদেশবাসীর জীবন বিপন্ন করা। অবশেষে স্থির হল, যুদ্ধ নয় শান্তি, বিবাদ নয় সন্ধি। দ্বারস্থ হলেন গৌড়পতি ললিতাদিত্যের শিবিরে। বললেন, 'যুদ্ধ চাই না, বলেন তো পরাভবও স্বীকার করি।' যোগ করলেন, 'আর এই মাতঙ্গগুলি গ্রহণ করুন, আমারই লোক এদের শিক্ষা দিয়েছে।' কাশ্মীররাজের মুখমণ্ডল তখনো প্রসন্ন নয়, তখনও কুঞ্চিত গৌরাননে কৌটিল্যের স্পষ্ট সংকেত। গৌড়পতি সবিনয়ে জানালেন 'আরও যদি কামনা থাকে ব্যক্ত করুন, সাধ্যমত রাখতে চেষ্টা করব ?' ললিতাদিত্য বিগলিত হলেন, 'না-না, এই যথেষ্ট। বিদায়বেলায় গৌড়রাজকে আমন্ত্রণও জানালেন। কিছুকাল পর কাশ্মীরে পৌঁছে পুনর্বার স্মারকলিপি পাঠালেন। গৌড়পতি নবতম মিত্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, সহচরগণ হাজির হলেন কাশ্মীরে। একদা গৌড়াধিপের শিবিরে এলেন ললিতাদিত্য। বললেন, 'চলুন, আজ আমাদের দেবালয় দেখবেন।' ক্ষুব্ধ গৌড়রাজ মন্ত্রবৎ অনুসরণ করলেন ললিতাদিত্যকে।

এখানেই, ত্রিগামীর কাছে, আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু হল। মৃত্যুবার্তা পৌঁছাল প্রভুসহচর সেই মুষ্টিমেয় বঙ্গপুঙ্গবের নিকট। শোকে নয়, ক্ষোভে ফেটে পড়ল তারা। মরণনৃত্যে হল মাতোয়ারা। কবি কহ্লণ জানালেন, এমন কর্ম বিধাতারও অসাধ্য : বিধাতুরপি অসাধ্যং তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা। প্রকাশ থাক, রাজতরঙ্গিণীর রচনাকাল খৃষ্টীয় বার শতক। কাশ্মীরে তখন মুসলমান আমল। কাশ্মীরের শাসনকর্তা জয়নাল আবদিনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় কবি এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি রচনা করেন। স্মরণীয়, শুধু সভাসদ্‌রাই নন, মুসলমান রাজারাও ইতিহাসলিখনে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মনোগত বৈশিষ্ট্যই এ হেন পার্থক্যের কারণ।

রাজতরঙ্গিণী থেকে হর্ষচরিতে, ললিতাদিত্য থেকে শশাঙ্ক প্রসঙ্গে ফেরা যাক। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের ঐতিহাসিক উপাদানের উৎস মূলত চারটি। এক, হিউ-এন-সাঙের ভারতবিবরণ। দুই, কয়েকটি লিখন-লিপি। তিন, বাণভট্টের হর্ষচরিত। চার, বৌদ্ধগ্রন্থ মঞ্জুশ্রীমূলকল্পের ৫৩ অধ্যায়। এদের ভিতর হর্ষচরিত ও মঞ্জুশ্রীমূলকল্প আমাদের আলোচ্য বিষয়। দুটি গ্রন্থই শশাঙ্কপ্রসঙ্গে অনীহ। বাণ বললেন : প্রকট কলঙ্কোদয়মানম্‌……অকাশতাকাশে শশাঙ্কমণ্ডলম্ (পঞ্চম অধ্যায়)। শশাঙ্ক কলঙ্কিনী চন্দ্রিমার মত। তাঁর যা কিছু সম্পদ্ ঠুনকো, দুরাতের ব্যাপার : কাতরস্য তু শশিন ইব হরিণহৃদয়স্য পাণ্ডুরপৃষ্ঠস্য কুতো স্থিরাত্রমপি নিষ্ফলাঃ লক্ষ্মীঃ (পঞ্চম অধ্যায়)। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প আর একটু এগিয়ে তাঁকে দুষ্টকর্মানুচারি বলে অভিহিত করল : পরাজয়ামাস যোমাখ্যং দুষ্টকর্মানুচারিণম। ততো নিষিদ্ধঃ সোমাখ্যো স্বদেশেনাবতিষ্ঠতঃ॥ নিবর্তয়ামাস হকারাখ্যঃ ম্লেচ্ছরাজ্যেম পূজিতঃ। তুষ্ট কর্মা হকারাখ্যো নৃপঃ শ্রেয়সা চার্থধর্মিণঃ। স্বদেশেনৈব প্রযাতঃ যথেষ্ট গটিনামপি বা। বলা প্রয়োজন, মঞ্জুশ্রীমূলকল্প আদ্যোপান্ত ভবিষ্যৎ বচনে লেখা। এতে ব্যবহৃত নামগুলিও সাংকেতিক। শশাঙ্ক এখানে সোম, হর্ষ হলেন হকার এবং রকার রাজ্যবর্ধন। লক্ষণীয়, শশাঙ্কনিন্দায় পঞ্চমুখ মঞ্জুশ্রীমূলকল্পও স্বীকার করতে বাধ্য যে, অধিক অগ্রসর হতে না পারলেও শশাঙ্ক স্বভূমে সম্রাট্ ছিলেন। তাঁর স্বভূমের বিস্তার ছিল বারাণসীর গঙ্গাতীর পর্যন্ত : সোমাখ্যোপি ততো রাজা একবীরো ভবিষ্যতি। গঙ্গাতীরপর্যন্তং বারাণস্যামতঃ পরম্ (মঞ্জুশ্রীমূলকল্প)॥ হর্ষের সভাপণ্ডিতের এ স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা থাকলেও সন্দেহের অবকাশ নেই। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুবার্তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ণসুবর্ণের রাজনগরী রাঙামাটির প্রাসাদপ্রাঙ্গণে যে জয়ধ্বনি উঠেছিল তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছিল উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজন্যসমাজে। দূর কান্যকুব্জের বুক সেদিন কেঁপে উঠেছিল বঙ্গসেনার বীরবিক্রমে। গৌড়েশ্বরের প্রবল পরাক্রমের কাছে আনত হয়েছিল থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন। বাংলার রাজপতাকা উড়েছিল কান্যকুব্জের বুকে। এবং একথা ভাবলে অবিশ্বাস্য মনে হয়, যিনি বন্দিনী রাজ্যশ্রীর মর্যাদারক্ষায় যত্নবান, স্বেচ্ছায় শৃঙ্খলমোচনে তৎপর তাঁরই পক্ষে তস্করের মত রাজ্যবর্ধনকে অসহায়ভাবে হত্যা করা কেমন করে সম্ভব? ঐতিহাসিক ভিন্‌সেন্ট স্মিথ্ হর্ষ-শশাঙ্ক সংঘর্ষে শশাঙ্কের পরাজয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন এবং নির্দ্বিধায় বলেছেন শশাঙ্কের জীবৎকালে নয়, মৃত্যুর পর গৌড় পরকবলিত হয়। [His kingdom became subject to Harsa at a later date]।

গৌড়পতি মহীপালের কর্ণাটবিজয় উপলক্ষ্যে লেখা আর্য ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটকটির

কথা প্রসঙ্গত স্মরণে আসে। কেমন করে কর্ণাটলক্ষ্মী বঙ্গবীর কর্তৃক লুণ্ঠিত হল তারই সবিশদ্ বর্ণনা এই নাটকটির উপজীব্য। কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। চান্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সেনাপতি যুদ্ধে চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবকে পরাজিত করেছিলেন। কিন্তু গাঙ্গেয়দেবের বীর তনয় কর্ণদেবের দুর্দান্ত শৌর্য, অমিত বিক্রম তুলনারহিত। তিনি 'সকল-ভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুদ্র' তাঁর 'শৌর্যবিক্রমভয়ে' পাণ্ড্যরাজ শান্ত, কেরলরাজ নত। কুঙ্গপতি তাঁর ভয়ে সৎপথে এসেছেন, কিররাজ শুকপাখির মত 'পঞ্জরগৃহে' বাস করতে বাধ্য হয়েছেন। হূনদের দাপট মাথায় উঠেছে। কলঞ্জর পর্বতাধিপতি তাঁকে যমজ্ঞানে ভয় করেছেন (বিহ্লনকৃত বিক্রমাঙ্কদেবচরিত)।

পরবর্তী প্রসঙ্গ কলিযুগরামায়ণ রামচরিত। রচনা উত্তর বাংলার কবি সন্ধ্যাকর নন্দী। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালের গ্রন্থাগার থেকে এই ঐতিহাসিক কাব্যটি উদ্ধার করেন। সন্ধ্যাকরের রামচরিত আর্যায় বাঁধা ২৭৫টি শ্লোক। শ্লেষগাঢ় এই শ্লোকসমূহ দ্ব্যর্থবোধক। একদিকে রাম হলেন অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র অন্যদিকে রামপাল। একদিকে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে জানকীকে উদ্ধার করছেন অন্যদিকে ভীমকে বধ করে রামপাল বরেন্দ্রী করতল গত করছেন। বলা বাহুল্য, শ্রীরামচন্দ্র সমাচার বিঘ্ন আনলেও বঙ্গবীর প্রসঙ্গ রামচরিতে অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং এ প্রসঙ্গ মোটামুটি নিরপেক্ষ। কেননা, সন্ধ্যাকর যাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য রামপালের স্তুতি তিনিও প্রসঙ্গক্রমে ভীম, হরি এবং বরেন্দ্রীর তৎকালীন সামন্তশক্তির কথা উল্লেখ করেছেন। রামচরিতের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একাদশ শ্লোক এবং আরও কয়েকটী শ্লোকে ভীম-রামপালের সংঘর্ষ এবং ভীমবাহিনীর বীরত্ব বর্ণিত হয়েছে। কবি বলেছেন, শত্রুশ্রেষ্ঠ ভীম জীবিত অবস্থায় রামপাল কর্তৃক ধৃত হলেন। তাঁর অনুচরেরা হন্যমান হয়েও কিছুমাত্র কাতরতা প্রকাশ করল না। সন্ধ্যাকরের ভাষায়ঃ সহসা বিঘটনয়া জীবগ্রাহগ্রাহিতাহিতপ্রবরম্। স্ফুরদসমধামসম্পত্তিমীয়-মানবলসংবাধম্ (২।১৭)॥ বরেন্দ্রীর প্রজাপুঞ্জ তাঁদের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যেভাবে জীবনাহুতি দিয়েছেন এবং সন্ধ্যাকর তার যে অনুপম বর্ণনা দিয়েছেন তা গঙ্গারাঢ়ীদের বীরত্ববর্ণনায় মুখর ভার্জিলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রামচরিতে মোট চৌদ্দজন সামন্তের উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন (১) ভীমযশ (২) দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্তী বীরগুণ (৩) দণ্ডভুক্তি ভূপতি জয়সিংহ (৪) দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ (৫) লক্ষ্মীশূর (৬) শূরপাল (৭) তৈলকম্পপতি রুদ্রশেখর, (৮) উচ্ছলপতি ময়গল সিংহ (৯) ডেক্করীয়রাজ প্রতাপ সিংহ (১০) কয়ঙ্গলপতি নরসিংহার্জুন, (১১) সংকট গ্রামীয় চণ্ডার্জুন, (১২) নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ (১৩) কৌশাম্বীপতি গোবর্ধন এবং (১৪) পদবম্বাপতি সোম। উল্লিখিত সামন্তগণ সকলেই বীর ছিলেন। রামচরিতের টীকাকার এঁদের বীরত্বের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। নামবিশেষণেও এর কিছু আভাস মেলে। কেউ হচ্ছেন কান্যকুব্জরাজবাহিনী গঠন-ভুজঙ্গ-মগধ-পীঠপতি। কেউ নানারত্ন মুকুট-কুট্টিম-বিকট-কোটাটবী কন্ঠিরবো-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্তী। কেউবা দণ্ডভুক্তি-ভূপতিরদ্ভুত-প্রভাবাকর-করকমল-মুকুল-তুলিতোৎকলেশ কর্ণকেশরী-সারঘল্লভঃ কুম্ভসম্ভবঃ জয়সিংহঃ। আর কেউ হলেন অপর মন্দার মধুসূদনঃ সমস্তাটবিক

সামন্তচক্রচূড়ামণিঃ লক্ষ্মীশূর। সন্ধ্যাকর হলেন বাল্মীকি আর তাঁর কাব্য রামচরিত হল রামায়ণ: অবদানম্ রঘুপতিবৃত্ গৌড়াধিপরাম দেবায়োরেতং। কলিযুগ রামায়ণমিহ, কবিরপি কলিকাল বাল্মীকি॥ কবি সন্ধ্যাকরের রামনামেই বোধ হয় লুকিয়ে রইল সন্ধ্যার সংকেত।

ক্ষণপরেই পাল রাজাদের পালা শেষ, সেনী ঘরানার দাপট ও শেষ হল বলে। বঙ্গসূর্য অস্তাচলে। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্তণ্ড এখন সায়াহ্নের রক্তাক্ত সংবর্ত। সাঁঝের বাতি জ্বলতে না জ্বলতেই প্রকাশ্য রাজপথে সায়ংবেশ-বিলাসিনীরা বিলোল কটাক্ষ হানছে, মঞ্জু মঞ্জির ধ্বনিতে বন্দনা করছে সন্ধ্যাসুন্দরীকে (পবনদূতম্)। 'অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশব সেন', যিনি 'সচিবশতমৌলি-ললিত-পদাম্বুজ' বলে খ্যাত তিনিও কুরঙ্গীদৃশা লজ্জানতা সুন্দরীদের 'নীবীবন্ধ বিসরণে' ব্যস্ত। ঋষি বঙ্কিম রাতের ঘণ্টা বাজালেন: সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।...গাঢ়তর গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল। বাংলার রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীগর্ভে নামিতে লাগিলেন (বিবিধ প্রবন্ধ)।

শিল্পে নজর

নিজেকে রচনার সাথে মানিয়ে নিতে গেলে, নিজের রচনার স্বভাবকে রেওয়াজকে চালিয়ে নিতে হ'লে যে-জিনিসটি শিল্পীর বড়ো বেশী দরকার তাকেই বলি নজর। এটি কিছু পরিমাণে দেখার ব্যাপার। তাই যদি হয়, আমরা তো সবাই দেখি—কেউ সাদা চোখে, কেউ বা কাচ দিয়ে চোখ বাঁধিয়ে নিয়ে। তবু সবাই শিল্পী হ'তে পারিনে কেন? কারণ, যিনি দেখতে পান তিনিই শিল্পী নন, যিনি দেখতে জানেন তাঁরই কপালে শিল্পের রাজটীকা। চোখের দেখার সাথে মনের তাক-করা ভাবনার মেশাল দেওয়াকে বলে দেখতে জানা। নজর হচ্ছে এরই আরেক নাম। আমরা পাখি লতা ফুল আকাশ মাটি নদী পাহাড় দেখি, নদী পাহাড় সাগরপাড় আলোর ঝাড় থেকে সুরু ক'রে সারা দুনিয়া দেখি। কিন্তু কোনো মতেই সেই চোখের কাঁচামালকে মনের ভাবনার কারুকোঠায় চালান ক'রে দিই নে, এমন কি স্মৃতির তোষাখানেতেও সাজিয়ে রাখি নে, তাকে আদর ক'রে। ফলে নজরের মালিকানা না থাকায় শিব গড়তে ব'সে শিব ছাড়া অনেক কিছুই গ'ড়ে ফেলি।

কেউ হয়তো বলবেন, মেনে নিলুম এ কথা যে, শিল্পী হ'তে গেলে তেমন ক'রে চোখের দেখাটাই আসল ব্যাপার যাতে মনের ভাবনাকে জাগিয়ে তোলা যায়; কিন্তু যাঁরা অন্ধ, শিল্পের দেওয়ানে তাঁরা ডাক পান কেমন ক'রে! আমি বলব, চোখে না-দেখার ফাঁকটুকু তাঁরা কানের শোনা দিয়ে পুরিয়ে নিতে পারেন ব'লেই মনের ভাবনার কারুকোঠায় রসদজোগানে ঘাটতি পড়ে না, আর তাই দৃষ্টিহীন হ'য়েও তাঁরা নজরহীন নন।

আবার এমন মানুষও দেখতে পাই যাঁরা শিল্প বোঝেন, শিল্পের মেলায় উৎসুক হ'য়ে ভিড় করেন, শিল্পের ভালো-মন্দ নিয়ে দুচার কথা বলেন, দুপাঁচ কথা লেখেনও, অথচ নিজেরা শিল্পী নন। এর কারণ, মনের ভাবনা এঁদের পুরোপুরি তাক-করা নয়, দিশেহারা,—নাচের সময় মঞ্চের আলো-বদলের মতো। এখন চোখের দেখা বা কানের শোনার সাথে মনের এই চুলবুলে ভাবনা মিশিয়ে নজর হ'য়ে উঠে আধখানা, ঠিক যেন গ্রহণ-লাগা চাঁদ—মায়া ছড়ালেও মোহ জড়াতে পারে না।

নজরের দুটো দিক আছে, একটাকে বলা যাক বাইরের নজর, আর একটা ভেতরের। বাইরের নজর বড়ো বেশী ছড়ানো। শিল্পী যখন কোনো কিছুর অবিকল মূর্তি গড়েন, হুবহু ছবি আঁকেন, যখন তিনি শ্রোতার পীড়াপীড়িতে তাদেরই পছন্দ-করা গান শোনান, দর্শককে খুশি করতে গিয়ে যখন তিনি নাচে বা অভিনয়ে চালের চেয়ে চলনটাকেই বড়ো ক'রে তোলেন, নজর তখন দস্তুরমাফিক বাইরের। কারণ বাইরের জগৎকে পেরিয়ে তিনি কিছুতেই নিজের মনের জগতে যেতে পারছেন না, বারোয়ারি চাহিদার কঞ্চুকীর চোখ এড়িয়ে ভেতরমহলের রূপ-রস-রঙ-রীতি

নিয়ে নিজেকে মেখে ধরতে পারছেন না। সাহিত্যের সভাঘরেও একই ব্যাপার। গল্পের বাইরে দাঁড়িয়ে শিল্পী সমান তফাতে রেখে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোকে ঠিক চালিয়ে নিয়ে যান। এখানে তিনি বিরাট ক্ষমতার মালিক। গল্পের মাঝে কে কী ভাবছে, কে কী মনে করছে, কে কী বলবে —সবই তার জানা; এমন বন্ধ ঘরে বা অন্ধকারে কী ঘটে তাও তাঁর চোখে ধরা পড়ে। আর সবচেয়ে মজার কথা, শিল্পীর এমনি ধারা সবজান্তা ভাবটুকু নিয়ে রসিকমনে সন্দেহ জাগে না, ফলে এত সব ব্যাপার তিনি কেমন ক'রে জানতে পেলেন তা নিয়ে শিল্পীরও কোনো জবাবদিহির দায় নেই।

বাইরের নজর মূল বিষয়ের খুব কাছাকাছি যাবার পথ হারায়। সব কিছুকে নিয়েই এর কারবার, তাই কোনো কিছুর সাথেই জমাট আত্মীয়তা গ'ড়ে উঠতে পারে না। এ ধরণের অসুবিধের সামনে যাতে না আসতে হয় সেজন্যে শিল্পী অনেক সময় তাঁর বাইরের নজরকে কিছুটা গুটিয়ে এনে রসিকমনকে রচনার ঘনিষ্ঠ ক'রে তোলেন। তখন গল্পের ভেতরকার কোনো চরিত্র কাহিনীর বাইরের কোনো ঘটনাকে মেলে ধরে; শ্রোতার বা দর্শকের মর্জির সাথে শিল্পীর মেজাজ মিশিয়ে গ'ড়ে ওঠে নাচ-গান-অভিনয়; তখন মূর্তি-ছবি আর পুরোপুরি অবিকল হয় না, ছেনির ঘায়ে তুলির আঁচড়ে শিল্পীর নিজের কথাও বেরিয়ে আসে; শিল্প তখন বস্তু আর ভাবের হরগৌরী। বাইরের নজর আর ভেতরের নজরের এই বোঝাপড়ায় আরো একটা সুবিধে হচ্ছে, সব কিছুকে নিয়ে কারবার না গ'ড়ে—কাহিনীর বাইরে দাঁড়িয়ে একজনের পক্ষে যতটুকু দেখা ও শোনা সম্ভব—নিজের মত আর চরিত্রগুলোর মনের কথা প্রায় বাদ দিয়ে শিল্পী ঠিক ততটুকুই গল্পের মাঝে সাজিয়ে দিতে পারেন। তারপর রসিকমনের 'পরে ভার রইলো সেই কাহিনীধারা থেকেই সমাপ্তি টেনে নেবার। রূপরেখার কারুলোকেও তেমনি সুনয়নার ছবিতে কান ছোঁয়া চোখ এঁকে রসিকমনকে তার মানে খুঁজে বের করবার কাজে লাগিয়ে শিল্পী বসেন তুলির দাগের আড়ালে।

নজর যেখানে ভেতরের, শিল্পী নিজেই সেখানে গল্পের চরিত্র হ'য়ে ওঠেন, মূর্তি-গড়ায় ছবি-আঁকায় ছেনির প্রতিটি আঁচড়ে তুলির প্রতিটি টানে নিজেকেই তিনি ফুটিয়ে তোলেন, গানের সুর নাচের মুদ্রা অভিনয়ের ভঙ্গি—সব কিছুই তাঁর নিজের মনের ব্যাকুলতাকে মেলে ধরে। এই ভেতরের নজরে ভেতরের তাগিদটাই বড়ো, বাইরের চাহিদা সেখানে পৌছয় না। চুপিচুপি যে-ঢেউ উঠছে আবেগের, আড়ালে আড়ালে যে-ধারা বইছে ভাবের আর ভাবনার, ফিরে ফিরে তাতেই ডুব দিয়ে ঘট ভ'রে শিল্পী দাঁড়ান পটের সামনে। তারপর নিজেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে সুরু করেন শিল্পরচনা। এই রচনা বড়ো বেশী ক'রে শিল্পীর একার; এখানে তিনি নিজেই খেলা, নিজেই খেলুড়ে। এ ধরণের শিল্পে ঘটনার দর কম, ঘটনাগুলো যে- মানসিক আলোড়ন জাগিয়ে তোলে তাকে নিয়েই কারবার; এখানে রেখা-টানার বাঁধা পথ ভুল হ'য়ে যায়, রঙে রঙে গাঁটছড়া বেঁধে ভাবের নিশান ওড়ে বস্তুকে ছাড়িয়ে; কথাকে পেছনে ফেলে সুরের কারুকাজে তান চলে যৌতাতা খুশিতে—গরাদ টপ্‌কে মেলে-দেওয়া চাউনির মতো। এমনিধারা শিল্পের কারিগরকে আমরা ওস্তাদ ব'লে কুর্নিশ জানাই। আমাদের ভালো-লাগার বৈঠকখানা পার হ'য়ে ভালোবাসার

বালাখানায় তাঁর ডাক পড়ে।

তবে এ কথা ঠিক, ভেতরের নজর শিল্পীর কাছে প্রিয় হ'লেও সহজ রসিকের অবুঝ টান কিন্তু বাইরের নজরের দিকে—যেখানে রস পাওয়া যায়, চাটও মেলে। কারণ ভেতরের নজরের ব্যাপারে শিল্পী নিজের চোখে নিজেকেই দেখেন, অপরের চোখ দিয়ে অপরকে যেমন দেখেন না, তেমনি নিজেকেও না। ফলে একজনের খেয়াল যেখানে সবকিছুকে ছাপিয়ে ওঠে, আরেক জনের খুশি সেখানে ঘা খেয়ে ফিরবেই। তাছাড়া ভেতরের নজর দিয়ে গড়া শিল্প দেখে কোনো রসিকমন যদি ব'লে ওঠে—কিছুই বোঝা গেল না, শিল্পী অমনি মনে মনে তাঁকে রসিকমহল থেকে খারিজ ক'রে দেবেন। মোদ্দা কথা হোলো, ভেতরের নজরে শিল্পী চলবেন আপন চালে, রসিকমনকে সজাগ থেকে তার সাথে পা মিলিয়ে নিতে হবে। আর এই খাটুনি যদি না পোষায় তবে নিশ্চয়ই সে বাইরের নজর-ফলানো শিল্পমেলায় গিয়ে ভিড়বে যা পুরোপুরি না হ'লেও অনেকটা তারই মুখ চেয়ে গ'ড়ে উঠেছে।

আরো একটা কথা বলবার আছে। ভেতরের নজরে শিল্পীর নিজের কালের খাঁটি চেহারাটি প্রায় ধরাই পড়ে না, আর না পড়লেও গড়ন-সাজ বদল ক'রে এমনভাবে ফুটে ওঠে যে, অমুক কাল ব'লে তাকে সনাক্ত করা কঠিন। তখন তার গায়ে কোনো বিশেষ কালের ফোঁটাতিলক নেই, আছে চিরকালের নামাবলী। আমরা ঘরের কোণে যে-পিদিম জ্বালি, আলো তার খুব কাছের লক্ষ্মীর পট পর্যন্ত পৌঁছলেই চলে, কিন্তু আকাশপিদিম সাজাই উঁচুতে, তার আলো ঘরের চালে ছড়ালেও বহুদূরের কোন্ স্বর্গপথে ইশারা মেলে রাখে। ভেতরের নজর যেন ঐ আকাশ-পিদিমের আলো,—ধূলোবালির জগৎ থেকে নানান জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে শিল্পের মাঝখানে তাদের নোতুন ক'রে গ'ড়ে তোলে, আর এই গড়ে-তোলার পথে তাদের বাহার খোলে বটে, কিন্তু খোলনলচে বদল করতে গিয়ে ধূলোবালির খুব চেনা আমেজটুকু হারায়।

আমি ভেতরের নজরের নিন্দে করছি নে, কিংবা তাকে বাতিল করবার জন্যেও গলদগুলো তুলে ধরছি নে; বরং এ কথাই বলতে চাই, শিল্পের দেউল থেকে পাট উঠলে শিল্পই দেউলে হ'য়ে পড়বে। তাছাড়া বাইরের নজর আর ভেতরের নজরকে নিয়ে যে-দুটি মহল গ'ড়ে উঠেছে তাদের তফাৎটুকু ঘুচিয়ে দেওয়াও ঠিক হবে না। কারণ দেওয়াল আমাদের বাধা দেয়—এই মনে ক'রে আমরা যদি তা ভাঙবার কাজে লেগে যাই তবে সব ঘর একাকার হ'য়ে হয়তো অনেক আলো-বাতাস খেলবার সুযোগ ক'রে দেবে, কিন্তু ঘরে দোরে আমাদের চলাফেরায় সুবিধে ক'রে দেবে না। দেয়াল থাকাতে যতটা বাধা পেতুম, না থাকাতে তখন বাধা পাব তার চেয়ে অনেক বেশী। তাই বাইরের নজর থাক হাজার জনের আসরে মনজোগানো হ'য়ে, আর ভেতরের নজর জড়িয়ে পড়ুক জনকয়েকের মন-জাগানোর কাজে।

তবু ভুললে চলবে না, রসের যাচনদার হ'লেও বাইরের নজরের একটা সমাজগত দাম আছে। এর যা কিছু গৌরব তা এখানেই। ভেতরের নজরের গৌরব ডুব দিয়ে তার তল খুঁজে বেড়ানোর গভীরতায়। আর এই দুটি নজর যখন একই আসনে জাঁকিয়ে ব'সে ভারী ঠাট আর হালকা ঠমকে মিশিয়ে শিল্প গ'ড়ে তোলে, তখন মাঝারি রসিকের দল খুশিমনে তার আশেপাশে

ভিড় জমায়। এদিক থেকে এই দো-আঁশ নজরের খাতিরও বড়ো কম নয়।

এ প্রসঙ্গে আরেক ধরনের নজরের কথা মনে পড়ছে। তাকে ধরণ ঠিক বলা যায় না, কারণ নোতুন কিছু নয়। একটি নজর চলতে চলতে হঠাৎ অন্য নজরে বাঁক ফেরে। এর ফলে একই শিল্পে হরেক রকম নজরের মেলা ব'সে যায়। এর নাম দেওয়া যাক বাঁকফেরানো নজর। এই বাঁকফেরানো ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে শিল্পীর অজানিতে, আর রাতারাতি রসিক হ'য়ে ওঠা মনের কাছে তা ধরাও পড়ে না। তবে জেনেশুনে নজরে চমকলাগানো বাঁক ফিরিয়ে শিল্পী অনেক সময় পাকা বনেদী রসিকেরও মন কাড়তে পারেন। কখনো বা নজরের বাঁক ফেরবার ফলে রসিকমন হাঁপ ছাড়বার সুযোগ পায়। এই সুযোগ আসে ঘন রঙের জটিল বুনন পার হ'য়ে হালকা রঙের গভীরতায়, পেশল দেহের ওপরে দুটি করুণ চোখের চাউনিতে, এক স্বর থেকে আরেক স্বরে যেতে মিহি মিড়ের কারুকাজে, নোতুন কাহিনী মেলে ধরবার আগে কোনো চিঠিতে কিংবা বর্ণনায়। তাছাড়া বাঁকফেরানো নজর রসিকমনের ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে পারে, গুটিয়ে নিতে পারে, রসিকমনকে মূল বিষয়ের খুব কাছে নিয়ে যেতে পারে, আবার তা থেকে দূরে সরিয়েও দিতে পারে। আর ঠিক তখুনি এই টানাপোড়েনে শিল্প ওঠে সজীব হ'য়ে।

দেবব্রত চক্রবর্তী

সাহিত্য সংবাদ

Good-bye proud world !
I am going home : Thou art not any friend......
—Emerson.

সত্যদ্রষ্টা ইমার্সন কোন কারণে এই খেদোক্তি করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই কিন্তু একটি তরুণ প্রাণের অকাল বিয়োগের বেদনায় ইমার্সনের কথাগুলি আবার আমাদের স্মরণ করতে হল। মানবতার উপাসক জন ফিংসারেল্ড কেনেডির কণ্ঠ চিরতরে নিস্তব্ধ করে দিয়েছে মানবদেহধারী এক পশু। যদিও নিয়তির অমোঘ বিধানে সেই ঘাতক কঠিন মাটীর তলে আশ্রয় নিয়েছে কিন্তু প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে, মানুষ সভ্যতার বড়াই যতই করুক না কেন, মূলতঃ তার মনের গহনে পাশববৃত্তির বীজ প্রদীপের নীচের অন্ধকারের মতই লুকিয়ে আছে।

যেদিন সাহিত্যের পথ ত্যাগ করে জন কেনেডি রাজনীতির পথে মানব সেবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সেদিন কেউ কি জানত যে যাঁদের সেবায় তিনি মগ্ন, তাঁদেরই একজন কেউ অকালে তাঁর সব আশা আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করে তাঁকে চিরনিদ্রার কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করাবে? না, কেউ জানত না। কিন্তু এখন আমরা জানলাম যে সভ্যতার দামামা যত জোরেই বাজান হোক না কেন পাশবতার বীজ আমাদের মনের মাঝে সুপ্ত রয়েছে, স্থান কাল পাত্র ভেদে সেই বিষবৃক্ষের উন্মীলন হয়। কেনেডির অকালমৃত্যু বিংশ শতাব্দীর দুরপনেয় কলঙ্ক, যা নিয়তই আমাদের সভ্যতার গর্বকে স্পর্শ করে বলবে—তোমরা কেউ আমার বন্ধু ছিলে না। জীবন-শিল্পী জন ফিংসারেল্ড কেনেডি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মূল-মন্ত্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন একটি মাত্র কার্যক্রম যার মর্মার্থ হল শাদা-কালোর ব্যবধান ঘুচিয়ে দেশের একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত সমস্যার আশু সমাধান করা। কিন্তু ২৩শে নভেম্বর শুক্রবারে মৃত্যু আততায়ী রূপ ধরে কেনেডির সেই সৎ প্রচেষ্টার সুষ্ঠু চিন্তাধারাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছে। একটি সুস্থ মানবমন, যাঁর আশ্বাসবাণীতে শত সহস্র নির্যাতিত নিগ্রোর ব্যাকুল চোখে আশার প্রদীপ জ্বলে উঠত, সেই তরুণ মন এযুগের উৎকট রাজনীতির পেষণের চাপে আর কোন আশার বাণী শোনাবে না, উদাত্ত কণ্ঠে সেই জীবন-শিল্পী আর বলবে না—"যা আমাকে করতেই হবে, যত বাধাই আসুক না কেন—।"

রাজনীতির কুটিল পটভূমিকায় তরুণ কেনেডি হয়ত শহীদ হয়ে রইলেন কিন্তু আমরা হারালাম একজন সার্থক সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক বন্ধুকে। 'প্রোফাইলস্ ইন কারেজ,' 'স্ট্রাটেজি অব পীস' ও 'হোয়াই ইংল্যাণ্ড স্লেপ্ট' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা জন কেনেডি যে আর আর লেখনী

চালনা করবেন না একথা মৃত্যুর মতই সত্য। যদিও সাহিত্যের পথ থেকে তিনি ক্রমশঃ সরে গিয়েছিলেন কিন্তু মানবসেবার সৎচিন্তায় তাঁর মন যে পথ বেছে নিয়েছিল তা অত্যন্ত পঙ্কিল বলেই না আমরা অকালে আমাদের এক সাহিত্যিক বন্ধুকে হারিয়েছি। যার অনেক কিছু দেবার ছিল কিন্তু অকস্মাৎ কেন যেন কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে সবকিছুই অপূর্ণ রয়ে গেল কেনেডির অকালমৃত্যুতে হয়তো কয়েকটি নির্বোধ পাষণ্ডের মনে উল্লাসের ঢেউ তুলেছে কিন্তু নির্যাতিত মানুষের চোখে যে অশ্রু ঝরেছে তা দিয়ে কি এ পৃথিবীর পাপ মুছে ফেলা যাবে না?

১৯৬৩ সালের ২৩শে নভেম্বর শুক্রবার হয়ত বিশ্ব-শোক দিবস রূপে চিহ্নিত হয়ে রইল কিন্তু মানবসভ্যতা কোন পথে পা বাড়িয়েছে তা ভেবে আমাদের মন ক্রমশঃ শঙ্কিত হয়ে উঠেছে আর একটি প্রশ্ন বারবার মনের মধ্যে আশঙ্কার ছায়া ফেলে আমাদের উদ্বিগ্ন করে তুলছে—পৃথিবীর মৃত্যু কি অবধারিত?

ঠিক একই দিনে আর একটি অমূল্য জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল দুরারোগ্য ব্যাধির নিষ্ঠুর আক্রমণে। যাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল তীক্ষ্ণদ্যুতি খাপখোলা তলোয়ারের মত। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিক আলডুস হাক্সলির চিন্তাধারা ছিল বিজ্ঞান এবং কাব্যের এক অপূর্ব সমন্বয়ের সাগর সঙ্গম। স্পেশালাইজেশনের চেয়ে ভারসেটালিটির প্রতি হাক্সলির কৌতূহল ছিল দিগন্ত প্রসারী, তাই তাঁর রচনায় আমরা শ্রুত অশ্রুত বহু রাগ রাগিণীর ঐক্যতান এবং বহুতর রসের মধুর সমাবেশ লক্ষ্য করে বিস্মিত হই। হাক্সলির মৃত্যুতে এই চলমান শতাব্দী আর আমরা হারালাম এক চিন্তাশীল নিরলস সাহিত্যসেবীর সাহচর্য। মঙ্গলগ্রহে যাত্রার জাঁক-জমক যাঁরা করেন তাঁদের কি একবারও মনে হয় না যে জীবন যদি সুন্দর না হয় তাহলে এত বিজ্ঞানের বাহাদুরির কোন মূল্যই নেই? এ পৃথিবীর বুকে এমন অনেক বীজাণু আছে যার কোনও প্রতিষেধক নেই অথচ কত না অমূল্য প্রাণ প্রতিদিন তার রোষাগ্নির বলি হচ্ছে আর নিয়তই সমাজের সমূহ ক্ষতি করে চলেছে। ক্যান্সার রোগের যদি কোনও প্রতিষেধক থাকত তাহলে হয়ত আলডুস হাক্সলিকে আমরা এত সহজে হারাতাম না।

* * *

সাহিত্য জগতে নির্যাতনের ইতিহাস সম্ভবতঃ আজও লিপিবদ্ধ করা হয় নি যদি কেউ একাজে ব্রতী হন তাহলে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে তিনি যেন টমাস মান কে বিস্মৃত না হন।

নাৎসী পাপচক্রের বলি টমাস মান যেদিন তাঁর স্বদেশ থেকে নির্বাসিত হলেন সেদিন তাঁর মনের অবস্থা হয়ত কিছুটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু হিটলার যেদিন 'বাডেনব্রুকস' নিধন যজ্ঞে মনুষ্যত্বের ঘৃতাহুতি দান করে বর্বর অট্টহাস্যে সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সভ্যতার মুখোশের ঘনত্ব সামান্যই, তখন যদিও সরব নীরব সবরকম প্রতিবাদই ধ্বনিত হয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধ টমাস মানের চোখের কোণে সেদিন নিরুদ্ধ শোকাশ্রু টলমল করে উঠেছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।

টমাস মান প্রায় নয় বৎসর হল ইহজগৎ ত্যাগ করেছেন সুতরাং যে মনোবেদনায় তাঁর অন্তর নিপীড়িত হয়েছিল তাঁর কাছ থেকে সে ইতিহাস আর কেউ শুনতে পাবে না। কিন্তু তাঁর

একান্ত বন্ধু ও ভক্ত রবার্ট ফেসি আজও জীবিত আছেন। জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান সাহিত্যের এমেরিটাস অধ্যাপক রবার্ট ফেসী কবি এবং ঔপন্যাসিক। ফেসী টমাস মানের সান্নিধ্য লাভ করেন ১৯৩৫ সালে। নাৎসী সরকারের বর্বর অত্যাচারের সীমানা থেকে দূরে জুরিখসীর তীরে টমাস মান তখন মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। ফেসী তাঁর জীবনের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত টমাস মানের সান্নিধ্যে অতিবাহিত করার সুযোগপেয়েছিলেন ওই জুরিখসীর মুক্ত তীরে।

আলাপ যদিও বেশী দিনের নয় তবু তাঁদের মধ্যে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সাহিত্য-চিন্তার মাধ্যমে। তাঁদের মধ্যে যে পত্রালাপ ঘটেছিল তার কয়েকটি 'ব্রিফহ্বেশেল্' নামক এক পত্র সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে বলে প্রকাশ। গত বৎসর জুরিখের আটলান্টিস প্রতিষ্ঠান মূল জার্মান ভাষায় গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন। যাঁরা জার্মান ভাষা জানেন তাঁদের পক্ষে সরাসরি বাংলায় গ্রন্থটির অনুবাদ করা সম্ভব। পত্র সঙ্কলনটির অনুবাদ বাংলা অথবা ইংরাজী ভাষায় যদি আমরা পাই তাহলে টমাস মানের অন্তর্বেদনার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ পরিচয়-লাভ হয়ত আমাদের পক্ষে সম্ভব হতে পারে।

নূতন গ্রন্থ

দি সেক্সপীয়র রেমান্টস্ : গিবসন।

ইদানীং সেক্সপীয়রের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করে যে হট্টগোল চলেছে তার শেষ কোথায় এমন প্রশ্নের সদুত্তর আমাদের অজ্ঞাত। যাঁরা সেক্সপীয়রের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁদের হাতে একটি মাত্র বেসরকারী দলিল আছে, তার মর্মার্থ হল এই—কয়েকটি কবিতা এবং নাটক যে সেক্সপীয়রের লেখা তা তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন ব্যক্তি সমর্থন করেছিলেন, সুতরাং সেক্সপীয়রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ কোথায়? কিন্তু তবুও তো একদল উগ্র সাহিত্যপ্রেমিক বছরের পর বছর সেক্সপীয়রকে নস্যাৎ করবার চেষ্টায় তুমুল সোরগোল তুলে চলেছেন।

সেক্সপীয়রের বিরুদ্ধে যাঁরা আছেন তাঁরা যে দলে বেশ ভারী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কারণ প্রায় পঞ্চাশজনেরও বেশী সাহিত্যিককে সেক্সপীয়রের প্রকল্প হিসেবে সামনে রেখে তাঁরা প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধে ব্রতী হয়েছেন। দুপক্ষই তাঁদের যুক্তির সারবত্তা প্রমাণের জন্য ভারী ভারী বই দু'পক্ষের দিকে নিক্ষেপ করে আশ্বস্ত হবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তর্কের মীমাংসা হয়নি এবং কবে তার সমাপ্তি ঘটবে তাও বলা কঠিন।

সংবাদে প্রকাশ, বাদী ও প্রতিবাদীর দল নাকি আজপর্যন্ত প্রায় চার হাজার গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ধূম্রজালে সেক্সপীয়রকে ঢেকে ফেলেছেন। এই বাদানুবাদের সামগ্রিক রূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা হয়ত সম্ভব হত না যদি গিবসনের "দি সেক্সপীয়র ক্লেমান্টস্" গ্রন্থটি হাতে না আসত। সেক্সপীয়রের প্রতিপক্ষ হিসাবে মুখ্যতঃ যে চারজন সাহিত্যিকের নাম করা হয়েছে তাঁরা হলেন—বেকন, অক্সফোর্ড, ডার্বি এবং মার্লো। গিবসনের গ্রন্থটিতেও উক্ত চারজনের পক্ষে কিছু যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যার সারবত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে। কিন্তু গিবসন ধৈর্য সহকারে এই প্রচণ্ড তর্কযুদ্ধের একটি খসড়া ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তার জন্য তাঁকে আমরা নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানাব।

যদিও এখন পর্যন্ত সেক্সপীয়রের নাম মুছে দেওয়ার মত কোনও মতবাদ পুরানো বিশ্বাসের ভিত্তি মূলে আঁচড় কাটতে সক্ষম হয়নি তবুও গিবসনের গ্রন্থটি যে কৌতূহলোদ্দীপক এবং সুখপাঠ্য একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে।

The shakespeare ‹laimants : H. N. Gibson. 320 pp, illustrated+4 Plates. 1962. Banres & Uoble, New york. S. 6.

দি মিডল্ ইস্ট ১৯৬২ : সম্পাদিত।

রাজনীতির যে প্রচণ্ড ঝড় মধ্য প্রাচ্যের আকাশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছিল তা যে এখন স্তিমিত হয়েছে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। সুতরাং মধ্য প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিচয় সম্বন্ধে পাঠকসমাজের কৌতূহল থাকাই স্বাভাবিক। দি মিডল ইস্ট ১৯৬২ গ্রন্থটিতে মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি বিষয়ক বহু দুরূহ প্রশ্নের জবাব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা বহু কৌতূহলী মনকে আকৃষ্ট করবে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে এটি একটি সুসম্পাদিত আকর গ্রন্থ।

The Middle East—1962 : Edited. 9th Edition xvi+536 two cloumn pages. 1962. Europa, London. S. 13. 50.

অজিত দাস

বাংলা কবিতা ॥ চতুর্থ পর্যায় : পশ্চিম অলিন্দ। সম্পাদক : শান্তি লাহিড়ী। প্রকাশক : সাহিত্য : ১ ডেকার্স লেন, কলকাতা-১ ; দাম চার টাকা।

যেকোন দেশেরই হোক-না কেন, কবিতাকে অভিব্যক্তির সচল পটে রেখে যখনি দেখি বিস্মিত হয়ে যাই। সেকালের, নিকট অতীতের, একালের, কাব্য-কবিতা পাশাপাশি সাজালে, নিরন্তর ও সমূহ পরিবর্তন যে ঘটে চলেছে, তা অস্বীকার করার বিন্দুমাত্র উপায় নেই। অথচ, গভীরতর দৃষ্টিপাত করলে সঙ্গে সঙ্গে এতথ্যও লক্ষ্যগোচর হয়, যে, কাব্যবস্তু মূলত সেই একই আছে। অবশ্য কালক্রমে, পুরনো অনেক বিষয়-উপাদান-উপকরণ পরিত্যক্ত হয়েছে ; অনেক নতুন বিষয়—উপাদান-উপকরণ কবিতার এলাকায় পদক্ষেপ করেছে। কিন্তু তদ্বারা ভাব-পরমাণুর রাজ্যে যে বিরাট কোন বিপ্লব ঘটে গেছে তাও নয়। কারণ কবিতার আশ্রয় সেই প্রকৃতি-প্রেম-মানুষ-সৌন্দর্য-আত্মা-অসুন্দর ইত্যাদি মৌলিক বিষয়। এক্ষেত্রে ধ্রুপদী ও কল্পতন্ত্রী, বস্তুবাদী ও প্রতীকবাদীর মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই।

তাহলে কবিতার বিবর্তিত অভিব্যক্তির উৎস কোথায় ? বদলায় কী ? পরিবর্তন কিসের ? বাগ্‌ভঙ্গীর ? তাতো নিশ্চয়ই ! কিন্তু শুধুই কি ভঙ্গির বদল ? তার বেশি কিছুই না ? আত্মার হেরফেরও না ? তাহলে, কবিতার চলমান স্রোত কি কেবলমাত্র রীতিবদলের ইতিহাস ? প্রাক্-রবীন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রেতর—রবীন্দ্রোত্তর—তদুত্তর বাংলা কবিতা, এই যে অভিব্যক্ত হতে হতে কেবলই এগিয়ে এসেছে—এই অভিব্যক্ত বিবর্তন নিছক ভাষার আর ছন্দের, আর চিত্রকল্পের ? বয়ঃসন্ধিঅন্তে রাধার কি কেবল শরীরী রূপান্তর, মানসী ভাবান্তর নয় ? তা যদি হয়, তবে আত্মা তথা প্রাণশক্তির অনিবার্য নিঃশেষে বাংলা কবিতার পরমায়ু একদিন ধীরে ধীরে অথবা দপ করে নিভে যাবে। ছন্দের অস্ত্রোপচার, চিত্রকল্পের অ্যানাস্থেসিয়া, শব্দের মিক্শ্চার দিয়েও তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

কিন্তু তার প্রয়োজন হয় নি। যেহেতু, কবিতার অভিব্যক্তি শুধুমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিবর্ধন নয়, তার আত্মা ও প্রাণশক্তিরও চলিষ্ণু প্রকাশ। কালে-কালে নতুন বিষয়ের প্রবেশে কাব্যলোক উজ্জীবীত হয়ে ওঠে নিশ্চয়ই। অপিচ, কাব্যাশ্রয়ী মৌল বিষয়গুলি বিভিন্ন দেশে-কালে এক হলেও, ঠিক এক নয়।

কবিতার একদিকে বাহির-জগৎ, অন্যদিকে মনোজগৎ ; দুই কোটীর টানাপড়েনে তার বিচিত্র বুনুনী। সময় এবং নানাবিধ কার্যকারণিক ঘাতপ্রতিঘাতে পরিপার্শ্ব নিরন্তর পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। তার সংযোগে বিপ্রয়োগে মনও বদলে চলেছে। আবার, অন্তর জাগতিক সংঘাতেও মন নিজে নিজে অনেক এগিয়ে যায়। এবং মন বদলের অর্থ : দর্শন ও অনুভূতির, সেই সঙ্গে মানস-প্রক্রিয়ারও বদল। তখন যাকিছু পুরনো, নতুন দৃষ্টিতে স্নান করে নবীন হয়ে ওঠে। সনাতন

মৌলিক বিষয়গুলি নতুন অনুভূতির আলোয় অবগাহন ক'রে নবজাতকরূপে দেখা দেয়। প্রকাশ-ব্যাপারটিও তখন তার বিশ্বস্ত সহযোগিতা করে, নতুনতর শব্দ, বাক্য, ছন্দ, চিত্রকল্প, বিন্যাস, গঠন, অর্থাৎ রূপকর্মের সমস্ত প্রকরণ উপকরণ দিয়ে। সৃজনী সত্তার ভাবুক অংশকে যদি বলি কবি, তার রূপদক্ষ অংশটিকে বলা যায় শিল্পী (রবীন্দ্রনাথ)। কবির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীও চলেন, ভাবের সঙ্গে রূপ। কালিদাস আর রবীন্দ্রনাথে, মৌল বিষয়ের অভিন্নতা স্বত্বেও, এইখানেই পার্থক্য। এই-ভাবেই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজে বারেবারে অতিক্রম করেছেন। আবার, এইভাবেই পরবর্তী কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করেছেন। কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য গড়ে উঠেছে, সাদৃশ্যের ভূমিকা সত্ত্বেও কবিতার ভূমিগুলি সেই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত। সাদৃশ্য মৌল বিষয়ে, পার্থক্য আনুভূতিক দৃষ্টি-প্রদীপের, যার প্রক্ষেপণে মৌল বিষয়ও নবভাবে ও ভঙ্গিতে, অভিনব প্রত্যয়ে ও প্রকরণে দৃষ্টি-গোচর হয়। কল্লোলীয় উচ্ছ্বসিত বিদ্রোহের পরেই মার্কস্‌বাদী বিপ্লবী চেতনা, তার পরেই চল্লিশের দশক।— যখন কতিপয় বুধজন এবং তদনুগামী অবোধ জনেরা বলতে সুরু করলেন : বাংলা কবিতায় আর কোন অগ্রগতি নেই, সমৃদ্ধি নেই, দুর্বোধ্যতার দুর্বহ পাঁকে তার আত্মহত্যা সম্পূর্ণ হতে চলেছে; অন্যপক্ষ ঘোষণা করলেন : এ-শতক প্রস্তুতির যুগ, অবক্ষয়ের নয়, এবং এই প্রস্তুতি সুদীর্ঘকাল ধরে চলবে। কোন-কোন কবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে চাইলেন, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেন কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন কবি। কিন্তু সমস্ত সংশয়—দ্বিধা—ঘোষণা—ভবিষ্যদ্‌বাণীর দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে দেখা দিল পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতা, স্বস্থ ও সুস্থ, যাটের ঘরে পা দিয়েও অটুট যৌবন। মৌল বিষয়ে স্থিত হয়েও প্রত্যয়ে ও প্রকরণে, ভাবে ও রীতিতে আবারও মৌলিক।

বলা বাহুল্য, চল্লিশের দশকে সুস্থ কবিতার জন্ম বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। যেহেতু, নানাবিধ সংঘাতে দশকটি ক্ষতবিক্ষত, রক্তচিহ্নিত—আগস্ট বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ বিপর্যয়ের চূড়ান্ত। জীবনের ও শিল্পায়নের নানা দিকে। আবার এরই মাঝে, এই আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে, স্বাধীনতার মতোই নতুন মন, নতুন শিল্পমনস্কতার জন্ম সূচিত। জটিল উদ্ধত আবার সহজ প্রেমিক জীবনদৃষ্টি, মানসকূট ও বিচিত্র অনুভূতি, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া; বাস্তবকে ছুঁয়েই অন্তর্মুখী; কখনও স্পষ্ট, কখনও তির্যক, কোথাও আবেগ, কোথাও বা আক্রমণ; লুব্ধ অথবা ক্ষুব্ধ, অতৃপ্ত অথবা চপল। বিরাট মহিমান্বিত কোন আদর্শ নয়, তবু আন্তর্জাতিক চেতনা; পীড়িত সমাজবোধ তবু আন্তরজাগতিক চৈতন্য। বাহির ও অন্তরের, চেতন ও অবচেতনের দ্বন্দ্ববিধ্বস্ত প্রতিক্রিয়া। ছোট ছোট ব্যক্তিগত ভাবনা, দেখা, শোনা অনুভূতি—এইসব। সকালের একটুকরো আলো, জলের ক্ষণিক আলপনা, পথের সামান্য দৃশ্য, পাতার ঈষৎ কারুকাজ, একটা গান কি একটু ছবি, আকস্মিক চটুল সুর অথবা স্থায়ী গভীর উপলব্ধি। বাসনার বিচিত্র রতি, প্রকাশের পদ্ধতিও তার অনুসারী; বিবিধ ছন্দের মিশ্রণ, এই ছন্দের নতুন রাগিণী; গদ্যমুখিনতা ও চিত্র কল্পের প্রাধান্য; পদ্যছন্দ যেখানে, সেখানে নবীন আলাপচারী। অপরিচিত অথচ অনিবার্য শব্দ ও বাক্য বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়ার তীর্যক প্রয়োগ, যারা গভীর অনুভূতির সশব্দ বা সচিত্র প্রতীক; বাক্যবিন্যাসের নবনব রীতি, কবিতার শরীর গঠনের, স্তবক রচনার চিত্রল কম্‌পোজিশন। শুধু আত্মস্থ কবিই নয়, নিরপেক্ষ শিল্পীও। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রত্যয় ও প্রকরণে এতদিন ধরে যাকিছু অনুশীলিত হয়ে এসেছে, এখন তারই

সার্বিক ফলশ্রুতি, এবং ততোধিক : 'পুনরধিকারের পুনরর্জনের পুনরুজ্জীবনের মাহেন্দ্রমুহূর্ত, প্রাচুর্যে প্রবলতার সামর্থ্যে ও প্রত্যয়ে স্পন্দমান।' পঞ্চম দশকের বাংলা কবিতার আর একটি সুলক্ষণ—শিল্পক্ষেত্রজ গণতান্ত্রিকতা। এখানে কোন একজন কবি বিরাটত্বে মহিমায় উচ্চতায় সম্রাট নন; সকলেই সমান অংশীদার, সমান উজ্জ্বল। কোন ক্ষেত্রে 'অনেকে মিলে সংহত', কেউবা-'আলাদা বিচ্যুত দ্বীপের মতো আত্মবিলীন,' উভয় কোটিতেই 'অহঙ্কার ও আত্মহনন দুই গণ্ডে আচিত্রিত'। এই তীক্ষ্ণ অহংবোধ এবং আত্মহননবৃত্তি নৈঃসঙ্গ্য ও নিঃস্বতাবোধের অনুসঙ্গী, এবং সবগুলিরই উৎস দ্বন্দ্ব, বিরোধ, ব্যক্তিত্বের অতিবিস্ফার। এসব প্রস্তুত বিষয় নয়, সমকাল থেকেই অনিবার্যভাবে জাত, যার ফলে আজকের সচেতন ও বুদ্ধিজীবী মানুষমাত্রেই স্বরচিত মানসদুর্গের নির্জন অধিবাসী।

কবিরা নির্জনতম অধিবাসী। ওপরের ঢেউ সরিয়ে জীবনের-মানসের-মননের গভীরে, অবচেতনে অতি চৈতন্যে তাঁরা অন্তর্মুখী ডুব দেন, স্পর্শ করেন, এবং সেই গভীরতম বোধগুলিকে রূপায়িত করেন অতি সযত্নে।

তাই কবিতাপাঠ আজ গভীরতম গাঢ়তম অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে, ত্রস্ত চিত্তে কিংবা লঘু পক্ষে নয়, তার জন্যে চাই সমান নির্জনতা : শ্রান্ত স্তব্ধ দুপুর, অথবা নীরব মধ্যরাত্রি, উপলব্ধি উন্মুখ শান্ত মন, স্থির মননও। বর্তমান ব্যস্ততার ভিড়ে এর কোনটাই সহজে মেলে না; তাই কবিতার ললাট থেকে দুর্বোধ্যতার কলঙ্ক আজও মুছে গেল না। অথচ, অন্তত, পঞ্চাশের দশকের তরুণ কবিরা, অনেক স্বচ্ছ ও সুস্থ, যেখানে কচি কবিতা পাঠকের ত্রৈত সাযুজ্য অসম্ভব তো নয়ই, বরং সহজতম সেই দুর্লভ উপনীতি।

ভালোবাসা অন্ধ এতত্ত্বে আমি বিশ্বাস করি না। তবু, কবিতা, বিশেষতঃ সাম্প্রতিক কবিতার প্রতি যাঁদের অনীহা, তাঁদের মনে হতে পারে—সদ্য :-উক্তিগুলি ভালবাসার চক্ষুহীন ভাষা। কিন্তু তা নয়। এবং নয় যে, পঞ্চাশের দশকের কবি ও তাঁদের কৃতি বিষয়ে অবহিত হলে তা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে পত্র-পত্রিকায় ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কবিতা থেকে একাধিক শ্লোক উদ্ধৃতির লোভ সম্বরণ অসম্ভব। কিন্তু আপাতত তার প্রয়োজন নেই। তরুণ কবিতার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকসমাজের আত্যন্তিক পরিচয় সাধনের সহৃদয় উদ্দেশ্যে কবি শান্তি লাহিড়ী সম্প্রতি একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন : 'বাংলা কবিতা। চতুর্থ পর্যায় : পশ্চিম অলিন্দ।' উদ্যোগটি সাধু। প্রয়োজনীয়, তৃপ্তিকরও। (কিছু ভুল সত্বেও) ছাপা বাঁধাই উৎকৃষ্ট, আয়তন বহনযোগ্য, এবং অঙ্গসজ্জা অতুলনীয়। বাংলা কবিতার সংকলন অবশ্য নতুনই চেষ্টা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র পঞ্চাশের দশকের কবিদের একত্র সন্নিবেশ এই প্রথম, এবং তরুণ কবির সম্পাদনাও এই প্রথম। সংকলনটি তাই নিব্যূঢ় বৈশিষ্টের দাবি রাখে। স্বভাবতই, এক্ষেত্রে কবিতার নির্বাচন, সংখ্যাগত ও পরিমাণগত ভারসাম্য ইত্যাদি প্রসঙ্গে সমালোচকের বা পাঠকের অতৃপ্তি ও বক্তব্য থেকে যায়। কিন্তু এ বক্তব্যের শেষ নেই বলেই এখানে এবিষয়ে কোন কথা বলব না। অপিচ, সমালোচনা নয়, বইটির পরিচয়িকাই আপাত-উদ্দেশ্য। তাই, একথা বলেই উপসংহার করব : সাম্প্রতিক কবিতা মনস্ক তো বটেই, যাঁরা অন্যমনস্ক, তাঁদের কাছেও 'বাংলা কবিতা' (আর আরও অনেকগুলি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে) একটি অপরিহার্য গ্রন্থ। যাঁরা কবিতাবিমুখ, তাঁরাও এর রূপসী

সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে (যার সমস্ত কৃতিত্ব মলয়শংকর দাশগুপ্ত ও নির্মলেন্দু দাশগুপ্তের প্রাপ্য) উপহার বা অলংকার হিসেবে স্বল্প মূল্যে সংগ্রহ করে নিরতিশয় খুশিই হবেন ॥

গুরুদাস ভট্টাচার্য

বিষ্ণুপুর ঘরাণা ॥ শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা মূল্য পাঁচ টাকা।

বাংলা ভাষায় গল্প রচনা করা হয়েছে অনেক কিন্তু তার ইতিহাস রচনা হয়নি। বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মানেই বাংলা গানের কাব্যরূপ নিয়ে আলোচনা। চর্যাপদ, মৈমনসিংহ গীতিকা, মঙ্গল গান, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বৌদ্ধ গান ইত্যাদির গীত রীতি আমাদের সঠিক জানা নেই।

বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ চর্চা বাংলা গানের আসরে একটি বিস্ময়কর অধ্যায়। বাংলা দেশের রাজারাজরা ও ধনীরা যখন হাফ আখড়াই, কবির লড়াই বা টপ্পা গানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, বাংলা দেশের নিভৃত কোণে, বিষ্ণুপুরে তখন ধ্রুপদচর্চা হত। এই গানের ঐতিহ্য এলো কোথা থেকে এবং কি করেই বা বিষ্ণুপুরের গান সর্বভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের দরবারে ঘরাণার আসন পেল সেকথা সঙ্গীত ঐতিহাসিকদের জানা দরকার। শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচ্য গ্রন্থে এই জিজ্ঞাসাগুলির সমাধান দিয়েছেন।

কোনও ঘরাণার ইতিহাস বিবৃত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সেই স্থানের সঙ্গীত ঐতিহ্য নির্ণয়। তারপর আসবে নূতন ভাবধারা বা নূতন গীতপদ্ধতির সংঘাত যার ফলে সেই ঘরাণা তার মর্যাদা পাবে। সঙ্গীতের ইতিহাস নিশ্চয়ই রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস নয় তবু ঘরাণার ইতিহাস বলতে হলে রাজনৈতিক ইতিহাসের কথাও বলবার প্রয়োজন আছে, যেহেতু রাজদরবারের প্রাসাদ স্পর্শ না পেলে ঘরাণার কৌলীন্য লাভ হয় না। সুতরাং সমস্ত বিষয়টিই এই রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করতে হবে। দিলীপবাবু আলোচনা প্রসঙ্গে এই সমস্ত দিকগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন এবং যথার্থ ইতিহাসের ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিষ্ণুপুরী ঘরাণার কৃতী সংগীতজ্ঞদের সঙ্গে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী সংগীত বিষয়ক পুস্তক রচনা করে যশস্বী হয়েছেন। উত্তরকালে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঘরাণার ধারক বা বাহক বলেই বিবেচিত। পূর্বোক্ত চারজন খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞদের লেখা পুস্তকে এক রামশংকর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম ছাড়া আর কোনও বিষ্ণুপুরী ওস্তাদের নাম পাওয়া যায় না। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর লিখেছেন,—The old Rajahs of Bissenpur in the District of Bankura were famous for the impetus they gave to the cause of music by

encouraging musicians and fostering its practice in the country. At one time the progress made here was so great, and the number of musicians it produced so large, that the country came to be desinguated as the 'Delhi of Bengal'. Ram Sankar Bhattacharya was one of the distinguished musician of the place…' (Universal History of Music by S. M. Tagore, page 84). আমরা বিষ্ণুপুর ঘরাণা বলতে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি সংগীত গুণীদের নাম জানতাম।

কিছুকাল আগে বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে কিছু ইতিহাস রচনা হয় এবং বিষ্ণুপুরের সংগীতকে কেন্দ্র করেও অনেক নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। এই সমস্ত তথ্যের সঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিদগ্ধ মনীষীদের নামও জড়িয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে নাম করার মতন হল ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, ডাঃ বিনয় ঘোষ, শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র, ঐতিহাসিক অভয়পদ মল্লিক, সাহিত্যিক রামপদ চৌধুরী ও সর্বোপরি বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধারক ও বাহক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তথ্যগুলি একত্রে সন্নিবেশিত করলে এইরকম দাঁড়ায়,—

মোঘলসম্রাট শাহ আলমের আমলে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ দিল্লী থেকে সেনীঘরানার উস্তাদ বাহাদুর খাঁকে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনে বিষ্ণুপুরের দরবারের গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। তাঁর কয়েকজন সাকরেদদের মধ্যে প্রধান সাকরেদ ছিল গদাধর চক্রবর্তী। বিষ্ণুপুর ঘরাণা এই বাহাদুর খাঁ ও গদাধর চক্রবর্তীকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেই হিসাবে সকলের মতে বিষ্ণুপুর ঘরাণা বলতে সেনী ঘরাণাই বোঝায়।

আলোচ্য পুস্তকে লেখক এই সমস্ত কলাবিদদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ করেছেন। লেখক দেখিয়েছেন যে এইমতের প্রধান অসঙ্গতি হল কালগত। ইতিহাস পর্যালোচনা করে প্রতিপন্ন করেছেন যে বাহাদুর খাঁ দ্বিতীয় রঘুনাথের সমসাময়িক ছিলেন না এমনকি দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে বাহাদুর খাঁর পিতার জন্ম হয়েছিল কিনা সন্দেহ। সুতরাং দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে বাহাদুর খাঁর বিষ্ণুপুরে আগমন 'অলীক কিম্বদন্তী মাত্র, বাস্তব ইতিহাস নয়।' এ ছাড়া বিষয়গত অসঙ্গতিও তুলে ধরেছেন প্রচুর।

এই মতগুলি নির্মূল করে লেখক বিষ্ণুপুর ঘরাণার ইতিহাস নতুন করে লিখেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে বিষ্ণুপুররাজ চৈতন্য সিংহের আমলে তাঁর সভাপণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্যের পুত্র রামশঙ্কর ভট্টাচার্য আগ্রার জনৈক হিন্দু উস্তাদের কাছে দুই বৎসর ধরে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সঙ্গীত পারদর্শী ও মেধাবী রামশঙ্করের বিষ্ণুপুর ঘরাণার ভিত্তি স্থাপন করা হয় এইখানেই। প্রমাণস্বরূপ বর্তমানে সংরক্ষিত রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের হস্তলিখিত পুঁথির অস্তিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন এবং তারই অনুলিপি একটি ফোটোপ্লেট, আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

লেখক একের পর এক যুক্তি উত্থাপন করে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন বিশেষ সংযম রেখে বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের কথা স্মরণ করেই বোধকরি যুক্তি তর্কগুলি সুসংবদ্ধ করেছেন। তাঁর আলোচনার ভেতরে কোথাও কারও প্রতি বৈরীভাব নেই অথচ অপর মতামতগুলি খণ্ডন করতে হয়েছে

উদাহরণ তুলে ধরে। বইখানি পড়লেই বোঝা যাবে সে সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়েই তিনি বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। বক্তব্যের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষকে হেয় প্রতিপন্ন করার কোনও প্রচেষ্টা নেই।

বাংলা সঙ্গীতের অনুশীলকগণ বইখানি পড়ে যে উপকৃত হবেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের ইতিহাসপ্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা যথেষ্ট প্রশংসা ও উৎসাহের দাবী রাখে। আশাকরি বিষ্ণুপুরের এই সঙ্গীত ইতিহাস সকলের কাছেই স্বীকৃতি পাবে এবং ইতিপূর্বে প্রকাশিত ভ্রমাত্মক মতবাদগুলি অপনোদন করবার বন্দোবস্ত হবে।

বইখানির ভূমিকা লিখেছেন স্বামী জ্ঞানানন্দ। আলোচনার সারাংশটুকুকে স্বামীজি প্রায় মেনেই নিয়েছেন তবে ঘরাণার উৎস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এখনও রয়ে গেছে। গোয়ালিয়র ঘরাণায় হরিদাস স্বামী মিঞা তানসেনের ইত্যাদি ধ্রুপদীদের সম্পর্ক টেনে এনে স্বামীজি বলেছেন আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবনের উস্তাদরা প্রকৃতপক্ষে এই সেনী ঘরাণার উত্তরসূরী সুতরাং সেইদিক থেকে বিচার করতে হলে বিষ্ণুপুরকে সেনী ঘরাণার অন্তর্ভুক্তই করতে হবে। তাঁর বক্তব্য আর এক অধ্যায়ের সূচনা করলো। এখন রাজামান ও নায়ক বক্সুর ধ্রুপদ প্রীতি ও চর্চাকাল থেকে নতুন করে ইতিহাসের ছক যাচাই করার প্রয়োজন আছে। তবে সেনীঘরাণার কাছে যদি এইভাবে ঋণ স্বীকার করতে হয় তাহলে আমরা বলব যে এই ভাবে সকল ঘরানাই সেনী ঘরাণার কাছে ধ্রুপদী সঙ্গীতে ঋণী।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানানো উচিত প্রকাশককে যিনি অমিত সাহসের পরিচয় দিয়েছেন বইখানি প্রকাশ করে। আর একটি কথা,—কিছু ছাপার ভুল চোখে পড়লো সেগুলিকে দ্বিতীয় মুদ্রণকালে সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

চলো যাই ॥ অমিয় চক্রবর্তী। শ্রীপ্রকাশভবন। এ৬৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-১২ ১'৮০ নঃ পঃ

নানা সময়ে নানাধরণের বই হাতে আসে—তাদের কোনটি গল্পের বই, কোনটি উপন্যাস, কোনটি কাব্য, কোনটি নাটক, কোনটি রম্যরচনা, কোনটি আবার ভ্রমণকাহিনী অর্থাৎ প্রত্যেকটি একটি বিশেষ চৌহদ্দীর মধ্যে আটকানো, বিশেষ বিশেষ ছকের মধ্যেই তাদের আবেদন সীমাবদ্ধ। 'চলো যাই' এমন একটি যা সব ছক, সব চৌহদ্দী পেরিয়ে এক সর্বজনগ্রাহ্য রূপ নিয়েছে। শিশু-সাহিত্য প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত বইটী শুধু শিশু-কিশোরদেরই মন ভোলায় না বয়স্কদেরও আকর্ষণ করে। কবি-লেখকের সঙ্গে সকলেই বলতে চায়, চলো যাই দেশ থেকে দেশান্তরে, গ্রাম নগর থেকে গ্রাম নগরে। কাহিনীর অনুসরণে স্বচ্ছ সরল ভাষা মনকে দেশ থেকে দেশান্তরে টেনে নিয়ে যায় অবলীলাক্রমে।

ইরাণে, ফিনল্যাণ্ডে, আফগানিস্থানে, ন্যুইয়র্কে, জর্মানি, বরিশালে, সীরিয়ায়, অক্সফোর্ডে, ডেনমার্কে, মস্কো শহরে, হল্যাণ্ডে—এই ১১টি ভ্রমণবৃত্তান্ত নিয়ে লেখা বই 'চলো যাই'। অবশ্য কোনটিকেই পূর্ণাংগ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলা চলে না। এ যেন আশ্চর্য কারিগর তার রসের ভিয়ানের আভাসমাত্র বয়ে এনেছে রসিকজনের সামনে। যারা রসপিপাসু তারা সামান্যের মধ্যে অসামান্যের প্রকাশে চমৎকৃত কিন্তু যা পাওয়া যায়নি তার জন্য একটা অতৃপ্তিও থাকে তাদের। লেখক সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, রসসমুদ্রের কূল থেকে তৃষ্ণা দূর না করেই তিনি তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন, অপ্রাপ্যের দায় ভাগ তো তাঁরই।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের অলংকার ও প্রচ্ছদ আশ্চর্যভাবে কাহিনীর সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলেছে। কাহিনীকারের সংগে শিল্পীর এ সংগত কোথাও বিসদৃশ রকম উৎকট হয়ে ওঠেনি এবং সেইটাই শিল্পীর সবচেয়ে বড় বাহাদুরী।

বইটি একাধিক পুরস্কার পেয়েছে এবং নিঃসন্দেহে তা যোগ্য ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়েছে তাই এর সামান্য দু'একটা ত্রুটী অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লেগেছে। উচ্চতার ক্ষেত্রে (পৃঃ ১১) বর্গ ব্যবহার অবান্তর। সিন্ধু পাখীর (পৃঃ ১৭) বদলে সামুদ্রিক পাখী ব্যবহারই বোধ হয় শোভন হত। যদি বিশেষার্থে সীগালের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলেও গাংচিল ব্যবহার করা উচিত ছিল। পরবর্তী এই সামান্য ত্রুটী দু'টি দূর করলে বইটী সর্বাংগ সুন্দর হয়ে উঠবে। এর ছাপা বাঁধাই ভালই বলা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কোন লোকই এ বই পড়ে আনন্দ পাবে।

রবি মিত্র

বৈচিত্র্যের সমন্বয়
পূর্ব রেলওয়ে

সমকালীন

একাদশ বর্ষ ॥ মাঘ ১৩৭০

যত্ন ক'রে টিকেট লাগান

ডাক চলাচল ত্বরান্বিত করুন

* সঠিক মূল্যের টিকেট লাগান

* চিঠিপত্রের ঠিকানা যেদিকে লেখা হয় সেখানে ডানদিকের ওপরের কোণে টিকেট লাগান

* প্রয়োজনীয় মূল্যের যথাসম্ভব কম সংখ্যক টিকেট ব্যবহার করুন

* আলগাভাবে টিকেট লাগাবেন না

ডাক ও তার বিভাগ

DA 63/476

একাদশ বর্ষ ১০ম সংখ্যা

মাঘ তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
ও মনোরঞ্জনে..
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন

ভিন্ন প্রদেশে রবীন্দ্র চর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

পঞ্জাবীতে রবীন্দ্ররচনার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে—কবির মৃত্যুবৎসরে। বাংলার সগোত্র ভাষা অসমীয়া এবং ওড়িআ-র কথা বাদ দিলে ভারতবর্ষে রবীন্দ্রচর্চায় সকলের পিছনে চলেছে পঞ্জাবী। এতে যে ডজনখানেক রবীন্দ্রগ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায় তার তিন-চতুর্থাংশ রচিত হয়েছে কবির জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে। এই থেকেই পঞ্জাবীতে রবীন্দ্রচর্চার স্বল্পতা বোঝা যাবে।

এই সঙ্গে এর কারণগুলিও ভেবে দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যে ভারতের সর্বত্র সমভাবে সমাদৃত হননি তার অনেক কারণের একটি হল সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের তারতম্য। পঞ্জাবীরা জাতিগতভাবে যতটা অসিক্ষেপণে মজবুত ততটা মসী-লেপনে নন। পঞ্জাবী যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের কথাই বিশেষভাবে বিবেচ্য। কারণ পঞ্জাবী মুসলমান যেমন উর্দুর অনুরাগী, পঞ্জাবী হিন্দুর পক্ষপাত তেমনি হিন্দীর প্রতি। ফারসী, নাগরী ও গুরুমুখী এই তিন লিপিতে পঞ্জাবী ভাষার চর্চা হলেও আজ পঞ্জাবী ভাষা ও গুরুমুখী লিপি প্রায় অবিচ্ছেদ্য, একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির কথা ভাবা যায় না। মোট কথা নানা ঐতিহাসিক কার্য-কারণ-সম্পর্কে পঞ্জাবী আজ একটি ধর্মীয় ভাষায় পরিণত; এবং সে ধর্ম হল শিখধর্ম।

শিখ সম্প্রদায়ের দশম গুরু গোবিন্দ সিং প্রতিপক্ষের হাতে পিতৃদেবের শিরশ্ছেদের সংবাদ পেয়ে দুর্জয় প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে বলেছিলেন—'আর পীর নয়, মীর। সন্ত্ নয়, সৈনিক। গুরু নয় যোদ্ধা।' সেই দৃপ্ত ঘোষণা ওঁদের জীবনে মূল মন্ত্র হয়ে রইল। এই পটভূমিকাটি আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় ভাষাগুলিতে যে নতুন ধরনের সাহিত্য দেখা

দিয়েছে—যাকে বলা হয় আধুনিক সাহিত্য—পঞ্জাবী সাহিত্য সেক্ষেত্রে সর্বকনিষ্ঠ। আধুনিক পঞ্জাবী সাহিত্যের উদ্‌গাতা হলেন (প্রথম অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপক) ভাই বীর সিং। যিনি লেখা শুরু করেছিলেন এই শতকের গোড়ায়। বীর সিং-এর কনিষ্ঠ সমকালীন পঞ্জাবী লেখকদের মধ্যে একমাত্র পূরণ সিং ছাড়া ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে আর কারও পরিচয় ছিল বলে জানা যায় না। পঞ্জাবী সাহিত্যিক মহলে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথমে শ্রুত হয় ১৯১৩ সালে, কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে। এর অব্যবহিত পরে শুরু হয় প্রথম মহাযুদ্ধ। সমগ্র পঞ্জাব যুদ্ধ নিয়ে মেতে ওঠে। যুদ্ধের শেষে দেশব্যাপী আশাভঙ্গ, পঞ্জাবে দেখা দেয় তার চরম রূপ। ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিআঁওয়ালাবাগে সেই নির্মম হত্যাকাণ্ড। দশ বছর যাবৎ রাজনৈতিক মঞ্চ ছাড়া পঞ্জাব অন্য কোন সাহিত্যের খবর রাখেনি। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু হয় আধুনিক পঞ্জাবী সাহিত্য-চর্চার অবিচ্ছিন্ন ধারা।

ভারতীয় সংস্কৃতির আর্যরূপ নানা বিবর্তন ও বিকৃতির মধ্য দিয়ে অন্যান্য আঞ্চলিক সাহিত্যে আজও যতটা পরিস্ফুট, পঞ্জাবে ততটা নয়। ভিন্ন ঐতিহ্যের গুরুতর প্রভাবে পঞ্জাব তার মূল থেকে বিশ্লিষ্ট। এক সময়ে আরবী-ফারসী এবং তার ছায়ায় গড়ে-ওঠা উর্দু উত্তর ভারতের জনমানসে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভৌগোলিক কারণে স্বভাবতই সে প্রভাব ব্যাপকতর হয় পঞ্জাবে, পঞ্জাবের ভাষায় ও চিন্তাধারায়। আজ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে পঞ্জাবীদের আত্মমর্যাদা-বোধ প্রখর হয়ে উঠলেও তা আরবী-ফারসী-উর্দুর প্রভাবমুক্ত নয়। উর্দুর পরিবর্তে পঞ্জাবী এবং ফারসী হরফের বদলে গুরুমুখী ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে বটে, কিন্তু তার রূপ ও রুচি অনেকটা স্বভাব-ভ্রষ্ট। একজন পঞ্জাবী যখন গুরুমুখী লিপিতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ লেখেন, তখন তা ফারসী বর্ণবিন্যাসের মধ্য দিয়ে এসে গুরুমুখীতে হাজির হয়। ফলে গুরুমুখী লেখায় তৎসম শব্দের যে নিদারুণ বানান-বিকৃতি ঘটে এমন আর কোন ভারতীয় ভাষায় নয়।

কেবল বানান-বিকৃতি নয়। আরও গোড়াকার কথা ধরা যাক। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে যত পার্থক্যই থাক, বর্ণমালার ক্ষেত্রে সর্বত্র অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ এবং তৎপর কবর্গ ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণের ক্রম মানা হয়। সকলের থেকে আলাদা পঞ্জাবী 'পৈংতী' অর্থাৎ বর্ণমালা। (পঁয়ত্রিশটি বর্ণ নিয়ে গঠিত বলে পঞ্জাবীতে বর্ণমালাকে সাধারণতঃ বলা হয় 'পৈংতী' অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ)। পঞ্জাবী পৈংতীর মূল স্বরবর্ণ মাত্র তিনটি—উড়া, ঐড়া, ঈড়ী অর্থাৎ উ, অ, ই। (এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, উর্দু বর্ণমালাতেও স্বর মাত্র তিনটি—অলিফ্, উয়াও, ইয়ে)। বিশুদ্ধ পঞ্জাবী অভিধান শুরু হয়, 'উড়া' (উ) দিয়ে—এটি হল গুরুমুখী 'পৈংতী'র পহেলা অক্ষর। অন্য বর্ণমালার চতুর্থ অক্ষর (ঈ), গুরুমুখীর চতুর্থ অক্ষর (সস্সা) অর্থাৎ 'স'। পঞ্চম অক্ষর 'হা-হা' অর্থাৎ 'হ'।

এর সঙ্গে যোগ করুন পঞ্জাবী রসিক চিত্তের অত্যধিক গজলপ্রীতি। এক্ষেত্রেও পঞ্জাবী উর্দুর অনুগামী। সুদূর বাংলাদেশের কবি-চিত্তে নবসভ্যতাজাত যে আধুনিকতা জন্ম নিয়েছে তাকে অনুকূল চিত্তে গ্রহণ করবার মতো স্পৃহা, পরিবেশ বা প্রেরণা কোনোটাই পঞ্জাবে ছিল না। পূর্ব ও পশ্চিম, উপনিষদ্ ও বাইবেল, কীট্‌স্ ও যাজ্ঞবল্ক্য—এই বিচিত্রের সমন্বয়ী রবীন্দ্রনাথকে জীবনের যে গভীর ক্ষুধা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে নিত্য সচল রেখেছিল, পঞ্জাবের 'জাতীয়'

জীবনে তার আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

তা ছাড়া, হিন্দী-উর্দু অনুবাদের মধ্য দিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় তখন স্বভাবতই হিন্দী-উর্দু-ঘেঁষা পঞ্জাবীতে তার ভাষান্তর বিশেষ আবশ্যক বলে বিবেচিত হয় নি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় শিক্ষিত শিখসমাজে! কারণ অবশ্য 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটির হিন্দী অনুবাদ, বলা উচিত বিকৃত অনুবাদ। ১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অসুস্থ শরীর নিয়ে কবি লখনউ থেকে লাহোরে যাত্রা করেন। 'রবীন্দ্রজীবনী'র চতুর্থ খণ্ডে বলা হয়েছে : 'এবার লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। 'গুরুগোবিন্দ'কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল তাহা নিরাকৃত হইল; 'আকালী' পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প মূর্তি, তাঁহার শিষ্টাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের এমনই উৎসাহ দেখা দিল যে, তাহারা শান্তিনিকেতনে গুরুদ্বার স্থাপনের জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কবি এই প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মন্দির বা ধর্মস্থাপনের পত্তন প্রবর্তিত হইলে ইহার শেষ কোথায় বলা যায় না।' (পৃঃ ৪)

'গুরু গোবিন্দ' সম্পর্কে আকালী পত্রিকায় কবির কী বক্তব্য প্রকাশিত হয় জানি না, তবে শিখমণ্ডলীর সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় উপলক্ষ্যে রচিত একটি শিখ-মহিমা-খ্যাপক কবিতার কথা জানা যায়, যার শেষ অংশটা এইরূপ : আঠারো বছরের কিশোর নেহাল সিং বলে উঠলো—'চাইনে প্রাণ মিথ্যার কৃপায়, সত্যে আমার শেষ মুক্তি, আমি শিখ।' 'শেষ সপ্তক' গ্রন্থে (দ্রঃ ৩৩ সংখ্যক কবিতা) কবিতাটির রচনাকাল দেওয়া নেই। তবে ১৩৪২ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে 'শিখ' নামে প্রকাশিত এই কবিতাটি মাসতিনেক আগে লাহোর প্রবাসেই রচিত বলে অনুমান করি।

আমাদের মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পঞ্জাবী সাহিত্যে আগ্রহের সঞ্চার হয় ১৯৩৫ সাল থেকে। পঞ্জাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের যেটুকু সমাদর হয়েছে তার মূলে আছে বোধকরি দুটি কারণ। প্রথমত, কবির কিছু সংখ্যক কথাকাব্যে শিখ-জাতীয়তার জ্বলন্ত দাহের প্রকাশ এবং গুরু নানকের পদানুবাদ। দ্বিতীয়ত, কবির কতগুলি কবিতার হ্রস্বতা ও গীত-প্রাণতা, যার মধ্যে পঞ্জাবী রসিক চিত্ত নতুন 'গজল'এর সন্ধান পেয়েছে। গীতাঞ্জলি এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনা।

পঞ্জাবী গীতাঞ্জলি ॥ পঞ্জাবী ভাষায় অনূদিত গীতাঞ্জলির সংখ্যা দুই—একখানির প্রকাশকাল ১৯৪১, অপরখানির ১৯৫৮। প্রথম অনুবাদক হলেন নরিন্দর সিংঘ 'সোচ', যাঁকে আমরা বলবো 'সোচ' অথবা নরেন্দ্র সিং'। দ্বিতীয় অনুবাবাদকের নাম 'অজাইব চিত্রকার', সংক্ষেপে যাঁকে চিত্রকার বলাই সুবিধাজনক। দু'জন অনুবাদকেরই মূল অবলম্বন ইংরেজী গীতাঞ্জলি।

নরেন্দ্র সিং-এর অনুবাদগ্রন্থের টাইটেল পেজ-এ লেখা হয়েছে : 'এশীআ দী পহিলী কিতাব। গীতাঞ্জলী। টৈগোর দা মাসটরপীস'। এই অনুবাদের 'জানপছান' (পরিচয়) লেখক বীর সিং-এর কয়েকটি মন্তব্য তুলে দিচ্ছি : 'ডাকটর রাবিন্দরনাথ-এর এই গ্রন্থে যে-গীতগুলি সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি দু'একবার পড়লে তৃপ্তি হয় না; যদি দশবার পড়া যায় তো এগারোবার পড়বার আকাঙ্ক্ষা দশগুণ বেড়ে যাবে। কোনো বই ভালো কি মন্দ তা পরখ করার অনেক নিরিখের মধ্যে সবচেয়ে

সেয়া নিরিখ হল—বইখানি কতবার পড়া যায় ।.........মূল গীতাঞ্জলির স্বাদ ও মাধুর্য সম্পর্কে কিছু বলতে আমি অসমর্থ, কারণ বাংলা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু বলতে পারি, নরেন্দ্র-সিং-এর রচনা একটি সফল অনুবাদের নিদর্শন। ইতিপূর্বে আমি হিন্দী ও উর্দুর দু'একটি তর্জমা দেখেছি, সেগুলির তুলনায় নরেন্দ্রের অনুবাদ আমার কাছে ঢের বেশী 'রসীলা ও সুরীলা' বলে মনে হয়েছে। অবশ্য এর একটি কারণ এই হতে পারে যে, পঞ্জাবী আমার মাতৃভাষা।

অনুবাদক 'সোচ'জী স্বয়ং ২৭ পৃষ্ঠার একটি মুখবন্ধ লিখেছেন 'ফেরীওয়ালা' (= ভ্রাম্যমাণ) শীর্ষক দিয়ে। এতে আছে অতি সংক্ষিপ্ত রবীন্দ্রজীবনী, বিশেষভাবে বলা হয়েছে পঞ্জাবের সঙ্গে রবীন্দ্র সম্পর্কের কথা। যেমন, অমৃতসরে বেশ কিছুকাল কিশোর রবীন্দ্রনাথের অবস্থান ও দরবার সাহেবদর্শন, যার প্রভাবে উত্তরকালে কবি শিখসম্বন্ধীয় কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা-রচনায় অনুপ্রাণিত হন। অনুবাদকের মতে শিখদের উচিত ট্যাগোরের ঐ কবিতাগুলির এক একটি লাইন সংগ্রহ করা এবং সমস্ত ভাষায় ছেপে সেগুলি বিতরণ করা।

সোচের অনুবাদ গদ্যছন্দে, তবে প্রথম দিককার গোটা পঞ্চাশেক কবিতা সাজানো হয়েছে পদ্যের আকারে। এবং সেগুলিতে যে ছন্দ-স্পন্দ সঞ্চার করা হয়েছে তা 'লিপিকা' বা 'পুনশ্চ-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

চিত্রকারের অনুবাদ পদ্যছন্দে। গ্রন্থের গোড়াতেই রবীন্দ্রনাথের একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করা হয়েছে :

সোন থাল আজ তিরা সজাইআ
দুক্‌খ ভরে হঞ্‌ঝুআঁ দী ধার।
হে মাঁ! গুন্দগলে বিচ পাইআ
মৈঁ তেরে হৈ মোতীহার।

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ' ইত্যাদি অংশের অনুবাদ। বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—"ইহনাঁ গীতাঁ দে রচনহার কবী রাবিন্দরনাথ টৈগোর দী পবিত্তর য়াদ নূঁ।, 'এই অনুবাদ' প্রসঙ্গে সুরজীত রামপুরী লিখেছেন : অজাইব চিত্রকার মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বাংলাভাষার চর্চা করেছেন। তাঁর অনূদিত কবিতাগুলি শুনে আমার মনে হল, পঞ্জাবী সাহিত্যে এগুলি মৌলিক রচনা বলে গণ্য হতে পারে।

অনুবাদকের 'অ্যাদিকা' (= আদিকথা) থেকে জানতে পারি কিভাবে তিনি বাংলা শিখে নিয়ে গীতাঞ্জলি, নৈবেদ্য, খেয়া ইত্যাদি মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। বাংলা গীতাঞ্জলির পুরো অনুবাদ করেও তিনি যে কেবল ইংরেজী গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন তার কারণ এই গ্রন্থই কবিকে নোবেল পুরস্কারের সম্মান এনে দিয়েছে। অনুবাদকের প্রধান চেষ্টা ছিল, শব্দাবলীর দিক থেকে যতদূর সম্ভব বাংলা রচনার কাছে থাকা যায়। পংক্তি সাজানোর ব্যাপারেও তিনি যথাসম্ভব বাংলার অনুসরণ করেছেন। অনুবাদকের মতে মূল রচনায় 'সন্‌স্‌ক্রিত' শব্দের এবং সমাসবদ্ধ পদের বড় প্রাচুর্য। সংস্কৃত-প্রভাবিত এই সমস্ত কবিতার বিশ্বস্ত পঞ্জাবী অনুবাদ একটি কঠিন সমস্যা। কারণ ঐসমস্ত পদের আধুনিক পঞ্জাবীর চলতি রূপ দেওয়া চলবে না, কেউ যদি তেমন চেষ্টা করেন তো মূল রচনার পরিবেশটুকু ক্ষুণ্ণ হবে। আবার যদি বাংলা রচনার মতো

হুবহু সংস্কৃতের অনুগামী হওয়া যায়, তবে পঞ্জাবী পাঠকের পক্ষে তাঁর রসাস্বাদন দুরূহ হয়ে ওঠবে। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে চিত্রকার একটি মধ্য পন্থা ধরে অগ্রসর হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

ইংরেজী ও বাংলা উভয় রূপের সঙ্গে পরিচয় থাকার ফলে অনুবাদক সুবিধামতো কখনো ইংরেজী, কখনো বাংলা, আবার কখনো বা দুয়েরই সমকালীন সাহায্য নিয়েছেন। যেমন, 'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি' এই কবিতার 'জেগে দেখি, দখিণ হাওয়া পাগল করিয়া। গন্ধ তাহার ভেসে বেড়ায় আঁধার ভরিয়া' এই অংশ ইংরেজী অনুবাদে বর্জিত, কিন্তু চিত্রকারের অনুবাদে গৃহীত হয়েছে। 'এই তো তোমার প্রেম, ওগো হৃদয়হরণ'—এখানে 'হৃদয়হরণ' এই সমাসবদ্ধ সংস্কৃত পদ দেখে অনুবাদক ইংরেজীর আশ্রয় নিয়েছেন।

ইংরেজী : Yes, I know, this is nothing but thy love,
O beloved of my heart.

পঞ্জাবী : হাঁ, মৈঁ হাঁ ইহ জান্‌দা মন মেরে দে পী!
তেরে পিআর বগৈর ইহ কুঝ্‌ বী হোর নহীঁ।

যেখানে বাংলা-ইরাজী মিলিয়ে অনুবাদ করেছেন তার একটি নমুনা পাই নিম্নলিখিত অংশে :

সব সাধনা আরাধনা মম
উড়িতে চায় পাখির মতো সুখে।

এই কবিতায় সাগর-পার হওয়ার কথা নেই। ইংরেজী অনুবাদে across the sea এই পদসমষ্টি যুক্ত হয়েছে : my adoration spreads its wings like a glad bird on its flight across the sea.

মেরী সারী **সাধনা, আরাধনা**
সাগর। তে উড্‌দে পঞ্ছী বাঁগ্‌রাঁ
করন নগ্‌গী কামনা উড্‌ডন লঈ।

প্রথম পংক্তির চিহ্নিত অংশটুকু বাংলা থেকে, এবং দ্বিতীয় পংক্তির চিহ্নিত অংশটুকু নেওয়া হয়েছে ইংরেজী থেকে।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও কোনো কোনো কবিতায় গোলযোগের চিহ্ন দেখা গেল। সামান্য গোলযোগের কথা বলছিনা কারণ, তা অপরিহার্য। কোথায় যেন কে বলেছিলেন, অনুবাদের জন্য কেবল ভাষা-জ্ঞানই যথেষ্ট নয়, ভাবপরিচিতিও অত্যাবশ্যক- বিশেষ করে কবিতার ক্ষেত্রে। কেন একথা মনে হল বলছি। 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—এই কবিতার শেষের কয়েকটি পংক্তি দেখুন : 'সুদূর কোন্ নদীর পারে। গহন কোন্ বনের ধারে। গভীর কোন্ অন্ধকারে। হতেছ তুমি পার।' এটি মিলনের কবিতা, না বিরহের? এতে অবশ্যই আসন্ন মিলনের সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। 'অভিসার' শব্দটি তার প্রমাণ। ইংরেজীতে আছে journey of love. যাঁর চোখে প্রথম পংক্তির 'অভিসার' কথাটির তাৎপর্য ধরা পড়ল না, তাঁর কাছে এটি সদ্য বিচ্ছেদের কবিতা বলেও মনে হতে পারে। কারণ কবিতাটির বাকি অংশে বলা হয়েছে আকাশের হতাশ কান্নার কথা। বলা হয়েছে—বিরহিনীর চোখে ঘুম নেই, দুয়ার খুলে সে বারে বারে তাকাচ্ছে বাইরের দিকে, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বিরহিনী ভেবে পায় না কোথায় তার

প্রেমিকের পথ। কোন্ নদীর পার ধরে, বনের ধার দিয়ে গভীর অন্ধকারে তার প্রেমিক অগ্রসর হচ্ছে (হতেছ তুমি পার)! অগ্রসর হচ্ছে কোন্ দিকে? প্রেমিকার উদ্দেশে অথবা তার বিপরীত পথে? বাংলা কবিতার এই অস্পষ্টতা (হতেছ তুমি পার) কবি ইংরেজী অনুবাদে মোচন করেছেন এইভাবে: threading thy course **to come to me.** পঞ্জাবী অনুবাদকের কাছে এখানে বাংলা রূপ অপেক্ষা ইংরেজী রূপ অধিকতর নির্ভরযোগ্য হত। এবং তাহলে পঞ্জাবী অনুবাদে এটি আর বিরহ কবিতায় পরিণত হত না। 'হতেছ তুমি পার' চিত্রকারের অনুবাদে দাঁড়িয়েছে—আমায় ছেড়ে, বন্ধু, তুমি কোথায় না চললে! কিধরে তুর তে নহীঁ গিআ তূঁ ছড্‌ডকে মৈনূঁ যার্!

প্রথম অনুবাদক নরেন্দ্র সিং-এর রচনা পড়ে যে কথাটি বিশেষভাবে মনে এলো তা হচ্ছে এই যে, অনুবাদ কার্যে অনুবাদকের স্বাধীনতা কতখানি। রবীন্দ্রকাব্যের অন্যতম তামিল অনুবাদক শ্রীনিবাস রাঘবন্ বলেছেন কবি-হৃদয়ের প্রতিধ্বনির কথা। আক্ষরিক অনুবাদ নয়, হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। একথা মেনে নিলে স্বভাবতই অনুবাদকের খানিকটা স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকলে এর অপব্যবহারের আশঙ্কাও থেকে যায়। নরেন্দ্রসিং-এর অনুবাদে তাই হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়েছে জনৈক বিশিষ্ট রবীন্দ্র সমালোচকের একটি অভিমত। কিছুকাল পূর্বে কলকাতার তামিল লেখক সঙ্ঘের সভায় 'জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ' এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উক্ত বাঙালী সমালোচক বলেছিলেন যে, ভাষার অজুহাতে ভারতের বিপুল জনসাধারণকে রবীন্দ্রসাহিত্যের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত রাখা চলে না। রবীন্দ্রসাহিত্য বুঝতে হলে বাংলা শিখতেই হবে এমন কোন কথা নেই, আর সকলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ চিন্তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে ভারতের প্রত্যেকটি প্রাদেশিক ভাষায়। এক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োজন নেই। সংস্কৃত রামায়ণ যেমন বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ অনুবাদের মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকের মনকে স্পর্শ করেছে, রবীন্দ্রসাহিত্যেরও তেমনি স্বাধীন স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রয়োজন যাতে অবাঙালি জনসাধারণ তাঁকে আপন বলে ভাবতে পারে, অনুবাদ ভেবে তার প্রতি উদাসীন না থাকে। সমালোচকের এই দুঃসাহসিক প্রস্তাব অনেক রবীন্দ্রভক্তের কাছে গ্রহণীয় না হতে পারে। কিন্তু নরেন্দ্র সিং-এর অনুবাদ যেন এই প্রস্তাবেরই বাস্তব রূপ।

'তুমি যখন গান গাহিতে বল' এই কবিতাটিই ধরা যাক। মূলে আছে ১৬ পংক্তি, সোচের অনুবাদে হয়েছে ৩৭ পংক্তি। এমন নয় যে পংক্তিগুলি খুব ছোট ছোট। আসলে রবীন্দ্রভাবকে অবলম্বন করে পঞ্জাবী কবি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন এইভাবে: যখন তোমার ইশারা আমাকে দিয়ে গান গাওয়ায়, তখন চোখের মধ্যে দৃষ্টি, দৃষ্টির মাঝে অশ্রু; তখন বুকের মধ্যে স্পন্দন, স্পন্দনের মাঝে স্বপ্ন—যখন আমি গান গাই। আমার কঠোর বচন ও কঠোর ভাবনা, আমার রুক্ষ আচরণ ও দুরন্ত বৃত্তি—সবকিছু বদলে গিয়ে গানের মধ্যে লীন হয়ে যায়—যখন আমি গান গাই। আমিও গান, তুমিও গান. সমস্ত বিশ্বভুবন একখানি গান। আমি সেই পাখির মতো, যে পাখি চঞ্চল পাখায় উড়ে পার হয়ে যায় উন্মুক্ত আকাশ আর অকূল সাগর। আমার সুখদুঃখের সঙ্গীত, আমার

জন্ম-মৃত্যুর সঙ্গীত, আমার উত্থান-পতনের সঙ্গীত আমায় পার করে নিয়ে যায়।······প্রথম অর্ধাংশের যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা গেল। পাঠক মিলিয়ে দেখুন বাংলা ও ইংরাজী রূপের সঙ্গে এই পঞ্জাবী রচনার মিল ও অমিল কতটা। দ্বিতীয় অনুবাদক চিত্রকার দিয়েছেন ঠিক মূলানুযায়ী রূপ—　　জদ তূঁ মৈনূঁ গাণ দে লঈ আখিআ

দিল গরব দে নাল মেরা ভর গিআ। ইত্যাদি

বিশুদ্ধ অনুবাদের দৃষ্টিতে দেখলে দ্বিতীয় রচনা নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর, মূলের কাছাকাছি। প্রথম রচনাকে অনেকে হয়তো অনুবাদের মর্যাদাই দিতে চাইবেন না। কিন্তু একাধিক 'গিআনী' পঞ্জাবীর সঙ্গে কথা বলে দেখেছি চিত্রকার ও সোচ এই দু'য়ের মধ্যে সোচের অনুবাদই তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে। তাঁদের মতে চিত্রকার পদ্যছন্দে অনুবাদ করাতে তাতে সুর এসেছে বটে, কিন্তু রস আসেনি। আর সোচের রচনা যথার্থই 'রসীলা'।

এই 'রসীলা অনুবাদের আর একটি মাত্র নমুনা দেখুন। 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে কবিতাটির অনুবাদ চিত্রকার করেছেন মূলানুযায়ী : প্রথম চার পংক্তির পঞ্জাবী রূপ—

বদ্দল তে বদ্দল জুড়ে ছান্দা জাএ হনের
হাএ পিআর! তূঁ কিস লঈ বাহরবার দুআর তোঁ
কল্ল-মুকল্লে তোঁ ম্রিরে করওয়া রিহৈঁ উডীক?

নরেন্দ্র সিং এখানে সন্ধ্যার আভাস পেয়েছেন 'it darkens' এই পদসমষ্টি থেকে। মেঘলা দিনে 'আঁধার করে আসে' বলেই সন্ধ্যা বোঝায় না। বস্তুত বাংলা পদে সন্ধ্যার উল্লেখ নেই, আভাসও নেই। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী অনুবাদে একটি জায়গায় সন্ধ্যার অনুমানকে সম্ভব করে তুলেছেন। কাজের দিনে নানা কাজে = In the busy moments of the **noontide.** আজ = On this dark lonely day. দুই পক্ষের একদিকে যদি থাকে noontide. অপরপক্ষে সন্ধ্যার অনুমান এসে উঁকি মারে। মোট কথা ইংরেজী ও বাংলা পাশাপাশি রেখে পড়লে ইংরেজীতে সন্ধ্যার আভাস পাওয়া যায়, বাংলায় তা নেই। বাংলা-জানা চিত্রকার রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে অতিক্রম করেন নি। কিন্তু নরেন্দ্র সিং একেবারে মুক্তপক্ষ : ঘটাঁ কালীআঁ চঢ়িআঁ হন, বিজলী চমকে; হোইআ অন্ধেরা। শামাঁ নে নিশানী আঁ মিলাপ দীআঁ······ইত্যাদি। তাৎপর্য এই যে, আঁধার এল। সন্ধ্যা হল মিলনের প্রতীকে। পাখি তার পাখা ছড়িয়ে ঠোঁটে খাবার নিয়ে চলেছে কুলায়ে ডিমের উপর তা দেওয়ার জন্য, খরকুটোর মহলে আনন্দ করবার জন্য। আমি আছি 'নগরী' থেকে অনেক দূরে। আমার না আছে কোনো 'টিকানা', আমি না পেয়েছি কোনো খাদ্য, আমি যে পক্ষবিহীন।···ইত্যাদি অসংলগ্ন কথা সোচজী পেলেন কোথায়?

আক্ষরিক অনুবাদের আমরা বিরোধী। তাই বলে এজাতীয় বল্গাবিহীন কবি-কল্পনার আনন্দমজলিশে আসন গ্রহণে আমরা প্রস্তুত নই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা ও বাঙালী সমাজ-মন

অলোক রায়

কোনো সাহিত্যস্রষ্টা যখন সাহিত্যসমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তখন তার মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা থাকে, অন্তর্দৃষ্টির আলোকে চেতনালোকের গভীরতম অঞ্চলও আলোকিত হয়ে ওঠে, অন্যদিকে আত্মপরবশ্যতা সাহিত্যাদর্শকে সঙ্কুচিত ও সীমিতক্ষেত্রে আবদ্ধ করে দেয়, নিজের সামর্থ্য ও প্রবণতা দ্বারা সাফল্য ও ব্যর্থতার মান নির্ধারিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র মৌলিক সাহিত্য সৃজনে এক বিশেষ আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন; উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সমাজ-মনের অনুকূল সাহিত্যাদর্শ। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের মত অতীতকে আঁকড়ে থাকলেন না, আবার মধুসূদনের মত ভাঙনের মন্ত্রেও দীক্ষা নিলেন না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমন্বয়ের চেষ্টা। মহাকাব্যের উত্তাল উন্মত্ত ফেনরাজির পরিবর্তে উপন্যাসের গহন গভীর হৃদয়ারণ্যে পথ অন্বেষণ; কবিগানের প্রথাসিদ্ধ চকমকি ঝলক নয়, পরিবর্তে গীতিকবিতার সরল স্বচ্ছ আত্মভাষণ; য়োরোপীয় ও সংস্কৃত নাটক এবং যাত্রার একক আদর্শানুকরণ নয়, সমন্বয় চেষ্টায় বাংলা নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যবিচারে এই নূতন সাহিত্যাদর্শকে স্থায়ী মূল্যমান রূপে গ্রহণ করলেন, এবং ফলে মধুসূদনের মহাকাব্য ও আলালের গদ্যের প্রতি তিনি সহানুভূতি ও করুণা বর্ষণ করেছেন, কিন্তু উল্লসিত প্রশস্তি রচনা করতে পারেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কৈশোর জীবনের সাহিত্যগুরু হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমকে বলতেই হয়েছে—"মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্বণ' চাই না।" কিন্তু তবু 'পৌষপার্বণে'র আকর্ষণও তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারছেন না, আর তাই 'খাঁটি বাঙ্গালী কবি'র জন্য হাহুতাশের অন্ত নেই। এই দ্বিধা উনবিংশ শতাব্দীর।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করেন, তখন তাঁর মনে প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম বর্তমান। বিশেষ করে বাংলাভাষার উন্নতি সাধন, বাংলা সাহিত্যের সুউচ্চমান নির্দ্ধারণ তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। বাংলাভাসা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর অনীহা তাঁকে পীড়িত করেছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাকে অবলম্বন করেই বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিপ্রতিভা শতধারায় প্রবাহিত হোলো। কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথমদিকের যাবৎ প্রবন্ধে একই সঙ্গে বাঙালীত্বের আত্মশ্লাঘা এবং বাঙালীত্বের আত্মসমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে। একদিকে অতীত ভারতবর্ষের সাহিত্যশিল্পের প্রতি আকর্ষণ ও গভীর শ্রদ্ধা, অন্যদিকে য়োরোপীয় সাহিত্যের কষ্টি-পাথরে তার বিচার ও মূল্যনির্ণয়ের চেষ্টা। আধেয় এদেশ, আধার বিদেশ। য়োরোপীয় মন ও সাহিত্যদৃষ্টি নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যকর্মের সমালোচনা।

এর কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন, তা বাংলাদেশে যেমন সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেছে, তেমনি বিরূপ মন্তব্যও অর্জন করেছে। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর 'Critics and disappointed writers poured forth their rage on the devoted head of the young author, his style, his conception, his story were all condemned, and he was put down as **a denationalized writer, an imitator of European models** (The Literature of Bengal : R. C. Dutt, Calcutta 1895, p. 223). বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ ছিল যে, তিনি য়োরোপীয় সাহিত্যাদর্শের অনুকরণে রত। লক্ষ্য করতে হবে, ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যের বিরুদ্ধে যখন এ অভিযোগ করা হচ্ছে, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরজগতে একটা বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। 'অনুকরণ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করেই লিখলেন : 'অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য ? তাহা কদাচ হইতে পারে না।...বাঙালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ।...বাঙালী যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙালীর ভরসা।...তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে, তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না।' বলাবাহুল্য বাঙালীর অনুকরণ মত্ততার নিন্দা বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লোকরহস্য এবং কমলাকান্তের দপ্তরে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় করেছেন। কিন্তু এইখানেই উনবিংশ শতাব্দীর স্বাভাবিক স্ববিরোধ।

য়োরোপ থেকে কতখানি নেবো, কতখানি ছাড়বো, এই জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বারবার দেখা দিয়েছে। তিনি গুরুর মত সহজ বিশ্বাসে বলতে পারেননি : 'কতরূপ যত্ন করি। দেশের কুকুর ধরি। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।' তিনি বরং মিরাণ্ডা ও দেসদিমোনার তুলনায় শকুন্তলাকে অনেক ম্লান, অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ বিবেচনা করেছেন (যদিও মুখে বলছেন : 'শকুন্তলার কবি যে টেম্পেস্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।') এবং অন্যত্র প্রাচীন আলংকারিকদের রসবিচারের গভীরে প্রবেশ না করেই মন্তব্য করেছেন : 'এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্যসম্পন্ন হয়না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।'

[বঙ্কিমচন্দ্রের উপর্যুক্ত মন্তব্যটি আলোচনাকালে ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যলোক' গ্রন্থে লিখেছেন : '(বঙ্কিমচন্দ্র) স্থায়ীভাব ও ব্যভিচারীভাবের সত্যকার স্বরূপ ও পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না, এবং শৃঙ্গার রসের স্থায়ীভাব রতিকে প্রেমাখ্য মধুর চিত্তবৃত্তি-বিশেষ না বুঝিয়া, বুঝিয়াছিলেন এক কদর্য মানসিক বৃত্তি বলিয়া। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের উদাহৃত শৃঙ্গাররসের শ্লোকগুলি এই জন্য কতকাংশে দায়ী হইলেও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের আদিগুরু এবং উত্তররামচরিতের সমালোচকের নিকট হইতে ইহা অপেক্ষা অধিক মনস্বিতাপূর্ণ প্রৌঢ়দৃষ্টিই আমরা আশা করিয়াছিলাম। আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই,—বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তা-মন্ত্রের অগ্র পুরোহিত হইলেও আত্মবিস্মৃতি বশে কাব্যশাস্ত্রের অতীতের গৌরবময় সিদ্ধি অস্বীকার করিয়া যথাসম্ভব পাশ্চাত্যের পদ্ধতি অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন। যিনি বাংলার ও ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তিনিও সম্যক্ অধ্যয়ন ও আলোচনা বিনাই প্রাচীন

আলংকারিকদের প্রণাম করিয়া দূরে বিদায় করিলেন। অথচ দেখা যাইতেছে ব্রাড্‌লে ও রিচার্ডস্‌ প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ কাব্যশাস্ত্রসম্বন্ধে এখন যে সকল তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, তাহাদের মধ্যে ধ্বনি, ব্যঞ্জনা বা শব্দার্থমূলক অনেক বিষয়েই অন্ততঃ সহস্রবৎসর পূর্বে আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রে পণ্ডিতগণকর্তৃক প্রায় সম্পূর্ণরূপে আলোচিত হইয়াছে। তাই প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্র-সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এইরূপ মন্তব্য এক অসতর্কক্ষণের মন্তব্য বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিলাম।' (কাব্যালোক, দ্বিতীয়সংস্করণ ১৩৬৫, পৃঃ ১২৮-১২৯।) বলাবাহুল্য আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ উক্তিটি নিছক 'অসতর্কক্ষণের মন্তব্য' মনে করি না,—ঐ উক্তিটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তা ও মানস-বিকাশের ইতিহাস লুকানো আছে বলে মনে করি।] আসলে আধুনিক মন নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং অধিকাংশ সময়েই আধুনিক মনের বিস্ফোরণে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-প্রবন্ধগুলি এক অপূর্ব অগ্নিচ্ছটা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতামতগুলির সত্যতা নির্ধারণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বাহন গীতিকাব্য ও উপন্যাস। দুইই অন্তর্মুখী, ব্যক্তিপ্রধান, সূক্ষ্মভাবাভিব্যক্তিতে সমৃদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, উপন্যাসের সাহিত্যিক আদর্শ নিয়ে বড়ো একটা আলোচনা করেননি। তবে 'গীতিকাব্য' সম্বন্ধে তাঁর আলোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। গীতিকাব্য যে একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সৃষ্টি, এবং প্রাচীন 'তথাকথিত গীতিকাব্যে'র সঙ্গে আধুনিক গীতিকাব্যের স্পষ্ট পার্থক্য আছে, তা বঙ্কিমচন্দ্র নির্দেশ করেছেন। লিরিকের প্রতিশব্দ রূপেই বঙ্কিমচন্দ্র 'গীতিকাব্য' শব্দটির প্রচলন করেন এবং প্রসঙ্গত মন্তব্য করেন: 'ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদের দেশেও যে একটি পৃথক নাম দিতে হইবে, এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক, সেখানে নামও পৃথক হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে, তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।' (গীতিকাব্য)। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যই যে বিশেষভাবে য়োরোপের নিকট ঋণী একথা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন রচনায় বারংবার স্বীকার করেছেন। (দ্রঃ 'Bengali literature': Calcutta Review 1817) 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন: 'আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালী কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন।' অবশ্য এখানে তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের বিশেষ প্রশংসা করতে পারেননি (তখনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা জন-পরিচিতি লাভ করেনি,) তিনি মনে করেছেন: 'মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্বশক্তি হ্রাস পায় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তরাগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি বাংলা সমালোচন সাহিত্যের দিগ্‌দর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে একমাত্র রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' কতকগুলি উৎকৃষ্ট সমালোচনা-কর্মের নিদর্শন রেখেছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল নিজে কল্পনাশ্রয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করেননি; তাঁর সমালোচনাগুলি বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে বিশেষ প্রভাবিত করলেও, বঙ্কিমচন্দ্র বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজস্ব পথ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে বলা যায় সমালোচনার দুটি পথ বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী। ভারতবর্ষের আলঙ্কারিকেরা বিশ্লেষণী পথ অনুসরণ করতেন; বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের প্রথমাংশে এই প্রাচীন রীতি অনুসরণ করেছেন: 'আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখা হয় না! এক একখানি প্রস্তর পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। একটি একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্তির অনির্বচনীয় শোভা অনুভূত করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এ স্থান ভাল রচনা, এই স্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না।' বলা বাহুল্য বিশ্লেষণী রীতির এই ত্রুটি সম্বন্ধে এতটা সচেতন থাকা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এই রীতির দ্বারা অনেক সময়েই চালিত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'শকুন্তলা, মিরন্দা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধটিও বিশ্লেষণী রীতিতে রচিত। রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে সুরু করে উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ সমালোচকের রচনাই বিশ্লেষণী রীতির অনুসরণ।

কিন্তু য়োরোপীয় সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর পরিচয়ের ফলেই তিনি সংশ্লেষণী-রীতির সাহিত্য-সমালোচনার শ্রেষ্ঠতা সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন, এবং 'উত্তর চরিত' সমালোচনা-প্রবন্ধের শেষাংশেই তাঁকে এই নূতন রীতির অনুসরণ করতে দেখি: 'যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগর গৌরব অনুভব করিতে হইলে, তাহার অনন্ত বিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট যে, তাহা কেহই পড়িতে পারে না।' যে আনুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের প্রশংসা করিবে না।" বলা বাহুল্য বঙ্কিমচন্দ্র 'আনুবীক্ষনিক সমালোচনা'য় বিশেষ উৎসাহবোধ করেননি, এবং পরবর্তীকালে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যেও বিশ্লেষণী রীতির পরিবর্তে সংশ্লেষণী রীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তুলনামূলক-সাহিত্যসমালোচনাও য়োরোপীয় প্রভাব সংজাত। বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত বা বাংলা সাহিত্য আলোচনাকালে য়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার তুলনার প্রয়োজন বারংবার অনুভব করেছেন। একের আলোয় অন্যের স্বরূপ স্পষ্ট হয়; একের পাশে অন্যে তার নিজস্বতা প্রকাশ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহের ফলেই বাংলায় তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনা উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক বিস্তারলাভ করে। (দ্রঃ—'তুলনায় সমালোচনা'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার। বঙ্গদর্শন:

বৈশাখ, ১২৮০)। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তুলনামূলক-সাহিত্য সমালোচনায় সম্যক্ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি ; তাঁর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটি কিছুটা একদেশদর্শী, কিংবা 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে যখন তিনি বলেন : 'কবিত্ব ধরিতে গেলে Paradise Lost হইতে কুমারসম্ভব অনেক উচ্চে। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষায়, কোন মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিলটন অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রমবোধ হয় ; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না।'—তখন এই তুলনা যথার্থ মনে হল না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই রীতির সীমা জানতেন না এমন নয়, 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন : 'ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না।' রবীন্দ্রনাথও শকুন্তলা নাটক আলোচনাকালে এই কথাই বলেছেন। তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কেন ? আসলে এইখানেই যুগের প্রেরণা, সমাজ-মনের প্রভাব কার্যকরী হয়েছে।

কিন্তু সাহিত্য-সমালোচনায় যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বাধিক কৃতিত্ব এবং সার্থকতা, আমরা এখনো তার আলোচনা করিনি। বঙ্কিমচন্দ্র যখনই বিশেষ কোন কবি, নাট্যকার বা কোনো বিশেষ গ্রন্থের আলোচনা করেছেন, তখনই তিনি সেই বিশেষকে অবলম্বন করে সাহিত্য সম্বন্ধে একটা নির্বিশেষ সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির মূল রহস্যোদ্ঘাটনেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তা একান্তভাবে ভাবাবেগ চালিত কবিকল্পনা নয়। তিনি একই সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি এবং সাহিত্যরসিকের মন নিয়ে সাহিত্যিক-সত্য নির্ধারণ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সমালোচনা তাই একইসঙ্গে যুক্তিনির্ভর এবং রসগ্রাহী। সমাজবিজ্ঞানী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসমালোচনাকালে বলেন : সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।......সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।......সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।' (বিদ্যাপতি ও জয়দেব)। বাংলা দেশে গীতি সাহিত্যের বাহুল্যের তিনি যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা সর্বাংশে মেনে নেওয়া না গেলেও, সাহিত্যবিচারে তিনি যে সমাজ-চেতন মনের পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায় কেন্দ্রীয় সমস্যা,—সত্য, শিব ও সুন্দরের সম্পর্ক নির্ণয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন' জানিয়েছেন : 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।' একদিকে রয়েছে 'নীতিজ্ঞান', অন্যদিকে 'সৌন্দর্য-বোধ'। বলা বাহুল্য ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যচিন্তা সমাজ-মনের অনুসরণেই সুউচ্চ আদর্শবাদকে গ্রহণ করেছিল। 'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্বমাত্র।' ঊনবিংশ শতাব্দীতে

জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা, সমাজগঠনের বিরাট স্বপ্ন, প্রগাঢ় নীতিবোধ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শেলীর মতই বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন: 'কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্তা, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন।' সুতরাং কবিদের কর্তব্য, তাঁদের কাব্যের মধ্য দিয়ে 'মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন।'

কিন্তু এইখানেই সাহিত্যস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সুতীব্র আত্মজিজ্ঞাসা নীতিশিক্ষা যদি কাব্যের উদ্দেশ্য হয় তবে "হিতোপদেশ', 'রঘুবংশ' হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। …সেই হিসাবে 'কথামালা' হইতে 'শকুন্তলা' কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।" কিন্তু তা সম্ভব নয়। তখনই তাঁকে স্পষ্ট করে বলতে হোলো: 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।' সৌন্দর্যসৃষ্টিই বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য,—সাহিত্যের শেষ সীমা। 'সৌন্দর্য অর্থে কেবল বাহ্য প্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য বুঝিাত হইবেক।' এখানে বঙ্কিমচন্দ্র অস্পষ্টভাবে কবিদৃষ্টির কথাই বলতে চেয়েছেন। কবিরা 'সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।' বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সৌন্দর্যসৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য, নীতিশিক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সমালোচনার সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর মূল পার্থক্য। তাঁরা সৌন্দর্য এবং নীতির পূর্বাপর স্থান পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন।

এই তো গেল শিব ও সুন্দরের সম্পর্ক। এর পর আসছে সত্যের সঙ্গে শিব-সুন্দরের সম্পর্ক। সৌন্দর্য প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন: 'স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না।' কিন্তু "এই জগৎ ত সৌন্দর্যময়—তাহার প্রতিকৃতিমাত্রই সৌন্দর্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র, সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি,—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে 'সৃষ্টি' বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহা সৃষ্টি"। বলা বাহুল্য 'সাহিত্যের সত্য' কাকে বলবো তা নিয়ে চিরকাল মতবিরোধ হয়ে আসছে। গ্রীকরা সাহিত্য-শিল্পকে Mimeses বা Imitation বলেছে। কিন্তু প্লেটো কিংবা আরিস্টটল কেউই সাহিত্যকে বাস্তবের হুবহু অনুকৃতি মনে করেন নি। আরিস্টটল তো স্পষ্টই বললেন 'The artist may imitate things as they ought to be'। বঙ্কিমচন্দ্রও 'সৃষ্টি' বলতে এই 'modes of imitation' বুঝেছেন।

'উত্তরচরিত' সমালোচনা প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, সত্য-শিব-সুন্দরের সমন্বয়ে যে সাহিত্যিক আদর্শ তাঁর মনের মধ্যে নিত্যবিরাজিত ছিল, তাকেই ব্যাখ্যা করলেন। প্রাচীন সাহিত্যকর্মকে অবলম্বন করে আধুনিক সাহিত্যিক চিরন্তন সাহিত্যাদর্শকে আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র সাহিত্য সমালোচনাগুলি তাই সাময়িক সাহিত্যের নিদর্শন হয়েও, স্রষ্টা-মানসের স্পর্শে কালোত্তীর্ণ সাহিত্যতত্ত্বের মর্যাদা লাভ করেছে।

দ্বারকানাথ ও তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থা

অমৃতময় মুখোপাধ্যায়

১৮৪২ খৃস্টাব্দে ১৫ই ডিসেম্বর দ্বারকানাথকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া যে অভিজ্ঞান পত্র দেন তাতে দ্বারকানাথের পরিচয়পত্র দেওয়া হয় 'জমিদার ব্যবসায়ী ও কলিকাতার শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত'। কলিকাতায় এই শান্তিরক্ষক বা জাষ্টিস্ অফ্ পীসের সৃষ্টি হয় ১৭৯৪ খৃস্টাব্দ থেকে। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) পর্যন্ত কলিকাতার জমির খাজানা আদায় করতেন 'জমিদার'। (১) সহরের শান্তি, শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ভারও ছিল তাঁর কিন্তু কলিকাতা সহরটা দেখতে দেখতে এত বিরাট হয়ে পড়েছিল যে তাঁর পক্ষে কোন কিছুই সুষ্ঠুরূপে করা সম্ভব ছিল না। ১৭৯৪ সালে বিলাতে তৃতীয় জর্জের এক আইনের ধারা অনুযায়ী কলিকাতাতেও কয়েকজন জাষ্টিস্ অফ্ পীস্ নিযুক্ত করে তাঁদের হাতে সহরের ভার বহুলাংশে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাঁরাও খুব উৎসাহের সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেন। জমির কর হিসাব মত ধার্য করে এবং মাদক দ্রব্যের লাইসেন্স ফি আদায় করে সেই টাকায় তাঁরা সহরের উন্নতির চেষ্টা করেন। প্রথম কর ধার্য করা হয় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে। আর সার্কুলার রোড পাথর ফেলে পাকা করা হয় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। ১৮০১ সালে ৮৫ জোড়া বলদ ও গাড়ী দিয়ে ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করেন। ঐ বৎসর থেকেই কলিকাতার জাষ্টিস্ অফ্ পীস্রা কলিকাতা ও ২৪ পরগণা ও তাহার চতুর্পার্শ্বের বিশ মাইলের মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করবার ক্ষমতা পান। ১৮০৩ পর্যন্ত জাষ্টিস্ অফ্ পীস্রা খাজানা আদায় করে তা মোটামুটি রাস্তা সারানো, সাফ করানো ইত্যাদিতে খরচ করতেন। ঐবৎসর সহরের উন্নতিকল্পে মন্তব্য করতে লর্ড ওয়েলেস্লি একটি কমিটি নিয়োগ করেন এবং তাঁদের মন্তব্য অনুসারে ৩০ জন সদস্য নিয়ে টাউন ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি গঠিত হয়। ১৮০৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতার জন্য একটী পুলিশসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকেও জাষ্টিস্ অফ্ পীসের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৮৩৩ খৃস্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দ যখন নূতন করে দেওয়ার কথা হয় তখন কতকটা উদারতা দেখাবার জন্য ডিরেক্টররা স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশীয়রা উপযুক্ত হলেই উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু ঐ স্বীকৃতি মাত্রতে বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। লর্ড কর্নওয়ালিশ যে দেশীয়দের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করা রহিত করে দিয়েছিলেন, সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে, যখন রাজত্বের এলাকা ক্রমশঃ বেড়ে যাওয়ায় দেশীয়দের নিয়োগ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, তখন দেশীয়দের কয়েকজনকে ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট করার জন্য একটা আইনের খসড়া তৈরী হলে বড়লাটসাহেবের কাউন্সিলে গভীর মতদ্বৈধ প্রকাশ পায়। সুলিভান সাহেব সপক্ষে ও মেলভিল সাহেব ঘোর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন সেই সময়ে কতকটা সম্ভবতঃ পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকজন ভারতীয়কে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়। সমাচার দর্পণে ২৭শে বৈশাখ ১২৪২ (৯ই মে ১৮৩৫) তারিখে 'এতদ্দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেট' শিরোনামায় দেখি 'নীচে লিখিতন্য

এতদ্দেশীয় ১২ জন মহাশয়কে বিনা বেতনে মেজিষ্ট্রেটী কর্ম নির্বাহার্থে গভর্ণমেণ্ট অনুমতি করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রাজচন্দ্র দাস, রাজচন্দ্র মল্লিক, রাজা কালীকৃষ্ণ, রসময় দত্ত, রাধামাধব বাঁড়ুয্যে, রাধাকান্ত দেব, রস্তমজি কাওয়াসজি।'

এর কয়েকমাস পরেই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম জাষ্টিস্ অফ্ পীস্ পদে দুজন ভারতীয় নিযুক্ত হন—দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাধাকান্ত দেব। রাধাকান্ত দেবের হোরেস হেম্যান উইলসনকে লেখা ১৮৩৬-এর এক পত্র থেকে জানা যায় (২) যে তার আগের বৎসর আগস্ট মাসে জাষ্টিস্ অফ্ পীস নিযুক্ত হয়ে তিনি সপ্তাহে দুইদিন সহরের ময়লা ফেলার ব্যবস্থার (কন্‌জার্‌ভেন্সি) তত্ত্বাবধান করতেন এবং দ্বারকানাথ খাজানা নিরুপণ বিষয়ে (অ্যাসেস্‌মেণ্ট) দেখাশুনা করতেন।

জাষ্টিস্ অফ্ পীস্ হওয়ায় এঁরা দুজন সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেটও হলেন। সে খবর ২৪শে শ্রাবণ ১২৪২, ৮ই আগস্ট ১৮৩৫-এর সমাচার দর্পণে বের হয়। (৩)

এর বছর দুই বাদে ১৮৩৬—৩৭ সালে যখন ফৌজদারী আইন নিয়ে ঘোর আন্দোলন ও ফৌজদারী কোর্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ—সকলের কাজের চূড়ান্ত সমালোচনা হয়, তখন মফঃস্বলের শান্তি রক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা করা যায় সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে সরকার মাননীয় ডব্লিউ, ডব্লিউ বার্ডের সভাপতিত্বে এক কমিটি বসান। এই কমিটির সামনে দ্বারকানাথ সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু দ্বারকানাথের সাক্ষ্যের কথার আগে তখনকার কালের পুলিশের কার্যকলাপ ও ফৌজদারী বিচারের বহর সম্বন্ধে তদন্ত যা দেখা যায় সেবিষয়ে কিছু বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয়।

ফৌজদারী ও পুলিশ বিভাগে বিচারবিভ্রাট তখন এতদূর গড়িয়েছিল যে লোকেরা সহস্র অত্যাচারেও পুলিশ বা ফৌজদারীতে নালিশের নাম করত না। বরং নালিশ বা নালিশের সাক্ষ্য এড়াবার জন্য যথাসাধ্য ঘুষ দিত। তখনকার বিচারের নমুনাস্বরূপ দেখা যায়—এক সাহেব নালিশ করেন তাঁর বাবুর্চি পালিয়েছে। পুলিশ তাকে ধরে আনে। সে বলে যে পূর্বে কোন সামান্য দোষের জন্য সাহেব তার কান কেটে দিয়েছেন—তাই সে পালিয়েছে। বাবুর্চির শাস্তি হল দশ বেত।

বেণীবাবু কাপ্তেন স্কটের গাড়ী সারিয়ে দেবেন বলে ঠিক দিনে কাজ না করায় শাস্তি দশ জুতো।

মহম্মদের স্ত্রীকে রমজানের স্ত্রী গালাগালি দিয়েছে বলে মহম্মদ থানায় নালিশ করে। বিচারে দেখা গেল দুজনের স্ত্রীই পরস্পরকে গালাগালি করেছে সুতরাং উভয় পক্ষেরই অপরাধ। শাস্তি হল দুইপক্ষই পাঁচ টাকা করে জরিমানা দেবে।

সেযুগে দারোগাই ছিলেন পল্লী অঞ্চলে পুলিশের প্রধান কর্মচারী কোন হাঙ্গামা হলে প্রথম তদারকের ভার তাঁর। এই দারোগা ও তার অধীনস্থ কর্মচারীদের অত্যাচারের কাহিনী ইতিকথা হয়ে আছে। (৪) তখন সাধারণ পুলিশ কর্মচারী মাহিনা যা পেত তা'তে সংসার তো চলেই না, এমন কি একটা ঘোড়ার খোরাকীও হয় না—অথচ এলাকা দেখাশুনা ঠিকমত করতে হলে দারোগার দুটো এবং জমাদার ও কেরাণীর একটা করে ঘোড়া অত্যাবশ্যক। এই কারণে চাকুরী পেলেই পুলিশের লোক ধরে নিত যে উপরি পাওনা তার ন্যায্য।

১৮০২ সালে এক জজসাহেব দারোগার বর্ণনায় বলেছেন যে 'এরা সাধারণ কাজেরও উপযুক্ত নয়, গায়ের বা মুখের কোনটারই জোর নাই। সাধারণত এদের জমিজমা নাই, থাকলেও কাছাকাছির মধ্যে নয়, তাই এদের কর্মস্থলের বাসিন্দাদের সুখ-সুবিধার দিকে এদের কোন নজর নাই। ইহারা প্রায়ই কুঁড়ে ও ঘুষখোর। কেউ এদের প্রশংসা করে না কারণ এদের মাইনে এত কম যে অসদুপায়ে রোজগার ছাড়া গতি নেই। এদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হল মেজিষ্ট্রেট সাহেবের সামনে হাকডাক করা আর সেলাম ঠোকা—চাকুরীটা যেন না যায়।'

১৮০৯ সালে সরকারের সেক্রেটারী ডাউডস্‌ওয়েল (Dowdeswell) সাহেব লিখেছেন যে দারোগার ক্ষমতা 'আমাদের দেশের আইনে জাষ্টিস্ অফ্ পীসের প্রায় সমতুল্য। এত ক্ষমতা বিলাতে কখন কোন নিম্নশ্রেণীর পুলিশের লোকের হাতে দেওয়া হয় নাই এবং দিলেও তাহা ঐ দেশে কেহ মানিয়া লইবে না।'

সেকালে দারোগারা ফরিয়াদীর শপথ নিয়ে জবানবন্দী নিতে পারতেন এবং সমন বা ওয়ারেণ্ট হবে কি না ঠিক করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জামিনে খালাস (বেল) এর জন্য পাঠাতে পারতেন। রাজবাল হাটের এক দারোগা কয়েকজন বন্দীকে দুমাস ধরে রেখে তারপর বিচারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠায়। দারোগার ইচ্ছার চেয়ে বড় আইন কিছু ছিল না।

১৮১৪ সালে দারোগার অসাধুতা আর নিরন্তর চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে এক ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন—কোথাও ডাকাতির খবর পেলে দারোগা বাবুদের বড় আনন্দ। অনুসন্ধান করার জন্য অমনি সরজমিনে গিয়ে হাজির হবেন তারপর যত বর্ধিষ্ণু প্রজা বা বাসিন্দা আছে সকলকে ডেকে নানা ভণিতা করে কাল্পনিক গল্প খাড়া করে বলবেন যে তিনি যা খবর পেয়েছেন তা থেকে তাঁর সন্দেহ হয় যে ওঁদের কারুর বাড়িতেই মাল আছে। এ কেবল পয়সা নেবার অছিলা। পয়সা না দিলে বাড়ী তোলপার করে এটা ওটা কেড়ে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সাক্ষী দিতে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে। পয়সা আদায় করার আরেকটা ফন্দি হল বাড়ীর মেয়েদের নামে বলা যে তারা নিশ্চয়ই সাহায্য করেছে। এই অজুহাতে তাদের ধরে চালান দেবার উপক্রম করলে বাধ্য হয়ে পয়সা দিয়ে ছাড়াতে হয়। তবুও সব সময়ে মেয়েরা দারোগার হাত থেকে সহজে নিস্তার পায় না।

দারোগাদের এইসব অসাধুতার জন্য যে প্রায়ই চাকুরী যেত না তা নয়। ১৮৩৫ সালে এক ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন যে হুগলী জেলায় অর্ধেকের উপর পুলিশ কর্মচারীদের তিনি বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৩৭ সালে ১৮জন দারোগার মধ্যে ১৩ জনের চাকুরী যায়—পাঁচ জনের যায় অপরাধ গোপন করতে চেষ্টা করায়, চারজনের কর্তব্যের গাফিলতির জন্য, তিনজনের ঘুষ লওয়ার কারণে এবং একজনের যায় জোর করে দোষ কবুল করাতে চেষ্টা করানোর অপরাধে।

তখনকার কালে আদালতে ফৌজদারী বিচার বিভ্রাটের বেশ একটা বর্ণনা পাওয়া যায় ব্রজমোহন দাসের লেখা ও ইংলিশম্যানে প্রকাশিত এক চিঠি থেকে। (৫) তিনি জানান—

' * * * কলিকাতায় বড়বাজারে অনেকদিন থেকে আমার একটি কাপড়ের দোকান আছে; চন্দ্রকোনায় দুবস্তা কাপড় কিনে ফেরবার পথে বিরহিমপুর বা বসন্তপুর (উভয় নামেই এই স্থান পরিচিত) পৌছিলে হুগলি জেলার জাহানাবাদ থানার মুহুরী আমার মাল আটক করে ১৪৲ দামের

চার জোড়া ধুতি কেড়ে নিয়ে মাত্র ১০৲ দিতে চাইলেন। আমি এত লোকসানে আমার মাল বিক্রী করতে গররাজি হওয়ায় তিনি আমায় প্রচুর গালমন্দ করলেন। তৎসত্ত্বেও এ অধম রাজি না হওয়ায় পুলিশের লোকটী আরও রেগে আমায় চোর বলে বেঁধে ফেললেন। কোন পরিচিত লোকের সাহায্যের আশা নাই, এরকম জায়গায় ঐরকম বিপদে পড়ে আমার মত গরীবের রাজি হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। তখন মুহুরী তাঁর অধীনস্থ বরকন্দাজ জয়কেষ্ট তেওয়ারী ও শ্যামলাল পাঁড়েকে ১০৲ দিয়া ঐ টাকা আমায় দিতে বলিয়া গেলেন। জয়কেষ্ট ও শ্যামলাল তাহাদের নিজেদের জন্য দুই টাকা রেখে বাকী আট টাকা আমায় দিয়ে খালাস করে দিলে।

মুহুরীর কাছে তৎপূর্বেই যে নিদারুণ ব্যবহার পেয়েছি তারপর বরকন্দাজদের সঙ্গে বচসা করিলে ফল কি হইবে তাহা ভেবে বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কাপড়ের বস্তাগুলি দোকানে চালান করে আমি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে এই অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে নালিশ করিবার উদ্দেশ্যে হুগলীর পথে রওনা হলাম।

সন্ধ্যাবেলা হুগলী পৌছিয়া পরদিন সকালে গঙ্গাস্নানের সময় নিকটে পাশাপাশি দুইঘাটে অনেক লোক জমায়েৎ দেখি। নিকটে গিয়া জানিলাম যে এক সাধারণ বিবাদের মকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই গঙ্গাপূজা দিতেছেন। ইহাতে আমার বিশেষ আশ্চর্য বোধ হইল কারণ মামলায় যাঁরা জেতেন এদেশে তাঁহারাই আনন্দ করেন ও পূজা ইত্যাদি দেন। সেইজন্য প্রথম দলের নিকটে গিয়ে যিনি পূজা দিচ্ছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলাম, যে তিনি বাদী এবং মকদ্দমা জিতিয়াছেন কিন্তু সেকারণে পূজা দিতেছেন না। তাঁর পূজা দেওয়ার কারণ সাক্ষীসাবুদ সহ গত এগার মাস ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির দেওয়ার হাত হইতে এক্ষণে অব্যাহতি পেয়েছেন। পূজান্তে তিনি দেশে ফিরবেন—এতদিনের অনুপস্থিতিতে তাঁর ব্যবসায়ে লোকসানের একশেষ হয়েছে। তিনি আক্ষেপ করলেন যে ন্যায় বিচারের জন্যই প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়ে নালিশ করার ফল এমন সর্বনেশে হবে তা' তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

আমি অবিলম্বে অন্যজনকে প্রশ্ন করে জানলাম যে তাঁরা প্রতিবাদী। তাঁদের প্রত্যেকের কয়েকটাকা জরিমানা হয়েছে কিন্তু সেকারণে তাঁরা ক্ষুণ্ণ নহেন। গত আটমাসাবধি ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে সাক্ষীসাবুদ সমেত হাজিরা দেওয়ার জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পেয়েছেন এবং দেশে ফিরে নষ্ট ব্যবসায় পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন এই আনন্দে তাঁরা পূজা দিতেছেন। আমি বললাম যে আপনারা সশরীরে হাজির না দিয়া মোক্তার নিযুক্ত করিলে ত' ব্যবসায় রক্ষা হইত। তদুত্তরে তাঁরা বলেন যে মোক্তারনামা পেশ করেছিলেন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তা অগ্রাহ্য করায় নূতন আইনের কোপে পড়িবার ভয়ে হাজিরা দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সমনে কোন তরফ গরহাজির হইলে এই আইনে তাকে আসামী গণ্য করে ফেরারী বহিতে তার নাম লিখিয়া বিভিন্ন থানায় গ্রেপ্তারের পরোয়ানা পাঠাবার হুকুম হয়েছে। এরূপ সুযোগ পাইলে পুলিশের লোক সর্বপ্রকারে জুলুম করে অপবাদ দেয় ও উৎকোচ আদায় করে। আবার সমনে হাজির হইলে ন্যায়ত যা শাস্তি তার বহুগুণ করে গুরুতর শাস্তি হয়, যার তুলনায় ফেরারী বহিতে নাম উঠার অপবাদ সহিয়া সপরিবারে পলাতক হওয়াও শ্রেয়। এই কারণে হুগলীর অন্ততঃ তিনশত পঞ্চাশটি পরিবার বর্তমানে ঘর ছাড়িয়া পথে পথে

ঘুরিতেছে। এটাও লক্ষণীয় যে ম্যাজিস্ট্রেটের এই নতুন বিধির ফলে সজ্জন ব্যক্তিদের সর্বনাশের উদ্দেশ্যে বহু দুর্জন মিথ্যা নালিশও দায়ের করিতেছে।

ঘটনাটি তাবৎ বিস্ময় ও মনোযোগ সহকারে শুনিয়া এবং নিজে একজন পণ্য বিক্রয়ে জীবিকা অর্জনকারী সামান্য ব্যবসায়ী মাত্র জানিয়া এবং হুগলী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে অনর্থক দীর্ঘকাল হাজির দিতে হইলে সমূহ সর্বনাশ বুঝিয়া, জেহানাবাদ থানার মুহুরী ও তাঁর অনুচর বরকন্দাজদ্বয় জয়কৃষ্ণ তেওয়ারী ও শ্যামলাল পাঁড়ের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে সাহস হইল না। নিষ্পত্তির বিষম দেরী ও সর্বনাশা হাজিরার দরুণ যে আদালতে জিতও হারের বাড়া, সেখানে নালিশ না করিয়া সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারকে এবিষয়ে অবহিত করিতেছি।

তখনকার কালে পুলিশের কোন বাঁধা সাজ ছিল না। ১৮৩৭ সালে এক ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছেন যে বরকন্দাজরা (এদেরই পরে 'কনেষ্টবল' করা হয়) সব আকারে নানারকমের এবং তাদের রকমারী সাজে রামধনুর সবক'টা রং খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

এসব বে-বিলি সত্ত্বেও মুসলমান আমলের তুলনায় যে শাসন ব্যবস্থার বেশ কতকটা উন্নতি হয়েছিল এবং অন্ততঃ সহরবাসীদের মনে স্বস্তির ভাব এসেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হয়েছেন (৬) এখবর কলিকাতায় পৌছিলে সেরিফ টাউন হলে এক সভা ডেকে (৭) মহারাণীর ভারতস্থিত প্রজাগণের পক্ষ হতে একটি অভিনন্দন দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এই অভিনন্দন বিলাতে পাঠাবার সমর্থনে দ্বারকানাথ একটি ছোট-খাট মিষ্ট বক্তৃতা করেন—'যেমনটি ঐরকম ব্যাপারে বলা শোভনীয়'। তিনি বলেন যে, যদিও এখনও বহু বিষয়ে পূর্ণ সুব্যবস্থা হয় নাই ; এখনও বহু আপত্তি বা অসুবিধাজনক বিষয় আছে তথাপি অন্ততঃ এক বিষয়ে মস্তবড় উন্নতি হয়েছে। আজ কলিকাতাবাসীরা জানে যে মুসলমান আমলের মত কারণে বা বিনা কারণে রাজকোপে পড়িলেই ধনে প্রাণে মারা যাবার ভয় আর নেই। সেই দিনের সভায় খুব কমসংখ্যক দেশী ভদ্রলোকের উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি জানান যে 'আজকের দিনে উপযুক্ত সংখ্যক দেশীয় ভদ্রলোকেরা যে উপস্থিত নাই তার কারণ এ নয় যে তাঁরা অকৃতজ্ঞ। ইংরাজ শাসনের সুব্যবস্থার সুফল সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ সচেতন ও কৃতজ্ঞ। তবে এই দিনই হিন্দুদের পর্বদিন এবং ছুটী বলে সামান্য সংখ্যক লোকই আসিতে পারিয়াছেন।' (৮)

এই সময়েই সাগর জেলায় একটা বেশ জোর হাঙ্গামা হয়। পুলিশের সঙ্গে। তখন সরকার ঠিক করেন পুলিশকে পল্টনের মত করে গড়ে তুলতে এবং তারই কিছুদিন বাদে বার্ড সাহেবের পুলিশ কমিশন বসে।

এইখানে দ্বারকানাথ সাক্ষ্য দিতে দিয়ে ফৌজদারী বিভাগের বেবিলির সব প্রমাণ দেখান এবং পুলিশ বিভাগের সংস্কারের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী বা ডেপুটী হিসাবে দেশী ইউরেশীয় ও ও ইউরোপীয়দের নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয়েরা এই পদপ্রার্থী হলে যেন তাঁরা প্রমাণ দেখাতে পারেন যে এদেশের এবং বিশেষ করে দেশের যে অংশে তাঁরা কাজ করবেন সেই আঞ্চলিক ভাষা তাঁরা ভালোভাবে বোঝেন, যাহাতে রায়তের সঙ্গে কথা বলিতে দোভাষীর দরকার না হয় এবং লোকে দরখাস্ত করিলে তা' তিনি নিজেই পড়িয়া বুঝিতে পারেন।

তিনি আরও বলেন যে এই ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটরা ভদ্রঘরের ও উপযুক্ত শিক্ষিত লোক হওয়া দরকার। তিনি স্পষ্টই বলেন যে দারোগা, সেরেস্তাদার প্রভৃতির মধ্যে দু'একটা ভালো লোক থাকতে পারে, তাই বলে ঐ স্তরের লোকদেরই মাহিনা বাড়িয়ে ডেপুটি বানালে বিশেষ কোন সুফল হবে না। হয় সদর দেওয়ানী আদালত বা সরকার সরাসরি ঐ সব ডেপুটিদের চাকুরীতে বহাল করিলেই ভাল হয়। এঁরা থাকবেন মফঃস্বলে এবং ফৌজদারী বিভাগে এঁরা হবেন মুন্সেফদের সমান এবং থানাদারদের উপরে। তিনি দারোগার পদ তুলে দেবার সুপারিশ করেন এবং গ্রামাঞ্চলেও কলিকাতার আদর্শে থানা প্রতিষ্ঠা করতে বলেন। তাঁর মতে জমাদারের দরকার মত বা কোন গোলযোগের আশঙ্কা করলে সরাসরি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে খবর দিতে-নিতে পারার ক্ষমতা থাকা উচিত। যে সব জায়গায় অনেক ইউরোপীয় বাসিন্দা সেখানে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে দারোগার বদলে সাহেব বেলিফ নিয়োগের কথাও তিনি বললেন্। তবে এইসব বেলিফের যেন উপযুক্ত শিক্ষা থাকে যাহাতে তারা দারোগার কর্তব্যও উপযুক্তভাবে কাজ করিতে পারে।

সরকার ঐ ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রস্তাবটা নিয়েছিলেন এবং প্রথম দু'এক বছর ম্যাজিস্ট্রেটের নজরের নিচে সহকারী হিসাবে কাজ করার পর তাঁদের মহাকুমার পূর্ণ ভার দিয়ে ছেড়ে দেন। প্রথম যে কয়জন ডেপুটি হয়েছিলেন, তাঁরা হয় অবস্থাপন্ন ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তান বা হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র। যে সব স্থানে অপরাধীর হার খুব বেশী, অধিকাংশ সময়ে সেই সব জায়গাতেই তাঁদের পাঠানো হয়েছিল। এবং ফলে দেখা গিয়েছিল যে অপরাধের সংখ্যাও সেখানে কমে গেছে এবং তাঁদের কেন্দ্র করে শিক্ষা ও নব্য সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। তাঁরা মফঃস্বলের লোকদের মধ্যে একটা নবজাগরণের সাড়া তুলতে পেরেছিলেন। তাঁদের উৎসাহে ডাক্তারখানা ইস্কুল, লাইব্রেরী, সাহিত্যসমিতি ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। বস্তুত গত একশত বৎসরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটদের অবদান বড় কম নয়।

'পরবর্তীকালে দ্বারকানাথের উপদেশ থেকে বিচ্যুত হয়ে দারোগা পেস্কার ও ঐ পর্যায়ের অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীদের ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করার ফলে ঐ পদ লোকচক্ষে অনেক হেয় হয়ে গিয়েছে।'

(১) সেন্সাস্ অফ্ ইণ্ডিয়া ১৯০১, তৃতীয় খণ্ড

(২) শ্রীযোগেশ বাগলের 'রাজা রাধাকান্ত দেব' পুস্তকে উদ্ধৃত ৫ই মার্চ ১৮৩৬ এর চিঠি। (৩) কলিকাতা ম্যাজিষ্ট্রেট।—এতদ্দেশীয় ও ইষ্টিণ্ডিয়ান মহাশয়দিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্মে নিযুক্ত করিতে পার্লিমেণ্ট যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন তাহা প্রতিপালনার্থে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করাতে এই সপ্তাহে নীচে লিখিতব্য মহাশয়রা কলিকাতার ম্যাজিষ্ট্রেটী কর্মে স্বকৃতিকরণপূর্বক নিযুক্ত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুক্ত জেমস্ কিড সাহেব।' (৪) অ্যাডমিনিষ্ট্রেসন অফ হুগলী ডিস্ট্রিক্ট—জি, টয়েনবি

(৫) চিঠির তারিখ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪১

(৬) ২০শে জুন ১৮৩৪ (৭) ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ (৮) কিশোরী চাঁদ মিত্র

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান

সুধীর চক্রবর্তী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের দু' বছর পরে জন্মেছিলেন, কিন্তু রবীন্দ্র-তিরোধানের আটাশ বছর আগেই তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভার যৌবনস্থচনা তিনি দেখে গিয়েছিলেন, সে-প্রতিভার বিচিত্র ও বহুমুখী পূর্ণতা দেখে যান নি। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী মন দ্বিজেন্দ্রলালের জীবিতকালেই দ্বিজেন্দ্রপ্রতিভার স্বকীয় সৌন্দর্য সম্পর্কে মুখর হয়েছিল। কিন্তু উভয় কবির মহাপ্রয়াণের অনেকদিন পরে, সাম্প্রতিককালের বাঙালী এই দুই বাণীসাধককে এক অলীক দ্বন্দ্বযুদ্ধের যুযুধান প্রতিপক্ষরূপে জানেন। বিশেষত, বর্তমানকালের বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রে আচ্ছন্ন ও উদ্বুদ্ধ, অতএব দ্বিজেন্দ্রলালের ভূমিকা সেখানে বৃহৎ সৌরমণ্ডলের অন্তর্গত এক অমার্জনীয় কলঙ্করেখার মত। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাঙালীদের কাছে এই হতমান খণ্ডিতমূর্তি হয়ত দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাপ্য ছিল না। কারণ তাঁর বাণীসাধনা ছিল বঙ্গভারতীর পুজার নামান্তর, দেশধ্যান ও জাতীয়তাবোধ ছিল তাঁর শিল্পচেতনার অন্থকোষে। বিশেষত স্মরণীয় যে তাঁর এমন অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল যা রবীন্দ্রনাথের বাণীলাবণ্যে নিবেদিত না-হয়ে অহংবাদী স্বকীয়তার এক স্থায়ী পরিমণ্ডল পরবর্তীকালের বাঙালীদের জন্য রেখে গেছে। রবীন্দ্রনাথের সব্যসাচী মূর্তির পাশে দ্বিজেন্দ্রলালকে তাই একলব্যের মত মনে হয়। কেননা একলব্যের মত তিনি একনিষ্ঠ কিন্তু চরমপন্থী, অসামান্য প্রতিভাধর কিন্তু সকরুণভাবে অর্ধপথে তাঁর আত্মনিঃশেষ।

বাঙলা সংগীতের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের এবং দ্বিজেন্দ্রসংগীতের উপেক্ষিত অস্তিত্ব আরো মর্মান্তিক। কখনও কখনও স্বদেশীগানের উদ্বেলিত প্রান্তরে তাঁর প্রতিভার একাংশ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। হাসির গানের প্রসঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় মাত্র। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ভুল সুরে কদাচিৎ তাঁর নাটকাশ্রিত কয়েকটি গান পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রসংগীতের সেই প্রবল অন্তর্বেদনা, সেই মেদুর ঔদাস্যভরা প্রেমের গানগুলি, ভক্তিমূলক গানগুলি হয়ত দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকীর পরেও তাঁদের নির্বাসন-ব্যথা ভোগ করবে।

দ্বিজেন্দ্রসংগীতের এই উপেক্ষার কারণ সম্ভবত তাঁর সম্পর্কে অপপ্রচার, অপ্রচার এবং গায়কদের অনীহা। অর্থাৎ তাঁর সংগীতসাধনাকে, তাঁর সাহিত্যসাধনার মতই, সর্বদা ভ্রান্তবাদী দৃষ্টিতে বিচার করা হয়েছে। তিনি যে একটি যুগের অংশ, সেকথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে এবং তাঁর সাধনাকে এককভাবে বিচার করা হয়েছে। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তরেখা স্পর্শ ক'রে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক বাঙলাদেশের সংগীতসভায় তিনজন গীতকবির গানের ত্রিধারা লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদ এই ত্রিধারার নায়ক। তাঁদের শৈশব-কৈশোরকালীন সাংগীতিক পরিবেশ, ভাবপ্রকাশের ভাষা, গায়কী এবং গানের গোত্রচিহ্ন যদিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এমনকি বিপরীতধর্মী কিন্তু তাঁদের শতাব্দীর ভাব-পটভূমি ছিল অনন্য। অর্থাৎ মানসাকাশে তাঁদের স্বকীয়

চেতনা যুক্ত থাকলেও তাঁদের ভাবের সমন্বয় ছিল যুগের সমতলে। উনবিংশ শতাব্দীর উদ্দীপ্ত জীবনার্তি তাঁদের সংগীতকে উদ্বেলিত, বিচিত্র ও মরমী করছে। এই তিনজন গীতকবিই সংগীতের সুধারস সঞ্চয়ের নেশায় অন্তবিহীন পথ পরিক্রমা ক'রে বিলাত গিয়েছিলেন এবং নিজেদের গানের গভীরে য়ুরোপীয় সুরের গতিশব্দ ও বৈচিত্র সঞ্চারিত করেছিলেন; অবশ্য মাত্রাভেদে ও গ্রহিষ্ণুতার তারতম্যভেদে তার প্রয়োগ বিভিন্নভাবে ঘটেছে। উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশমন্ত্রের সাধনা, ভক্তি-ভাবের স্বতস্ফূর্ত আবেগ ও রোমান্টিক ভাবমূলকতা এঁদের তিনজনের মনেই রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল। তাই সংগীতের মাধ্যমে বিশেষত রূপের দিক থেকে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নানাভাবে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের গানে ধ্রুপদাশ্রয়, দ্বিজেন্দ্রনাথের গানে টপ্‌খেয়ালের অন্তর্দ্যুতি এবং অতুলপ্রসাদের গানে ঠুংরির উচ্ছল ঐশ্বর্যের মধ্যে পারস্পরিক রূপগত বৈষম্য থাকলেও তাঁদের উৎস ছিল একই যুগচিত্তের বৈচিত্র্যসন্ধানী আবেগকম্পন এবং পরিণামও ছিল এক অনন্তআকাশে হৃদয়উন্মীলনের ব্যাকুলতা।

শিল্পীমননের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পার্থক্য মূলত একজায়গায়। রবীন্দ্রনাথের মননে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙলার প্রাণ সাধনা যৌথভাবে গৃহীত; অর্থাৎ তিনি উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র জীবনধর্ম ও আবেগ আত্মসাৎ ক'রেও বিংশ শতাব্দীর নানা বৈচ্যিত্র-ময়তায় সর্বাধুনিক। আর দ্বিজেন্দ্রলাল উনবিংশ শতাব্দীর জীবনাশ্রয়ে নিশ্চিন্তমরমী। এই পার্থক্যের কারণ, রবীন্দ্রনাথের শৈশব-কৈশোরকালীন পটভূমি কলিকাতার ধর্ম-রাজনীতি-মানবতা-পশ্চিমীভাবাদর্শ কম্পিত উন্মাদনা; আর, দ্বিজেন্দ্রলালের পটভূমি কৃষ্ণনগরের চাঞ্চল্যহীন সাম্প্রদায়িক ভক্তি (বৈষ্ণব ও শাক্ত) নিরুদ্বেগ শান্তি।

কাব্যপ্রত্যয়ের দিক থেকেও রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সুগভীর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রত্যয়ের মূলকথা ছিল (রবীন্দ্রসংগীতেও) স্বভাবকে অবলম্বন ক'রে স্বাভাবিকতা থেকে উত্তরণ; আর দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন সম্পূর্ণত স্বভাবের দাস। এই উক্তিটির একটু বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন, 'স্বভাবের শোভা যত হেরিব নয়নে'। স্বভাবের শোভাময় মূর্তি তাঁর কবিতা ও গানে চমৎকার ফুটেছে। 'তারা ফুলের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে'— এমন স্বাভাবিক গীতভাষা সবদেশের গীতকাররা নিরন্তর সন্ধান করছেন। কিন্তু মুস্কিল যে, কাব্য ও বিশেষত গানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা ক্লান্তি আনে। সত্যিকারের কাব্যে এবং গানে আমরা চাই উত্তরণ, অর্থাৎ, স্বাভাবিকতা থেকে উত্তরণ। হয়ত অতীন্দ্রিয়তার বিচিত্র স্বপ্নাচ্ছন্নতায়, কিংবা অনুভবের অস্পর্শ কান্তারে। স্বভাবের শুদ্ধ বর্ণনায় মন ভরে না, স্বাভাবিকতার সৌন্দর্যউচ্ছ্বাসে হৃদয় ক্লান্ত হয়। যেমন, তাঁর একটি কাব্যাংশে লক্ষণীয় :

পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি গিরিচূড়ায়—মনোহর! মাঠের উপর রাঙামাটি, সবুজ—গাছের চারিধার,
পড়েছে ঐ সূর্যরশ্মি তরুশিরে— কী সুন্দর! আকাশে কি রঙের খেলা খেলে যাচ্ছে—চমৎকার!

পড়তে পড়তে মনে হয়, স্বাভাবিকতার স্বতঃমুগ্ধতায় কবি তলিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু পাঠকদের সে ভাগ দিতে পারছেন না। মনোহর, চমৎকার, কী সুন্দর—এসব বিশেষণ ব্যঞ্জনাহীন ও নিষ্প্রাণ। অর্থাৎ অনুভূতির সঙ্গে কল্পনার সাযুজ্য না ঘটায় কবি বর্ণনাটিকে পাঠকের অন্তরে নিবিষ্ট করতে পারলেন না। তার কারণ, তিনি স্বভাবতই মুগ্ধ, স্বভাবেই মুগ্ধ। কিন্তু কাব্যে, বিশেষত গানে

এই স্বাভাবিকতা অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্যসন্ধান করতে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের একই গানে বসন্তের স্বাভাবিক বর্ণনাকে অতিক্রম ক'রে সৌন্দর্যকল্পনার অসামান্য দ্যুতি ফুটেছে এইভাবে :

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল ॥

অতিশয়োক্তি সত্ত্বেও স্বাভাবিকতার অন্তরালে এই গানে ফুটে উঠেছে কল্পনার ফুল, দুটি অসামান্য শব্দবয়ন (ফুলের আগুন ও সৌরভের শিখা) এবং একটি চমৎকার চিত্রকল্প। যেগুলি অবলম্বন ক'রে পাঠক বা শ্রোতার স্বাভাবিক মন অনেক দূরযাত্রী হয়।

অথবা রবীন্দ্রনাথের আরেকটি বসন্তের গানে বসন্তের অন্তর্লীন আরেক রূপ ফুটেছে :

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে।
দেখিস নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরা-ফুলের খেলা রে ॥

রবীন্দ্রনাথ এইভাবেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করতেন ; এইভাবেই তাঁর গানে ফুটে উঠেছে বস্তু-স্বভাবের অন্তর্ময়তা। পাশাপাশি বিচার করলে দেখা যাবে দ্বিজেন্দ্রলাল এতদূর অগ্রসর হননি। সেইজন্যই প্রকৃতির গানে তিনি লেখেন :

ফুল ফুটেছে চাঁদ উঠেছে আসছে ভেসে মলয় বায়
সাদা সাদা মেঘগুলি ঐ যাচ্ছে ভেসে নীলিমায়।

স্বাভাবিকতার প্রতি এই অসীম আগ্রহেই তিনি একটি প্রেমের গানে লেখেন :

আমি, চেয়ে থাকি দূর সান্ধ্য গগনে
ধীরে দিবা হয় অবসান।
আমি, নিভৃতে নয়ননীরে করি অভিষিক্ত নৈশ উপাধান।

একজন বিরহীর বর্ণনা হিসাবে এটি স্বাভাবিক, কিন্তু সুন্দর নয়। একজনের কথা ভাবতে ভাবতে বেদনায় উপাধান অশ্রুসিক্ত হচ্ছে, এ ঘটনা খুব স্বাভাবিক বলেই রসাভিব্যক্তির পক্ষে অচল। কিন্তু স্বাভাবিকতার প্রতি রসগতভাবে আসক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষে এ-বর্ণনার প্রলোভন জয় করা অসম্ভব এবং সম্ভবত অনুচিত। সেই জন্য এমন কি 'উপাধান' এই স্থূল ব্যবহারিক গ্লানিময় শব্দটিকেও তিনি পরিহার করেন নি।

এইখানেই তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণত বিহারীলালের ভাবমূলক আত্মকেন্দ্রিকতার অনুযাত্রী আর দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভাবুকতাবিরোধী বস্তুগত কল্পনার কবি'। সুতরাং স্বভাবত বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের মানসকেন্দ্রে সংগীতকারের ভাবোচ্ছ্বাস অসম্ভব। এবং সন্দেহ হয়, হয়ত তাঁর কবিতার মত গানও বস্তুধর্মী। কিন্তু এইখানে দ্বিজেন্দ্রলালের জয় তথা সংগীতের জয়। সুরবশ্যতা তাঁর বস্তুবাদী স্বভাবস্পন্দী মনকে উদ্বেল করেছে, দ্রব করেছে। আর সেইজন্যই তাঁর গানগুলি বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল বাউল সংগীতের ক্ষেত্রে যতবড় গীতিকার তার চেয়েও বড় কম্পোজার। এই দিক থেকে তাঁর সাংগীতিক প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিকতর সৃষ্টিধর্মী। কেননা সংগীত রচনার প্রতি পদে তাঁর ভাবপ্রকাশের দুর্বলতা ঢেকে দিতে হয়েছে সুরের আভায় আর সুরের বৈচিত্র্যে। এই অর্থে, য়ুরোপীয় সুর মমতা তাঁর গানে সবচেয়ে

মৌলিক উপাদান ও নিগূঢ়ভাবে সৃষ্টিশীল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের গানগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা চলে। এক, স্বদেশমূলক ; দুই ভক্তিমূলক ; তিন, নিসর্গমূলক এবং চার, প্রেমমূলক। তাঁর সমগ্র গানের সংখ্যা তিনশতাধিক। তার মধ্যে শতাধিক গান নাটকে সংযোজিত অথবা নাটকের প্রয়োজনে রচিত। স্বদেশ ও ভক্তিমূলক গানের সংখ্যাধিক্য লক্ষণীয়। স্বদেশী গান ও ভক্তিমূলক গানের সংখ্যাধিক্যের কারণ সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর জীবনাশ্রয়ে বিশ্বাস এবং কৃষ্ণনগর নবদ্বীপের ভক্তিরসাপ্লুত পটভূমিকা। বর্তমান আলোচনায় দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানগুলিক বাদ দেওয়া হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় উদ্দীপনার ক্ষেত্রফলরূপে বাংলার অনেক কবি স্বদেশী কবিতা ও সংগীত রচনা করেছিলেন। হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতির কাব্য এবং রাজকৃষ্ণ রায়, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির স্বদেশী সংগীত বিখ্যাত। এই সব কবিতা ও গান পরাধীনতার তীব্র জ্বালা থেকে প্রত্যক্ষভাবে উৎসারিত; সেইজন্যই স্বদেশের প্রাক্তন গুণস্মরণের সমান্তরালে বর্তমান অবক্ষয় ও ভাবী জাগৃতির আশা, এই সব স্বদেশী সংগীতের পৌনঃপুনিক প্রসঙ্গ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই ধারা রক্ষা করেও তাতে প্রকাশের চারুত্ব দিয়েছেন ; বিশেষত তিনি এসব গানে প্রাণসঞ্চার করেছেন য়ুরোপীয় সুরের ওঠানামার চকিত ছন্দপ্রয়োগে। এছাড়া, অন্তত 'ধনধান্যপুষ্পেভরা,' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে,' 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে' প্রভৃতি গানে যে অম্লান আবেগ ও উন্মাদনার সততা তার উদাহরণ বিশেষ নেই। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সংগীতের ভাব ও রূপের প্রভাব সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় পুনর্জন্ম লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভক্তিমূলক গান লেখেন নি। তাঁর সাধারণ পর্যায়ের গানগুলিকে তিনি 'পূজা' নামে গ্রন্থিত করেছেন। এই পূজা হৃদয়স্বামীর নির্বিশেষ অনুভবের উদ্দেশে নিবেদিত। এই বিশিষ্টতাতেই তাঁর ব্যক্তিতন্ত্রের বিশেষ পরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গানে ব্রাহ্মসমাজের সামান্য সংস্পর্শ থাকলেও, সমগ্রভাবে উনবিংশ শতাব্দীর মানুষের ভক্তিউন্মাদনার তথা জনতার ভক্তি-প্রাণতার কোন পরিচয় নেই। সে-পরিচয় দ্বিজেন্দ্রলালের গানে। শিবস্তোত্র, কৃষ্ণস্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র, শক্তিস্তোত্র এবং এমনকি কীর্তন ও নামগানও তিনি রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নির্বিশেষ সাধন-বেগের সংগে তুলনা করলে দ্বিজেন্দ্রলালের এসব গানকে অবশ্য অনেকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারেন। সে বিচার ভ্রান্তিমূলক ; কেননা সে দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যাবে মুসলমান সম্প্রদায়-ভুক্ত হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিজেন্দ্রলালের মত হিন্দু দেবতাদের নিয়ে চমৎকার গান লিখেছেন। নজরুলের প্রতিভার বিশেষত্ব ছিল, যে কোন প্রসঙ্গে তিনি চমৎকার গান বানাতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের এই ধরণের গানগুলি কিন্তু তাঁর ধর্মবিশ্বাসজাত। বঙ্কিমচন্দ্রের মত দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুত্বপ্রীতি ছিল অসাধারণ। তারই ফলিত ও আবেগ মথিত রূপ এই গান। তাঁর সমকালীন বাঙালীরা এসব গান হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য সেটাই বড় কথা নয়, আসলে এই সব বিচিত্র দেবতাশ্রয়ী ভক্তিসংগীতে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবভক্ত মনের পরিচয়। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক প্রসঙ্গেও তাঁর মন কত সহজে অনুপ্রেরিত হ'ত তার প্রমাণস্বরূপ আপাতত একটি গান আগাগোড়া উদ্ধৃত

করছি। শিবের কয়েকটি নাম অবলম্বনে এমন সংহত সংগীত রচনা তাঁর সামর্থ্যের সার্থক উদাহরণ :

ভূতনাথ তব ভীমবিভোলা বিভূতি ভূষণ ত্রিশূলধারী।
ভুজঙ্গভৈরব বিষাণভীষণ ঈশান শঙ্কর শ্মশানচারী॥
বামদেব শিতিকণ্ঠ উমাপতি ধূর্জটি পশুপতি রুদ্র পিনাকী।
মহাদেব মৃড শম্ভু বৃষধ্বজ ব্যোমকেশ ত্র্যম্বক ত্রিপুরারী॥
স্থাণু কপর্দী শিব পরমেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় গঙ্গাধর স্মরহর।
পঞ্চবক্ত্র হর শশাঙ্কশেখর কৃত্তিবাস কৈলাস বিহারী॥

বাঙালীর ভক্তিসাধনার যুগ্মরূপ : কঠিনের সাধনা মধুরের রূপে। তাই তন্ত্রের শক্তিদেবী বাঙালীর ভাবসাধনার আগমনী বিজয়ার নিত্যবেদনায় গৃহস্থসঙ্গিনী। তাঁর কৃপাণখর্পরশোভিত রক্তলোহিত ভয়ঙ্কর রূপ মায়ামমতার গাঢ়বেদনায় আনতকোমল হয়েছে। বাঙ্গালী সাধনার ভক্তি-শক্তির এই যুগ্মরূপ দ্বিজেন্দ্রলালের ভক্তিসংগীতে সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত :

চরণ ধ'রে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস নে মা!
মত্ত আছিস আপন খেলায় আপন রূপে বিভোর বামা।
এ কী খেলা খেলিস্ ঘুরে স্বর্গমর্ত পাতাল জুড়ে
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি চরণ ধরে ডাকে 'মা মা'।
হাতে মা তোর মহাপ্রলয় পায়ে ভব আত্মহারা
মুখে হা হা অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্তধারা।

এই ভয়ংকরী মূর্তি, এইধ্বংসরূপিনীর বন্দনাগানের পরিণামে গীতকার ভক্তি আনত, প্রসন্নতায় বলেছেন :

এতদিন তো কালীভীমা—তোরই পূজা করেছি মা
পূজা আমার সাঙ্গ হ'ল এখন মা তোর অসি নামা॥

কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল পৌত্তলিক ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা-পর্যায়ের গানে ঈশ্বরকে জীবনস্বামী বলে বন্দনা করেছেন। তাঁকে ঔপনিষদিক কল্পনায় 'আনন্দরূপে' দেখতে চেয়েছেন। সেইজন্য ধর্মের ক্ষেত্রে আচারসর্বস্বতা লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গোক্তি করেছেন একটি গানে :

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে নারি কখন্ তুমি দাও যে ফাঁকি॥
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ায়
পিছন হ'তে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁওয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥

ঈশ্বরানুভবের ক্ষেত্রে. রবীন্দ্রনাথ আচার, মন্ত্র ও আয়োজনকে মিথ্যা মনে করেছেন। এবং 'আপন মনের একটি কোনায়' জীবনস্বামীর বন্দনা করতে চেয়েছেন। অন্তরের মধ্যে অনুভব করেছেন অন্তর্যামীকে। এই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের ঈশ্বরচেতনা আরো উদার, আরো ব্যাপক। কেননা তিনি মূর্তি পূজার ব্যর্থ আয়োজনকে লক্ষ্য ক'রে একটি গানে লিখেছেন :

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে　　　মন্দির তোমার কি গড়িব মাগো
এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা।　　　মন্দির যাঁহার দিগন্ত নীলিমা?

এই গানের নির্বিশেষ অনুভূতিটুকু অনুধাবন করলে বোঝা যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ভক্তহৃদয়ের পুষ্পাঞ্জলি কোন বিশেষ দেবতাকে উৎসর্গ করেন নি; কিন্তু তিনি হিন্দু ছিলেন। এবং প্রকৃত হিন্দুর মত তাঁর ভক্তি পৌত্তলিকতায় আচ্ছন্ন না থেকে বিশ্বের মধ্যে বিতত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের নিসর্গমূলক গানগুলি কিন্তু দুর্বল। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানের মত প্রকৃতির অন্তর্নিহীত বাণী ও জীবনচাঞ্চল্য নেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকৃতির গানে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাবমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর গভীরতায় প্রকৃতির রূপলোক ও রসলোকের যুগপৎ সন্ধান পেয়েছিলেন, প্রকৃতি তাই তাঁর চেতনায় চঞ্চলের লীলাসহচরী, ঋতু পর্যায়ের সঙ্গিনী এমনকি মহাকালের বিবর্তন-সাক্ষীরূপে ধরা দিয়েছিলেন। সেইজন্যই আকাশে উড্ডীন বকপাতির সঙ্গে তিনি নিজের বেদনাকে মিলাতে পেরেছিলেন, মনকে করেছিলেন মেঘসহচর, নিজের অনুক্ত গানকে খুঁজে ফিরেছিলেন 'মেঘলা আকাশে উতলা বাতাসে'। দ্বিজেন্দ্রলালের নিসর্গমূলক গানে দৃষ্টির এই গূঢ়তা নেই। ফলত, তাঁর গানে নিসর্গের রঙিন শোভার বর্ণনা বেশি এবং সে-বর্ণনায় অনুভূতির গভীরতা নেই। 'আইল ঋতুরাজ সজনী জ্যোৎস্নাময় মধুর যামিনী'—তাঁর একটি গানের এই ধুয়োটুকু শুনে আমাদের মনে বসন্তঋতুর গভীর অনুভূতির যে প্রত্যাশা জাগে, গানের আভোগ-অংশে সে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় যখন শুনি:

পর সখি পর নীলাম্বর, পর সখি ফুলমালা;　　করিগে চল কুসুম চয়ন, রচিগে চল পুষ্প শয়ন
চল সখি চল কুঞ্জে চল, বিরহবিধুরা বালা।　　ফিরিবে তব নাথ সজনি, হৃদয়ে তব আজি॥

বোঝা যায়, এ-বসন্ত শুধুই উদ্দীপন বিভাব আর গানের ভাবটি আবহমান বাংলা গানের সেই বসন্ত আগমনে নায়িকার মিলনপ্রত্যাশার অনুসঙ্গে ভারাতুর। আরেকটি প্রকৃতির গানে:

আনন্দময়ী বসুন্ধরা
চির অভিরামা, তরুণী শ্যামা, সুহাসিনী পিককলস্বরা।

মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলাল অনুভবের প্রগাঢ় উত্তাপের চেয়ে আড়ম্বরের ব্যাপারে অত্যুৎসাহী। তাঁর চেতনায় প্রকৃতি 'চির-অভিরামা' অর্থাৎ স্বতঃসুন্দর এবং সেইজন্য বৈচিত্র্যহীন ও গভীরতাহীন।

কিন্তু দুয়েকটি গানে দ্বিজেন্দ্রলাল নিসর্গকে শুধু দৃশ্যসৌন্দর্যে আবদ্ধ ক'রে রাখেন নি এবং সেই-বিরলক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধি ঘটেছে। অন্যতর এই চেতনায় প্রকৃতির মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন বৈরাগ্য ও মেদুর ঔদাস্যের এক প্রসন্ন শান্তি। 'নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো'—মাত্র এই দৃশ্যরূপটিকে অবলম্বন ক'রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর ভাবান্তর ঘটেছে এবং তারই পরিণামে তিনি অনুভূতির গাঢ়তায় বুঝতে পেরেছেন।

বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মতন ভালবেসে।
আজকে যদি মরতে না পাই, তবে আমার মরণ ভালো॥

কিন্তু এই অসামান্য ভাবান্তরেই গানটির সমাপন ঘটে নি, কারণ এরপরে দ্বিজেন্দ্রলাল সেইখানে আত্মবিলয়ের কামনা জানিয়েছেন 'যেখানে ঐ অসীম সাদায়—মিশেছে ঐ অসীম কালো'। নিসর্গের

এমন গূঢ় উন্মোচন অবশ্য তাঁর বেশি গানে নেই।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানগুলি সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে অপ্রচলিত কিন্তু রসের বিচারে সবচেয়ে সুন্দর। গানের সুরে টপ্পার অন্তর্দ্যুতি রূপায়নের সূক্ষ্ম মন্থরতায়, প্রেমানুভূতির নিবিড় আর্তি চমৎকারভাবে রসসৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে কীর্তনভঙ্গির সকরুণ মীড় গানের ছন্দকে বিলম্বিত গাঢ়তায় ভরে তোলে। ভাবের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা দেশের ম্লানমন্থর অপরাহ্ণের রিক্ত বিরহবেদনা মর্মায়িত। বাড়ির ছাদে ব'সে, বেলফুলের মালা হাতে নিয়ে, উদভ্রান্ত বসন্তের চাঞ্চল্যের সন্ধ্যায় বাগেশ্রী, বেহাগ, খাম্বাজ আর ঝিঁঝিটের তান দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমের গানে যেন স্মৃতিচিহ্নের মত সংযোজিত। অকারণ বিরহ, গার্হস্থ্যবেদনা, রোমান্টিক রূপপিপাসা এবং নানা খণ্ড ছিন্ন লৌকিক ব্যথার এমন গানে যেন সে শতাব্দীর সমস্ত ক্রন্দনগাথা পুঞ্জিত হয়ে আছে। কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃতযোগ্য

এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি
এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় ● ধরে না ধরে না তায়
আকুল অসীম প্রেমরাশি।

অথবা

আমি তোমার কাছে ভাসিয়া যায় অন্তর আমার
আজি সহসা নয়নে কেন ঝরিল এ বারিধার

অথবা

সে কেন দেখা দিল রে না দেখা ছিল যে ভালো,
বিজলীর মত এসে সে কোথা কোন্ মেঘে লুকালো।
দেখিতে না দেখিতে সে কোথা যে গেল রে ভেসে;
যেন কোন্ মায়া-সরসী ছুঁতে না ছুঁতে শুকালো।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাবলী আলোচনা করলে দেখতে পাই প্রেমপ্রসঙ্গে তাঁর মন প্রায় নীরব; তাঁর বেশির ভাগ উচ্ছ্বাস প্রণয়কে ঘিরে। তাঁর গানে প্রেমশব্দটির প্রায় অনুপস্থিতি এবং প্রণয় শব্দটির বাহুল্য যুগপৎ লক্ষণীয়। এর অন্যতম কারণ, সম্ভবত তাঁর সুখী দাম্পত্যজীবন। অবশ্য তাঁর রচনাবলীর মূলরস মানবিকতা। তাছাড়া নাটকে স্বদেশমন্ত্র, হাসির গানে অনুকরণপ্রিয় পরাধীন বাঙালীর সম্পর্কে বেদনামিশ্র বিদ্রূপ, কাব্যে দেশাত্মবোধ, নিসর্গপ্রীতি ও শৈশবমাধুর্যের প্রতি পেলব মমতা পরিস্ফুট। কিন্তু তাঁর কোন কোন গানে অন্তঃশীলা এক দহন জ্বালা, ভগ্ন প্রেমের বেদনার চিহ্ন মরমী শ্রোতার কানে বাজে। সে হয়ত ঠিক অকারণ বেদনা নয়, বরং এক অস্থিত চিত্তবিষাদ ও আর্তি। 'আজি আমার নয়নপাশে, এ কী আঁধার ঘেরিয়া আসে, পাষাণ-ভার চাপিয়া ধরে হৃদয়ে বারেবার'—এই অবরুদ্ধ বেদনার স্বীকৃতির মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলালের মন ক্ষণিকের জন্য কখনও কখনও ভাববিভোরতায় বাষ্পাচ্ছন্ন হয়েছে। অথচ ভাববিভোরতা তাঁর কবিস্বভাববিরুদ্ধ। এর থেকে বোঝা যায়, ভাবুকতাবিরোধী তাঁর মন সংগীতের সুধারস প্রান্তরে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে নি। সুরের লাবণ্যে, বহুযুগের ওপার থেকে (কিংবা তাঁর নিজের বাণীতে, 'মহাসিন্ধুর

ওপার থেকে') অস্পর্শ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করেছে। আর সংগীতের বাণীবদ্ধতায়, ঝিঁঝিট, বেহাগ বাগেশ্রী ও মল্লারের সুরশ্রী বিস্তারে সেই অন্তঃনিরুদ্ধ ভাবুকতা বিহ্বল ক'রে তুলেছে সৃষ্টির প্রাঙ্গন।

রবীন্দ্রনাথের গানের ধ্বনিসুষমা এবং অতুলপ্রসাদের গানের সরল বাণীবিন্যাসের পাশে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বাণী, মনে হয়, প্রয়াসজাত, তৎসমপ্রধান ও গদ্যধর্মী। অনায়াস স্বতংস্ফূর্ততা থেকে উৎসারিত বাণীশ্রী তাঁর গানে প্রায়শই বিরল; সম্ভবতঃ সেইজন্য তাঁর গানগুলির এক বৃহৎ অংশ সুরবিহীন পাঠ্য কবিতা হিসাবে তায় অচল। আমার মতে, এই সূত্রেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্ববিরোধ আবিষ্কার করা সম্ভব। বস্তুত, হাসির গানে ও স্বদেশপ্রাসঙ্গিক কবিতায় তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে তিনি যত সচেতন, ভাষা প্রয়োগে তথা প্রকাশভঙ্গীতে তত নন। সেই কারণে আর্যগাথা, মন্দ্র কিংবা আলখ্য-র কবিতাগুলির অন্তর্নিহীত আবেগ ও অনুভূতি আমাদের আবিষ্ট করে, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর দুর্বলতা আমাদের পীড়া দেয়। গানের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা কোথাও কোথাও ভাবের সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছে যেমন :

কার প্রেমমধুর মৃদু অস্ফুট বাণী জাগে প্রাণে—
চপলপবনবিকম্পিতকিশলয়পল্লবমর্মরতানে।

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, গানের ভাষায় এমন প্রচণ্ড সমাসবদ্ধতা কি চলে ?

দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক ক্ষেত্রে গানের বাণী বয়নে ধ্বনিবশ্যতায় বন্দী হয়েছেন এবং সেই ধ্বনিবশ্যতা মূলত আনুপ্রাসিক। যেমন :

এ কি মধুর ছন্দ মধুর গন্ধ পবন মন্দমন্থর
এ কি মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্রপুঞ্জমর্মর।

বাংলা গানে তৎসম শব্দের আধিক্য ও সমাসবাহুল্য চলে না। দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সে-প্রবণতা কিন্তু খুব বেশি। একটি উদাহরণ :

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে
শ্যামবিটপীঘন তটবিপ্লাবিনী ধূসরতরঙ্গভঙ্গে।

তৎসম শব্দের বাহুল্যে, এমনকি সংস্কৃত লঘু-গুরু উচ্চারণ পর্যন্ত অনিবার্যভাবে এসে গেছে। অবশ্য এ-গানটি বন্দনাস্তোত্র ব'লে শব্দবয়ন বেশ যথাযথ, কিন্তু অনেক সরল ভাবের গানে এমন শব্দবয়ন অসংগত লাগে। অথচ পাশাপাশি 'ধনধান্যপুষ্পেভরা' গানটির স্বাভাবিক বাণীবিন্যাস চমৎকার। সুতরাং দেখাযাচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রলালের সামর্থ ছিল, শক্তিও ছিল কিন্তু সম্ভবতঃ সুরের প্রবল টানে তিনি শব্দসুষমা বিস্মৃত হতেন। এখানেই তাঁর সৃষ্টিকর্মের স্ববিরোধ।

মনে হয়, দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বাণীবয়নে কোন পদ্ধতিগত দুর্বলতা ছিল। শব্দের ধ্বন্যাত্মকতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও তিনি অন্যতর কারণে শব্দগাম্ভীর্য ফোটাতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। মল্লার-সুরমণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রলাল ও অতুলপ্রসাদের একটি ক'রে বর্ষার গানের অংশ পাশাপাশি উদ্ধৃত করলে পূর্বোক্ত মন্তব্যটি পরিষ্কার হবে :

দ্বিজেন্দ্রলাল	অতুলপ্রসাদ
ঘনঘোর মেঘ আই ঘেরি গগণ	বহিছে ঝরঝর গরজে গরগর
বহে শীকরস্নিগ্ধোচ্ছ্বসিত পবন	ধ্বনিছে সরসর শ্রাবণ মা ঃ।

দুজনেই গানের ভাষায় দুটি অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করেছেন। বর্ষার ব্যঞ্জনায় মল্লারের তানে শব্দ দুটি বেশ সংগতি লাভ করেছে। অথচ লক্ষণীয়, অতুলপ্রসাদ তিনটি ধ্বনিময় শব্দে (ঝরঝর, গরগর, সরসর) বর্ষার যে ধ্বনিটি আনতে পেরেছেন, দ্বিজেন্দ্রলালের গানে ব্যবহৃত সংস্কৃত সমাসে (শীকরস্নিগ্ধোচ্ছ্বসিত) তা ব্যর্থ হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য আলোচনায় সমালোচক উল্লেখ করেছিলেন 'তাঁর ভাষায় ব্যঞ্জনাশক্তির অভাব আছে এবং সে-অভাবকে ঠিক স্বভাব না ব'লে অভাব বলাই সঙ্গত' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা : ভবতোষ দত্ত। 'দেশ', সাহিত্যসংখ্যা ১৩৬৩)। সমালোচকের উদ্ধৃত মন্তব্যের সারাংশটুকু দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বাণী সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অনুভূতিকে সুন্দরভাবে না ব'লে সোজাসুজি বলার প্রবণতা তাঁর গানের গভীরতাকে অনেকক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করেছে (যেমন তাঁর অসামান্য টপ্-খেয়াল 'আজি তোমার কাছে ভাসিয়া যায়' গানের সঞ্চারী অংশে :

আজি আমার কাছে বর্তমান ভেঙে ও ভেসে যায়
আজি আমার কাছে অতীত হয় নূতন পুনরায়।

খুব ভাল গীতশিল্পীর কণ্ঠলাবণ্যেও 'বর্তমান' শব্দটির কঠিন ব্যবহারিকতা অন্য তাৎপর্য পায় না। এই জাতীয় ব্যঞ্জনাহীন শব্দ বাহুল্য ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে তাঁর গানে গতানুগতিক ও আবহমান প্রতীক অনুসঙ্গ (নির্ঝর, বিটপী, মলয়, সজনী, কোয়েলা, মোহনবাঁশি, পাপিয়া প্রভৃতি) পৌনঃ-পুনিক ও ক্লান্তিকর। নিজের ভাবাবেগকে মোটা তুলিতে এঁকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর গানের আপাতরম্যতাকে অস্বীকার ক'রে গেছেন।

দেখা গেল, সাহিত্যের বিচারে দ্বিজেন্দ্রলালের গান সর্বাঙ্গসুন্দর নয়। কিন্তু সংগীতের বিচারে কাব্যধর্মিতাই চরম নয়, সুরধর্মিতাও বিচার্য। কেননা সংগীতে কবিতার মত পাঠ্যগুণই প্রধান নয়, তার শ্রাব্যসৌন্দর্যই প্রাথমিক। দ্বিজেন্দ্রলালের গানের কাব্যময়তার অভাব ভরিয়ে দিয়েছে.অসামান্য সুরশ্রী! য়ুরোপীয় সংগীতের উদাত্ত বিস্তার ও নৃত্যচপল গতিস্পন্দনের সঙ্গে ভারতীয় টপ্খেয়ালী অন্তর্মরতার রূপায়ণবৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়ে তাঁর গানকে রসরূপ দান করেছে। প্রমথচৌধুরী সেজন্যই বলেছিলেন : 'দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্নচৈতন্যে দেশী ও বিলাতী সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্ট হয়েছে।'

বস্তুত বাঙলার সংগীতক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের সবচেয়ে প্রধান ভূমিকা কম্পোজার হিসাবে। এমন পৌরুষসম্পন্ন সুরকার এদেশে আর কেহ নেই। দ্বিজেন্দ্রলালের গান বাংলা গানের ইতিহাসে সবচেয়ে নাটকীয়। তার কারণ, তাঁর গানের একটা বড় অংশ মঞ্চের চাহিদার রূপ নিয়েছে এবং জনতার রসরুচিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। প্রকৃত Incidental song যাকে বলে, তাঁর নাটকে তার কিছু উদাহরণ আছে। সে সব গান কখনও নাটকীয় দৃশ্য পরিবর্তনের মত আকস্মিক ; যেমন—'ঘন-তমসাবৃত অম্বর ধরণী'। কখনও স্মৃতির মত সকরুণ ; যেমন—'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার থেকে'। কখনও

মধুর গীতিকাব্যের মত উদাসী ; যেমন—'আমি সারা সকালই ব'সে ব'সে আমার সাধের মালাটি গেঁথেছি'। বাঙলা নাটকের জন্য খাঁটি বাঙলা সুরে ও তালে একক ও সখীদের কোরাস গান তিনিই প্রথম রচনা করেন। বেহাগ, আড়খেমটা তালে—'সে কেন দেখা দিল রে'; ভূপালি, একতালায়—'তুমি যে হে প্রাণের বঁধু' ; আবার খাম্বাজ, একতালায় বিদেশী সুরের সামান্য ওঠানামা জুড়ে—'আমরা এমনই এসে ভেসে যাই' ; বাঙলা নাট্য সংগীতের ক্ষেত্রে এসব চিরস্মরণীয় উদাহরণ।

আরেকটি তথ্য স্মরণীয়। বাঙলা টপ্পার বিলম্বিত চালের মুখ্যকাজ ও উত্তর ভারতীয় খেয়ালের সহযোগে দ্বিজেন্দ্রলাল টপ্-খেয়াল নামক যে-ফর্মকে নিজস্ব ভাবধারার প্রকাশ মাধ্যম রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তা পরবর্তীকালের বাঙলা গানকে মুক্তি দিয়েছে তালের দিক থেকে। এবং একমাত্র তিনিই বাঙলাগানে য়ুরোপীয় সুরের মহিমাটুকু কাজে লাগিয়েছেন। ভারতীয় সংগীতে সুরের একটি স্থায়ীরূপ ও সেইরূপের বিস্তারিত স্বরূপ ফোটানো হয় ; তাতে গাম্ভীর্য আছে, গভীরতা আছে, কিন্তু লঘুচপল গতি নেই। মনের বিচিত্র সূক্ষ্ম ওঠাপড়া, ঝর্ণার মত আনন্দের চকিত চাপল্য ভারতীয় গানের অন্তঃপ্রকৃতিতে নেই। দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা গানে বিদেশী সুরের এই দিকটি সংযোগ ক'রে ভাবী সুরকারদের সামনে আদর্শ রেখে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বাঙলা গানের ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কারকের ভূমিকা নেন নি। কেননা বাঙলাদেশের দীর্ঘবাহিত গানের ধারা ও রূপায়ণবৈশিষ্ট্যকে তিনি মূলত মেনে নিয়েছিলেন। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সংগীতসাধনা লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, তিনি বাংলার চিরায়ত গানের ধারাগুলিকে সার্থক ভাবপ্রকাশের বাহন বলে মেনে নেন নি। সেইজন্য বাঙলা লোকগীতির উপেক্ষিত সুরচ্ছন্দ, বিদেশী সুরের বৈচিত্র ও ভারতীয় মার্গসংগীতের বিস্তার—এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথ এমন এক গীতরীতির উদ্‌ভব করেছেন, যাকে আমরা বিশিষ্ট-ভাবে রবীন্দ্রসংগীত বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতে কোন বিশেষ গীতধারার প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে আবিষ্কার করা আয়াসসাধ্য, কারণ সব কিছুর স্বীকরণে রবীন্দ্রনাথের গান এক অনন্য রূপ নিয়েছে। তাতে ধ্রুপদের মত চারটি কলি আছে, আবার মাঝে মাঝে টপ্পার দানা মিশে আছে, কোন একটি বিশেষ রাগের সঙ্গে অভিনব মিশ্রণে আরেকটি রাগকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর সব কিছুকে অতিক্রম করে আছে গানের সংহত ব্যঞ্জনাময় বাণীশ্রী—যা এক একটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা। সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধি দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতসাধনার নানাতর বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, সংগীত অনুশীলন তিনি বেশিদিন করতে পারেননি ; ব্যবহারিক চাকুরীজীবনের প্রহার তাঁর সাধনায় বারবার বাধা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর অধিকাংশ গান পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অভিনয়যোগ্য নাটকের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে লেখা ; ফলে সুরসংগতির চেয়ে যেসব গানে বেশি নজর রাখতে হয়েছে জনচিত্তজয়ী উপাদানের দিকে। তৃতীয়ত, তাঁর গানের বাণী রবীন্দ্রনাথের মত শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতায় পরিণত হয়নি ; কারণ' দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের মত গানের ক্ষেত্রে কথার অভাবকে সুরের সাহায্যে পরিস্ফূট করতে চাননি বরং সুর কম্পোজিশনের অসমান্য গাঢ়তায় কথাগুলিকে তরঙ্গিত ক'রে দিয়েছেন।

এই সব কারণে, বাঙলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলালের গানের বিশিষ্ট সুরসামর্থ্য তথা কম্পোজাররূপে তাঁর

যোগ্য ভূমিকা আজও নির্ধারিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের গান, পাঠ্য গীতিকবিতার মত বেশ পড়া চলে। আধুনিক বাঙালী কাব্যপাঠক 'গীতিকবিতা' পড়ে আনন্দ পান। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি মূলত সুরনির্ভর তথা শ্রুতিসুখকর; কিন্তু প্রচারের অভাবে ও রূপায়নের ব্যর্থতায় দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রকৃষ্ট স্বরূপ সকলের সামনে উন্মোচিত হয়নি। বিশেষভাবে নিরপেক্ষ সংগীতরসিকদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একদিকে ব্যক্তিত্বের স্পন্দন, আরএকদিকে সরল ধর্মচেতনা; রবীন্দ্রনাথের গানে প্রথমটি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের গানে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য। সেইজন্য দ্বিজেন্দ্রলালের গানে সূক্ষ্মতার চেয়ে আবেগ বেশি, অনুভবের চেয়ে উচ্ছ্বাস, কাব্যের গূঢ়ার্থের চেয়ে সুরশ্রীর বিস্তার।

শিল্পে রীতি

শিল্পের মাঝখানে নিজেকে মেলে ধরবার বাঁধা ভঙ্গি আছে। ভঙ্গি বাইরে কেউ বেঁধে দেয় না, মনের কথাকে শিল্পে সাজিয়ে দিতে গিয়ে শিল্পীর ভেতরকার কারিগরটিই একে গড়ে তোলে মনের খোশমেজাজী চলনের লাগসই করে। আমরাতো চলেছি হাজার জনের মেলায় মিলে মিশে, তবু আবেগ-ভাবনা-খেয়াল-কল্পনার দিক থেকে আমাদের বনিবনা নেই, মনের একচেটে দৌলত নিয়ে সবাই আলাদা গণ্ডির বাসিন্দে। ফলে রূপ গড়তে গিয়ে গড়বার টানে-ছাঁদে-ঢঙে ওস্তাদের চলন-বলন-ধরণ-ধারণই পাকা হয়ে ফুটে ওঠে,—কাগজের গায়ে জলছাপের মতো। আর এরই জোরে কোনো কারিগরিকে অমুকের বলে চিনতে পারি। কারুকাজের ভেতরে এমনি করে নিজেকে খোদাই করবার যে একটা বিশেষ গৎ, শিল্পের ভাষায় তাকেই বলি রীতি। এটি রচনার পোশাকী বাহার নয়, বরং বনেদী চরিত্র।

চিন্তা যখন রূপ নেয়, তখনই রীতির জন্ম। রূপের বাইরে যে-চিন্তা সে তো ভবঘুরে, কোনো কিছু বানাবার কাজে তার ঝোঁক নেই। রূপের বাঁধনে ধরা দিলে তবেই শিল্পের আপিসঘরে কেজোদের খাতায় তার নাম ওঠে। তাই রীতির গরজে চিন্তা আর রূপ একেবারে হরিহরাত্মা। মনের ভাবকে প্রকাশ করতে গেলে রীতিকে মানতেই হবে, কারণ ও ছাড়া আর কোনো পথেই আমাদের ভেতরমহলের কথাকে শিল্পের মহলে মেলে ধরতে পারি না। এখানেই রীতির জোর আর এই জোরই এর সবচেয়ে বড়ো লক্ষণ। সুন্দরের সাথে নজরছাঁকা ভাবা-রঙ-সুর মিশিয়ে আমরা তৈরী করি রীতিকে। অবশ্য শিল্পীমনের তাগিদ থাকা চাই, নইলে গোটা ব্যাপারটাই কেমন জোলো হয়ে যাবে। রীতির সড়ক বাঁধা হোলো কি অমনি সদর-জগৎ যেন আপনা থেকে শিল্পীর অন্দরে রসঘন হয়ে ভারী সহজে সেই সড়ক বেয়ে চলে আসে রসিকের মেলায়। এই সহজ-চলার ছন্দটাই শিল্পকে অব্যর্থ করে তোলে।

যাঁরা বলেন কোনো কোনো রচনায় রীতি থাকে না, আমি তাঁদের মতকে নিজের করে নিতে গররাজী। আমার মনে হয়, রীতিকে বাদ দিয়ে কোনো রচনা সম্ভব নয়। একথা ঠিক যে, গড়বার ভঙ্গি মানেই রীতি, যদি সেই ভঙ্গির মাঝে শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবু গড়ে তোলা সব শিল্পেরই রীতি আছে, হয়তো সে রীতি ভালো-খারাপ হতে পারে, জোড়ালো বা কমজোর হতে পারে। এর বড়ো প্রমাণ হচ্ছে—নকল করা ছাড়া দুজন শিল্পীর দুটি রচনা সকল দিক থেকে হুবহু একই রকম হতেই পারে না। এই ফারাকটুকুর মূলে আছে আলাদা রীতির হাজিরা।

চারপাশের দুনিয়া আমাদের মনে যে-দোলা লাগায়, তাকে শিল্পের চেহারা দেওয়া যায় কেমন করে—এই চিন্তাই আমাদের পেয়ে বসে, আর এই চিন্তাকে সুডোল করে তুলতে গিয়েই রীতির

দোরে হাত পাততে হয়। যেহেতু রীতি হচ্ছে শিল্পের চরিত্র, সেকারণে তর্ক করে কিংবা ছুরি-কাঁচি চালিয়ে কাটা-ছেড়া করে একে পাওয়া যাবে না। সত্যিকারের সমঝদার রসিকের উপলব্ধিতেই এটি ধরা পড়ে। 'সত্যিকারের, বললুম এজন্য যে, অনেকেই হয়তো শিল্প বোঝেন, শিল্প ভালবাসেন, কিন্তু চারপাশের দুনিয়া শিল্পীমনে যে-আবেগ জাগায় সেই আবেগের অভিজ্ঞতা রসিকমহলে খুব কমজনেরই থাকে। যিনি এমনিধারা অভিজ্ঞতায় ধনী তাঁকেই বলি সত্যিকারের সমঝদার। একটিমাত্র রচনাকে পরখ করেই রীতিকে জানা যায় না; কোনো শিল্পীর পর-পর বেশ কিছু রচনার স্বাদ নিলে তবেই তাঁর রীতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে রসিকজনের কাছে।

এক রীতির সাথে আরেক রীতির তফাৎ ঘটে গড়নের দিক থেকে, কিংবা ধরণের দিক থেকে, মানুষ ক্রমেই সমাজমনের আসর ছেড়ে ব্যক্তিমনের বাসরে চলেছে। তাই আজকের দিনে নানান রীতির মাঝে মিল খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা বৃথা, কারণ এক রাজার কাল পেরিয়ে আমরা সবাই রাজার কালে এসে ঠেকেছি। এদিক থেকে বলব, রীতিই হচ্ছে মনের আদল, শিল্পীর সকল পরিচয় লুকোনো রয়েছে শিল্পরীতির মাঝে।

এ তো গেলো গমকী রীতির কথা। আরো একটা দিক আছে—তার নাম দিলুম ঠমকী রীতি। এর আসন একেবারে ভিন্ন সারিতে। এই রীতি যেন ঠিক আগেরটির মতো গভীর নয়, কিছুটা ওপর-ওপর ভাসা-ভাসা। তার মানে, এটি শিল্পের বনেদী চরিত্র নয়, বরং পোষাকী বাহার। শিল্পকে গড়তে গিয়ে টানে-ছাঁদে-ঢঙে তাকে সাজাবার যে একটা বিশেষ ধারা, কারুশালার আওতায় তাকেই বলি ঠমকী রীতি। সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, শিল্পীর মনের কথাকে প্রকাশ করবার দিকে এর তেমন ঝুঁকি নেই, যতটা ঝোঁক আছে...কেমন করে প্রকাশ করা হোলো—সেদিকে।

এই ঠমকী রীতি আবার হরেক রকমের। যেমন, অনেক সময় কোনো একজন শিল্পী তাঁর রচনাকে যেভাবে সাজান, সেই বিশেষ ঢঙটুকু শিল্পীর নামের তকমা এঁটে নামজাদা হয়ে পড়ে। এমনি করে এলেমদার শিল্পী তাঁর নিজের ছাঁচ দিয়ে নিজেরই কালের শিল্পীদের বিভোর করে তোলেন, আর তাঁরা ঐ ছাঁচে শিল্প গড়তে গিয়ে মোটের ওপর ছাঁচটাকেই নকল করতে থাকেন। ফলে একই রকমের ঠমকী রীতিকে বজায় রেখে একটা শিল্পীগোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

ঠমকী রীতি বিশেষ সময়েরও হতে পারে। যেমন, এক এক যুগে এক এক রকম রীতির চলন হয়। মধ্যযুগের শিল্পে একটা দরাজ জমক মাথা তুলেছিল, সে তুলনায় আজকের শিল্প কতো সাদামাটা ছিমছাম। এমন কি যুদ্ধের আগের রীতির সঙ্গেই যুদ্ধের পরের রীতি খাপ খায় না। কাজেই কোনো সময়কার চারপাশের অবস্থা কিংবা বড়ো ঘটনা শিল্পীমনকে আচমকা এমন ধাক্কা মারে যে শিল্পীর সাবেকী ধারণায় ফাটল ধরে যায়, তখন ভেতরকার একরোখা তাগিদে রীতির জন্যে তিনি নোতুন করে পথ বেঁধে নেন।

কখনো-বা রীতি তৈরী হয় শিল্প গড়ার মালমশলার খাতিরে। এক ভাষার শব্দের যে-চাল যে চলন থাকে আরেক ভাষার শব্দের তেমনটি থাকে না। তাই ইংরেজি কবিতার ছন্দ আর জাপানী কবিতার ছন্দ একেবারে আলাদা জিনিষ। মজবুত প্যাপাইরসের গুঁড়ির ওপর কাদামাটি

লেপে মিশরে যে মূর্তি গড়া হলো, চীনদেশের পক্ষে তার রেওয়াজ করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের নানান আবিষ্কার পশ্চিমের বস্তুঘেঁষা অভিনয়কে যে-খাতে নিয়ে গিয়েছে, পূবের ভাব-ডগমগ অভিনয়কলা আপনা থেকে সেই খাতটি কিছুতেই কেটে নিতে পারে না।

রীতির মূলে কোনো বিশেষ অঞ্চলের মেজাজ আড়ালে আবডালে কাজ করে চলে। নিজের চারপাশের জল-হাওয়াকে ধ্যানধারণাকে কোনো শিল্পীই উড়িয়ে দিতে পারেন না। তাঁর দেহে-মনে-ভাবে-ভাবনায়, এমনকি নিজেকে মেলে ধরবার ঢঙটুকুর ওপর, ওরা এমন যাদু-পরশ বুলিয়ে দেয় যে, গড়ে তোলা শিল্পের ভেতর দিয়ে তা ফুটে উঠতে থাকে। ফলে তল্লাটে তল্লাটে রীতির হেরফের। তাই তো দেখি, একই ভারতের শিল্প হয়েও পাটনা-কলম, কাংড়া-কলম, বিষ্ণুপুর-ঘরানা, মনিপুরী-নাচ।

সব শিল্পেরই একটা নিশানা আছে। ভাষা-রং-সুর মারফত শিল্পী তাঁর ঝোঁক বা মর্জিকে ঐ নিশানামুখো করে তোলেন। কাজেই মর্জিটাকে বড়ো করতে গিয়ে কারিগরির ভঙ্গিটা মর্জিমাফিক হয়ে ওঠে। এমনি করে বাঁধা হয় রীতি। যেমন, ধরা যাক, শিল্পী চাইলেন রসিকমনে হাসির হর্‌রা ছোটাতে। তাঁর রচনার রীতি গড়ে উঠবে ঠাট্টা নিয়ে, টিপ্পনী নিয়ে, বেমানান ধরণ নিয়ে, আবোল-তাবোল কিম্ভুত কল্পনা নিয়ে। আবার রসিকমনকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে প্রশান্ত গম্ভীর করে তুলতে গেলে রীতির ভেতরে একটা গণ্ডিছাড়া দেদার দরাজ ভাব থাকা চাই, যার নজির আছে ভৈরবী রাগিণীতে, গথিক ধারার গরবী খিলান আর দিঘল থামগুলিতে।

শিল্পের বিষয়ের ওপর জোর দিয়েও রীতি গড়ে ওঠে। যেমন, আমরা অনেক সময় বলে থাকি, নাটুকে রীতি। তার মানে, নাটক রচনা করবার ভঙ্গিটি, বিশেষ করে নাটকে ঘটনা সাজাবার ধরণটি যেমন তারই নামের শীলমোহরে একচেটে হয়ে গিয়েছে। নাটকে যে দৃশ্যসংগীত তার গোড়াতেও এই একই কারণ।

রসিকজন শিল্পকে না নিলে তো শিল্পের দরই গেল কমে, যদিও দাম একচুল কমে না। তাই রসিকজনের মন যোগাতে গিয়ে শিল্পের রীতির চলন হয়। রাজাবাদশার আমলে শিল্পের যাচনদার ছিলো রাজসভার সভাসদেরা, পারিষদেরা, খেলাত-পাওয়া উজীর-নাজির-আমির-ওমরাহেরা। কাজেই শিল্পের কারিগরিতে চালু ছিলো রাজসভার রীতি। যতই দিন গেল, রাজসভা মিলিয়ে গেল জনসভায়। ফলে হাল-আমলের শিল্পে পেলুম জনগণের রীতি।

এই যে এত রকমের রীতির হদিশ পাওয়া গেল এদের কোনোটা শিল্পের লক্ষণ, কোনোটা-বা গুণ। সাধারণ রসিকের পক্ষে এই গোলমেলে প্যাঁচোয়া ব্যাপারটা যাচাই করে নেওয়া সহজ নয়। হালকাভাবে বলতে পারি, রীতি যেখানে লক্ষণ সেখানে মনকে দোলায়, যেখানে গুণ সেখানে রুচিকে ভোলায়। তার মানে, আগেরটিতে রসিকের ভেতরমহলকে তোলপাড় করে তাকে উঁচু তলার মানানসই করে নোতুনভাবে গড়ে তোলে। পরেরটিতে চমক আছে, কিন্তু রসিকজনকে সেই চমকদারীতে মজাতে পারে না।

সব শিল্পেই রীতির তিনটে ঘাট—গোড়াতে রসিকজনের কাছে কোনো বিষয়ে মেলে ধরা, তারপর মেলে-ধরা বিষয় দিয়ে রসিকজনকে খুশি করা, শেষটায় খুশি-করা রসিকজনকে ইচ্ছেমতো

আলোড়নে মাতিয়ে তোলা। একমাত্র অভিনয়ে এই তিনটে ঘাটকে খোলাখুলি আলাদা করে জেনে নেওয়া যায়, নইলে এরা থাকে শিল্পের টানে-ছাঁদে-ঢঙে জড়িয়ে মিশিয়ে।

যেখানে যেটি মানায় তাকে সেখানে সাজিয়ে শিল্পকে নিখাদ আর পরিপাটি করে তোলাই রীতির নিশানা হওয়া উচিত। তবে নজর রাখতে হবে, এর ফলে শিল্প যেন হাটবাটের জিনিস না হয়ে পড়ে। ছিমছাম রুচির ভেতর দিয়েই রীতির বনেদিয়ানা ফুটে ওঠে। যাঁরা বলেন—কোমর বেঁধে রীতি গড়া যায়, আমি না বলে পারছি না যে, তাঁরা একটানা নিরেট ছেলেমানুষিক আস্কারা দিচ্ছেন। কারণ রীতিকে কোমর বেঁধে গড়া যায় না, ভেতরের তাড়া যদি না থাকে। অবশ্য নোতুন পথে চরবার একগুঁয়ে ঝোঁকটা অনেক সময় শিল্পীদের পেয়ে বসে। আমার মজবুত বিশ্বাস শিল্পীমনে সেই পথের গোটা চেহারাটা জেগে না উঠলেও তার একটা খসড়া তৈরী হয়ে যায়। সেই খসড়াটার ওপরে সবটুক্ ইচ্ছে দিয়ে দাগা বুলোতে বুলোতে একদিন পথের ছবিটা পাকা হয়ে ধরা পড়ে।

দেবব্রত চক্রবর্তী

সাহিত্য-সাধক বিবেকানন্দ। শ্রীঅধীর দে। প্রকাশক : সৃষ্টি প্রকাশনী ১৪১-বি, ব্রাহ্ম সমাজ রোড, কলিকাতা-৩৪। পরিবেশক : কল্লোল প্রকাশনী, এ-১৩৪, কলেজষ্ট্রীট মার্কেট. কলিকাতা-১২। মূল্য : তিন টাকা।

স্বামী বিবেকানন্দ এক বক্তৃতায় নিজের সম্পর্কে বলেছেন, 'Above all, I am a poet'। এই কবি পরিচয়ই বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয়। তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদয়ের স্পর্শ, গভীর আবেগ ও কবিত্বের পরিচয় শুধু তাঁর কবিতাবলীর মধ্যেই নয়, স্বামীজীর বক্তৃতা, বাণী, চিঠিপত্র ও প্রতিটি গদ্যরচনার মধ্যে নিহিত। গ্রন্থকার যথার্থই বলেছেন, 'যিনি শব্দের মধ্যে প্রাণ-চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারেন, ছন্দের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহের স্পন্দন আনয়ন করিতে সক্ষম হন এবং যাঁহার প্রতিটি বাক্য আশ্চর্য-সুন্দর ও এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টিকারী, তিনি যে মনেপ্রাণে প্রকৃতই কবি, সে-সম্পর্কে কোন সংশয়ের অবকাশই নাই।' এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য মনীষী রমঁ্যারল্যাঁর স্বামীজী সম্পর্কিত মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'His (Vivekananda) words are great music, phrases in the style of Bethoven, stirring rhythms like the march of Handel choruses.'

সমালোচ্য গ্রন্থে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ অধীর দে বিবেকানন্দের সাহিত্য প্রতিভার আলোচনা করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। বাংলা গদ্যে, বিশেষ চলিত রীতির প্রবর্তনায় বিবেকানন্দের দানের কথা উপেক্ষণীয় নয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দিক থেকে তো বটেই, স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় উদ্ঘাটনে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় বিশেষ প্রয়োজন। বিবেক-প্রতিভার এই বিশেষ প্রয়োজনীয় দিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় একরকম উপেক্ষিতই থেকে গিয়েছে। সম্প্রতি কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত রচনা ও তাদের সংকলিত গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ে উপর আলোকপাতের চেষ্টা করা হলেও তা সামগ্রিক ভবে অখণ্ড (synthetic) আলোচনায় পর্যবসিত হতে পারেনি। সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে একক ভাবে বিবেক-প্রতিভার সৃষ্ট সাহিত্যের মূল্যায়ন করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি বললেই চলে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগ সন্ধিক্ষণের এই মহান নায়কের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচারের সঙ্গে সাহিত্যিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ইতিহাসে তাঁর স্থান নিরূপণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। ডঃ দে এই কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। আমাদের মনে হয় তিনিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রতিভার সামগ্রিক রূপ ধরবার চেষ্টা করেছেন।

বীরেশ্বর, সমাজ-সংস্কারক, বৈদান্তিক, হিন্দুধর্ম প্রচারক, যুগাচার্য, সন্ন্যাসী, বিপ্লবী, পরিব্রাজক প্রভৃতি পরিচয় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও কর্মের নানাদিক উদ্ঘাটিত করে। কবি

বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টি কবিকল্পনা ও সৌন্দর্যানুভূতির যথার্থ প্রকাশ, সত্য শিব সুন্দরের পূজারী এই তরুণ সন্ন্যাসীর অন্তরের ভাবুক মনটির পরিচয় তাঁর ইংরেজী বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কবিতা ও সঙ্গীতে, খণ্ডকাহিনী, ভ্রমণবৃত্তান্ত ও চিঠিপত্রে নিহিত। বিশেষ বাংলা ভাষায় চলিত গদ্যরীতির সমৃদ্ধিতে বিবেকানন্দকে স্মরণ করতে হয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালী ভাষা' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমী ভাষা' বাংলা গদ্যে প্রথম কথ্য ভাষা প্রচলনের সাহিত্যিক প্রয়াস। কিন্তু সে ভাষা রঙ্গ-কৌতুক ভিন্ন পরিমিত শালীনতাবোধ, সৌন্দর্য ও রসসৃষ্টির যথার্থ পরিচয় দিতে পারেনি। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' প্রকাশের প্রায় সাঁইত্রিশ বৎসর পর বিবেকানন্দের রচনায় চলিত গদ্যরীতি সর্বপ্রথম সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার ব্যাপক আন্দোলনের প্রবর্তক 'সবুজপত্র' ও বীরবলের অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর বহুপূর্বেই বিবেকানন্দ গুরুগম্ভীর তত্ত্ব বা গল্পকাহিনী মূলক যে কোন ভাবকে বাংলাগদ্যে প্রকাশের পক্ষে চলিত রূপাদর্শকে গ্রহণ করে ভাগীরথী তীরের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যিক মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ডঃ দে তাঁর আলোচনায় 'ভাষা ও বাণীভঙ্গি' শীর্ষক স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে বিবেকানন্দের কাছে বর্তমান বাংলা ভাষার ঋণের কথা স্মরণ করেছেন।

বাংলা সাহিতের পাঠকের কাছে কবি রামকৃষ্ণের মন্ত্রসাধক ও উপযুক্ত শিষ্য বিবেকানন্দের কবি পরিচিতি ছিল না। অবশ্য বিবেকানন্দের কবি ও সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে বিশ্বকল্যাণকর সমাজ ধর্ম ও রাজনীতি চেতনার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। তিনি সক্রিয় ভাবে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হননি বা শিল্পসৃষ্টি কর্মে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন তাও তাঁর ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর লিখিত অসংখ্য চিঠিপত্রে ভ্রমণবৃত্তান্তে, দেশ ও জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় উদ্ঘাটনে কখনো ধর্মের ব্যাখ্যায়, বক্তৃতায়, কথোপকথনে বা ডায়েরী রচনায় তাঁর যে পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়েছে তা দুর্লভ সাহিত্য-প্রতিভার নিদর্শন। তাঁর জীবনের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা সমাজ সংস্কারের কাজে, বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম প্রচারে, রামকৃষ্ণ দেবের জীবন ও বাণীর প্রতিষ্ঠায়, সর্বোপরি সমগ্র বিশ্বের কাছে মহান ভারতবর্ষের পরিচয় দানে ব্যাপৃত ছিল। তৎসত্ত্বেও একথা সুবিদিত, যখনি সময় পেয়েছেন তিনি কবিতা লিখেছেন, সঙ্গীত রচনা করেছেন। আপন মনে গান গেয়েছেন। শোনা যায় নরেনের গান শুনেই রামকৃষ্ণ দেব আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নরেন ছিলেন সুগায়ক, সুকণ্ঠ। প্রাক্-সন্ন্যাস যুগ থেকেই বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সঙ্গীতের দিকে প্রবণতা দেখা যায়। লেখক আবেগ ও কবিত্ব পর্যায়ে বিবেকানন্দের প্রতিটি বাংলা কবিতা ও সঙ্গীত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিবেক-প্রতিভায় ইংরেজ কবি মিলটন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ কবিগণের প্রভাব আলোচনা করে তিনি বলেছেন, 'বিবেকানন্দ ভাষা ও ছন্দের দিক হইতে তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা সমকালীন কবিগণদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইলেও ভাবের ক্ষেত্রে তাঁহাদের কাহাকেও অনুসরণ করেন নাই।' বিবেকানন্দের অধিকাংশ সঙ্গীত ও কবিতার ভাব অধ্যাত্ম-তত্ত্ব বা উপনিষদের সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। এই বিষয়াশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ ভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যের ও অভিনব ভাবাদর্শে বিবেকানন্দের ব্রহ্ম ও শক্তি বিষয়ক সঙ্গীত ও কবিতাবলীর নামকরণ থেকে (যথা—'শ্রীরামকৃষ্ণ -আরত্রিক ভজন' 'শিব-সঙ্গীত,

'সৃষ্টি', 'প্রলয় বা গভীর সমাধি', 'সখার প্রতি', 'নাচুক তাহাতে শ্যামা', 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' ও 'সাগরবক্ষে') বিষয়ের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। লেখকের এই পর্যায়ের আলোচনা মনোরম ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

'মনন ও ব্যক্তিত্বে' লেখক স্বতন্ত্র ভাবে বিবেকানন্দের চিন্তানায়ক পর্যায়ের রচনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'ভাববার কথা' 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'পত্রাবলী' এই এই পর্যায়ের রচনার অন্তর্ভুক্ত। চিন্তানায়করূপে তিনি যে বিশ্ববাসীর অন্তরে স্থান করে নিয়েছিলেন তার কিছু কিছু পরিচয় এই সকল গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিবেকানন্দের রচনার লৌহদৃঢ় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে আমাদের সুপ্ত চেতনা জাগরিত হয়, বলতে গেলে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে, তার পরিচয়ও এই সব রচনার মধ্যে নিহিত। পরাধীনতার দাসত্বে বদ্ধ দরিদ্র ভারতবাসীর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে এই রচনাগুলি লিখিত ; জাতিগত বৈষম্যের হীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মহান ভারতবর্ষ আবার যাতে সমগ্র বিশ্বের কাছে ধর্ম জাতি ও দেশ হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, তাঁর রচনার এটিই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় রচনাগুলি লিখিত হলেও কোথাও অতিরঞ্জিত বা অহেতুক পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায়নি ; বরং ইউরোপ আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশ ও জাতি সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য, বিভিন্ন সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ঐতিহাসিক পরিচয়, সমাজ ধর্ম রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সুনিপুণ আলোচনা বিবেকানন্দের গভীর মনন ও সুবিশাল ব্যক্তিত্বের পরিচয় বহন করে। তাঁর সমন্বয়বাদ মানবিক কল্যাণ চেতনায় বিশ্বসমাজ গঠনের কাজে আদর্শস্বরূপ। বিশেষ, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের রজোগুণ ও প্রাচ্য জীবন দর্শনের সত্ত্বগুণের সমন্বয় না হলে কল্যাণ ও সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, বিবেকানন্দের এই নির্দেশটি বর্তমান কালেও বিশেষভাবে বিবেচ্য। লেখক তাঁর আলোচনায় বিবেকানন্দের রচনার এই মানব কল্যাণের দিকটির অনুসন্ধান করেছেন। আমাদের মনে হয় এই পর্যায়ের আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সমাপ্ত হয়েছে। বিবেকানন্দের 'মনন ও ব্যক্তিত্বে'র আলোচনায় লেখকের আরো বেশি তথ্য ও যুক্তি নির্ভর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বিবেকানন্দের অধিকাংশ চিঠিপত্র, বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি ইংরেজি ভাষায় রচিত। তাঁর ইংরেজি রচনার পরিমাণ বাংলা রচনার চেয়ে কম নয়। সে সব রচনা আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারেনি। যদিও লেখক আশ্বাস দিয়েছেন, ভরসা পেলে তিনি বিবেকানন্দের ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত রচনা নিয়েও স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করবেন। তাহলেও আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গরূপ দিতে বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাই লেখকের মূলধন হওয়া উচিত ছিল। শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় লিখিত রচনা থেকে বিবেকানন্দের মনন ও ব্যক্তিত্ব-রূপ খণ্ডিত ভাবেই প্রকাশ পায়।

একথা সুবিদিত, বিবেকানন্দ সর্ব্ববিষয়ে রামকৃষ্ণদেব কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিলেন ; বিশেষ কাব্যিক প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে এই প্রভাব অনতিক্রম্য। সচেতন ভাবে না হোক অবচেতন ভাবেও বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণদেবের স্বভাব-কবিত্বের প্রভায় আচ্ছন্ন। রামকৃষ্ণদেবের কথার তীব্রতা, যা মনকে সরল ও সোজা ভাবে নাড়া দেয়, বিবেকানন্দের রচনার আবেগময়তা ও ব্যঞ্জনাও

সমভাবেই সাড়া দেয়। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বোধকরি মার্জিত রুচির, যা অনেক ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণদেবকে খাঁটি গাঁয়ের মানুষ বলে মনে হয়, আর বিবেকানন্দকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রুচিবান। বিবেকানন্দের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশে রামকৃষ্ণদেবের স্বভাবকবিত্ব যে অনেকখানি দায়ী সে বিষয় গবেষণার অপেক্ষা রাখে। আমাদের মনে হয় এ-বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা এ-ক্ষেত্রে বিষয়ানুগই হবে। আশা করি গ্রন্থকার এ-বিষয়ে ভবিষ্যতে ভেবে দেখবেন।

গ্রন্থারম্ভে বিবেকানন্দের সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিপরিচিতি ও পরিশিষ্টে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়ে গ্রন্থের ব্যবহারিক মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র্যে উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্যে ও আলোচনার গভীরতায় 'সাহিত্যসাধক বিবেকানন্দ' বাংলা সাহিত্যের উল্লেখ্য গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

রতন সান্যাল

ঝক্‌ঝকে দাঁত
আর সুন্দর হাসি
সাধনা
দশন
আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরী আদর্শ দাঁতের মাজন
SADHANA
DASAN
সাধনা দশন নিয়মিত ব্যবহার করিলে কোন দন্তরোগের ভয় থাকে না। দন্তরাজী সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়।
দেশীয় গাছগাছড়া হইতে ইহা প্রস্তুত হয়।

একাদশ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৩৭০
সমকালীন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
১·২৫

বাংলার শিকার প্রাণী
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩·০০

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
নৃত্যবিদ্ শ্রী মণি বর্ধন
২·৯০

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

উন্নয়নের পথে পশ্চিমবঙ্গ
০·৫০

পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের কর্মসংস্থানের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা
শ্রী নিস্তারণ চক্রবর্তী
১·০০

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা
(হস্তশিল্প)
শ্রী আশীষ বসু
১·২৫

গান্ধী রচনাবলী
১ম খণ্ড
২য় খণ্ড
প্রতি খণ্ড—৫·০০

স্থানীয় বিক্রয় কেন্দ্র

প্রকাশন বিক্রয় কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস স্ট্রীট
কলিকাতা—১

ডাকযোগে অর্ডার দিবার ও মণিঅর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা

প্রকাশন শাখা
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপালনগর রোড
আলিপুর, কলিকাতা—২৭

W.B.(P)Adv-D 20 /64.

AMBASSADOR
faces the futur
with a broader
outlook !

The re-styled radiator grille gives the new Ambassador a face-lift matching her numerous other attractive features. For, mark you, her face is not her only good fortune. With new front and rear bumper over-riders, the "Mark II" flash on each front wing, side-lights placed at the base of the grille, improved front-seat design, addition of two-tone trim, ash trays for the front and rear seats and at the centre of the facia panel, new designs for the roof lining and door trim pads and provision of the HM emblem at the bottom centre of the rear glass, the new Ambassador presents a definite new look.

With graceful modern styling, spacious comfort, a powerful 1489 c.c. O.H.V. engine and modest fuel consumption, the Mark II boasts of beauty as enchanting as her performance.

the old favourite with the new look

THE NEW
AMBASSADOR MARK II

HM
HINDUSTAN MOTORS

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1.

একাদশ বর্ষ ১১শ সংখ্যা

ফাল্গুন তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ফাল্গুন
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

রাখালদাস ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ১২ই এপ্রিল (বঙ্গাব্দ ১লা বৈশাখ ১২৯২) মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। রাখালদাসের পিতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সন্তান ছিলেন। বহরমপুরে ইনি আইন ব্যবসায়ী রূপেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। রাখালদাস মতিলালের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুল হইতে ১৫৲ টাকা বৃত্তি সহ এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এই সময় উত্তরপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা কাঞ্চনমালা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কাঞ্চনমালা সাতিশয় বিদুষী ও গুণবতী ছিলেন। বিবাহ-পরবর্তী জীবনে স্বামীর আদর্শে বাঙ্গলা ভাষায় তিনি কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া যশস্বিনী হন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বিষয় সংক্রান্ত নানা দুর্যোগে জড়িত হইয়া পড়ায় কিছুদিনের জন্য তাঁহার পড়াশুনা স্থগিত রাখিতে হইয়াছিল।

প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালে রাখালদাস আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সমধিক আগ্রহান্বিত হন। কলেজে হরপ্রসাদ রাখালদাসের সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে পাঠকালেই রাখালদাস ভারতীয় যাদুঘরে নিয়মিত যাতায়াত করিতেন, এই সময় যাদুঘরে পুরাতত্ত্ব শাখার অধ্যক্ষ ছিলেন ডাঃ থিওডোর ব্লখ্ (Dr. Theodore Bloch)। ব্লখ্ শিলালিপির পাঠোদ্ধার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তরুণ রাখালদাসের অনুসন্ধিৎসা তাঁহাকে আকৃষ্ট করে এবং

তিনি তাঁহাকে সযত্নে প্রাচীন লিপি পাঠ বিষয়ে শিক্ষা দিতে থাকেন। স্বীয় মেধা এবং গুরু ব্লখের অকৃপণ সহায়তায় বি-এ পাশ করিবার পূর্বেই রাখালদাস প্রাচীন লিপি ও প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত হন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস ইতিহাসে অনার্স সহ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। এই বৎসরই কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে রাখালদাস প্রাচীন কুক্কুটপাদ বিহারের অবস্থান সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তিনি এই প্রবন্ধে এই মত প্রকাশ করেন যে গয়া জেলার গুড্‌পা পাহাড়ই প্রাচীন কুক্কুটপাদ গিরি। এই বৎসরই এই পত্রিকাতেই তিনি মালয় উপদ্বীপে প্রাপ্ত কয়েকটি মৃন্ময় ফলক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পাশ করিবার পূর্বেই লক্ষ্ণৌ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে রাখালদাস লক্ষ্ণৌ গমন করেন ও তথায় কয়েক মাস অবস্থান করিয়া মিউজিয়মস্থ তাম্রশাসন গুলির পাঠোদ্ধার করেন এবং ইহার পুরাবস্তু সংগ্রহগুলির তালিকা প্রস্তুত করেন। লক্ষ্ণৌ মিউজিয়ামে কার্যকালে তিনি শক যুগ সম্বন্ধে কতকগুলি অজ্ঞাত তথ্য আবিষ্কার করেন। এই বৎসর সুপ্রসিদ্ধ Indian Antiquary পত্রিকায় ভারত ইতিহাসে শক-কুষাণ যুগ সম্বন্ধে রাখালদাসের ৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তরুণ রাখালদাসের আহৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথকে তাঁহার Early History of India গ্রন্থের শক যুগ সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি সংশোধন করিতে হয় (Scythian Period in Indian History—Indian Antiquary 1908)। এই সময়ে শক যুগে প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপি সম্বন্ধেও রাখালদাসের একটি প্রবন্ধ Epigraphica Indi aতে প্রকাশিত হয় (New Brahmi Inscriptions of the Scythian Period—Epigraphica Indica Vol X).

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধি লাভ করেন। এই বৎসরই তিনি কলিকাতা মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব শাখার (Archaeological Section) একজন কর্মচারী (সহকারী) নিযুক্ত হন। কর্মদক্ষতার গুণে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ছয় বৎসরকাল রাখালদাস এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে ভারতীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময় তিনি যে সকল তথ্য সংগ্রহ করেন সেইগুলির সাহায্যে উত্তরকালে তিনি মধ্যযুগে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভাস্কর্য সম্বন্ধে একটি মহামূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই (১)। Indian Museumএ কর্মকালে রাখালদাস আরও কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পাল যুগ সম্বন্ধীয় একটি ইংরাজী পুস্তকে তিনি বাঙ্গলার পাল রাজগণ সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত তথ্য সন্নিবেশিত করেন (২) রমাপ্রসাদ চন্দের "গৌড়রাজমালা" এবং রাখালদাসের Palas of Bengal একই সময়ে রচিত হয়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বাঙ্গলার ইতিহাস রচনায় প্রথম পদক্ষেপের কৃতিত্ব রমাপ্রসাদ চন্দের ন্যায় রাখালদাসেরও প্রাপ্য। রাখালদাস রচিত বঙ্গাক্ষরের উৎপত্তি বিষয়ক একটি রচনা ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "জুবিলী রিসার্চ প্রাইজ" অর্জন করে। ইহা ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৩)।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় মুদ্রাতত্ত্বের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান আছে। Sir

Alexander Cunningham (1814-1893), James Princep (1799-1840), Edward Thomas (1813-1886), H. M. Elliot (1808-1853), James Rapson (1861-1937) প্রভৃতি বৈদেশিক পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে গবেষণার সূত্রপাত করেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে ভগবানলাল ইন্দ্রজীই প্রথম মুদ্রাতত্ত্বচর্চায় অগ্রণী হন। ইন্দ্রজীর মুদ্রাতত্ত্বচর্চা পশ্চিম ও ও উত্তরাঞ্চলের ক্ষত্রপ নৃপতিগণ প্রচলিত মুদ্রাগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রাখালদাসই সর্বপ্রথম ভারতের সকল যুগের মুদ্রা লইয়া বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তি রচনা করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাখালদাসের "প্রাচীন মুদ্রা" ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি অতি উল্লেখযোগ্য রচনা (৭)। এই গ্রন্থ রচনার পূর্বে ও পরে রাখালদাস প্রাচীন মুদ্রা সম্বন্ধে বহু নিবন্ধ রচনা করেন এইগুলি এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, বিহার ও উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি জার্নাল প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (দ্রঃ—মুদ্রাতাত্ত্বিক রাখালদাস "ইতিহাস", ৭ম খণ্ড)।

রাখালদাস রচিত "বাঙ্গলার ইতিহাস" দুই খণ্ডে যথাক্রমে ১৯১৪ ও ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (৫)। এই দুই খণ্ড বাঙ্গলার ইতিহাসে মুদ্রা, প্রাচীন লেখমালা প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি মূল উপাদানের উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সহ বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালীন ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম খণ্ডটির ৩য় সংস্করণ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাতনামা ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। "প্রাচীন মুদ্রা" ও দুইখণ্ড বাঙ্গলার ইতিহাস যদি বাঙ্গলায় রচিত না হইয়া ইংরাজীতে রচিত হইত তবে রাখালদাস প্রচুর অর্থ ও যশ লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ বশতঃই রাখালদাস এই বইগুলি বঙ্গভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় শাখার সহকারী অধ্যক্ষরূপে কর্মরত থাকার সময়ে রাখালদাসের পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, ইতিহাসচেতনা ও কর্মদক্ষতা ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা জন মার্শালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মার্শালের চেষ্টায় রাখালদাস ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম অঞ্চলের অধ্যক্ষ (superintendent) নিযুক্ত হন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী, রাজপুতনা ও মধ্যভারত লইয়া গঠিত এই অঞ্চলের কার্যালয় পুণায় অবস্থিত ছিল। পুণায় ছয়বৎসর অবস্থান সময়ে রাখালদাস তাঁহার সীমানার মধ্যে অবস্থিত ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন স্থান হইতে বহু প্রত্নদ্রব্য নিদর্শন ও প্রত্ন সমৃদ্ধ স্থান আবিষ্কার করেন এবং এই সমস্ত স্থান গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে সুষ্ঠু সংরক্ষণের ব্যবস্থা করান। এইসময়ে তাঁহার পরিদৃষ্ট ও আবিষ্কৃত মন্দিরাদির বিবরণ পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় বার্ষিক রিপোর্ট ও Memoirs এ প্রকাশিত হয়। এই রচনা গুলির মধ্যে বাদামী, ত্রিপুরী ও ভূমারা বিষয়ে তাঁহার নিবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য (৬)। পশ্চিম অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ থাকাকালে রাখালদাস বোম্বাইএর প্রিন্স অব্ ওয়েলস মিউজিয়মের পুরাতত্ত্ব বিভাগটি সুসংগঠিত করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের শীতকালে রাখালদাস তৎকালীন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুবিভাগের লারকানা জেলার অন্তর্ভুক্ত মহেঞ্জোদাড়ো নামক স্থান খনন আরম্ভ করেন। এই স্থানটি প্রত্নসমৃদ্ধ অঞ্চল রূপে পরিচিত ছিল। ইহার কিছুদিন

পূর্বে অবিভক্ত পাঞ্জাবের মণ্টোগোমারী জেলায় হরাপ্পা নামক স্থানে প্রাক্ আর্য সভ্যতার কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মহেঞ্জোদাড়োতে ইতিপূর্বে কোন প্রত্নাভিজান হয় নাই এবং এখানে যে সিন্ধু-সভ্যতার কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতে পারে এরূপ কোন চিন্তাও কাহারও মনে আসে নাই। ইতিপূর্বে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া রাখালদাস একটি বৌদ্ধযুগের স্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান। বৌদ্ধযুগের নিদর্শন দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া রাখালদাস ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অত্যন্ত পরিমিত অর্থ ও লোকবল সহ এই স্থান খনন করিতে আরম্ভ করেন ও এখানে চারিটি বিভিন্ন যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেন। গভীর ইতিহাস জ্ঞান ও প্রগাঢ় মনীষা সম্পন্ন রাখালদাস সিদ্ধান্ত করেন যে উপরের স্তরে বৌদ্ধযুগের (খৃষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীর) সভ্যতার যে নিদর্শন রহিয়াছে নিম্নতম স্তরের প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি তাহা অপেক্ষা দুই তিন সহস্র বৎসরের প্রাচীনতর এবং এই সভ্যতা প্রাক্-বৈদিক। এই নিম্নতম স্তরে প্রাপ্ত লিপি যুক্ত কয়েকটি সীলকে তিনি হরাপ্পার প্রাপ্ত কয়েকটি সীলের সহিত একই সময়ের বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই সময় পুরাতত্ত্ব বিভাগ হরাপ্পায় প্রাপ্ত Chalcolithic যুগের নিদর্শন আর কোন স্থানে পাওয়া যায় কিনা তাহার সন্ধান করিতেছিলেন। রাখালদাসের মহেঞ্জোদাড়ো অভিযানের অভিজ্ঞতাগুলি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় বার্ষিক প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ হয় (Annual Report, 1920, 1922-23)। রাখালদাসের মন্তব্যাদি পাঠ করিয়া পুরাতত্ত্ব বিভাগ মহেঞ্জোদাড়োতে রাখালদাসের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে এই অভিযানের জন্য রাখালদাস যে পরিমাণে অর্থ, লোকবল ও অন্যান্য সুবিধা ও সাহায্য পাইয়াছেন তাহা মোটেই পর্যাপ্ত নহে। রাখালদাসের আরব্ধ খনন কার্যের সূত্র ধরিয়া ও তাঁহার মন্তব্যাদিকে যথোচিত মর্যাদা দিয়া ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে পুরাতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ জন মার্শাল স্বয়ং মহেঞ্জোদাড়ো অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু অমূল্য প্রত্ন নিদর্শন আবিষ্কার করেন। এম. এস. ভাটস্, দয়ারাম সাহনী, কাশীনাথ দীক্ষিত, ই. জে. এইচ্ ম্যাকে প্রভৃতি বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ব বিদদের সহায়তায় এই অভিযান পরিচালিত হওয়ার ফলে খৃষ্ট পূর্ব্ব তিন সহস্রবৎসর পূর্বেকার ভারত সভ্যতার রূপ-রেখা বিদ্বজ্জনের গোচরীভূত হয়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ জন মার্শাল (পরে সার) তাঁহার Mahenjo Daro and The Indus civilization গ্রন্থে মহেঞ্জোদাড়ো আবিষ্কার সম্বন্ধে রাখালদাসের প্রাথমিক কৃতিত্ব ও দূরদৃষ্টিকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছেন (P. 10)।

মহেঞ্জোদাড়ো অভিযানকালে রাখালদাসকে অতি পরিমিত লোকবল ও অর্থ দেওয়া হয় এই জন্যই তাঁহার পরবর্তী অভিযানকারীগণ যত অধিক ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন রাখালদাস তাহা পারেন নাই। মহেঞ্জোদাড়োর অত্যধিক গরমে ও গুরু পরিশ্রমে রাখালদাস বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে দীর্ঘদিনের ছুটি লইতে হয়।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার (Eastern circle) অধ্যক্ষ (Superintendent) রূপে কলিকাতায় বদলী হইয়া আসেন। এই সময়ে তিনি উত্তরবাংলার পাহাড়পুর নামক স্থানে অভিযান করিয়া বৌদ্ধযুগের কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করেন। রাখালদাসের পরে আরও অনেকে পাহাড়পুরে খনন কার্য পরিচালন করেন, তবে এই বিষয়ে

রাখালদাসই ছিলেন পথিকৃৎ।

ধনী সন্তান রাখালদাসের জীবনযাত্রা ছিল রাজোচিত। আবাল্য বিলাস ব্যসনের মধ্যে লালিত রাখালদাস জীবনে সংযম অভ্যাস করেন নাই, তদুপরি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষী ও স্বাধীন চিত্ত। অতি অল্প বয়সেই চাকুরীতে তাঁহার উন্নতি এবং ঐতিহাসিকরূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার বহু সহকর্মীর অন্তরে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। কলিকাতায় আসার পর সহকর্মীদের চক্রান্তের ফলে রাখালদাসকে কিছুদিনের জন্য সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় (Suspend)। তাঁহার নামে এই অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছিল যে তিনি জব্বলপুরের সন্নিকটস্থ তেড়াঘাটের, চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির হইতে একটি মূর্তি অপসৃত করিয়াছিলেন। রাখালদাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না করিতে পারিয়া তাঁহার অন্যান্য কাজে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া সামান্য কিছু পেনশন দিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর গ্রহণ করানো হয়।

বাল্যকাল হইতেই রাখালদাস ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন, ধনী পিতার সন্তান হিসাবে তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না। কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া তিনি অর্জিত অর্থ বন্ধু-বান্ধব অতিথিদের ভূরি-ভোজন করাইয়া ব্যয় করিতেন। দুঃস্থের দুঃখ মোচনের জন্যও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন। উচ্চ বেতনের সরকারী চাকুরী হারাইয়া রাখালদাস নিদারুণ অর্থকষ্টে পতিত হন। এই সময়ে তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তিও নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিছুকাল কর্মচ্যুত থাকার পর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে ময়ূরভঞ্জের মহারাজার নিকট অর্থসাহায্য পাইয়া রাখালদাস উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা আরম্ভ করেন। রাখালদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার রচিত উড়িষ্যার ইতিহাস দুই খণ্ডে ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (৭)। সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক, প্রবাসী-মডার্ণ রিভিয়ুর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকের প্রকাশভার গ্রহণ করেন। রাখালদাসের উড়িষ্যার ইতিহাসে উড়িষ্যার প্রাচীন মধ্যযুগীয় ও ইংরাজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক কালের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়। ইতিপূর্বে কেহই আর উড়িষ্যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করেন নাই, বস্তুতঃ ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের এরূপ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ইতিপূর্বে রাখালদাস ব্যতীত আর কেহ রচনা করেন নাই।

উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা সম্পন্ন হইয়া যন্ত্রস্থ থাকার কালে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে (বাংলা ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭) রাখালদাস কলিকাতায় মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে অকালে পীড়াগ্রস্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। রাখালদাস মাত্র ৪৫ বৎসর জীবিত থাকিলেও ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে একজন চিরস্মরণীয় ব্যক্তি হইয়াই থাকিবেন। রাখালদাসের মৃত্যুর পর তাঁহার সমসাময়িক কালের একজন বরেণ্য ঐতিহাসিক বর্তমানে স্বর্গত কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল মহাশয় মন্তব্য করিয়াছিলেন "প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন দশজন ব্যক্তি রাখালদাস একক ভাবে যাহা করিয়াছিলেন তাহা সম্পন্ন করিতে হয়ত সমর্থ হইতেন না, হয়ত বা তাহা করিতেও পারিতেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মানুষ, এই প্রতিভা ক্বচিৎ মানুষের মধ্যে দেখা যায়" ["Ten men of first rate ablity together may or may not do the amount of work which Mr. Banerje did alone. He was a

genius and a prodigy"—Vide Modern Review ; June, 1930, P : 806] ঐতিহাসিক প্রবর কাশীপ্রসাদের উপরোক্ত উক্তিটি বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। সাধারণতঃ দেখা যায় যিনি ইতিহাসের একটি শাখায় বিশেষজ্ঞ রূপে পরিচিত, অন্যান্য শাখায় তাঁহার অনুরূপ গভীর জ্ঞান নাই। রাখালদাস ছিলেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। রাখালদাস ছিলেন একাধারে প্রত্নতাত্ত্বিক, মুদ্রাতত্ত্ববিদ, শিলালেখ—তাম্রশাসন প্রভৃতির লিপি বিশারদ এবং মূর্তি, মন্দির ও অন্যান্য স্থাপত্য শিল্প মর্মজ্ঞ। ইতিহাসের সম্ভাব্য প্রায় প্রত্যেকটি বিষয়ে রাখালদাস পুস্তক এবং নিবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন এবং এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে আহৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে বাংলার ও উড়িষ্যার ইতিহাস বিষয়ে প্রামান্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এতদুপরি রাজপুতানা মধ্যপ্রদেশ, এবং মহেঞ্জোদাড়ো সহ বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ও বাঙ্গলাদেশের বিভিন্নপুরাকীর্তি ও পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ স্থান সমূহ আবিষ্কারও তাঁহার জীবনের অন্যতম কীর্তি। রাখালদাস সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষা অতি উত্তমরূপ আয়ত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত ফার্সী এবং অপর তিন চারিটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাতেও তাঁহার বুৎপত্তি ছিল। ঐতিহাসিক রূপে রাখালদাস আজীবন বাঙ্গলাভাষার সেবা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাভাষায় কতিপয় প্রামাণ্য ইতিহাস ও বহু নিবন্ধ রচনা ব্যতীত তিনি বাঙ্গালাভাষায় অনেকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়া গিয়াছেন—এইগুলির নাম শশাঙ্ক, (১৯১৪) ময়ুখ, (১৯১৬) ধর্মপাল, (১৯১৫) করুণা (১৯১৭) অসীম, (১৯২৩) লুৎফউন্না ও ধ্রুবা। ধর্মপাল ও শশাঙ্ক উপন্যাসদ্বয়ে রাখালদাস বাঙ্গালী সম্রাট ধর্মপাল ও শশাঙ্কের স্মৃতি বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির অতীত গৌরবের স্মৃতিকে ভাস্বর করিতে চাহিয়াছিলেন। ময়ুখ উপন্যাসটি ষোড়শ শতাব্দীর পর্তুগীজ অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। করুণা উপন্যাসে গুপ্ত যুগে মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিচ্ছবি সন্নিবিষ্ট আছে। অসীম ও লুৎফউন্না উপন্যাসদ্বয়ে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের বিবরণ আছে। ধ্রুবা উপন্যাসটি রাখালদাসের মৃত্যুর পর সুপ্রসিদ্ধ প্রবাসী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয় কার্তিক—চৈত্র, (১৩৩৮)। রাখালদাস রচিত 'পাষাণের কথা'ও এই শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা (১৯১৪)।

রাখালদাসের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি অতিশয় সুখপাঠ্য, ধারাবাহিকরূপে 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশের কালে পাঠক এইগুলির প্রকাশিত অংশ পাঠ করিয়া পরের অংশটুকু পাঠ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিত। সুলিখিত উপন্যাসের সমস্ত গুণাবলী রাখালদাসের উপন্যাসগুলির মধ্যে লক্ষণীয়রূপে বর্তমান, এই সব উপন্যাসের বাতাবরণও ইতিহাস সমত। গভীর স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি প্রীতি রাখালদাসের উপন্যাসগুলির প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট হইয়া আছে। উপন্যাস রচনায় রাখালদাসের গুরুগম্ভীর রচনাশৈলীও বিশেষভাবে উপভোগ্য। ঐতিহাসিকরূপে রাখালদাসের যদি কোন দানও না থাকিত তথাপি বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবেও রাখালদাস স্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে রাখালদাসের কৃতিত্বের মূল্যায়ন সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের এই মন্তব্যটী প্রণিধান যোগ্য—'বিংশ শতাব্দীর প্রথমে উপন্যাসক্ষেত্রে নবাগতের মধ্যে দুইজন অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯৩০) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬—১৯৩৮)।

রাখালদাসের অধিকাংশ উপন্যাস ঐতিহাসিক। এই উপন্যাসগুলিতে গুপ্ত, পাল ও মোগল যুগের ইতিহাসকে সজীব করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বাঙ্গলায় একমাত্র রাখালদাসই লিখিয়াছেন।'—(বাঙ্গলা সাহিত্যের কথা—ডাঃ সুকুমার সেন পৃঃ ১৭৬)। রাখালদাস 'পক্ষান্তর (১৯২৪) ও ব্যতিক্রম' (১৯২৪) নামে দুইটি সামাজিক উপন্যাসও রচনা করিয়া ছিলেন।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে রাখালদাস সাধ্যমত কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সেবা করেন। ১৯১০ ও ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে রাখালদাসের ৩০টী নিবন্ধ সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত দুইটী Memoirs এ তিনি দুইটী পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধ প্রকাশ করেন, উহার একটী পূর্বোল্লিখিত Palas of Bengal অপরটী হাতীগুম্ফা ও নানাঘাট প্রস্তর লিপি সম্বন্ধীয় আলোচনা। এশিয়াটীক সোসাইটী ব্যতীত লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটীক সোসাইটী, বিহার ও উড়িষ্যার রিসার্চ সোসাইটী এবং ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ সোসাইটীর মুখপত্রগুলিতেও রাখালদাস অনেকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। 'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রাদিতেও রাখালদাসের অনেক ঐতিহাসিক নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলা ১৩১৫ হইতে ১৩১৯ সাল পর্যন্ত রাখালদাস বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সহকারী সম্পাদক ছিলেন। সাহিত্যপরিষদ পত্রিকার প্রথম বর্ষ হইতে ত্রিবিংশ বর্ষ পর্যন্ত (১৩০১—১৩২৩) রাখালদাস রচিত ১৫টী ঐতিহাসিক নিবন্ধ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৩১৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা রমেশ ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলে রাখালদাস ইহার অধিকাংশ দ্রব্যই (প্রাচীন মুদ্রা, মূর্তি প্রভৃতি) সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে (১৯১১) রাখালদাস লিখিত এই চিত্রশালার সবিবরণ তালিকা প্রকাশিত হয় (৯)। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে রাখালদাস রচিত 'লেখ মালানুক্রমনী' নামে একটি বাঙ্গালা পুস্তক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ভারতবর্ষের মধ্যে ধাতুফলকে মূর্তির পাদপীঠ ও শরীর গাত্রে এবং প্রস্তর ফলকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত যে সমস্ত লেখমালা ঐ সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়, এই পুস্তকটিতে শুধু অশোক লিপিগুলির বিবরণ পরিত্যক্ত হয় (১০)। মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী লেক্‌চার হিসাবে প্রদত্ত রাখালদাসের বক্তৃতাগুলি তাঁহার মৃত্যুর পর বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)।

রাখালদাসের একমাত্র জীবিত পুত্র-শ্রীযুক্ত অদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (জন্ম ১৯০৯) ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বরণ্যে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ঐতিহাসিক গবেষকরূপে ইনিও যশস্বী হইয়াছেন।

(১) Eastern Indian School of Medieval Sculpture, Delhi—1933.

(২) The Palas of Bengal (Memoirs of Asiatic So iety, vol v, no : 3. Calcutta-1913)

(৩) The origin of Bengali script (Calcutta University, 1917)

(৪) প্রাচীন মুদ্রা, কলিকাতা, ১৯১৫

(৫) বাঙ্গলার ইতিহাস ১ম খণ্ড, ১৯১৪ ২য় খণ্ড, ১৯১৭

(৬) (ক) The Temple of Siva at Bhumara (Memoirs of Archaeological Survey of India, no 16, 1924)

(খ) Bas Reliefs of Badami (Do Do Do, no : 25)

(গ) The Haihayas of Tripuri and their monuments (Do Do Do, no : 23)

(৭) History of Orissa from the earliest times to the British period 2 vols, 1930-31, Calcutta.

(৮) The paleography of the Hati Gumpha and the Nanaghat Inscriptions (Memoirs of the Asiatic Society, Vol XI. 1929.)

(৯) Descriptive list of sculptures and coins in the museum of Bangiya Sahitya Parishad, 1911.

(১০) লেখমালানুক্রমণী (১ম খণ্ড)—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্, ১৩৩০

(১১) Age of the Imperial Guptas (Manindra Chandra Nandi Lectures 1924), Benaras, 1933.

আধুনিক কথাশিল্পে সঙ্কট

নিতাই বসু

সমসাময়িক সাহিত্যের মৌল রীতি-নীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পিটার ওয়েস্টল্যাণ্ড লক্ষ্য করেছেন আধুনিক কালে ভালো উপন্যাস লেখা হচ্ছে না। এবং এর কারণ স্বরূপ তিনি 'genius-এর অভাবের কথা বলেছেন। অবশ্য এই genius বলতে তিনি 'product of purpose plus technical ablity'র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই 'purpose' বলতে তিনি কোন মতবাদের প্রচার অথবা কলাকৈবল্যভাবনার বিপরীতধর্মী কোনো চিন্তার দিকে সংকেত করেননি, বরঞ্চ মনে হয়, এই শব্দটির মাধ্যমে তিনি ইপ্সিত আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠার কথা ভেবেছেন।

একশো তেরো বছর আগে একদা ফ্লবেয়ার একটি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছিলেন। তিনি অকপট চিত্তে বলেছিলেন : আমাদের সবই আছে, এমন কি, কলাকৌশল-জ্ঞানের অভাবও নেই, কিন্তু 'we lack inner life, the soul of things, the idea of the writers subject'. এ উক্তির সত্যতা আধুনিক বাঙালী লেখকদের পক্ষেও সমান প্রযোজ্য, কিন্তু এর সঙ্গে আরো কয়েকটি সঙ্কট ক্রমশ এতো প্রবল ও অনিবার্য হয়ে উঠেছে যার মুখোমুখী হওয়া ছাড়া এঁদের গত্যন্তর নেই।

যে প্রধানতম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আধুনিক লেখকরা গল্প উপন্যাস সৃষ্টি করছেন, তা হলো এর বিষয়বস্তু নির্বাচনের সমস্যা। নায়ক থাকলেই নায়িকা আনতেই হবে, উভয়ের প্রেমলীলা দেখাতে হবে, পরিণামে হয়তো মিলনের হাসি কিংবা বিচ্ছেদের অশ্রু—এখনকার কথাসাহিত্য থেকে এই পটভূমিকা উঠে গেছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। এ সাহিত্য যেন সমস্ত গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। সম্ভবত এই বিদ্রোহের জন্যই এই সাহিত্যে এমন অনেক উদ্ভট পরিকল্পনা করতে হচ্ছে যা প্রাক-ত্রিশ-পর্বের বাংলা সাহিত্যে ছিলো অকল্পনীয়। বাড়ীও'লার ছেলে থাকলেই ভাড়াটে মেয়ের পরিকল্পনা এখনকার কথাসাহিত্যিকের উপজীব্য নয়, বরঞ্চ বিগত যৌবন বাড়ীওয়ালার সঙ্গে পরকীয়া প্রেমের সূক্ষ্ম জটিল মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের প্রবণতায় ভাড়াটে পরিবারের মধ্যে একটি তরুণী বধূর পরিকল্পনা আশ্চর্য নয়। অথবা অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের শিক্ষিতা সুন্দরী যুবতীর রূপায়ণে প্রাক-তিরিশের লেখকেরা সচেষ্ট হলে একটি সুন্দর শিক্ষিত উকিল যুবকের (এই সেদিনও বাংলাদেশে উকিলেরা সর্বত্র সশ্রদ্ধ মনোভাব আকর্ষণ করতে পারতেন) সঙ্গে সেই মেয়েটির মিলন ঘটালে আমাদের আশ্চর্য হওয়ার কোনোই কারণ থাকতো না। কিন্তু একালে কি হয়? রূপ যৌবন সম্পন্না ধনীকন্যা এমন একটি ছেলেকে হয়তো ভালোবাসে, যে সুন্দর স্বাস্থ্য ও চেহারার অধিকারী নয়, পরন্তু বেকার, অভদ্র ও কদর্যমনোবৃত্তিসম্পন্ন।

এখনকার কথাসাহিত্যে আর একটি ঘটনা লক্ষ্য করার মতো। এখনকার সাহিত্যিকেরা চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে এক নতুনতরো স্বাদ এনেছেন যা আমাদের সাহিত্যের পংক্তিতে কখনোই আশ্রয় পায় নি। হয় সাধু নতুবা শয়তান আমাদের সাহিত্যের বাজার ছেয়ে ফেলেছিলো এবং এই শতকের প্রথম পর্বে রবীন্দ্র-শরৎ-প্রভাবিত বাংলাসাহিত্যে এই চেতনায় পরিবর্তন সাধিত হলেও

তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন কিছু হয়নি। তাঁরা শয়তানের মধ্যে এমন-কতকগুলো গুণের সমন্বয় ঘটাতেন যার ফলে সে সমস্ত স্খলন-পতন ত্রুটি নিয়ে মূর্ত হতো এবং পাঠকসমাজের সমস্ত সহানুভূতি কেন্দ্রীভূত হতো এই শ্রেণীর চরিত্রের ওপর। একালের সাহিত্যিকেরা এই নীতি বর্জন করেছেন। এঁরা মানবিকতার কোনোরকম প্রলেপ না লাগিয়েই সমাজের জঘন্য মানুষগুলিকে মুখোশ খুলে সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—এঁদের সৃষ্ট চরিত্রনির্দয়ভাবে মৃত স্ত্রীর শরীর থেকে অলঙ্কার খুলে নেয় দ্বিতীয় পক্ষকে সাজানোর জন্য, আশ্রিতেরা আশ্রয়দাতার কৃষ্ণবিগ্রহের স্বর্ণ মুকুট চুরি করে নিয়ে সরে পড়ে। এই প্রসঙ্গেও মনে রাখতে হবে, নিছক সাধুত্ব অথবা অবিমিশ্র শয়তানি একালের চরিত্রের নিয়ামক নয়। একালের চরিত্র অত্যন্ত আটপৌরে মানুষের, যার বিশেষ কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই; সে যেন মিছিলের একজন। চরিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবের কোনোই পরিচয় নেই একালের সাহিত্যে—সাহিত্যের ভোজে কেউই অস্পৃশ্য নয়, অপাংক্তেয় নয়—ডোম বাগ্দী বেদে কৈবর্ত থেকে শুরু করে জমিদার রায়সাহেব রিটায়ার্ড জজ অধ্যাপক প্রভৃতি সকলেই উপজীব্যহিসেবে ব্যবহৃত হয়েছেন। প্রত্যহ-দেখা, অতি পরিচিত চরিত্রসৃষ্টির সমস্যা একালের কথাসাহিত্যিকদের পক্ষে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়; মহৎ ও বীরের চরিত্রাঙ্কনে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবে লেখক রং-ফলানোর প্রচুর স্বাধীনতা পান, আমাদের অতি-পরিচিত প্রতিবেশীদের চরিত্র-সৃজনে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকেরা তেমন কোনোই সুযোগ পাচ্ছেন না। এই ধরণের সুযোগপ্রাপ্তিতে তাঁদের কোনো মনোযোগ নেই, তাই আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তাঁরা অতি-সাধারণ মালমশলা কুড়িয়ে নিয়ে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় অসাধারণ গল্প-রচনায় আগ্রহী। অত্যন্ত গ্রাম্যরুচিসম্পন্ন লোকটি যখন বই কিনতে চায়, তখন সে যে সস্তায় নরনারীর দেহসঙ্গমের নগ্নচিত্র পরিকীর্ণ একখানা বই কিনবে অথবা সকালে একমাত্র ছেলে দোতলা থেকে পড়ে গিয়ে আহত হলেও সন্ধ্যায় বরযাত্রীর আসরে কনে-বাড়ির একটি মেয়ের জন্য জনৈক বরযাত্রীর হৃদয় অন্তত সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে উঠতে পারে, এবং এ সমস্ত ঘটনার স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দিহান হবার কোনোই কারণ নেই। কিন্তু এ ধরণের বিষয়বস্তু নিয়ে যে অতি চমৎকার গল্প রচনা করা যায়, তা আবিষ্কার করাই যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকের মৌলধর্ম।

একালের লেখকদের রুচি মনোবিশ্লেষণে গভীরভাবে আকৃষ্ট বলেই দেহগত সমস্যাকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ দেহ ও মনকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা উচিত নয়, দেহের সঙ্গে মনের সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। একালের সাহিত্য মূলত দেহভিত্তিক, নারীপুরুষের যৌনবাসনা এবং তজ্জনিত মনোবিকার যে সৃষ্টির প্রাণকেন্দ্রে স্থিত। তাই শুধু যৌনতত্ত্ব নয়, সাম্প্রতিককালে গল্প-উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের এতো বাড়াবাড়ির কারণও নরনারীর দেহসমস্যা। সে সমস্যা একালের সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে—দেহধারণের সমস্যা ও দেহমিলনের সমস্যার রূপায়ণ এবং তার ফলে মনঃসমীক্ষণ প্রয়াসে একালের সাহিত্যিকদের উল্লেখতম প্রবণতা লক্ষণীয়। নীতির দিক থেকে হোক, রুচির দোহাই দিয়ে হোক, আধুনিক কথাসাহিত্যে যাঁরা যৌনতাকে প্রশ্রয় দিতে চান না, উল্লাস উন্মত্ততা ও উত্তেজনা বর্জন করে চলেন বলেই আজ তাঁরা স্পষ্টত একটা সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অতি-পরিচিত পরিবেশের রূপায়ণে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের উল্লেখ সাফল্যের সঙ্গে চরিত্র-

চিত্রণের যে ভাবসঙ্কট দেখা দিয়েছে তা আধুনিক কথাশিল্পে একটা চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় সমস্যা, অভিজ্ঞতার বহুবৈচিত্র্য। সমসাময়িক উপন্যাস ও ছোটগল্পের মূর্ধাধর্মিতা সম্পর্কে কটাক্ষ করে Westland বলেছিলেন : It is less a work of art than an exercise of the faculties primarily of the intellect." এই intellect-এর প্রধান কারণ সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের মানসগঠন। অভিনব বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় একালের কথাকারদের মধ্যে যেন একটা নিরর্থক প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। বিভিন্ন পটভূমিকায় বিচিত্র জীবনের কাহিনী শুনে আমরা যেন অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমাদের সুপরিচিত নাগরিক পরিবেশকে অবলম্বন করে সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণার একান্ত অভাব একালের সাহিত্যিকদের একটা মজ্জাগত মর্জি। সুপরিচিত পরিবেশকে অবলম্বন করে জীবন-কাহিনী রচনা করার অনেক সুবিধা আছে, আবার অপরিচিত পরিবেষ্টনীকে উপজীব্য করে সাহিত্য-সৃষ্টির কয়েকটি সুবিধাও আছে কেননা সেখানে আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া লেখকের পক্ষে অনায়াসসাধ্য। প্রত্যেক অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ, আবহাওয়া, আচার-সংস্কার সেই পরিবেষ্টনীর নরনারীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে বলেই যদি কোনো কথাকার পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের কাহিনীকে অবলম্বন করে উপন্যাস সৃষ্টি করেন তাহলে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সন্দিহান হলেও বলার কিছুই থাকে না। অভিজ্ঞতা রূপায়ণের এই সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে কোনো কোনো লেখক অসাধুতা অবলম্বন করছেন ; তাঁরা স্বতন্ত্র পরিবেশ ও স্বতন্ত্র ধরণের চরিত্রসৃষ্টি করলেও সংলাপের ভাষাপ্রয়োগের দুর্বলতায় এবং পরিবেশসৃষ্টির শৈথিল্যে নিজেদের দুর্বলতা আরো উৎকটভাবে প্রকাশ করছেন।

আমাদের কথাসাহিত্য অভিজ্ঞতার বহুবৈচিত্র্যে এখন সমস্ত পৃথিবীকে যেন নিজের প্রাঙ্গনে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ভারতের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ এবং তার নরনারী কুশীলব হয়ে আমাদের সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে সমৃদ্ধি এনেছে। জোয়ার বইয়েছে। শুধু ঘরের কথা ঘরোয়াভাবে লিপিবদ্ধ করলেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা অর্জনের আর কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যিকদের মধ্যেই অভিজ্ঞতার বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন এত চোখে পড়ে, যা গত তিন-চার দশক আগের বাংলাসাহিত্যে উপস্থিত ছিলো না। এমন কি, একালের নাগরিক জীবনের পটভূমিকায় যাঁরা উপন্যাস সৃষ্টি করেছেন, তাঁরাও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ও সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের ক্রিয়াকলাপকে যেন অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করছেন। সুতরাং মানুষের জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেই একালে লেখকতার খ্যাতি দাবী করা সম্ভব নয় এবং বিরল ব্যতিক্রম বাদ দিলে একালের অধিকাংশ সাহিত্যিক শুধুমাত্র আমাদের পরিচিত ঘরোয়া পরিবেশকে অবলম্বন করে সাহিত্যসৃষ্টি করেই নিজস্ব আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেননি। আমাদের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃততর করার জন্য অনেক সময় অনভিজ্ঞ লেখককেও এগিয়ে আসতে হচ্ছে।

অভিজ্ঞতার বহু বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে সাহিত্যিকদের আর একটি সমস্যার কথা মনে পড়ে যায়। সৃষ্টির আদিকাল থেকে পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক দৈহিক আকর্ষণ আমাদের সাহিত্যে শুধু নয়, বিশ্বসাহিত্যে উপজীব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একালের সাহিত্যে নরনারীর প্রেম বা আকর্ষণ

অনেক সময় প্রাণহীন বস্তুর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। একালের বাংলা গল্পে যখন পড়ি—একটি গাছের সঙ্গে একটি মেয়ের এমন অন্তরঙ্গতা হয়েছে যে সেই গাছের একটি পাতাকে সে বুকের দুধ খাইয়ে সযত্নে শুইয়ে দিচ্ছে তখন আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ থাকে না। তাছাড়া হাতী, গরু, ময়ূর, সাপ, বাঘ, এমন কি, টিকটিকি পর্যন্ত একালের গল্পের বিশাল-ব্যাপ্ত পটভূমিতে একত্রে বিচরণ করে। আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতার অভিনব প্রকাশশৈলী এবং সেই প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে লেখকের স্বকীয়তা—এই ত্রিমুখী উপচারের সমাহার না থাকলে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব।

আঙ্গিকের দিক থেকেও সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের তুলনায় আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যে অভিনবত্বের নিদর্শন মেলে। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, মোপাসাঁর উপন্যাস পড়ে কোনো একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। অতঃপর সেই উপন্যাসটি যথার্থ উপন্যাস হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে লেখকের কাছে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। মোপাসাঁ তাঁর বক্তব্যের জবাবে বললেন—এত বিভিন্ন ধরণের, বহু ভঙ্গিমার উপন্যাস লেখা হচ্ছে এবং 'উপন্যাস' বলে স্বীকৃত হচ্ছে, যার কোনো একটা উপন্যাসকে উপন্যাস বলতে পারা নাকি রীতিমতো হঠকারিতা। তিনি প্রায় কুড়িখানা গ্রন্থের নাম করেছিলেন, বিশেষত জোলার 'জার্মিনাল' এবং ফ্লবেয়ারের 'মাদাম বোভারি'র প্রশ্ন তুলে জানিয়েছিলেন, এদের উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার তুলনা না চলা সত্ত্বেও এ দু'টি উপন্যাস বলে আখ্যাত। প্রকাশশৈলীর অভিনবত্বে সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে বহু বিচিত্র রীতির উপন্যাস ও ছোট গল্প লেখা হচ্ছে, তবে কথা-সাহিত্য যেহেতু আমাদের সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যেহেতু সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক কারণে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে, সেজন্য উপন্যাসের ক্ষেত্রে শৈথিল্য আসা স্বাভাবিক। একালের একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক বলেছেন: Culture in the twentieth century, in the sense of the possession of fundamental beliefs about religion or art or politics, has been quickly disappearing...and a result of this is the absence of a framework. কিন্তু সে তুলনায় আমাদের ঔপন্যাসিকের ঋজু মনোভঙ্গির ফলে উপন্যাসের মধ্যে যে দার্ঢ্যগুণের পরিচয় মেলে এবং ছোট গল্পের আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যে অভিনব পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তাতে আশান্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র পরিকল্পনা, গতিবিন্যাস, বাস্তব অভিজ্ঞতা, সংলাপের ও ভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আঞ্চলিকতা ইত্যাদি বিভিন্ন ও বহুমুখী সঙ্কটের সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিক লেখকেরা শিল্পসাধনা করছেন। সামাজিক বিপর্যয় ও অর্থ নৈতিক ভাঙনের সামনে দাঁড়িয়ে অবক্ষয় ও হতাশার ছদ্মনামে কোনো কোনো লেখক যৌনতা ও মনোবিকারকে সাহিত্যে কুৎসিতভাবে রূপান্বিত করছেন, একথা অমূলক নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার বহু বৈচিত্র্য ও প্রকাশভঙ্গীর মৌলিকত্ব না থাকলে শুধু ঘরের কথা ঘরোয়াভাবে বলে অথবা সস্তারুচির চাহিদা মিটিয়ে জনতার মন জয় করা আর সম্ভব নয়। উপকরণ ও পরিবেশনের মৌলিকতা না থাকলে খ্যাতি লাভ করার যে বৃহত্তম অন্তরায় একালের সাহিত্যিকদের এড়িয়ে চলতে হচ্ছে যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে, সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে সম্ভবত তার চেয়ে বড় সঙ্কট আর কিছুই নেই।

ডান্‌-প্রসংগে

প্রলয়কুমার দেব

'শেষের কবিতা'-র অমিত রায় ডানের নির্জন কাব্যমহলের কথা উল্লেখ করেছেন। আধুনিক পাঠকের কাছে কিন্তু সে নির্জনতা অন্তর্হিত। ইতিহাসের পথের ওপর দিয়ে পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলে গেছে। রং বদল হয়েছে মানুষের মানসদিগন্তে। তাঁর জীবন এবং মননের অনুবন্ধ রচিত হয়েছে একটা নবতর বিশ্বপটভূমিকার আত্মিক বিন্যাসকে কেন্দ্র করে। যে কবিতাকে এক সময়ে মনে হয়েছে দুর্বোধ্য, অনাবশ্যক বাক্‌চাতুর্যের বিলাস, অথবা অন্তঃসারশূন্য কল্পনার হাস্যকর রূপায়ন, তাকেই সে গ্রহণ করে নিল সাদরে, আবিষ্কার করল তার মধ্যে অনুভূতির ঐশ্বর্য্য, বিস্মিত হয়ে গেল তার আধুনিকতায় যার আবেদন অনবসিত সময়ের নিষ্করুণ ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে। দ্বিতীয় চার্লস যখন ফ্রান্স থেকে ফিরে এলেন ; তখনো পর্য্যন্ত ডানের খ্যাতি সগৌরবে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর আবেগহীন, শুদ্ধতাশ্রয়ী সমালোচকের কাছে সে খ্যাতি অহেতুক বলে মনে হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে কোলরিজ এবং ব্রাউনিং ডানকে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু তবুও সে প্রশংসায় হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হয় নি। বিংশ শতাব্দীতে ডান্‌ অধিষ্ঠিত হলেন আপন আসনে, যখন যুগযন্ত্রণায় কাতর, মোহমুক্ত মানুষ ক্ষয়িষ্ণু রোমান্টিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদল ও জেকোবিআন নাট্যকারদের রচনার মধ্যে খুঁজে পেল একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা, হয়ত উপলব্ধ সামগ্রিক অভিজ্ঞতা বা আশাবাদী জীবনদর্শনকে বিসর্জন দিয়েও। বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কাল মানুষের জীবনের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে সভ্যতাচেতনার এমন এক সরণিতে যেখানে ইতিবাচক মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে, যেখানে শুধু দ্বিধা, সংশয়, অবিশ্বাস আর আধ্যাত্মিক শূন্যতা। মানুষ যেন দাঁড়িয়ে আছে দুটো পৃথিবীর মাঝখানে। একটা পৃথিবী বিচূর্ণিত, প্রাচীনপন্থীর রক্ষণশীল, গতানুগতিক সংস্কারের পৃথিবী। আরেকটা উপযুক্ত শক্তির অভাবে জন্ম নিতে অপারগ। এমন অবস্থায় স্বভাবতই মানুষের মনে একটা দোলাচলতা, একটা অসংহতি সুস্পষ্ট। অনেক আয়াসের বিনিময়েও সে একটা সামঞ্জস্য মূল গ্রন্থি রচনা করতে পারে না উৎকেন্দ্রিকতা এবং হতাশাব্যঞ্জক নেতিবাদের লক্ষ্যহীন, বিবর্তনশীল বাস্তবে। ডানের কবিতার ভেতরে বর্তমান যুগের মানুষ যেন তার নিজের মনের প্রতিফলনকেই প্রত্যক্ষ করেছে। ডানের ভেতরে আধ্যাত্মিক দেউলেপনা নেই, একথা স্বীকার্য। কিন্তু তাঁর চঞ্চল আগ্রহ, অনুমানের উন্মুখতা, জিজ্ঞাসার বাসনা, পুরোনো পৃথিবীকে নিরীক্ষা যুক্তি-বিচার-সম আলোকে এবং নতুন পৃথিবী সম্বন্ধে বেদনাময়, সন্দিগ্ধ অনুভূতি—সবকিছুই যেন বর্তমান যুগ ও চেতনাকে দ্যোতিত করে। পরিবেশ এবং ঘটনার অত্যাচারে ডানের জীবন বারবার বিপর্যস্ত হয়েছিল। প্রথমত, তিনি ছিলেন একজন ক্যাথলিক। সমাজে যে সমস্ত মানুষেরা নিরুদ্ধ অন্তর্বেদনায় বিক্ষুব্ধ, যাদের ধর্ম অত্যাচারের দুঃস্বপ্নের তলে অবলুপ্ত, যারা মৃত্যুর উপহাস আর কাল্পনিক শহীদব্রতকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে তাদের সংগেই তাঁর পরিচয় ও নিবিড় অন্তরংগতা। শুধু

ধর্মজীবনই নয়, ভাবজীবনেও তাঁকে পদে পদে মানসিক অশান্তির শিকার হতে হয়েছে। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ভেসালিয়াস এবং বেকনের নতুন বিজ্ঞান-দর্শন তাঁর বহুদিনের পরিচিত সযত্নে সংরক্ষিত অধিবিদ্যাসংক্রান্ত চিন্তাধারাকে নির্মমভাবে আন্দোলিত করেছিল। সময়ের গতির ওপর নির্ভরশীল ডানের ধর্মতত্ত্ব এবং জীবনদর্শন তাঁর কবিতার প্রতিটি পংক্তিতে অভিব্যক্ত।

১৯৬৩ সালে ড্রাইডেন ডান্ প্রসংগে বলেছিলেন : 'He affects, the metaphysics' প্রেমের কবিতাকে পেলব আবেগের স্পর্শে তরঙ্গায়িত না করে তিনি মানুষের চোখের সামনে তুলে ধরেছিলেন দর্শন শাস্ত্রের সূক্ষ্মতা। ড্রাইডেনেরও আগে হথর্ণডেন্-নিবাসী ড্রামণ্ড নামে জনৈক সমালোচক সেই সব কবিদের কথা উল্লেখ করেছিলেন যাঁদের রচনায় আধিবিদ্যক প্রত্যয় এবং মধ্য-যুগীয় দর্শনের জটিল প্রকৃতি সম্যক্ প্রতিফলিত হয়েছে।. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ডঃ জনসন্ ডান্-প্রমুখ কবিদের নিয়ে মূল্যবান আলোচনা করলেন। কাউলের জীবনী নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি এঁদের বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও সে উল্লেখে প্রশস্তি বন্দনার সুর নেই। ডঃ জনসনের মতে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যেসমস্ত আধিবিদ্যক কবি আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের পাণ্ডিত্যকে বিষদৃশভাবে জনগণের কাছে প্রকাশিত করা। পরিশ্রমের বিকারত্ব তাঁদের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এবং সেই কারণে তাঁদের চিন্তাধারায় অভিনবত্ব থাকলেও স্বাভাবিকত্ব ছিল না। জোর খাটীয়ে তাঁরা সংযোজিত করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির অসদৃশ heterogen'eous অনেক ধারণাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ডঃ জনসনের মত একজন সূক্ষ্মধী সমালোচক দোষের অনুসন্ধানে নিরত থেকে গুণের কোন খবরই পেলেন না। অধ্যাপক ডন্ বলেছেন, 'আধিবিদ্যক' কথাটির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা এবং চিন্তান্বিত কল্পনা রয়েছে। স্টুয়ার্ট যুগের গীতিকাব্যে শুধু উপমার—অমিতাচার—অথবা উদ্ভট কল্পনার উৎসারই ছিল না, সেখানে অন্য আবেদনও ছিল। অধ্যাপক হার্বার্ট রীড্ ডানের অনুভূত চিন্তার কথা উল্লেখ করেছেন, যে অনুভূত চিন্তা ভিক্টরীয় যুগে ব্রাউনিং-এর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এই অনুভূত চিন্তাই কবির সংবেদনশীল চেতনাকে একটা সংহত রূপ দান করেছে। তাঁর আংগিক এবং রচনাশৈলীকে নিশানা দিয়েছে নতুন পথের। ডঃ জনসন যে অসদৃশ ভাবধারার জন্য আধিবিদ্যক কবিদলকে বিরূপ দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, সেই অসদৃশ ভাবধারার সার্থক সংযোজিত রূপায়ণই সাম্প্রতিক কালের কবির সবচেয়ে বড় কামনা। টি. এস. এলিঅট বলেছেন, প্রেমের অনুভূতি, রান্নার গন্ধ, টাইপরাইটারে শব্দ, স্পিনোজার দর্শন,— এ-সমস্ত অসম ('disparate') অভিজ্ঞতাগুলোর যদি একটা সুন্দর একত্র সম্মিলন করা যায়, তাহলেই কবিতার জন্ম হবে। জীবনের অভিজ্ঞতা বিচিত্রমুখী। একটার সংগে অন্যটার হয়ত কোন অন্বয় নেই, কোন সাযুজ্য নেই। কিন্তু কবি প্রকাশ করবেন জীবনকে, জীবনের সৌন্দর্যকে, জীবনের বীভৎসতাকে, জীবনের কুশ্রী মালিন্যকে। সমস্ত সংবেদজ অনুভূতিকে প্রকাশিত করতে হবে একটা মাধ্যমের সাহায্যে আর সেই মাধ্যমই হচ্ছে কবিতা। আধিবিদ্যক কবিদল কবিতার স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁদের আবেদন এখনো অম্লান।

ডানের কবিতার ভেতরেও বহুমুখী ভাবরাশির অপূর্ব ঐকতান এবং এর উৎস কবির সংযোজিত সংবেদনশীলতা। সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধের আধিবিদ্যক কবিতা একটা বিশেষ

জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই জীবনদর্শনের কার্যক্রম স্মরণ করিয়ে দেয় দান্তের ডিভিনা কমেডিয়া এবং গ্যেটের ফাউস্ট-এর কথা। এর মৌল আবেদন মানবজীবনের অধ্যাত্ম-চেতনায়ঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীন রহস্য মানুষের আত্মাকে আকর্ষণ করে প্রতিনিয়ত এবং সেই আকর্ষণের প্রকাশ অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি স্পন্দনে। ডানের কবিতায় দান্তে বা গ্যেটের আধ্যাত্মিক দর্শন অনুপস্থিত। কিন্তু সেখানে আছে এপিকিউরাস-এর পরমাণু-সম্বন্ধীয় চিন্তা, সেন্ট টমাসের ধর্মতত্ত্ব, স্পিনোজার জীবনদৃষ্টি। দার্শনিক উপলব্ধি কবির কল্পনা এবং জীবনবোধকে উদ্দীপ্ত করেছে, তাঁর চোখের সামনে আত্মার নাটকীয় মুহূর্তগুলোকে উপস্থাপিত করেছে, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে বিশ্বাসে, বিচলিত করেছে সন্দেহে। সংঘাতজর্জর দৈনন্দিন প্রহরপরিক্রমা, না ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদন, ইন্দ্রিয়সুখসর্বস্ব কামনা দেহাতীত প্রেম—কোনটাকে কবি বেছে নেবেন তা সবসময়েই মুখ চেয়ে রয়েছে আত্মউপলব্ধির, তার সম্মতির অপেক্ষায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে, দর্শনের গাম্ভীর্যই ডানের কবিতার একমাত্র সত্য নয়। সেখানে মিশে আছে বুদ্ধি আর বিস্ময়, যুক্তি আর আবেগ, সুস্মিত হাস্যরস আর অতীন্দ্রিয় ধর্মনিলীন অনুভূতি। উদাহরণস্বরূপ 'ক্যাননাইজেশন্' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি তার প্রেমকে সমর্থন করেছেন জনসাধারণের কাছে। চাইছেন একটু গোপন অবসর। ব্যঙ্গ করুক তারা তাঁর বার্ধক্যকে, অসুস্থতাকে, দুর্ভাগ্যকে। ব্যস্ত থাকুক তারা সম্পদ নিয়ে, শিল্প নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে। তিনি শুধু ভালবাসতে চান তাঁর প্রিয়তমাকে সুনিবিড় নিঃসংগতায়। কবিতাটির ভেতরে একটা আপাতবিরোধী সত্য আছে যার প্রকাশ বুদ্ধি এবং বিস্ময়ের সমন্বয়ে, লঘুতা এবং গভীরতার ঐক্যবদ্ধতায়। কবি ফিনেক্সের প্রহেলিকার কথা উল্লেখ করে তাকে স্বকীয় প্রেমের সাংকেতিক রূপায়ণ হিসেবে কল্পনা করেছেন। প্রহেলিকা বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচায়ক, অথচ তার রহস্য অবাক বিস্ময়ের নির্ঝর উৎস। ফিনিক্স আরবপুরাণের বিখ্যাত পাখী অগ্নিশিখায় মৃত্যুবরণ করে যে আবার ভস্মাবশেষ থেকে নতুন করে জন্মলাভ করত। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রবার্ট চেস্টারের 'লাভ্স্ মার্টার' শীর্ষক কাব্য সংকলনে এই পাখী হচ্ছে মুখ্য সংকেত। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, মৃত্যুর মধ্যে নবজীবনের আশ্বাস, সিস্‌ক্ষার প্রতীকী প্রকাশ, চিরন্তনতায় ভাস্বর। ডানের কবিতায় এই ফিনিক্স সংকেতের ব্যবহার স্বভাবতই ক্রাইষ্ট-এর পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এখানেই ডানের মৌলিকত্ব। তাঁর কল্পনায় প্রেমিকরা কোন সময় প্রদীপ ও পতঙ্গের মত, কোন সময় আবার ক্রাইস্টের জীবনের মত সম্মানার্হ রহস্যের বার্তাবহ, মহৎ সৌন্দর্যের আশীর্বাদে ধন্য। প্রদীপ-পতংগ সংকেত এলিজাবেথীয় যুগের সামাজিক হাস্যরসের অন্যতম উপাদান হিসাবে পরিগণিত হত। মেয়েদের জামার ওপরে প্রদীপ ও পতংগের ছবি থাকত। উদ্দেশ্য নিতান্তই সহজ বোধ্য! ডানের গৌরব এই হাস্যরস পরিবেশনে নয়, এই হাস্যরসের সংগে ধর্মচেতনার সংযোগসাধনে। প্রসংগক্রমে, প্রহেলিকায় আকর্ষণ সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা হয়ত অবাঞ্ছিত হবে না। রেনেশাঁস-প্রভাবিত য়ুরোপীয় জনগণ প্রহেলিকাকে সাহিত্যের একটা বিশেষ সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কেননা প্রহেলিকায় আপাত-তুচ্ছতা সঞ্জাত হাসির সংগে আধিবিদ্যক জ্ঞানের একটা সংযোগ কোন সময়েই দুর্লক্ষ্য ছিল না। সমকালীন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, অনেক সময়েই কেমব্রিজ প্লেটোনিস্টরা, সমস্ত পৃথিবীটাকেই একটা প্রহেলিকা বলে মনে করতেন। স্পেন,

ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এই এক চেতনা প্রবাহিত ছিল। ঈশ্বর মানবমনের প্রেম ও ভক্তির বেদীতে উপবিষ্ট। কিন্তু তাঁর কার্যাবলী মানবমনের স্বল্পজ্ঞান দিয়ে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। প্রাণিজগতে বৈচিত্র আছে। সুর আছে। পরস্পরবিপরীতধর্মী প্রাকৃতিক লীলায়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চলেছে স্রষ্টিকারের অদ্ভুত খেয়ালী নির্দেশনায়। সবকিছুই তো প্রহেলিকা, অনেক বুদ্ধির বিনিময়েও যার ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য।

ডানের প্রেমের কবিতাকে নিতান্তই দেহাশ্রয়ী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এই দেহাশ্রয়ী প্রেমের কবিতাই ধরা পড়ে সম্পূর্ণ নতুন আলোকে। ডানের কাছে নারী এক চিরন্তন বিস্ময়। তাকে ঘৃণা করা যায় আবার ভালবাসাও যায়। কিন্তু তাকে জীবন থেকে বাদ দেবার কথা কল্পনাও করা যায় না। স্থার এপিকিওর ম্যাসন্ বা ভল্‌পোনের কাছে নারী নরম পোষাক এবং সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু ডানের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র, অনেকটা সংযমী তপস্বী টলস্টয়ের মত। তাঁর কবিতায় দেহের উষ্ণ বর্ণনা অনুপস্থিত নয়। যুদ্ধে গমনোদ্যত নায়ক নায়িকার নগ্নতাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সুতীব্র আবেগের উন্মাদনা তার শোণিতধারায় চঞ্চলতার পদধ্বনি। কিন্তু, আকস্মিকভাবে এই নগ্নতার ইন্দ্রিয়জ আবেদন আধ্যাত্মিকতার হিরণ্ময় দ্যুতির স্পর্শপাতে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। নায়িকার দেহকে উপমিত করা হল দুজ্ঞের্য়, অতীন্দ্রিয় বইয়ের সঙ্গে (mystic 'books')। আধ্যাত্মিক চেতনা ও উপলব্ধির সার্থক প্রকাশ অবশ্য ডানের পবিত্র সনেটগুলোতে। সেখানে কামনা দেহের সীমা ছাড়িয়ে স্বর্গীয় প্রশান্তির স্বমহিম সত্যকে অন্বেষণ করে ফিরছে। ঈশ্বরের বন্দী হয়েই কবি মুক্তির আনন্দ লাভ করবেন। তাঁর ধর্ষণেই দেখা দেবে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা। পেছনে রয়েছে নৈরাশ্য, সামনে মৃত্যু। কিন্তু ওপরের আকাশের দিকে তাকালেই আত্মিক উদ্বোধন: ঈশ্বর তাঁকে নতুন করে সৃষ্টি করবেন। তাঁর সমস্ত পাপ অনুশোচনার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে যাবে। মানসিক সংঘাত এবং অনিশ্চয়তার ভয় প্রায়ই তাঁকে বিচলিত করে দেয়। কিন্তু মাঝে মাঝে, প্রাণের দীপ্তির বলয়ে বিশ্বাসের প্রজ্ঞা জীবনের মহত্তম সত্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বাস ভক্তির কেন্দ্র এবং পরিধি। বিশ্বাস আছে বলেই কবি দেবতাকে প্রিয়রূপে বরণ করতে পারেন, কল্পনা করতে পারেন নিষ্পাপ নিষ্কলুষ জীবনের কথা। প্রেয়সীর কাছে ডান্ চেয়েছেন প্রেম কিন্তু, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে চেয়েছেন পরিপূর্ণতা। 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো'। ঘটনাপ্রবাহ প্রার্থীর মানসিক সংগঠনের ওপর রেখাপাত করছে। প্রার্থিত বস্তুও তাই পরিবর্তিত।

ডানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য প্রেমের বৈচিত্র, বিস্তার এবং গতিপ্রকৃতির অনুশীলনে। বিশ্বের কাব্যভাণ্ডারে তাঁর মৌলিক অবদান প্রেমের কবিতা। সেখানে, হেলেন গার্ডনারের ভাষায়, 'আমি' এবং 'তুমি' মিলে 'আমরা' হয়ে গেছে। এ-ধরণের প্রেমের কবিতার সংগে একমাত্র বৈষ্ণবপদাবলীর তুলনা চলতে পারে। আবেগ এখানে সীমাহীন। দেহ এখানে দেহাতীত দর্শনসাধনার প্রথম সোপান। ব্যষ্টির প্রেয় স্বপ্ন এখানে বিশ্বমানবের শ্রেয়তপস্থার বলিষ্ঠ অভিজ্ঞান। কবি প্রেমের স্পর্ধধন্য, নবজাগ্রত দুটি আত্মাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বস্তুতান্ত্রিক জগতের দুঃসাহসিক অভিযান বা ক্ষমতার নেশা তাদের জন্য নয়। তাদের পূর্ণতা প্রেমের সারল্য এবং মৃত্যুহীন,

সুসমঞ্জস, কেন্দ্রায়িত ঐক্যের সমগ্রিক আস্বাদনে। সরল বলেই বিনষ্টি বা অবক্ষয়ের আওতার বাইরে প্রেমের স্থান, ঈশ্বর বা আত্মার মত। নিজের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে তিনি আগামী-কালের প্রেমিকদের অনুরোধ করেছেন তাঁকে শিক্ষা করবার জন্য। কেন না, তিনি প্রতিটি মৃত পদার্থের স্মারক, প্রেমের আমূল পরিবর্তনকারী রসের দাক্ষিণ্যে যেখানে জীবনের আশা অংকুরিত। তাঁর ধনী মনের বৈভব সত্যিই অকৃপণ প্রকাশের আবেদনে যুগোত্তীর্ণ। সে বৈভবে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, জীবনবীক্ষা এবং ব্যক্তি সত্তার প্রথানির্মোক ত্যাগ করবার দুর্মদ আস্পৃহা। সেখানে কোনসময়ে প্রবুদ্ধভাবের বিস্তার এবং পেত্রার্কীয় আদর্শবাদ, কোনসময়ে আবার নারীজাতির প্রতি সুতীব্র বিদ্রূপ, ঐহিক কামনার পংকিলতা থেকে উদ্ভূত বিদ্বেষের নিষ্ঠুরতা। 'অ্যানিভার্সারি' কবিতায় কবি প্রেমের শাশ্বত নতুনত্বের রূপটি উদ্‌ঘাটিত করেছেন। পৃথিবীর সব কিছুরই ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ধ্বংস নেই শুধু প্রেমের। প্রথম দিনের প্রেম আর শেষ দিনের প্রেম, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই। সময় যে পার্থক্যের সৃষ্টি করে, প্রেম তাকে স্বীকার করতে পারে না। কারণ, প্রেম সময়ের উত্থানপতনকে বস্তুবাদী আলোকে বিচার করার পরিপন্থী।

> "All other things, to their destruction draw,
> Only our love hath no decay;
> This, no to morrow hath. nor yesterday,
> Running it never runs from us away,
> But truly keepes his first, last, everlasting day."

'লাভস্ অ্যালকেমি' কবিতায় কিন্তু নারীজাতির প্রতি একটা ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব ফুটে উঠেছে। নারীর কোন মন নেই। খুব বেশী হলে তাদের মধ্যে আছে মধুরতা এবং বুদ্ধি। তারা যেন শব দেহ, ভৌতিক নিয়ন্ত্রণাধীন।

> "Hope not for minde in women; at their best
> Sweetnesse and wit, they, are but ***Mummy***, possest."

'অ্যাপারিশ্যন' কবিতায় কবির ঘৃণা, ক্রোধ এবং আকর্ষণ যুগপৎ অভিব্যক্ত। প্রেয়সীর বিদ্রূপ যখন তাঁকে হত্যা করবে এবং যখন প্রেয়সী ভাববে সে মুক্ত হয়ে গেছে সমস্ত দুর্ভাবনা থেকে তখন অশরীরী তিনি তার বিছানার সামনে এসে দাঁড়াবেন।

> "When by they scorne, O murderesse I am dead,
> And that thou thinkst thee free
> From all solicitaion from mee,
> Then shall my ghost come to thy bed,..."

'সানরাইজিং' কবিতায় কিন্তু আবার অন্য কথা। চোখের পলক ফেললেই সূর্যালোক অন্তর্হিত হয়ে যায়। কিন্তু অতটুকু সময়ের জন্যও কবি তাঁর প্রেয়সীকে চোখের আড়াল করতে পারবেন না।

> "I could eclipse and cloud them with a winke,
> But that I would not lose her sight so long ;..."

ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়, একই কবিমনে সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী অনুভূতির কি বিচিত্র স্বরগ্রাম, কত ধরনের তাদের প্রকাশ, কত অন্তরঙ্গতা সেই প্রকাশের। 'কমিউনিটি' কবিতায় যিনি বলছেন—

"Chang'd loves are but chang'd sorts of meat,
And when hee hath the Kernell eate,
Who doth not fling away the shell ?"

'একস্ট্যাসি' কবিতায় তাঁরই চিন্তায় আধ্যাত্মিক মিলনের বোধ, গভীরতা এবং ব্যাপ্তিতে যার তুলনা মেলা ভার।

"A single violet transplant,
The strength, the colour, and the size,
(All which before was poore, and scant,)
Redoubles still, and multiplies.
When love with one another so
Interinanimates two soules,
That abler soule, which thence doth flow
Defects of lonelinesse controules."

ইটালীর মধ্যযুগীয় যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিত্রকল্প, যুক্তিনিষ্ঠ বিচার পদ্ধতি, ভাবাবেগের সূক্ষ্ম বিবর্তন এবং সর্বোপরি যুক্তি ও অনুভূতির সার্থক সংমিশ্রণ দেখা যায়, সপ্তদশ শতকের কবিকৃতিতে সেগুলোরই পুনর্মূল্যায়ন হয়েছিল। এই পুনর্মূল্যায়নে ডান্ সাহায্য করেছিলেন তাঁর পূর্ণ মনের সমস্ত সমৃদ্ধি দিয়ে। তবে, ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখবার জন্য তিনি কখনই মৌলিকত্বকে অবদমিত করে রাখেন নি। আবেগ তাঁর যুক্তিকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু অনেক সময়ে যুক্তির প্রক্রিয়াই একটি আবেগময় অভিজ্ঞতার রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এ-প্রসঙ্গে ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর. জি. কোক্স্-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "It is certainly characteristic of Donne that profound emotion generally stimulates his powers of intellectual analysis and argument, and that for him the process of logical reasoning can be in itself an emotional experience." জ্ঞানের কবিতায় স্পেন্সারের অলঙ্কারসমৃদ্ধি নেই। কীটস্-এর সৌন্দর্যস্পৃহা নেই, টেনিসনের সুরঝঙ্কার নেই। দান্তে-লুক্রেশিআস-শেক্সপীয়রের মত কোন দর্শনকেও তিনি প্রকাশ করেন নি। তবুও তাঁর আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। এবং বলা বাহুল্য, এই আকর্ষণের পেছনে রয়েছে তাঁর বিচিত্রবর্ণ কবিমন।

লিখনমালায় বঙ্গবীর কথা ঃ পালযুগ

বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য

সৃষ্টির স্বপ্নে বাঙালী মাতাল হল নতুন করে পাল আমলে। দর্শনে-ধর্মে-চিত্রে-ভাস্কর্যে-সাহিত্যে-সঙ্গীতে সর্বত্রই এই সেই সৃষ্টির স্বাক্ষর। সুন্দরময় ধরা দিল মন্দিরের মোহন বিগ্রহের অঙ্গে অঙ্গে, ধর্মের উদার প্রেমানুরাগে এবং শক্তিতত্ত্বের নিগূঢ়তায়। মিলনডোরে বাঁধা পড়ল বৌদ্ধ এবং হিন্দুরা। সংস্কৃতের নিগড় ভেঙ্গে মুখ তুলল বৌদ্ধ দোঁহা আর ধর্মমঙ্গল কাব্য। তারানাথের বৌদ্ধ-ধর্মের ইতিহাস তাই বলল; লিখনমালাও এ সত্য অস্বীকার করল না। অতীতের সেই স্বর্ণালী দিনগুলির উজ্জ্বলতা, সেই বিগত-পুরুষদের প্রতাপকাহিনী ধরা রইল পাহাড়ের গায়ে নগর-প্রাকারে উচ্ছ্বাসী কবির দু-চারটি ছত্রে। অবশ্য এই লিপিগুলো থেকে কল্পনার কাজল সরিয়ে দিলে কতটা সত্যের আলো দেখা দেবে বলা মুস্কিল। তার মানে এই নয় যে লিখন মাত্রই অতিশয় উক্তিতে ভরপুর কিম্বা যথার্থতা সেখানে দুর্লভ। বরং চরিত্রভেদে লিখনগুলোও কখনো কখনো সত্য কথা বলে।

বাংলার লিখনগুলোকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—শাসন এবং প্রশস্তি। স্তুতির বা স্তবের ধুতিই প্রশস্তি। প্রায়শই এগুলি রাজারাজড়াদের গুণকীর্তনে মুখর হয়। রাজাকে তোষামোদ করাই মূলতঃ কবির ইচ্ছে ছিল বলে সর্বদা ওরা পঞ্চমেই সুর বাঁধত, সত্যের ধারে কাছে কাছে ঘেঁশত না। রাজা ওদের কলমে কখনো পৃথিবীপতি কখনো সকলনৃপতিকুলতিলক। দেখতে কখনো শিবসম কখনো ইন্দ্রসম। কখনো পালপ্রভঞ্জনে ধাক্কা খেয়ে অরাতিকুল ধরণীর ধুলোর মতো উড়ে যাচ্ছে, কখনো ঐ নৃপকুলতিলক মশাই মজা করে সকলের মাথায় পা রাখছেন। কিন্তু লিখনমাত্রেরই এ দশা নয়। অন্তত তুলনায় শাসনকে সত্যের সহোদর না বললেও আত্মীয় বোধ হয় বলা যায়। রাজারা সেকালে প্রজাদের ভূমি দিতেন বা অন্য কিছু দান করতেন তারই লিপি এই শাসনগুলোয় লেখা থাকত। রাজা তো আর প্রজাদের নকল না রেখে দিতেন না। কাজেই এই শাসনগুলো পারৎপক্ষে অনৃতবাদী হোত না। যে ভূমি রাজার নয়, কিম্বা যে ভূমি রাজা কদাচ দেননি, তাকে রাজার নামে চালিয়ে দেওয়া অন্তত পাল আমলে অসম্ভব ছিল। আশ্চর্যের হলেও সত্যি, এখনকার মতো তখনো রাজার কাজকারবার নিয়ে সাধারণ মানুষ রীতিমত পলিটিক্স করত। গোপালকে তো তারা রাজাই বানিয়ে দিল! ধর্মপাল দেবের একটি তাম্রলিপি জানাচ্ছে যে সেকালে গ্রামান্তরের গোয়ালারা, গ্রামের সাধারণ মানুষগুলো, হাটবাটের লোকজন এমন কি ঘরের আঙিনায় খেলুড়ে শিশুরা এবং পিঞ্জরিত শুকপাখিরা অব্দি রাজকারবারে কনশাস্। লিখনটিই তুলে দিই: গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ লীলা-বেশ্মনি পঞ্জরোদর শুকৈরুদ্গীতমাত্ম-স্তবং…। লিখনমালায় গুণবাখানিতে ধর্মপাল বোধ করি ফার্স্ট হবেন। তাঁর স্তবস্তুতিতে কবিরা যেন সদাই প্রস্তুত। উত্তরাপথের সার্বভৌম সম্রাট ধর্মপাল দুর্বার বৈরি, কখনো সমস্ত জম্বুদ্বীপ-ভূপাল। তাঁকে

অনেক উদীচীনরপতি অসংখ্য হয়বাহিনী উপহার দিয়ে আত্মপ্রসাদ পায়। তিনি চলেছেন সমরক্ষেত্রে। সঙ্গে চলেছে প্রকট-লীলা-চালিত সেনাবাহিনী আর আগে আগে চলেছে নসীর বা পথদেখানিয়ারা। ওদের চরণসংঘাতে ধূলো উঠছে। সেই ধূলোয় যেন আকাশগোধূলি নেমে আসছে। যুদ্ধ অঙ্গণে তাঁর রণকুঞ্জরের মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠস্বর অনেককে 'জলদসময়' স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। অনেকে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনেও ঐ রণকুঞ্জরনিকরের ঘটা অর্থাৎ সম্মেলনে জলদজলবৎ অনুভব করছেন। তাঁর মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিলাসে বঙ্গনায়করা ভোজ মৎস্য মদ্র কুরু যদু যবন অবন্তি গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি জনপদের রাজাদের পরাজিত করে কান্যকুব্জের রাজ্যশ্রী পেয়েছেন। ধর্মপালদেবের নানাবিধ নৌবাটক জমায়েৎ হলে লোকে ভাবছে বুঝি সামনে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধ চলছে নৌকোগুলো হীহী রব করে এগিয়ে যাচ্ছে, হাতীগুলো মারমার করে ছুটছে সেনাবাহিনী রণে উন্মাদ হয়ে আছে—সত্যই এ এক অপরূপ দৃশ্য। ধর্মপালের ছেলে দেবপালও ছিলেন বাপের বেটা। রেবাজনক বিন্ধ্যগিরি থেকে গৌরী-জনক হিমালয় এবং বালারুণের কিরণে উজ্জ্বল পূর্বসমুদ্র থেকে অস্তাচলগামী ক্লান্ত রবির রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিম সমুদ্র অব্দি সব জায়গা বঙ্গবাহিনী জয় করে করপ্রদ করেছিল। দেবপালের এই বিপুল মহিমার মূলে ছিলেন তাঁর রাজমন্ত্রী। যামিনীর জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্রমার পাওনা তেমনি দেবপালদেবের এই শৌর্যদ্যুতির সূর্য ছিলেন রাজমন্ত্রীই। সুতরাং তাঁর কাছে 'নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসু' মহারাজাধিরাজকেও প্রণতিপরায়ণ হতে হত। রাজা তাঁকে সম্মানীয় আসন দিয়ে স্বয়ং সচকিত ভাবে বসতেন। স্তম্ভলিপির ভাষায়: সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদঃ (গড়ুর লিপির ৭-এর শ্লোক)। রাজমন্ত্রীর সাহায্যে সত্বর রাজার শক্তি বেড়ে গেল। তিনি উৎকলকুল নাশ করলেন হূণগর্ব খর্ব করলেন, দ্রাবিড় গুর্জরের দর্প চূর্ণ করলেন: উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত হূণগর্বং খর্বীকৃত দ্রাবিড়-গুর্জর-নাথ-দর্পং…(গড়ুর লিপির ১৩-এর শ্লোক)।

ভোজদেবের সাগরতালে পাওয়া শিলালিপি থেকে জানা যাচ্ছে বিগ্রহপালদেব ছিলেন বৃহৎ বৈরি। সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু সংহারকারী এবং সেই হেতু তাঁকে অজাতশত্রুও বলা যেতে পারে। বিমল জলধারার মতো তাঁর বিমল অসিধারায় শত্রুকুলের বিনাশ ঘটত। শত্রুদের মা-বোন এবং বৌ-এরা মাথা থেকে মুছে ফেলত তাদের এয়োতি চিহ্ন, সীমন্তের সিঁদুর রেখা। শিলালিপির ভাষায় তিনি হলেন শত্রু-বণিতা-প্রসাধন-বিলোপি-বিমলাসি জলধারঃ।

কিছুকাল চুপচাপ। মহীপালদেবের আমলে লিখনখালা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রীমহীপাল যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়ে সব বিপক্ষ সৈন্যকে নিহত করে অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার করে রাজাদের মাথায় চরণপদ্মস্থাপন করে অবনিপাল হলেন। মূল লিপিটিই তুলে দিলাম: হত সকল বিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃত বিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং। নিহিতোচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধিন তস্মদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ (বাণগড় শাসন, গৌড়লেখমালা, ৯২ পাতা)

শাসন এবং প্রশস্তি প্রসঙ্গে আর এক ধরণের লিপির কথা মনে পড়ে। এগুলো মূলত ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যবহার করা হত। এগুলোকে ধর্মলিপিও বলা যেতে পারে। শাসনকে ইংরেজিতে তর্জমা করলে Charter এবং প্রশস্তিকে Eulogy বলা যায়। অমরকোষ অবশ্য শাসনকে বলেছেন

অববাদস্ত নির্দেশে নিদেশঃ শাসনং চ সঃ। অধ্যাপক কোলব্রুক এর অর্থ করেছেন An Order or command. মেদিনীতে শাসনকে বলা হয়েছে রাজদত্তভূমি। শাসন এবং প্রশস্তির চরিত্র সর্বদা অক্ষুণ্ণ না থাকলেও মোটামুটি বলা যায় ধর্মপালদেব, দেবপালদেব, নারায়ণপাল দেব, মহীপাল দেব বিগ্রহপালদেব এবং মদনপাল দেবের লিপিগুলো শাসন আর গড়ুরস্তম্ভ লিপি এবং বীরদেবের লিপি প্রভৃতি প্রশস্তি।

একটি মধুর কাহিনী দিয়েই শেষ করি। সিংহাসনে বসে আছেন নয় পালের ছেলে তৃতীয় বিগ্রহ পাল। বাহুবলে তিনি শত্রুকুলকালরুদ্র। চেদীরাজ কর্ণদেব এসেছেন তাঁর ক্ষমতা দেখাতে গৌড়ে। বিগ্রহ পাল দেব বনাম কর্ণদেবে তুমুল যুদ্ধ। যুদ্ধে কর্ণদেবের অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে। ভাহা হেরে দেশে ফিরলে বেইজ্জং আবার লড়ে গেলে প্রাণ রাখা দায়। উপায় কি? নিরুপায় কর্ণদেব এবার শেষ অস্ত্র মেয়েকেই ক্যাপিটাল হিসেবে প্রয়োগ করলেন। হঁ্যা, রূপসী মেয়ে যৌবনশ্রীকে উপহার দিলেন বঙ্গরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের হাতে। ফলও হল চমৎকার। রণভেরী স্তব্ধ হল। সমরাঙ্গণে অসির ঝনঝনা আর ধনুর টংকারের বদলে গৌড়রাজ প্রাসাদে শোনা গেল বীণার ঝংকার, প্রেমের গান। ভূমিকাঞ্চন করিতুরগাদি দিয়ে কর্ণদেব নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol iii, P. 22.) যৌবনশ্রীর কি হাল হল? শিলালিপি তার কথা বলে না। তাম্রলিখনে তার সন্ধান নেই। না, কোথাও তার কোন হদিশ পাওয়া যাবে না।

শিল্পে সুন্দর

সবচেয়ে নিখাদ সবচেয়ে বনেদী আর উঁচু দরের আনন্দ বেরিয়ে আসে সুন্দরের ভাবনা থেকে। এখানে আমাদের হৃদয় জেগে ওঠে জলে ওঠে, তারপর আনন্দে ভরপুর হয়ে ওপরে সিঁড়িগুলোকে ছাড়িয়ে যায় চূড়াকে পাবে বলে সুন্দর হচ্ছে শিল্পের রূপমহল। যখন সুন্দরের কথা বলি তখন ছোট্ট করে বুঝে নিই হৃদয়ের সেই ঘুমভাঙানো মনভাঙানো মর্জিটুক্—সুন্দরের ভাবনায় যাকে আমরা প্রথম জানতে পারি। তাহলে দেখা গেল, শিল্পের মাঝে ভাব আর বস্তুর নিটোল চাল আর সুডোল চলনটাই রসিকহৃদয়কে পেঁাছে দেয় আনন্দের বালাখানায়, আর সাদা কথায় একেই বলি সুন্দর।

শিল্পের টান রয়েছে সুন্দরের দিকে। এই সুন্দরকে মানতে পারি, বুঝতে পারি যে এটি আছে, এমন কি এর আস্বাদও নিতে পারি, কিন্তু আলাদা করে ভেঙে ভেঙে একে দেখাতে পারি নে। ফলে, সুন্দরকে দেখবার একরোখা ইচ্ছের তাড়ায় শিল্পের একমেটে চরিত্রটি খুঁজে বেড়াই। ভেতরকার পর্দাটানা রূপ হচ্ছে সেই চরিত্র। শিল্পের গড়নের নানান টুকিটাকির বেমালুম খাপখাওয়ানো যোগাযোগটি পর্দা টেনে আড়ালে রেখেছে রূপকুমারীকে। আমি সুন্দর বলতে চাই তাকেই যা রূপরসাল আবেগকে জাগিয়ে তোলে। রূপরসাল আবেগ যখুনি বলেছি তখুনি তো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এ আবেগ রূপকে বাদ দিয়ে নয়। ভেতরমহলের লুকিয়ে থাকা আবেগের প্রকাশ অনেকের কাছেই অচেনা। এই আবেগ বেঁচে আছে জেগে আছে শিল্পের তালে মানে, কিছু পরিমাণে শিল্পীর ইতিহাসেও।

কোন জিনিসের ভেতর থেকে ফুটে বেরুনো গুণ নয় এই সুন্দর। যে-মন ডুবে রয়েছে তল-ছোঁয়া এক-নিশানা ভাবনায়, সেখানেই এর আস্তানা। সুন্দরের মাঝখান দিয়েই চলেছে আনন্দের সড়ক, আর আনন্দের দুধারেই সুন্দরের গুলবাগ। ঘর-সংসারে ঘেরা চৌহদ্দিতে নজরকে আটকে রেখে অনেকে বলে থাকেন, নারীদেহের লাবণ্যে উপচে পড়েছে সুন্দরের ঝরণাধারা। এই নজরকে বেশ কিছুটা দরাজ করে আমরা বলতে পারি, যার ছোঁয়া লেগে আবেগ জলে ওঠে তা সুন্দর বৈকি। পয়লা নম্বরের ট্র্যাজেডির চেয়ে মাথাব্যথা অনেক বেশি খাঁটি—আমরা আজ আর এমন একটি বেঢপ ধারণাকে আঁকড়ে থাকতে চাই নে। কারণ সব শিল্পই আবেগকে জ্বালিয়ে তোলে, আর আবেগ জলতে থাকে যার ইশারায়, শিল্প তারই আরেক নাম। কাজেই শিল্প সই পাতিয়েছে আবেগের সাথে, আবেগ আবার সুন্দরের লাগসই। ফলে সুন্দরকে নাকচ করে শিল্প গড়ে উঠতেই পারে না।

সুন্দর সদাই চাইছে তার নিজের ভেতরে আমাদের টেনে নিতে। এই টান রসিকমনকে শিল্পের প্রেমে জড়িয়ে ফেলবার ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। রসিকমনকে দখল করতে গিয়ে শিল্পীর নজরের পুরোটাই যদি সুন্দরের টানের দিকে থাকে তবে তাঁর শিল্পের ভাবনা আধখেঁচড়া হতে বাধ্য।

আর তখুনি শিল্পীর ঐ বেতালা একপেশে ঝোঁকটাকে তাঁর পালাবার মনোভাব বলে ঠাউরে নিয়ে বাস্তববাদীরা গাল পাড়বেন। রোজদিনকার জীবনের খেয়োখেয়িকে পেছনে ফেলে সুন্দরের মৌতাতী এলাকায় যাবার সবচেয়ে ছোট্ট রাস্তাটি হচ্ছে শিল্প। এই শিল্পের গোপনচারী সুন্দর নিজের সুষ্ঠু গড়নের মাঝখানে মাতিয়ে তোলে রসিক মনকে, আর সে-মনের সব ইচ্ছে-ভাবনা সব যুক্তি-আবেগকে মানানসই করে বিনি সুতোর মালা গাঁথে।

যাঁরা মনে করেন সুন্দরকে গড়ে তোলা যায়, তাঁরা এর বরাত দিয়ে রেখেছেন শিল্পীর এলেমদারির ওপর। শিল্পের মালমশলাকে ঠিক ঠিক কাজে লাগাতে যিনি পারেন, বাজে জিনিস বাদ দিয়ে মাপমতো কাঁচামালকে কারুশালায় নিজের খেয়ালমতো করে তুলবার বাহাদুরি যাঁর আছে, সুন্দর তাঁর হাতের মুঠোয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কারিগরীক্ষমতা, পাকাপোক্ত তালিম আর হাতে-কলমে একটানা চর্চা—এই তিনের কোন্‌টি শিল্পীর কাছে সবচেয়ে বেশি দরকারী। এর জবাবে বলতে পারি, তালিম আর চর্চা থেকে আসে এলেমদারি, কারিগরী ক্ষমতার সাথে সেই এলেমদারির যোগ ঘটলেই শিল্পী একেবারে ব্রহ্মা। তাই এদিক থেকে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই যে, প্রকৃতির ওপর মানুষের খোদকারিতেই ফুটে ওঠে সুন্দর, কারণ, সেখানে আছে শিল্পীমনের রূপরসাল আবেগ।

সুন্দরকে যদি বলি শিল্পীর সেরা দৌলত, তবে খাঁটি প্রেমিকের কাছে সব জিনিসই যেমন মনভোলানো সোহাগভরা, খাঁটি শিল্পীও তেমনি সবকিছুর মাঝেই দেখতে পান সুন্দরকে। সবখানে এর ঠাঁই, শুধু মনের চোখ চাই একে দেখতে জানার মতো। এক নজরেই যার প্রেমে পড়ি, সুন্দর তার নাম। অনেক সময় বুদ্ধি খাটিয়ে যাকে প্রেমের এখতিয়ারে নিয়ে আসি তাকে পেয়ে আমাদের ভেতরমহলের পণ্ডিতটা হয়তো খুশি হয়, কিন্তু রসিকটা মোটেই সুখী হয় না। কারণ শুধু মাথাটার খোরাক যোগাতে গেলে হৃদয়টার এঁড়ে লাগে। অবশ্য কেউ কেউ কেউ মাথাটাকেই হৃদয় বলে ধরে নিয়ে প্রেমের ওপর বুদ্ধির দখলী স্বত্ব ভোগ করেন, আর এই স্বত্বভোগই একালের রসিকপাড়ার সেরা কানুন। প্রে যাকে একার করে রাখে, শিল্প তাকে সবাইকার করে তোলে। এইটেই প্রেম আর শিল্পের বাঁধা সাঁকো। প্রেমের ভেতর একটা লোভী ইচ্ছে জড়ানো আছে, সুন্দর গোড়াতেই খারিজ করে ঐ লোভকে। তাই সুন্দরকে বলতে পারি মধুর প্রেম, যে প্রেম, যে-প্রেম সবকিছুকে নীলেমদারিতে কিনে নেবার জন্যে উদ্‌গ্রীব নয়, বরং নিরিবিলি ভাবনার বিষয়।

পড়ে-পাওয়া সুন্দর আর গড়ে-তোলা সুন্দর—এ দুটোর ভেতরে তফাৎ আছে। যাকে হাতের কাছে পেয়েই মন বললে সুন্দর, পড়ে-পাওয়া সুন্দর বলছি তাকেই। যেমন, ভোরবেলাকার রঙঝরানো আকাশ, কিংবা নিশুত রাতে ঘুমভাঙা পাখির নিরালা সুরের রেশ। নজর এখানে পুরোটাই হৃদয়ের দিকে। আর যাকে খুঁটিয়ে দেখি, কারুশালার শানে কষে পরখ করি, আর সেই পরখে উৎরে গেলে সুন্দরের রাজটীকা পরাতে একটুও দ্বিধা করি নে, তারই নাম দিলুম গড়ে-তোলা সুন্দর। এতে আছে শিল্পীমনের আনন্দের ছোঁয়াচ। নজর এখানে হৃদয়কে মেনে নিয়েও কিছু পরিমানে বুদ্ধির দোর-ধরা। যেমন, ছাই ফেলবার কুলোটিও যদি তেমন করে বানানো যায় তবে তবে তা সুন্দর বৈকি, হোক না তা দিয়ে ছাই ফেলা। কিন্তু আচ্ছা করে গড়া না হলে সোনার

গয়নাও সুন্দর বলে খেতাব পাবে না। কারণ সোনাকে সুন্দর বলতে পারি নে, তারমাঝে ফুটিয়ে তোলা মানানসই আদব আর কায়দার নাম সুন্দর।

শিল্পের ভেতরে ধারাটাকে সামাল মতো বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবেই সুন্দর বজায় থাকবে। একটা খাঁটি জিনিষ সুন্দর হতে পারে, মেকিও। আসল কথা, সুন্দর ভর দিয়ে রয়েছে জিনিসের গুণের ওপর নয়, চরিত্রের ওপর। কোনো জিনিসেরই হাজার টুকরোর ভেতরে সুন্দর নেই। তারা যে সবাই মিলে গোটা জিনিসকে গড়ে তুলবার জন্যে একই সাথে কাজ করে চলেছে, সুন্দরের আসন সেইখানে। সূর্যকে তো সুন্দরের জগতের মধ্যমণি বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু সেই সূর্যের একটি কণাকে যদি আলাদা করে নিই, তবে মুঠো ভরব আলো দিয়ে নয়, ছাই দিয়ে।

হাল্কাভাবে সুন্দর বলতে আমরা ঝলমলে জিনিসকেই বুঝে থাকি। আর, এইটেই সুন্দরের সবচেয়ে ছড়িয়ে-পড়া মানে। সুন্দর সম্বন্ধে এমনি এক ধারণা গড়ে নিয়ে মরচে-ধরা লোহার চেয়ে সোনাকে, আবার সোনার চেয়ে পল-তোলা হীরেকে আমরা সুন্দর বলি। তবে যা সুন্দর তা-ই সোনাদানা কিংবা হীরের টুকরো—এরকম একটা কুঁদুলে ফতোয়াকে কিছুতেই মানতে পারি নে। অবশ্য একথা ঠিক যে, বড়ো গভীর মাঝখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারব সুন্দর আর ঝলমলের মাঝে একটা কিছুর যোগ আছে, সে-যোগ অনুভূতির হতে পারে। কোনো শিল্পকে বাহবা দিতে গিয়ে বেশ বাছা-বাছা উপমা লাগিয়ে আমরা বলি—শিল্পটি বেশ ঝলমলে স্বচ্ছ স্পষ্ট সাবলীল, অতএব সুন্দর। এমনিধারা উপমার বান ডাকালে সোজা কথাটি সহজেই ধরতে পারা যায় যে, সুন্দর সম্বন্ধে আমাদের কোনো একটি বাঁধা ধারণা নেই, কতকগুলো চিহ্ন ঠিক করে রেখেছি মাত্র।

বসতবাড়ির ছবি সুন্দর, পোড়ো বাড়ির ছবিও। সোনো আর কোরাসকেও তেমনি একই সাথে সুন্দর বলি। এখানেই ধাঁধা লাগে, সুন্দর তবে আসন পেতেছে কোন্‌খানে! আমার বিশ্বাস, ওকে পাওয়া যাবে কোনো চেহারায় নয়, রূপে। পাকা রসিকমন কখনো জিনেসের ভেতরে সুন্দরকে খুঁজে বেড়ায় না, সেই জিনিসটি তার যে-সব আবেগ জাগিয়ে তুলেছে, সেই আবেগগুলোকে নিয়ে সে নিজেরই ভেতরে তল্লাসি চালায়, আর নিজের মনের মণিকোঠাতেই পায় সুন্দরের খোঁজ। কারণ কেউ যদি জলের ওপরকার ঢেউ দেখে মাতোয়ারা হয়ে সুন্দরকে পাবার জন্যে তার পিছু ধাওয়া করে, তবে তাকে তো পাবেই না, বরং নিজে তলিয়ে যাবে সোঁতার টানে।

বাইরের জগৎ থেকে যা কুড়িয়ে পাই তাকে মিলিয়ে দিই আমাদের ভেতরের জগতের ভাবের সাথে। এই মিলনমেলা থেকেই শিল্পের সুরু। কাঁচা মাল আর কারিগরের মাঝে বোঝাপড়াটা নিখাদ না হলে শিল্পে খাঁটি সুন্দরকে গড়ব কেমন করে! তাই সূর্য দেখতে গেলে চোখকে সূর্যের মতো হতে হবে। হৃদয় যদি নিজের সুন্দর না হয় তবে সুন্দরকে বুঝে নেওয়া তার পক্ষে কখনোই সম্ভব হতে পারে না।

কোনো জিনিস আসলে যেমন, শিল্পে তাকে হুবহু পেলে মন খুশি হয় না। ভাবকে জাগিয়ে তুলতে গেলে আসল জিনিসটির সাথে বাড়তি আরো কিছু জুড়ে দেওয়া দরকার। এই বাড়তিটুকুতেই সুন্দরের ফোয়ারা। কারণ এরই টানে আবেগগুলো ভাবকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের সাড়া তোলে নিথর মনে। ফলে বাইরে থেকে আমোদ কিংবা বিষাদ যাকেই পাই না কেন, ভেতর থেকে তাকে

সুন্দর বলতে হৃদয় ভরে ওঠে।

সুন্দর আর কল্যাণের মাঝে একটা গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছিল সাবেক কালে। একালেও নীতিবাগীশের দল সেই গাঁটছড়াকে পাকা করে রাখবার কাজে ব্যস্ত। কিন্তু আমরা খোলা মন নিয়ে বুঝতে পারছি, কল্যাণের সাথে জড়ানো সুন্দরের এই ধারণা শিল্পের ধারণা থেকে তফাৎ। কারণ কল্যাণের দিকে মুখ রেখে যে-শিল্প চলে, আসলে তার চলাটা হচ্ছে মাপা গণ্ডীর মাঝখানে ঘুরে মরবার আরেক নাম। রোজদিনকার ছোটো জগতের স্বার্থ-ঘেরা জিনিস এই কল্যাণ; সমাজের ঝুটঝামেলায় নজর বেঁধে এটি মোড়ল মাতব্বরের বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু শিল্প ছোটো জগৎ থেকে বড়ো জগতে যাবার দুয়োর দেয় খুলে। এর দিলখোলা আওতায় বারোজনের মেলা চলে, বারোয়ারী মোড়লী চলে না। অবশ্য কল্যাণের চল্‌তি মানেটাকে রদবদল করে নিয়ে আমরা যদি বলি, রস যাতে তাড়ি না হয়ে ওঠে সেদিকে নজর রেখে শিল্পকে নিজের চালে চলতে দেওয়াটাই শিল্পের মুলুকে একমাত্র কল্যাণ, তবে খাঁটি শিল্প গড়তে গিয়ে কল্যাণের সাথে সুন্দরের আড়ি আর টেঁকে না।

সুষ্ঠু রূপের ভেতরে নিজেকে যে কড়াক্রান্তি পর্যন্ত বিলিয়ে দেয় নি, কোনো রীতিকেই যে মানতে চায় না বাঁধন ছেঁড়ার মাতলামিতে, তা-ই অসুন্দর। ইন্দ্রের নাটমহলে নাচের তাল কেটেছিল বলে উর্বশীকেও নেমে আসতে হয়েছিল মর্ত্যে। এটি নিছক পুরাণের গল্প হলেও শিল্পের পটে একেই আমরা অসুন্দর বলে মানি। সোজা কথা হোলো, সুন্দর বলতে বুঝি সত্যি সত্যি যা আছে, অসুন্দর হচ্ছে এরই পাল্টা ঘর, তার মানে—যা নেই। ফলে, কোনো কিছুর অভাব থাকলেই আর সুন্দরকে গড়া গেল না।

চল্‌তি ধারণায় যাকে অসুন্দর বলি, শিল্প তার মাঝেও পায় সুন্দরকে। হাল আমলে ঝোঁকটা তো ঐ সুন্দরের ভেতর দিয়ে শিল্পের সুন্দরকে গড়ে তুলবার দিকে। সুন্দর সম্বন্ধে সাবেককালের বেশীর ভাগ ধারণাই নীতির কচ্‌কচি থেকে তৈরী হয়েছিল। সে সময় সব কল্যাণ আর সব সুন্দরের ভিতই গাঁথা হয়েছিল প্রকৃতির মাঝখানে। পাপকে মেনে না নেবার ফলে ছোট হয়ে পড়েছিল সুন্দরের গণ্ডীটা। অথচ মজার কথা হচ্ছে এই পাপ প্রকৃতির ভেতরেই লুকিয়ে রয়েছে, আর তারই ফলে প্রকৃতির বাসিন্দে মানুষ পেয়েছে এর মালিকানা। এই যুক্তির ওপর দাঁড়ালে সব কিছুই সুন্দর—ষ্ট্যাড থেকে সুরু করে বারাঙ্গনাপাড়ার দালালের কথাবার্তা পর্যন্ত সব।

দেবব্রত চক্রবর্তী

চলচ্চিত্র ও সাহিত্য

সমকালীন ১৩৭০ আশ্বিন সংখ্যায় 'সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ' পর্যায়ে শ্রীরণজিৎকুমার সেন 'চলচ্চিত্র ও সাহিত্য' শিরোনামায় একটি সুচিন্তিত ও প্রশংসনীয় আলোচনা করেছেন। নিবন্ধকারের মৌল বক্তব্য : সাহিত্যের বিষয়ই মঞ্চে রূপ পায়, উপনীত হয় চলচ্চিত্রে; এরই অনুসঙ্গে তিনি সাহিত্য-মঞ্চ-চলচ্চিত্রের জ্ঞাতিসম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

(১) রণজিৎকুমার সেন নিবন্ধের উপোদ্‌ঘাতে বলেছেন, 'কি নাটক, কি সাহিত্য সর্বাগ্রে তাকে রসোত্তীর্ণ হতে হয়, ললিতধর্মী হতে হয়।' রসোত্তীরণের সঙ্গে ললিত ধর্মের নিত্য-সম্বন্ধের ধারণাটি বর্তমানে অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এখানে লক্ষণীয়—'কি নাটক, কি সাহিত্য,' এই বাক্যাংশ; অর্থাৎ লেখক সাহিত্য ও নাটকের, কাব্যরস ও নাট্যরসের, ভেদ স্বীকার করেন। এ নিয়েও বিতর্কে যাবনা। শুধু কথাটা মনে রাখা দরকার। কারণ, লেখক পরবর্তী পর্যালোচনায় এই মূল সূত্রটি নিজেই বারংবার অস্বীকার করেছেন, হয়তো অজ্ঞাতসারেই।

(২) শ্রীসেন সুরু করেছেন : 'ইদানিং মঞ্চক্ষেত্রেও অবশ্য বিজ্ঞানের ছায়াপাত ঘটেছে সন্দেহ নেই। তাতে যত বেশি পরিমাণে ইলেকট্রিক্যাল ড্রামা হচ্ছে—।' লেখক 'ইদানিং' অর্থে কি আজ-কাল-পরশু বুঝিয়েছেন? পর্দা-সেট-দৃশ্যপট আলো-ধ্বনি, এদের প্রয়োগ বিজ্ঞাননির্ভর। যার ফলে মঞ্চমায়ার সৃষ্টি হয়; এগুলি কি 'ইদানিং তথা সম্প্রতিকালের প্রয়োগ? বিগত শতকে, তারও আগে, তারও আগে, এদের ব্যবহার ছিল না? কৌশলকলার আতিশয্য অবশ্যই নিন্দার্হ তা ব'লে বিজ্ঞান-নির্ভর আঙ্গিককলা মাত্রেই নিন্দনীয় নয়। যেহেতু, আলো-ধ্বনি-পট ইত্যাদিদের বরখাস্ত করলে আধুনিক নাট্যাভিনয় বন্ধ করে দিয়ে গ্রাম্য যাত্রা বা আদিম কৃত্যাভিনয়ে ফিরে যেতে হয়। তাতে ইলেকট্রিক্যাল ড্রামা' (?)-র হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বটে, সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং 'ড্রামা'-র অন্নও মারা যাবে!

(৩) মঞ্চে বাস্তব পরিবেশ অসম্পূর্ণ ও সংকুচিত হয়ে যায়, এই প্রসঙ্গে শ্রীসেন বলেছেন : 'নাট্যবস্তুর উপরে যে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব অনেকখানি, তা হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশ থাকে-না।' মঞ্চের সীমিত পরিধিতে দেশ-কাল যথাযথ বিধৃত হয় না, তা নাহয় বুঝলাম; কিন্তু 'পাত্রের'-ও প্রভাব হৃদয়ঙ্গম হয় না কেন, কিছুতেই বুঝলাম না। নাটক তাহলে কাদের নিয়ে হয়!…এই প্রসঙ্গে লেখক একটি পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গে তুলনা করে প্রশ্ন তুলেছেন : মঞ্চে কি এ চিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব? উত্তরে বিনীত বক্তব্য :

নিশ্চয়ই সম্ভব! বাস্তবের হুবহু অনুকরণেই মঞ্চ যেকোন পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করতে পারে। ইঙ্গিত, অনুভাবনা, প্রতীক ইত্যাদির সাহায্যে এ সমস্যার আরো সহজেই সমাধান

হয়ে যায়। একাজ মঞ্চ নতুন করছে না। গত একশো বছর ধরে পাশ্চাত্যভূমিতে এনিয়ে সচেতনভাবে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে আসছে যার ফলে জন্ম নিয়েছে—বাস্তববাদ, প্রকৃতিবাদ অধ্যাসবাদ, স্ফোটবাদ, প্রতীকবাদ, অতিবাস্তববাদ প্রভৃতি রীতি। এবং এক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের সহযোগিতা ইতিহাসসম্মত। অপিচ বস্তুপুঞ্জ মঞ্চে নাইবা এল, ক্ষতি কী ? [রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত আলোচনা স্মরণীয়।] যে-শিল্পকে 'রসোত্তীর্ণ' হতে হয় 'বস্তু' নয়, ভৌগোলিক জ্ঞান নয়, ব্যঞ্জনাই যে, তার স্বধর্ম, আশা করি, এতথ্য প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অলংকারশাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝাতে হবে না। সাম্প্রতিক মঞ্চ বিবিধ আঙ্গিকে এই ব্যঞ্জনাকেই প্রকাশ করতে চাইছে, তাতে স্থূল বস্তুর চেয়ে বাস্তবের অনেক গভীরে প্রবেশ করা যায়, অন্তঃশায়ী রসের সন্ধান মেলে।

চলচ্চিত্রের মতো পারে কি—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই উল্লেখ্য—মঞ্চে যেভাবে সেট তৈরী করা হয়, চলচ্চিত্রের অনেক দৃশ্যও সেই ভাবে সেট সাজিয়ে ছবি তোলা হয় (সবটাই একদা হত, ষ্টুডিওয় তোলা); আদালতের দৃশ্য তুলতে কলাকুশলীরা হাইকোর্টে ছোটেন না, কিংবা, ক্লাশরুমের দৃশ্য তুলতে বিশ্ববিদ্যালয়ে। অতঃপর স্বীকার্য, মঞ্চের পরিবেশ সৃষ্টির পদ্ধতি তার নিজস্ব, চলচ্চিত্রের মতো নিশ্চয়ই নয়। তার কারণ, আর কিছু নয়, এরা দুজন স্বতন্ত্র জাতের আর্ট। তাই, মঞ্চে যখন পরিবেশ 'নিছক বাস্তব,' চলচ্চিত্রে সে 'কেবলি ছবি'; মঞ্চস্থ পরিস্থিতি—পরিবেশ স্থানকালের দ্বারা সীমিত, চলচ্চিত্রে স্থানকাল-অতিক্রান্ত; মঞ্চ তিনমাত্রার, চলচ্চিত্র দ্বিমাত্রিক, তারই মধ্যে তৃতীয় মাত্রার গভীরতর অধ্যাস। অপিচ এই পরিবেশও বাঞ্ছিত চিত্র বা চিত্রকল্প। ভূগোল বিদ্যার অধ্যাপনা চলচ্চিত্রেরও পবিত্র দায়িত্ব নয়, যেমন নয় কবিতার; বা নাটকের, বা স্থির চিত্রের, বা যে কোন শিল্পের।

(৪) মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের স্বরূপগত ব্যবধান সম্পর্কে অনবহিতির জন্যে শ্রীসেন মন্তব্য করেছেন : 'আসল বিষয় হচ্ছে নাটক,' এবং মঞ্চের তুলনায় চলচ্চিত্রে 'নাটক গড়ে ওঠে বৃহত্তর পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে…এখানে রস আছে এবং সেই সঙ্গে আছে বহির্জগতের প্রাকৃতিক জ্ঞান।' অর্থাৎ মঞ্চে যাকে ছোট ক'রে দেখানো হয়, বা আদৌ দেখানো যায় না (বলে লেখক মনে করেন), চলচ্চিত্রে তাকেই বড়ো ও বাস্তব করে দেখানো হয়। উত্তম কথা ! তাহলে—মঞ্চকে যদি এমন বড়ো আকার দেওয়া যায় যাতে ভৌগোলিক পরিবেশ 'নিখুঁত ভাবে' আনা যায়; অথবা…(সেই আগের মতো) কোন-দৃশ্য গাছতলায়, কোন-দৃশ্য ছাদ্‌নাতলায়, কোন-দৃশ্য শ্মশানঘাটে ব'য়ে ব'য়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদেরও; চাই-কি ট্রেনে বা প্লেনে চ'ড়ে শিল্পী ও সামাজিকদের শিলং-লক্ষ্মণঝোলা-রামেশ্বরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অভিনয় দেখানো হয় (এখন আর ছবি নয়, নির্ভেজাল বাস্তব !)—তাহলেই কি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের ব্যবধান কমে যাবে ? আমরা সকলেই জানি, এ সম্ভব নয়, যেহেতু এতে 'শিল্প' হয় না; নাটমঞ্চ মথুরবাবুর পূজা 'স্পেসাল' নয় এবং এতদ্বারা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের স্বরূপতত্ত্বগত ব্যবধান একটুও কমে না। আসলে (প্রয়োগ বিদ্যার আপাত :-সাদৃশ্য স্বত্বেও) উভয়ের পার্থক্য পরিমাণগত নয়, গুণগত। একটিতে ক্রিয়া, অন্যটিতে প্রক্রিয়া প্রতিফলিত। একটি থেকে অন্যটিতে 'সরাসরি' যাবার পথ নেই। ত্বরিত প্রশ্ন হবে : কেন—যে-নাটক মঞ্চসফল, তাকে তো ছবিতেও দেখি।—হ্যাঁ দেখি। যেখানে মঞ্চের নাটকই 'হুবহু-যথাযথ' ছবিতে প্রতিফলিত হয়,

সেখানে যে-বস্তু জন্ম নেয়, তার নাম 'চলচ্চিত্র' নয় 'নাট্যচিত্র' বা 'থিয়েট্রিক্যাল পিকচার'। প্রথমটির উদাহরণ 'মহানগর,' দ্বিতীয়টি উদাহরণ—এক্‌স্‌-ওয়াই-জেড্‌। আমাদের দেশে এই নাট্যচিত্রই এখনও আসর জাঁকিয়ে বসে আছে (যার মধ্যে অনেকগুলি, 'মঞ্চস্থ' না হলেও, 'চলচ্চিত্র' আদৌ নয়। যথা: 'দেয়ানেয়া') তাই অনেকের ধারণা, মঞ্চনাটককে বৃহত্তর পরিসরে বা লোকমনের পটে ক্যামেরার সামনে ধরলেই বুঝি চলচ্চিত্র হয়ে যায়। তা হয় না; ছবি হয়, চলচ্চিত্র হয় না। উদাহরণত—মঞ্চে একটি দৃশ্য আন্তন্ত অভিনীত হবে, তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেওয়া যায় না; মনের ভাবনাকে 'চিত্র কল্পে' ফোটানো যায় না, একজন যখন কথা বলে, অন্যরা অদৃশ্য থাকে না; এবং দর্শকও মঞ্চের দূরত্ব বরাবর সমান থাকে, 'ক্লোজ্‌আপ্‌' সম্ভবে না। ক্যামেরা-সম্ভব চলচ্চিত্রে এগুলি স্বাভাবিক রীতি, এখানে পরিবেশ সৃষ্টি ও অভিনয় রীতি তাই মঞ্চ-অনুগামী নয়, তার বিপরীত। তাই কোন নাটককে যখন চলচ্চিত্রায়িত করা হয়,তখন তার শরীরকে আগাপাশতলা বদলে নিতে হয়; বদলে যে নেয় তার নাম 'চিত্রনাট্য'। নাটক শব্দরূপ, তাই সাহিত্যও; চলচ্চিত্র দৃশ্যরূপ, তাই সাহিত্য নয়। এবং 'মঞ্চনাট্য' ও 'চিত্রনাট্য' যমজ না, সোদর না, আত্মীয় না, মিত্র না, শত্রুও না—ভিন্‌পাড়ার প্রতিবাসী, তথা শিল্পের বি-ভিন্ন মাধ্যম মাত্র। উভয়ের জন্ম, রূপায়ন,উপস্থাপনা, আস্বাদন, প্রক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি সবই মূলত স্বতন্ত্র।

(৫) অতঃপর শ্রীসেনের মূল বক্তব্য: 'সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের নিবিড়তম যোগ রয়েছে,' যেহেতু—সাহিত্যে যা আক্ষরিক, চিত্রে ও মঞ্চে তাই জীবন্ত সজীব। চিত্রে ও মঞ্চে যে কথা, যে কাহিনী ও যে সঙ্গীতরূপ পাচ্ছে, তা সাহিত্যেরই নায়ক-নায়িকার কথা সাহিত্যেরই কাহিনী ও সঙ্গীত।'—একদা চলচ্চিত্রের জন্মভূমি য়োরোপেও এই কথা মনে করা হত, আমাদের দেশে এখনও এই ধারণা প্রবল। কিন্তু ওদেশ—এ দেশের চলচ্চিত্রশিল্পবিদ ও রসিকজন বর্তমানে মতটিকে নিঃসংশয়ে পরিত্যাগ করেছেন। এমন অভিমত সৃষ্টির কারণও অবশ্য ছিল। বিগত শতকে জন্মক্ষণে চলচ্চিত্রের হাতে কোন লিখিত পাণ্ডুলিপি থাকত না, চিত্রকর যা দেখতেন, বুঝতেন, তাই তুলতেন। তারপর এল সাহিত্যের প্রভাব—সুখ্যাত গল্প বা নাটক অবলম্বনে ছবি তোলা হত (দর্শক-আকর্ষণ-অন্যতম মুখ্য কারণ ছিল)। এরই পাশে ছিল কাল্পনিক কাহিনীরও চিত্ররূপায়ন। তখন চলচ্চিত্র নাট্যরীতির অনুসরণ' করত। ভেবেছিল এই পথেই মোক্ষ। অচিরেই এ-ভুল ভেঙ্গে গেল, চলচ্চিত্রের, শুধুমাত্র 'চলচ্চিত্রের উপযোগী বিষয়বস্তু' রচনার কাজে হাত পরল। 'চিত্রনাট্যের' স্বরূপ ও স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠল। সেই সঙ্গে চলচ্চিত্রের 'নিজস্ব ভাষা ও রীতি' সম্পর্কে সচেতন উপলব্ধি ও অনুশীলিত জ্ঞান সঞ্জাত হল। একটি 'স্বতন্ত্র স্বকীয় শিল্প-মাধ্যম'-রূপে চলচ্চিত্রের নব জন্ম হল। তবু যে এখনও চলচ্চিত্র তার উপাদানের জন্যে সাহিত্যের,নাটকের দ্বারস্থ হয়, তার কারণ একাধিক। প্রথমত, অধিকাংশ পরিচালক চলচ্চিত্রের ধর্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাঁরা তৈরি করেন 'নাট্য-চিত্র' দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞ ব্যক্তিও একাজ করেন (দর্শক-সাধারণের অনভিজ্ঞতার সুযোগে) আর্থিক লাভের আশায়, নামী বই হলেই ভালো চলবে, এই বিশ্বাসে। তৃতীয়ত যে গল্প বা নাটকের চলচ্চিত্রে রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে, যা থেকে ভালো 'চিত্র নাট্য' করা যায়' সেগুলি চিরকালই চিত্রায়িত হবে, বলা বাহুল্য, আপাদমস্তক 'রূপান্তরণ'-এর পর। চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ এই জাতীয়।

এর জন্তে চলচ্চিত্রকে সাহিত্যের ক্রীতদাস মনে করা অযৌক্তিক। এক পাড়ার শিল্প-বস্তুর অন্ত পাড়ায় শিল্পে রূপান্তর নতুন কিছু নয়; কিন্তু তার জন্তে বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমগুলিকে কেউই শ্রীসেনের মতো আঙ্কিক যোগফলের হিসেবে ধরেন না। যাঁরা ধরেন, তাঁরা ভুল করেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থ' পুনশ্চ কাব্যের একটি আক্ষরিক কবিতা; আবার, একেই পাই কবিতায়, ছবিতে, নৃত্য-নাট্যে, বাদ্যযন্ত্রে, চিত্রনাট্যে, (আলোকসম্পাতী তাপস সেন একে আর-এক নতুনতর পদ্ধতিতে উপস্থাপনার চেষ্টা করছেন)। উপজীব্য সর্বত্র সেই এক (প্রকাশের পদ্ধতি স্বভাবতই স্বতন্ত্র)। কিন্তু তাই বলে, ছবি, নৃত্যনাট্যে বা বাদ্যযন্ত্রে যা রূপ পেল, তা শুধু কবিতারই কথা, কবিতারই কাহিনী ও সংগীত, তার বেশি আর কিছু না, এমন সিদ্ধান্ত হাস্যকর। শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-ভবনে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবিতে, বা কলকাতার তিমিরবরণের বাজনায় এখবর একবারও পাইনি। অতএব চিত্রের মাধ্যমে সাহিত্য দাঁড়াবে কিসের জোরে?'—লেখকের এই জিজ্ঞাসার কোন অর্থই হয়না। অপিচ, 'দাঁড়াতে' হলে আত্মনেপদী রীতিই সর্বোত্তম। সাহিত্য দাঁড়াবে নিজেরই জোরে, অক্ষরবাহিনীর সহায়তায়, ধ্রুপদী অমর রচনাগুলি এই পথেরই যাত্রী। সাহিত্যকে চিত্ররূপ দানের, ও অমরতা দানের দায়াধিকার দায়িত্ব চলচ্চিত্র নেয় নি। যদি কখনও সে কাজ (শিল্পত্বের কথা মনে রেখে) সে করে, তবে নেহাৎই (কোন মহত্তর বা) নিজস্ব প্রয়োজনে, এবং নিজস্ব রীতিতে রূপান্তরিত ক'রে। সাহিত্যতত্ত্ব ও চলচ্চিত্রতত্ত্ব, সাহিত্যরস ও চলচ্চিত্ররস আদৌ অভিন্ন নয়, অভিজ্ঞতা পৃথক। একের পাত্রে অন্যের রস যখন পরিবেশিত হয়, তখন শিল্পের ধর্ম অনুযায়ী রূপ-রস পরিবর্তনীয়, তা যদি না হয়, তাহলে কোথাও গলদ আছে, বুঝতে হবে। গ্রীকট্রাজেডী ও গ্রীক ভাস্কর্য, রেনেশাঁস-সাহিত্য ও রেনেশাঁস-চিত্র তার দৃষ্টান্ত।

(৬) 'সাহিত্যের যা উপজীব্য, চিত্রেরও তাই উপজীব্য—এই উক্তিও ভ্রান্তিবিলাস মাত্র। প্রথম কারণ: চলচ্চিত্র (যখন স্বধর্মে স্থিত নয় তখনও) চিত্রনাট্য-নির্ভর। চিত্রনাট্যকে যদি সাহিত্যধর্ম বলি, তবুও প্রচলিত সাহিত্যকৃতি থেকে তার জাত সম্পূর্ণ আলাদা, সে নতুনতমা। নাটকের সঙ্গেও তার তুলনা হয় না। মঞ্চ-পরিচালক নাট্যকারকেই মোটামুটি অনুসরণ করেন। করুন বা না করুন, নাটক একান্তভাবেই নাট্যকারের; সে 'পাঠ্যরূপে' নিজ অস্তিত্ব প্রমাণিত করে। চিত্রনাট্যকেও নবরূপ দেন পরিচালক; চলচ্চিত্র চিত্রনাট্যকে গ্রাস করে। তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই বললেই হয় (ব্যতিক্রমও আছে সে ব্যতিক্রম স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখে) কোন কোন পরিচালক (আদি-পর্বের মতো) কোন চিত্রনাট্য না নিয়েও ছবি তোলেন আত্মভাবনাকে নির্ভর করে। চলচ্চিত্র এখানে চিত্রনাট্য-বিরহী। তথ্যচিত্রের কথা ছেড়ে দিলাম, অনেক ছবি আছে, যা, 'অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্ট', বিমূর্ত বিষয় নিয়ে তোলা—যেমন, গতি বা ছন্দ বিষয়ে, কবিতা বা গানের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে সশব্দ চিত্র; একগাদা মুখোসকে নিয়ে, অথবা রেখার বিবিধ রূপ-বিরূপ (ডিস্‌টর্‌শান্‌) নিয়ে ছবি। য়োরোপ-কানাডায় এমন ছবি প্রচুর তোলা হয়। আমাদের দেশের অন্তত দুটির নাম বলতে পারি—ফিল্‌ম্‌ ডিভিশনের ষড়-ঋতুবিষয়ক ছবিটি, এবং ক্যালকাটা ফিল্‌ম্‌ সোসাইটির 'পোর্ট্রেট্‌ অফ দি সিটি'। দুটিই তথ্যচিত্র এবং ঋণগ্রস্ত; তবু সৃষ্টি হিসেবে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত। সে-শিল্প সাহিত্যের নয়, কাহিনী-চরিত্রের নয়, বিশুদ্ধভাবে চলচ্চিত্রের।

এই কৌশিক ভ্রান্তিবশত শ্রীসেন 'শিল্পধর্মী সাহিত্যিক সমাজ' এবং 'অপর এক সাহিত্যিক সমাজ' (অর্থাৎ চিত্রনাট্যকার)-এর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। চিত্রনাট্য যেমন 'সাহিত্য' নয়, চিত্রনাট্যকারও তেমন সাহিত্যিক নন। যেমন, ভালো ঔপন্যাসিক হলেই ভালো নাট্যকার হওয়া যায় না, কিংবা ভালো চিত্রকর হলেই (রাগরাগিনীর ছবি আঁকলেও) ভালো গায়ক হওয়া যায় না, তেমনি সুসাহিত্যিক মাত্রেই সুচিত্রনাট্যকার নন। তা যদি হত, সাহিত্যিক সমাজ সে-অধিকার ছেড়ে দূরে বসে থাকতেন না। অপিচ চলচ্চিত্রের মোহে জাত সাহিত্যিকরা যে স্বধর্মে বিনষ্ট হন, বাংলাদেশেই তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। অবশ্য একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক শিল্প-সৃষ্টির ক্ষমতা থাকতে পারে, ভালো সাহিত্যিক ভালো চিত্রনাট্যকার হতে পারেন (যেমন ঈশারউড, অস্বোর্ণ কক্‌তো) ; কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব তখন দ্বিধা বা বহুধা-বিভক্ত। অন্যপক্ষে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, ডি-সিকার সহযোগী, জাভাত্তিনী সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত নন। অনেক পরিচালক বিন্দুমাত্র সাহিত্যধর্ম সৃষ্টি না করেও প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার—যথা ইন্‌গমার বার্গম্যান, সার্জেই আইজেনস্টাইন। এঁদের চিত্রনাট্য সাহিত্যের মতোই একটি শিল্প।

(৭) পরিশেষে, শ্রীসেন আবার ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন : 'ইতিমধ্যেই চলচ্চিত্রযোগে কিছুসংখ্যক সাহিত্যসচেতন ব্যক্তির শুভাগমনের ফলে……'কয়েকখানি ছবি 'সাহিত্যের পূর্ণমূল্য' দিয়ে শিল্পোৎকর্ষে উন্নীত হয়ে' উঠেছে। বাক্য দুটির অতিব্যাপ্তদোষ ইতিপূর্বের বিশ্লেষণেই পরিস্ফুট। তদতিরিক্ত বক্তব্য : যাঁদের লক্ষ্য করে লেখক এই মন্তব্য করেছেন, তাঁরা কেউই একে সমর্থন করবেন না। চিত্রপরিচালকের প্রথমতম ধর্ম চলচ্চিত্রশিল্পসচেতন ব্যক্তি হওয়া ; সাহিত্য-চেতনা তাঁর উপরি পাওনা। তাতে লাভ বই লোকসান নেই। যেহেতু একাধিক শিল্পচেতন স্রষ্টার প্রতিভাকে উজ্জ্বলতর কোরে তোলে। কিন্তু পরিচালক যদি মুখ্যত 'সাহিত্যসচেতন ব্যক্তি হন, তাহলে ফল কী দাঁড়ায়, তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশেই আছে। আমাদের সাহিত্যিক-পরিচালকদের কথা বলছি। অন্যদিকে রাখলাম আপাতত একজনকেই, তাঁর নাম চার্লি চ্যাপলিন।

(৮) মোহনার পরেই সমুদ্র। সমুদ্রে নেমেই সব এলোমেলো। শ্রীসেন ঘোষণা করেছেন : শিল্পের প্রথম আশ্রয় সাহিত্যে, তারপর নাটকীয় ঘাতসংঘাতের মধ্য দিয়ে তার চরম সার্থকতা ঘটে অভিনয়ে।'——শিল্পের প্রথম আশ্রয় সাহিত্যে ? তাহলে ছবি—ভাস্কর্য—স্থাপত্য—নাচ—এরা সব সাহিত্যের পোষ্যবর্গ ? ইতিহাস বিজ্ঞান যে বলে, মানুষের শিল্প-চেতনার প্রথম অভিব্যক্তি গুহান্বিত খোদাই ছবিতে, তারপর মূর্তিতে, তারপর নৃত্যাভিনয়ে—এসবই ভ্রমাত্মক তথ্য ! অপরন্তু, শিল্পের (না সাহিত্যের ?) চরম সার্থকতা অভিনয়ে ? সব পথ শেষ হয় একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ রোমে ? ছবি তাহলে ছবি নয়, ভাস্কর্য প্রতিমাশিল্প নয়, কবিতা কবিতা নয়, গল্প গল্প নয়, প্রবন্ধ প্রবন্ধ নয় ! সকলের শেষ সার্থকতা—অভিনয় ! শ্রীসেনের নিবন্ধেরও কি চরম সার্থকতা—!

পুনশ্চ ॥ 'চলচ্চিত্র ও সাহিত্য' নামধেয় সংস্কৃতিপ্রসঙ্গের পর্যালোচনায় এতক্ষণ যা লিখলাম, অধিকাংশত নেতিমূলক উক্তি। অতঃপর যা লেখা হলনা (অথচ ঔচিত্যবোধজাত ইচ্ছা ছিল) : (ক) চলচ্চিত্রের শিল্পধর্ম ও শিল্পরূপ প্রসঙ্গে ইতিমূলক পর্যালোচনা ; (খ) সাহিত্য-মঞ্চ-চলচ্চিত্রের সত্তা

আত্মীয়তা, যেখানে তার উদ্‌ঘাটন, ভিন্নতর অববাহিকায় ; (গ) উল্লিখিত যুক্তি ও তথ্যের বিস্তৃত প্রমাণপঞ্জী ও প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি। এগুলির জন্য স্বতন্ত্র পর্যায়ের আলোচনা করণীয়। কিন্তু এখানে আমি আত্মনেপদী প্রবন্ধ লিখতে চাইনি, শ্রীসেনের মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক নিবেদনটুকু ব্যক্ত করতে চেয়েছি মাত্র। অনালোচিত বিষয়গুলি প্রবন্ধান্তরে প্রকাশের ইচ্ছে রইল। ইতিমধ্যে আলোচনা যদি প্রসারিত হয়, সুখী হব। বিতর্কের নয়, শিল্পমনস্কতা ও চিন্তার অনুশীলনের আনন্দে রণজিৎ কুমার সেনের তাত্ত্বিক প্রস্থানভূমি সুধীজনকর্তৃক ভ্রান্ত, অর্থহীন ও অনুর্বরা জ্ঞানে পরিত্যক্ত। তবু তাঁর নিবন্ধ আমাকে যে সুযোগ দিয়েছে, তার জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষত, সাহিত্য-পত্রে এজাতীয় আলোচনা যতো বেশি হবে, চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ ততোই স্বীকৃত, পরিচিত ও আস্বাদিত হবে। বাঙ্গালী দর্শক ও স্রষ্টার রুচি ও অভিজ্ঞার বিবর্ধনে আমাদের চলচ্চিত্র ক্রমেই সর্বাঙ্গসুন্দর শিল্পপ্রতিমা হয়ে উঠবে। তার, এবং সেই আমাদেরও, ব্যাধি দূর হয়ে ফিরে আসবে যৌবনের স্বাস্থ্য।

গুরুদাস ভট্টাচার্য

সমাজ-শিক্ষার পরিধি

সমাজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে "পরস্পর সহযোগিতাপূর্বক বাসকারী মনুষ্যসঙ্ঘ।" সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে এই শব্দটি যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা হইতে আমরা বিশদরূপে সমাজ-শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারি।

"শমৈর্বর্গঃ সংঘসার্থৌ তু জন্তুভিঃ।
সজাতীয়ৈ কুলম্ যূথম্ তিরশ্চাং পুংনপুংসকম্॥"

অর্থাৎ সমান শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর দলকে বর্গ বলা হয়। জন্তুদিগের দলকে বলা হইয়া থাকে সংঘ বা সার্থ। সজাতিসমূহকে বলা হয় কুল এবং তির্য্যক্ প্রাণীর দলকে বলা হয় যূথ।

কিন্তু ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট সর্বসাধারণের মিলনজনিত সৃষ্ট দলকে বলা হইয়া থাকে সমাজ। "অন্যেষাং সজ্যঃ সমাজঃ", অর্থাৎ, পূর্বশ্লোকে বর্ণিত নানাশ্রেণীর দল ভিন্ন "সবার মিলনে পবিত্র করা" যে জনসঙ্ঘ তাহাই সমাজ। সুতরাং সমাজ শব্দটি খুবই ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত।

সমাজের এই ব্যাখ্যা হইতে আমরা স্পষ্ট অনুধাবন করিতে পারি যে সমাজশিক্ষার পরিধি কতদূর ব্যাপক হইবে। এখন আমরা সমাজ-শিক্ষা কাহাকে বলে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে প্রথমে দেখিব শিক্ষা বলিতে কি বুঝি। বিদ্যাগ্রহণের অপর নাম শিক্ষা—"শিক্ষা বিদ্যোপাদানে। কিন্তু বিদ্যা ত অনন্তপার, ইহার কতটুকু আমরা সমাজ-শিক্ষা বলিতে বুঝিব?

যে শিক্ষা দ্বারা আমরা কাহার কোথায় স্থান, কাহার কি কর্তব্য প্রভৃতি সুষ্ঠুরূপে অবগত হই তাহাই প্রকৃত শিক্ষা—"শিক্ষ্যতে স্থানাদিকমনয়া"।

এখন এই "সমাজ-শিক্ষা" কথাটির স্বরূপ আমরা বিশদরূপে আলোচনা করিব। এই জাতীয় শিক্ষা অন্যান্ত দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংলণ্ড, ওয়েলস্ প্রভৃতি দেশে ইহা বয়স্ক-শিক্ষা নাম গ্রহণ করিয়াছে; বিশ্ব-সংস্কৃতি-সংসদ ইহাকে ভূষিত করিয়াছেন মৌলিক-শিক্ষা নামে। চীন ইহার নামকরণ করিয়াছে গণ-শিক্ষা। কিন্তু বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি সেক্সপীয়রের ভাষায় আমরা বলিতে পারি—'নামে কি যায় আসে? যাকে আমরা গোলাপ বলি তাহার নাম যাই দেওয়া হোক্ না কেন তাহার মধুর প্রাণ-মাতানো গন্ধ একই থাকিয়া যাইবে।'

সুতরাং এই জাতীয় শিক্ষাকে যে কোন আখ্যায় ভূষিত করা যাক্ না কেন ইহার মাধুর্য্য, প্রয়োজনীয়তা ও স্বত্তা অব্যাহতই থাকিবে।

এখন স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই জিজ্ঞাসা জন্মিবে যে যদি বয়স্ক-শিক্ষা, মৌলিক-শিক্ষা গণ-শিক্ষা—ইহারা একই হইয়া থাকে তবে ইহাদের নামে এত পার্থক্যই বা কেন এবং ভারতই বা কেন সমাজ-শিক্ষা নামে ইহাকে পরিভূষিত করেন?

ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা "ভারতে সমাজ-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের ইতিহাস" শীর্ষক অধ্যায়ে করিব। এই স্থানে শুধু ইহাই বলা হইতেছে যে সমাজ-শিক্ষা বলিতে আমরা সেই জাতীয় শিক্ষাই বুঝিতে পারি যাহা দ্বারা আমরা সম্পূর্ণ কর্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন সুযোগ্য নাগরিক হইতে পারি এবং পরস্পর মিলিত হইয়া জীবনের অবসর মুহূর্তগুলিকে চূড়ান্তরূপে দেশসেবা ও আত্মোন্নতিমূলক কার্যে নিযুক্ত করিতে পারি।

নিম্নে সমাজশিক্ষার বিভিন্ন মনীষী-প্রদত্ত বিবিধ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইল; ইহা হইতে সমাজ-শিক্ষা যে কি সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা হইবে।

মহাত্মা-গান্ধী ইহার স্বরূপ বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সমাজ-শিক্ষা সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা। জীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া লব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে পূর্ণতর জীবনের অধিকারী হইবার শিক্ষাই সমাজ-শিক্ষা।

প্ল্যানিং কমিশন বলিয়াছেন যে জনসাধারণের সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা সর্বসাধারণের সমুন্নয়ন-পদ্ধতিই সমাজ-শিক্ষা।

প্রকৃতপক্ষে সমাজ-শিক্ষা সর্বসাধারণের শিক্ষা-শৈশব হইতে আমরণ ইহার প্রসার। বিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিয়া থাকি বা না থাকি, সাক্ষর বা নিরক্ষর যাহাই হই না কেন—এই জাতীয় শিক্ষা সকলেরই প্রয়োজন। ইহা খুবই ব্যাপক এবং মানব-জীবনের ন্যায়ই বৈচিত্র্যময়। ইহা বিলাস, অবাস্তব খেয়াল বা রাজনৈতিক ধাপ্পা নহে। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যও সামাজিক উন্নতির জন্য ইহার প্রয়োজন। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার ইহা অচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ।

সমাজ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ইহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য ॥

'ন হি অনুদ্দিশ্য কো ঽ পি প্রবর্ত্তেত'—অর্থাৎ, কোনও উদ্দেশ্য না লইয়া কোনও কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ, উদ্দেশ্যহীন বা অনিশ্চিত উদ্দেশ্য লইয়া কার্যে রত হইলে সেই কার্য

অঙ্কুরেই নষ্ট হইয়া যায়। সমাজশিক্ষা ব্যাপারেও রত হইবার পূর্বে আমাদের জানিতে হইবে ইহার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও প্রয়োজনীয়তা; নচেৎ সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে আমাদের অগ্রগতি হইবে পদে পদে ব্যাহত ও জাতি সংগঠনের এই বিরাট প্রচেষ্টা হইবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক্ কেন আজ সমাজ-শিক্ষা লইয়া এই বিরাট আন্দোলনের প্রয়োজন হইল। ভারতের ইতিহাস বিংশ শতাব্দীতে সুরু হয়নি, বহু সহস্র বৎসর পূর্বেই যে জাতি একদা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হইয়াছিল সেই জাতি-মধ্যে আজ সহসা এই জাতীয় শিক্ষার কি প্রয়োজন হইল?

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে আমরা অর্থনীতির দুই-একটি মূল সূত্রের আলোচনা করিব। যুগে যুগে দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তন হইয়া থাকে। আদিমকালে মানব যখন গুহায় বাস করিত তখন তাহার প্রয়োজন মিটিত কাঁচা মাংসে ও যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলাদিতে। ভূমি-কর্ষণ প্রথা তাহাদের ছিল জ্ঞানবহির্গত ও সেইজন্য ভূমির উপর তাহাদের কোনও চাহিদা ছিল না। মহর্ষি বাল্মীকি সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে অমর মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে পরিকল্পনা যে কতদূর চিন্তাশীল ও কার্যকরী হইতে পারে তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দণ্ডকারণ্যের সভ্যতা ছিল আদি-মানবের। রাক্ষসাদি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে না ছিল বাসগৃহ, না ছিল উদরান্ন সংস্থানের জন্য সুপরিকল্পিত অধ্যবসায়। কিষ্কিন্ধ্যা-সভ্যতায় আমরা দেখিতে পাই উন্নততর জীবনের আস্বাদ। বানরাদি এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করে ও জীবিকা-নির্বাহের জন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করে। কিন্তু হলকর্ষণ তাহাদেরও বুদ্ধির বাহিরে। এবার আসিলাম অযোধ্যা-সভ্যতায়। সেখানে দেখিতে পাই হলাগ্রে উত্থিতা সীতাকে। এই সীতা আর কেহই নহেন, ইনিই ভারতের পরমারাধ্যা জীবনস্বরূপিণী কৃষিদেবী। হলাগ্রে উত্থিতা উদ্বৃত্তস্বরূপা। প্রকৃত পক্ষে সমাজে যতদিন উদ্বৃত্ত সৃষ্ট না হয় ততদিন সভ্যতার প্রসার অসম্ভব। উদ্বৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে হয় চাহিদা বৃদ্ধি, যাহার ফলে মানব-সভ্যতা যুগে যুগে বিস্তার পাইয়া থাকে। রাজর্ষি জনকের আমলে হইল প্রচুর উদ্বৃত্ত—ফলে সভ্যতারও প্রসার হইল। ভূমি কর্ষণের প্রয়োজনে গবাদি পশুর মূল্য বাড়িয়া গেল। যে গবাদি পূর্বে স্বেচ্ছায় মানব আহার করিত তাহা হইয়া পড়িল অঘ্ন অর্থাৎ হননের অযোগ্য। বৃষ হলাকর্ষণের প্রধান সহায় বলিয়া তাহার সম্মান বাড়িয়া গেল—বৃষ হইল দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন। এইরূপে যুগে যুগে মানব-সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা বাড়িয়া যায় ও দ্রব্যাদির মূল্য পরিবর্তিত হইতে থাকে।

ভারতে আর্য-ঋষিগণের সময় হইতেই কৃষি-সভ্যতা পরিলক্ষিত হয় এবং অদ্যাপি ভারতবাসীর মূল শক্তিকেন্দ্র লক্ষ লক্ষ গ্রাম ও কৃষিই ভারতের লক্ষ্মী বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের জয়যাত্রার দিকে মানব-সভ্যতার দিক্ পরিবর্তিত হইয়াছে। বিজ্ঞান-সাধনার বলে মৃত্যু-হার গিয়াছে কমিয়া; উন্নততর ঔষধাদি ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা জীবনের পরিধি বহুগুণে বিবর্ধিত করিয়াছে। লোকসংখ্যা গিয়াছে অন্যূনপক্ষে ১০।১১ গুণ বাড়িয়া। এই বিরাট জনসমষ্টির অন্ন-সংস্থান আজ কেবলমাত্র কৃষির দ্বারা সম্ভব নহে। বর্তমান জগতে উন্নত সকল জাতিই শিল্প গড়িয়া তুলিয়া নিজ মাতৃভূমিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভারতকেও বহুবিধ শিল্পে অত্যুন্নত হইতে হইবে, নচেৎ অগ্রগামী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির তুলনায় চিরদিন বহু পশ্চাতে পড়িয়া

থাকিতে হইবে।

কিন্তু শিল্পোন্নয়ন করিতে হইলে আমাদের প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি, ভাবধারা ও জীবনদর্শনের নানাবিধ সংস্কার করিতে হইবে। শান্ত তপোবনে যে শিক্ষা প্রচলিত ছিল, আনবিক মারণাস্ত্রের যুগে সে শিক্ষার স্থান নাই। কৃষিগতপ্রাণ দেশবাসীর যাহা প্রয়োজন, শিল্পজগতে উন্নতিকামীর সেই ধরণের শিক্ষা অহিতকর। এই জন্য সমাজ-শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষরূপে অনুভূত হয়। প্রয়োজনের তারতম্যের সহিত চাহিদার ও দ্রব্যমূল্যের পার্থক্য হয় এবং ইহার সহিত প্রয়োজন হয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন। সমাজ-শিক্ষার প্রধান প্রয়োজনই এই যে ইহা আমাদের নূতন নূতন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলিতে ও নূতন পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ লইয়া চলিতে শিক্ষা দেয়। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইবার ও আত্মোন্নতি করিবার শিক্ষাদানই সমাজশিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহা সর্বকালের ও সকলের জন্যই।

শিক্ষা যে কোনও ব্যাপারেই দেওয়া যাক না কেন, ইহার মূল উদ্দেশ্য তথ্য-সংবাদাদি জ্ঞান-প্রদান নহে—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য মানবহৃদয়ে উচ্চতর ভাব ও আদর্শসংস্থাপন এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিত্তপ্রণিধানক্ষমত্বসাধন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হইলে নিরক্ষরতা দূরীভূত হইবে এবং সমাজ-শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকিবে না। সত্য বটে, ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশে সমাজ শিক্ষা বলিতে বর্তমানে প্রধানতঃ নিরক্ষতার বিরুদ্ধে অভিযানই বুঝা যায়, কিন্তু অক্ষরজ্ঞানই সমাজ-শিক্ষার মূল আদর্শ নহে ইহা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। **অজ্ঞতা কুসংস্কার প্রভৃতি বহু দিনের গ্লানি কেবলমাত্র সাক্ষরতার দ্বারা অপনেয় নহে।**

ভারত আজ স্বাধীন দেশ। স্বাধীনতা স্থায়ী রাখিতে হইলে প্রত্যেক ভারতবাসীকে হইতে হইবে রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃত অনুরাগী। নাগরিকত্বের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ণ সচেতন হইতে হইবে ও জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিতে হইবে। সমাজ শিক্ষার ইহাও উদ্দেশ্য বটে। গণতন্ত্রকে কার্যকরী করিতে হইলে প্রত্যেকটি নাগরিককে হইতে হইবে প্রকৃত শিক্ষিত, যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতিটি মঙ্গলজনক কার্যের পিছনে থাকে তাঁহাদের সচেতন আনুকূল্য। গড্ডালিকা-স্রোতের ন্যায় পরিচালিত জনসমষ্টির দ্বারা প্রকৃত গণতন্ত্র চলিতে পারে না। "Self Government can succeed only through an instructed electorate."—Hoover.

"The whole purpose of democracy is that we may hold counsel with one another so as not to depend upon the understanding of one man but to depend upon the common counsel of all."—Wilson.

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে সমাজ-শিক্ষাই গণতন্ত্রের ভিত্তি। যে কোনও দেশেই সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন অথবা সংস্কার সমাজশিক্ষা ব্যতীত কার্যকরী হইতে পারে না। সমাজশিক্ষাই জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, শিল্প ও সংস্কৃতির বাহক ও ধারক। শিক্ষিত জনকজননী শিক্ষিত সন্তানের হেতু—সুতরাং সমাজ-শিক্ষার প্রয়োজন কি তাহা আমরা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারি।

এই প্রয়োজন হইতে স্বতঃই আসিয়া পড়ে সমাজ-শিক্ষার উদ্দেশ্য। পৃথিবী আজ সঙ্কীর্ণ-পরিসর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বে এক দেশ হইতে অন্য দেশে যাতায়াত ছিল দীর্ঘদিনসাপেক্ষ, ব্যয়-বহুল ও বিঘ্ন বিপদাকুল। বিভিন্ন দেশের সহিত সম্পর্ক প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। যে রুশ জাতি আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির অন্যতম শীর্ষস্থানীয়, মাত্র সেদিন মহানুভব পিটারের অধীনে হইল জাগ্রত ও বিশ্ব-দরবারে পরিচিত। ইহার পূর্বে কুর্মের ন্যায় ছিল নিজ পরিধির মধ্যে সঙ্কুচিত। সমাজ-শিক্ষার ফলে আজ সেই জাতির মধ্যে নিরক্ষরতা নাই বলিলেই চলে ও শিল্পোন্নতির দ্বারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতিরূপে পরিগণিত।

শিক্ষায় অগ্রগামী দেশসমূহে সমাজ-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নাই এইরূপ ভাব এখনও অনেকে পোষণ করিয়া থাকেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যে জাতি পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে সমাজ-শিক্ষা কেবলমাত্র তাহাদেরই প্রয়োজন। ইহাদের উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে সমাজ-শিক্ষা সকল সময়ের, সকল জাতির ও সকল অবস্থার জন্য। আজ পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যতদূর উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে ও হইতেছে তাহা অদ্যাপি কোনও যুগে পরিদৃষ্ট হয় নাই। বিগত দুই শতাব্দী ব্যাপী বিশেষ দ্রুত-গতিতে নানাক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রসার ঘটিতেছে। শিল্পজগতে ও যানবাহনাদির ব্যাপারে যে অভূতপূর্ব দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবনের উপরেও পরিলক্ষিত হয়। শিল্পোন্নতির ফলে ঘনবসতির সৃষ্টি হইয়াছে; যন্ত্রের নিকট শ্রমিকের হইয়াছে পরাজয়—অতি সাধারণ ব্যক্তিরও জীবনে আজ নূতনতার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অচিন্তিতপূর্ব। মানুষের সময় মিলিতেছে প্রচুর—যন্ত্রযুগে ইহা অবশ্যম্ভাবী। বহু মানবের অক্লান্ত পরিশ্রমে যাহা পূর্বে গঠিত হইত তাহা বর্তমানে যন্ত্রের দ্বারা অতি স্বল্প সময়েই অনায়াসলভ্য হইয়াছে। ফলে শ্রমিকের হইতেছে প্রচুর অবসরলাভ। এই অবসর সময় যাপন করিবার উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে দেশের অমঙ্গল অনিবার্য। অবসর যাপন করার অর্থ ইহা নয় যে নিদ্রা, ব্যসনাদি ব্যাপারে আমরা সময় কাটাইব। কর্তব্যকর্ম হইতে যে কয়েক ঘণ্টা পাই কোনও মতে অলসব্যসনাদির দ্বারা তাহা কাটানোই অবসরযাপন নহে। যে বিরতিকালের মধ্যে আমরা আত্মোন্নতিমূলক কার্যাদি দ্বারা নিজের ও দশের উন্নতির চেষ্টা করি তাহাই প্রকৃত অবসর এবং জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণের ইহাই কর্তব্য।

সমাজশিক্ষা আজ কেবলমাত্র বয়স্কশিক্ষা অর্থাৎ বয়স্কদিগের সাক্ষরতাসম্পাদন নহে। সমাজের অগ্রগতির ফলে আজ আমরা এমন এক জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি যেখানে সমাজশিক্ষা গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার অত্যাবশ্যক অংশ বলিয়া বিবেচিত। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের উন্নতির জন্য ইহার প্রয়োজন—শিল্পশিক্ষার অগ্রগতির জন্য বর্তমানে যে প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সঙ্গে তালে তালে সমাজশিক্ষাকেও অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্তমান সমাজের আর একটি বিশেষ দিক রহিয়াছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানব-জীবনের পরিধি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; জন্মহার বহুস্থানে কমিয়া গিয়াছে এবং ফলে সমাজে বয়স্কদের সংখ্যা বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই বয়স্ক ব্যক্তিগণের মনস্তত্ত্ব ভিন্ন প্রকারের। নূতন জাগতিক ভাবধারার সহিত ইহারা সম্পূর্ণ খাপ খাওয়াইয়া চলিতে পারে না। সমাজ-শিক্ষা ইহাদের সাহায্য করিবে নূতন পৃথিবীর সহিত মানাইয়া চলিতে। নূতন শিক্ষা, নূতন ভাবধারার সহিত

পরিচয়ের মাধ্যমে তাঁহাদের চিত্তকে অনুকূল ভাবাপন্ন করিয়া তুলিতে হইবে। "হেথা হ'তে যাও পুরাতন"—কবীন্দ্রের ভাষায় বলি পুরাতন যুগের জ্ঞানবৃদ্ধ পরিণতবয়স্ক সমাজ তাঁহাদের চিত্ত করিয়া তুলুন সরস ও সংগঠনমূলক। নবীনের জয়যাত্রার দিনে স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা অগ্রগতির পথ মসৃণ করিয়া তুলুন; প্রাচীন মতের ধুঁয়া তুলিয়া তাঁহারা যেন দেশের অভ্যুত্থান ব্যহত না করেন। সমাজ-শিক্ষা এ-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিবে।

আত্মা অরে বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—আর্য ঋষিগণের এই বাণী শাশ্বতকালের জন্য। সর্বাঙ্গীণ আত্মোন্নতিই সমাজ-শিক্ষার কাম্য ও উদ্দেশ্য। মানুষ বিজ্ঞানসাধনার ফলে পরিবেশের উপর অনেকটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে। প্রকৃতির খামখেয়ালী অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে; কিন্তু আজিও এমন কোনও বৈজ্ঞানিক কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই যাহার দ্বারা ভাবগত পরিবেশের উপর মানব জয়ী হইতে পারিয়াছে। চিত্তবৃত্তির নিয়ামক হইবে আমাদের পরিকল্পিত সমাজশিক্ষণ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় স্বার্থ, সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রাখিয়া আন্তর্জাতিক মিলন সেতু-নির্মাণও সমাজ শিক্ষার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পরিসর দ্রুতগামী বিমান প্রভৃতির আবিষ্কারের জন্য সঙ্কীর্ণ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্যক্তিগত মানবের জ্ঞানের পরিসর গিয়াছে সহস্রগুণ বাড়িয়া। ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রতিটি মানবের চিত্তজগতে যে বিরাট আলোড়ন প্রতিটি মুহূর্তে চলিতেছে তাহাতে অপরের সহিত আচরণ, বিশেষরূপে অন্যান্য দেশবাসীর সহিত আচরণ বিশেষরূপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। মানুস অপর মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তি অর্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সহজ কল্যাণের পথে নিজের সহিত অপরকে লইয়া অগ্রসর হইবার শক্তি আজিও অর্জন করে নাই।

ইহার ফলে প্রতিটি জাতির সত্তাই আজ বিপন্ন; আণবিক অস্ত্রাদি কখন যে সকল সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই। সমাজ-শিক্ষা ঠিক পথে পরিচালিত হইলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক মধুর হইয়া উঠিবে। সকল জাতিই মিলনরাখী বাঁধিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে। পৃথিবী হইয়া উঠিবে শান্তি রাজ্য।

কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়

অদৃষ্টচর ॥ রঞ্জিত সিংহ ॥ গ্রন্থভবন, ১২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ ॥ দু' টাকা।

সম্প্রতিকালের সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতোই, বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধন হয়েছে। অবশ্য এজন্য আধুনিক কবিগোষ্ঠীর, বিশেষত তরুণ মহলের নবতর জীবনজিজ্ঞাসা, বিষয়ান্বেষণে নতুনতর দৃষ্টিপাত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি একমাত্র দায়ী। বলা বাহুল্য, সম্প্রতিকালে প্রকাশিত তরুণ কবিমহলের কয়েকখানি কাব্যসঙ্কলন এবং তাঁদের কাব্যচর্চা, কাব্যপ্রবাহের আলোকে উপর্যুক্ত কথার যাথার্থ্য নিরূপণ হয়তো অসহজসাধ্য নয়।

বর্তমান গ্রন্থটি তরুণ কবির কাব্যসঙ্কলন। অবশ্য বর্তমান কাব্য-সঙ্কলনটি তরুণ কবি শ্রীযুক্ত রঞ্জিত সিংহের প্রথম ফসল নয়; 'অদৃষ্টচর' তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। রঞ্জিত সিংহের কবিমনের বহুবিচিত্র অনুভূতির মোট তিরিশটি কবিতা বর্তমান সঙ্কলনে স্থান লাভ করেছে। বর্তমান কালের প্রেম ও বিরহবোধ, যন্ত্রণাময় বিচিত্র জীবনচৈতন্য তাঁর কবিতায় বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে:

> 'তুমি ত আমার প্রেম, প্রবীণ হৃদয়!
> জলবৃত্তে রেখে যাও মায়ার আবহ
> তারারা আকাশে এলে কী যে মনে হয়
> অসূর্যম্পশ্যার মত তারার সম্মোহ।
>
> দু' হাতে সূর্যকে ঢেকে আর কত কাল
> আত্মঘাতী প্রেম গড়ো কালের রাখাল।'
>
> (কালের রাখাল)

অথবা,

> 'হে হৃদয় চেয়ে দেখো,—শব্দহীন সমস্ত সংসার
> বৃষ্টি থেমে গেছে তবু বৃষ্টি পড়ে শ্রাবণে শ্রাবণে
> তুমি ভুলে গেছ জানি তবু সেই দৃশ্যের প্রসার
> ঋতুচক্র বহমান চিরস্থির তমালের বনে।'
>
> (রুদ্ধদ্বারে)

'অদৃষ্টচর' কাব্য সঙ্কলন পাঠে পাঠক হিসেবে প্রতীতী হলো: কবির মধ্যে একটি গভীর বেদনাবোধ সঞ্চারিত; এবং বলা বাহুল্য, 'অদৃষ্টচরের' কাব্য ভাবনায়, পরন্তু চিত্ররচনায় সেই অন্তর্তর মনোবেদন কাব্যাঙ্গের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত না হলেও বিশেষত 'কালের রাখাল; দর্পময়ী;

বিশ্বসহচরী; বর্তিকা; ছন্দ মিল যতি; রুদ্ধদ্বারে; পরবাসে; ফুলহার; স্বগত; সায়াহ্নের দিন; মৃত্যু' ইত্যাদি কবিতাবলীতে এক আশ্চর্য বেদনাঘন রূপ লাভ করেছে। প্রেম ও বিরহের আবহাওয়া রচনার ক্ষেত্রে কবির অন্তর অনুভূতি কাব্যগ্রন্থটির মধ্যে উপস্থিত এবং তৎসহ হৃদয়ের সঙ্গে মননবৃত্তির সাযুজ্যবোধ স্থাপনেও তাঁর পরিশুদ্ধ কাব্যানুশীলন ক্ষেত্র বিশেষে সক্রিয়:

'সিদ্ধ হ'ল নিপাতনিক প্রেম
ব্যাকরণের সংজ্ঞা ভাবা ভুল
এবং প্রাণে দুর্বিনীত ক্ষেম
দর্পহারীর হ'ল চক্ষুশূল।'

'আমার জেনো কর্মবাদী প্রাণ
গীতায় খোঁজে প্রেমের অনুপ্রাস
এবং দর্পহারীর তাতে টান
ঝঞ্ঝা এনে দেখায় হেত্বাভাস।'

(দর্পহারী)

ষ্টচরের' কবির জীবনবেদ পাঠক এখানেই আবিষ্কার করতে পারেন। জীবনসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে বর্তমান কবির দৃষ্টির প্রসার স্বতন্ত্র এবং নিজস্ব এবং পরন্তু কিঞ্চিৎ ব্যাপক বলেই তাঁর ভবিষ্যৎ কবিতাবলীর প্রতি, আশাকরি, বাংলা কাব্যপাঠক উৎসাহ প্রকাশ করবেন। শব্দবিন্যাস, ছন্দ, পংক্তি যোজনা এবং ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে তিনি শ্রদ্ধেয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রীবিষ্ণু দে'র কাব্যভাবনাকে অনুসরণ করেছেন—প্রয়োগরীতির মাধ্যমেই কবির অনুসৃত কাব্যপথরেখাকে পাঠক হয়তো সহজেই চিনে নিতে পারবেন।

'অদৃষ্টচরের' কাব্য আঙ্গিক আধুনিক এবং সাম্প্রতিক মননশীলতার আবছায়ায় লালিত। বর্তমান সঙ্কলনে বিগত ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত মোট পাঁচ বছরের কবিতাবলী সংযোজিত হয়েছে। 'অদৃষ্টচরের' মুদ্রণ সুন্দর তবে অঙ্গসজ্জা সাধারণ॥

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

Statement in Form IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

SAMAKALIN

1.	Place of Publication	Calcutta.
2.	Periodicity of its Publication	Monthly.
3.	Printer's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhe Road, Calcutta.
4.	Publisher's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
5.	Editor's Name	Anandagopal Sengupta.
	Nationality	Indian.
	Address	24, Chowringhee Road, Calcutta.
6.	Names and address of individuals who own the newspapers and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.	Anandagopal Sengupta. *Proprietor.* 24. Chowringhee Road, Calcutta-13.

I, Anandagopal Sengupta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Publisher.

Dated, 1st March, 1964. (Sd.) A. G. Sengupta.

সমকালীন

একাদশ বর্ষ ॥ চৈত্র ১৩৭০

AMBASSADOR faces the futur with a broader outlook !

The re-styled radiator grille gives the new Ambassador a face-lift matching her numerous other attractive features. For, mark you, her face is not her only good fortune. With new front and rear bumper over-riders, the "Mark II" flash on each front wing, side-lights placed at the base of the grille, improved front-seat design, addition of two-tone trim, ash trays for the front and rear seats and at the centre of the facia panel, new designs for the roof lining and door trim pads and provision of the HM emblem at the bottom centre of the rear glass, the new Ambassador presents a definite new look.

With graceful modern styling, spacious comfort, a powerful 1489 c.c. O.H.V. engine and modest fuel consumption, the Mark II boasts of beauty as enchanting as her performance.

the old favourite with the new look

THE NEW AMBASSADOR MARK II

HM

HINDUSTAN MOTORS LTD., CALCUTTA-1.

বিপুল সংখ্যক চীনাবাহিনী এখনও আমাদের
উত্তর সীমান্তে রয়েছে। সতর্ক থাকুন।

আপনাদের শৃঙ্খলাই ভারতের শক্তি

IDA-63/F-18E

॥ সদ্য প্রকাশিত ॥

ডঃ অসিতকুমার হালদার ॥ **রূপদর্শিকা** ১০·০০ রণেন্দ্রনাথ দেব ॥ **কবি স্বরূপের সংজ্ঞা** ৪·০০

॥ বৈষ্ণব সাহিত্য ॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু ॥ **চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি** ১২·৫০ ডঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতি ॥ **চৈতন্য পরিকর** ১৬·০০

॥ রবীন্দ্র সাহিত্য ॥

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
রবীন্দ্রসাহিত্যে পদাবলীর স্থান ৬·০০

ডঃ ক্ষুদিরাম দাস
রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয় ১০·০০

ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত
রবীন্দ্রনাথের রূপক নাট্য ১০·০০

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী ৫·০০

ধীরানন্দ ঠাকুর
রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা ১২·০০
রাবীন্দ্রিকী ৪·৫০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ ৪·০০
রবীন্দ্র অভিধান ১ম, ২য়, ৩য়
প্রতি খণ্ড ৬·০০

॥ মনোরম সমালোচনা ॥

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
বিষ্ণুপুর ঘরাণা ৫·০০

মোহিতলাল মজুমদার
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ১০·০০

শিশির দাশ
মধুসূদনের কবি মানস ২·০০

অহীন্দ্র চৌধুরী
বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরীশচন্দ্র ৫·০০

সোমেন্দ্রনাথ বসু
বিদেশী ভারত সাধক ৩·৫০

ধীরানন্দ ঠাকুর
বাংলা উচ্চারণ কোষ ৩·০০
গোপালদাস চৌধুরী

এস. কে. দে
পঞ্চাশোর্ধ্বেতী রাজ ৭·০০

প্রিয়তোষ মৈত্রেয়
অনুন্নত দেশের অর্থনীতি ৫·২৫

প্রিয়রঞ্জন সেন
প্রবাদ বচন ৬·০০

বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১, শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬

একাদশ বর্ষ ১২শ সংখ্যা

চৈত্র তেরশ' সত্তর

সমকালীন : প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

চৈত্র
তেরশ' সত্তর

একাদশ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

বাংলায় বিদেশী

চণ্ডী লাহিড়ী

পর্তুগীজ পদচিহ্নের সন্ধানে

একটি সর্বজনবিদিত কারণে এদেশে পর্তুগীজদের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা অস্বস্তিকর। রাজনীতিকের আস্ফালন বা দেশপ্রেমিকের আবেগকে প্রশ্রয় দিলে ইতিহাসের ছাত্রকে সত্যনির্ণয়ে বেগ পেতে হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহে পর্তুগীজদের ভূমিকা কোথায় সেটা নির্ণীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনস্বীকার্য যে, তারাই প্রথম ইউরোপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছিল। তারাই ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন বন্দরের মধ্যে ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের জন্য গড়ে' তুলেছিল এক ভাষা-মাধ্যম বা Lingua franca (সমকালীন, আষাঢ়, ১৩৭০, লেখকের নিবন্ধ। বিদেশীদের চোখে দেশীভাষা)। আর ইউরোপের বিভিন্ন দেশ প্রথম দিকে ভারতবর্ষকে দেখেছিল পর্তুগীজদের চোখ দিয়ে। তারাই ডাচ, ইংরেজ, ফরাসী ও ইতালীয়ানদের সম্মুখে ভারতের এক মনোহর ছবি তুলে ধরে বলেছিল—রম্যাণি বীক্ষ্য।

আর আমরা গৌরবর্ণের বাঙ্গালীরা? আমরাই কি জানতাম ভারতবর্ষ নামক দেশটি এত বৃহৎ! তামিল, তেলেগু, মালয়ালী, গুজরাটী এমন কি সিংহলী মলক্কা বা সুমাত্রায় প্রচলিত বিভিন্ন শব্দও পর্তুগীজদের কণ্ঠে কিঞ্চিৎ বিকৃত হয়ে পৌছাল আমাদের কানে। পেলাম ব্যঞ্জনাময় নতুন শব্দ। গদ্যসাহিত্যে তো দূরগগনবিহারী নীহারিকা, কবিতাও তখন পর্যন্ত কেবল পদাবলী, পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের ধরাবাঁধা কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে সাহিত্যে সেই নতুন শব্দ প্রবেশপত্র পেল না। কেবল লোকমুখে ব্যবহারিক প্রয়োজনে চলতে সুরু করল। কালক্রমে পূর্বপ্রচলিত দেশজ শব্দের চেয়েও নূতন শব্দ বক্তব্য প্রকাশের কাজে জোরালো বলে মনে হল। ফলে নতুন শব্দ

দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী বধূর মত ঘর আলো করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলল। পূর্বপ্রচলিত শব্দকে পরে আর অভিধানের বাইরে খুঁজে পাওয়া গেল না।

বাংলা দেশে চৈতন্যদেব তখন সম্ভূত। পাঠান-শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলন পুরোদমে চলছে। অধর্ম অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র ভাগবত প্রতিশ্রুতিতে তখন বাঙ্গালীর অটুট বিশ্বাস। কাজেই গৌরাঙ্গদেবের তিরোভাবের পর যখন দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্রে, দীর্ঘশ্মশ্রু নতুন গোরাদের আবির্ভাব হল তখন সেই বিদেশী নাবিকদের মুক্তিদূত বলে কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিলেন। তার প্রমাণ, সেবাস্তিও গন্‌জালেসের সন্দীপ আক্রমণের সময় হিন্দুদের সহযোগিতা। জয়লাভের পর গন্‌জালেস হিন্দুদের হুকুম দিয়েছিলেন—মূরদের (পাঠানদের) মাথা চাই।

ইংরেজ শাসনে লালিত আমাদের পক্ষে এদেশে পর্তুগীজ-ভূমিকার মূল্যায়ন করার আগে আরও কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। মনে রাখতে হবে, ইংরেজ ও পর্তুগীজ গাত্রবর্ণে এক হলেও তাদের জাতি-চরিত্র ভিন্ন উপাদানে তৈরী। ইংরেজ-বংশোদ্ভূত যে সব এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এদেশে বসবাস করে তারা নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করত। কারণ বৃটেনের চোখে ভারত ছিল উপনিবেশ, শোষণক্ষেত্র। ভারতীয় ও ইংরেজের রাজনৈতিক অধিকার সমান ছিল না। বৃটিশ পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভারতীয়দের কোনদিন ভোটাধিকার ছিল না। কোন ভারতীয়ের পক্ষে বৃটিশ ক্যাবিনেটের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখাও ছিল অপরাধ। প্রতিষ্ঠার প্রতিধাপে অসংখ্য কানুনী বেড়াজাল পদে পদে স্মরণ করিয়ে দিত—তুমি ভারতীয় অতএব নিকৃষ্ট। আমার সমকক্ষ হওয়ার অনধিকারী। ফলে বৃটিশ নাগরিকের সমকক্ষ হওয়ার মোহে, ততোধিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা ভারতকে মাতৃভূমি বলে স্বীকার করেনি। বৃটিশ ডেমক্রেসি কেবল বৃটিশ সিটিজেন্‌দের জন্য, তার উপনিবেশবাসীদের জন্য সে দরওয়াজা মুক্ত ছিলনা কোনদিন।

কিন্তু ফ্রান্স? পর্তুগাল? অন্ততঃ বৃটেনের চেয়ে তারা উদার। উভয়েরই গণতন্ত্র কেবল ওষ্ঠবিধৃত বুলি নয়, বক্ষনিবদ্ধ বিশ্বাস। ফ্রান্সের চোখে চন্দননগর বা পণ্ডিচেরী ছিল উপনিবেশ। যেমন ছিল ইন্দোচীন, ভিয়েৎনাম, তিউনিসিয়া, মরক্কো বা আলজিরিয়া। কিন্তু প্রত্যেক উপনিবেশবাসীর ফরাসী পার্লামেন্টের নির্বাচনে ভোটাধিকার ছিল। উপনিবেশের আয়তন, লোকসংখ্যা ও গুরুত্ব অনুযায়ী ফরাসী মন্ত্রীসভায় পূর্ণ মন্ত্রীরূপে উপনিবেশের নাগরিককে গ্রহণ করা হয়েছে। সেদিন পর্যন্ত একজন কৃষ্ণকায় আলজিরিয়ান ফরাসী মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। পর্তুগাল কোনদিন গোয়া দমন দিউ বা চীনের মাকাউকে উপনিবেশ বলে মনে করেনি। এসবই তাদের মূল ভূখণ্ডের এক একটি প্রদেশ। খাস লিসবনের নাগরিক যে সুযোগ-সুবিধার অধিকারী, গোয়া বা মাকাউএর নাগরিক ঠিক সেই সুযোগ-সুবিধার অধিকারী এবং গোয়াতেও তাই ছিল। সালাজার ডিক্টেটর হওয়ার পূর্বপর্যন্ত গোয়ার অধিবাসীরা নিজেদের কোনদিন পরশাসিত বলে মনে করেনি। ভারত শোষণ করে বৃটেনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, ভারত নিমজ্জিত হয়েছে সর্বনাশা দারিদ্র্যের মধ্যে। সেই ভারতেরই অপর অংশ গোয়া। চারশো বছর পর্তুগীজ অধিকারের পরও গোয়ার

ধনৈশ্বর্য ক্রমবর্দ্ধমান। বরং লিসবনও গোয়ার ঐশ্বর্যের তুলনায় ম্লান। ইংরেজ গভর্নর, আই-সি-এস্‌রা কর্মজীবনের শেষে খাস গ্রেট বৃটেনে নিরুপদ্রব অবসর-জীবন কাটাবার স্বপ্ন দেখত। কিন্তু গোয়ার পর্তুগীজ রাজ-কর্মচারী চাকরী শেষ করে অবসর জীবন গোয়াতেই কাটিয়েছে। গোয়াতেই দেহরক্ষা করেছে এমন নজীর বহু আছে। আর, এ কারণেই ইংরেজবংশোদ্ভূত এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মত পর্তুগীজ-বংশোদ্ভূত ফিরিঙ্গিরা এদেশে হীনমন্যতায় ভোগেনি। পর্তুগালের নাগরিক ও পর্তুগালের ভোটার হওয়া সত্বেও তারা ভারতকে মাতৃভূমি বলে চিরদিন মনে করেছে। নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিলে চাকরী হারাবার যখন ভয় নেই, বা চাকরী প্রাপ্তিতেও কোন অসুবিধা নেই তখন মাতৃভূমিকে অস্বীকার করবে কেন? বরং গোয়ার অধিবাসী শুনলে লিসবনের সাধারণ পর্তুগীজরা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়মিশ্রিত চোখে চেয়ে দেখত। গোয়ার ঐশ্বর্য লিসবনের ঈর্ষা।

পর্তুগীজদের ধারণা ছিল, ধর্মের দিক থেকে একীকৃত হলে গোয়ানীজরা নিজেদের কালক্রমে পর্তুগীজ বলে মনে করবে। দেখা গেল সে ধারণা ভুল। ধর্মে রোমান ক্যাথলিক হয়েও, চার্চের প্রতি আনুগত্য অক্ষুন্ন রেখেও তারা পর্তুগালের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছে এমন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নাম মনে পড়েনা কিন্তু পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেছে এমন ফিরিঙ্গি ও ক্যাথলিক গোয়ানিজ একটি নয়, বহু।

আবার মূল আলোচনায় ফিরে আসি। বৃটিশ শাসনাধীনে থাকায় শাসক জাতির ভাষার বহু শব্দ যে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু ইংরেজরা যে অর্থে বাংলাদেশের শাসক ছিল, পর্তুগীজরা সে অর্থে বাংলদেশ শাসন করেনি কোনদিন। তবু তাদের ভূমিকা ছিল বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাত্ম সাধনে উৎসাহী, ঐহিক সুখবিমুখ ভাগ্যবাদী একটি দেশকে পর্তুগীজরা বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার দিকে আকর্ষণ করেছিল। পাঠানদের বঙ্গদেশ আক্রমণ ও লক্ষ্মণসেনের নদীয়া ত্যাগের (১২০৩) পর থেকেই গৌড়বঙ্গের অধিবাসীরা ভাগ্যবাদী হয়ে পড়ে। চৈতন্যদেবের মধ্য দিয়ে তারা সর্বপ্রথম নৈতিক বিশ্বাস খুঁজে পায়। ক্লৈব্য পরিত্যাগ করবার, অধ্যাত্মবাদের নামে জাগ্রত বর্তমানকে অস্বীকার করবার প্রবণতাকে পরিহার করবার প্রেরণা যোগালেন চৈতন্যদেব। তারপরই এল পর্তুগীজরা, ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে। তারা যে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করেছিল সেটা অনেক পরের ঘটনা। আঠারো শতকের শেষদিকে ব্যবসা-ঘাঁটিগুলো হাতছাড়া হওয়ার পর অনেকেই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে।

পর্তুগীজ শব্দ এদেশীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে প্রধানত তাদের ব্যবসা ও ধর্মপ্রচারের মাধ্যমে। ডাচরা সিংহলে খুবই ক্ষমতাবান ছিল ব্যবসার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতাও তাদের কম ছিল না। তবু সেখানে আজ আর ডাচ শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। পর্তুগীজ শব্দ সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়। বাংলা ভাষাতেও ডাচ শব্দ এত সামান্য যে উপেক্ষা করা চলে। অথচ পর্তুগীজরা পর্যুদস্ত হওয়ার বহুদিন পরেও এদেশে ডাচরা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে।

বাংলাভাষায় পর্তুগীজ শব্দের ব্যাপক অস্তিত্বের প্রধান কারণ, পর্তুগীজ বংশোদ্ভূতদের বৃহৎ অস্তিত্ব। ভারতের বিভিন্ন ঘাঁটীতে কর্মরত পর্তুগীজদের গোয়ার গভর্নর আলফান্সো আলবুকর্ক

নির্দেশ দিয়েছিলেন দেশী মেয়েদের বিয়ে করে পর্তুগীজদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। ফলে পর্তুগীজরা ব্যাপকভাবে দেশী মেয়ে বিয়ে করেছে নির্দ্বিধায়। সত্য যে, উচ্চবংশীয় কন্যাদের নাগাল তারা পায়নি। অপেক্ষাকৃত নিম্নবর্ণের যেসব কন্যা তারা বিয়ে করেছিল তাদের সন্তান-সন্ততিরা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, পিতৃকুলের ভাষাও শিখেছিল। ইংরেজ পিতৃকুল তাদের ভারতীয় পত্নী ও পুত্রকন্যাদের অনিশ্চয়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করে সাগরপারে চলে যায়। কিন্তু পর্তুগীজরা নিজেদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। নিজেদের সামান্য সামর্থ দিয়ে পুত্রকলত্রের প্রতি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে। এই যে নতুন মিশ্র সমাজ, ক্যাথলিক ধর্ম ও পর্তুগীজ ভাষার দ্বারা সুসংবদ্ধ নরনারীর দল তারাই বাংলাদেশে পর্তুগীজ ভাষাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। উন্নাসিক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পল্লীতে বাস করলেও সেখানে তারা কোনদিন মর্যাদা পায়নি। ইংরেজী তারা চাকরীর লোভে ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রতিবেশীত্বের জন্য শিখে নিয়েছে কিন্তু অন্ত-সলিলা ফল্গুর মত গৃহের নিভৃতে চর্চা করেছে পর্তুগীজ ভাষার—তাদের পিতৃভাষা।

তৃতীয় কারণ, পর্তুগীজ মিশনারীদের কার্যকলাপ। পর্তুগীজ মিশনারীদের খৃষ্টধর্মপ্রচার ও ও পর্তুগীজ ভাষা প্রচারের ইতিহাস প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতকে বা আরবীকে যেমন ইস্লামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখার রেওয়াজ আছে, তেমন প্রথম দিকে খৃষ্টধর্মের ভাষা হিসাবে পর্তুগীজ ভাষাকে দেখা হত। ইওরোপীয় সংস্কৃতির সেরা মাধ্যম হল পর্তুগীজ—এমন ধারণা ছিল বহুদিন পর্যন্ত। খৃষ্ট ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় দ্রব্যাদির কোন বাংলা প্রতিশব্দ ছিলনা। ফলে পর্তুগীজ শব্দগুলিকেই ব্যবহার করতে হয়েছে। আবার গীর্জাকে গীর্জা না বলে মন্দির বললে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তার পার্থক্য লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সেজন্য গীর্জাকে বাংলা ভাষায় গীর্জাই রাখা হল। পরবর্তীকালে রোমান, জার্মান বা অন্য দেশের মিশনারীরা যখন এলেন তাঁরাও কাজের সুবিধার জন্য পর্তুগীজ শব্দগুলিকেই ব্যবহার করতে থাকলেন। নচেৎ নতুন শব্দ ব্যবহার করলে দেশীয় লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। খাস কলকাতায়, যেখানে ইংরেজী ভাষার এমন প্রবল প্রতাপ, সেখানে ইংরেজ মিশনারীরাও পর্তুগীজ শব্দ ব্যাপকভাবে আজও ব্যবহার করে থাকে। অবশ্য শিক্ষিত দেশী খৃষ্টানদের নিয়ে কোন অসুবিধা হবার কারণ ছিল না। তাদের শব্দের চেয়ে শব্দের তাৎপর্যই ছিল গ্রহণীয়। ভয় অহেতুক নয়। হিন্দুরা যে রকম উদার বা কৌশলী তাতে দশাবতারের পর একাদশ অবতার হিসাবে যিশুর নামেও স্তোত্র রচনা করে ফেলবে। মিশনারীদের সব চেষ্টা তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে। তবে পর্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করাই নিরাপদ। কাজেই cruz (cross) ireja (church) alter, Padree, Cassar (Marry) Papa (Pope) Bispo (Bishop) arcebispo (Arch Bishop) Arvento (Advent), Pascoa (Easter) ইত্যাদি শব্দগুলি প্রচলিত। চার্চের বিভিন্ন ব্যাপারে পর্তুগীজ শব্দাবলী আজও প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

কলকাতা বোম্বাই মাদ্রাজের মত কসমোপলিটন সহরে যে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংরেজী ভাষা চালু আছে তার অনেক শব্দই খাস গ্রেটবৃটেনে পাওয়া যায়না। সকলেই জানেন কিছু আঞ্চলিক কিছু ভিন্‌দেশী শব্দ ও উচ্চারণকৌশলে অভিনব হয়ে প্রত্যেক উপনিবেশে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ ইংরেজী

ভাষা গড়ে উঠেছে। ভারতে এই সঙ্কর ভাষা এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইংলিশ। তার মধ্যে পর্তুগীজ শব্দ অনেক। বহু শব্দ পর্তুগীজরা এদেশ থেকে আহরণ করে এশিয়ার অন্যান্য দেশে এবং ইওরোপেও চালু করেছিল। পরবর্তীকালে সেই সব শব্দ বিকৃত উচ্চারণসহ পুনরায় যখন ভারতে ফিরে এল তখন তাকে চেনা দায়। সেই শব্দকে ইংরেজী শব্দ মনে করে গ্রহণ করেছি।

ইওরোপের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বহু নতুন দ্রব্য ভারতে আমদানী হল। নতুন জিনিস, কাজেই তার নামটাও ধার নেওয়া হল। সংস্কৃত দেবভাষা হলেও নতুন বিশ্বের বহু নতুন দ্রব্য কালিদাস-ভবভূতিরা চোখে দেখেননি। কাজেই লিখেও যাননি। কিছু শব্দ অর্ধ-পরিচিত কিছু একেবারে অপরিচিত। যেমন আলমারী, বোতাম, ফিতা, বালতি। কোন কোন শব্দ প্রথম দিকে চালু ছিল পরে অনুরূপ ভাবপ্রকাশক্ষম দেশী শব্দ এসে তাকে বেদখল করে বসেছে।

অনেকসময় দেশীশব্দ থাকাসত্ত্বেও আভিজাত্যের বা উৎকর্ষের পরিচায়ক হিসাবে বিদেশী শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন Pao (পাঁওরুটি) tronco (ট্রাঙ্ক বা সুটকেস), copo (কাপ), mestre (মিস্ত্রী বা মাষ্টার)।

আবার অনেক শব্দ নিছক উচ্চারণের সুবিধার্থ ব্যবহৃত হয়। অবশ্য বক্তব্যও এতে বেশ সহজে প্রকাশ করা যায়। যেমন bacio (বাসন) banco (বেঞ্চ) grade (গারদ) Toalha (তোয়ালে)।

বহু এশীয় শব্দ পর্তুগীজরা এদেশ থেকেই ইওরোপে ও অন্যত্র রপ্তানী করছে। যেমন আচার, ছিট, গুদাম, পিরিচ ইত্যাদি। আচার মূল পারসিক শব্দ। পর্তুগীজরা মালয়ে শব্দটি শোনে এবং স্বদেশে নিয়ে যায়। ছিট মূল সংস্কৃত 'চিত্র' থেকে হিন্দুস্থানী চিট বা ছিঁট, তার থেকে পর্তুগীজ chintz হল এবং ইওরোপে রপ্তানী হল। গুদাম শব্দটি আসলে মালয়ী গাডোং বা তামিল গিডঙ্গী থেকে পর্তুগীজরা পেয়েছে, আমরা পর্তুগীজদের কাছ থেকে gudao শুনে গুদাম করলাম। স্মরণ রাখতে হবে, মালয়, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে বহুদিন থেকে দক্ষিণভারতীয়েরা বসতি স্থাপন করে ব্যবসাবাণিজ্য চালাচ্ছে। ফলে দক্ষিণ ভারতীয় শব্দ যদি সেই সব দেশে পাওয়া যায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

আনন্দরাম বরুয়া

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে আসামের উত্তর গৌহাটি পল্লীতে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ পরিবারে আনন্দরামের জন্ম হয়। ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরস্থ এই উত্তর গৌহাটি জনপদের অপর পারেই কামরূপ জেলার প্রধান শহর গৌহাটি অবস্থিত। খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে অহোম নৃপতি চুখামপার রাজত্বকালে দুর্গাচরণ বসু নামে বঙ্গদেশাগত এক ব্যক্তি চুখাম্পার বিশেষ প্রীতি অর্জন করেন। ইহার বিদ্যা-বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া চুখাম্পা ইহার নূতন নাম দেন মানিকচন্দ্র বরকাকতি। রাজকার্যের পুরস্কার স্বরূপ চুখাম্পা ইহাকে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। কালক্রমে এই পরিবার "মাজিন্দার বরুয়া" নামে পরিচিত হয় ও অসমীয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। মানিকচন্দ্র নিজে অহোম রাজধানী গড়গাঁও-এ বাস করিতেন। তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ গর্গরাম উত্তর গৌহাটিতে বসবাস করেন। ইনি আসামে বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে সদর আমিন (মুন্সেফ) এর পদ প্রাপ্ত হন। আনন্দরাম বরুয়া এই গর্গরাম বরুয়ার তৃতীয় পুত্র। সাত বৎসর বয়সের সময় আনন্দরামের মাতৃবিয়োগ হয়। গর্গরাম সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুত্রগণকে বাড়ীতে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিকট প্রাচীন প্রথায় সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া আনন্দরাম বাল্যকালেই সংস্কৃতে পারদর্শী হন। উত্তর গৌহাটি ও গোয়ালপাড়া বিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করার পর আনন্দরাম গৌহাটি হাই স্কুলে দুই অগ্রজ ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন করেন এবং এই স্কুল হইতেই ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে গৌহাটিতে কোন কলেজ না থাকায় আনন্দরাম কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত প্রভৃতি উত্তরকালের কৃতি ব্যক্তিগণ আনন্দরামের সহাধ্যায়ী ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে পাঠানুরাগ, মেধাশক্তি ও স্বভাব মাধুর্যের জন্য আনন্দরাম শিক্ষক ও সহপাঠীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্গগৌরব ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অধ্যাপকবৃন্দ ও অধ্যক্ষ মিঃ সাটক্লিফ্ জেমস এই তরুণ অসমীয়া বিদ্যার্থীকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম ষষ্ঠস্থান অধিকার পূর্বক এফ, এ, পাশ করেন, গণিতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার জন্য তিনি ডাফ্ স্কলারশিপও লাভ করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে বি, এ, পাশ করেন। ইতিপূর্বে তাঁহার সহপাঠী রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত এবং তাঁহার কলেজের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র উত্তরকালের দেশ-বিখ্যাত জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস্ হইবার জন্য ইংল্যাণ্ড গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কলেজের এই তিনজন কৃতী ছাত্রের দৃষ্টান্তে আনন্দরামের মনেও আই, সি, এস পড়িবার জন্য ইংল্যাণ্ডে যাত্রার বাসনা জন্মে। আনন্দরামের পিতা রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিলেন, ইংল্যাণ্ড যাত্রার জন্য তাঁহার সম্মতি ও অর্থ সাহায্য পাওয়া সহজ হইবে না বুঝিতে পারিয়া

আনন্দরাম পরীক্ষা দিয়া Gilchrist বৃত্তি অর্জন করেন। তাঁহার হিতৈষী শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে তাঁহাকে সরকারী বৃত্তি (স্টেট স্কলারশিপ) পাইতেও সাহায্য করেন। এই দুইটি বৃত্তি পাইয়া ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে আনন্দরাম নিশ্চিন্ত মনে অধ্যয়নার্থ ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া পর বৎসর আনন্দরাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি শ্রেণীতে ভর্তি হন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মিডিল টেম্পলে আইন অধ্যয়ন করিতে ও আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে আনন্দরাম কৃতিত্বের সহিত আই, সি, এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এই পরীক্ষায় গণিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বার-য়্যাট-ল শ্রেণীভুক্ত হন। ইতিমধ্যে আনন্দরাম লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এস-সি ডিগ্রীও অর্জন করিয়াছিলেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে আনন্দরাম প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ থিওডোর গোল্‌ষ্টুকর, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতদের প্রীতিভাজন হন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগে আনন্দরাম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও আসামের শিবসাগরে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কার্যে যোগদান করেন। আনন্দরামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময়ে আনন্দরামের পিতা জীবিত ছিলেন। আসামের মধ্যে আনন্দরামের পূর্বে বা পরে কেহই আই সি এস হন নাই, অসমীয়যুবকদের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট ও ব্যারিস্টার হন। কৃতিপুত্রের সাফল্যে আনন্দরামের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যে বিশেষ হৃষ্ট হইয়াছিলেন ইহা বলাই বাহুল্য। আনন্দরামের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরই তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন।

আসামে কিছুকাল চাকুরী করার পর আনন্দরাম বিশেষ চেষ্টা করিয়া বাঙ্গলাদেশে বদলী হইয়া আসেন সম্ভবতঃ আসামের বাতাবরণ তাঁহার ভাল লাগে নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবসাগর হইতে বদলী হইয়া আনন্দরাম মৈমনসিং, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান প্রভৃতিস্থানে সহকারীম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করেন।

বাল্যাবধি আনন্দরাম সংস্কৃত ভাষার একান্ত অনুরাগী ছিলেন, ছাত্রাবস্থায় স্বদেশে ও বিদেশে সর্বদাই তিনি সংস্কৃত ভাষার চর্চা করিতেন—এই ভাবে তিনি সংস্কৃত ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া আনন্দরাম প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া সংস্কৃত মুদ্রিত পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ করিতেন এবং রাজকার্যের অবসরে যতটুকু সময় পাইতেন তাহা অধ্যয়নেই ব্যয়িত করিতেন। কর্মে প্রবেশ করিয়া তিনি একটি ইংরাজী সংস্কৃত অভিধান সঙ্কলন আরম্ভ করেন, এই অভিধানটির প্রথম খণ্ড ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (১)। এই অভিধানটি প্রকাশিত হইলে উহা স্বদেশের ও বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক বিশেষরূপে সমাদৃত হয়। একজন তরুণ বয়স্ক অথচ গুরুদায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা কিভাবে এইরূপ একটি অভিধান রচনা সম্ভব ইহা চিন্তা করিয়া সকলেই বিস্মিত হন। এই বৎসরই আনন্দরাম ভবভূতি রচিত মহাবীর চরিত্রম্-এর একটি সুসম্পাদিত সংস্করণ নিজকৃত "জানকীরাম" ভাষ্য সহ প্রকাশ করেন (২)।

আনন্দরাম তাঁহার পরলোকগত মধ্যমাগ্রজ জানকীরামের স্মৃতি স্মরণীয় রাখিবার জন্যই নিজকৃত ভাষ্যটির জানকীরাম ভাষ্য নামকরণ করেন। আনন্দরাম সম্পাদিত "মহাবীর চরিতম্" প্রকাশের পরই কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উহা পাঠ্যরূপে মনোনীত হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে আনন্দরাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ, এ ও বি, এ

পরীক্ষার্থীদের জন্য একটি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে মেঘদূত, কুমার সম্ভব, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ প্রভৃতি হইতে পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট অংশগুলির টিকা টিপ্পনী সহ সরল ব্যাখ্যা সনিবিষ্ট হইয়াছিল (৩)। এই পুস্তকটি সংস্কৃত শিক্ষার্থী ছাত্রদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। এই পুস্তকটি প্রকাশের পর আনন্দরাম কবি ভবভূতি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার স্থান সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ প্রকাশ করেন (৪)। এই বৎসরই আনন্দরাম প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সহ জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পদে উন্নীত হন। এই সময়েই তাঁহার ইংরাজী সংস্কৃত অভিধানের ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডে আনন্দরাম তাঁহার রচিত একটি অভিনব সংস্কৃত ব্যাকরণ সংযোজিত করেন, সংস্কৃত ভাষার লিঙ্গ ও বাক্য বিন্যাস রীতি আলোচিত হয়, এই পুস্তকে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট উদ্ধৃতি ইংরাজী অনুবাদ সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। মৌলিক সংস্কৃত রচনায় শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষিতদের উৎসাহিত করার জন্যই সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহশীল আনন্দরাম এই পুস্তক রচনা করেন। পর বৎসর এই ব্যাকরণটি পৃথক পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম রচিত সংস্কৃত অভিধানের শেষ ৩য় খণ্ডটি প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের ভূমিকা স্বরূপ আনন্দরাম প্রাচীন ভারতের ভূগোল বিষয়ে একটি অতি মূল্যবান গবেষণামূলক ইংরাজী নিবন্ধ সংযোজিত করেন। ইতিপূর্বে সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ব্যতীত প্রাচীন ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে কেহ আলোচনা করেন নাই। কানিংহামের আলোচনা প্রধানতঃ হিউএন চ্যাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছিল, আনন্দরামের আলোচনার কাল ও পরিসর আরও বিস্তৃত ছিল। আনন্দরামের অভিধানটি দেশে ও বিদেশে সকল সংস্কৃতানুরাগীরই প্রশংসা অর্জন করে। এই পুস্তক রচনার জন্য ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থব্রুক, পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমুল্যার প্রভৃতি আনন্দরামকে অভিনন্দিত করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে ইতিপূর্বে প্রকাশিত সার মনিয়ার উইলিয়মস্ রচিত ইংরাজী সংস্কৃত অভিধানটি অপেক্ষা আনন্দরামের অভিধান আরও উপাদেয়।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম প্রতিখণ্ডে সহস্র পৃষ্ঠাযুক্ত দ্বাদশখণ্ডে একটি সুবৃহৎ পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার পরিকল্পনা করেন। তিনি স্থির করেন ইহাতে ব্যাকরণের নিয়মগুলি সরলীকৃত করা হইবে, এই নিয়মগুলির কালানুক্রমিক পরিবর্তনের ইতিহাস আলোচিত হইবে, নিয়মগুলির উদাহরণ প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উদ্ধৃত হইবে এবং ইহাতে সমগ্র বেদেরও ভাষ্য করা হইবে। এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে প্রথমে কিছুদিন সরকারী কর্ম হইতে ছুটি লইয়া আনন্দরাম কলিকাতায় আসেন এবং কলিকাতায় বাগবাজারে স্বীয় ভ্রাতার নামে একটি মুদ্রণালয় স্থাপন করেন ও একটি বাটী ক্রয় করেন। এই সঙ্গে বহরমপুর শহরেও তিনি একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। পরিকল্পিত ব্যাকরণ প্রকাশের জন্যই তিনি দুইটি স্থানে দুইটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করিয়া প্রেস স্থাপন করেন এবং কর্মচারী রাখিয়া এইগুলি পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। ইহার পর দীর্ঘদিনের ছুটি (ফার্লো) লইয়া আনন্দরাম তাঁহার ব্যাকরণ রচনার উপাদান সংগ্রহের জন্য ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, অক্সফোর্ডের বডলেয়ন লাইব্রেরী ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী হইতে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে আনন্দরাম স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং চট্টগ্রামে

জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টররূপে সরকারী কার্যে যোগদান করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম পরিকল্পিত ব্যাকরণের দশম খণ্ডটিই প্রথমে প্রকাশিত হয়। 'ছন্দ' সম্পর্কীয় এই গ্রন্থে পিঙ্গলসূত্র এবং শৌনকঋক্ প্রতিশাক্য, আগ্নেয় ছন্দসার, নারায়ণ ভট্ট টিকাসহ কেদারভট্ট রচিত বৃত্তরত্নাকর প্রভৃতি ছন্দশাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি অতি পাণ্ডিত্য সহকারে ব্যাখ্যাত হয়। এই ব্যাখ্যানের সহিত ছন্দসম্পর্কিত ১৪১ পৃষ্ঠাব্যাপী ইংরাজী ভূমিকাটিও এই খণ্ডের গৌরব বর্দ্ধন করে (৫)। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম বামন, বাগ্‌ভট্ট ও ভোজরাজ প্রণীত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ নামক অলঙ্কারশাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থত্রয় সম্পাদন করিয়া একত্র প্রকাশ করেন (৬)। পরবৎসর সরস্বতী কণ্ঠাভরণ পৃথক ভাবেও প্রকাশিত হয় (৭)। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম নোয়াখালির জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্টার পদে উন্নীত হন। ইহার পূর্বেও তিনি অস্থায়ীভাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করেন। ভারতীয়দের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে কার্য করিবার গৌরব আনন্দরামই প্রথমে লাভ করেন। আনন্দরামের অল্পকাল পর রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত মহাশয়দ্বয়ও এই সম্মান লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আনন্দরামের সংস্কৃত ব্যাকরণের পরবর্তী খণ্ড তৃতীয় খণ্ডরূপে "নানার্থ সংগ্রহ" নামে ৫৩ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ ইংরাজী ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে অমরকোষ, বিশ্ব প্রকাশ (মহেশ্বর), হেমচন্দ্র, হলায়ুধ, ত্রিকাণ্ড শেষ, হারাবলী, মেদিনী, মাতৃকা শেষ প্রভৃতি প্রচলিত ও অপ্রচলিত কোষ গ্রন্থ হইতে শব্দের রূপান্তর দৃষ্টান্ত সহ পর্যালোচিত হয়। আনন্দরাম পরিকল্পিত দ্বাদশ খণ্ড ব্যাকরণের মধ্যে দুইটি খণ্ডই প্রকাশিত হইয়াছিল। পরিকল্পিত অপর দশটি খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারে নাই।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আনন্দরাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। এই সময় জগতের একজন প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ ও জ্ঞানসাধক রূপে তিনি সর্বত্রই স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে আনন্দরাম নাম-লিঙ্গানুশাসন (৮) ও ধাতুবৃত্তিসার নামে দুইটি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া প্রকাশ করেন (৯)। নামলিঙ্গানুশাসন গ্রন্থটিতে অমরসিংহ রচিত অমরকোষ ক্ষীর স্বামী ও বৃহস্পতি রায় মুকুটের টিকা সহ সন্নিবিষ্ট হয়। ধাতুবৃত্তিসার গ্রন্থে দুর্গসিংহ রচিত কাতন্ত্রগবৃত্তি রামনাথ রচিত মনোরমা ভাষ্য সহ মুদ্রিত হয়। পরবৎসর আনন্দরাম ধাতুপাঠ বা ধাতুকোষ নামে আর একটি পুস্তক প্রকাশ করেন, ইহাতে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত ভাষার সকল ধাতুর অর্থ দেওয়া হয়, প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণগুলির ধাতুসম্বন্ধীয় অংশের সারাংশও এইগ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছিল (১০)।

আনন্দরাম কর্তৃক রচিত পুস্তকাবলীর পরিচয় লইতে হইলে লক্ষ্য করা যায় তাঁহার সারস্বত সাধনার লক্ষ্য ছিল সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ ব্যাকরণের প্রচার। আনন্দরামের যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা ব্যাকরণ, অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র চর্চায় মূলতঃ নিবদ্ধ ছিল। আনন্দরাম রচিত গ্রন্থাবলী বর্তমান যুগে শিক্ষা প্রচারে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষা প্রচারে তাঁহার আজীবন সাধনা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তুলনীয়। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনীষীগণ আনন্দরামের জ্ঞানচর্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। জ্ঞান সাধনায় বিঘ্ন হইবে আশঙ্কা করিয়া আনন্দরাম দারপরিগ্রহ করেন নাই। গুরুতর রাজকার্যের

দারিদ্র্য এবং অবিশ্রান্ত অধ্যয়নের জন্য আনন্দরামের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ১৮৮৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নোয়াখালী জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর রূপে কর্মরত থাকা কালে আনন্দরাম পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিন মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দানবীর তারকনাথ পালিত (পরে সার ও ডাঃ) মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, দুই জনের এই বন্ধুত্ব উত্তরকালে আরও সুদৃঢ় হয়। গুরুতর রোগগ্রস্ত হইয়া আনন্দরাম চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আসেন এবং তারকনাথের বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডস্থ গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারকনাথ ও তাঁহার পরিবারবর্গ আনন্দরামের পরিচর্যায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কলিকাতার শ্রেষ্ঠ কবিরাজ ও ডাক্তারদের আনন্দরামের চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করা হয়। সকল সেবাযত্ন ও চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া ১৮৮৯ খৃস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী পরম সুহৃদ তারকনাথের আশ্রয়ে মাত্র ৩৯ বৎসর বয়সে আনন্দরামের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। আনন্দরামের মৃত্যু সংবাদে সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতানুরাগী বিদ্বজ্জন শোকমগ্ন হন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র হিন্দু-প্যাট্রিয়ট, ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতিতে যথোচিত মর্যাদার সহিত আনন্দরামের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। আনন্দরাম ষোল বৎসর ধরিয়া সরকারী কর্মচারী রূপে যে সকল স্থানে কার্য করিয়াছিলেন সেই সব স্থানের প্রজাবৃন্দ আনন্দরামের মৃত্যুতে নিরতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হন। আনন্দরাম শুধু দক্ষ শাসক ছিলেন না, সরকারের প্রতিনিধি রূপে তিনি সর্বদাই প্রজাদের মঙ্গল বিধানে সচেস্ট থাকিতেন, সেইখানেই তিনি প্রজাদের জলকষ্ট নিবারণ করিতেন এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি বিধান করিতেন। কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে তাঁহার চেষ্টায় বাজার, স্কুল, দীঘিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইগুলি বরুয়া দীঘি, বরুয়া বাজার, বরুয়া স্কুল প্রভৃতি নামে খ্যাত হয়। বহু পণ্ডিতকে তিনি মাসিক বৃত্তি দিয়া সাহায্য করিতেন, অধ্যয়নার্থী দুঃস্থ ছাত্র কখনও তাঁহার সাহায্য লাভ করিতে আসিয়া বিফল হইত না। বহু লোককে তিনি জীবিকাসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। আনন্দরাম যখন সদর হইতে রাজকার্যে গ্রামাঞ্চলে যাইতেন তখন নিজ অর্থব্যয়ে তিনি সঙ্গে প্রচুর খাদ্য ও বস্ত্র লইয়া যাইতেন ও ঐগুলি প্রকৃত দুঃস্থ ব্যক্তি দেখিলে তাহাদের দান করিতেন। আনন্দরামের কর্মজীবন বাঙ্গালাদেশের ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, বগুড়া, বৰ্দ্ধমান, খুলনা, যশোহর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে অতিবাহিত হয়।

আনন্দরাম বাঙ্গালার নিকটতম প্রতিবেশী আসামের সন্তান। বাঙ্গলা তাঁহার মাতৃভাষা না হইলেও বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত থাকার সময়ে তিনি বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্যভাষার (dialects) একটি শব্দকোষ বা অভিধান প্রণয়নের সঙ্কল্প করেন ও এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সহায়তা প্রার্থনা করেন। আনন্দরামের অকাল মৃত্যুতে এই সাধু সঙ্কল্পটী বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে আনন্দরাম পরিকল্পিত কথ্য ভাষায় শব্দকোষ রচনার কার্যটী আর কেহই পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন নাই। বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বাঙ্গলার দু একটী জেলার কথ্যভাষার শব্দ সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন, ইহা ক্ষোভ ও পরিতাপের বিষয়।

আনন্দরামের মৃত্যুর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় তদানীন্তন উপাচার্য সার

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দরামের মৃত্যুতে সাতিশয় খেদ প্রকাশ করেন (Mr. Anandarum Barooah was a distinguished member of the Civil service. Amidist engrossing duties of office, he could find time to plan and party execute literary works of profound scholarship, and it is a matter of no small regret that untimely death preventing him from completing them. (From the Convocation address, Calcutta University, 1890).

মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত আনন্দরামের সহপাঠী ও আবাল্য সুহৃদ ছিলেন। প্রিয় বন্ধু ও জ্ঞান-চর্চার সতীর্থ আনন্দরামের মৃত্যুর পর রমেশচন্দ্রের Civilization of Ancient India নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র আনন্দরামের অকাল মৃত্যুর কথা উল্লেখ করিয়া শোক প্রকাশ করেন। ["His untimely death is a loss to Sanskrit scholar-ship in this country which will not be easily remidied".]

সংস্কৃত মৌলিক কবিতা রচনাতেও আনন্দরামের বিশেষ দক্ষতা ছিল। আমাদের দেশে আধুনিক কালে সংস্কৃত চর্চা করিয়া যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আনন্দরামের নাম অগ্রগণ্য। আনন্দরামের অকাল মৃত্যু না হইলে তিনি সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারে আরও বহু সম্পদ সংযুক্ত করিতে পারিতেন সন্দেহ নাই। অসমীয়া ভাষায় আনন্দরামের একটি নাতিবৃহৎ সুলিখিত জীবনী আছে ((আনন্দরাম বরুয়া, শ্রীসূর্যকুমার ভূঞা, দ্বিতীয় সং, কলিকাতা, ১৯২৪)।

(১) English Sanskrit Dictionary Vol, I, 1877; Vol II (with Higher Sanskrit Grammar in English—Gender & Syntax as preface) 1879, Vol III (With on the Ancient Geography of India, Geographical names rendered into Sanskrit as preface), Calcutta, 1880. (২) Bhababhuti's Mahavira Charitam with Commentary and Sanskrit English Glossary, 1877. (৩) A Companion to Sanskrit reading undergraduates of the Calcutta University being a few notes on Sanskrit Texts nad their Commentaries, 1878. (৪) Bhababhuti and his place in Sanskrit literature with a Chronological sketch of Ramaic drama, 1878. (৫) A Comprehensive Grammar of Sanskrit Language analytical, historical and lexicographical Vol X ছন্দ (Prosody) Calcutta 1882, Vol III—নানার্থসংগ্রহ (Letters & their changes, Calcutta 1884). (৬) Vamana Sutra Vrithi, Vagbhatalankara, Saraswati Khantabharams, 1883. (৭) সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, 1884. (৮) Anasingha's Namalinganusasana (2 parts only), 1887-83. (৯) ধাতুবৃত্তিসার 1887. (১০) ধাতুশেষ বা ধাতুপাঠ 1888.

ভিন্নপ্রদেশে রবীন্দ্রচর্চা

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

মহারাষ্ট্র ও মরাঠী সাহিত্যের সঙ্গে বাংলা তথা রবীন্দ্রনাথের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এই সম্পর্ক নানা দিকের। বাংলা দেশের ব্যাপক পটভূমির কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি কেবল ঠাকুর পরিবারের কথা ধরি তাহলে দেখা যায়—রবীন্দ্রনাথের অন্যতম প্রসিদ্ধ অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সরকারী কাজ নিয়ে দীর্ঘকাল মহারাষ্ট্রে ছিলেন। তাঁর মহারাষ্ট্র-প্রবাসের সূচনা হয় বোধকরি ১৮৬৪ সালে। রবীন্দ্রনাথ তখন তিন বছরের শিশু। বিদ্যানুরাগী সত্যেন্দ্রনাথ কেবল সরকারী কাজে মগ্ন না থেকে বিশেষ যত্ন ও আগ্রহ নিয়ে মরাঠী ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। প্রাক্তন বোম্বাই প্রদেশের অন্যতর ভাষা গুজরাটীও তাঁর অজানা ছিল না। মহারাষ্ট্রের অনেক ধর্মনেতা, সমাজনেতা ও সাহিত্যিকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় ও হৃদ্যতা ঘটে। মহারাষ্ট্রীয় সাধক কবিদের কথা তিনিই বোধকরি সর্বপ্রথম বাঙালী পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইতে প্রথম পদার্পণ করেন ১৮৭৮ সালে, সতেরো বছর বয়সে। বিলাত-যাত্রার প্রাক্-কালে তাঁর এই স্বল্পকালীন বোম্বাই প্রবাস ইংরেজী ভাষা ও বিলেতী আদব-কায়দা শেখার জন্য কল্পিত হলেও এই সময়ে মরাঠী ভাষাও সাহিত্যের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ পরিচয় ঘটে। সত্যেন্দ্রনাথ মরাঠী কবি তুকারামের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। মূল মরাঠি ভাষায় তুকারামের 'অভঙ্গ' তাঁর জানা ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে তুকারামের রচনার রসাস্বাদন করতেন। কেবল তাই নয়, এই ভ্রাতৃদ্বয় মরাঠি ভক্তকবির কিছুসংখ্যক পদ বাংলায় অনুবাদ করেন। বহুদিন পরে সেই সেই অনূদিত পদগুলি সত্যেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত "নবরত্নমালা" নামক গ্রন্থে স্থান পায়।

তুকারামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক এইখানেই শেষ নয়। আধুনিক বাঙালী কবির উপর এই প্রাচীন মরাঠী কবির অধিকার আরও একটু বেশি। চিত্রকল্প ব্যবহারে তুকারামের সহজ নৈপুণ্য সুবিদিত। রবীন্দ্রচিত্তে স্বভাবতই তার কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে। এ সম্পর্কে কেবল একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হচ্ছে। "কন্যা সাসুর্‍্যাসি জায়ে। মাগেঁ পরতোনী পাহে।"...ইত্যাদি পদাংশে তুকারাম কৃষ্ণের প্রতি স্বীয় ব্যাকুলতার কথা বোঝাতে গিয়ে বললেন যে, কন্যা যেমন বধূরূপে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সময়ে সতৃষ্ণ নয়নে তার 'মায়ের বাড়ি'র দিকে তাকায়...ইত্যাদি। "খেয়া" কাব্যগ্রন্থের 'দিঘি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা মিলিয়ে দেখুন :

> পথ চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা ক'রে
> বাপের ঘরে চায়।

বাঙালির কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রবর্ণিত এই দৃশ্য বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু মহারাষ্ট্রের জাতীয় অনুষ্ঠানে এটি একটি সুপরিচিত দৃশ্য।

প্রথম জীবনে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আরও অনেক ঘনিষ্ঠ সংযোগের কথা জানা যায়।

১২৯৬ সালে রবীন্দ্রনাথের পশ্চিম ভারত ভ্রমণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনীকার লিখেছেন—"বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার প্রবাসপর্বটা সাহিত্যসৃষ্টির দিক হইতে বিশেষভাবে স্মরণীয়।" মহারাষ্ট্রের বীর ও বীরাঙ্গনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীকাব্য (জয়তু শিবাজী, প্রতিনিধি, বিচারক) এবং নাট্যকাব্যের (সতী) কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আর; বিশেষভাবে স্মরণীয় অন্নপূর্ণা নামে সেই মরাঠী যুবতীর কথা—"কবি মানসী"কার যাঁর কাহিনী সবিস্তারে ও সরসভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মহারাষ্ট্র ও মরাঠী সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও ১৯১৩ সালের অর্থাৎ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বে মহারাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রসাহিত্য একরকম অপরিচিত ছিলই বলা যায়। এ তথ্য আমার অনুমান-লব্ধ নয়, একথা বলেছেন মহারাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ লেখক গং. দে. খানোল্কর—যাঁর সুদীর্ঘ 'রবীন্দ্রনাথ'গ্রন্থখানি (প্রকাশকাল ১৯৬১) মরাঠী সাহিত্যে একটি স্মরণীয় সংযোজন।

১৯১৩ সালের পূর্বে মহারাষ্ট্রে রবীন্দ্রনাথের এই অপ্রসিদ্ধির কারণ বোঝা যায় না। এমন নয় যে, বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মহারাষ্ট্র উদাসীন ছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত, চণ্ডীচরণ সেন, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রভৃতি খ্যাত-অখ্যাত অনেক বাঙালী লেখকের খবর তাঁরা জানতেন। অন্যের কথা থাক, ঠাকুর পরিবারের একাধিক লেখকের গ্রন্থ মরাঠী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকের মরাঠী অনুবাদ, তারপরে অনূদিত হয় স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বাণ' ও 'ফুলের মালা'। অথচ ১৯১৩ সাল পর্যন্ত লেখক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মরাঠী ভাষায় অজ্ঞাতই থেকে গেল।

উত্তরকালে বিশ্বকবির শান্তিনিকেতনে অনেক মহারাষ্ট্র সন্তান বিদ্যার্থীরূপে যোগদান করেন। তাঁদের সঠিক সংখ্যা জানা নেই। 'মহারাষ্ট্র রাজ্য রবীন্দ্রনাথ জন্ম শতাব্দি সমিতির' উদ্যোগে প্রকাশিত এবং শ্রীপাদ যোশী সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ জন্ম আণি মহারাষ্ট্র' (প্রকাশকাল ১৯৬১) নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এমন ২৯ জন নর-নারীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত এবং সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট সন্তানরূপেও পরিচিত। এর থেকে বোঝা যায়, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্রে যোগ্য সমাদর পেয়েছিলেন।

মরাঠী গীতাঞ্জলি ঃ

গীতাঞ্জলির মরাঠী অনুবাদকের মধ্যে একসঙ্গে যে-তিনজন লেখকের নাম করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন (১) গোবিন্দ বাসুদেব কানিটকর (২) কাশীনাথ হরি মোডক (১৮৭২-১৯১৬) (৩) মরাঠী উপন্যাসের জনকরূপে পরিচিত হরিনারায়ণ আপ্‌টে (১৮৬৩-১৯১৯)। হরিনারায়ণ আপ্‌টে এবং গোবিন্দ বাসুদেব কানিটকরের গীতাঞ্জলি আমরা দেখিনি। একাধিক মরাঠী পণ্ডিতের রচনায় এঁদের গীতাঞ্জলি সম্পর্কে যে উল্লেখ পেয়েছি তাতে বোঝা শক্ত কোন্‌খানি অগ্রবর্তী। মামা-বারেরকরের মতে হরিনারায়ণ আপ্‌টেই গীতাঞ্জলির প্রথম মরাঠী অনুবাদক। আপ্‌টের গীতাঞ্জলি ১৯১৭ সালে প্রকাশিত বলে রবীন্দ্রগ্রন্থ পঞ্জীতে উল্লেখ করা হয়েছে। কানিটকরের গীতাঞ্জলির প্রকাশকাল দেওয়া হয় নি। মরাঠী ভাষায় রবীন্দ্র-জীবনীকার গং. দে. খানোলকর (গঙ্গাধর দেব্‌রাও

খানোলকর) বলেছেন, ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'নবযুগ' নামক একটি মাসিক পত্রিকার প্রথম থেকেই কানিটকরের গীতাঞ্জলি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। আমাদের অনুমান কানিটকরের গীতাঞ্জলি অগ্রবর্তী হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৭ সালের পরে। হরিনারায়ণের গীতাঞ্জলির সঙ্গে অনুবাদকের একটি মূল্যবান ভূমিকা ছিল বলে জানতে পেরেছি। কিন্তু সে ভূমিকা পড়বার সুযোগ আমাদের হয়নি।

কাশীনাথ হরি মোডক মারা যান ১৯১৬ সালে। ইনি ১৯০৩-১৯০৬ সালের মধ্যে মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের মরাঠি অনুবাদ শেষ করেন। গীতাঞ্জলির অনুবাদ করেন ১৯১৩-১৯১৫ সালের মধ্যে। কবির অকাল মৃত্যুর ফলে জীবদ্দশায় গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয়নি। ১৯২৪ সালে প্রকাশিত কবির কাব্য-সংগ্রহের একেবারে শেষ দিকে পনেরোটি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে—যেগুলি গীতাঞ্জলির অনুবাদ।

কানিটকর, আপ্টে ও মোডক—এঁরা সকলেই অনুবাদ করেছেন ইংরেজী থেকে। প্রথম দু'জনের অনুবাদ গদ্যে, মোডকের অনুবাদ পদ্য-ছন্দে। 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী' ইত্যাদি অংশের অনুবাদ আছে :

গুণালয়া তুঁ করিসী কৈসেঁ গান কলেনা তরী
পরিসতোঁ বিস্মিত মীঁ অংতরীঁ ॥

মোডকের অনুবাদ থেকে মনে হয় ইনি অনুবাদের সময়ে মূল বাংলা পদগুলি দেখে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জিতে এই অনুবাদের কোনো উল্লেখ নেই।

গীতাঞ্জলির অন্যান্য অনুবাদগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হচ্ছে :

প্রকাশকাল	অনুবাদক	অনুবাদের রূপ
১৯৫৫	শারঙ্গপাণি	পদ্যছন্দে
১৯২৮	র্যা° ঋগ্‌বেদী	পদ্যছন্দে
১৯৩১	দেবীদাস লক্ষ্মণ মহাজন	পদ্য
১৯৪৬	শ্রীরেগে	গদ্যে
১৯৪৭	ত্র্যা° র° দেওগিরিকর	গদ্যে
১৯৫৮—১৯৬২	কাকা কালেলকর	গদ্যে

উল্লিখিত অনুবাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদী, দেওগিরিকর ও কালেলকর—কেবল এই তিনজনের গ্রন্থ দেখার সুযোগ আমরা পেয়েছি।

ঋগ্‌বেদীর গ্রন্থখানি নানা কারণে সারা ভারতের গীতাঞ্জলি-চর্চা তথা রবীন্দ্র-চর্চায় একখানি স্মরণীয় গ্রন্থ। কেন স্মরণীয় সে কথা বলার আগে এর বাহ্যরূপের কিছু পরিচয় দিচ্ছি। বইখানির নাম 'অভংগ গীতাঞ্জলি'। অনুবাদক মহাশয় 'অভংগ গীতাঞ্জলি সমর্পণ' এই শিরোনামায় 'জগদ্‌বিখ্যাত বংগদেশীয় কবিবর্য গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'-এর গীতাঞ্জলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে। ভূমিকা শেষ করেছেন 'ওঁ তৎসৎ ব্রহ্মার্পণমস্তু' বলে। মূল গ্রন্থের আরম্ভে আছে ওঁ-চিহ্নিত কৃষ্ণমূর্তি। গ্রন্থের শেষে আছে ভগবদ্‌ভজন। ১৯টি মরাঠীপদ (অভংগ)—বিশিষ্ট এই

ভগবদ্‌ভজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ কিছু আছে বলে মনে হল না। অতঃপর 'পূজা' 'করুণাষ্টক', 'আরতি'। মোট কথা গ্রন্থখানিকে এমনভাবে ধর্ম ও অনুষ্ঠানিকতার আবরণে মোড়া হয়েছে যে, কোনো সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে মন উঠবে না। বইখানির আদ্যন্ত এই ধর্মের নামাবলী। রীতিমত অশ্রদ্ধা জন্মে।

অথচ এই সব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ঠেলেঠুলে ধৈর্য ধরে যদি মূলগ্রন্থের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলে সমগ্র ভারতের গীতাঞ্জলি-চর্চায় একে শীর্ষস্থানীয় বলা চলে। এই গ্রন্থ কেবল অনুবাদ নয়, ব্যাখ্যাও বটে। প্রতিটি পদের অভংগ ছন্দে মরাঠী রূপান্তর (যার জন্যে বইখানির নাম দেওয়া হয়েছে 'অভংগ গীতাঞ্জলি') তারপরে গদ্যে ভাবার্থ এবং সর্বশেষে 'রহস্য' নামক টীকা। এই তিনটি অঙ্গই বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। প্রথমটি লেখকের কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক; দ্বিতীয়টিতে তাঁকে পাওয়া যায় বোদ্ধা ও ব্যাখ্যাতারূপে; এবং তৃতীয়টীতে পাই তাঁর পাণ্ডিত্য ও রস-গ্রাহিতার পরিচয়। এই 'রহস্য' অংশে লেখক গীতা, উপনিষদ্ এবং মরাঠী সাধক তুকারামের অভংগ উদ্ধৃত করে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তুকারামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব-সাদৃশ্যই লেখককে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। 'রবীন্দ্রনাথ আণ মহারাষ্ট্র' গ্রন্থের প্রস্তাবনা-লেখক আচার্য সখারাম জগন্নাথ ভাগবতও বলেছেন: 'গীতাঞ্জলির মধ্যে যে বৈষ্ণব ভাবধারা রয়েছে তা তুকারামের পদাবলীর সগোত্র।'

ঋগ্‌বেদীর অভংগ গীতাঞ্জলির মূল অংশে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ১১২টি কবিতার অনুবাদ। ১০৩টি Gitanjalir পদ এবং বাকি নয়টি নেওয়া হয়েছে নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতবিতান প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। যেমন: তুমি তবে এসো নাথ; ফুলের মতন আপনি ফুটাও গান, তোমারি বলবো নানা ছলে…ইত্যাদি। পরিশিষ্টে যে আরও নয়টি পদ দেওয়া হয়েছে তার একটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসিদ্ধ গান 'প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমায়'। বাকি আটটি রবীন্দ্রনাথের। যেমন, অন্তর মম বিকশিত করো, বাঁচান বাচি মারেন মরি, জীবনে যত পূজা…ইত্যাদি।

ঋগ্‌বেদী তাঁর 'অভংগ গীতাঞ্জলি'র ১১২টি পদকে দশটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন: (১) আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্ম (২) বাসনা ত্যাগ (৩) ঈশ্বর অন্বেষণ (৪) ঈশ্বর সাক্ষাৎকার (৫) ঈশ্বরের সঙ্গে সখ্য (৬) ঈশ্বরের কৃপা (৭) করুণ প্রার্থনা (৮) মৃত্যু ও পুনর্জন্ম (৯) ঈশ্বর প্রার্থনা (১০) প্রাসঙ্গিক বিচার। বলা বাহুল্য, কবিতাগুলির বিন্যাসক্রম অনুবাদকের নিজস্ব। প্রতিটি বিভাগের সূচনায় বিভাগস্থ কবিতাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এই সমস্ত থেকে বোঝা যায়, ঋগ্‌বেদী কেবল অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, গীতাঞ্জলির রস ও মর্ম-গ্রহণে যথেষ্ট যত্নশীল হয়েছিলেন।

ঋগবেদীর মুখ্য অবলম্বন Gitanjali হলেও মূল বাংলা রূপকে তিনি অগ্রাহ্য করেননি। ভূমিকায় তিনি জানিয়েছেন: 'ইংরেজী পোষাকে যে স্বাদ ও অর্থ পাওয়া যায় তার বেশিগুণ পাওয়া যায় বাংলা রূপে।…বন্ধুবর শ্রীগোপালকৃষ্ণ রাও-র অনুগ্রহে বাংলা কবিতার ভাবধারা বোঝার সুযোগ পেয়েছি। তার থেকে আমার যে অবর্ণনীয় আনন্দ হল, আমার মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুরাও সেই আনন্দের সমভাগী হোন—এই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচনা করেছি।' কেবল ভূমিকাতে নয়, অনুবাদের মধ্যেও এমন পরিচয় পাওয়া যায় যাতে লেখক বাংলার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন বলে আমরা অনুমান

করতে পারি। ইংরেজী গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতায় আছে…such is thy pleasure বাংলায় এর মূল রূপ হল 'এমনি তোমার লীলা'। মরাঠী অনুবাদেও ঐ 'লীলা শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। Gilanjali-র ৯ নং কবিতার প্রকাশভঙ্গি বাংলা থেকে অনেক পৃথক। মরাঠি অনুবাদে দেখা যায় বাংলা রূপের অনুবৃত্তি—

আপুলিয়া স্কংধীঁ মজ ন নেঈন।
ভিক্ষা ন মাগেন মাঝ্যা দ্বারীঁ ॥
সর্বভার মাঝ্যা খালোনী স্বচ্চরণী।
হিংডেন ভুবনীঁ লীনপণেঁ ॥ (অভংগ গীতাঞ্জলি—গীতসং ৮)

এই গ্রন্থের দুটি অতিরিক্ত আকর্ষণের কথা বলছি। একটি হল আট পৃষ্ঠার একটি উপোধঘাত—যার লেখক হলেন দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকর, সংক্ষেপে যিনি কাকা কালেলকর নামে সমগ্র ভারতে সুপরিচিত। দ্বিতীয়টি হ'ল স্বয়ং 'রবীন্দ্রনাথ টাগোর' স্বাক্ষরিত একটি সাত পংক্তির অভিমত—যেটি গ্রন্থের প্রারম্ভে 'গুরুদেবাঁচা সন্দেশ' শিরোনামায় মুদ্রিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতটি যে মূলে ইংরেজীতে লেখা ছিল তা অনুমান হয় ঐ 'টাগোর' স্বাক্ষর থেকে। কিন্তু মুদ্রিত হয়েছে তার মরাঠী অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : মরাঠী ভাষায় লিখিত রা০ ঋগ্‌বেদীর 'অভংগ গীতাঞ্জলি'র মাধ্যমে মহারাষ্ট্রে আমার রচনা আরও পরিচিত হবে বলে আমার বোম্বাইস্থিত কয়েকজন বন্ধু আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন যে, অনুবাদক মূল কবিতাগুলি মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করেছেন বলে ভাষান্তর মূলানুযায়ী হয়েছে। আমার বিশেষ আনন্দ এই কারণে যে, এতে আমার কাব্যের ভাব স্বরূপেই রক্ষিত আছে। ৯ অক্টোবর, ১৯২৮।

ঋগ্‌বেদীর অভংগ গীতাঞ্জলি'-তে যে তুকারামের প্রাসঙ্গিক পদ বহু উদ্ধৃত হয়েছে সে-কথা আমরা বলেছি। ঋগ্‌বেদীরপ্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে আমরা একটি পদ তুলে দিচ্ছি। 'জগতে আনন্দ যজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ'—এই কবিতার অলোচনায় এটি স্থান পেয়েছে :

ধন্যদিবস আজি ডোলীয়াঁ লাধলা।
আনন্দ দেখীলা ধরণী বরি ॥
ধন্য ঝালেঁ মুখ নিবালী রসনা।
নাম নারায়ণ ঘোষ করুঁ ॥
ধন্য হেঁ মস্তক সর্বাংগ শোভলেঁ।
সন্তাঁচী পাউলেঁ লাগতাতি ॥
ধন্য আজি পন্থেত চালতী পাউলেঁ।
টালিয়া শোভলে ধন্য কর ॥

গীতাঞ্জলির অন্যতম কন্নড অনুবাদক শ্রীনরেগল্লা প্রহ্লাদ রাওর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি প্রহ্লাদবাবু মরাঠী অনুবাদক দেওগিরিকরের গীতাঞ্জলি থেকে সাহায্য নিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলেন। ত্র্যং র দেওগিরিকরের মরাঠী গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। এই গ্রন্থের "প্রবেশ" অর্থাৎ প্রস্তাবনা লিখেছেন বাংলাভাষাভিজ্ঞ বিশিষ্ট মরাঠী পণ্ডিত আচার্য সখারাম

জগন্নাথ ভাগবত। দীর্ঘ ২৩ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রস্তাবনায় গীতাঞ্জলির তত্ত্ব ও সৌন্দর্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ইনি প্রয়োজনবোধে রবীন্দ্রনাথের মূল রচনা থেকে দীর্ঘ অংশ নাগরী হরফে উদ্ধৃত করেছেন। মহারাষ্ট্রের একাংশে রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে ইনি বলেছেন—সনাতনী রাষ্ট্রবাদী, সাহিত্যিক ও অধ্যাত্মবাদী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক রবীন্দ্র-মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তার অন্যতম কারণ গান্ধী-যুগের সূচনায় "চরখা ও খাদি" সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিরূপ সমালোচনা। এই রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাব এখনও রয়েছে।

অনুবাদকের ভূমিকা (অনুবানকার্টে নিবেদন) থেকে জানা যায়, বাংলাভাষায় রবীন্দ্র-কাব্য অধ্যয়ন করার ইচ্ছা তাঁর অনেকদিনের। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনের সময়ে কারাগারে বসে তিনি আচার্য ভাগবতের কাছে থেকে বাংলা শেখার সুযোগ পান। ভাগবত মহাশয় "সঞ্চয়িতা"র কবিতাবলী এমন মনোরম ভঙ্গিতে ব্যাখ্যা করে শোনাতেন যে, তাঁর "রসভরিত ও অর্থোদ্‌গ্রাহী প্রতিপাদন" দেওগিরিকরের স্মরণে চির-অম্লান থাকবে। এর পরে বাংলা গীতাঞ্জলির মরাঠী অনুবাদ করা হল এবং সেই অনুবাদ যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ হল নাশিক জেলে, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা মুকুন্দলাল সরকারের কাছ থেকে। অনুবাদকের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল অনুবাদের সঙ্গে গীতাঞ্জলির মূল কবিতাগুলিও নাগরী হরফে মুদ্রিত হবে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না পাওয়ায় অগত্যা একটি করে পংক্তি উদ্ধৃত করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ভূমিকা ইত্যাদির পরে মূল গ্রন্থ শুরু হওয়ার ঠিক আগের পৃষ্ঠায় একটি মধুর বিভ্রমের সৃষ্টি করা হয়েছে। হঠাৎ সেই পৃষ্ঠার উপর প্রথম চোখ পড়লে পাঠকের মনে হবে, বইখানি বাংলা গীতাঞ্জলি। অর্থাৎ বাংলা গ্রন্থের "গীতাঞ্জলি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" অংশটির হুবহু অনুলিপি ছেপে দেওয়া হয়েছে। এই মনোরম কৌশলের জন্য অনুবাদক ও প্রকাশক অভিনন্দনীয়।

দেওগিরিকর অনুবাদ করেছেন গদ্য ছন্দে, যদিও পংক্তিগুলি সাজানো হয়েছে পদ্যের ভঙ্গিতে। আমরা কেবল একটি উদ্ধৃতি দিয়েই নিরস্ত থাকবো। গীতাঞ্জলির ১০৫ নং কবিতায় অনুবাদে বলা বলা হয়েছে—

যাপুঢেঁ মী মলা স্বতঃচ্যা ডোক্যাবর বাহুন নেণার নাহী
যাপুঢেঁ মী স্বতঃচ্যা দারাশীঁ কংগাল হোউন রহাণার নাহী।

আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য অনুবাদক হলেন দত্তাত্রেয় বালকৃষ্ণ কালেলকর—সারা ভারতে যিনি কাকা কালেলকর নামে সুপ্রসিদ্ধ। পশ্চিম ভারতের এই অশীতিপর পণ্ডিত (জন্ম ১৮৮৫ সালে জন্মসূত্রে মহারাষ্ট্রীয় হলেও তিনি সত্যসত্যই একজন ভারত-নাগরিক। তাঁর মাতৃভাষা অবশ্যই মরাঠী, কিন্তু গুজরাতী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অধিকার কিছু কম নয়। মরাঠী ও গুজরাতী উভয় সাহিত্য তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ। বাংলাও তিনি শিখে নিয়েছেন। ১৯১৪-১৫ বিশ্বভারতীর অতিথি-অধ্যাপক রূপে তিনি রবীন্দ্র সাহচর্যের সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তী কালে গান্ধী-রবীন্দ্রের যোগসূত্র রূপেও তিনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু সে-কথা "গুজরাতী গীতাঞ্জলি" পর্যায়ের জন্য তোলা রইল। কাকাসাহেব নিজে যেমন মরাঠী ও গুজরাতী ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ করেছেন, তেমনি অন্য লেখকের অনুরূপ অনুবাদ গ্রন্থের অনেকগুলি তাঁর ভূমিকা, প্রস্তাবনা অথবা

মুখবন্ধের দ্বারা অলংকৃত। মোট কথা, কাকা কালেলকর পশ্চিম ভারতে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রূপে স্বীকৃত।

মরাঠী ভাষায় গীতাঞ্জলির অনুবাদ ইতিপূর্বে অনেক হয়েছে। সুতরাং কালেলকরের অনুবাদে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু ভাষান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গীতাঞ্জলির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্র-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি। কালেলকর-কৃত গীতাঞ্জলির এই "মনন ও ভাষান্তর" পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় "রবীন্দ্র-মনন", ১৯৬১ সালে "রবীন্দ্র-বীণা" এবং ১৯৬২ সালে "রবীন্দ্র-ঝংকার"। এই তিনখানি গ্রন্থে যথাক্রমে ৫০, ৩৬ এবং ৪৩টি কবিতা অনূদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। অনুবাদ গদ্যে। কিন্তু এই গ্রন্থের সমাদর ঠিক অনুবাদের জন্য নয়, ব্যাখ্যার জন্য। মূল গীতাঞ্জলির মনন, চিন্তন ও রসগ্রহণের ব্যাপারে ৩০ বছর আগে ঋগবেদী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, কালেলকর সেই পথে আরও অগ্রসর হলেন। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ঋগ্‌বেদীর "অভংগগীতাঞ্জলি"র উপোদ্‌ঘাত লিখে দিয়েছিলেন কাকাসাহেব। সুতরাং মনে হয়, ঐ গ্রন্থের পরিকল্পনায় কাকাসাহেবের প্রেরণা ছিল।

কালেলকর কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসে 'স্বান্তঃসুখায়' যে-কাজ করেছিলেন, বহুজনহিতায় তাকে প্রকাশ করেছেন। মরাঠী ভাষায় এটি এমন একটি কাজ অন্য ভারতীয় ভাষায় যার তুলনা আছে বলে আমার জানা নেই। কাকা সাহেব কেবল ব্যাখ্যা করেও নিবৃত্ত হননি। মরাঠীভাষীকে মূল বাংলা কাব্যের রসাস্বাদন করাবার জন্য ব্যাখ্যা ও অনুবাদের সঙ্গে নাগরী হরফে মূল কবিতাগুলিও মুদ্রিত করে দিয়েছেন এবং 'রবীন্দ্রমনন'-এর পরিশিষ্টে বাংলা ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি বিবৃত করে সেই উচ্চারণের দৃষ্টিতে একটি কবিতার পুনর্লিখিত রূপ দিয়েছেন। যেমন বিপদে মোরে **রোক্ক্ষা** করো…ইত্যাদি। মরাঠী ভাষীর সম্মুখে বাংলা কাব্যকে এমন শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরার জন্য কাকসাহেব আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়ে থাকবেন।

মরাঠীগীতাঞ্জলি প্রসঙ্গে আর একটি নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি হলেন ভীমরাও হস্তূরকর (শাস্ত্রী) (১৮৯০—১৯৫৫)। দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতশিক্ষকরূপে ইনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতে যে অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার পরিচয় মেলে স্বরলিপি সহ নাগরী অক্ষরে ১৯২৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সঙ্গীত-গীতাঞ্জলি' নামক গ্রন্থে।

'কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়'

'সমকালীন' পত্রিকার একাদশ বর্ষের ৫ম সংখ্যায় (ভাদ্র ১৩৭০) ডক্টর সতী ঘোষ ও ডক্টর প্রভা রায়ের লেখা 'কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়' নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, আমার সেটি পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। এই প্রবন্ধে লেখিকাদের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের এবং দুরূহ সমস্যার গ্রন্থি উন্মোচনে আগ্রহের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু প্রবন্ধটির অনেক উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি। এখানে আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

প্রথমে, আমার সম্বন্ধে প্রবন্ধটিতে যা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। লেখিকারা তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির নাম উল্লেখ করায় আমি সম্মানিত হয়েছি। তাঁরা লিখেছেন, "সম্প্রতি অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসের উল্লিখিত গৌড়েশ্বরকে বারবক শাহ বলে অনুমান করেছেন। তিনি নানা তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সে সময়ে নারায়ণ দাস কেদার রায় এবং গন্ধর্ব রায় প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন যাদের উল্লেখ পাওয়া যায় কৃত্তিবাসের 'আত্মবিবরণীতে'।" কিন্তু এর ঠিক পরেই তাঁরা লিখেছেন, "দেখা যাচ্ছে—সবাই অনুমানের উপর নির্ভর করেছেন এবং প্রত্যেকেই কৃত্তিবাসের 'আত্মবিবরণী' নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন।" এই "সবাই"-এর মধ্যে আমিও নিশ্চয়ই পড়ি। কিন্তু লেখিকাদের নিজেদেরই ভাষায় আমি "নানা তথ্যাদি দ্বারা" নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছি। তাহলে কৃত্তিবাসের কালনির্ণয়ে কেবলমাত্র "অনুমানের উপর নির্ভর" করেছি, এ অভিযোগ কেমন করে সত্য হতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে আমি শুধু অনুমানের উপর নির্ভরও যেমন করিনি, তেমনি আগে থাকতে একটা সিদ্ধান্ত গড়ে তুলে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে সেই সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাখ্যাও করিনি। কৃত্তিবাস যে রুকনুদ্দীন বারবক সাহেরই সভায় গিয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে আমি আমার 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' বইয়ে ও অন্যত্র অনেকগুলি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখিকারা আমার প্রবন্ধগুলির মধ্যে মাত্র একটি ভিন্ন আর কোনটির উল্লেখ করেননি এবং কোন প্রমাণেই খণ্ডন করার চেষ্টা করেননি। তা না করে তাঁরা বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুমান-বিলাসীদের দলে ফেলেছেন! এতে আমার প্রতি নিঃসন্দেহে অবিচার করা হয়েছে।

সতী দেবী ও প্রভা দেবী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, কৃত্তিবাস রাজা লক্ষ্মণসেনের (রাজত্বকাল আঃ ১১৭৯-১২০৭ খ্রীঃ) সভায় গিয়েছিলেন। নিম্নলিখিত দুটি "প্রমাণ" থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

(১) কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের অন্যতম সভাসদের নাম নারায়ণ। (সতী দেবী ও উমা দেবী মনে করেন নারায়ণ রাজার "ডাহিনে" বসেছিলেন বলে গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে দেখা যায় নারায়ণ ছাড়া জগদানন্দ, কেদার রায় প্রভৃতি অমাত্যরাও রাজার "ডাহিনে" বসেছিলেন)। লক্ষ্মণসেনের অনেকগুলি তাম্রশাসন থেকে জানা যায়, তাঁর সান্ধিবিগ্রহিকের নাম ছিল নারায়ণ দত্ত।

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দের সমসাময়িক বলে অভিহিত হনুমানের "মহানাটকম্" নামে একটি সংস্কৃত রামায়ণের অংশবিশেষের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশবিশেষের "ভাব এবং ভাষার অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই দুটি "প্রমাণ" পর্যাপ্ত বলে গণ্য হতে পারে না। 'নারায়ণ' নাম বাঙালীদের মধ্যে এত বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় যে মাত্র এই একটি নামের মিল থেকে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তেই আসা যায় না। সতী দেবী ও প্রভা দেবী যদি কৃত্তিবাস-বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ ও লক্ষ্মণসেনের কর্মচারীদের মধ্যে আর একটি সাধারণ নাম দেখাতে পারতেন (যেমন আমরা রুকনুদ্দীন বারবক শাহের ক্ষেত্রে দেখিয়েছি), তাহলে তাঁদের মত খানিকটা গুরুত্ব লাভ করত। হনুমানের 'মহানাটকমে'র সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের মিল থেকেও কিছুই প্রমাণিত হয় না। হনুমানের 'মহানাটকম্' লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িককালে রচিত হতে পারে, কিন্তু যে কাব্যে তার অনুকরণ আছে, তা'ও যে ঐ সময়েই রচিত হবে, তার কোন মানে নাই। ধোয়ীর 'পবনদূত' কাব্যে কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর অনুকরণ দেখা যায় বলে কি আমরা ধোয়ীকে কালিদাসের সমসাময়িক বলব ?

সুতরাং কৃত্তিবাসকে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক বলার স্বপক্ষে বস্তুত কোন প্রমাণ নেই। কৃত্তিবাস যে লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক হতে পারেন না, তার প্রমাণ "কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী"র মধ্যেই আছে। নীচে সেগুলির উল্লেখ করছি ;

(১) সতীদেবী ও প্রভাদেবী "কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী"কে কৃত্তিবাসের নিজের রচনা বলেই মনে করেন। আমরাও তা'ই মনে করি। এই "আত্মকাহিনী"র ভাষা এখন আধুনিক হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে এমন কোন প্রমাণ নেই, যার থেকে বলা যায় যে এটি আধুনিক কালেই রচিত। কিন্তু এর প্রাচীন ভাষা ও যদি গা'য়েন ও লিপিকরদের হাতে পড়ে আধুনিক হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ভাষাতত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সেই প্রাচীন ভাষাকে নিশ্চয়ই পুনর্গঠন করতে পারা যাবে। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ভাষাকে আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষায় দাঁড় করাতে পারি, তাতে কয়েকটি শব্দ ও ক্রিয়াপদের আধুনিক রূপকে প্রাচীন রূপে পরিবর্তিত করা ছাড়া আর কিছু করার দরকার হয় না। কিন্তু এর ভাষাকে লক্ষ্মণসেনের আমলের ভাষায় পরিণত করা যায় না। লক্ষ্মণসেনের আমলে বাংলা ভাষার যে রূপ প্রচলিত ছিল, তা চর্যাপদের ভাষার সমজাতীয়। কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ভাষাকে চর্যাপদের ভাষায় পরিণত করতে গেলে যে কী রকম ব্যর্থতা বরণ করতে হয়, তার একটি দৃষ্টান্ত আমরা দিচ্ছি।

বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥

এই পয়ারটিকে যদি আমরা চর্যাপদের ভাষায় রূপান্তরিত করতে চেষ্টা করি, তাহলে দ্বিতীয় চরণের 'গঙ্গাতীর' হয়ে দাঁড়াবে 'গঙ্গাতীরেঁ', কারণ চর্যাপদের ভাষায় বিভক্তিহীন অধিকরণ কারক ছিল

না। প্রথম চরণের 'অস্থির' 'অস্থির'ই থাকবে, অবশ্য তার উচ্চারণ হবে 'অস্থিরতা'। কিন্তু তাহলে 'অস্থির' ও 'গঙ্গাতীরে' তে মিল হবে না। সুতরাং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ভাষা যে মূলে লক্ষ্মণসেনের আমলের বাংলা ভাষা ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(২) কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে বর্ণিত গৌড়েশ্বরের জনৈক সভাসদের নাম 'কেদার খাঁ'। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেই (আনুমানিক ১২০৪ খৃষ্টাব্দে) মুসলমানরা প্রথম বাংলাদেশের কতকাংশ জয় করে। এর মাত্র কয়েক বছর আগে তারা দিল্লী ও উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিল। মুসলমানরা এদেশে আসার অনেকদিন পরে হিন্দুদের 'খাঁ' উপাধি দিতে সুরু করে। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সভায় 'কেদার খাঁ' নামক সদস্যের উপস্থিতি কল্পনা করা যায় না। পঞ্চদশ শতকের আগে কোন হিন্দু 'খাঁ' উপাধি লাভ করেছিলেন বলে জানা যায় না।

(৩) ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায় মুসলমানদের বাংলাদেশে প্রথম আধিপত্য বিস্তারের বেশ কিছুকাল পর থেকে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী প্রভৃতি মুসলমানী ভাষার প্রভাব পড়া সুরু হয়। অথচ কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন,

"সপ্তঘটী বেলা যখন **দিয়ানে** পড়ে কাটী।"

"পাত্রমিত্র সকলে দিলেন **খাসা** জোড়া।"

'দিয়ান' (দিওয়ান বা দেওয়ান) ফারসী শব্দ। 'খাসা' আরবী শব্দ।

সুতরাং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর ভাষা যে চতুর্দশ শতাব্দীর আগেকার হতে পারে না, তা এর থেকে বলা যায়।

সতী দেবী ও প্রভা দেবী মনে করেন, কৃত্তিবাস যদি লক্ষ্মণসেনের সভায় নাও গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর কোন পুত্রের সভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তা-ও হওয়া সম্ভব নয়, কারণ লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর যে সময়টুকু তাঁর পুত্রেরা রাজত্ব করেছিলেন, তার মধ্যে বাংলা ভাষার প্রকৃতি আমূল বদলে যাবে অথবা 'খাঁ' উপাধিধারী হিন্দু সভাসদের আবির্ভাব ঘটবে বলে কল্পনা করা যায় না। তা ছাড়া কৃত্তিবাসকে লক্ষ্মণসেনের বা তাঁর ছেলেদের আমলে পাঠাবার আদৌ কোন কারণই নেই।

সতী দেবী ও প্রভা দেবীর এই প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল আমাদের নজরে পড়েছে। সেগুলি সম্বন্ধে নীচে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(১) তাঁরা লিখেছেন, "কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণীতে উল্লিখিত 'বেদানুজ' শব্দটির কোন অংশই বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ অংশটির অর্থ 'বেদের অনুগমন করে যে' অর্থাৎ বেদজ্ঞ বা শাস্ত্রজ্ঞ অথবা পরমধার্মিক ধরা যেতে পারে। কিন্তু 'বেদের অনুগমন করে যে' অর্থে 'বেদানুগ' হতে পারে, 'বেদানুজ' হয় কেমন করে? 'বেদানুজ' শব্দের অর্থ বেদের পরে জাত।

(২) এরপর তাঁরা লিখেছেন, "বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির' এই পংক্তির ব্যাখ্যা তুর্কী আক্রমণের বিপর্য্যয়কে অনায়াসেই ধরা যেতে পারে। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে নরসিংহ ওঝা যে সভায় পাত্র ছিলেন সেইটি লক্ষ্মণসেনের রাজসভা এবং দেশের যে বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে তা তুর্কী আক্রমণ।"

তাই বা হয় কেমন করে? লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালেতো পূর্ববঙ্গে কোন বিপর্যয় ঘটেনি।

পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজী রাজধানী নবদ্বীপ সমেত পশ্চিমবঙ্গের একাংশ অধিকার করার ফলে রাজা লক্ষ্মণসেন সদলবলে ঐ সময়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমানরা তার পরেও অনেকদিন যেতে পারেনি। এদিকে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে পূর্ববঙ্গে "প্রমাদ উপস্থিত হয়েছিল বলেই নারসিংহ ওঝা পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথী তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। নারসিংহ লক্ষ্মণসেনের সভার পাত্র ছিলেন ধরলে বলতে হবে তিনি নিরাপদ পূর্ববঙ্গ ছেড়ে বিপর্যয়গ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গে চলে এসেছিলেন !!! এক্ষেত্রে সতী দেবী ও প্রভা দেবীর মতের সঙ্গে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর উক্তির কোন সামঞ্জস্য নেই। তাঁরা "নারসিংহ ওঝা"কে "নরসিংহ ওঝা" বলেও ভুল করেছেন।

(৩) সতী দেবী ও প্রভা দেবী লিখেছেন, "ইতিহাসে দেখা যায় যে তুঘ্রিল খাঁ গিয়াসুদ্দিন বলবনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন এবং গিয়াসুদ্দিন দনুজমর্দনের সাহায্য চেয়েছিলেন যাতে জলপথে তুঘ্রিল খাঁ পালাতে না পারেন।"

গিয়াসুদ্দীন বলবন তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের যে হিন্দু রাজার সাহায্য চেয়েছিলেন, তাঁর নাম 'দনুজমর্দন' নয়। আলোচ্য পর্ব সম্বন্ধে প্রামাণিক ইতিহাসগ্রন্থ জিয়াউদ্দীন বারুনির 'তারিখ-ই ফিরোজ শাহী'তে এবং ফার্সী ভাষায় লেখা অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে এই রাজার নাম লেখা রয়েছে 'রায় দনুজ'। বলবন আনুমানিক ১২৮০ খৃস্টাব্দে এঁর সাহায্য চেয়েছিলেন। কুলজী গ্রন্থগুলির মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গে 'দনুজমাধব' নামে একজন বিশিষ্ট হিন্দু রাজা ছিলেন। এদিকে দশরথ দেব নামে ত্রয়োদশ শতাব্দীর একজন হিন্দু রাজার তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে দেখা যায় এঁর বিরুদ্ধ ছিল 'অরিরাজ-দনুজমাধব'। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ফার্সী ইতিহাস গ্রন্থের 'রায় দনুজ', কুলজীগ্রন্থের 'দনুজমাধব' এবং তাম্রশাসনের 'অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব' অভিন্ন লোক। দনুজমর্দন পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা,—তিনি ১৪১৭ ও ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া. সোনারগাঁও ও চাটগাঁও থেকে নিজের মুদ্রা প্রকাশ করেছিলেন। চন্দ্রদ্বীপে একজন রাজা দনুজমর্দন ছিলেন বলে প্রবাদ আছে, কিন্তু তিনিও পঞ্চদশ শতাব্দীর আগেকার লোক নন। সতী দেবী ও প্রভা দেবী ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজার নাম রায় দনুজ বা 'দনুজমাধব' না লিখে 'দনুজমর্দন' লিখে নিঃসন্দেহে ভুল করেছেন।

(৪) তাঁরা লিখেছেন, 'প্রশ্ন উঠতে পারে কৃত্তিবাস যে রাজসভা দেখেছিলেন সেটা তাঁর (বৃদ্ধ) প্রপিতামহ নরসিংহ ওঝা যে সভার পাত্র ছিলেন সেই সভায়ই কিনা। আমাদের মনে হয় যে, কৃত্তিবাসের সে সভায় উপস্থিত হওয়া খুব অসম্ভব নয়।'

কিন্তু কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীর সাক্ষাৎ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এরকম হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ আত্মকাহিনীতে লেখা আছে যে নারসিংহ 'বঙ্গদেশের'রাজা 'দেবাহুজে'-এর পাত্র ছিলেন, সেখানে 'প্রমাদ' উপস্থিত হলে তিনি গহনতীরবর্তী ফুলিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন, তারপর তার পুত্র গর্ভেশ্বরের জন্ম হয়।

ফুলিয়া চাপিআ হইল তাহার বসতি।
ধনে ধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি ॥

গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হইল তাহার আলয় ॥

তর্কের খাতিরে ধরলাম, নরসিংহ যে বছর পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে ফুলিয়ায় এসেছিলেন, সেই বছরেই গর্ভেশ্বরের জন্ম হয়; গর্ভেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুরারির জন্মের সময় গর্ভেশ্বরের বয়স ১৮ বছর, মুরারির সপ্তম পুত্র বনমালীর জন্মের সময় মুরারির বয়স ৪০ বছর এবং বনমালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃত্তিবাসের জন্মের সময় বনমালীর বয়স ১৮ বছর ছিল এবং কৃত্তিবাস ১৬ বছর বয়সে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন বলে যদি ধরা যায়, তাহলেও নারসিংহ যে সময় রাজার পাত্র ছিলেন, তার সঙ্গে কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর দর্শনের সময়ের ব্যবধান হয় ১৮+৪০+১৮+১৬=৯২ বছর। লক্ষ্মণসেন যে ৯২ বছর রাজত্ব করেছিলেন, একথা কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। অন্য কোন রাজাও এত বেশী দিন রাজত্ব করেছিলেন বলে জানা যায় না। লক্ষ্মণ সেন ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন; ১২০৪ খ্রীস্টাব্দের মত সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজী তাঁর কাছ থেকে নদীয়া জয় করেন; ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে সঙ্কলিত শ্রীধরদাসের 'সদুক্তি কর্ণামৃত' থেকে জানা যায়, তখনও লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন। এই সময়কার প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ মীনহাজ-ই-সিরাজের 'তবকাৎ-ই-নাসিরী'তে লেখা আছে যে বখতিয়ারের নদীয়া জয়ের অল্প বাদেই লক্ষ্মণসেন পরলোকগমন করেন। সুতরাং লক্ষ্মণ-সেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৭৯-১২০৭ খ্রীঃ ২৭।২৮ বছরের মত। অতএব তাঁর সভায় নারসিংহ ওঝা ও তাঁর বৃদ্ধ-প্রপৌত্র কৃত্তিবাস—দুজনকেই টেনে আনবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

(৪) সতী দেবী ও প্রভা দেবী তাঁদের প্রবন্ধের সূচনায় মাইকেল মধুসূদনের সনেট থেকে যে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন, তার মধ্যে 'কীর্তিবাস' না লিখে 'কৃত্তিবাস' লিখে ভুল করেছেন। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কৃত্তিবাসের নাম সাধারণতঃ 'কীর্তিবাস' রূপে লেখা হত। মাইকেলও সর্বত্র 'কীর্তিবাস' লিখেছেন। সতী দেবী ও প্রভা দেবী আলোচ্য সনেটটির যে তিনটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন, তাদের মধ্যে 'কৃত্তিবাস' নামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সতী দেবী ও প্রভা দেবী তাঁদের প্রবন্ধে এমন কতকগুলি কথা লিখেছেন, যেগুলি আমার কাছে অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে। যেমন, তাঁদের পূর্ববর্তী গবেষকদের সম্বন্ধে তাঁরা লিখেছেন, '(কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের) পাত্রমিত্রদের মধ্যেও নিজেদের ইচ্ছামত কোন কোন নাম গ্রহণ করেছেন ও কোন কোন নাম বাদ দিয়েছেন;' কিন্তু সতী দেবী ও প্রভা দেবী নিজেরাও তো রাজার পাত্রমিত্রদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র নারায়ণের নাম নিয়ে বাকীগুলি বাদ দিয়েছেন। তাহলে তাঁরা পূর্ববর্তী গবেষকদের উপর দোষারোপ করেছেন কেন? তারপর আত্মকাহিনীর 'মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর' উক্তিটি থেকে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন, 'গৌড়েশ্বর বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছিলেন। অল্প বয়সের যুবক কোন রাজা শীতকালে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছেন এ যেন ভাবা যায় না। এই সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে আমাদের মনে হয় কবি কৃত্তিবাস লক্ষ্মণসেনের সভা দেখেছিলেন…।' কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর যে যুবক ছিলেন, তা এ পর্যন্ত কেহই বলেনি। সুতরাং এ নিয়ে আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য সতী দেবী ও প্রভা দেবীও প্রমাণ করতে পারেন নি যে এই গৌড়েশ্বর যুবক ছিলেন না, বৃদ্ধ ছিলেন। কারণ শীতকালে যুবকরা রোদ পোহায় না, বৃদ্ধরাই রোদ পোহায়—এই জাতীয় উক্তির কোন অর্থ হয় না। (শীতকালে আমিও সুযোগ

পেলে রোদ পুইয়ে থাকি ; তাই আশঙ্কা হচ্ছে আমিও হয়তো বৃদ্ধের পর্যায়ে পড়ে যাব, ঠিকুজীর সাক্ষ্য যা'ই হোক্ না কেন ?) আর এই গৌড়েশ্বর যদি বৃদ্ধই হন, তা' হলেই যে তিনি লক্ষ্মণসেন, হবেন, এই বা কেমন কথা ? লক্ষ্মণসেন ছাড়া আর কোন গৌড়েশ্বর যে বৃদ্ধ বয়সে রাজত্ব করেন নি এমন তো নয়। মোটের উপর এই রাজার শীতকালে রোদ পোহানো থেকে তাঁর বৃদ্ধ হওয়া বা যুবক হওয়া বা লক্ষ্মণসেন হওয়া—কিছুই প্রমাণিত হয় না।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল, তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সতী দেবী ও প্রভা দেবীর সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় না। এখন কৃত্তিবাসের সময় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে বলছি। কৃত্তিবাস যে পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বর্তমান ছিলেন এবং গৌড়েশ্বর রুকনুদ্দীন বারবক শাহের (রাজত্বকাল ১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) সভায় গিয়েছিলেন, একথা বলার অনুকূলে কয়েকটি যুক্তি ও প্রমাণ আছে। নীচে সেগুলির উল্লেখ করছি।

(১) কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে দেখা যায় যে, তিনি যে গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন, তাঁর সভাসদদের মধ্যে তিনজনের নাম ছিল কেদার, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায়। বর্ধমান উপাধ্যায়ের 'দণ্ডবিবেক' ও 'মুল্লা তকিয়া'র বয়াজ (দুটিই প্রামাণিক গ্রন্থ) থেকে জানা যায়, বারবক শাহের কেদার রায় নামে একজন কর্মচারী ছিলেন এবং বারবক শাহ্ তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে কেদার রায়কে ত্রিহুতে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ-বিজয় ও ভরত মল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' থেকে জানা যায় যে বারবক শাহের আমলে নারায়ণ নামে একজন 'রাজবৈদ্য' ('অন্তরঙ্গ') ছিলেন। কুলজী গ্রন্থে লেখা আছে ঠিক এই সময়েই গন্ধর্ব খান নামে এক ব্যক্তি বর্তমান ছিলেন, যিনি গৌড়েশ্বরের 'ধনাধ্যক্ষ' ছিলেন। গন্ধর্ব খান ও গন্ধর্ব রায় এক ব্যক্তি হতে পারেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায় এই তিনটি নাম আমরা রুকনুদ্দীন বারবক শাহের কর্মচারীদের মধ্যেও পাচ্ছি। গন্ধর্ব রায়কে বাদ দিলেও কেদার রায় ও নারায়ণ—দুটি নামের মিল থাকে। একটি নামের মিলকে উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু দুটি-তিনটি নামের মিলকে তা করা চলে না। কর্মচারীদের নামের এই মিল থেকে মনে হয় কৃত্তিবাস কর্তৃক উল্লিখিত গৌড়েশ্বর বারবক শাহ্-ই।

(২) জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল থেকে জানা যায়, যখন হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়া থেকে নীলাচলে গিয়েছিলেন, (আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ) তখন যাঁরা তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন হরিদাসের প্রিয়পাত্র সুষেণ পণ্ডিত। জয়ানন্দ লিখেছেন যে সুষেণ পণ্ডিত যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই বংশে মুরারি, দুর্গাবর, মনোহর প্রভৃতি বিশিষ্ট ও কুলীন ব্যক্তিরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। এদিকে ধ্রুবানন্দের 'মহাবংশাবলী' থেকে জানা যায় যে কৃত্তিবাসের এক সম্পর্কিত পৌত্রের (তাঁর জাঠ্‌তুতো ভায়ের পৌত্র) নাম সুষেণ এবং এই সুষেণের বৃদ্ধপ্রপিতামহ, জ্যেষ্ঠতাত পিতার নাম ছিল যথাক্রমে মুরারি, দুর্গাবর ও মনোহর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জয়ানন্দ-কথিত সুষেণ ও কৃত্তিবাসের পৌত্রস্থানীয় সুষেণের আত্মীয়দের নামে মিল হচ্ছে। দুই সুষেণই কুলীন ব্রাহ্মণ এবং দুজনেই ফুলিয়ার অধিবাসী। সুতরাং এঁরা নিঃসন্দেহে অভিন্ন ব্যক্তি। এই সুষেণ পণ্ডিত ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। কৃত্তিবাস যখন সুষেণের পিতামহস্থানীয়, তখন পিতামহ ও পৌত্রের

স্বাভাবিক গড়পড়তা ব্যবধান ৫০ বছর ধরে হিসাব করলে কৃত্তিবাসকে ১৫১৬—৫০ = ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত পাওয়া যায়। ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বাংলার সুলতান ছিলেন। সুতরাং সময়ের হিসাবেও বারবক শাহেরই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হবার দাবী বেশী।

(৩) রুকনুদ্দীন বারবক শাহ বিদ্যা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বহু কবি ও পণ্ডিত তাঁর কাছে সংবর্ধনা ও পৃষ্ঠপোষণ লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু, 'পদচন্দ্রিকা'-রচয়িতা রায় মুকুট বৃহস্পতি মিশ্র, বাসুদেব সার্বভৌমের পিতা নরহরি বিশারদ এবং ফার্সী শব্দকোষ 'শরফ্‌নামা'র রচয়িতা ইব্রাহিম কায়ুম ফারুকী। সুতরাং কবি-পণ্ডিত কৃত্তিবাস বারবক শাহের কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়।

অতএব তিনদিক থেকে বিচার করলে কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বর হিসাবে বারবক শাহকেই পাওয়া যায়। কিন্তু বারবক শাহের ক্ষেত্রে এই দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে :—

(১) কৃত্তিবাস তাঁর আত্মকাহিনীতে গৌড়েশ্বরের যে সব সভাসদের নাম করেছেন, তাঁরা সকলেই হিন্দু। কিন্তু মুসলমান গৌড়েশ্বর বারবক শাহের সভায় নিশ্চয়ই অনেক মুসলমান সভাসদও ছিলেন। কৃত্তিবাস তাঁদের নাম করলেন না কেন ?

(২)　　পাটের চান্দয়া শোভে মাথার উপর।
　　　মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥

গৌড়েশ্বরের সভার এই বর্ণনা সার্ব্বভৌম সুলতান বারবক শাহের সভা সম্বন্ধে প্রযোজ্য হতে পারে কি না ?

প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যায়, কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের সভাসদের নাম উল্লেখ করেননি, তাঁদের মধ্যে মাত্র ৮।৯ জনের নাম করেছেন। গৌড়েশ্বরের সভায় অন্ততঃ ৬০।৭০ জন সভাসদ ছিলেন। (ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মত জমিদারেরও বহু সভাসদের নাম আছে।) কৃত্তিবাস অধিকাংশ সভাসদেরই নাম করেননি। মুষ্টিমেয় যে ক'জনের নাম তিনি করেছেন, তাঁরা হিন্দু বলেই গৌড়েশ্বরের অন্য সভাসদরাও যে হিন্দু ছিলেন, তা কোন মতেই বলা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যায়, কৃত্তিবাস 'সপ্তঘটী বেলা' অর্থাৎ বেলা প্রায় সাড়ে নটার সময় গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়েছিলেন। মাঘ মাসের শীতে সকালের সভা যে ঘরের মধ্যে অনুষ্ঠিত না হয়ে খোলা আঙিনায় মাথার ওপর চাঁদোয়া খাটিয়ে অনুষ্ঠিত হবে, এইটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে সভা ও সমাবেশ শীতের দিনে খোলা জায়গাতেই অনুষ্ঠিত হত। এখনও শান্তিনিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর সমাবর্ত্তন সভা শীতকালের সকালবেলা খোলা জায়গায় মাথার উপর চাঁদোয়া খাটিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সুতরাং কৃত্তিবাস রাজসভার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভা সম্বন্ধে অনায়াসেই প্রযোজ্য হতে পারে।

সুতরাং সব দিক দিয়ে বিচার করলে, কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক শাহের সভায় গিয়েছিলেন ও তাঁরই কাছে সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন বলেই সিদ্ধান্ত করা যায়। এই সিদ্ধান্তের

পরিপোষক খুঁটিনাটী প্রমাণ আরও অনেকগুলি আছে, বাহুল্য বোধে সেগুলির এখানে উল্লেখ করলাম না।

(এই প্রবন্ধে কৃত্তিবাসের আত্মকাহিনী থেকে উদ্ধৃতি দেবার সময়ে ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী কর্তৃক আবিষ্কৃত পুঁথির পাঠ অনুসরণ করেছি।)

সুখময় মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য ও জনগণ

প্রতি যুগ আত্মপ্রকাশিত হয় স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব ও দীপ্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীর মাধ্যমে। যুগচিন্তা, যুগভাবনা ও যুগপরিবেশকে স্বীকৃতি জানিয়েও যার লেখনী চিরন্তনতার স্পর্শে শাশ্বত, সংকীর্ণতা ও সাময়িকতার বেড়া ডিঙোতে পেরেছে তিনি আগামীকালের মানুষের মনকে করেছেন জয় আর বর্তমানকে দিয়েছেন পুরো মূল্য। সীমিত অন্তর্ভাবনাকে পরিব্যাপ্ত বিশ্বভাবনায় রূপান্তরের মধ্যেই শিল্পীর অসীম সাফল্য। তৎকালিক নানা প্রতিকূলতা ও পরিবেশের অস্বীকৃতির জন্য অনেক সময়েই স্বাভাবিক কারণেই ব্যথিত শিল্পীর নিরলস সাধনাও ধিক্কৃত হয়; কিন্তু অতিক্রমী সময় তার যোগ্য বিচারে কুণ্ঠিত নয়। অনুকূলতার অভাবে কোনোকালের সাহিত্যের উপজীব্য চরমভাবে অস্বীকৃত ও উপেক্ষণীয় হলেও পরম উদ্‌বোধনে তার চরম মূল্যায়নে নির্দ্ধারিত হতে বাধ্য। চাই অনুকূল মনন, বিচার ও উর্বর ফসলের উপযুক্ত ভূমি। তাই যুগে যুগে সাহিত্যের সংজ্ঞাই শুধু বদলেছে তাই নয়, একই সঙ্গে সাহিত্যে যারা প্রাণময়তা লাভ করেছে তাদের অবয়ব ও পথযাত্রাপ্রণালীরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নতুনত্ব যেখানে ব্যাহত, উপেক্ষিত সেখানে সুপ্রচুর মৌল উপাদান-লাভেও বঞ্চিত হতে হবে। অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধাবশত নয়, বরং তাকে রক্ষা ও কালজয়ী করবার জন্যই বর্তমানকে অগ্রাহ্য না করে আগামীর পথে যাত্রা করতে হবে। নইলে স্থবিরত্ব একঘেয়েমির শেষ সীমাকে স্পর্শ করে নবজাতকের আবির্ভাবকে সম্পূর্ণরূপে দলিত করবে। আর যেখানে বালার্কের আহ্বান সুদূরে পরিব্যাপ্ত হয় না সেখানে অনেককিছুর সন্ধান মিললেও বিদগ্ধ মন সত্য স্বরূপের সন্ধান পায় না।

আদি সাহিত্যের জন্মলগ্ন কুয়াশার নিবিড়ে অথবা উপকথার অনুরূপ গল্পকথার মায়াময় জগতে। বহু অনুসন্ধানে তমসা কাটিয়ে ইতিহাসের ক্ষীণ কঙ্কালসূত্রটির সন্ধান মিললেও সন্দেহ উঁকি মারতেই থাকে তবু লিখিত প্রাচীনতম সাহিত্যের বস্তুরূপটি আমাদের অধিগত। সেই কয়েক হাজার বছরের সাহিত্য-নিদর্শন থেকে অধুনা যে বিরাট ভাণ্ডার তার সীমাহীনতা মানুষকে বিস্মিত করলেও যোগসূত্র ও একাত্মতা আবিষ্কার একেবারে অসম্ভব নয়। মহাকাব্য-নাটক-কাব্য-সমালোচনা-উপন্যাস-ছোটগল্প—এইসব নিয়ে সাহিত্যের বিরাট আয়োজন ও ব্যাপক প্রসার। বিশ্বমানবের সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই শিল্প ও শিল্পীর উৎসার আর তাদের চিন্তা-ভাবনা-মনন-

কল্পনা বর্দ্ধিত হয়েছে এই পরিবেশে যদিও স্বাভাবিক কারণেই মৌলিকতা ও স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

জনগণ। অতি-ব্যবহারে অধুনা এর স্বরূপটি পরিস্ফুট করবার প্রয়োজন হয় না। সচল মানবের মধ্যে অধিকাংশই সাধারণ হাট-বাটের মানুষ। ব্যথা-বেদনা সামান্য আশার মধ্য দিয়েই তাদের জীবনের স্বল্প বৈচিত্র্য। সে জীবন নিস্তরঙ্গ তবু আবেগময়তা, প্রাণরঙ্গময়তাও অপ্রচুর নয়। বৃহতের কোলাহলে সামগ্রিক সমাজে ব্যক্তির একক স্বতন্ত্র চিন্তা ও জীবনের যে তেমন কোনো মূল্য থাকতে পারে একথা বহুদিন অস্বীকৃত ছিল। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধ-উত্তরকালে জনগণ ও তার দাবি এবং প্রতিষ্ঠার কথা যে-পরিমাণে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যক্ত হ'ল তাতে পৃথিবীর অন্য এক কোটীর মানুষ যেমন নিজেদের মধ্যে এক আশ্চর্য আত্মীয়তা অনুভব করল ঠিক তেমনি অন্যদিকে অনেক শিক্ষিত (?) উন্নাসিক চমক-দেওয়ার ভঙ্গিতে এধারে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হলেন, কারণ তারা মোটেই চাইতেন না এদের মর্যাদার আসন দিতে। এইকালে নানাভবে শুরু হল আলোচনা উপেক্ষিত জনগণ ও তাদের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক নিয়ে। আর স্বাভাবিক কারণেই এইখানে প্রশ্ন ও বিতর্কের জন্ম। সাহিত্য ও জনগণ—এই আলোচনায় প্রথম দুটি বক্তব্যকে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। প্রথম, সাহিত্য কি জনগণের দ্বারা সৃষ্ট? দ্বিতীয়, সাহিত্য কি জনগণের জন্য রচিত? অনেকেই বিতর্কশেষে কোনো একটিকে সমর্থন করেছেন। এখন দেখা যাক সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ শেষে এর অসারতা প্রমাণিত হয় কিনা।

সাহিত্য কি জনগণের দ্বারা সৃষ্ট? বহতা জীবনে চলার পথে শিল্পী সমাজের মধ্য থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, অনুভূতির মায়াময় স্পর্শে তারই বহিঃপ্রকাশ যখন ঘটে তখন সৃষ্টি হয় মহৎ সাহিত্যের। জনগণের একজন হয়ে সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন, পরিবেশের আলোতে-বাতাসে তার বৃদ্ধি। কিন্তু যে মুহূর্তে তিনি স্বতন্ত্র চিন্তা ও মুক্ত ভাবনার প্রকাশে উৎসুক হলেন সেই ক্ষণ থেকেই তার অস্তিত্বে স্বাতন্ত্র্য এসে উপস্থিত হল। দশজনের দ্রবীভূত অতিসাধারণ চিন্তার মূঢ়তা থেকে তিনি হ'লেন বিবিক্ত, মুক্ত। সমষ্টির স্রোতে দেহ ভাসিয়ে চলার প্রবণতা ও চিন্তায় সমতা রক্ষার আগ্রহ সেদিন হল ব্যাহত। অর্থাৎ শিল্পীর চিন্তায় যখন বিশিষ্টতার ছাপ পড়ল তখন তিনি দশের মধ্যে থেকেও একক, স্বতন্ত্র। জনগণের একজন তিনি কখনই আর থাকতে পারেন না। যখন চারিদিকের বাধা, বিপত্তি তাদের অসহায়তাকে বাড়িয়ে তোলে, আর্থিক ও মানুষ-গড়া সামাজিক নিস্পেষণে যখন তারা দিশেহারা তখন এক কাল্পনিক শক্তির প্রতি অগাধ ও সরল বিশ্বাসে, ধিক্কার দেয় নিজ-জীবনের অসীম দুর্গতিকে। এই দুঃখের দিনের অংশীদার দরদী শিল্পীও হন; কিন্তু ঠিক অন্যদিকে এই অনাচার সহ্য করতে না পেরেই মানুষের ব্যথায় অবমাননায়, অপাংক্তেয় মানুষের প্রতি একান্ত আন্তরিক আকর্ষণে শিল্পী এই ভাবকে নিজ কল্পনায় জারিত করে প্রকাশ ও প্রচার করেন প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রীতির মাধ্যমে। যে ব্যথা নিজের অনুভবে অসহ্য, তাকে সকলের মধ্যে ঘোষণা করাতেই শিল্পীর আত্মপ্রকাশের সম্পূর্ণতা।

এ আলোচনার সত্যতায় আমরা আলেক্সি পেশ্‌কভ্‌-কে নিতে পারি। এক সর্বহারা পরিবারে তার জন্ম যেখানে দারিদ্র আর তারই ফলে নীচতা ও হীনতা নিত্যসঙ্গী। সাত বছর বয়সে যে ছেলে পিতৃহীন ও অভিভাবকহীন আর বাধ্য হয়ে অসৎ আত্মীয়দের তাড়নায় নয় বছর

বয়সে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে ও বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তার জীবনের ধারা সহজেই অনুমান করা যায়। সে ভবঘুরের মত সমস্ত রাশিয়া ঘুরেছে, দেখেছে শোষকের অবিচার-অত্যাচার, সামাজিক নিষ্পেষণ ও কিছু না পাওয়া মানুষের হাহাকার এবং সর্বোপরি এসবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে আত্মিক অবনতি, উশৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতা। অভাবের তাড়নায় ও হৃদয়ের 'দন্ত-যন্ত্রণায়' পেশ্‌কভ্‌ উনিশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেছে এবং সেখান থেকে রক্ষা পেয়ে কলম ধরেছে একদিনের অভিজ্ঞতা-প্রকাশের বাসনায়, অবশ্য বন্ধুর অনুরোধও এখানে উল্লেখ্য। তার চিন্তা-অনুভূতি স্বাতন্ত্র্য লাভ করল, জনগণের 'একজন' ছিলেন বলেই ও সারাজীবন তাদের সুখদুঃখের অংশীদার হতে পেরেছিলেন বলেই আলেক্সি পেশ্‌কভ্‌ একদিন হলেন 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্‌' 'মাদার' 'চেলকাসে'র লেখক ম্যাক্সিম গোর্কি। জনগণের এমন আন্তরিক প্রতিনিধি-বন্ধু পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। তিনি জন্মলাভ করলেন সর্বহারা জনগণের মধ্যে কিন্তু সাহিত্যরচনা যখন শুরু করলেন তখন তিনি তাদের আশা-আকাঙ্খা-অনুভূতিকে নিজের চিন্তার বলিষ্ঠতার দ্বারা প্রকাশে সক্ষম হ'লেন। জনগণের মধ্যে জীবনের অনেকাংশ কাটিয়েছেন বলেই তার সাহিত্য জীবন্ত, বলিষ্ঠ, স্বরূপে অনন্যসাধারণ। তাদের ভিতরের অবস্থিতি তার সাহিত্যের খোরাক জোগালেও সেটা তাদের চিন্তার থেকে অনেক দূরে, ভিন্নতা অবশ্য প্রকাশ্য।

তবে কি বলতে হবে, সাহিত্য জনগণের জন্য সৃষ্ট? সেই প্রাচীনকাল থেকে অতিসাধারণ মানুষ রামায়ণ-মহাভারত ইলিয়াদ-অডিসির গল্পরস আস্বাদন করে আসছে। (সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত এর গল্পরসও কিন্তু সাধারণ মানুষের শুনবার পরিবেশ ছিল না, কারণ সকলের শিক্ষার অধিকার যেমন ছিল না তেমনি সাধারণ মানুষ ও উচ্চতর ভাষার সঙ্গে পরিচিতও ছিল না)। গল্পকথা শুনবার আগ্রহ চিরন্তনকালের মানুষের সার্বিক আগ্রহ তাই এদের মধ্যে যে কাহিনীরস আছে তারই প্রতি মানুষের অতি-আকর্ষণ। মনসা-চণ্ডী-ধর্ম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্য কোনোকালের সাধারণ মানুষ সাহিত্যরসের জন্য শোনে নি, শুনেছে ভয়ে ও আত্মমঙ্গলচিন্তায়। পূর্ববঙ্গের জলা-ভূমিতে তাই মনসামঙ্গলের এত জনপ্রিয়তা। সাপের ভয়ে আর সন্তানসন্ততির উন্নতি-শ্রী কামনায় রাত্রির পর রাত্রি মঙ্গলগান শুনেছে—পার্থিব লাভের আশায় তার এই ধৈর্য, কারণ কিছুই তো পায়নি এই সমাজের অতি-সাধারণ নগণ্য মানুষ। অনেকেই বলেন, চাঁদ সদাগরের অতুচ্চ বলিষ্ঠতা ও সীমাহীন মনোবল মনসামঙ্গলকে জনপ্রিয় করেছে। এমত সর্বাংশে ভ্রান্ত, কারণ প্রতি শ্রোতাই চাঁদের এই স্পর্দ্ধায় উৎসাহিত বোধ করে নি, চেয়েছে তার নতিস্বীকার আর যখন তাই হয়েছে তখন ফেলেছে স্বস্তির নিঃশ্বাস আর শতসহস্র প্রণাম জানিয়েছে চাঁদ-সদাগরকে নয়, মনসাকে, যিনি যে-কোনো মুহূর্তে কুপিত হলে আর রক্ষা নেই। পরকালের চিন্তাও নয়, চারিদিকের ছোট চাওয়া-পাওয়াকে নিয়েই তাদের চলা। সাহিত্যরস ও আবেদন তাতে আছে একথা অস্বীকার নিশ্চয়ই কেউ করবে না কিন্তু জনগণ তা অসীম আগ্রহে শুনেছে কারণ তা ধর্মকথা। তাই চণ্ডী-গীতা রামায়ণ-মহাভারত যত না হয় পঠিত তার চেয়ে বেশী হয় পূজিত। গল্পকথা অবশ্য সাধারণ মানুষ শুনতে খুবই উৎসাহী কিন্তু তা ছাড়া নির্ভেজাল সাহিত্যরস তাদের জন্য নয়।

জনগণের মনের মত করে যদি সাহিত্য রচিত হত তবে তা যেমন সাময়িকতার গণ্ডি

অতিক্রমে অসমর্থ হ'ত তেমনি শিল্পীর চমৎকারিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যও থাকত অস্ফুট। প্রাচীন সাহিত্যে তাও এখোরাক কিছুটা প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে তা আরও অসম্ভব হয়ে উঠল। গল্প-উপন্যাসে মনস্তত্ত্বের সুনিপুণ প্রকাশে, কবিতায় চিত্রকল্পের নব-ব্যবহার ও রীতি চাতুর্যে, বিন্তার বক্রতায় ও প্রকাশরীতির নবপদ্ধতিতে তা আর অতি-সাধারণ থাকল না; হ'য়ে উঠল রীতিমত মননশীল। তাই সাহিত্য আজ শুধু হৃদয়ের উপলব্ধির বস্তু নয়, বুদ্ধির তীব্রতাও সেখানে প্রয়োজন। এবং এও সত্য, সকলের উপলব্ধি ও বোধগম্যের জন্য সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভবও যেমন নয় তেমনি কাম্যও নয়।

আলবেয়ার কাম্যুর 'দি প্লেগ' বা 'আউটসাইডার'-এর যা বক্তব্য ও বলবার ভঙ্গি, এজরা পাউণ্ডের কাব্যের দুর্বোধ্যতা ও প্রকাশের বৈচিত্র্য নিশ্চয়ই সাধারণের পক্ষে সহজ নয়। আর্নেষ্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান এ্যাণ্ড দি সী' অতি-সাধারণ একটি বৃদ্ধও একটি বালকের অতি-তুচ্ছ মাছ-শিকারের কাহিনী। কিন্তু প্রকাশের অনন্য রীতির ফলে এই বড় গল্পটি সকল সমালোচকের বিস্ময়। চার্লস্ লুই ফিলিপ্পের 'দি সেন্‌টিনারিয়ান' ছোট গল্পে একজন সাধারণ সুবৃদ্ধের যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, যে দ্বিধা, ব্যগ্রতা তার মধ্যে প্রকাশিত তা অনেকের জ্ঞাত থাকলেও সকলের মনকে নাড়া দিতে পারবে না। 'পদ্মানদীর মাঝি'র অতি সাধারণ কাহিনীও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীর গুণে অপূর্বতা ও বিশিষ্টতা লাভে সমর্থ হয়েছে।

উদাহরণের বাহুল্যে লাভ নেই, তবে সাহিত্য সৃষ্টিতে সমতা ও সাম্যবাদ কখনই গ্রহণীয় হতে পারে না। উচ্চতর সাহিত্য সকলের পঠনীয় কখনই হতে পারে না; আর যদি তা হয় তবে সেটা সুখের নয়—সেখানে সাহিত্যের দীনতাই হয় প্রকাশিত।

তাহলে সত্য—সাহিত্য রচিত হয় জনগণকে নিয়ে। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে। বৃহৎ অংশ যে সর্বহারা শ্রেণী, তাদের প্রতিদিনের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, আশা-আকাঙ্খার কথাতেই মহৎ সাহিত্য পূর্ণ। যেখানে বৃহৎ উপেক্ষিত, যেখানে তাদের কথা না-বলার চেষ্টাতেই অনেকে উৎসুক সেখানে মহত্তর সৃষ্টিও প্রতিহত। আবহমান কালের মানুষ চেয়েছে সামান্যই, পেয়েছে আরও কম। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতন ভোগ করেও কিন্তু সহানুভূতি পায় নি বিন্দুমাত্র। প্রাচীন কালের কাব্য-সাহিত্য তো রাজ-রাজারার কীর্তি-কথায়ই পূর্ণ। আর প্রজাদের কথা যেখানে একান্তই না বললে নয়, সেখানেও অবজ্ঞামিশ্রিত উল্লেখ। কালিদাসে মানুষ হাসির খোরাক জুগিয়েছে। 'রঘুবংশে'র শেষ রাজার দর্শন অনেক কাকুতিতেও জনগণ পায় নি—পেয়েছে শ্রীচরণ দর্শন। ভারতীয় সাহিত্যে তো উচ্চবংশের মানুষেরই প্রতিষ্ঠা। কারণ অবশ্য ছিল। প্রথমতঃ অবজ্ঞা, উপেক্ষা; দ্বিতীয়তঃ বেশীর ভাগই কবি-সাহিত্যিক উচ্চবংশোদ্ভূত কারণ বিরাট ঐতিহ্যে-ভরা 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র ভারতবর্ষে সকলের শিক্ষালাভের অধিকার ছিল না (এই ভেদাভেদ-ভরা প্রাচীন ভারতের লৌকিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে আমাদের কত গর্ব, কত গালভরা আস্ফালন!) মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য-সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কথা আছে, আছে তুর্কী আক্রমণে মানুষের অশেষ দুর্গতির কথা। কিন্তু সেখানে নায়ক-নায়িকার স্থান দখল করেতে পারেনি অপাংক্তেয় মানুষ—তারা নিম্ন কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট, পেছনে বনেদী আসনের টিকিট মারা। ব্যাধ-আদি

বৈচিত্র্যে ভরা জনগণ কাব্যের নায়কের প্রায়শই অনুপযুক্ত। জনগণের কথা থাকলেও স্বীকৃতি সেখানে নেই। রেনেসাঁস বহু পরিবর্তন এনেছে কিন্তু পরিপূর্ণতা সেখানেও নেই—নইলে 'ভালগার পিপ্‌ল'-এর দরদী লেখক বোকাচিওকে প্রাজ্ঞ পেত্রার্ক জনগণের অবজ্ঞার রাজ্য থেকে ক্লাসিকের জগতে নিয়ে যেতেন না। ফরাসী বিপ্লবোত্তর কালেই মানুষের সত্যকার স্বীকৃতি হল শুরু আর তারপর দৃপ্ত পদক্ষেপ। উনবিংশ ও বিংশ শতকের সাহিত্য তো মানুষের কথায় ও জয়গানে মুখর। গী দ্য মোপাসাঁর 'এক তাল চর্বি', 'কৃষ্ণ-বালিকার কাহিনী', আলফোঁস দদের 'দুটি সরাইখানা' প্রভৃতি গল্প এক নব চিন্তার ও নবধারার প্রবর্তন করল। যে আন্তরিকতা এখানে প্রকাশিত তা তুলনা রহিত। তাই গোর্কি 'মানুষের জন্ম' গল্পটিতে যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিলেন তা অপূর্ব হলেও ইতিহাসে প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক। চিন্তার ব্যাপকতা, মানবতাবোধের উজ্জীবন, সাধারণ মানুষের ভিতর থেকে সাহিত্য-শিল্পীর উৎসার ও প্রসার এতে সহায়ক হয়েছে। জীবন সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ তাদের ছিল বলেই সাহিত্যসৃষ্টিতে জীবন ও জীবনদর্শন উভয়েরই সন্ধান পাওয়া গেল। শুধু দেখা নয়, ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা যেখানে ব্যাপ্ত সেখানেই সার্থক শিল্পের জন্ম। জনগণের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে যেমন জীবনের সমগ্রতার সন্ধান মিলবে না তেমনি সহানুভূতির স্বল্পতায় জীবনদর্শনও গড়ে উঠতে পারে না। অভিজ্ঞতার ব্যাপকতা ও সহানুভূতির গভীরতা না থাকলে শিল্প শাশ্বত বাণী-প্রকাশে অক্ষম। তাই হেনরী জেমস্ বলেছেন, 'নো গুড্ নভেল উইল এভার প্রসিড্ ফ্রেম্ এ সুপারফিসিয়াল্ মাইণ্ড।' কিন্তু জনগণের সান্নিধ্যে যে অভিজ্ঞতা তা সহানুভূতির মিশ্রণে সৎ-সাহিত্যের জন্ম দেয়। কিন্তু অনেক সময়েই সংলক্ষ্য, বহু সাহিত্যিকই প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতার পুঁজি ভাঙিয়েই পরবর্তীকালে বিলাসের আসনে জনগণের দরদী-সাহিত্য রচনা করেন। এই চরম ফাঁকি তাৎক্ষণিক ভ্রান্তিতে ধরা না পড়লেও কাল তাকে বিচার করবেই। পাশ্চাত্যের কিছু কালজয়ী শিল্পী নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করবার যে প্রবণতা দেখান তাতে শেষ জীবন পর্যন্তও তাদের সাহিত্যের আবেদন ক্ষুণ্ণ হয় না বরং বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও ব্যাপকতায় এবং নব উপাদানের সুষ্ঠু প্রকাশে বড় বিস্ময় লাগে। আমাদের বাংলা-সাহিত্যের সামান্য কয়েকজন সাহিত্যিক ব্যতীত প্রায় অধিকাংশই পূর্ব অভিজ্ঞতার চর্বিণ-চর্বণ করে থাকেন, ফলে তাদের রচনা একঘেয়েমীর শেষ সীমা স্পর্শ করে। সুলভ খ্যাতি ও সুখবিলাস অভিজ্ঞতালাভে বাধা জন্মায়।

তাহলে একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই উচ্চারণ করা যেতে পারে, জনগণের দ্বারা বা জন্য নয়, তাদের আশা-নিরাশার ব্যাপক কাহিনীই জনগণ ও সাহিত্য বিষয়ক এত কথার উৎসার ঘটিয়াছে।

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

শিল্পে মন

মনে হচ্ছে ঠিক যেন দোরোখা শালের মতো, দুপিঠেই কারুকাজ-করা—ভাবের কাজ আর জ্ঞানের কাজ। বাইরের জগৎ থেকে আমরা যা-কিছু জোগাড় করি ভেতরমহলের জন্যে, তাদের বেশির ভাগই পুরো চেহারা নিয়ে আসে না; হয় কাঁটা ছেঁড়া, নয় তো জবড়জং। ভাবের দিকটি বসে এদের ওপর পাকা কারিগরি ফলাতে; সেই কারিগরিতেই শিল্পের রসলোকে চোখ রেখে জোড়া দিয়ে কিংবা ঘষে মেজে সবকিছুর গোটা রূপ গড়ে দেয়। এই যে রূপ পাওয়া গেলো, এটি সহজভাবে যা বোঝায় তা নিয়েই যদি খুশি হই তবে আর শিল্পের রসিক হতে পারলুম না। কারণ এর ভেতরে একটা ইশারা আছে। সেই ইশারাটি ধরতে হবে, ভেতরকার লুকিয়ে-থাকা মানেটি খুঁজে বের করতে হবে। মরা গাছের কোটরে সবুজ টিয়ের বাসা—ছবি হিসেবে কতোই সাধারণ, কিংবা গল্পে-উপন্যাসে যে পাই মাঝ রাতে ঘরে-দোরে ঝড়ের মাতামাতি—এ তো সোজা কথায় একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। ইশারা কিন্তু অন্য দিকে। সেখানে ঐ ছবিটির মানে হচ্ছে—মৃত্যুর ভেতর দিয়েই জীবন চলেছে আপন চালে, মাঝরাতের ঝড়—মানে, হঠাৎ-ভিড়-করে-আসা দুঃসময়। রূপের গভীরে এই ইশারার ধাঁধাটুকু একবার বসাতে পেরেছে কি অমনি ভাবের কাজ সারা।

জ্ঞানের দিকটি বড়ো হিসেবী আর হুঁশিয়ার। প্রমাণ ছাড়া সে এক পাও চলে না, অকারণের ওপর তার কোনো টান নেই, বরং চেষ্টা করে তফাতে রাখে। এমনিধারা জ্ঞানের দিকেরও কিন্তু ডাক পড়ে শিল্পের কারুশালায়। কারণ রূপ শুধু গড়লেই হয় না, তা সাচ্চা হোলো কি না, কিংবা যদি একেবারে মেকি হয় তবে রসিকের হাটে তাকে সাঁচ্চা বলে চালাতে গেলে কীভাবে সাফাই গাইতে হবে—এ সব ভাবনারও দরকার আছে। আর জ্ঞানের দিকটি সে ব্যাপারে ভারী পটু। যেমন ভূতের গল্পে ছোটো ভূত বড়ো ভূত সবাইকারই দেহ আছে, আমাদের মতো হাসি-কান্না খিদে-তেষ্টা আছে, তাই তাদের হাত পা কেটে গেলে লাল রক্তই বেরোয়। এই যে সার বেঁধে সবটুকু স্বাভাবিক করে তোলা, নিছক কল্পনা হলেও তাকে যুক্তির কাঠামোয় দাঁড় করানো—এইটেই জ্ঞানের দিকের কাজ। আবার জ্ঞানের দিকটি যদি ভাবের দিকের ওপর সওয়ার হয়ে বসে তবে মুশকিল আসানের উপায় দেখিনে। তখন তো রসিকমহল গোড়াতেই মোক্ষম বাণ ছাড়বে—ভূত বলে কিছু নেই। আর এবাণের ঘায়ে বেচারা ভূত তো মারা যাবেই, সে সঙ্গে শিল্পও।

মন যাদের নিয়ে কারবার করে তাদের ভেতরে খুব বেশি মিল নেই। এই অমিলের আসরেই মজবুত মন জোরালো অনুভূতির মধ্যে দিয়ে ভেতরকার ছোটো গণ্ডীটাকে ক্রমেই বড়ো করে তোলে। তাছাড়া মন হচ্ছে খোপকাটা—ডাকঘরের চিঠি সাজিয়ে রাখবার বাক্সের মতো; এদের

কোনটায় সাড় আছে, কোনোটা অসাড়, কোনোটা-বা দুয়ের মাঝামাঝি। আমরা বাইরের জগৎ থেকে যা জোগাড় করি কিছুই হারায় না, সবই এই কুঠুরীগুলোতে জমা হয়ে যায়। তারপর যখন শিল্প গড়তে বসি তখন এদের থেকে মাপসই আর মানানসই মালমশলা নিয়ে জোড়ালো অনুভূতির পথ বেয়ে হাজির হই ভেতরকার বড়ো গভীর কাছে, নানান রসদের মাঝে মিলের জোড়টুকু লাগাবার চেষ্টা করি।

যেহেতু জীবন হোল মনের হাজার ইচ্ছে ও চেষ্টার ঢেউ-তোলা, আর আকছার-দেখা সেজন্যে সেই মামুলি জীবনকেই যেহেতু আমরা নিজের হাতে গড়ে চিরকেলে করে দেখতে চাই, সেজন্যে সব শিল্পই হবে মন-ঘেঁষা। তাই বলে যেমনটি মনে হোলো, ভাষাতে রঙে সুরে তেমনটি পর পর সাজিয়ে গেলেই,—মানে, কোনো কিছুকে সরাসরি নকল করলেই—শিল্প গড়ে উঠবে না। কতকগুলো কথাকে সুর করে টেনে টেনে নাকের মধ্যে দিয়ে বের করলেই দুঃখের গান হয়ে যায়-না। শিল্পীমনের ঘষা মাজা দরকার। এতে যদি কেই ভেবে রাখেন, ঘষা-মাজাটাই যখন বড়ো তখন যা কোনোদিন মনেও হয় নি, ঘষে মেজে তার ওপরেও কারিগরি ফলানো যাবে, তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন। কারণ এই মন-ঘেঁষা শিল্প যে গড়ে তার যেমন একটা জোর আছে, যাকে গড়া হবে তাকেও তেমনি জোড়ালো করতে হবে। আর জোরালো করতে গেলে মনে তার স্বাদ পাওয়া চাই-ই।

মনের দুটো তরফ আছে। একটা, ব্যক্তিমন; আরেকটা, সমাজমন। যে-মন কোনো একজনের একচেটে খেয়াল-খুশি-ভাবনা-কল্পনার বনেদের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে বলি ব্যক্তিমন। সমাজমন হচ্ছে হাজার ব্যক্তিমনের যোগফল। আর, যোগফল বলেই আলাদা করে কাউকে চেনা যায় না, অনেক কিছু তালগোল পাকিয়ে একটা সাধারণ কিছু হয়ে উঠেছে। সমাজমন সহজের নেশাতেই বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসে, আর সহজকে পেরিয়ে অ-সহজের দিকে যাওয়াতেই ব্যক্তিমনের যতো দুরন্তপনা।

এদেশের বিদেশের সব দেশের পুরাণ খুললেই মনে হবে যেন যাদুকরের খেলা দেখছি। পুরোণো দিনের সমাজমন এই সব পুরাণের পাতায় লিখে রেখেছে দেবদেবীর ইচ্ছেমতো রূপ বদলানোর কথা, জলপরী-আকাশপরীর কথা, সাতমাথাওয়ালা দত্যি কিংবা ডানাওয়ালা সিংহের কথা; এমনি আরো কত কী। এ নিয়ে ছবিও এঁকেছে। বুদ্ধির দোরে ঘা লাগালেও এদের সব কিছুর ব্যাখ্যা মিলবে না। অবশ্য আজ আমরা মাথা খাটিয়ে এ সবের ভেতর থেকে নানান মানে বের করছি, আর খাসা প্রতীক ব্যবহার করতে পারতেন বলে পুরাণের শিল্পীদের নামে বাহবা দিচ্ছি। তবু এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়, যাঁরা এগুলো গড়েছিলেন, তাঁরা হরেক রকম তাজ্জব শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। ফলে সেই ধূ ধূ অতীতের শিল্পীরা হামেশাই এদের দেখেছেন মনের যুক্তিছাড়া কোন থেকে ছন্দছাড়া রুচি নিয়ে, আর সে আমলের সমাজমন এদের মেনে নিয়েছে শিল্পের আওতায় নয়, ধর্মের ঘেরাটোপে।

আমরা যখন কোন কিছুকে সুন্দর বলি তখন সৌন্দর্যকে তার গুণ হিসেবেই ধরে নিই; আসলে কিন্তু এটি আমাদের ভেতরের আনন্দ ছাড়া আর কিছুই নয়। রুচির হাত-ধরা আবেগ তার

বায়নামতো জিনিস পেলেই খুশি হয়; আমরা সেই খুশিকেই জিনিসটির ওপর চাপিয়ে তাকে সুন্দর বলে ভাবতে শিখি। সাবেককালের সমাজে এই ভাবনাটুকু ছিল সবাইকার একইরকম; কারণ সমাজের সাথে তখন মানুষের বাঁধন ছিল সাত পাকের নয়, শত পাকের। তাই পুরাণ রাশি রাশি আজগুবি গল্পের যাদুকর হলেও তা বিশেষ যুগের সমাজমনের ধ্যানধারণার মহাফেজখানা। এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে, এক যুগ থেকে আরেক যুগে এ সব ধারণার হাত-বদল হয়, আর এমনি করেই আজ আমরা এদের মালিকানা পেয়েছি। ফলে, আজকের দিনেও গল্পের দত্যি-দানোরা হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করে, তাদের মুখের ভাষা হুবহু আগের মতোই রয়ে গিয়েছে; একালে বসেও মহাপুরুষের ছবিতে মাথার চারপাশে একটা আলোর চাকা না আঁকলে তাঁকে ঠিক মহাপুরুষ বলে মানতে ইচ্ছে করে না।

একথা শুনলে হয়তো অনেকে শিউরে উঠবেন যে, আমাদের সবাইকার ভেতরে আজও সেই আদ্যিকালের মানুষ বেঁচে আছে। শিউরে উঠলেও না মেনে তো উপায় নেই, আমরা তাদেরই রক্ত বয়ে নিয়ে চলেছি আস্‌ছে কালের জন্যে। সেকারণে, পুরোণো দিনকে পেছনে ফেলে অনেক এগিয়ে এসেছি বলে যতোই বুক ফুলিয়ে বেড়াই না কেন, আজও ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের মাঝখানে পুরাণের অজস্র প্রতীক গড়ে তুলি, জেগে উঠে তাদের কিম্ভুত মনে হয়, ব্যাখ্যা করতে পারিনে। তাই বলছিলুম, বুদ্ধির কারবারী হয়ে ব্যক্তিমনকে রাজা বানালেও সমাজমন আড়ালে--আবডালে থেকে ঠিকই চলেছে সাথে সাথে, তাকে একেবারে মুছে ফেলা যায় না, রাতের আকাশ যেমন পারে না সবটুকু আলো মুছে ফেলতে।

আমরা পুরাণের গল্পগুলোকে বলি আজগুবি, চরিত্রগুলোকে বলি কিম্ভুত। তার কারণ, ভেবে রেখেছি, ওদের আমরা মানি নে। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি না মানি, তবে পুরাণের গল্প পড়ে যে আনন্দ পাই তা আসে কোথা থেকে। সে কি না—মানবার আনন্দ? তা তো নয়। না-মানবার আনন্দে কিছুটা হামবড়া ভাব থাকে। পুরাণের গল্প পড়লে সে ভাবটুকু যখন জাগে না, তখন আমার মনে হয়, ওদের আমরা জ্ঞানের কোঠায় না মানলেও সমাজমনের রসের খাতিরে ভাবের কোঠায় মেনে নিই।

একালের শিল্পীর রচনাকেও খাঁটি ব্যক্তিমনের কারিগরি বলা যায় না, এর ভেতরেও সমাজমন কাজ করে চলেছে। কারণ আমরা সমাজের মাঝেই বাস করি—ভবের সমাজ কিংবা ভাবের সমাজ। এই বিশেষ আবহাওয়ায় যারা মানুষ, তারা সবাই প্রায় একই রকম ধ্যানধারণা নিয়ে চলেছি। এখন, এদের কেউ যদি শিল্পী হয়ে ওঠেন তবে তাঁর ভাবনা-কল্পনা-আবেগ-দরদের সাথে বাকি দশজনের ভাবনা-কল্পনা-দরদের নিশ্চয়ই কোনো-না কোনো-দিক থেকে কিছু-না-কিছু মিল থাকবেই। ফলে শিল্পীর রচনায় যে-কথা ফুটে ওঠে তা ঐ দশজনেরই কথা। এমনি করে ব্যক্তিমনের মাঝখানে জড়িয়ে মিশিয়ে রয়েছে সমাজমন—নদীর জল পলিমাটির মতো।

তবু ব্যক্তিমনের একটা বড়ো বাহাদুরি হচ্ছে এই যে, তা নিজের রচনায় নিজের ছাপটি এমন করে লাগিয়ে দেয় যাতে আর কেউ তার মালিকানা দাবি করতেই পারে না। তুলির আঁচড়, ভাষার কারুকাজ, রাগ মেলে ধরার ভঙ্গি, এমনকি মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিটি পা-ফেলা, হাত-নাড়া যেন

আমাদের খোঁচা মেরে জানিয়ে দেয় এটি অমুকের, ওটি অমুকের। সেজন্তেই এক ভাষার রচনাকে আরেক ভাষায় নিতে গেলে মাঝপথে অনেকটা জিনিস নষ্ট হয়, কিংবা হয়তো সবটুকু নেয়া গেলেও যেমন করে এক ভাষায় ছিলো ঠিক তেমন করে আরেক ভাষায় তাঁর ঠাঁই হয় না। কারণ ব্যক্তিমন নিজেকে নিয়ে খেয়ালমাফিক খেলা করবার মতো যে-ধরন যে-চলন বেছে নিয়েছিলো, তাকে ভিন ছাঁচে ফেলতে গেলে এই টানাটানির জোরের কথাটাকে একেবারে চাপা দিয়ে রাখা যায় না।

এর ওপর, ব্যক্তিমনের রচনায় তার নিজের খুশিটাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। তাই নিজের খুশি হওয়াকেই সে রচনার উৎরে যাবার মাপকাঠি বলে মনে করে। রসিকমহলকে খুশি করবার দায় তার নেই, এমন কি রচনার প্যাঁচোয়া রীতি নিয়ে যদি রসিকমহল থেকে নালিশ ওঠে তবু ব্যক্তিমন মোড় ফিরতে গররাজী। সোজা কথায়, সমাজমনকে পরোয়া না করে হামেশাই ব্যক্তিমন চলে আপন চালে।

অনেক সময় দেখা যায়, বিষয় এক হলেও কোনো শিল্প হয়তো অন্য শিল্পকে টেক্কা দিচ্ছে। এর জন্যে পুরোপুরি ব্যক্তিমন দায়ী। কারণ সমাজমনের ভাঁড়ার থেকে কাঁচামাল জোগাড় করে তার ওপর মানানসই কারুকাজ ফলিয়ে তবে তাকে শিল্পের মহলে সাজিয়ে রাখা যায়। এই কারুকাজ করবার বাহাদুরিটুকু ব্যক্তিমনের একচেটে—কিছুটা একেবারে সে নিজেই গড়েছে, কিছুটা পেয়েছে বংশধারা থেকে আর তার কালের চল্‌তি ধারণা থেকে।

আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে যে অগুণতি মানুষের মেলা তাদের মনকে যদি শিল্পছাড়া বলি তবে সত্যিই অন্যায় করা হবে। বরং বলব, রূপ গড়বার কারুশালায় তারা সব পাপড়ি-মেলতে-না-পারা শিল্পীর দল। শিল্পের মালমশলায় তারা হয়তো গরীব, কিংবা বাঁচবার তাগিদে লড়াই করতে গিয়ে মনের শান্তি আর নিরিবিলি সময় হারিয়ে ফেলেছে, অথবা কোনো কিছু তৈরী করা তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা যদি সহজভাবে কালি-কলম-তুলি-পটের কাছাকাছি আসে আর ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে ভাবতে শেখে, তবে নিশ্চয়ই শিল্পের একটা সমাজ-নেঙড়ানো রূপ পাওয়া যাবে,—যেমন পাওয়া গিয়েছে লোকসাহিত্যে লোকশিল্পে লোকসংগীতে। দরদী ব্যক্তিমন আপন ছদ্মবেশে সমাজের এই অসংখ্য বোবা মনের কথাই ফুটিয়ে তোলে নিজের রচনায়। সে যে শুধুই সমাজমনকে ফের গড়ে দেয় তা নয়, সেই সঙ্গে তার লুকিয়ে থাকা গৌরব আর দৌলতকে মেলে ধরে শিল্পে।

মন হচ্ছে মাটির কাঁপন টের-পাওয়া যন্ত্রের মতো বড়ো বেশি সজাগ। সামান্য নাড়া লাগলেই সে তার এমন ছবি এঁকে রাখে যা কিছুতেই ঝাপসা হয়ে যায় না। ছোটো বড়ো সব ইচ্ছেই মনের মহলে লুকিয়ে কাজ করে চলে, বাইরে থেকে তার হদিশ মেলা ভার। এখন, যে-ব্যক্তিমন শিল্পকে গড়ে সমাজমনের খাতিরে, গোড়াতে সে কড়া যাচনদার হয়ে সমাজের সাথে ঐ সব ইচ্ছের সম্পর্কটা বুঝে নেয়, তারপর দরকার মতো ইচ্ছেগুলোকে সমাজমনের ছাঁচে ঢালাই করে ভেট দেয় রসিকের আম-দেওয়ানে। আর, যে ব্যক্তিমন নিজের খাতিরেই শিল্পকে গড়ে, সে তার ইচ্ছাগুলোকে পুরোপুরি মেলে দেয়। এমনিধারা নিজেকে উজাড় করে মেলে ধরতে গিয়ে অনেক সময় সে নিজেকেই আবিষ্কার করে বসে।

শিল্পীর মারা যাবার পর একশো বছরেও যে শিল্প মারা যায় না, তাকে বাহবা দেবো বৈকি। ব্যক্তিমনই বলি আর সমাজমনই বলি—সবই একটা বিশেষ সময়ের বাসিন্দে। এখন, যে মন নিজের কালের বেড়া টপকে চিরকালের খোলা পথের চলনদার হতে পারে, বুঝতে হবে, সে-মন সকল কালের রসিকমহলের চাহিদার ঢঙটুকু আঁচ করবার ক্ষমতা রাখে। ঐ একশো বছরে কালের বদল হবে, কালের কেনা গোলাম মানুষেরও। তবু এরই মাঝখানে পুরো ঠাট বজায় রেখে কোনো শিল্পের অনেকদিন ধরে টিঁকে থাকবার কারণ, শিল্পটি এমন বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে যা কাছের দূরের সব মানুষেরই সাধারণ ধারণার সাথে, সহজ জানাশোনার সাথে আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে যায়।

শিল্পীমনকে জানতে পারলে শিল্পকে জানা যাবে, তেমনি শিল্পের মানেটুকু যদি ধরা যায়, তবে শিল্পীমনের ধরণটুকু আঁচ করতে একটুও বেগ পেতে হয় না। এখানে, শিল্পীমন আর শিল্পীর মন—কথা দুটোকে আমি তফাৎ করতে চাই। শিল্পীর মন বলতে বুঝি, ব্যক্তি কিংবা সমাজের যে-মন বাইরের জগতের সাথে জল-উঁচু জল-নীচু করে চলে, অর্থাৎ যে-মনের ওপর ধুলোবালির সংসার তার পাকা টিপসই মেরে দেয়; এ-মন শুধু কুড়িয়ে বেড়ায়—ঝুলি-কাঁধে হরেক রকম টুক্‌রোটাক্‌রা কুড়োনো মানুষের মতো। এর ওপরে আছে যে, তাকেই বলি শিল্পীমন, গড়বার কাজে সে-ই এলেমদার কারিগর, কুড়িয়ে-পাওয়া জিনিস নিয়েই সে তৈরী করে বাহারে কাটুমকুটুম। আরো সহজভাবে বলা যায়, কোনো লোককে ওপর থেকে ভারী আমুদে দেখালেও সে যখন শিল্প গড়ে তখন তার মাঝে হয়তো দুঃখের সুরটাই থাকে বেশি—এখানেই শিল্পীর মন আর শিল্পীমনের ফারাক।

শিল্পের সাথে সমাজের কতটা যোগ তা সহজেই জানতে পারা যাবে শিল্পী ও সমাজের সম্পর্কটুকু পরখ করলে। যদি কোনো শিল্পে সমাজমনকে একেবারেই খুঁজে না পাওয়া যায় তবে বুঝতে হবে তা বারান্দায় ঝোলানো সৌখিন অর্কিডের মতো—শেকড় তার মাটি পর্যন্ত পৌঁছয়নি। সাধারণত সমাজমনকে পটভূমি হিসেবে দাঁড় করিয়েই শিল্প গড়ে ওঠে। কিন্তু সমাজমন আর শিল্পের গাঁটছড়া বাঁধাটাই বড়ো হয়ে উঠলে একঘেয়ে সমাজমনের নকিবীয়ানার তাঁবেদারি করে করে শিল্পের এমন দশা হয় যে, সে আর কোনোদিন রসিকমহলে নিজের পরিচয় নিজে দিতে পারে না। শিল্পের মেজাজ আর সমাজমনের মর্জির যোগাযোগের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। তবু এ কথা ঠিক, সমাজমনের কোনো সমস্যা নিয়ে ব্যক্তিমনই আলোচনা করতে পারে জোরালোভাবে, সমাজমনের নিজের ক্ষমতায় তা কুলোয় না; কারণ ভাবনা তার এলোমেলো, ধারণা তার ভাসা-ভাসা।

সমাজমন যেমন শিল্পের ওপর ছায়া ফেলে, শিল্পের ছাপও তেমনি পড়ে সমাজমনে। সমাজমন বিপদ ঘটায় তখনই যখন পয়লা নম্বরের শিল্পকে বাতিল করে হুজুগে মেতে উঠে কোনো খেলো শিল্প নিয়ে নাচানাচি সুরু করে দেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ শিল্প খেলো আর কোন্‌টা বা পয়লা নম্বরের—সে বিচার কে করবে। ব্যক্তিমন, না সমাজমন? এখানে, ভুল-বোঝাবুঝিটুকু এড়াতে গেলে আমার মনে হয়, শিল্পের বিচার করবার এখ্‌তিয়ার দুয়েরই আছে, আর নিজের নিজের ধারণা নিয়ে দুজনেই খুশি থাকুক। কারণ ব্যক্তিমনের পছন্দকে যেমন সমাজমনের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি সমাজমনকেও সব দিক থেকে ব্যক্তিমনের ছাঁচে আনা সম্ভব নয়। অবশ্য এলেমদার ব্যক্তিমন অনেক সময় শিল্পের বাহাদুরি দেখিয়ে সমাজমনকে গড়ে তুলতে পারেন, কিংবা বেঁকে-বসা

সমাজমনকে টেনে আনতে পারেন নিজের দলে।

অনেকে বলেন, শিল্পের কারবারে সেই সব রসদই বেছে নেওয়া উচিত, ব্যক্তিমন আর সমাজমন যাদের থেকে একই সাথে রস নিতে পারে। আমি কিন্তু এই দলে নাম লেখাতে নারাজ। সমাজমনের জন্যে শিল্প থাকুক তাতে আপত্তি করিনে, বরং খুশি হই, সে সঙ্গে শিল্প নিছক ব্যক্তি-মনেরও হয়ে উঠুক। সব শিল্পই যদি সমাজমনের খাতিরে গড়ে ওঠে, তবে তো ব্যক্তিমনের খেলা করবার উঠোনটুকুও আর থাকে না। তাছাড়া সমাজমনের আওতায় পুষ্ট হলেও ব্যক্তিমন অনেক ব্যাপারেই তাকে পেছনে ফেলে চলে আগ বাড়িয়ে। এমন অবস্থায় দুজনের হাতে একই কড়া লাগালে বেচারা ব্যক্তিমনকে পায়ে পায়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। আর, নিজের স্বচ্ছন্দ তাল হারিয়ে খুঁড়িয়ে চলতে গিয়ে হয়তো কালে ব্যক্তিমনের চলাটাই একেবারে থামে, কিংবা একটানা ঐ খুঁড়িয়ে চলার হ্যাঁচকা টানে সমাজমন বেসামাল হয়ে পড়ে।

অবশ্য আজকের দিনে গণশিল্পের ধুয়ো তুলে সমাজমন-ঘেঁষা শিল্পকে বেশি দর দেবার আর ব্যক্তিমন-ঘেঁষা শিল্পকে গা-বাঁচিয়ে-চলা বাবুগিরি বলে জাহির করবার একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। আমি গণশিল্পের পক্ষে, আমি চাই এমন শিল্প গড়ে উঠুক যাকে জনসাধারণ একান্ত নিজের বলে মনে করতে পারে। তবু বলব, ব্যক্তিমনকে পুরোদস্তুর খারিজ করলে শিল্প একেবারে মুদিখানার চাল-ডাল-তেল-নুন হয়ে উঠবে। ফলে, রোজদিনকার হাড়ে-হাড়ে জানা কথাটিই শিল্পের মারফত আবার জানালে রসিকমহলের কাছে তা বস্তা-পচা বলে মনে হবে। এর মস্ত বড়ো নজির তো আমাদের হাতেই রয়েছে যে, রাজারাজড়ার যুগ পেরিয়ে এসে আজও সাধারণ মানুষ সমাজের কথাকে বেশি আদর করে না, যতটা করে রাজার কাহিনীকে। ঐ ঝলমলে পেশোয়াজ, ঝকঝকে তরোয়াল, রঙে-রাঙতায় ঐ যে একটা জমক, তা বারেবারে অরুচি ধরে-যাওয়া জিনিস নয় বলেই সাধারণ মানুষের মনকে টানে, তাকে দেয় হাঁপ ছাড়বার আনন্দ। আরো একটা কথা হোলো, যতোই দিন যাচ্ছে, আমাদের ব্যক্তিমন ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে,—আঁটোসাঁটো সমাজজীবন তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়বার এইটেই বড়ো কারণ। কাজেই এমন অবস্থায় ব্যক্তিমনকে খারিজ করা আর ব্যক্তিমন-ঘেঁষা শিল্পকে বাবুগিরি বলা নিশ্চয়ই মাথাওয়ালার কাজ হবে না।

দেবব্রত চক্রবর্তী

স মা লো চ না

লক্ষ্মী ও গণেশ ॥ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; ১০০।১ ভূপেন বোস এভিনিউ থেকে পুরোগামী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত; ১৩৮ পৃষ্ঠা মূল্য চার টাকা।

ভারততত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করে বাংলায় যারা কৃতিত্ব অর্জন করেছেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্থান নিঃসন্দেহে তাদের প্রথম সারিতে। জীবিতকালে তিনি পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বহু অজ্ঞাত তথ্য জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিপথে উপস্থিত করেছিলেন। ভারততত্ত্বের ভিন্নভিন্ন শাখায় তাঁর প্রবেশ ছিল অত্যন্ত সহজ এবং তপস্বীর নিষ্ঠা নিয়ে তিনি সমগ্র জীবন জ্ঞানের অনুশীলন করে গিয়েছেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন ও সাধকোচিত নিষ্ঠা জ্ঞানান্বেষীর আদর্শ। তিনি তাঁর রচিত অনেক সন্দর্ভ প্রকাশ করে গিয়ে থাকলেও শুনেছি যে তাঁর অপ্রকাশিত বহু রচনা এখনও রয়েছে। লক্ষ্মী ও গণেশ সম্পর্কিত বর্তমান পুস্তকটি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অপ্রকাশিত রচনা থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। বাংলাভাষায় ভারতীয় দেবদেবী তথা মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কে ভাল আলোচনা হয় নাই বলেই চলে। এঁদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক নির্যাসের কতখানি যে এই দেবদেবী ও তাদের মূর্তি:ক অবলম্বন করে রূপ লাভ করেছিল তা ভারততত্ত্ব অনুশীলনকারীদের অজ্ঞাত নয়। যে সব সমাজে ঈশ্বরোপাসনায় মূর্তির ব্যবহার হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই দেবদেবী ও তাঁদের মূর্তিকে অবলম্বন করে সেই সমাজের মনে যে সব জিজ্ঞাসা জেগেছে, যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে সেই সব জিজ্ঞাসা ও সমস্যা সম্পর্কিত মনন, অনুসন্ধান ও রূপ কল্পনার ব্যাপক পরিচয় বিধৃত হয়েছে। এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সেমেটিক জাতির মানুষের সমাজে মূর্তি পূজার প্রতি প্রবল বিরাগ ছিল। এছাড়া প্রায় সব প্রাচীন সমাজেই ভিন্নভিন্ন পর্যায়ে নানা ধরণের দেবদেবীর পরিকল্পনা হয়েছে এবং মূর্তিরও উদ্ভব হয়েছে। অনেকে মনে করেন ভারতের বেদ রচনাকারী অধিবাসীরা মূর্তি পূজায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু এ ধারণা বেদের আভ্যন্তরীণ বহু প্রমাণে ভিত্তিহীন বলেই অনুমিত হয়। বেদ রচনাকারীরা কিন্তু নানা দেবতার অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, আবার এই সব নানা স্তরের শক্তি সম্পন্ন দেবদেবীরা যে মূলত এক অখণ্ড সত্বার অংশ এ ধারনাও তাঁদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্রমে বেদে উল্লিখিত প্রবল ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতা ইন্দ্র, মরুৎ অগ্নি নাসত্য এবং আদিত্য, রুদ্র, বসু ইত্যাদি পর্যায়ের দেবতারা পরবর্তী যুগে বিষ্ণু, শিব, সূর্য, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনমানস থেকে দূরে অপসারিত হয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ যখন পূর্বোত্তর-ভারতের সমাজে আবির্ভূত হন তখনও বৈদিক আচার ও ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবদেবীর প্রভূত প্রভাব ছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে কোন সময়ে সমাজে বিষ্ণুর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষ্ণু বৈদিক দেবতা হলেও পুরাণগুলিতে বিষ্ণুসম্পর্কিত পরিকল্পনার বিবর্তন ঘটে। মহাভারত এবং রামায়ণও বিষ্ণুভক্তদের হাতেই পূর্ণবিবর্তন লাভ করে। এই মহাকাব্যগুলি এবং বিভিন্ন পুরাণে এই বিষ্ণুকে অবলম্বন

করে একদল নূতন দেবদেবী অভূতপূর্ব আড়ম্বরের সঙ্গে ভারতীয় সমাজে স্থানলাভ করেন। এই সব দেবদেবীর মধ্যে কোনকোনটির নাম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া গেলেও অধিকাংশেরই বেদের যুগে কোন উল্লেখ বা মর্যাদা ছিলনা। গণেশ এবং লক্ষ্মী উভয়েই এই পর্যায়ের নূতন পরিকল্পিত দেবতা। এই সূত্রে এই দুই দেবতারই উদ্ভব ও বিবর্তন নিয়ে ভিন্নভিন্ন কাহিনী ও মত আছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এতৎ সম্পর্কিত সমস্ত উপকরণ অনুসন্ধান, বিচার ও বিশ্লেষণ করে তার তথ্য রচনা করেছেন।

ভূমিকায় সূচনা নামক নিবন্ধটি ভারতীয় ধর্ম ক্রিয়াকলাপ ও দেবদেবী সম্পর্কে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সন্দর্ভ যদিও লক্ষ্মী ও গণেশ সম্পর্কে এই সন্দর্ভের প্রত্যক্ষ যোগ কিছু নাই। লক্ষ্মী সম্পর্কে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আলোচনাটি প্রভূত পরিমাণে উপকরণ বহুল এবং তথ্য সমৃদ্ধ। ঋগ্বেদে শ্রী ও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ আছে তবে এর কোনটি দেবতাবাচক নয়। ঋগ্বেদে পৃথিবীই দেবীদের মধ্যে অন্যতমা। আর তিনিই অদিতীরূপে দেবমাতা। পরবর্তীযুগে শ্রী ও লক্ষ্মী সৌভাগ্যের দ্যোতক দেবী ও প্রধানত বিষ্ণুর শক্তিরূপে পরিচিতা। কোনকোন বিষ্ণু মূর্তির পাশে শ্রী ও পৃথিবীর মূর্তি, কোন কোন বিষ্ণু মূর্তিতে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়। দুই বা চারটি হাতীর দ্বারা অভিষিক্ত একধরণের নারী মূর্তি বৌদ্ধশিল্পে সন্নিবিষ্ট করা হত। আনন্দকুমারস্বামী এই মূর্তিকে অভিষেক লক্ষ্মী বলে নির্ণয় করেন। ইতিপূর্বে এক প্রবন্ধে আমি এই দেবীকে দিকপালগণকর্তৃক অভিষিক্তা সদ্য সাগরোত্থিতা পৃথিবী বলে বর্ণনা করবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলাম। ভারহুতের সিরিমাকে আমি পরিভাষায় রচিত বৌদ্ধগ্রন্থ বিমানবত্থুতে উল্লিখিত জীবকভগিনী ও মৃত্যুর পর দেবতাপর্যায়ে উন্নিতা সিরিমার মূর্তি বলে মনে করি।

মনে হয় বৌদ্ধশিল্পে উৎকীর্ণ অভিষেক লক্ষ্মী বৈদিক পৃথিবী বা অদিতী এবং পুরাণোক্ত শ্রী শেষপর্যন্ত এক ও অভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। গণেশ কিন্তু নিতান্তই অবৈদিক দেবতা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক উল্লিখিত 'দন্তী' নামক দেবতাকেই গণেশ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। এ ছাড়া ভিন্নভিন্ন পুরাণ ও অন্যান্য উপকরণ থেকে এবং অন্যান্য সূত্র থেকে অত্যন্ত যত্নসহকারে গণেশ সম্পর্কিত বহু প্রবচন, ধ্যান, কাহিনী ইত্যাদি পরিবেশন করেছেন। ভারতের বাইরে পৌরাণিক তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সাধনাকে অবলম্বন করে গণেশের জনপ্রিয়তা যেভাবে প্রসারিত হয়েছিল বিদ্যাভূষণ মহাশয় সে সম্পর্কেও বিশদভাবে আলোচনা করে গণেশ সম্পর্কিত অংশটির মূল্য বৃদ্ধি করেছেন। মূর্তি ও সাধনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনায় নলিনীকান্ত ভট্টশালী যে যুক্তিবিচারের প্রবর্তন করেছিলেন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের রচনায় তার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার হওয়া নানা কারণে নিতান্তই বাঞ্ছনীয় এবং পুরোগামী প্রকাশনীর উৎসাহী কর্মীরা এ বিষয়ে অগ্রণী হওয়ায় তাদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, তাঁরা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অন্যান্য অপ্রকাশিত রচনা মুদ্রিত করতে যত্নপরবশ হবেন এবং অধুনা অপ্রচলিত সরস্বতী সম্পর্কিত পুস্তকটি পুনর্মুদ্রিত করার কথাও তাঁরা চিন্তা করবেন। বেশ কয়েকটি মূর্তির প্রতিলিপি সন্নিবিষ্ট থাকায় বর্তমান পুস্তকটির মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে সন্দেহ নাই।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্প ॥ শিশিরকুমার দাশ। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৬। ১০·০০

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পকে সজীবতম শাখা বললেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন বা করছেন তাঁরা সকলেই এই শাখাটিকে নবীনতম শাখারূপেই চিহ্নিত করেছেন। বর্তমানে যে বিশিষ্ট রচনারীতিকে সচেতনভাবে আমরা ছোটগল্প বলে অভিহিত করছি তা উনবিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নানাধরণের ছোটগল্পের আবির্ভাব লক্ষণীয়। বাংলা ছোটগল্পের বয়স একশত এখনও পূর্ণ না হলেও বহু প্রবীণ ও নবীন গল্পকার এই বিশিষ্ট রূপটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন ও করছেন, ফলে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার যে সমৃদ্ধ হচ্ছে তা বলাই বাহুল্য। নিত্য নব সংযোজন সত্বেও এই শাখাটি সম্পর্কে তত্ব ও তথ্যগত আলোচনা যে সুপ্রচুর নয় তা অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে, এই বিভাগটি সম্পর্কে উপযুক্ত আলোচনার অবকাশ আজও যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। সুখের বিষয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের রীডার শ্রীশিশিরকুমার দাশ স্বল্প-আলোচিত এই বিষয়টিকে তাঁর গবেষণার বিষয়রূপে গ্রহণ করায় আলোচনার অভাব অনেকখানি দূর হয়েছে। তবে অধ্যাপক দাসের পূর্ববর্তী আলোচকদের স্মরণে রেখেই একথা গ্রহণীয়।

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প সম্পর্কে প্রথম আলোচনার গৌরবপ্রাপ্য শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর এবং তারপর আরও কয়েকজন খ্যাতিমান ব্যক্তি এই বিষয়টিকে আলোচ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা সকলেই বাংলা ছোটগল্পের সূচনা থেকে আধুনিক পরিণতির ক্রমবর্তনের ইতিহাসই আলোচনা করেছেন কিন্তু অধ্যাপক দাশ বলেছেন—"আমার গ্রন্থটির বয়ঃসীমা ১৮৭৩-১৯১৩ অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সূচনার ইঙ্গিত দিয়েই তার পরিসমাপ্তি" আলোচনার বিষয়বস্তু এইভাবে একটি বিশেষ কাল পরিধির মধ্যে আবদ্ধ হওয়ার ফলে এই গ্রন্থে সূচনাপর্বের আলোচনা গভীরমূল হওয়ার অবকাশ পেয়েছে, আর এখানেই গ্রন্থটির স্বাতন্ত্র।

অধ্যাপক দাশ তাঁর গ্রন্থটিকে ষোলটি পর্বে সমাপ্ত করেছেন। এরমধ্যে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বাংলা ছোটগল্পের আবির্ভাবের পটভূমিকে সুচিহ্নিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ছোটগল্পের মত বাংলা ছোটগল্পও মূলত পত্রিকার বুকেই জন্ম ও প্রতিষ্ঠালাভ করেছে এই বক্তব্য উপস্থিত করে তিনি পত্রিকার বুকে কি রূপ নিয়ে ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করল তারই বিশ্লেষণে মনোযোগী হয়েছেন। ছোটগল্পের রূপ-বিশ্লেষণ করতে বসে গবেষক এক নেপথ্যভূমিতে প্রবেশ করায় কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং তিনি বলেছেন "ইতিহাসের উপকরণ ছড়িয়ে আছে এই নেপথ্যভূমিতে; এই অন্তরালভূমিতে যে কুসুম কোরকদশায় বন্দী হয়ে মুক্তি চাইছিল সেই অন্তরালভূমিকে আনলে এই বিচিত্র সাহিত্যরূপের পরিচয় পরিস্ফুট হবে।"

গল্প-সাহিত্যের এই বিচিত্র রূপের পরিচয় পরিস্ফুট করতে গিয়ে তিনি বাংলা ছোটগল্পের প্রথম পর্যায়ের রচনাগুলিকে চারটি পৃথক নামে চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। প্রথম স্তর "টুকরো টুকরো কাহিনী, এদের নাম দেওয়া যেতে পারে চূর্ণক।" এই চূর্ণক শব্দটি তিনি সাহিত্য-

দর্পণের একটি শ্লোক থেকে সংগ্রহ করে তাঁর আলোচনার কাজে লাগিয়েছেন এবং উদাহরণ হিসেবে সমাচার-দর্পণ, বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করে তাঁর বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন সেটি হল "আখ্যানক"। কোন্ জাতীয় রচনাকে আখ্যানক নামে অভিহিত করতে চান সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে একে বারোটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সংশ্লিষ্ট দৃষ্টান্তও আছে সেই সঙ্গে। তৃতীয় স্তরের নামকরণ করেছেন "নক্সা"। নক্সা কাহিনীর কাঠামোমাত্র; তারমধ্যে কাহিনীর আভাস আছে, কিন্তু পূর্ণতা নেই।" এ বক্তব্য লেখকের। প্রথম পরিচ্ছেদ। উৎসের দিকে: দ্বিতীয় পর্যায় অংশে তিনি যে চতুর্থ স্তরের অবতারণা করেছেন সেটি হল 'নভেলা'। পরিভাষার অভাবেই ছোট ছোট উপন্যাসকে তিনি এই আখ্যা দিয়েছেন। তৎসহ গ্রন্থকারের স্মারক—"চূর্ণক, আখ্যানক ও নক্সা এই তিন ধারার পরিণতি নভেলায় নয়, নভেলা একটি পরবর্তী নূতন ধারা।" এই দু'টি পরিচ্ছেদে গবেষক যে বক্তব্যকে উপস্থাপিত করেছেন তা প্রশংসনীয় কারণ ইতিপূর্বে ছোটগল্প নিয়ে যে আলোচনা গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে, এই গ্রন্থের অন্যান্য পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট একাত্মতা থাকলেও এই অংশের আলোচ্য বিষয় কিছু নতুন ধরণের।

প্রসঙ্গত আর এক কথা। বাংলা দেশে বহুদিন থেকে মৌখিক গল্প বলার একটি ট্রাডিশন চালু ছিল। এরা পেশাদার গল্প বলিয়ে। বাড়ীর মেয়েদের চিত্তবিনোদন তথা ধর্মমতি করার উদ্দেশ্যে এই গল্প বলিয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরে গল্প বলে আসত। ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের কেউ কেউ পূর্ব স্মৃতি আলোচনায় এদের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া জমিদার বাড়ীর বয়স্য বা (ভাঁড়ের দল) নিযুক্ত হতেন তাঁর গল্প বলাবার নিপুণ ভঙ্গীর জন্য। নিছক কল্পনা নয়, অনেক সময় প্রতিবেশী জমিদারকে ঘায়েল করবার মতলবে কিছু তথ্যের উপর রঙ চড়িয়ে তাঁরা গল্প বানাতেন। ভাঁড় ছাড়াও এদেশের নাপিতরা ছিল দক্ষ গল্পস্রষ্টা এবং প্রায়ই সে-সব গল্প কাহিনী-ভিত্তিক। এই মৌখিক ট্রাডিসনকে অস্বীকার করলে ছোট গল্পের পূর্বপট রচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। আর ছোট গল্প কেবল সাহিত্যের কার্যকারণ সম্পর্কে আবদ্ধ নয়; দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থার সঙ্গে চিন্তা-জগতের যে বিপ্লব উনিশ শতকের মানুষকে ভাবতে শিখিয়েছিল সেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনও ছোট গল্পের জন্মলাভে সহায়তা করেছিল। এই দিকটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি তত প্রসারিত হয়নি।

মুদ্রণ প্রমাদ দূরপনেয় কিন্তু সর্বদাই নিন্দনীয়। বহু ভুল এই বইটির সর্বাঙ্গে দুষ্টক্ষতের মত বিরাজিত। বিশেষতঃ ৭৮ পৃষ্ঠায় ৭৭ পৃষ্ঠার একটি লাইন পুনর্মুদ্রিত হওয়ায় পাঠকমন পীড়িত বোধ করবে।

অরুণ সান্যাল